ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

বিংশ বর্ষ

১৩৫৪

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

রামধনু

বিংশ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র), ১৩৫৪

সূচীপত্র

ষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	প
ধ (গল্প)	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ	৬
বাবুর অন্তর্দ্ধান (ঐ)	শ্রীশামুক	৬
ল্লা বনাম ভারতবর্ষ (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	৩
রা শ' সাতান্ন (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি	২১
াড়ী খড় ফাঁক (গল্প)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৯, ১০১, ১
(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ, বিদ্যাবিনোদ	৪৭
দের গ্রাম (ঐ)	ঐ	২৮৬
দেশের বৈজ্ঞানিক (জীবনী)	অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে	৪১
যখন ছোট ছিলাম (স্মৃতি-কথা)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২, ১
(বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য. এম্.এ, বি.এস্-সি	
ক-গঠন (ঐ)	ঐ	১৫
ার কাহিনী (ঐ)	ঐ	৮
চলে অসীমের পথে (ঐ)	স্থলপদ্ম	
যুগ (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু	২৮
তের কারিকর (প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	২০
াশ নগর (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু	
াক নীল পাখী (কবিতা)	শ্রীঅধীর দাস	
নতুন আবিষ্কার (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্. এস্-সি	৩
রাতে (কবিতা)	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
স্বর্ণ-সন্ধ্যা (স্মৃতি-কথা)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	২
খানি হাস (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি	
য আছে মজার মানুষ (ঐ)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	
ায়া ভ্রমণ (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়	
(কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী	
লিংটন স্কোয়ারের যুদ্ধ (স্মৃতি-কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	
খেলা	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	৫
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (জীবন-কথা)	শ্রীকৌটিল্য	৭
বড় ময়লা জিনিষ (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১
টি ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও গণ-বিপ্লব	...	

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক
কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা	...
কলকাতার ফুটবল (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র
কলিযুগের কুবের (জীবনী)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য. এম্. এস্
কল্পনাতীত (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার
কাতুকুতু দাও (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি
কার্ব্বন ডায়কসাইডের কারবার (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত, বি. এস্-সি
কুড়ান গল্প (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি
কৃতী গ্রাহক শ্রীমান্ মনীষকুমার	...
খাবার চিবিয়ে খাবে (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস
গল্প বলার বিপদ (গল্প)	শ্রীশামুক
গান্ধীজির কয়েকটি বাণী	...
গান্ধীজির গল্পসঞ্চয়ন (জীবন-কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস
গান্ধীজির জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা	...
গান্ধীজি লোকটি কেমন ছিলেন	...
গান্ধীজি সম্বন্ধে বই	...
চিঠি (কবিতা)	শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী
চিঠিপত্র	৩৮, ৭৫, ১১২, ১৪৯, ১৮৬, ২২৩, ২৬৪ ৩০০,
চিত্রশালা	১৭,
চুপি চুপি (কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া
চেতনা (গল্প)	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ
ছড়া (কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
ছিটে ফোঁটা (ঐ)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী
ছোট পাখী ব'লে গেল (ঐ)	শ্রীনিহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার
ছোট্ট একটি মিথ্যে (গল্প)	শ্রীকমলা দত্ত, বি এ. বি, টি
ছোট্ট টুকু (কবিতা)	শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী
জনগণমন-অধিনায়ক (জীবন-কথা)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ
জয়তু গান্ধী (কবিতা)	শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
জয় মহাত্মা (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ
জাতীয় পতাকা (প্রবন্ধ)	ঐ
জার্ম্মান্ মজুরদের সঙ্গে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়
জার্ম্মানীর স্মৃতি (ঐ)	...
জীবন (গল্প)	শ্রীনারায়ণ দত্ত
জুজুবুড়ী (কবিতা)	শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য্য
জ্যোৎস্নায় (ঐ)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
টিনের ক্ষুদ্র কাহিনী (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়	১০
ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান (জীবন-কথা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	১৬৬
ডিউটি (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৮২
তপু সর্দার (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্. এ.	৩২৯
তরল বায়ু (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়	১৩১
তরুণের সাধ (কবিতা)	এ. কে. জয়নাল আবেদীন	২৮৭
তিনটি প্রশ্ন (গল্প)	শ্রীসীতা দেবী	৭৪
দলপতি (গল্প)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	৮২
দাওয়াই (ঐ)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি	২৩৭
দিল্লীপথের ডাক (কবিতা)	কুমারী দীপালী সেনগুপ্তা	৩৬২
দুই শিকারীর কাহিনী (গল্প)	শ্রীশান্তা দেবী	২৯৫
দুঃখ জয়ের মন্ত্র (ঐ)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	১৩
দেশের ছেলে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১৮
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর	৪০, ৭৯, ১১৫, ১৫৩, ১৮৯, ২২৫, ২৬৭, ৩০৩, ৩৩৬, ৩৬৮, ৪০৩, ৪৩৯, ৪৪০	
নটবর পাল (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	২৭৮
নতুন বই (সমালোচনা)		১৫২, ৩০৩
নবসন্ন্যাসী (কবিতা)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্	৩৭১
নয়া আগষ্টের শহীদ (গল্প)	শ্রীপরিমল সিংহ	১৯৫
নানা প্রসঙ্গ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ৩১, ৬৫, ১৪৬, ১৭৭, ২৫৮, ৩২৩, ৩৯৮, ৪৩০	
নাপিতের বুদ্ধি (গল্প)	ঘোরপ্যাঁচ	১০৯
নালিশ (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৯
নিস্তারিণী পিসিমার সত্য কাহিনী (গল্প)	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ	২৩০
নেতাজী-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬২
নেমে আয় (ঐ)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৫
পড়ার সময় নাই (ঐ)	ঐ	৮১
পলাইতে পথ নাই (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৭
পানুর প্রবেশিকা পরীক্ষা (গদ্য কবিতা)	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	২৮৪, ৪১, ১১১, ১১৫, ২২৪, ২৬৬, ৩৬৫, ৪৩৯
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল		
প্রণাম (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন ঘোষ, এম্. এ, বি. এল্	৩০৫
প্রত্যহ কি খাওয়া উচিত	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৩২৮
ফোটার কাহিনী (কবিতা)	শ্রীননীলাল দে	৪১২
বড় কাজ (প্রবন্ধ)	অরূপ	৩১২

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ন্দে মাতরম্ (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এ	২২৭
ষী যতীন (ঐ)	শ্রীপ্রভাত বসু	২৫২
ড়ীওয়ালার সেই ব্যাপারটা (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল	১৯৯
পুজী ও মহাত্মা		৩৭৫
ংলার নববর্ষ উৎসব (সচিত্র)	শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস	৬৩
ংলা সাহিত্যের গল্প (প্রবন্ধ)	শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ ১৮, ১০৮, ১৪০, ১৬৩, ১৯৭, ২৪৩, ২৮৫, ৩৯২	
জ্ঞানের এক অদ্ভুত ছাত্র (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়	৩১৪
দেহী আত্মা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৪, ৩০৬, ৩৪২, ৩৮৯, ৪১৪	
স্ময় (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	১৭০
লি (ঐ)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	৩১৬
জ্ঞানিক ঋষি অঙ্গিরা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ	২৮৩
বদিক যুগের প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	১১৭
াণ্ডেল (দেশবিদেশের কথা)	শ্রীগৌরী দেবী ৩৯, ৭৭, ১১১, ১৫১, ১৮৮, ২২৪, ২৯৮, ৪৩৭	৩৫
াবী সাহিত্যিকের বৈঠক	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	১৮১
ারতের জাতীয় পতাকা (কবিতা)		২৮২
জার ছবি (চিত্র)	যাদুকর এস্. কে. ভাদুড়ী	২৫৪
ঞ্চের ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক)		১৮৩
ণিমঞ্জুষা		৩৮০
নে রেখ		১১০, ৪৩৯
নোরঞ্জন-চিরস্মৃতি-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল	শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়	১০৪
নোহরপুর (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	৩৭৭
হাতপা (জীবন-কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি. এ	৩৬৯
হাত্মা (কবিতা)	জয়নাল আবেদীন	৩৭৭
হাপ্রয়াণে (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	৩০৯, ৩৫৪
ানস সরোবরে এক রাত্রি (দেশবিদেশের কথা)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	১৬১
ানুষ (গল্প)		১১৮
ক্তাকণা (সংগ্রহ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	২০৮
ঘের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	১৫২, ১৭৬, ২২২, ২৬৭, ৩০৩, ৩৬৫, ৩৯৬, ৪৩৯	
যে বই তোমরা পড়তে পার	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৯১
্যানি বেশান্ত (কবিতা)		
াধামাধবের রত্নহার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৪, ৪৪, ৮৪, ১১৯
ামগড়ের জঙ্গলে (স্মৃতি-কথা)	শ্রীহীরালাল মিত্র	৩৩৮, ৩৮৬
রু (গল্প)	শ্রীরাধারাণী দেবী	৩৭
লাই ফেরৎ নন্দদুলাল (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীশামুক	৬, ৫৩, ৯১, ১২৮, ১৫৬, ১৯২, ২৩৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক	
লড়ুয়ে চড়াই (প্রবন্ধ)	...	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	...
লাল কেল্লা (গল্প)	...	শ্রীসুমেধা মুখোপাধ্যায়	...
শিয়ালের চাতুরী (ঐ)		অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	
শিশুসাহিত্য-সংবাদ (সমালোচনা)	...		৭৮, ১৫২, ২৬৩, ২৯৭, ৩০৩,
শীত (কবিতা)	...	শ্রীহরিপদ গুহ	...
শোক-সংবাদ	...		...
শ্রদ্ধাঞ্জলি	...		...
সকলের কাছে আগে (প্রবন্ধ)	...	অরূপ	...
সখের মিউজিয়াম্ (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	
সত্যি-মিথ্যে (গল্প)	...	কুঞ্জনাথ	...
সন্দেশ			৩৯, ৭৬, ১১৪, ১৫১, ১৮৭, ২২১, ২৬৫, ৩০১, ৩৩৫, ৩৬৫, ৪০১,
সন্ধ্যামণি (কবিতা)	...	শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক	...
সন্ন্যাস (ঐ)	...	ঐ	...
সবচেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার (গল্প)	...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	...
সবজান্তা	...	শ্রীকল্যাণী রায়	...
সব সত্যি (প্রবন্ধ)	...	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	...
সহযাত্রী (গল্প)	...	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	...
সাত ভাই চম্পা (কবিতা)	...	বন্দে আলী মিয়া	...
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	..		...
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...		...
সাংহাইয়ের গল্প (গল্প)	...	শ্রীনারায়ণ দত্ত	...
সিদ্ধপুরুষ (গল্প)	...	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	...
সুকুমার-স্মরণে (জীবন-কথা)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	
সুভাষ-স্মরণে	...		...
সুয়েজ খাল (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	...
সেণ্ট জর্জ্জের কথা (ইতিহাসের কথা)	...	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ	
সোনার ছবি (কবিতা)	...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...
সোমনাথ (ঐ)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...
স্বপ্নে (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...
স্বাধীনতার দিনে	...		...
স্বাধীনতার পথে	...		...
স্বাধীন ভারত ও ইংরাজী ভাষা	...	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	
স্বাধীন ভারতের আদর্শ	...		...
হে বীর, প্রণাম করি (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর,	২১১, ২৪০, ২৯৩, ৩২১, ৩৫২,
হে মরণজয়ী বীর (কবিতা)	...	শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...

বার্ষিক ৩
ষাণ্মাসিক

কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা
ফোন : সাউথ

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	
লড়ুয়ে চড়াই (প্রবন্ধ)	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	...
লাল কেল্লা (গল্প)	শ্রীসুমেধা মুখোপাধ্যায়	...
শিয়ালের চাতুরী (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	
শিশুসাহিত্য-সংবাদ (সমালোচনা)		৭৮, ১৫২, ২৬৩, ২৯৭, ৩০৩,
শীত (কবিতা)	শ্রীহরিপদ গুহ	...
শোক-সংবাদ		...
শ্রদ্ধাঞ্জলি		...
সকলের কাছে আগে (প্রবন্ধ)	অরূপ	...
সখের মিউজিয়াম্ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	
সত্যি-মিথ্যে (গল্প)	কুঞ্জনাথ	...
সন্দেশ		৩৯, ৭৬, ১১৪, ১৫১, ১৮৭, ২২১, ২৬৫, ৩০১, ৩৩৫, ৩৬৫, ৪০১,
সন্ধ্যামণি (কবিতা)	শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক	...
সন্ন্যাস (ঐ)	ঐ	...
সবচেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	...
সবজান্তা	শ্রীকল্যাণী রায়	...
সব সত্যি (প্রবন্ধ)	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	...
সইযাত্রী (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	...
সাত ভাই চম্পা (কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	...
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা		...
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর		...
সাংঘাইয়ের গল্প (গল্প)	শ্রীনারায়ণ দত্ত	...
সিদ্ধপুরুষ (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	...
সুকুমার-স্মরণে (জীবন-কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	
সুভাষ-স্মরণে		...
সুয়েজ খাল (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	...
সেণ্ট জর্জ্জের কথা (ইতিহাসের কথা)	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ	
সোনার ছবি (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...
সোমনাথ (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...
স্বপ্নে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...
স্বাধীনতার দিনে		...
স্বাধীনতার পথে		...
স্বাধীন ভারত ও ইংরাজী ভাষা	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	
স্বাধীন ভারতের আদর্শ		...
হে বীর, প্রণাম করি (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, ২১১, ২৪০, ২৯৩, ৩২১, ৩৫২,	
হে মরণজয়ী বীর (কবিতা)	শ্রীঅচ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...

২০শ বর্ষ • বৈশাখ, ১৩৫৪ • প্রথম

কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
প্রতি সং
ফোন : সাউ

COLOUR PA

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। **হারান বই**—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। **ওপারের দূত**—(প্রবোধ সান্যাল)
৩। **রাতের আতঙ্ক**—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। **স্বর্গের সিঁড়ি**—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। **জয়পতাকা**—শৈলবালা ঘোষজায়া
৬। **অভিশপ্ত ম্যামী**—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। **বিভীষণের জাগরণ**—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রত্নভূষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয়-পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি
ভাদ্র—**সবই যখন অন্ধকার !**—অশোক মিত্র

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান-কাহিনী-পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জন্মদিনে

'দ্বারে আসি' দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫৪ { ১ম সংখ্যা

সোনার ছবি

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা
নদীর কূলে কূলে,
ঘেসো-ফুলের চুমকি তাতে
কাঁপছে দুলে দুলে।
ভোরের বেলা আলোর মেলা,
আকাশ জুড়ে রংয়ের খেলা,
আলোর হোলি খেলছে কে ঐ
আবীর গুলে গুলে?

রাতের আঁধার দূর হোলোরে,
বার হয়েছি সোনার ভোরে,
হাসছে আলো নীল আকাশের
দুয়ার খুলে খুলে;
ঝুরু ঝুরু বাতাস চলে,
ঢেউ ওঠে তায় নদীর জলে,
সোনার স্বপন দেখছে নদী,
উঠছে ফুলে ফুলে।

রামধনু—

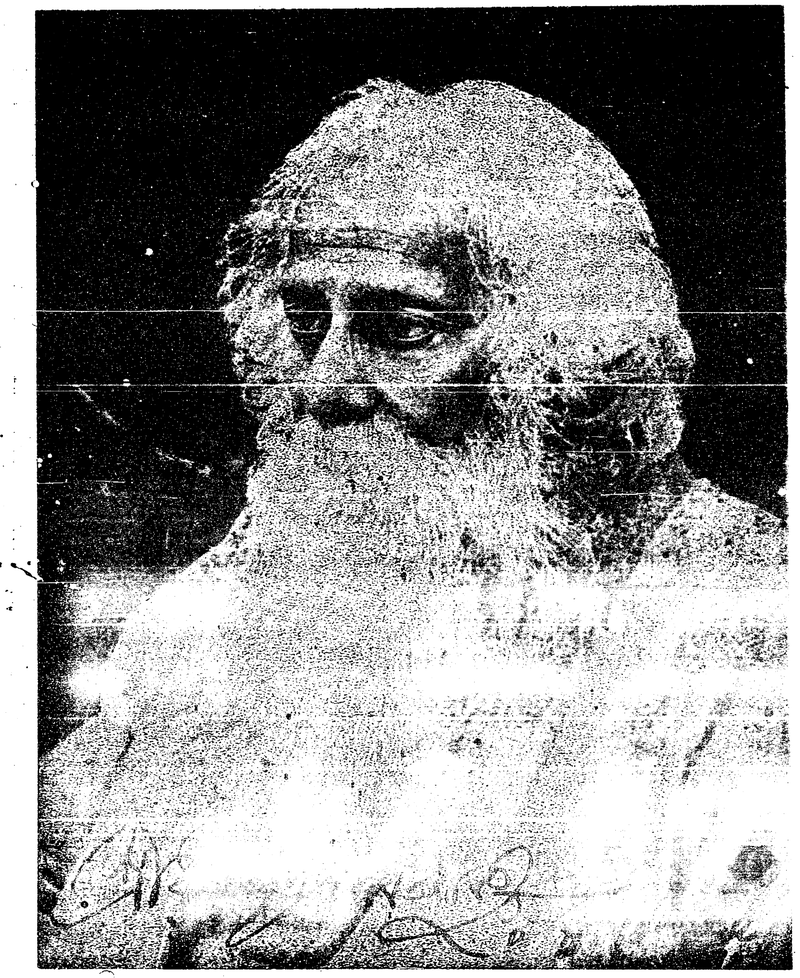

জন্মদিনে
'দ্বারে আসি' দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৫৪ | ১ম সংখ্যা

সোনার ছবি

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রাতের আঁধার দূর হোলোরে,
বার হয়েছি সোনার ভোরে,
হাস্‌ছে আলো নীল আকাশের
দুয়ার খুলে খুলে ;
ঝুরু ঝুরু বাতাস চলে,
ঢেউ ওঠে তায় নদীর জলে,
সোনার স্বপন দেখ্‌ছে নদী,
উঠ্‌ছে ফুলে ফুলে।

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা
নদীর কূলে কূলে,
ঘেসো-ফুলের চুম্‌কি তাতে
কাঁপ্‌ছে দুলে দুলে।
ভোরের বেলা আলোর মেলা,
আকাশ জুড়ে রংয়ের খেলা,
আলোর হোলি খেলছে কে ঐ
আবীর গুলে গুলে ?

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE

কচি কোমল সবুজ ঘাসে
ফড়িং ওড়ে রাশে রাশে,
ঘেসো ফুলে বসতে ভোমর্
পড়ছে ঢুলে ঢুলে ;
বটের শাখে, অশথ-গাছে,
বাঁশের ঝাড়ে নদীর কাছে,
আসর জমায় পাখীর দলে
কূজন তুলে তুলে।

বন-মালতীর বাস ছুটেছে,
ঝুমকো লতায় ফুল ফুটেছে,
তারই লতায় প্রজাপতি
নাচছে ঝুলে ঝুলে ;
কোন্ সে মহান্ শিল্পী কবি
ফুটিয়ে তোলেন সোনার ছবি ?
প্রণাম করি তাঁরেই আমি
সকল ভুলে ভুলে।

আমি যখন ছোট ছিলাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রায় ৫০।৬০ বছর আগেকার কাহিনী। আমার শৈশব-স্মৃতির কিছু কিছু তোমাদের ইতিপূর্ব্বে (ফাল্গুন, ১৩৫৩) বলেছি। আজ আবার কিছু শোন।

আমাদের পণ্ডিত মশাই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী। সে সময়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রচার ছিল খুবই বেশী। আমাদের গ্রামে ডাকঘর ছিল না। পাশের কমারখাড়া (স্বর্ণগ্রামে) ছিল ডাকঘর। কামাখ্যা পণ্ডিত মশাই ছিলেন 'বঙ্গবাসীর' গ্রাহক। তখনকার দিনে দৈনিক কাগজ বাংলা ভাষায় ছিল না। 'দৈনিক-চন্দ্রিকা' নামে একখানি দৈনিক কাগজ ছিল, সে কাগজখানা গ্রামে কারু কাছে আসতো না। যেদিন 'বঙ্গবাসী' ডাকঘরে আসতো সেদিন ডাকঘরে ভিড় জমে যেত, লোকেরা সব সংবাদ শুনতেন। আমাদের গ্রামে তিন-চার জন ছিলেন বঙ্গবাসীর গ্রাহক। পণ্ডিত মশাই প্রত্যেক সোমবার আমাদের ডেকে দেশের সব খবর শোনাতেন। শুনে মহা আনন্দ হ'ত। আমাদের গ্রামের বাইরে দু'-এক জন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা রাখতেন। আবার বাবা ও মা 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' আর 'জন্মভূমি' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা রাখতেন। 'জন্মভূমি'তে ছবিও থাকতো। সে পত্রিকাখানা ১২৯৭ সালে প্রথম বের হয়। কতদিন আগেকার কথা!

সেকালের ডাক-হরকরার একজনের নাম ছিল সীতা-
নাথ। সে ছিল আবার পিসীমাদের প্রজা—ভিন্ন গাঁ
লোক। আমরা মাঝে মাঝে বাবা, মার চিঠি আন
জন্য ডাকঘরে যেতাম। একদিন বিকেল বেলা স্কুল থে
এসে দেখি সীতানাথ দিদিমার কাছে বসে কাঁদছে, দি
তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমরা বললাম—'কি হ
সীতানাথ দা?' সীতানাথ দা' বললে—'আমার বাবা আ
পাতাল গেছে; বাবাকে দেখতে পেলাম না!' আ
বললাম 'চিঠিটা দেখি!'—একখানা এক পয়সার ক
একজন লিখেছে,—গ্রাম সম্পর্কে দাদা, 'ভাই সীতনাথ,
লিখন সাত তারের লিখন বলে মনে করবে। তো
বাবার ব্যায়ারাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাকে ঢাকা আ
পাতালে দেওয়া হইয়াছে।' সকলে সীতানাথকে বুঝিয়ে
আকাশপাতাল আর কি হবে, অর্থাৎ তোমার বাবা
গেছে! নলিনী মামা ও আমরা বললাম, 'তোমার
মরে নি, সে ঢাকা হাসপাতালে আছে।' কয়েকদিন
সীতানাথ এসে বললো—'তোমাদের কথাই ঠিক ভা
মণিরা,—বাবা হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে বাড়ী ফিরেছে
চিঠি-লিখিয়ে হাসপাতালকে লিখেছে আকাশপাত
তাইতে এত বিভ্রাট!

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা আমাদের একটি কেন্দ্রে হ'
বাইরের দুই-একজন পরীক্ষক এসেছিলেন। এবার আ
হ'লো উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর পড়া। অনেক নূতন

…লো। তার মধ্যে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যপাঠ' …তীয় ভাগ, চারুপাঠ—দ্বিতীয় ভাগ অক্ষয়কুমার দত্তের, …রিমিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব, এ সব অনেক বই হ'লো। পি. …যের পাটিগণিতও পাঠ্য হলো। মিশ্র ভাগ ছেড়ে …লো ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিকের পালা। আমদের স্কুলে …রাজী বই পড়ান সুরু হ'লো, বইখানির নাম Royal Reader। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভাগ হবে। পড়াতেন পণ্ডিত …শয়ের একজন বন্ধু নিবারণ দাস। নিরারণ দাস ছিলেন …মের একজন মেধাবী ছাত্র। ফাষ্ট আর্টস্ পড়তেন …ন্তু এমন একটা কাজ করেছিলেন যে জন্য তাঁকে গ্রামের …ক শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। নিবারণের বাবা ছিলেন …কার মাঝি। নিবারণ যখন ঢাকা পড়তেন তখন একবার …র বাবা কিছু নারকোলের নাড়ু ইত্যাদি নিয়ে মেসে …য়েছেন। তাঁকে দেখে মেসের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলো, …কে ভাই?' নিবারণ বললে, 'বাড়ীর বুড়ো চাকর।' বৃদ্ধ …কথা শুনে সেই যে মেস থেকে চলে গেলেন, জীবনে তিনি …র কোনদিন পুত্রের মুখদর্শন করেন নি। নিবারণও …আর্টস্ পরীক্ষা দেবার বছরই গুরুতর পীড়ায় ভুগে মারা …লেন। ছেলেবেলার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা এখনও …মার মনে আছে।

… কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সম্বন্ধে এখন …উ আলোচনা করেন না। যদুগোপাল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তার পর তাঁর সঙ্কলিত 'পদ্যপাঠ' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগের মত সুন্দর সঙ্কলন গ্রন্থ সেকালে একখানিও ছিল না। সাহিত্যের …স এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ 'পদ্যপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ পড়েই পেয়েছিলাম। কি আনন্দেই না উচ্চৈঃস্বরে …ড়তাম—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়!

*   *   *   *

অই শোন, অই শোন ভেরীর আওয়াজ হে
ভেরীর আওয়াজ!'

প্রাণে পেতাম অদ্ভুত আনন্দ ও উন্মাদনা। আবার হেমচন্দ্রের—

'শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল,
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল।'

কি ভালই না লাগত! আমাদেরও কবিতা লিখতে সাধ যেত। 'চারুপাঠের' সেই পরমকারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বর আমাদের সর্ব্বদা ভয়ের সঞ্চার করে দিতেন। ব্যাকরণের কূটতত্ত্ব, সমাসের বিশ্লেষণ, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্বের তুমুল দ্বন্দ্বে দিশেহারা হয়ে যেতাম। পণ্ডিত মহাশয়ও এমন নিষ্ঠুর ভাবে ব্যাকরণ নিয়ে হাঙ্গামা করতেন যে আমাদের চারিদিক্ অন্ধকার লাগত! আমাদের প্রথম ব্যাকরণের পাঠ হয়েছিল লোহারাম শিরোরত্নের একখানা ব্যাকরণ নিয়ে। যেমন ছিল লোহারাম, তেমনি ব্যাকরণখানিও ছিল লোহারাম! একেবারে নীরস। মুখস্থ করে ফেলতাম, কিন্তু বুঝে উঠতে পারতাম না। আমাদের সময়ে অর্থপুস্তকের কোন বালাই ছিল না। পণ্ডিত মশাইদের কাছে কিংবা অভিধান খুঁজে শব্দের অর্থ বার করতে হ'ত। গ্রামে দু'তিনখানার বেশী অভিধান ছিল না। একখানি অভিধানের নাম ছিল 'প্রকৃতিবোধ'। এবার দেশে গিয়ে দেখলাম যে আমার বাল্যের পুরানো খাতাপত্র এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ, ঘরবাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব লোপ পেয়ে যাবার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বাড়ীতে আমাদের খুবই কড়া শাসন করতেন দিদিমা। ওদিকে যেমন খাওয়ার বেলায় মুক্তহস্ত, তেমনি পড়াশুনার বেলায় ছিলেন একেবারে ভয়ঙ্করী মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডিকা-রূপিণী! আমাদের পড়ার উচ্চারণ শুনেই মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, বলতেন, হুঁ। মালা জপার সঙ্গে সঙ্গে সে হুঙ্কার শোনাত ব্যাঘ্রের হুঙ্কারের মত। Royal Readerএর গল্প পড়ছি—দিদিমা বললেন, হ'ল না—ইঙ্গিলি ঠিক হ'ল না।' নিরক্ষরা দিদিমার এমন হুঙ্কারে আমরা বিস্মিত হতাম, কিন্তু সত্যি ভুল পড়া তিনি দিব্যি বুঝতে পারতেন। সন্ধ্যের পর খেলার মাঠ হ'তে ফিরতে দেরী হ'লে গ্রামের প্রান্তে এসে আমাদের নাম ধরে এমন জোরে ডাকতেন যে গ্রামের লোকেরাও ব্যস্ত হয়ে পড়তো। দিদিমার সব দিকেই ছিল নজর, কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি ছিলেন

TIGHT BINDING

উপরে! জ্বর হ'লেও চালতের ডাল দিয়ে ভাত খাইয়ে দিতেন।

সেকালে আমরা সাধারণতঃ খালি পায়েই চলাফেরা করতাম। শুধু সন্ধ্যেবেলা পা ধুয়ে খড়ম ব্যবহার করতাম। গায়ে দিতাম দোলাই। সহজ, সরল ছিল জীবন-যাত্রা। একবার বাবা-মা আমাদের জন্য কে, এম, দাসের ও কিয়ামুদ্দীন মিঞার তিন জোড়া চটি জুতো পার্শ্বেল করে পাঠিয়েছিলেন। ইংরাজী জুতো বলতে বুঝাত ফিতে বাঁধা জুতো, তার ব্যবহার গ্রামে বড় কা'কেও তখন করতে দেখি নি। চটি জুতো ছিল নিত্যকার ব্যবহার্য্য। সেকালের আমাদের একজন আত্মীয় একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল তাঁর চটি জুতো ভোগদখল করে পরপারে চলে গেছেন। তাঁর কোন ওয়ারিশান না থাকায় জুতো জোড়ার কি গতি হ'লো জানি না। আবু করিমের চটি জুতোকেও তিনি হার মানিয়েছিলেন।

সে সময়ের খেলাধুলার বেশীর ভাগই ছিল দেশী। হা-ডু ডু বা ডুগু ডুগু খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশী। সে খেলায় আবার যে সব ছড়া উচ্চারণ করতাম সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বীরত্বজনক। 'ডাক' দেওয়ার সময় আমরা যে সব ছড়া উচ্চারণ করতাম—

ডুগু ডুগু লাপ্পে (লাফে লাফে)
ধনা গোদার বাপ্পে (বাপ)
খাড়া লম্বিয়া কাপ্‌পে।
খাড়ার কপালে ফোটা
মইষ (মহিষ) মারি গোটা গোটা!

কিংবা

এক হাত্তা বলরাম দোহাত্তা সিং
নাচেরে বলরাম তাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্।

খোলা মাঠে নদীর পাড়ে, কতদিন সন্ধ্যায় ও জ্যোৎস্না রাতে গ্রামের সকলে মিলে আমরা হাডুডু ও গোল্লা ছুট খেলেছি—চারিদিকে ছিল একটা প্রফুল্লতা ও আনন্দ। 'ব্যাট বল' খেলা বা ক্রিকেট খেলার তখন প্রভাব সবে আরম্ভ হয়েছে।

আমাদের খেলাধুলা, নদীতে সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, এ সকলে ছিল মহা আনন্দ। আমি ত' বাল্যে ও কৈশোরে আমাদের নদী সাঁতরে পার হয়েছি। নদী নেহাৎ ছোটও নয়—কলকাতার ভাগীরথীর প্রায় অর্দ্ধেক হবে চওড়ায়। গাছে ওঠা ছিল মহা আনন্দ। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত কল্পনাও করতে পারবে না যে পাকা গাব ফলও কেউ খায়! কিন্তু আমাদের সুপক্ক গাব ফল ছিল পরম আনন্দ। গাছের উঁচু শক্ত ডালে বসে গাব খেতাম,—কি মিষ্টি ফল! গাবের কষ কাপড়ে লেগে বিবর্ণ হয়ে যেত, সে জন্য কি তাড়নাই না সয়েছি! তবু গাব না খেয়ে থাকতে পারতাম না। গাবের আঠাই ছিল আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। কাগজ যুড়তাম, ঘুড়ি তৈরী করতাম—বইয়ের 'আইরট্' মানে 'বেঠন' অর্থাৎ কিনা বই বাঁধাতাম ঐ আঠার সাহায্যে। আইরট্, 'বেঠন' এ সব শব্দ পার্শী। আমাদের বিক্রমপুরে ছেলেবেলা এ কথা দু'টির খুবই ব্যবহার ছিল। গাবের সম্বন্ধে একটা প্যারোডিও তৈরী করেছিলাম আমরা,—

বলরে ভাই মধুর স্বরে
গাব বিনা কি ধন আছে সংসারে!

শোন এইবার এক মজার কথা। একবার গ্রামের বাগানে—নিবিড় জঙ্গল বললেই হয়—গোলাপ জাম পেড়ে খেতে গিয়েছি আমরা চারজন পাড়ার ছেলে, এমন সময় দেখতে পেলাম একটা খুব উঁচু "করুই" গাছে প্রকাণ্ড একটা মৌচাক ঝুলছে। কি চমৎকার সে মৌচাক, এত বড় মৌচাক বড় দেখা যায় না! কি করা যায়? চুপি চুপি পরামর্শ হ'ল—এ মৌচাকের মধু খেতেই হবে! কিন্তু আমাদের, ছোটদের, সে ক্ষমতা কোথায়? একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, আমার দাদা ছিলেন অতি ভাল মানুষ, শান্তশিষ্ট, কোন গোলমাল, হৈ-চৈয়ের ভিতর থাকতেন না। তিনি রৌদ্রের ভিতর, বৃষ্টির ভিতর কিংবা নদীতে দিন-রাত লাফান ঝাঁপান পছন্দ করতেন না। তাঁকে এ সব দুষ্টুমির খবর দিতাম না। আমরা পাকা গাব, গোলাপ জাম, কালো জাম, পেয়ারা, বেল পেড়ে এনে ভাগ দিয়েছি। ডাকাতি করেছি আমরা, ভাগ দিয়েছি তাঁকে, সেই ভাগের অংশ নিতেও কুণ্ঠিত হতেন। বিধাতা সে জন্যই অতি অল্প বয়সেই এই পৃথিবী হ'তে তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন।

মামাকে মৌচাকের কথা বলায় তিনি বল্লেন—'আজই ওটাকে পাড়তে হবে।' এ সব বিষয়ে আমাদের নলিনী

মামা ছিলেন মহা উৎসাহী! কিন্তু হায়রে, পাড়বে কে? আমরা ত' সব ছোট ছেলের দল। উপায়?

মামাই উপায় ঠাওরালেন। তিনি বললেন, 'ব্যোম্ তাতাকে ধর্।' ব্যোম্ তাতার কথা শোন। অমাদের গ্রামে গোপাল নামে এক শূদ্র নৌকারুমাঝি ছিল, তার ভাই কৃষ্ণ ছিল খুব জোয়ান মর্দ্দ। সে ঢাকাতে কিছু দিন পেয়াদাগিরি করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মাথা গেল বিগড়ে। সে শুধু বলে বেড়াত—'দুনিয়াটা গেল, মানুষ গেল, টাকা গেল—এই ত' গণ্ডগোল!' এ বলেই দিত হুঙ্কার। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করত 'ব্যোম্ তাতা!' তাই তার নাম হয়েছিল ব্যোম্ তাতা। সে সময়ে আমাদের গ্রামের দু' মাইল দূরে এক সাধু বাস করতেন—তিনি খুব গাঁজা খেতেন। নাম ছিল তাঁর ব্যোম্ তাতা। কৃষ্ণ তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে গঞ্জিকা সেবন করে তাতা ব্যোম্ বা ব্যোম্ তাতা নাম পেয়েছিল। তা ছাড়া তাকে আমরা যখন যে কাজে লাগিয়েছি সে কাজেই সে 'হুঁ, পারবো' বলে ছুটে এসেছে। আমরা তাকে বলতাম "দাদা ব্যোম্ তাতা।"

মামার পরামর্শে—ব্যোম্ তাতা দাদু ভাইয়ের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করতে ইবললেন—'আলবৎ পারবো। চল্, দেখে আসি।' তাঁকে নিয়ে দেখিয়ে আনলাম। বল্লেন —'দেখ্, একটা 'চঙ্গ' যোগাড় করিস্।' চঙ্গ মানে মই। নুড়োর কথা—আগুনের কথা বলতে বল্লেন—'জানিস্', আমি তাতা ব্যোম্, সারা দুনিয়া তাতাই,—আমি হচ্চি ব্যোম্ তাতা! আগুন! হিঃ হিঃ হিঃ!'

সন্ধ্যা হ'লো—ব্যোম্ তাতা দা হাতে আর লাঠি হাতে সেই বাগানে এলেন। যেমন মইটি গাছের সঙ্গে লাগিয়ে উঠতে যাবেন, দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড সাপ। তখন ব্যোম্ তাতা মশাই নিমেষ মধ্যে লাঠি দিয়ে সাপকে বিনাশ করে, কোমরে ঝুলানো ধামা নিয়ে, মই বেয়ে উপরে উঠে নিমেষ মধ্যে মৌচাক কেটে তড়িৎ-গতিতে নীচে নেমে এলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মৌমাছির ঝাঁক তাকে তাড়া করে ঘিরে ধরলে—উঃ, সে কি কামড়! তিনি হুঁ হাঁ না করে ধামাটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের একটা পুকুরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমরা ত' মই ফেলেই দে ছুট্। মধুর চাকের মধুতে ধামা ভরে গেল। মামা ও আরো দু' চার জন ছিলেন পথে তাঁরা আমাদের হাত থেকে সেই চাকের ধামাটি নিলেন। বাড়ী গিয়ে মনের আনন্দে যেমন এব ভেঙ্গে মুখে দিয়েছি, গরম মিষ্টি মধুতে ত' গেছে মু কিন্তু কে জানতো ভিতরে লুকিয়ে ছিল একটা সে এমন কামড় দিলে যে মুখ গেল ফুলে!—

চাকের মধু কি মিষ্টি হ'ত
মৌমাছির হুল যদি না রইত!

কথাটি যে কত সত্যি সেদিন বুঝেছিলাম।

পরদিন গ্রামে পড়ে গেল হৈ-রৈ! ব্যোম দাদাকে দেখতে গিয়ে দেখি, তাঁর সারা গা ফু হয়েছে। তবুও ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—'ফুলে কামড়াতে পারে নি! আমি ব্যোম্ তাতা তাঁকে প্রচুর মধু দিলাম। ব্যোম্ তাতার মা যে মি আমাদের সম্বোধন করেছিলেন সে শব্দ কোন খুঁজেও পাবে না। কিন্তু অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখলাম তাতার! তিনি আমাদের গালমন্দ কিছুই দিলে বরং বললেন—'এমন কাজ নেই ব্যোম তাতা পা তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত মধু খাওয়ালাম।

হায় রৈ দুর্দ্দৈব! বাগানের মালিক পরদিন পেয়ে পঞ্চায়েতি সভা বসালেন। আমার সঙ্গীয় দেখা মিললো না, আমি হ'লাম আসামী! কানে যাওয়া মাত্র মোটা একটা বাঁশের লাঠি খা করলেন। কিন্তু বাগানের মালিককে তিনি ধমকে 'তোমার মৌচাক ভাঙতে পারে আমার আট নাতি!'

তবু বিচার হ'লো। সাজা পেলাম। সাজ ভার পড়লো পণ্ডিত মশায়ের উপর। গ্রামের দাড়িওয়ালা মাতব্বর কৃপা করে দিলেন দু'চারটে বড় মামা দিলেন রাম চিম্‌টি! হায় রে অদৃষ্ট, স থেকে নিরীহ আমি, আমার এ নির্য্যাতন দেখে হেসে! দিদিমাকে দণ্ড দিতে হ'ল মধুর মূল্য বুড়ি সে কথা মরার আগেও শুনিয়ে গেছেন, 'তোর মত দুষ্টু ছেলে ভূ-ভারতে কারু হয় না।'

মধুও ভাল করে খেতে পারলাম না। সক দাবী জানিয়ে শিশির পর শিশি ভর্ত্তি করে নিয়ে

বাড়ীতে বকুনি, বাইরে বকুনি—সর্ব্বত্রই সেই মৌচাক ভাঙ্গার ব্যাপার থেকে আমার নাম হ'লো—দুষ্টু সয়তান! বড়রাও ভয় করতেন, ছোটরাও সমীহ ক'রে চলত। সে বয়সেই হ'লাম গ্রামের এক সর্দ্দার। পাশের গ্রামেও আমার কীর্ত্তি ছড়িয়ে পড়লো। মৌচাক কেটে আনার অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের গৌরবও আমিই পেলাম। খেলার মাঠে ভিন্ন গাঁয়ের ছেলেরাও আমাকে দেখলে সমীহ ক'রে চলত। আমার মত নিরীহ ছেলে হয়ে গেলো গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দার!

ব্যোম্ তাতাকে আমি ভুলতে পারি নি। কোন দিন পারবোও না। পাগল হ'লেও সে ছিল মহৎ! শেষটায় ভয়ানক উন্মাদ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল। রাত্রিতে তার করুণ চীৎকার শুনে প্রাণ ব্যথিত হ'ত। সকলে মিলে তাকে প্রহার করতো, খেতে দিত না, হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছিল। তার সেই তাতা ব্যোম্—ব্যোম্ তাতা করে বিকট চীৎকার; মনে হয়, এখনও কানে শুনতে পাচ্ছি! কি জানি কেন উন্মাদ আমাকে স্নেহ করতো খুব বেশী। আমরা কয়েক জন মিলে নদীতে নিয়ে তাকে স্নান করিয়ে দই-চিঁড়ে দিয়ে ভাত মাঝে মাঝে খাইয়েছি। একজন সবল মহাপ্রাণ যুবক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাল।

যেদিন রাত্রিতে সে মারা গেল—সে রাত্রির কথাটি মনে হ'লে এখনও আমার চোখে জল আসে। ব্যোম্ তাতার বাড়ীর চিহ্নও এখন নেই। গ্রামের সেই পোড়ো ভিটাতে এখন একজন সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ বাড়ী করেছেন।

এ ঘটনার পর আমি সত্যিই অনেকটা নির্ভীক্ হয়ে পড়েছিলাম। কত যে দুঃসাহসিক দুষ্টুমি করেছি সে সব গল্প এখনও যে দু'একজন প্রাচীন ব্যক্তি বেঁচে আছেন তাঁরা তাঁদের পৌত্র ও পৌত্রীদের বলে আমার মহৎ কীর্ত্তির কথা প্রচার করেন। সে সব গল্প বেশী বলা কি ভাল?

লড়াই ফেরত নন্দদুলাল

শ্রীশামুক

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ—

নন্দদুলাল নামের সঙ্গে তার চরিত্রের কোনই মিল ছিল না। চেহারায় সে ছিল লম্বা-চওড়া—লোহার মত শক্ত, আর ছেলেবেলা থেকেই সব ব্যাপারে সে ছিল 'ডিসিপ্লিন্' বা নিয়মের উগ্র ভক্ত। এ হেন নন্দদুলাল যুদ্ধে গেল এবং যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল তার আকারে-প্রকারে, চালচলনে "মিলিটারী নিয়মানুবর্ত্তিতা" গভীর ভাবে গাঁথা হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শীও তার কিছু নমুনা পেলেন। তার পর একদিন নন্দর পিসেমশাই, যিনি ছিলেন এক আপিসের বড়বাবু, নন্দকে ডেকে তাঁর আপিসে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রথম দিন আপিসে গিয়েই, সেখানকার হালচাল দেখে, নন্দ ঠিক করল আর সে আপিসে আসবে না। তার পর পড়ঃ

ছয়

—পালিতের পুনর্জন্ম—

পরের দিন নন্দ আপিসে গেল না, আর ঠিক সন্ধ্যেবেলায় আপিস ফেরত পিসেমশাই এসে হাজির।

—কিরে, আজ এলি নি যে?

—চাকরি করবো না।

—করবি না মানে? একদিন করেই ঘাবড়ে গেলি! আরে, ও রকম ছোটখাট ভুল হিসেবে হয়েই থাকে, তার জন্যে এত মন খারাপ করে লজ্জা পাবার আছে কি? জানিস, একবার আমার নিজের হিসেবে ভুল হ'ল তিনশো সতেরো টাকা নয় পাই! কিছুতেই মেলে না। ভেবে ভেবে মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেল। তারপর ধরলাম ঠিক কোথায় গলদ! আরে ঐখানেই ত' চাকরির মজা। জেনে রাখ, কেরাণীর চাকরির মানে হচ্ছে মাত্র দু'টি জিনিষ—ভুল করা আর ভুল ধরা। বেশীর ভাগ লোক সারাজীবন ভুল করেই যায়, আর মাত্র কয়েক জন ভুল ধরতে পারে। সে জন্য সকলেই ত' আর বড়বাবু হ'তে পারে নারে—হে হে হে!

পিসেমশাই খুসিতে কেটে কেটে হাসেন।

—না, ভুলের জন্যে বলছি না। ও রকম কাজ আমার ভাল লাগে না। আর যে রকম ভাবে সকলে কাজ করে তাতে ভুল ত' হবেই নির্ঘাৎ।

—কাজের আবার ভাল লাগা খারাপ লাগা কি? কাজ যে রকমই হোক করে যেতে হবে। শুধু মাসের শেষে দেখতে হবে টাকাগুলি ঠিক ঠিক পকেটে আসছে কিনা। তুই অমন রাজার চাকরি করতে চাস না, আর কত বড় বড় মহা মহা লোক এসে আমার কাছে রোজ ধন্না দেয় তাদের আত্মীয়দের দেবার জন্যে। একবার বড়-বাবু হয়ে গেলে তার পর অনেক হাংগামা, বুঝলি? যাক বাজে কথা, ও সব শুনছি না কিছু, কাল থেকে আবার আপিসে আয়। একটা মাস ত' ক'রে দেখ, তা না হ'লে আমার যে বদ্‌নাম হবে রে! সকলে বলবে বড়বাবু এমন লোক নিজের নিয়ে এল যে একদিন কাজ করেই দে ছুট।

নন্দ ঠিক করেছিল আপিসে যাবে না, কিন্তু সকলে বোঝায় যে যাওয়া উচিত। দু' দিনেই মন বসে যাবে, আর পিসেমশায়ের নাম খারাপ করাটা ভাল হবে না।

এই শেষের কারণটি তার মনকে নাড়া দেয়। সত্যিই ত', নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে যখন চাকরি দিলেন তখন কিছুদিন অন্ততঃ করা উচিত। বেশ, একটি মাস করে সে ছেড়ে দেবে। তার বেশী আর একটি দিনও নয় কিছুতেই।

নন্দ আবার আপিস যেতে সুরু করে। নিজের কাজ-টুকু মন দিয়ে করে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যে। বাকি সময়টা এখানে ওখানে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বা অন্যদের কাজে সাহায্য করে। ঐ প্রথম দিনে ভয়ে যা ভুল করেছিল তার পর আর তার ভুলও কোন হয় না হিসাবে।

অন্য কেরাণীরা যখন দেখলে তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়, তার ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা আরো বেশী আরাম করতে পারে, তখন থেকে তারা নন্দকে খুব খাতির করতে আরম্ভ করে দিলে। সকলে ডাকতে থাকে 'জেনারেল' বলে। অবশ্য আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলতো 'বোকারাম', আর দাঁত বার করে হাসতো। কেরাণীদের মধ্যে অনেকের ঐ এক প্রবল রোগ। নিজেরা যত বোকা, যত বুদ্ধিহীনই হোক না কেন, সকলে নিজেকে ভাবে বড্ড বেশী চালাক। কোন কিছুতে বেদম হেরে গেলেও চোখ মটকে দেঁতো হাসি হেসে জাহির করতে লজ্জা পায় না যে সে-ই জিতেছে শেষ পর্যন্ত।

নন্দর চোখে এ সমস্ত পড়তো না। সে নিজের খেয়াল খুসিতে নিত্যকার কাজ করে, আর অন্যরা অনুনয় বিনয় করলে তাদেরও কাজ করে দেয়। মানুষদের বা তাদের ব্যবহার নিয়ে কোন রকম মাথা ঘামাতো না। তবে একজন লোককে সত্যি তার বড় খারাপ লাগতো। সে হ'ল ধনঞ্জয় পালিত।

ধনঞ্জয়ের যেমন রূপ তেমনি গুণ। কাজ জানে না কিচ্ছু, করেও না এতটুকু, সারাদিন শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায়। তবে জিভটি ভারি সচল। মিষ্টি কথায়

তোষামোদ করতে ওর জুড়ি আর নেই কেউ। ধনঞ্জয় বড়বাবু বলতে অজ্ঞান এবং বড়বাবুও ওকে প্রধান মোসাহেব হিসাবে বেশ খানিকটা প্রশ্রয় দেন।

—কি হে পালিত, গা ঢাকা দিয়ে শট কাচ্ছ যে, কাজ-কর্ম বুঝি আর করতে হবে না?

—আজ্ঞে না। নীচের হোটেলে বলতে যাচ্ছিলাম যেন আপনার চা ঠিক সময়ে নিয়ে আসে।

—তুমি যে ঘোর সংসারী, একেবারে গৃহপালিত জীব হে সব সময়ে খাওয়ার তদবির করতেই মজবুত!

—আজ্ঞে স্যর, আপনারই পালিত—যাকে বলে আশ্রিত;—হে হে।

নিজে কাজ করে না কিচ্ছু অথচ অন্যদের কাজ পণ্ড করে গোলমাল করে দিতে একখানি। আর সময়ে অসময়ে বড়বাবুর কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস, লোকেদের নামে লাগিয়ে তাদের সব অতিষ্ঠ করে মারে। ধনঞ্জয়কে কেউই দু' চক্ষে দেখতে পারে না, তবে মুখ ফুটে কিছু বলার ভরসাও পায় না, বড়বাবুর খাস মোসাহেব যে!

ধনঞ্জয়ই প্রথমে বড়বাবুকে চুপি চুপি খবর দিল যে নন্দ লিফ্‌ট্‌ম্যান আবদুলের সংগে বড্ড বেশী গল্প করে, এতে আপিসের সম্মান হানি হয়। বড়বাবু ওর সংগে একমত হ'লেও নন্দকে কিছু বলেন না। ভাবলেন, সে যা গোঁয়ার, হয়তো সকলের সামনেই ধনঞ্জয়ের মাথাটি নিয়ে দেওয়ালে ঠুকে দেবে। একবার ক্ষেপে গেলে তখন সামলানো হবে দায়।

নন্দর খুব ভাল লাগে আবদুলকে। একে ভয়ানক গরীব, তায় অত্যন্ত মিষ্টভাষী নিরীহ মানুষ। সমস্ত দিন লিফ্‌ট্‌ নিয়ে ওঠা নামা করে অথচ মুখে একটুও বিষণ্ণতার বা বিরক্তির ছাপ থাকে না। সব সময়ে মানুষের কাজ করতে পারলেই যেন খুসি। নন্দ মাঝে মাঝে টাকাটা সিকেটা দিয়ে সাহায্য করে, আর সময় পেলে ওর বাড়ির সম্বন্ধে, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে গল্প করে। বুড়ো আবদুল ভারি আনন্দ পায় ওর সংগে গল্প করতে পেলে। হিংসুটে ধনঞ্জয়ের তা সহ্য হবে কেন, মানুষের খুসিতেই যে ওর গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

অল্প কয়েক দিন পরে একদিন ধনঞ্জয় হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে বড়বাবুর টেবিলে যেন হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। জানায় যে কতকগুলি দামী নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না, নিশ্চয় চুরি গেছে।

আপিস অনেক মূল্যবান্ জিনিষের নমুনা আনে বিদেশ থেকে, সেগুলি বাজারে চালু করবার জন্যে। বাজারের আজকাল এমন দুরবস্থা যে ঐ সব জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না একেবারে। সুতরাং কেউ যদি নমুনা হাতিয়ে ফেলেও বাজারে বেচে ফেলে ত' বেশ দু' পয়সা পেয়ে যাবে।

তদন্তের জন্যে সমস্ত কেরাণী, বেহারা প্রভৃতি বড় বাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়, আবদুলও এক লম্বা সেলাম করে দাঁড়ালো।

—দেখ বাপু যে নিয়েছ চটপট বলে দাও, আর নয়তো জিনিষগুলি চুপি চুপি যথাস্থানে রেখে দাও। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আমি সাহেবদের বলতে চাই না, তাতে আমারই নাম খারাপ। কাল দুপুরে ঐগুলি রাখা হয়েছে আর আজ উবে গেল, এর মানে খুবই সোজা।

একটু আগে পালিত যে খবরটি দিয়েছে যে আবদুলই কাল সব শেষে আপিস থেকে গেছে, সে কথার উল্লেখ বড়বাবু কিছু করলেন না।

কেউ বলে না কোন কথা। সব চুপ। ধনঞ্জয় পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে বড়বাবুর কানে ফিস ফিস করে বললে কি।

—বেশ, তাই হোক, জ্যোতিষী এসেই গণনা করে চোর ধরে দিক।

নন্দর কোন ধারণা ছিল না যে আপিসের কাছাকাছি জ্যোতিষী প্রভৃতি সকলে ওৎ পেতে বসে থাকে। পর পর চোখের সামনে যা দেখলে তাতে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারলে না।

ধনঞ্জয় তখুনি সংগে করে নিয়ে আসে এক জটাজুট-ওয়ালা হিন্দুস্থানী সাধুকে। সে মহা আড়ম্বরে খড়ি দিয়ে অংক কষে বলে দিলে, যে নিয়েছে তার রঙ ফরসা এবং কপালের ওপর একটি কাটা দাগ আছে।

হুবহু মিলে যায় রেবতীমোহনের সংগে। কিন্তু সে কাল ছুটিতে ছিল, আপিসে আসে নি ত'!

ধনঞ্জয় আবার গিয়ে এক মন্তর পড়া চাল নিয়ে আসে। সকলকে মুখে দিয়ে চিবাতে হবে, এবং পরে কাগজের ওপর

ফেলতে হবে। যার সবচেয়ে শুখনো থাকবে সেই হবে চোর।

ভীতু মানুষ কিছুপদর মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসে একটি শুখনো ডেলা। কিন্তু সেই বা কি করে হবে! বিষ্টুপদ কাল ছুটির পর বড়বাবুর সংগে খাতাপত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি পৌছাতে গিছলো।

দু' দু' বার হেগে গিয়েও ধনঞ্জয় নাছোড়বান্দা। এবারে নিয়ে আসে এক মস্ত পালোয়ান। এ জানে নল চালা। আগাম টাকা নিয়ে অনেক জাঁকজমক করে মন্তর পড়ে লোকটি এক লোহার পাইপ মাটিতে ঘষড়ে ঘষড়ে এগিয়ে যায়। ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে তার উলটো দিকে চলে। এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে দাঁড়ালো গিয়ে আবদুলের সামনে। আবদুলই চোর।

আবদুল যোড় হাতে কেঁদে ফেলে, কিন্তু সকলে নিশ্চয় ভাবে মাথা নাড়ে—ঐ চোর, এ যে সাক্ষাৎ প্রমাণ!

নন্দ খুসি মনে এই সমস্ত মজার খেলা দেখছিল। আবদুলের কান্নার শব্দে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল যে গত কাল সবার শেষে নীচে নামতে গিয়ে দেখেছে ধনঞ্জয় সিঁড়ি দিয়ে—লিফ্‌টে নয়—বিড়ালের মতন ওপরে উঠে আসছে আবার।

এ কথা বলাতে ধনঞ্জয় হাত-পা ছুড়ে জবাব দেয় যে সে একটা জিনিষ ভুলে গিছলো, তাই নিতে এসেছিল আবদুলকে আর কষ্ট না দিয়ে। আবদুল সবার শেষে আপিস থেকে গেছে, সুতরাং সে-ই চোর।

সকলে ঘাড় নাড়ে, নিশ্চয় নিশ্চয়, আর যখন হাতে হাতে সাক্ষাৎ প্রমাণ। বড়বাবুর হুকুম হ'ল, হয় এখুনি জিনিষ ফিরিয়ে দিতে হবে, নয়তো পুলিশ ডাকা হবে। আবদুল নন্দর পা জড়িয়ে ধরে। কাঁদে আর বলে—বাবু, বাঁচাও। বেচারী!

ধনঞ্জয় ফিস ফিস করে সেই পালোয়ানের কাছে গিয়ে কি বললে। সে হাতের পাইপ উঁচু করে এগিয়ে আসে।

নন্দ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে যে আবদুল কখনো চোর হতে পারে না। কিন্তু ছোট হোক, মাঝারী হোক, পালোয়ান ত', তার অত ধৈর্য থাকবে কেন? ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দেয়, এবং পালোয়ানের ধাক্কা, তাই একটু জোরে এসেই লাগলো। এর পরমুহূর্তে সকলে শুনলে একটা ভীষণ আওয়াজ—চটাস্,—সার্কাসে ঘোড়দৌড় করবার সময় ঠিক চাবুকের যেমন শব্দ হয়।

তার পরে সেই পালোয়ান লাট্টুর মতন সতেরো পাক বন্ বন্ ঘুরে মাটিতে বসে পড়লো। সকলে ভয়ে তিন পা পিছিয়ে যায়, এমন রাম চড় তারা কেউ জীবনে দেখে নি কোন দিন। ধনঞ্জয়ও পিছিয়ে গিছলো কিন্তু নন্দ এক লাফে গিয়ে তার গলা টিপে ধরে দু'হাতে। শূন্যে তুলে বলে—দু'টি আছাড় মারবো মাটিতে, তার আগে ভাল চাও ত' বলে দাও কে নিয়েছে জিনিষ।

খানিকটা টিকটিকির মতন আঁকুপাঁকু করেই ধনঞ্জয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার আগে তার মুখ থেকে কয়েকটি কথা মাত্র সকলে শুনতে পেলে অস্পষ্ট,—আমি—আমি নিয়েছি জিনিষ।

ধনঞ্জয় পালিতের চাকরি গেল সেই দিনই। সেই সঙ্গে নন্দরও। পিসেমশাই কাঁপা গলায় মিষ্টি ভাষায় বুঝিয়ে বলে দিলেন—সে যেন আর আপিসের ত্রিসীমানায়ও না আসে, অন্ততঃ তিনি যত দিন বড়বাবু থাকবেন তত দিন। এমন পরম আত্মীয়ের সংগে এক আপিসে এক ঘরে কাজ করতে করতে তাঁর শরীরটা অক্ষত থাকবে, কোন রকম অপঘাত হবে না, তা কে বলে দিতে পারে? আর অন্য ফ্যাসাদে পড়তেই বা কতক্ষণ!

নন্দ খুসি মনে তার আপিস-পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরছিল ট্রামে, কিন্তু তখুনি আর ফেরা সম্ভব হ'ল না। পথের একটা আকস্মিক ঘটনা তাকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

টিনের ক্ষুদ্র কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

পুরাতন ধাতুদের মধ্যে আমি একটি। ভারতবাসী আমার নাম বিশেষ করিয়া জানেন। টিনের কোটা, টিনের চাল, টিনের বেড়ার কথা কুলি-মজুরেরাও জানে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমার প্রকৃত স্বরূপ সমস্ত শিক্ষিত সমাজ জানেন কিনা সন্দেহ। আমার কোথায় জন্ম, কি ভাবে আমাকে মুক্ত করা হয়—এ সমস্ত কথা ক'জনই বা চিন্তা করেন? যে মৌলিক ধাতুটা প্রাণ দিয়া ভারতবাসীর সুখ-সুবিধা রক্ষা করিতেছে তাহার প্রতি এরূপ অবহেলা মোটেই প্রশংসার নয়। ইহাতে ভারতবাসীর সভ্য

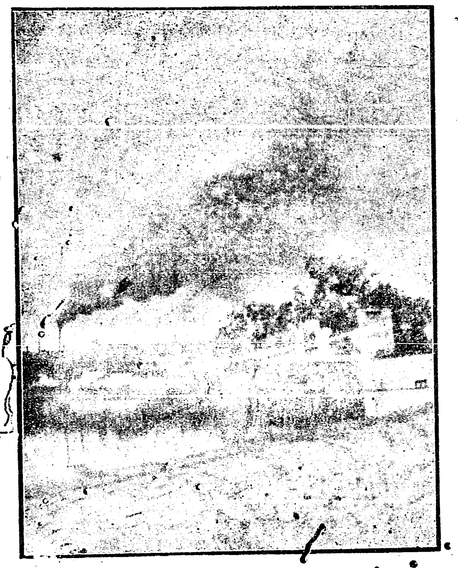

জামসেদপুরের একটি দৃশ্য
দূরে টিনপ্লেট্ কারখানা দেখা যাইতেছে

সমাজের পেছন পংক্তির স্থান আর ঘুচিবে না। আমি আজ তোমাদিগকে আমার আত্মজীবনীর কিছুটা শুনাইব।

আমাকে কে কখন আবিষ্কার করিয়াছে সে সম্বন্ধে ইতিহাস অত্যন্ত নীরব। দেখা গেছে ফিনিসিয়ানগণ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও ইংলণ্ড হইতে টিনষ্টোন্ নামে এক রকম পাথর আমদানী করিত। এই পদার্থটীর সাহায্যে তাহারা পিতল প্রস্তুত করিত। তখনকার লোকেদের নিকট এই নূতন পরিণতিটী অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কারণ যন্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা উহারা প্রস্তুত করিত। ইংলণ্ডের টিন খনি বহু পুরাতন এবং আজও তাহা ক্রিয়াশীল আছে। বর্ত্তমানে আমার শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার মালয়ে আছে—এবং সেখান হইতে যাবতীয় সভ্য দেশ আমাকে লইয়া যায়। আমেরিকাতেও আমাকে খুবই কম পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের টিন-ক্ষুধার দুই হাজার ভগ্নাংশও তাহা দিয়া মিটিতে পারে না। বরঞ্চ পরিমাণের দিক দিয়া দৃষ্টি করিলে বলিভিয়া ও ডাচ্ ইষ্ট্ ইণ্ডিজ্ আমার জন্মস্থানগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

আমি প্রকৃতির বুকে একা থাকি না, যেখানে থাকি অক্সিজেনকে আমার সঙ্গী করিয়া লই। অবশ্য সাধারণ সঙ্গী নয়, রাসায়নিক সঙ্গীর কথাই আমি বলিতেছি। তখন আমাদের যুক্ত নাম হয়, টিন-অক্সাইড —বাজারের নাম টিনষ্টোন্ বা ক্যাসিটারাইট্। আমাকে অক্সিজেনের কোল হইতে উদ্ধার করা কঠিন নয়। অঙ্গারমিশ্রিত টিনষ্টোনকে উত্তপ্ত করিলেই অক্সিজেন আমাকে ছাড়িতে বাধ্য হয়। পণ্ডিতগণ তখন আমাকে ধরিয়া ফেলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত এই উদ্ধারণ-প্রণালীটী রাসায়নিক বুদ্ধির একটি পূর্ণ ছবি। যত প্রকার ময়লা আমাকে আঁকড়াইয়া থাকে তাহারা সকলেই ক্রমে আমার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হয়।

আমি একটি 'শ্বেতধাতু'; দেখিতে সুশ্রীই—আমার একটা সুন্দর আভাও আছে। আমার শরীর নরম, হাতুড়ী মারিয়া আমাকে সহজেই চ্যাপ্টা করা যায়। সাধারণ বাতাস আমাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ সমস্ত কারণেই আমাকে লোকে আজকাল খুব দরকারী মনে করে।

এইবার লোকের কাজে আমি কি ভাবে লাগি তাহাই বলা যাক্। আমি বিশেষ করিয়া ব্যবহৃত হই টিনের পাত্র হিসাবে। খাদ্যাদি রক্ষা করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ড আমিই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারে ভারে যে সমস্ত খাদ্য এ দেশে প্রেরিত হয় তাহার অধিকাংশই আমার পাত্রে সরবরাহ হইয়া থাকে; জ্বালানী তেল (কেরোসিন, পেট্রোল), পেইণ্ট, ভার্নিস্, এমন কি তামাক, সিগারেট পর্য্যন্ত আমার পাত্রে আশ্রয় পাইয়া দেশে দেশে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ঘরের চাল, বৃষ্টি-জল নিকাশের নল, এরূপ অনেক কিছু ব্যবহারিক নিত্যপদার্থ আমারই সংস্করণ। সাধারণতঃ টিনের পাতে লোহার মাত্রা বেশী থাকে। ইহারা প্রকৃত পক্ষে ইস্পাতই, টিনের আবরণে পরিপূর্ণ। এই পাত বা প্লেট্ তৈয়ার করার জন্য প্রথমতঃ ডাইলিউট্ সাল-ফিউরিক এসিডে ধুইয়া লওয়া হয়। তারপর গলিত টিনের মধ্যে উহাকে চালিত করিলে সবটাই আমার রূপ পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। জামসেদপুর সহরে টিনপ্লেট্ তৈরী করিবার একটি বড় কারখানা আছে, তোমরা অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবে। খাঁটি টিন ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায় না। ডাইলিউট্ এসিড সরবরাহের নল অথবা খাদ্যাদি মুড়িবার অতি পাতলা আবরণ রূপে কখনও কখনও আমি ব্যবহৃত হই। মিশ্র ধাতুদের অনেকের মধ্যেও কিন্তু আমি বাস করি। পিতল, ঝালাই, ব্যাবিট্ ধাতু এবং ছাপার অক্ষর তৈরীর ধাতু (টাইপ মেটাল) প্রভৃতিতে আমি থাকি। আমার গর্ব্বের বিষয় এই যে অন্যান্য অনেক ধাতুর চেয়ে আমি মানুষের বেশী উপকারে আসি। দুধ, সুপ, ফল, শাকসবজি, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি খাদ্যাদি বুকে গ্রহণ করিয়া আমি সযতনে উহাদের রক্ষা করি। মানুষ প্রয়োজন মত উহাদের গ্রহণ করে। আমার কোলে স্থান পাইয়া মানুষের জিনিষপত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। এ জন্য কত শত সুন্দর সুন্দর ছাপ আমার শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে তা

জামসেদপুরের টিনপ্লেট্ কারখানা

আঘাত করে বা বাঁকাইতে চেষ্টা করে, আমি অনেক মত শব্দ করিয়া উঠি। এ গুণটী আমার সমধর্ম্মীদে অনেকেরই নাই। আমার আর একটি গুণ অদ্ভুত। আমার তৈয়ারী কতকগুলি পাত্রে সঙ্গে থাকে তবে একটি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে দেখিতে অপরগুলিতেও সে ব্যাধি সংক্রামিত হয়। রাসায়নি ব্যাধিকে বলেন 'টিন্ প্লেগ'।

আমার তিনটী পোষ্যপুত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে দুইটী ক্লোরিনযুক্ত পদার্থ। অপরা ডায়অক্সাইড্। প্রথম দুইটি রঞ্জন, কেলিকো ছাপ পুষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়টী লাগে সাদা রং ব্যাপারে।

আমার দুইটা মজার গুণ আছে। একটি 'টিন্ ক্রাই' অর্থাৎ আমার কাঁদুনী। আমাকে য

একটুখানি হাসো

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

একটুখানি হাসো তো ভাই, একটুখানি হাসো ;
গোম্‌রা মুখে ব'সে কেন বুড়োর মতো কাসো ?
হাসো তো ভাই পরাণ খুলে, লুটিয়ে পড়ো দু'হাত তুলে,
হাসির ছটায় ঘরের কোণে আঁধারটুকু নাশো।
হাহা-হিহি-র তুফান তুলে একটু জোরেই হাসো।

স্বচ্ছ উষার আলোর মতো হাসো রঙীন সুরে ;
শূন্য মনের ঘটগুলি দাও হাসির রসে পূরে।
প্রজাপতির পাখার মতো হেসে বেড়াও ইতস্ততঃ,
ফাটা ফুলের মোহন হাসি ছড়াও ঘুরে ঘুরে।
বর্ণাধারার হাসি বাজাও ছন্দোমধুর সুরে।

ঘরের কোণে পরের মতো থম্‌কে কেন র'বে,—
নাকে-কাঁদার আলাপ যেথা সাধছে বসে সবে ?
বাইরে এসো মাঠে ঘাটে, হাসি ছড়াও রাঙা বাটে,
তাপাতার বনে চাঁদের হাসির মহোৎসবে।
দুঃখ-রাতের শ্মশান-কোণে থম্‌কে কেন রবে ?

হাসা কি ভাই কঠিন বড় কাঁদার পৃথিবীতে ?
ভাতের মুঠা ব্যঙ্গ করে ক্ষুধায় মুখে দিতে ?
মৃত্যু-মলিন আকাশ তলে জীর্ণ ছেলের কাতার চলে,
ভাঙা দাঁতের রক্ত ঝরে গৃহের চরিভিতে !
তাহার মাঝেই হাসতে হবে করুণ পৃথিবীতে।

হাসি কি ভাই দেখো নিকো মায়ের, বাপের মুখে ?
পাণ্ডুমুখী মাসি-পিসির হাস্য গেছে চুকে ?
শেখালো কি বইয়ের পাতা কেবল ব্যথার কাব্যগাথা
গুরু কেবল অশ্রু ঝরায় বেতের লাঠি ঠুকে ?
তাহার মাঝেই হাসতে হবে খুশি-রসাল মুখে।

হাসতে হবে আজকে সকল দেশটা আলোড়িয়া,
ভাসিয়ে দিতে হবে জীবন বন্যা-হার্দ্রি দিয়া।
চাপা হাসি, মুচকি হাসি, মিঠে-কড়া হাসির রাশি—
যেমন পারো তেমনি হাসো, হাসির নেশা নিয়া।
হাসির চোটে ভুবনটাকে দাও তো আলোড়িয়া।

কালো মেঘের তড়িৎ সম হঠাৎ হাসো দেখি,
ঝড়ের মতন অট্টহাসি আকাশে দাও লিখি'।
সাগর-ফেনার হাসি নিয়ে তটের সীমা দাও ফেনিয়ে,
হিমালয়ের কঠিন হাসি তুষারে লও শিখি' ;
বহ্নি-গিরি অট্টহাসি হঠাৎ হাসো দেখি।

দুঃখ জয়ের মন্ত্র

শ্রীসুকুমার দে সরকার

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজার ছেলে ইন্দ্রসেন। একদিন তিনি মেরে, কেটে, পুড়িয়ে পৃথিবী জয় করেছেন কিন্তু সে হিংসা দিয়ে পৃথিবী বিজয় তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে নি। তাই হঠাৎ একদিন রাজ্য ছেড়ে একা তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন দুঃখ জয়ের মন্ত্রের সন্ধানে।

কোথায় পাওয়া যায় দুঃখ জয়ের মন্ত্র ? দেশে দেশে ঘুরে ফিরেছেন ইন্দ্রসেন। ধনীর কাছে, ধনের মধ্যে তিনি পেলেন না সে মন্ত্র। চোরেদের দলেও নেই সে মন্ত্র, দুঃখীদের মাঝেও নেই। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ইন্দ্রসেন পেলেন না মন্ত্রের সন্ধান। আজও তাই তিনি চলেছেন এগিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে। অনেক দুঃখ, কষ্ট, উত্তেজনায় কেটেছে তাঁর পথ। প্রিয় ঘোড়া মকরকেতুকেও তিনি হারালেন পথে। তবু তাঁর ক্লান্তি নেই, তাঁকে পেতেই হবে দুঃখ জয়ের মন্ত্র।

একটা বনের ভেতর দিয়ে পথ ক্রমশঃ নীচে নেমেছে। দু' ধারে বুনো ফুলের গালচে বিছান। সাদা সাদা বুনো পাখীর দল আকাশের নীল পটে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে দূরান্তরে। গাছের দলের চাঁদোয়া ভেদ করে রোদের কুচি কুচি সবুজের মাঝে মাঝে মাণিকের মত জ্বলছে। দুপুরের দিকে কিছু বুনো ফল খেয়ে একটা গাছতলায় ইন্দ্রসেন বিশ্রামের আশায় গা ঢেলে দিলেন। কে বলবে তখন যে ইনিই সেই বিশ্বজয়ী উদ্ধত ইন্দ্রসেন ?

কয়েক ফোঁটা জল মুখে পড়ায় ইন্দ্রসেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দেখলেন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। লক্ লক্ করে সাপের জিভের মত একটা বিদ্যুৎরেখা আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত চমকে গেল। ঈশান কোণে ডমরু বাজিয়ে, ক্ষ্যাপার মত নাচতে নাচতে বনের ওপর নামল বর্ষা। গাছতলায় দাঁড়িয়ে জলে ভিজতে ভিজতে ইন্দ্রসেন কাঁপতে লাগলেন।

ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্, বর্ষাধারা গাছের পাতায় বাজনা বাজিয়ে চলেছে অবিরাম। বনে আর কোন শব্দ নেই। হঠাৎ চমকে উঠলেন ইন্দ্রসেন। গান গায় কে ? মানুষের গলা না ? তাই ত' ! কে যেন এই দুর্য্যোগের ভেতর বেসুরো ভারী গলায় গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে :

"জঙ্গলমে ঢুঁড়ি ফিরি,
জ্যোছনা লাগত হ্যায়…"

ইন্দ্রসেন হো হো করে হেসে উঠলেন—জ্যোছনাই লেগেছে বটে !

একটু পরেই বাঁকের মুখে গায়ককে দেখা গেল। বিশাল বপু, দীর্ঘ এক লোক। মাথায় তার একটা টোকা ; কাঁধে এক বোঝা কাঠ নিয়ে, লাঠি হাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে, বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। ঝড় জলে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

"জঙ্গলমে ঢুঁড়ি ফিরি…
জ্যোছনা লাগত হ্যায়…"

ইন্দ্রসেন হাসতে হাসতে হেঁকে বললেন, "জ্যোছনাই লেগেছে বটে বন্ধু !"

লোকটা থমকে দাঁড়াল। এক মুখ দাড়ী-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে থেকে তার চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করে উঠল।

"হাসছ কেন ?" লোকটা এগিয়ে এল ইন্দ্রসেনের কাছে। "হাথি সিংএর গান শুনে হাসে, এ গাঁয়ে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?"

"আহা, চট কেন ?" ইন্দ্রসেন হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, "এমন জ্যোছনায় হাসি যে পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠছে !"

হাঁথি সিংএর মুখখানা ক্রমশঃই ওপরের আকাশের মত কালো বরণ হয়ে উঠছিল। কড়া গলায় সে প্রশ্ন করল, "তুমি কে হে বাপু ?"

"আমি বিদেশী।"

হাঁথি সিং একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল—ফুলন্ত একটা বেলুন যেন চুপসে গেল।

"বিদেশী ? ওঃ তাই বল ! না হ'লে আমার গান…"

ইন্দ্রসেন তাড়াতাড়ি বললেন, "এমন গান আর শুনি নি কখনও ! আর একবার ধর দেখি।"

সেই প্রথম হাঁথি সিংএর মুখে হাসি দেখা দিল। তার প্রশস্ত মুখমণ্ডলে দু'টো শিশুর মত চোখ হেসে উঠল।

"হোঃ হোঃ! তাই বল! কি গাইব? তোড়ী? ভূপালী? বিজুরী চমকে—এ! এ বি-ই-জ্‌-জুরী···!"

ইন্দ্রসেন হাঁথি সিংএর সঙ্গে পা ফেলতে সুরু করলেন। একটু পরে গান থামিয়ে হাঁথি সিং প্রশ্ন করল, "তুমি বিদেশী বললে না?"

"হ্যাঁ।"

"চলেছ কোথায়?"

"দেখি, গাঁয়ে কারও বাড়ী আশ্রয় পাই কি না!"

হাঁথি সিং থমকে দাঁড়াল।

"কি? কি বললে? এটা কি রাজা ইন্দরসেনের দেশ পেয়েছ নাকি? হাঁথি সিং গরুকে খেতে দিতে পারে, শূয়োরকে খেতে দিতে পারে আর তোমাকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারবে না? অন্য কোথাও আশ্রয় নেবার নাম করলেই দেখেছ ত' এই গদা?"

হাঁথি সিং তার গদার মত হাতখানা শূন্যে তুলে দেখাল।

ইন্দ্রসেন হেসে বললেন, "তা হ'লে দরকার নেই বাবা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে হাতি আর সিংহের খপ্পরে পড়ে কি আর ছাড়ান পাওয়া যায়?"

পায়ে পায়ে বন কাবার। হঠাৎ সামনে দিগন্ত খোলা চাষের ক্ষেত আকাশের নীচে ছড়িয়ে আছে। দূরে দূরে চাষাদের আটচালায় জ্বলে উঠছে সন্ধ্যাদীপ, যেন আলেয়ার আলো। পশ্চিম আকাশ প্রায় নির্ম্মল হয়ে এল, জলের বেগ কমে এসেছে। চলার তালে তালে গান যুড়েছে হাঁথি সিং—"বিজুরী চমকে-এ···অশনি গমকে-এ-এ···"

"চমৎকার!" বলে উঠলেন ইন্দ্রসেন।

"কি?" গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করল হাঁথি সিং।

"এই ক্ষেতগুলো।"

"হুঁ!" তুমি বাপু, বড়ই বেকুব! হাঁথি সিংএর ক্ষেত চমৎকার হবে না ত' কি রাজা ইন্দরসেনের ক্ষেত হবে?"

"রাজা ইন্দরসেনের ক্ষেত?"

হাঁথি সিং হেসে উঠল, "এঃ, তুমি কিছুই জান না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজা ইন্দরসেনের ক্ষেত! চাষের ক্ষেত নয় হে বন্ধু,—যুদ্ধক্ষেত! হাঁথি সিং কাটে ধানের শীষ, রাজা ইন্দরসেন কাটে মানুষের উষ্ণীষ! কার ক্ষেতটা ভাল তুমিই বল?"

এই বলে সেই দিগন্ত খোলা মাঠ কাঁপিয়ে হেসে উঠল হাঁথি সিং; তার পরে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ হে বাপু, তোমার ক্ষেত-খামার নেই?"

"হুঁ!"

"তবে সে সব ফেলে বেরিয়েছ কেন?"

ইন্দ্রসেন গলা নামিয়ে বললেন, "বেরিয়েছি এক মন্ত্রের সন্ধানে। বলতে পার হাঁথি সিং, দুঃখ জয়ের মন্ত্র পাওয়া যায় কোথায়?"

"দুঃখ জয়ের মন্ত্র?" হাঁথি সিং জবাব দিল, "ফুঃ! তুমি কি আমাকে ওঝা পেয়েছ নাকি বাপু? ও সব তন্ত্র মন্ত্রের ধার আমি ধারি না। আমি শুধু জানি এক মন্ত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেল, ক্ষেত চষো, সোনা ফলাও, খা[illegible] দাও, গান গাও। আর কি চাই? এই ত', রাজা ইন্দর সেনের সৈন্যসামন্ত, পঙ্গপালের মত আমাদের ক্ষেত খামার জ্বালিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত চলে গেল। হাঁথি সিংএর কিছু করতে পেরেছে? হাঁথি সিং লঙ্গটি এঁটে লাঙ্গল কাঁধে আবার লেগে গেল, আবার ক্ষেতে ফসল উঠল হেসে। হুঁ হুঁ বাবা, রাজা ইন্দরসেনই হোন আর যেই হোন, হাঁথি সিংকে হারানো সোজা নয়।"

ইন্দ্রসেন বিস্মিত দৃষ্টিতে হাঁথি সিংএর মুখের দিকে তাকালেন। সে মুখ সরল, গর্ব্বভরে উজ্জ্বল।

তার কুঁড়ে ঘরের আধ মাইল দূর থেকে হাঁথি সিং চীৎকার করতে সুরু করল, "গিন্নী, ও গিন্নী! চুলা জ্বালো দাল, রুটি পাকাও। ঘরে অতিথ এসেছে।"

লোকটার যতই পরিচয় পাচ্ছিলেন ততই বিস্মিত হচ্ছিলেন ইন্দ্রসেন।

"অত চেঁচাচ্ছ কেন? ঘরে গিয়ে বললেই ত' হবে।"

"চেঁচালে গলার জোর বাড়ে।" হেসে বলল হাঁথি সিং "আর লোকে জানতেও পারে। হাঁথি সিংএর ঘরে অতিথ এসেছে, লোকে জানবে না?"

* * *

ভোর বেলা; ইন্দ্রসেন তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। পাখীর কাকলীতে সবে মাত্র ভরে উঠেছে আকাশ। এক বিশাল ঝাঁকুনী খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে ইন্দ্রসেন দেখলেন, হাঁথি সিং তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

"এঃ, তুমি দেখছি একেবারে রাজচন্দর ইন্দরসেন! ওঠো, ওঠো, মাঠে যেতে হবে।"

তার পর সে এক অদ্ভুত জীবন সুরু হোল রাজার ছেলে ইন্দ্রসেনের। দিনে মাঠে, ক্ষেতে দৃঢ় পরিশ্রম। শ্রমের পর সেই চনচনে ক্ষিধে। খাওয়ায় যে এত তৃপ্তি থাকতে পারে ইন্দ্রসেন প্রথম জানলেন। আর রাতে ঢোল পিটিয়ে গান গাওয়া, কখনও বা গাঁয়ের ছেলে-বুড়োর নাচ, তারা-ভরা আকাশের নীচে। জীবন এখানে কত সরল ও সহজ!

গেল বর্ষা, সবুজ ফসলে মাঠ ভরে উঠল। সেদিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সেদিন সকালে উঠে হাঁথি সিংকে মাঠে যাবার জন্যে তৈরী নয় দেখে ইন্দ্রসেন বললেন, "আজ মাঠে যাবে না হাঁথি সিং?"

"আজ গাঁয়ে মস্ত মেলা। তুমি জান না বুঝি? কেমন করেই বা জানবে? একে বিদেশী, তায় দিনরাত ঘরে বসে কি ভাববে!"

হাঁথি সিংএর সঙ্গে ইন্দ্রসেন মেলায় এলেন। চাষাদের গাঁয়ে সেদিন মহা উৎসাহ। দলে দলে লোক হাঁটু অবধি কাপড় পরে মাথায় ফর্সা পাগড়ী বেঁধে এসেছে। কেউ বা বেচছে, কেউ বা কিনছে। হাঁথি সিংএর মাথায় ছোপান হলদে পাগড়ী, দাড়ী চোমরাতে চোমরাতে গর্ব্বিত মোরগের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে চলেছে।

এক জায়গায় লোকের বিষম ভিড়। গোল হয়ে জায়গাটা ঘিরে আছে চাষার দল। থেকে থেকে উঠছে একটা উল্লসিত হল্লা।

"কি হচ্ছে হে এখানে?" হাঁথি সিং জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকার উঠল, "হাঁথি সিং! হাঁথি সিং! হাঁথি সিং এসে গেছে।"

জানা গেল সেখানে ভিন গাঁ থেকে এক মল্ল এসেছে এবং ঘুঁষির লড়াই হচ্ছে। পুরস্কার হোল একটা ভাল দুগ্ধবতী গাভী। প্রথমতঃ, এক কপর্দ্দক দিয়ে ভিন গাঁয়ের সেই মল্লের বুকে একটা ঘুঁষি লাগিয়ে যে তাকে মাটি ছোঁয়াতে পারবে গাভীটা তার। দ্বিতীয়তঃ, আক্রমণকারী যদি মল্লকে মাটি না ছোঁয়াতে পারে তা হ'লেও তার আশা যাবে না। সে ইচ্ছে করলে, সেই মল্ল তখন তার বুকে এক ঘুঁষি মারবে। ঘুঁষি খেয়ে সে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা হ'লেও গাভীটা তার।

সব শুনে হাঁথি সিং বল্‌ল, "একবার দেখতে হচ্ছে বন্ধু!"

হাঁথি সিং এ গাঁয়ের সবচেয়ে বলবান্ লোক। সে ঢুকতেই ভিড় আপনা হ'তে সরে পথ করে দিল। আবার কলরব উঠল—"হাঁথি সিং! হাঁথি সিং!"

ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখা গেল, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা, বিশালদেহ মল্ল, শরীরের পেশীগুলো তার যেন লোহা। সে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে আর বলছে, "চলে এসো, চলে এসো, কে আছো জোয়ান?" এক পাশে একটা নধর গাই দাঁড়িয়ে উদাসীন ভাবে জাবর কাটছে।

হাঁথি সিং তখনই সেই মল্লর কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা জোয়ান গোছের চাষা এসে হাঁথি সিংএর হাত চেপে ধরল, "তুমি একটু দাঁড়াও হাঁথি সিং, আগে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আমার একটা গরুর বড় দরকার, মা-মরা ছেলেটা দুধ খেতে পাচ্ছে না।"

"বেশ ত', যাও না!" তাচ্ছিল্য ভাবে বল্‌ল হাঁথি সিং।

মল্ল তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে, বুকের পেশীগুলো ফুলিয়ে, পা দু'টো ফাঁক করে। পা ত' নয়, যেন একজোড়া লোহার থাম। একটু পরেই দেখা গেল বেচারী চাষা মাটিতে গড়াচ্ছে, মল্ল দাঁড়িয়ে আছে সটান।

সমবেত জনতা ক্ষিপ্ত হাসি হেসে উঠল। "হাঁথি সিং! হাঁথি সিং! হাঁথি সিং না হ'লে কেউ পারবে না।"

মল্ল হাঁক দিল, "চলে এসো হাঁথি সিং, গণ্ডার সিং, উট সিং! যে পারো চলে এসো!"

হাঁথি সিংএর চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। "আসছি হে বন্ধু, আসছি। এক ঘুঁষিতে মাছির মত চ্যাপ্টা করে ফেলব।"

দু'জনে যখন মুখোমুখী দাঁড়াল তখন জনতা নীরব। দু'জনেরই দৈত্যের মত বিরাট চেহারা। এক মুহূর্ত্ত চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে দু'জনে যেন দু'জনকে ওজন করে নিল, তারপর মল্ল তার বুকের পেশীগুলো ফুলিয়ে, ঘাড় নাড়ল। হাঁথি সিংএর গদার মত একটা বিশাল বাহু আকাশে উঠছে দেখা গেল। সংঘর্ষের একটা শব্দ হোল প্রচণ্ড, আর দেখা

গেল যে মল্ল প্রায় পড়তে পড়তে অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে সামলে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

"এবারে আমার ঘুঁষিটার জন্যে তৈরী হবে বন্ধু?"

হাঁথি সিংএর নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

"বেশ, এবারে তুমি মারো। আমার ঘুঁষি খেয়ে তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, তা হ'লে আমিও পারব।"

মল্ল হেসে বল্‌ল, "চমৎকার পাগড়ীটা পরেছ হাঁথি সিং, ওটা খুলে রেখে এসো। ওটাতে আর ধুলো-মাটি মাখিয়ে লাভ কি?"

হাঁথি সিং তৈরী হয়ে দাঁড়াল। আবার একটা গদা যেন বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। তারপরে দেখা গেল হাঁথি সিং তখনও দাঁড়িয়ে আছে। জনতা চীৎকার ক'রে উঠতে যাবে, হঠাৎ দেখা গেল কাঁপতে কাঁপতে হাঁথি সিং বসে পড়েছে মাটিতে!

মল্ল গর্জ্জন ক'রে হেসে উঠল, "চলে এসো গণ্ডার সিং, শার্দ্দূল সিং! সব শিং ভেঙ্গে বাছুর বানিয়ে দিই।"

ইন্দ্রসেন এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন, এইবার তিনি এগিয়ে গেলেন। "আমাকে একটা কপর্দ্দক ধার দেবে হাঁথি সিং?"

হাঁথি সিং হেসে উঠল, "ছাতু হ'তে চাও বন্ধু?"

মল্ল ইন্দ্রসেনের পানে চেয়ে হেসে উঠল, "এসো বাবাজী, যখন সখ হয়েছে চলে এসো।"

ইন্দ্রসেন বললেন, "বাজীটা আমি উল্টে নিতে চাই। আগে তুমি মারবে, তার পরে আমি।"

মল্ল খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে ইন্দ্রসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "যেমন তোমার খুসী।"

খালি গায়ে ইন্দ্রসেন যখন মল্লর সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর সুগঠিত পেশীগুলোর ওপর সূর্য্যালোক ঝক্ ঝক্ করছে। জনতা স্তব্ধ। আবার বাতাসে গদা ঘুরে গেল, আর বুকের ওপর ঘুঁষির একটা প্রচণ্ড শব্দ হোল। পরমুহূর্ত্তে ইন্দ্রসেন সটান দাঁড়িয়ে মল্লর দিকে চেয়ে হাসলেন। জনতার শ্বাস বন্ধ।

"এবার আমারটার জন্যে তৈরী হও বন্ধু!"

মল্ল বোকার মত ইন্দ্রসেনের দিকে তাকাল।

"নাও নাও বন্ধু, হাঁ ক'রে দেখছ কি?"

"হুঁ!" মল্ল গর্জ্জে উঠল, "ঘুঁষিটা হজম করে অহঙ্কার বেড়ে গেছে, নয়? আচ্ছা মারো।"

মল্ল শ্বাস টেনে, বুকের পেশীগুলো ইস্পাতের মত ফুলিয়ে তৈরী হোল। ইন্দ্রসেনের সুঠাম বাহু শূন্যে বৈদ্যুতিক একটা রেখা কেটে মল্লের পেশীতে গিয়ে লাগল আর ভট্ করে একটা শব্দ হোল তার মুখ থেকে। একটা বেলুন যেন সশব্দে ফেটে গেল। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মল্ল।

আর জনতার উল্লসিত চীৎকারে ভরে গেল আকাশ।

* * *

হাঁথি সিং এক লাফে এসে ইন্দ্রসেনকে জড়িয়ে ধরেছিল। ইন্দ্রসেন বললেন, "ওই গাভীটা···"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এবার আমাদের।"

ইন্দ্রসেন বললেন, "না, ওটা ওই চাষীকে দিয়ে দাও, যার মা-মরা ছেলে দুধ পাচ্ছে না।"

হাঁথি সিং একটু বিস্মিত হয়ে বল্‌ল, "দিয়ে দেবে তুমি বন্ধু! চমৎকার গাভীটা?"

সেদিন বাড়ী ফেরার পথে ইন্দ্রসেন জিজ্ঞেস করলেন, "কি হাঁথি সিং, কি ভাবছ?"

হাঁথি সিং বল্‌ল, "গাভীটা চমৎকার ছিল।"

ইন্দ্রসেন একটু ভাবলেন, একটু অপেক্ষা করলেন, তার পরে বললেন, "সামান্য একটা গাভীর কথা ভাবছ হাঁথি সিং! আমি তোমাকে রাজার মত ধনী করে দিতে পারি।"

ইন্দ্রসেন একমুঠো মোহর বার করে হাঁথি সিংএর সামনে ধরলেন। হাঁথি সিংএর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বাড়ীর সামনে এসে সে হাঁক দিল, "গিন্নী গিন্নী!"

ছুটে এল হাঁথি-গিন্নী।

"দেখেছ এগুলো কি? পাকা সোনার মোহর! হাঁথি সিংকে বন্ধু রাজা বানাতে চায়।"

"আঃ মরণ!" গিন্নী জবাব দিল, "তুমি রাজা হয়ে কি করবে শুনি?"

"তাই ত' বলছি গিন্নী! কিন্তু তুমি আর বলতে দিলে কই!"

মোহরগুলো হাঁথি সিং ফিরিয়ে দিল ইন্দ্রসেনকে।

"তুমি নেবে না হাঁথি সিং?"

"হ্যাঃ, রাজা হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাই আর দু' দিন না যেতে পেট ভুটভাট করুক, মাথার ব্যামো সুরু হোক!"

হাঁথি-গিন্নী বল্‌ল, "আর দশটা দাসী রেখে আমি জ্বালার মত মোটা হ'তে সুরু করি,—আর আজ বাত, কাল ব্যথা! তুমি বাপু লোক সুবিধে নও।"

"হ্যাঁ।" হাঁথি সিং বল্‌ল, "সর্ব্বনাশ করেছিলে আর কি! ভাগ্যে হাঁথি সিংএর বুদ্ধি আছে।"

* * *

সেই রাতে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন ইন্দ্রসেন নিজ রাজ্য পানে। আজ তিনি পেয়ে গেছেন দুঃখ জয়ের মন্ত্র—শ্রম, সন্তোষ, ভালবাসা। এই মন্ত্র তিনি ছড়িয়ে দেবেন রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে। চোখের সামনে তাঁর নতুন উদ্দীপনা,—নতুন পৃথিবী।

চিত্রশালা

সেলাইয়ের মজা

একখানি বিশ্ববিখ্যাত ছবি

বাংলা সাহিত্যের গল্প

রামরাম বসু

শ্রীসুনীল ঘোষ এম্.এ

বাংলা গদ্য সাহিত্যের গল্প বলতে গিয়ে এর আগে তোমাদের শ্রীরামপুরের পাদ্‌রি উইলিয়ম্ কেরি সাহেবের গল্প বলেছিলাম। এবারে শোন রামরাম বসুর কথা।

১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে চুঁচুড়াতে রামরাম বসুর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। আরবী আর পারশী ভাষায় তাঁর দখল ছিল বেশ। সংস্কৃতও কম জানতেন না তিনি। সমসাময়িক পাদ্‌রিদের কাছে তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলেই পরিচিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে তিনি কেরির সহকারী ছিলেন। অনেকের ধারণা কলেজের পরিচালকবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পণ্ডিতিতে ইস্তফা দেন। কথাটা খাঁটি কিনা এ বিষয়ে প্রামাণ্য কোন দলিল নেই। তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রুবাকে' ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতদের যে তালিকা পাওয়া যায় তার ভেতর রামরাম বসুর উল্লেখ নেই; আবার ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তিকাতে রামরাম বসুর নাম পণ্ডিত হিসাবে পাওয়া যায়। সেই থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে হয়তো তিনি ১৮০৫ থেকে ১৮১৯এর মধ্যে পদত্যাগ করেন। কিন্তু সে যাই হোক, তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যেই রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ ঘনীভূত হয়। অনেকের ধারণা রামমোহন রায়ই তাঁর মনে বই লিখবার আগ্রহ বাড়িয়ে দেন। রামমোহনের প্রথম অপ্রকাশিত গ্রন্থ "হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ" রামরাম বসুকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেছিল।

রামরাম বসুর নামে দু'খানা বাংলা বই প্রকাশিত হয়:

(১) প্রতাপাদিত্য চরিত্র

শিরোনামা: "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে। একব্বর বাদসাহের আমলে। রামরাম বসু রচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১"

(২) লিপিমালা—১৮০২।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বাংলা গদ্য। খালি গদ্য বলে এর দাম অনেক কমে যায়—একে একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলাই উচিত। বার ভূঞার অন্যতম ভূঞা ছিলেন যশোরের প্রতাপ আদিত্য—তিনি যে কত বড় বীর ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় এই কয় ছত্রে:

"নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

এর একটি কথাও বাড়িয়ে বলা নয়। আকবর বাদশাহ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি বাংলাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। প্রতাপের কাছে বার বার হেরেও ভারতের সম্রাট্ আকবর শাহ্ বাংলার যুদ্ধকে যুদ্ধ ব'লে স্বীকার করতে চান নি। আকবরের যে ইতিহাস তার মধ্যে কোথাও বেশ বড় ক'রে প্রতাপাদিত্যের কথা লেখা নেই তাই এই বীরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার সুযোগ আমাদের হয় নি। লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মধ্যে প্রতাপের কাহিনী চলে এসেছিল। রামরাম বসুকে অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে তথ্য সংগ্রহ করতে হ'য়েছিল বইটি লিখবার আগে প্রস্তাবনা স্বরূপ তিনি লেখেন:

"...এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।"

অর্থাৎ মোটামুটি তিনিও পরের মুখ থেকে শুনে লিখেছিলেন। তার কারণ গোড়াতেই বলেছি। প্রতা

াদিত্যের উপর নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস নেই। তবুও ায় ১৫০ বছর আগে তিনি যা লিখে গেছেন আজও তাপাদিত্যের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী কথা বা নতুন কথা ড় কেউ বলতে পারে নি।

কিন্তু এই ঐতিহাসিকতার কচকচি ছেড়ে দিলেও কটা কথা সবাই স্বীকার করবেন—যেটা হচ্ছে এর ল্লাংশ। রামরাম বসু গল্পটিকে বেশ চমৎকার ভাবে াজিয়েছেন। আরবী আর পারশী কথার বাড়াবাড়ি ানিকটা রয়েছে; তা সত্ত্বেও গল্পটি বেশ সরল গতিতে গিয়ে গিয়েছে। পড়তে বসলে কিছুতেই মনে হয় না যে তিহাস পড়ছি।

নীচে খানিকটা অংশ তুলে দিলাম:—

"...রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা (;) তাহার অধিারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই (অর্থাৎ ভাবিলেন) কান কৌশলে দেশ কবজ (অধিকার) করে (।) তাহা রিল একটা (অর্থাৎ একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন।) বন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল (।) ধুমঘাট নিজ রীর মধ্যে তাহাতে খাতির জমায় (খুব খাতির করে) কিল (রাখিলেন।), ভাবিল এখন কাবুর তলে (নিজের ধিকারে) থাকিলেন (;) আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার রণের আটক (বাধা) হবেক না (;) আর আর কেদার য় প্রভৃতি সমস্তকেই নিপাত করিয়া তাহার অধিকার রাজ্য) আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।

ইতিমধ্যে রামচন্দ্র ব্যতিরেক আর আর সমস্তই রতলে প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন (করিলেন।) এখন মচন্দ্রের রাজ্যে কবুজকরণের আটক হইতে পারে না। ত্র অখ্যাতি লোকে বলিবেক জামাতার অধিকার কাড়িয়া ইল (।) ইহা না করিয়া যদি উহাকে গুপ্তে (গোপনে) হার করিয়া মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্রে দিয়া শোকাচার রিলে পশ্চাৎ রাজ্য কবজ করণে অখ্যাতি হবে না। তএব সেই কর্ত্তব্য।"

সেকালের বাংলা গদ্য ছিল এই ধরণের। একালের মত ভাষার গাঁথুনি ঠাসা ছিল না সেকালে। কোন রকমে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টাতেই সেকালের বাংলা গদ্যের সার্থকতা ছিল।

"লিপিমালার" মধ্যে কিন্তু পারশী শব্দের বাহুল্য দেখি না। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। অনেক বিষয় নিয়ে লেখা ছোট ছোট চিঠি এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। "লিপিমালা" লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রামরাম বসু বলেন:

"...এ হেন্দুস্থান (হিন্দুস্থান;) মধ্যস্থল (লে?) বঙ্গদেশ (;) কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য (অন্যান্য) দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে (,) এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে (;) এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা (;) তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা (কথ্য ভাষা?) অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না (;) ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন (ইচ্ছা) এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া রাজকার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে প্রস্থিত করিয়া "লিপিমালা" নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"

অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যেই নানা রকমের ভাব আর বিষয়বস্তু নিয়ে বই লেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এর মধ্যে নানা রকম গল্প ছিল: ব্যবসা' সংক্রান্ত, ঘরের কথা, ধর্ম্মের কথা, ইতিহাসের কথা, রূপকথা, শাসন বিষয়ক কথা ইত্যাদি।

এ ছাড়া রামরাম বসু কেরিকে বাইবেল অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন। লং সাহেব বলেন, রামরাম বসু পাদ্‌রিদের সঙ্গে মিশে খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন এবং "গস্‌পেল মেসেঞ্জার" বলে একটি বই লেখেন। বইটির মধ্যে খ্রীষ্টের উপর প্রায় একশ'টি বাংলা শ্লোক রামরাম বসু রচনা করেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সময় থেকেই সার্থক বাংলা গদ্য আত্মপ্রকাশ করলো প্রথম। এই জন্যেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে রামরাম বসুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

উনপঞ্চাশনগর

শ্রীসুবোধ বসু

উনপঞ্চাশনগর অতি আধুনিক শহর। মার্কিন-দেশের লোকেরা প্রগতির জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তারাও এক রাস্তার বেলায় ছাড়া নাম-করণের ব্যাপারে সংখ্যা ব্যবহারে সাহসী হয় নাই। একটা গোটা শহরের নামে সংখ্যা ব্যবহার ইহাই প্রথম। ফলে, ভারতবর্ষের উনপঞ্চাশনগর হালের শহর হইলেও সারা পৃথিবীর লোকই ইহার নাম জানে। আরও একটি কারণ আছে। এখানে প্রতি বছরই পৃথিবী-চমকানো কোনও না কোনও ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর খবরের কাগজগুলি উনপঞ্চাশনগরের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। যখনই পৃথিবীতে খবরের মন্দা শুরু হয় তখনই উনপঞ্চাশ নগর কোনও মোটা হরফের উপযুক্ত সংবাদ লইয়া সংবাদপত্র-জগৎকে সাহায্য করিতে আসে।

কিছুদিন ধরিয়া এই বিখ্যাত উনপঞ্চাশনগর এমন চুপচাপ ছিল যে পৃথিবীর সকলেই একটা কিছুর অভাব অনুভব করিতেছিল। এমন সময় এই মহানগরী তাহাদের হতাশা দূর করিল; উনপঞ্চাশ নগরে তীব্র নাগরিক কলহ শুরু হইল। ঘ-পল্লীর সাথে ঞ-পল্লীর ঝগড়া হইতেই ব্যাপারটার সূত্রপাত। ঘ-পল্লীর প্রতিনিধি ঞ-পল্লীর প্রতিনিধির সাথে একই গার্ডেন-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু যেখানে ঞ-র প্রতিনিধি তিন টুক্‌রা কেক্ পাইল, সেখানে ঘ-পল্লীর প্রতিনিধির পাতে পড়িল মাত্র এক টুক্‌রা। খবরের কাগজে এ-সংবাদ প্রকাশ পাইলে ঘ-পল্লীর প্রত্যেকেই অপমানিত বোধ করিল। পার্টি-দাতা ইহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া সাফাই গাহিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ঘ-পল্লীর নেতারা জলের মতো সহজ করিয়া পল্লীবাসীদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিল যে, ঞ-র তিন গুণ জনসংখ্যা হিসাব করিয়াই এমন করা হইয়াছে।

এই "জাতীয়" অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘ-পল্লীর কাউন্সিলারেরা উনপঞ্চাশ-কর্পোরেশনের কাছে দাবি করিল: "ঞ-পল্লীকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার প্রতি অংশ ঘ-পল্লীর সমান করা হউক, যাহাতে ভবিষ্যতে কখনও কেক্-বণ্টনে বৈষম্য না ঘটে।"

কর্পোরেশনের সভা ডাকা হইল, জ্বালাময়ী বক্তৃ হইল, এবং ভোট-গ্রহণ করা হইল। দেখা গেল অধিকা সভ্যই ঞ-পল্লীকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলি বিপক্ষে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটির ভয়ে একটা রফা করি চেষ্টা হইল। স্থির হইল, ঞ-পল্লীকে তিন ভাগে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে।

ঘ-পল্লীও সন্তুষ্ট হইল না; ঞ-পল্লীও চটিল। উ পক্ষই কর্পোরেশনকে বয়কট করিয়া 'জয় হিন্দ' বলি বাহির হইয়া আসিল। উনপঞ্চাশনগরে অন্তর্বিপ্লব হইল। এই পটভূমিকাতেই বর্ত্তমান গল্পের সূত্রপাত।

ঘ-পল্লীর শালবন-পার্কে এক মহতী জনসভা আ হইয়াছে। দুপুর হইতেই দলে দলে ঘ-পল্লীবাসী স্ত্রীপু আসিয়া বক্তৃতামঞ্চের চারদিকে ভিড় করিতেছে। ঞ-পল্লী ও তাহার সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ডিক্টেটর নির্ব্বাচন করা হইবে। এই মহান ক সম্পাদনের জন্য ঘ-পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই দুপু চন্‌চনে রৌদ্রকে পরোয়া করিতেছে না। সভা আর এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি, কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেক পা সমস্ত রেলিং ও আশে পাশের সকল গাছের ডাল ভ গেছে।

ঘ-পল্লীর জনৈক পল্লী-প্রেমিক করদাতা বেলা বারো আসিয়া ডেইস্‌এর নিচে আসন দখল করিয়াছিল, তিন ঘণ্টা রৌদ্র সেবনের পর "সান-স্ট্রোকে"র মতো করায় তাড়াতাড়ি রেলিংএর ধারের একটা গাছের ত একটা নোংরা বেঞ্চের উপর আসিয়া ধপাস্ করিয়া ব পড়িল। রৌদ্র হইতে মাথাটা বাঁচাইবার জন্য মনে ক সেদিনের খবরের কাগজটা লইয়া আসিয়াছিল, এ তাহা দিয়া নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল। ফিরিয়া যাইতে পারিলেই আরাম বোধ করিত, ডিক্টেটর নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ না করিয়া বাড়ি ফি প্রতিবেশীরা তাহার পল্লীপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ ক পারে, এই ভয়ে বাড়ি যাওয়া হইল না।

খবরের কাগজ দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সহসা একটা কৌতূহলোদ্দীপক হেড্ লাইন্ ভদ্রলোকের চোখে পড়িল।—"রাঁচীর বাতুলাশ্রম হইতে উন্মাদ বন্ধু-যুগলের পলায়ন: জগৎকে "উন্মাদ" প্রমাণের সংকল্প!" ভদ্রলোক হাওয়া করা বন্ধ রাখিয়া খবরটি পড়িলেন: "…এই দুষ্ট পাগল দুইটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠে। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সারা পৃথিবীতে মাত্র তাহারা দু'জনেই সুস্থ আছে, এবং বাকি সকলেরই মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। উহারা যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, এই 'উন্মাদ জগৎ'কে উন্মাদ প্রমাণ করিবার জন্যই কাহাকেও না জানাইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িতেছে।"

"সভা কখন্ আরম্ভ হবে, মশায়?"

ঘ-পল্লীর সান্-ষ্ট্রোক্-কাবু দেশপ্রেমিক ভদ্রলোক চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, মধ্য-বয়স্ক বেঁটে ও মোটা জনৈক ভদ্রলোক কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া খবরের কাগজটা পাঠ করিতেছেন।

"তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুরু হবে। আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন?" খবরের কাগজের মালিক জিজ্ঞাসা করিলেন।

"নিজেকে।"

"মানে!…আপনি নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াচ্ছেন নাকি? নামটা শুনতে পারি কি?"

"আমার নাম ডেসিমেল পাঁচ চার নয় রেকারিং। আমি উনপঞ্চাশনগরের ভবিষ্যৎ একচ্ছত্র নেতা। ঘ-পল্লীর অধিবাসীদের বর্ত্তমান জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আমি ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। আপনাকেই আমার নাম প্রস্তাব করতে হবে। আপনাদের নেতারা ভীরু, নিয়মতান্ত্রিক। ঘ-পল্লীর এই মহা সঙ্কটে চাই বৈপ্লবিক নেতা। আমি সেই নেতা; আমি অনিয়মতান্ত্রিক। প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে আমি আপনাদের সহায়তা করতে অগ্রসর হয়ে এসেছি। যুদ্ধ জয় করতে হলে প্রথমেই একটা বৈপ্লবিক বুলি চাই, একটা আক্রমণাত্মক নীতি চাই। আমি অবিলম্বে সেই বুলি এবং সেই নীতির প্রবর্ত্তন করব। ঘ-পল্লীর আয়তন ঞ-পল্লীর এক-তৃতীয়াংশ, অথচ দুই পল্লীরই রাস্তা এক রকম চওড়া কেন? ভেবেছেন, এটার পিছনে কোনই মতলব নেই? মোটেই তা নয়। এটা একটা চক্রান্ত, একটা জঘন্য চক্রান্ত। পল্লী-নির্ব্বিশেষে সকল রাজপথের মাপ এক করার উদ্দেশ্য, তুলনায় আপনাদের বাস করার মতো জায়গা কমিয়ে দেওয়া। এই চক্রান্তে ঘ-পল্লীর সরল জনসাধারণ আজ প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে। নিজেদের রাস্তা বুজাতে এবং ওদের রাস্তা চওড়া ক'রে দিতে হবে। ঘরে আমাদের বুলি হবে, "রাস্তা বুজাও, রাস্তা কমাও।" বাইরে আমাদের বুলি হবে: "রাস্তা বাড়াও, রাস্তা বাড়াও।" বল ভাই সব, "রাস্তা বুজাও, রাস্তা বাড়াও…"

ইতিমধ্যে বেশ পুষ্ট রকম একটি জনতা এই অগ্নিবর্ষী নেতার চারদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। রাস্তা বুজাও, রাস্তা বাড়াও। রাস্তা কমাও, রাস্তা বাড়াও।" পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার অধিকারী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমিই আপনার নাম প্রস্তাব করব।" দুই শত দেশভক্ত কণ্ঠ বলিল: "আমরা আপনার পক্ষে হাত ওঠাবো।" তখন এই উত্তেজিত জনতার মধ্যে আবর্ত্তিত হইতে হইতে তেজদৃপ্ত '৫৪৯ বক্তৃতা-মঞ্চে গিয়া হাজির হইলেন।

ঘ-পল্লীর বিখ্যাত নেতা এইরূপ ভাবেই আবির্ভূত হইল। উনপঞ্চাশ কর্পোরেশনের কাছে ঘ-পল্লীর রাস্তা বুজাইবার দাবী প্রেরণ করা হইল, এবং 'আল্টিমেটামে'র ৪৮ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হইল। ঘ-পল্লীর দেশপ্রেমিকেরা ধামা ধামা চুণ, সুরকি, বালি, পাথরের কুচি, কয়লার টুকরো, মায় উনুনের ছাই লইয়া 'রাস্তা বুজাও', 'রাস্তা বুজাও' ধ্বনি করিতে করিতে নিজেদের পাড়ার সর্ব্বত্র তাণ্ডব করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং রাত্রির অন্ধকারে কোদাল, কুড়োল ও শাবল হস্তে ঞ-পল্লীতে চুপি চুপি ঢুকিয়া সেখানকার রাস্তা আরও চওড়া করিয়া দিয়া আসিতে লাগিল।

ঞ-পল্লী এই আক্রমণ নীরবে সহ্য করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি তাহারাও এক শক্তিশালী নতুন নেতা সংগ্রহ করিয়াছে। তিনি 'সম্ভবামি যুগে যুগে'

ভঙ্গীতে এক রকম হাওয়া হইতেই উদিত হইয়াছেন, এবং ক্ষুদ্র ঘ-পল্লীর ধৃষ্ট আক্রমণের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য আয়াসী এবং নিরামিষাশী ঞ-পল্লীবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বাণী দিয়াছেন: 'গুণ্ডামির বদলে গুণ্ডামি চাই', 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি ফিরিয়ে দাও।' ফলে ঞ-পল্লীর দেশপ্রেমিকেরা সুযোগ পাইলেই ঘ-পল্লীতে ঢুকিয়া পড়িতেছে এবং খালি জায়গা পাইলেই তাহাতে নতুন রাস্তা কাটিয়া দিতেছে এবং কম চওড়া রাস্তা চওড়া করিয়া ফেলিতেছে।

সারা শহরের জীবনযাত্রাই বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী অন্যান্য পল্লীরাও এ-দলে বা ও-দলে যোগ দিয়া দাঙ্গায় মাতিল। আজ যেখানে রাস্তা আছে কাল সেখানে রাস্তা নাই। আবার কাল যেখানে রাস্তার বংশও ছিল না আজ সেখানে প্রশস্ত রাজপথ জাগিয়া উঠিয়াছে। শহরের স্ট্রীট ডাইরেক্টরিগুলি বাতিল হইল; পোস্টম্যানেরা ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি বিলি করিতে গিয়া নাকাল হইল। লোকেরা বাড়ির বাহির হইয়া আর বাড়িতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। শহরে পুলিশের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহারাও নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এক বা অপর দলকে সাহায্য করিয়া সঙ্কট আরও ঘনাইয়া তুলিল। কার্ফিয়ু অমান্যের জন্য একদল পুলিশ এক পক্ষের লোক ধরিয়া আনিলে পুলিশের অন্য দল তাহাদের বেকসুর খালাস দেয়।

এই ডামাডোলের মধ্যে অকস্মাৎ একদিন ৫৪৯ রেকারিং, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। ঘ-পল্লীর প্রতি বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কেহ বলিল পালাইয়াছে, কেহ বলিল গুম্ হইয়াছে, কেহ বলিল বিদেশের সাহায্য আনিতে গিয়াছে। ঘ-পল্লীর যে সব নেতা ডিক্টেটর-নির্ব্বাচনে ভুঁইফোঁড় '৫৪৯ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল তাহারা বলিল: 'আচ্ছা জুয়াচোরকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিয়াছিলে। তখন সুপরামর্শ শোন নাই, হাতের সংখ্যার জোরে আমাদের মতো উপযুক্ত প্রার্থীদের উপেক্ষা করিয়া একটা ডেমাগগ্‌কে নিযুক্ত করিয়াছিলে, এইবার ঠেলা সামলাও।'

সহসা পিছন হইতে এক গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ শোনা
গেল। চকিতে সকলে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, '৫৪৯
রেকারিং তাহাদের সামনে উপস্থিত। তাহার শির উন্নত,
পোষাক পরিপাটি, চক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মুখে তেজচ্ছটা।
ডান হাতটি ডিক্টেটরদের ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া সে তাহার
শঙ্কাতুর অনুচরবৃন্দের উদ্দেশে কহিল: 'প্রিয় অনুচরবর্গ,
মাভৈঃ। আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধের পরবর্ত্তী নীতি স্থির করিবার
জন্য আমি ধ্যানে বসিয়াছিলাম, এ জন্যই তোমাদের দেখা
দিতে পারি নাই। এইবার তোমাদের নিকট সমাধান
হাতে ফিরিয়া আসিয়াছি। হীন ঞ-পল্লীবাসীরা আমাদেরই
অনুকরণে কোদাল, শাবল লইয়া আমাদের রাস্তা চওড়া
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পায়ে-চলা পথকে গলি,
গলিকে শড়ক, শড়ককে রাজপথ করিয়া দিয়া পালাইতেছে।
উহাদের চেহারা হুবহু আমাদের মতো হওয়ায় উহাদের
ঘ-পল্লীতে প্রবেশ আটকানো যাইতেছে না। যাহারা
সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি জাতি তাহাদের চেহারা এক রকম
করা ভগবানের কিছুতেই উচিত হয় নাই! সে যাহা
হউক, ভগবানের ত্রুটি আমাদের সংশোধন করিয়া লইতে
হইবে। দুইয়ের পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
.. নিশাবসানের পূর্ব্বেই ঘ-পল্লীর সকল বাসিন্দাকেই বাম
গালে চূণ লেপিতে হইবে। ইহাতে সহজেই আমরা
শত্রুদের ধরিয়া ফেলিতে পারিব। তা ছাড়া, মুখে চূ
প্রলেপের ফলে ঘ-পল্লীর সৈন্যদের আরও শক্তিমান্
ভয়ঙ্কর দেখাইবে। সুতরাং আমি আদেশ করিতেছি
কাল ভোর হইবার আগেই ঘ-পল্লীর প্রত্যেক পুরুষ
উপরোক্ত রূপ সংস্কার সম্পূর্ণ করিয়া প্রকৃত দেশপ্রেমে
পরিচয় দিতে হইবে। কেহ এই আদেশ অমান্য করিলে

ডিক্টেটর নির্ব্বাচনে পরাজিত নেতা ১°৪৯ প্রতি
করিয়া কহিল, 'আমি এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক
অর্থহীন মনে করি। যদি চূণ লেপিতে হয় তবে ঞ
বাঁদরদের মুখেই তা লেপা উচিত, আমাদের নিজেদের মু
চূণ মাখিয়া '

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না। ডি
টরের গগনভেদী হুঙ্কারে সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রা
চমকাইয়া উঠিল: 'চুপ্ রও, কাপুরুষ। কে সেনাবাহি
সর্ব্বাধিনায়ক, তুমি না আমি? কে ঘ-পল্লীকে জ

য়ারে লইয়া আসিয়াছে, তুমি না আমি? কে 'আত্ম-
..তী' সৈন্য শিক্ষিত করিয়াছে, তুমি না আমি? ঞ-দের
..খে চূণ মাখিতে গিয়া অযথা সৈন্যক্ষয় হইলে কে তাহার
..ন্য দায়ী হইবে, তুমি না আমি? সাবধান ১°৪৯!
..ইবার লইয়া দুইবার তুমি ডিক্টেটরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ
করিবার চেষ্টা করিলে। তৃতীয় বারের পর চতুর্থ বার বাধা
দিবার আর সুযোগ পাইবে না, এই কথা স্মরণ রাখিও।
তোমার মতো একটা পঞ্চম বাহিনীর লোকের জন্য সমগ্র
..-পল্লীর জাতীয় জীবন বিপন্ন হইতে দিতে পারি না...'

চতুর্দ্দিক্ হইতে রব উঠিল: 'জয়, সর্ব্বাধিনায়কের জয়!
..দেশের জন্য চূণ মাখো, বাম গালে চূণ মাখো।' 'জয় চূণ,
জয় চূণ!' সর্ব্বাধিনায়কের পরামর্শে চূণ মুহূর্ত্তে জাতীয়তার
প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। পরস্পর পরস্পরকে গালে চূণ
লেপায় সাহায্য করিল। চূণ লেপা গালই ফ্যাসান হইয়া
উঠিল। দেশপ্রেমিক মেয়েরা পর্য্যন্ত পেলব গণ্ডে চূণ
..ষিতে লাগিল। চূণ সম্বন্ধে জাতীয় সঙ্গীত লেখা হইয়া
সর্ব্বত্র গাওয়া হইল।

ঞ-পল্লীর ডিক্টেটর পাকা লোক। চট্ করিয়া
সে ব্যাপারটা টের পাইয়া গেল। সাঙ্গোপাঙ্গদের
ডাকিয়া সে কহিল: 'ঘ-পল্লীর হাঁদারামেরা বাঁ গালে চূণ
লেপিয়া ভাবিয়াছে বে-চূণ লোক দেখিলেই ধরিয়া ফেলিবে।
উহারা নিজেদের বড় চালাক ঠাওরাইয়াছে। আমরা
..হাদের চালাকি বাহির করিতেছি। কাল বেলা দুইটার
..ধ্যে ঞ-পল্লীর প্রত্যেক পুরুষকে উহাদের মতো বাঁ গালে
..ণ মাখিয়া ফেলিতে হইবে, এই মর্ম্মে ঢেঁড়া দিয়া দাও।
..খি কি করিয়া উহারা আমাদের চিনিতে পারে!'

ফলে পরদিন ঘ-পল্লীর ডিক্টেটর '৫৪৯কে আবার জরুরী
..ন্ত্রণা-সভা ডাকিতে হইল। উদ্বেগের স্বরে সে কহিল,
..ণিত ঞ-পল্লীর ডিক্টেটরটাও আমাদের চূণ-তথ্য টের
..ইয়া ফেলিয়াছে। ঞ-সৈন্যেরাও বাম গালে চূণ
..পিয়াছে। নিশ্চয় কোনও পঞ্চম বাহিনীর লোক
..াপন-সঙ্কেতে শত্রুপক্ষের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়াছে।
..হলে এত তাড়াতাড়ি ইহা তাহাদের জানিবার কথা নয়।
আমার সন্দেহ হয়, ১°৪৯-এর ইহাতে হাত আছে। অবিলম্বে
..হাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। কিন্তু এত সহজে
..আমাদের দমিলে চলিবে না। আমাদের নতুন চিহ্ন

ব্যবহার করিতে হইবে। এইবার প্রত্যেক ঘ-পল্লীবাসীকে ডাহিন গালে কালি মাখিতে হইবে...'

মন্ত্রণা-সভার জনৈক সদস্য বিনীতকণ্ঠে কহিল, 'ঘৃণিত ঞ-বাসীরাও তো সহজেই গালে কালি মাখিয়া আমাদের কৌশল ব্যর্থ করিতে পারে...'

'অর্ব্বাচীন, অর্ব্বাচীন! রণকৌশলের তুমি কিছুই জানো না দেখিতেছি!' প্রশ্রয়ের কণ্ঠে '৫৪৯ কহিলেন। 'কোন্ গোপন অস্ত্র আর চিরকাল শত্রুর কাছে গোপন থাকে? যে কয়দিন সময় পাওয়া যায়, কেল্লা ফতে করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। উহারা আমাদের দেখাদেখি ডাহিন গালে কালি মাখানো শুরু করিলে আমরা অন্য অঙ্গ এবং অপর বর্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিব। ইতিমধ্যে যাহা আদেশ করিলাম তাহা যেন প্রতিপালিত হয়।'

পরের দিন ঘ-বাসীরা বাঁ গালে চূণ ও ডান গালে কালির প্রলেপ লইয়া সগর্ব্বে যুদ্ধে বাহির হইল, কিন্তু তাহাদের প্রসাধন-গর্ব্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। অনতি-বিলম্বে ইণ্টেলিজান্স ব্রাঞ্চ খবর লইয়া আসিল যে ঞ-বাসীরাও বাঁ গালে চূণ ও ডান গালে কালি মাখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ঘ-বাহিনী স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের গোপনতম 'মুভ্'ও যদি শত্রুবাহিনী এত দ্রুত জানিয়া ফেলে তবে যুদ্ধ চালানোই অসম্ভব। ইহার পর আর আর সন্দেহ নাই যে সুচতুর পঞ্চম বাহিনী তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ১°৪৯-এর আচরণ সম্বন্ধে ডিক্টেটর মহাশয় কি আগেই সতর্ক করেন নাই? ঘ-পল্লীর বীরেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'রক্ত চাই, রক্ত চাই, ১°৪৯-এর রক্ত চাই' ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইল।

গৃহযুদ্ধ তুমুল হইয়া ওঠায় বহু লোকই শহর ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; উহাদের ইভ্যাকুয়েশনের জন্য রেল কোম্পানী বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। সে দিন ডুপ্লিকেট রাঁচী এক্সপ্রেসের বন্দোবস্ত ছিল; ইহার প্রতিই যেন অধিকাংশ যাত্রীর নজর।

ট্রেনটি যখন ছাড়িল তখন দেখা গেল ইহাতে আর তিল ধারণেরও জায়গা নাই।

এই ট্রেনের লোক-ঠাসা একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণায় দু'টি বন্ধু এতক্ষণ চণ্ডুখোরের মতো চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছিল ও মাথায় দেওয়ালের ঠোক্কর খাইতেছিল। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা নাক-ডাকা শুরু করিলে ইহারা দু'জনেই এক সঙ্গে চোখ মেলিল। লম্বা লোকটি বেঁটে মোটার হাত নিজ হাতে লইয়া মর্দ্দন করিয়া কহিল, 'সাবাস ভাই '৫৪৯, উনপঞ্চাশনগরকে শিক্ষা দিয়ে এলে বটে। এত সহজে যে এদের শিক্ষা দেওয়া যাবে তা তুমি বার বার বলা সত্ত্বেও প্রথমে আমার বিশ্বাস হয় নি।'

'৫৪৯ গম্ভীর গলায় কহিল, 'কিন্তু চূণ-কালির আইডিয়াটি তোমারই, ভায়া। এ-ছাউনিতে গিয়ে তোমার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করতে না পারলে ওটা আমার মাথায়ই খেলত না।…য়্যাসিলামের বাঙালি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটাকে গিয়ে বলতে হবে, 'নইলে এত তাড়াতাড়ি ফিরতাম না।…উনপঞ্চাশনগরের ব্যাটারা বড় কালচারের গর্ব্ব করত। দুই গালে চূণ-কালি মেখে এবার সং সেজে বসে আছে।…'

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

গোপন পরামর্শ

নিমপুকুর গ্রামে কয়েক দিন হইল বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নরম সুরের সন্ধি-সূচক পত্রের কথা আর কাহারও বড় জানিতে বাকি নাই। চাঁদপাল এবার অনেক কিছুই গুছাইয়া লইতে পারিবে। সংবাদটি যেমন এক দিক্ দিয়া আশ্রিতের দলে পুলকের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি এক শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে আনিয়াছে দারুণ আতঙ্ক। এতদিন তবু উপরে একজন থাকায় কিছুটা ভরসা ছিল, এখন হইতে সে বাধাও অপসারিত হইবে। স্বেচ্ছাচারী চাঁদপালের সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই এই আতঙ্ক।

যে সব ছোট-বড় জমিদার নবাবের বিরুদ্ধে চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল তাদের সকলকেই আজ নিমপুকুরে ডাকা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে একটু ভালো রকম আলোচনা করা। চাঁদপাল স্বেচ্ছাচারী, চাঁদপাল ধূর্ত্ত—স্বার্থপর, কিন্তু এমন একটা বড় কাজে নামিয়া অপরের সাহায্য ছাড়া যে আগানো যায় তা সে ভালমতই জানে। তাই এই ব্যবস্থা।

চাঁদপালের দরবার-গৃহে বৈকালের দিকে পরামর্শ-সভা বসিল। অনেকেই আসিয়াছে। কয়লাপটী, সুজাপুর, বেগুনতলি, সুবাসনগর, শ্যামপুকুর, শুকদ্বীপ, আওলা… …নকপুর, দোলাইখাড়, মেঘচাঁদা—সকল জায়গারই জমিদারেরা সঙ্গে ২।১জন করিয়া অনুচর লইয়া সভায় যোগ দিয়াছেন। ইহাদের সকলেই যে চাঁদপালকে খুব বিশ্বাস করেন তা নয়, কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ ও এমন একটা অভাবনীয় সুযোগের প্রলোভনে তাঁরা আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। চাঁদপালও এই সব মানী অতিথিদের যতটা সম্ভব খাতির-যত্ন করিতে ত্রুটী করে নাই।

সভার কাজ সুরু হইল। দেওয়ান রুদ্রকান্ত সকলকার পরিচয় করাইয়া দিলেন। চন্দনার তরফ হইতে আসিয়াছে রাসবিহারী। রুদ্রকান্ত পরিচয় করাইয়া দিতেই চাঁদপাল প্রশ্ন করিল, "ও, আপনি একা এসেছেন! চৌধুরী মশায় এলেন না?"

সভার সকলেই আড়ালে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নন্দ চৌধুরীর স্বভাবের কথা কারোই অজানা ছিল না, চাঁদপালও জানিত। অলস নন্দ চৌধুরীর পক্ষে তোড়জোড় করিয়া এতখানি পথ আসা খুবই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। তবে কিনা গরজ বড় দায়। এমন একটা অভাবনীয় সুযোগ হাতছাড়া হইয়া যাইবে! আর—আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। বারদীঘির সঙ্গে চন্দনার শত্রুতা বহুদিনের। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই বারদীঘিকে কিছুটা শিক্ষা দেওয়ারও সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। চাঁদপালের সহায়তা এই ব্যাপারে পরম লোভনীয়। তাই চন্দনা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই এই দলে যোগ দিয়াছে।

রাসবিহারী মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "হাঁ, তিনিও আসছেন। তবে এখন তো সবটা পথ নৌকো আসছে না, খানিকটা পথ ঘোড়ায় আসতে হয়। চৌধুরী মশায় আবার—" রাসবিহারী একবার ঢোঁক গিলিয়া লইল,—"চৌধুরী মশায় আবার ঘোড়ায় চড়া তেমন পছন্দ করেন না। তাঁর জন্য তাই গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি অনেক ক্ষণ রওনা হয়েছেন—অনেক ক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় পৌছে যাবেন।"

চাঁদপাল হাসিয়া কহিল, "ওঃ, তা তাঁর জন্য গরুর গাড়ীতে বেশ পুরু ক'রে গদী পেতে দেওয়া হয়েছে তো? এদিক্‌কার রাস্তাঘাট আবার বড় এবড়ো-খেবড়ো কিনা!"

ঘরের সবাই, যারা এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এবার প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিল। রাসবিহারী মুখ নীচু করিয়া কহিল, "আর তিনি আসছেন শুধু আপনাদের সম্মান রাখবার জন্য। কথাবার্ত্তা যা সব আমিই বলতে পারব। তিনি আর কতটুকুই বা নিজে করেন! সবই তো আমার ওপর…"

রাসবিহারীর কথা ভাল করিয়া শেষ হইবার আগেই দারোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর, একখানা গরুর গাড়ী ক'রে কে যেন এসেছেন!"

"ঐ এসে গেছেন বুঝি! রুদ্রকান্ত, দেখ তো যাও, ভিতরে নিয়ে এস।"

রুদ্রকান্ত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরেই নন্দ চৌধুরীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নন্দর পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে মিহি রেশমী পিরান আর গরদের চাদর। পায়ে সৌখীন মখমলের লপেটা শ্রেণীর জুতা। চাঁদপাল অভ্যর্থনা করিয়া অদূরবর্ত্তী তাকিয়া দেখাইয়া দিল। নন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাকিয়ার উপর গিয়া কাৎ হইয়া পড়িল এবং হাতের মুঠা হইতে হাতীর দাঁতের নস্যদানটি বাহির করিয়া একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া দিল। রাসবিহারী গিয়া তাহার পাশে বসিল।

আলোচনা চলিল বহুক্ষণ। জমিদারদের অনেকেই অনেক প্রস্তাব করিলেন, নিজের নিজের দাবী জানাইতেও ভুলিলেন না। নন্দর হইয়া রাসবিহারীও আলোচনায় যোগ দিল, সাধ্যমত তর্ক করিল, 'চন্দনার দাবী পেশ করিতেও ছাড়িল না।

কিন্তু পাদ্রী বারেটোর মত না লইয়া কোন সিদ্ধান্তই করা যায় না। বারেটোর সহিত একবার চাঁদপালের মুখোমুখী বসিয়া আলোচনা করা দরকার—বারেটোর মতই সমস্ত পর্ত্তুগীজ দলের মত। অবিলম্বেই এই সাক্ষাতের আয়োজন করিতে হইবে। তা ছাড়া রত্নহার সম্বন্ধেও ২।১টি দরকারী কথা জানা দরকার।

কিন্তু কোথায় সাক্ষাৎ করা যায়! বারেটো নিজে নিমপুকুরে নিশ্চয়ই আসিবে না। আর ফিরিঙ্গীর চকে গিয়া পর্ত্তুগীজ দুর্গের ভিতর ঢুকিয়া তার সহিত দেখা করিতেও চাঁদপাল নারাজ। উভয়েই সমান ধূর্ত্ত। এখন প্রয়োজনের খাতিরে যত বন্ধুত্বই হউক না কেন; কেহই অপর পক্ষের সম্পূর্ণ হাতের মুঠার মধ্যে ঢুকিতে রাজী নয়।

TIGHT BINDING

এমন একটা জায়গায় সাক্ষাতের আয়োজন করিতে হইবে যা দু'জনের পক্ষেই সমান নিরাপদ অথচ গোপনীয়। কিন্তু কথাটা খোলাখুলি বলা যায় না—চক্ষুলজ্জায় বাধে।

তখন ঠিক হইল, অবিলম্বে বারেটোর কাছে কৌশলপূর্ণ চিঠিতে সময় ও স্থান নির্ব্বাচন করিয়া একজন বিশ্বাসী লোক পাঠানো হইবে। এবং সে বারেটোর সম্মতি লইয়া ফিরিয়া আসিলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাতে সময় বেশী নাই। বারেটোর বিশ্বস্ত অনুচর বিব্বু কাছাকাছিই আছে, তাকে দিয়া খবর পাঠাইলেই সব চেয়ে ভাল হইবে।

পরামর্শ শেষ হইলে চাঁদপাল পরিশ্রান্ত জমিদারবৃন্দের পছন্দমত কাহাকেও ঠাণ্ডা সরবৎ, কাহাকেও সিদ্ধির সরবৎ এবং কাহাকেও বা অধিকতর শ্রমহারী পানীয় দিয়া আপ্যায়িত করিল। শেষোক্তটি হইতে সে নিজেও বঞ্চিত হইল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈরাগী-সংবাদ

শাঁখরাইলের কাছে মাদারপাড়ার সেই চটিটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই যেখানে রসরাজ প্রথম রত্নহারের সন্ধান পান?

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যার কিছু পরে চটির সম্মুখস্থ খোলা আঙ্গিনায় কয়েক জন লোক বসিয়া জটলা করিতেছিল। তাদের সামনে একজন বৈরাগী বসিয়া বসিয়া একতারায় ঝঙ্কার দিতেছিল। বৈরাগীর মুখখানা যেন চেনা চেনা।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল, "আর একখানা হোক্ না দাদা! রাত এখনও বেশী হয় নি।"

বৈরাগী বার দুই কাসিয়া লইয়া গাহিতে সুরু করিল—

কে কারে হারায় রে বন্ধু, হারায় কে কারে!
সংসারে নিয়তি বিধির কে খণ্ডাইতে পারে?
জলের মধ্যে ঘোরে মৎস্য—মাকড় ধইরা খায়,
সেই মৎস্য বকেরি ঠোঁটে যায়—তলাইয়া যায়।
মেকুর ভাবে বকের মাংস বড়ই চমৎকার,
শিয়াল আসে গুটি গুটি নাই তাহারও পার।
'বনের মধ্যে বেড়ায় শিয়াল, ব্যাঘ্রে ধরে ঘাড়,
চাইটা চাইটা রক্ত খাইয়া আশ মেটে না তার।
আচমকা কিরাতের তীরে সেও যে লুটায় পথে,
কে জানে নিয়তি কাহার বান্ধা কিসের সাথে!
বন্ধুরে, বান্ধা কিসের সাথে!

বৈরাগী গাহিয়া চলিল। ক্রমে ভিড় একটু একটু করিয়া পাৎলা হইয়া আসিল। বৈরাগী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল অদূরে একজন হৃষ্টপুষ্ট গোছের লোক অন্যমনস্ক ভাবে তার গান শুনিতেছে। আবছা অন্ধকারেও তার চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি বৈরাগীর চোখ এড়াইল না। লোকটা নেশা করিয়াছে।

বৈরাগী গান থামাইল। একবার হাই তুলিয়া বার কয়েক তুড়ি দিল। সমঝদারেরা বুঝিল আপাততঃ আর তার গান গাহিবার মতি নাই; তারা একে একে চটির ভিতরে চলিয়া গেল। বৈরাগী এবার ধীরে ধীরে সেই বলিষ্ঠ লোকটির কাছে আগাইয়া গেল।

"সেলাম দাদাভাই! এক-আধ ছিলিম খাওয়াতে পার? গলাটা কুঁকড়ে গেছে।"

লোকটির ঘোলাটে দৃষ্টি চকিতে কঠিন হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে বৈরাগীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উদ্ধতকণ্ঠে সে কহিল, "না, ও সব ক্ষুদে নেশার আমি ধার ধারি না।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উগ্র মদের গন্ধ আর চাপা রহিল না।

বৈরাগী হাসিমুখে কহিল, "আরে, চট কেন দাদাভাই ও-সব রসে কি আমরাও বঞ্চিত? তবে যে সময়কার যা এখন, প্রথম রাতে, ও-সব ক্ষুদে জিনিষ দিয়েই সুরু করতে হয়। রাত বাড়ুক না, তারপর—" বৈরাগী চোখ কুঁচ কাইয়া বাকিটুকু ইসারায় শেষ করিল।

লোকটি তখনও কোন কথা বলে না। বৈরাগী আ একটু অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ যে খা ফিরিঙ্গী রস যোগাড় করেছ দাদা! একবার না শুঁকলেই ধরে দেওয়া যায়।"

এবারে লোকটি ফিরিয়া চাহিল। বারান্দার এক আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; চিনি কষ্ট হয় না—এ আর কেহ নয়, বিব্বু, সম্ভবতঃ বারেটো নিকট হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিতেছে।

বাস্তবিকই তাই। বিব্বু প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়াই রিতেছে, পথে রাত হওয়ায় মাদারপাড়ার চটিতে আশ্রয় য়াছে। আশ্রয় না লইলেও চলিত, কিন্তু মাদারপাড়ার চটিটির কতকগুলি ব্যাপারে সুনাম ছিল—দুর্ল্লভ গীজ মদ সরবরাহ করা তার মধ্যে একটি। ব্যবসা-ণিজ্য সম্পর্কে নানা ধরণের লোক এখানে আশ্রয় নেয়, রিঙ্গী বণিকরাও আসে। সেইজন্যই চটির মালিককে সব ব্যবস্থা রাখিতে হয়। বিব্বুর ইহা জানা ছিল, জেই সুযোগ পাইতেই সে সুযোগকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা র নাই। কিন্তু এ বৈরাগীটি বলে কি! এ যে তারও রে যায়!

বৈরাগী বিব্বুর সন্দেহ অনুমান করিয়া কহিল, "দেখছ দাদা, ঘর-ছাড়া মানুষ। আজ এখানে, কাল ানে ঘুরে বেড়াতে হয়, ও-সব নইলে ভুলে থাকব কি র?" তারপর পুনরায় চোখ টিপিয়া কহিল, "কিন্তু, া, এ আর কি যোগাড় করেছ, আমার সঙ্গে যা আছে র স্বোয়াদ যদি একটু পেতে! সেও ফিরিঙ্গীর, কিন্তু নকার ফিরিঙ্গী—মানে পর্ত্তুগীজদের নয়; আর এক তের ফিরিঙ্গী আছে—ফরাসী ফিরিঙ্গী বলে তাদের, াদেরই তৈরী। তার কাছে এ!"

বিব্বুর দৃষ্টি এবার লোলুপ হইয়া উঠিল। কিছুটা স্ময় এবং কিছুটা সন্দেহমিশ্রিত স্বরে সে কহিল, "হ্যা, ্যা, শুনেছি বটে ফরাসী মদ বড় তোফা জিনিষ, কিন্তু ুমি—তুমি ও জিনিষ পেলে কোথায়?"

"আরে আমরা কি এক জায়গায় থাকি দাদা? লাম তো আজ হেথায় কাল হোথায়—দুনিয়াটা চষে ড়াচ্ছি। একবার গিছলাম তিলভেঙ্কটম্। মাদ্রাজীদের শ, কিন্তু বহু ফরাসী ফিরিঙ্গী এসে জুটেছে। আমার গান সেখানকার ফিরিঙ্গীরা কয়েক ভাঁড় দিয়েছিল। সবটা ে ধরে শেষ করতে পারি নি, আছে সঙ্গে খানিকটা। ত একটু এগোক, চাখাব তোমায়। আচ্ছা দাদা, । এখন এক ছিলিম না পেলে যুৎসই হচ্ছে না। কোথায় বাগাতে পারি।"

বৈরাগীর অনুমান মিথ্যা হইল না, রাত একটু বাড়িতেই া গেল বিব্বু চুপি চুপি বৈরাগীকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। বৈরাগী প্রস্তুতই ছিল, হাসিয়া কহিল, যে দাদা! আমার তৈরীই আছে, এস।"

ঝুলি খুলিয়া বৈরাগী একটা মাঝারি আকারের বো বাহির করিল। এ ধরণের বোতল ফিরিঙ্গীদের কাছে বড় একা দেখা যায় না। তার পর সে বিব্বুর প্রসা গেলাসে তা হইতে খানিকটা উগ্র তরল পদার্থ ঢালিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত দামী ফরাসী মদ—বৈরাগী নেহাৎ কথা বলে নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে গেলাস উজাড় করিয়া আবার হাত বাড়াইল। বৈরাগী দরাজ হাতে তা পূর্ণ করিয়া দিল। একবার—দু' বার—তিন পাকা নেশাখোর বিব্বুরও এবার নেশা ধরিতে হইল না।

তার পরে দু'জনে সুরু হইল গল্প। বৈরাগী শু তার বাঁধন-হারা জীবনের অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী। তার জীবনের অনেক কাহিনী বলিয়া গেল। নিম যা এ জীবন তার আর ভাল লাগিতেছে না। এই ধ কয়েক পিপা পানীয় পাইলেই সে আরাকানে গিয়া ঘর-সংসার পাতিবে—এই ধরণের নানা কথা।

"তা এখন চলেছ কোথায়? নিমপুকুর?"

বিব্বু অবাক্ হইয়া কহিল, "কি করে জানলে? তো বলি নি কিছু!"

"হুঁ হুঁ", বৈরাগীর মুখে দুষ্টামির হাসি। "বা সাহেব কোথায় সাক্ষাতের জায়গা ঠিক করলেন, নবমী না দশমীর দিন?"

"তুমি তো দেখছি অনেক খবর রাখ!"

"তুমিও রাখবে দাদা! যে জিনিষ চাখলে এর তো জান না!"

"সত্যি!"—বিব্বুর মুখে সন্দেহ এবং বিস্ময় ছায়া ফেলিল।

"সত্যি নয় তো কি? এই দেখ না, জীবনে তে সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়েছে বলতে অথচ আজ তুমি আমার কত বড় বন্ধু হয়ে প তোমার কত খবর আমি বলে দিলাম। তুমিও পারবে—অবশ্যি এক দিনেই নয়।"

বিবস্বর হিংস্র চোখ হইতে সন্দেহের ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইল—সেখানে দেখা দিল অপার বিস্ময়। এবার আর সে বৈরাগীর সঙ্গে কোন বিষয়েই নিঃসংকোচে আলাপ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। (ক্রমশ

কল্পনাতীত

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

জীবন বীমা, মানে ইন্সিওর কোম্পানীর, দালাল প্রায় একটা গালাগালির কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথা সবাই জানো। কিন্তু তবু লোকে জীবনে একবার না একবার ইন্সিওর কোম্পানীর দালালী করবেই; খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার কাকা, কি দাদা, কি মামা—কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ইন্সিওর কোম্পানীর দালাল আছেন কিম্বা ছিলেন।

তবে ও জিনিষ প্রায়ই ধোপে টেকে না এই যা। আমার বাবাও জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দালালী করে-ছিলেন, কিন্তু বছর দুই বাদে একটানা মক্কেলবিহীন অবস্থায় অনেক দিন থাকার পর তাঁকে দালালী ছাড়তে হ'ল। আমার কাকারও তাই, তাঁদের বন্ধুদেরও তাই; মানে সবাই একবার জীবনে দালালী করে দালান দেবার স্বপ্ন দেখে শেষে হাল ছেড়ে দেন।

আমিও ইন্সিওর কোম্পানীর দালাল ছিলাম, এবং দালালী করে দালান কেন, আরও অনেক কিছু নিয়ে কল্পনায় বিরাট স্বর্গ সৃষ্টি করে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু ও জিনিষ রাবণ রাজার মত মনেই থেকে গেল। কি করে দালালীগিরি ছাড়তে হ'ল—সেই স্বর্গ থেকে বিদায়ের ইতিহাস আজ তোমাদের শোনাবো।

পর পর কয়েকজন শাঁসালো লোক পাকড়ানোর পরে আর মক্কেল নেই এমনি অবস্থা হয়ে গেল দালালী করার প্রথম পর্ব্বে। যার কাছে যাই সে-ই হয়তো হাই তোলে, ঘড়ি দেখে, নয়ত বলে দেয় কাজ আছে, আজ আসুন গে। পিসিমার লাইফ ইন্সিওর করার পরে একটানা পাঁচ মাসের মধ্যে একজনকেও পাকড়াতে পারলাম না।

টো টো করে এখানে সেখানে মক্কেল খুঁজে বেড়াই, কিন্তু বৃথা খোঁজা! বন্ধুরা আমাকে দেখলেই গলি দিয়ে কেটে পড়ে, যেন তাদের কাছে ধার চাইতে যাচ্ছি। বন্ধুদের কাছে ঘুরে ঘুরে আমি নিরাশ হয়ে গেছি, ত… আর যাইও না।

একদিন বাগে পড়ে না পালাতে পেরে গৌর… আমাকে কথা দিয়েছিল যে সে একটা ইন্সিওর কর… নয়তো একটা মক্কেল জুটিয়ে দেবে। কিন্তু তার পর… থেকেই গৌরচাঁদের আর কোনো পাত্তা পাই নি। … কাল সকাল সকাল, ভোরবেলা, (আমার কাছে… সাধারণতঃ মাঝ রাত) তার বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলা… চা খাচ্ছিল, একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেললাম।

ও আমাকে দেখে মুখখানা এমন করল যেন … গরম হ'লে ও আমাকেই স্বপ্ন দেখে। মুখখানা কাঁচু… করে কোনো রকমে চায়ের পেয়ালাটা হাতে ধরে জিজ্ঞা… করল, 'এত সকাল সকাল কি মনে করে?'

আমি আর ভূমিকা না টেনে মোটা ব্যাগটাকে বগল থেকে ও বগলে এনে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করি।

ওর মুখ শুকিয়ে শাদা কাগজের মতো হয়ে যায়, … ফাঁদে পড়ে গজ গজ করতে পারে না। তাই আ… আমতা করে বলে, 'কিন্তু ভাই, আমি ত' করব না, … করতে পারি এমন…।' ও শুকনো গলাটা চ… চুবিয়ে নেয়। বলে, 'মানে, বোঝই ত', অনেক … দেখলাম, অত টাকা আমি, তবে…'

জানতাম, 'অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়,' … বললাম, 'ইন্সিওর না কর ত' কিছু টাকা ধার দা… আমার অবস্থাও তো দেখতে হবে।'

গৌরচাঁদ ধারের ধার দিয়েও যায় না, বলে, 'পা… নাকি, ধার কোত্থেকে দেব? তবে একজনকে ধরে দি… পারি।'

আমার উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ও ভেবে … 'পাশের বাড়ীর রায় বাহাদুর হয়তো করতে পারেন, …এখনো করেন নি।' গৌরচাঁদ আস্তে আস্তে কথাটা …ভাঙ্গল। 'প্রকাণ্ড জমিদার ঐ ভদ্রলোক। টাকা আছে, বিরাট বাড়ী। তুমি যাও না, একবার গিয়ে য়্যাপ্রোচ্ কর না।'

'পাশের বাড়ী মানে ঐ কম্পাউণ্ডওয়ালা চারতালা বাড়ীটা?' গৌরচাঁদকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ল ঘাবড়ে গিয়ে। …চিনি না শুনি না, তায় আবার কি দরের লোক…'

'দরাদরি আবার কি?' গৌরচাঁদ ভ্রূ কুঁচকায়, সদরের লোক হে, রাজা লোকও বলতে পার রায় বাহাদুর নরেন চৌধুরীকে। দিলদরিয়াও খুব, চাই কি তোমার কথার প্যাঁচে ভুলে বেশ একটা মোটা টাকার ইন্সিওর ক'রে ফেলতে পারেন। বেশ একটা লাম্ সাম্। একটু গিয়ে ওর লেখা বইএর সুখ্যাতির ওয়াস্তা, ব্যস্। লেখক কিনা, গলে যেতে বাধ্য।' গৌরচাঁদ তার হাতের তালুতে একটা …কিল মেরে আমাকে বুঝিয়ে দিল।

বললাম, 'ভদ্রলোক বই লেখেন নাকি? কই, মনে তো হয় না ওঁর লেখা কোনো বইএর নাম দেখেছি! শুনেছি বলেও তো মনে হয় না!'

'সি—কি—হে!' গৌরচাঁদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'পড় নি কি হে! বহু নভেল লিখেছেন যে ভদ্রলোক, অন্ততঃ গোটা কুড়ি তো বটেই। আমরা তো ওঁর বাঁধা গ্রাহক, অবিশ্যি বিনি পয়সার গ্রাহক বলতেও পার। পাড়াপড়শী প্রত্যেককে উনি একখানা ক'রে বই ছাপা হ'লেই বিলিয়ে দেন। খুব অমায়িক আর মহাশয় লোক হে!' সার্টিফিকেটের ঠ্যালায় গৌরচাঁদ মুখটা অমায়িক করে আনে।

তার পর নীচু গলায় কানের কাছে গিয়ে যেন খুব একটা প্রাইভেট কথা এমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, 'গিয়ে ঠেলে ওঁর লেখার প্রশংসা করে পায়তাঁরা ভাঁজবে। এমনি উপন্যাস হয় না, আপনি শরৎ বাবুর পরেই, এমনি দু'-একখানা নরম বচনের ঠ্যালায় ওকে স্রেফ ভাসিয়ে দেবে।' তার পর চোখ টিপে বলে, 'তোমরা ত' এ সব পারো হে। আমরাই এমনি করে দুর্গা পূজোর সময় দু'শো তিনশো টাকা প্রত্যেক বছর ওঁর কাছ থেকে আদায় করি।'

বটে বটে! আমি একেবারে লাফিয়ে উঠি। এখনি যাই না। আবার কবে এত সকালে ওঁর সৌভাগ… কে জানে?

'যাও না', গৌরচাঁদের তাড়া যেন আমার … বেশী। আমার আগেই দরজা অবধি এগিয়ে আসে…

গুটি গুটি পা ফেলে ভগবানের নাম ক'রে … বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। প্রকাণ্ড জমকালো চ… বাড়ীখানা দেখে মনে একটা ফুর্ত্তি এল। এ… টমিদার না হয়ে যায় না। বেয়ারাকে স্লিপ্ দি… আমাকে প্রকাণ্ড একটা ঘরে নিয়ে গেল, … রায় বাহাদুর একটা প্রকাণ্ড টেবিলে বসে কি… লিখছেন আর আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন … ঘরে ঢুকলাম তা উনি টেরও পেলেন না।

তাই গলাটা একটু খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'নম…

রায় বাহাদুর চমকে ফিরে তাকালেন, তার প… করে বললেন, 'আপনি?'

'পাড়াপড়শী! একটু মৃদু হেসে বললাম, '… নতুন এসেছি, কিন্তু আপনি এ পাড়ায় থাকে… জানতাম না!'

'চেনেন নাকি আমাকে?' রায় বাহাদুর প্রা… হয়ে গেলেন।

"চিনব" না? কি যে বলেন!' আমি … বিস্ময়ে হতবাক্ হবার ভান করি। 'আপনা… পড়ে পড়ে ঠিক আপনার এই রকম চেহারাই … করেছিলাম, ঠিক এমনি। চিনি কিনা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন!' রায় বাহাদুরের উল্লসি… দেখে আর থামি না, 'লিখে তো যান খুসী ম… রাখেন কত পাঠক আপনার নতুন উপন্যাসের … কত আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে?"

'হেঁ, হেঁ,' রায় বাহাদুর এবার চেয়ার ছে… সোফায় এসে বসেন। 'হেঁ হেঁ, আপনি … বলছেন মশাই, বেশী বেশী প্রশংসা করছেন। আমি লিখি খেয়াল মত, তাই বেশী লিখে উঠতে না। তা ছাড়া আমার 'ভিউ'টাও একটু … সবাই…'

'আপনার 'ভিউ' কে বলে বোঝা যায় …

স্পষ্ট আর এত প্রাঞ্জল, আপনার ইয়ে বইখানাতেই তো পরিষ্কার বোঝা যায়।'

"শেষ নিঃশ্বাসের' কথা বলছেন নিশ্চয়ই ?' রায় বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই বলছিলাম।' আমিও অকূলে কূল পেয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি।

'হ্যাঁ, শেষ নিঃশ্বাস আমার খুব ভাল লেগেছিল লিখে', রায় বাহাদুর বললেন, 'তবে··· '

'তবে একটু বড়', আমি পাদপূরণ করি। আবার মুখের ভাব দেখে সামলে নিয়ে বলি, 'না, না, তেমন বড়ও হয় নি, এমন কি বড় ?' আন্দাজে আন্দাজে টোপ দিয়ে চলি।

'প্রত্যাবর্ত্তনটা লেগেছে কেমন আপনার ?' রায় বাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

'সত্যিই সুন্দর', চোখ বুজে কল্পনা করে বলে যাই, 'প্লট্ এক হাত দেখিয়েছেন বটে আপনি। আর ভাষার ছন্দ ! আপনার বর্ণনাটাই হয়েছে সব চাইতে বেশী রোমাণ্টিক, অবাক্ করে দেয় ঐটাই।' নিজের বর্ণনা-চাতুর্য্যে নিজেকেই প্রায় অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

'আপনি অমাবস্যা' রাত্রের সিন্‌টার কথা বলছেন নিশ্চয় ? আমার সত্যি দশ পেয়ালা চা খরচ হয়েছিল ঐ একটা দৃশ্য লিখতে।' রায় বাহাদুরের চোখে বলতে বলতে ভাবের ঘোর এসে যায়।

চা এসে গেল। রায় বাহাদুর সযত্নে এক কাপ্ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমার লেখা সব নভেলের মধ্যে কোন্‌টা আপনার সব চাইতে ভাল লেগেছে বলুন তো ?'

মনে মনে প্রসন্ন চিত্তে কত টাকার একটা 'প্লিসি' গছানো যায় তাই ভাবতে ভাবতে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম, চমকে উঠলাম রায় বাহাদুরের কথা শুনে। ওঁর শ্রীমুখে যে দু'টো বইএর নাম শুনলাম তারই একটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু ততক্ষণে তা ভুলে গেছি। সর্ব্বনাশ ! শত চেষ্টা করেও ও দুটোর একটা নামও মনে আনতে পারলাম না। প্রাণপণে ভাবলাম, তবু না,—তবু মনে এল না।

নাম এল না বটে, তবে বুদ্ধি এল। তাই বিজ্ঞের মত একটু মাপা হাসি হেসে বললাম, 'এইবার তো মুস্কিলে ফেললেন রায় বাহাদুর ! কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টার বলব সেইটাই তো সব চাইতে মুস্কিল। আচ্ছা, আপনি বলুন না কোন্‌টা আপনার সব চাইতে ভাল লাগে বেশী লেখকের মুখ থেকেই শুনি।'

রায় বাহাদুর একটু প্রসন্ন হেসে খুব ঘন করে চায়ে একটা চুমুক দিলেন, তার পর অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, 'আমার মনে হয়—ভাব আর ভাষা দু'টো দেখে যত বই লিখেছি তার মধ্যে 'শেষ দেখা'ই বোধ হয়···'

'শেষ দেখা' তো ?' আমি রায় বাহাদুরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চীৎকার করে উঠি। 'বাস্তবিক রায় বাহাদুর, আমি ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আহা 'শেষ দেখা', নামেই মেরে দেয়। সামাজিক ছবি এঁকে করুণ ভাবে শরৎ বাবুর পরে কেউ ফুটিয়েছে কিনা মনে করতে পারি না, সে আপনি যাই ভাবুন। সত্যি সামাজিক একটা দিক্ খুলে দিয়ে আপনি সবাইকে একে বারে অবাক্ করে দিয়েছেন, এ আমি চিরকাল বলব। আমাদের পাড়ার লাইব্রেরীতে সেদিন ও কথাই হচ্ছিল যে 'শেষ দেখা'ই আপনার মাষ্টারপিস্। নামটাও আপনি দিয়েছেন, আহা ! সেলও হয়েছিল তেমনি বাজারে··· এক নিঃশ্বাসে বলে দম নিয়ে রায় বাহাদুরের দিকে একবার তাকালাম। আরও বলব কিনা দেখবার জন্যে।

এ কি ! রায় বাহাদুর কোথায় খুসীতে ডগমগ হয়ে যাবেন, তা না তাঁর চোখ দু'টো আস্তে আস্তে যেন কেমন হয়ে গেল। তাতে খুসীর লেশ মাত্র নেই। বললেন, 'আপনি 'শেষ দেখা' পড়েছেন ? পড়লেন কি করে ? আমি তো এক চাপ্‌টার লিখেছি সবে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখি, তাই শেষ হ'তে একটু দেরী লাগে। আ আপনি বলছেন··· !' রায় বাহাদুর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা শেষ করে কেমন একটা কড়া মুখ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর হঠাৎ এক দৃষ্টিতে আমার ব্যাগটার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

কি সর্ব্বনাশ !

পরের ব্যাপারটা যা খুসী তোমরা ভেবে নাও। কি জানাচ্ছি যে আমার দালালীগিরি করা সেই দিন ল তা তোমাদের কিছু জানাব না। শুধু এইটুকু খতম্।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

কাল বৈশাখী

গরমের সুরুতে—অর্থাৎ সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে কেলের দিকে কাল বৈশাখীর কথা তোমরা সবাই জান। ল বৈশাখী মানে হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি,—বৈশাখ মাসে হয় বলে নাম। কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ হয়তো বিকেলের ক দেখা গেল—পশ্চিম আকাশে কালো হয়ে মেঘ জমে ল, থেকে থেকে সুরু হ'ল বিদ্যুৎ চমকানো আর গর্জ্জন। তার পরেই হঠাৎ ধূলো উড়িয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। সময়ে সময়ে বা শিলাবৃষ্টি।

নদী, সমুদ্র, খাল-বিল থেকে সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এ খবর তোমরা সবাই জান। বাতাসের মধ্যে এই জলীয় বাষ্প সর্ব্বদাই মিশে আছে—কিন্তু তা বাতাসের মতই স্বচ্ছ বলে আমরা চোখে দেখতে পাই না। কেবল মাত্র যখন সে বাতাস কোন কারণে ঠাণ্ডা হয়ে যায়—তার ভিতরকার জলীয় বাষ্পও তখন জমে গিয়ে খুব ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়—তখনই তা চোখে টের পাওয়া যায়। মেঘ জিনিষটাও এই রকম ঠাণ্ডায় জমা বাতাসের জলকণা ছাড়া আর কিছু নয়। বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরে রাখবার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সে সীমাও আবার আর হাওয়ার উত্তাপের উপর নির্ভর করে। গরম বাতাস যতটা জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে, সে বাতাস ঠাণ্ডা হ'লে অতটা পারে না। এই জন্য গরম বাতাস যখন কোন কারণে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তখন তার ভিতরকার জলীয় বাষ্পও খানিকটা বেরিয়ে আসে এবং অতি ক্ষুদ্র আকারের জলকণা রূপে আকাশে ভেসে বেড়ায়। এই ভ মেঘের জন্ম হয়। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, আকাশে মেঘ,—বিশেষ ক'রে সাদা মেঘ, ভেসে বেড় একটু পরেই তা কোথায় মিলিয়ে গেল ! ব্যাপারটা কিছু নয়, বাতাস ঠাণ্ডা হওয়ায় তার শরীর থেকে বাষ্প বেরিয়ে যে মেঘের সৃষ্টি হয়েছিল, বাতাস আ হঠাৎ গরম হওয়ায় তার জলীয় বাষ্প ধরে রাখবার ক্ষ বেড়ে গেছে, মেঘের জলকণাগুলোও গরমে বাষ্প তাই আবার বাতাসে মিশে গেছে।

সব মেঘ থেকেই যে বৃষ্টি হয় তা যেন মনে ক'র মানুষের মধ্যে যেমন নানা জাতের লোক আছে—সাদা, কেউ কালো, কেউ তামাটে—এবং তাদের চলন, রীতিনীতিও যেমন আলাদা, মেঘেদের ে অনেকটা তাই। সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না, আষাঢ়-ম মাসের আকাশে যে ঘন মেঘ দেখা যায় তা থেকে প্রচু হয়—অনেক সময় সারা দিন সারা রাত ধরে তা থ চায় না। কাল বৈশাখীর মেঘের তেমনি বিশেষত্ব ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎবর্ষণ এবং সময় বিশেষে শিলাবর্ষণ। ে ভিতরকার জলকণাগুলো তার মধ্যে স্থির হয়ে থাকে মেঘের ভিতরেই ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। কাল বৈশ মেঘের ভিতরকার জলকণা, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ে সময় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বা তারও বেশী বেগে ছুটে করে। ঐ ছুটোছুটির সময়ে ঘষাঘষির ফলে ভেঙে

মেঘের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন হয়—যার ফলে সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ আর তার প্রচণ্ড শব্দ—যাকে মেঘের ডাক মনে ক'রে আমরা অনেকে ভয় পাই—এবং 'মেঘ-গরজন' নাম দিয়ে যার নামে কবিরা কবিতা লেখেন। ঐ বিদ্যুতের চিড়িক এবং গর্জ্জনকেও কাল বৈশাখীর বিশেষত্ব বলতে পার। ঝড়টা তো বটেই।

কাল বৈশাখীর সময়ে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় বলেছি,—চলতি কথায় যাকে আমরা বলি শিল পড়া। আকাশ থেকে বরফের কুচি মুষল ধারে পড়তে থাকে, দস্যি ছেলেরা কুড়োবার জন্য ছুটোছুটি করে। শিল কুড়ানোর আনন্দ বড় কম নয়। মেঘের মধ্যে ঐ শিলা বা বরফের কুচি কি ক'রে তেরী হয় সে সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করতে ছাড়েন নি। তাঁদের মতে মেঘের মধ্যে জলকণাগুলি ছুটোছুটি করবার সময় যে সবগুলি পাশাপাশি ছুটবে তার মানে নেই, উপরে নীচে ওঠা-নামাও করতে পারে। এই ভাবে জলকণা যখন উঁচুতে উঠে যায় তখন সেখানকার ঠাণ্ডায় জমে তা শক্ত অর্থাৎ বরফের আকৃতি পায়। সেই শক্ত কণা আবার যখন নীচে নেমে আসে তখন নীচের জলীয় বাষ্প তার গায়ে কম্বলের মত জড়িয়ে যায়। সেই কণা আবার উপরে উঠলে তার গায়ে জড়ানো জলীয় বাষ্পটুকুও আবার বরফে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবে ক্রমাগত ওঠা-নামার ফলে ছোট কণাটি বেশ বড়সড় একটি বরফের কুচিতে পরিণত হয়, তার পর দলবদ্ধ ভাবে ভীম বেগে মাটীতে নেমে আসে, আর আমরা বলি শিল পড়ছে!

এখন বৈশাখ মাস। বিকেলের দিকে কোন কোন দিন পশ্চিম আকাশে তাকালে দেখবে সাদা মেঘের নীচের অংশে বা মাঝখানে এক রকম গাঢ় কালো মেঘ আস্তে জমা হচ্ছে। তখনই সাবধান হবে কারণ ঐ হ'ল কাল বৈশাখীর পূর্ব্ব লক্ষণ।

প্ল্যাষ্টিকের গল্প

আমার হাতঘড়ী বাঁধবার ফিতেটা ছিঁড়ে গিয়েছি নতুন একটা কিনতে গিয়ে দ্বিধায় পড়লাম। চাম কিনব না কাঁপড়ের (রেশমী) কিনব! প্রথমটি মজ দ্বিতীয়টি দেখতে সুন্দর। সমস্যার সমাধান করল ওয়ালা। বল্‌ল, 'তার চাইতে প্ল্যাষ্টিকের ব্যাণ্ড এ নিয়ে যান না?—দেখতেও যেমন, মজবুতও তেম দেখতে কতকটা চামড়া কতকটা রবারের মত কিন্তু অ লোভনীয় রংএর কতকগুলি ফিতে সে বার করে দি দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে তাই একটা তুলে নি আজও তা ব্যবহার করছি।

প্ল্যাষ্টিকের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। অল্প ক বছর আগেও জিনিষটার তেমন চলন হয় নি—কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জিনিষটির প্রচলন এত বিপুল বেড়ে গেছে যে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন হ ভবিষ্যতে তাম্রযুগ, লৌহযুগ, ইত্যাদির মত পৃথি প্ল্যাষ্টিক্-যুগ ব'লেও একটা সময় আসা বিচিত্র নয়।

এর কারণ আর কিছু নয়, প্ল্যাষ্টিকের তৈরী জি গুণ এক কথায় বলে বোঝান যায় না। যেমন শ মজবুত, তেমনি দীর্ঘস্থায়ী। সহজে নষ্ট হয় না, এ ক্ষয়ে যায় না, গরম-ঠাণ্ডা সমান ভাবে সহ্য করতে দামেও সস্তা। সকলের ওপর,—যে সব জিনিষ প্ল্যাষ্টিক্ তৈরী করা হয় প্রকৃতির ভাণ্ডারে অজস্র প তা ছড়িয়ে আছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কাঠ, তেল, নোনা জল—এই সব হচ্ছে প্ল্যাষ্টিক্ তৈরীর মাল। অবশ্যি তৈরী করতে কিছু হাঙ্গামা আছে। ভাবে তৈরী করা হয় সে গল্প আর একদিন বলা শুধু এটুকু জেনে রাখতে পার যে প্রথমতঃ কাঁচা মাল কতকগুলি রাসায়নিক মশলা তৈরী করা হয়। তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ রাসায়নিক মশলার কতকগুলি একত্র মিলিয়ে আসল ব্যাপারটা হাসিল করা বৈজ্ঞানিক ভাষায় ঐ ব্যাপারটাকে বলে 'পলিমারিজে

এখন, যা বলছিলাম। প্ল্যাষ্টিক্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এতটা আশাবাদী হলেন কেন? নীচে কয়েকটি জিনিষের নাম দিচ্ছি। এর কোনটার সঙ্গে কোনটার কতটা মিল তা তোমরাই বল:— এরোপ্লেনের কলকব্জা, যুদ্ধজাহাজের বিভিন্ন অংশ, টেলিফোনের যন্ত্র, রেডিওর কলকব্জা এবং বাক্স দুই-ই, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ব্যাটারীর বাক্স, তামাকের পাইপ, জলের পাইপ, জানালার শার্শি, অস্ত্রোপচারের ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, পায়ের জুতো, চেয়ারের গদী, মোটরের সীট, ওয়াটার-প্রুফ, মোড়কের কাগজ বা কাপড়, জানলার ভারী পর্দা, ভ্যানিটি ব্যাগ, স্যুটকেস, খাবার প্লেট, চায়ের পেয়ালা, গেলাস, চশমা, ছাতা-লাঠি-ছুরির বাঁট, চিরুণী, ঘড়ির ফিতে, রাসায়নিক ল্যাবরেটরীর নানা সরঞ্জাম (যা আগে কেবল কাচেরই হ'ত), জামার বোতাম, নকল হীরা-জহরৎ, শক্ত সুতো, অভঙ্গুর কাচ রান্নার বাসন, জল গরম করার কেটলি, চায়ের ছাঁকনী, স্নানের টব, পুতুল, খেলনা, বাড়ী তৈরীর স্বচ্ছ ইট, ইত্যাদি। কিন্তু এর সবগুলোই আজকাল প্ল্যাষ্টিক্ দিয়ে তৈরী হচ্ছে। রূপকথার মত শোনায় না কি?

প্ল্যাষ্টিক্ নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনেক দিন থেকে চলছে, এবং এর ফলে নানা জাতীয় প্ল্যাষ্টিক আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। এদিক্ দিয়ে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। সব প্ল্যাষ্টিকের গুণ কিন্তু এক রকম নয়। ধর কোন প্ল্যাষ্টিক্ হয়তো অধিক তাপ বা শৈত্য সহ্য করতে পারে, কোনটা বা অল্পেই গলে যায়। কোনটাকে তৈরীর পরেও ইচ্ছে মত ভেঙ্গে বা গালিয়ে চালাই ক'রে নতুন চেহারা দেওয়া যায়,—নানা রং মিশিয়ে লোভনীয় রূপ দেওয়া যায়। আবার কোনটা একবার তৈরী হয়ে গেলে আর তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। চেহারাও যে তাদের বিভিন্ন তা তো আগেই বলেছি। শক্ত, নরম, রবারের মত বা সময় বিশেষে তরল প্ল্যাষ্টিক্ও দেখা যায় বা ইচ্ছে মত তরল ক'রে নেওয়া যায়। বিভিন্ন কাঁচা মাল থেকে তৈরী প্ল্যাষ্টিকের গুণও অনেক সময় বিভিন্ন হয়।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্ল্যাষ্টিক্কে নানা কাজে লাগান হয়েছিল। বিশেষ ক'রে এরোপ্লেন আর যুদ্ধজাহাজ তৈরীর ব্যাপারে। একটি যুদ্ধজাহাজে এই রকম প্ল্যাষ্টিকে ৫০,০০০টি অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল। যুদ্ধ প্ল্যাষ্টিক্ নিয়ে গবেষণাও তাই কম হয় নি। লোহা পাতি, কলকব্জা অনেক সময় মরচে ধরে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তরল প্ল্যাষ্টিকের মধ্যে সেগুলির গায়ে একটা প্ল্যাষ্টিকের জামা বা আবরণ নিয়ে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেছে।

যুদ্ধ থামবার পর বেসামরিক ব্যাপারেও ব্যবহার ভীষণ রকম বেড়ে গেছে। বলা বাহুল্য আমেরিকাই এ বিষয়ে সব চেয়ে অগ্রণী। সেখানে দেখতে বহু বড় বড় প্ল্যাষ্টিকের কারখানা গড়ে এবং উঠছে। পুরোনোগুলোও বড় হচ্ছে। দেখলাম, সম্প্রতি এই রকম একটি কোম্পানী ব্যবসা বাড়াবার জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা কে জানে হয়তো প্ল্যাষ্টিক্-যুগ আর খুব দূরে নেই!

পাখীদের দৌড়ের পাল্লা

পাখীরা আকাশে উড়ে বেড়ায় কিন্তু সব পাখী ক্ষমতা সমান নয়,—গতিবেগও বিভিন্ন। আমরা যে সব পাখী দেখি তার মধ্যে পায়রা একটি পাখী। যুদ্ধের সময় সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রা কাজে লাগান হয় এ খবর হয়তো তোম হাল্কা কৌটোর মধ্যে চিঠি পুরে সেই কৌটো পায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক সময় পায়র ছোট্ট ক্যামেরা বেঁধে গোপনে শত্রুপক্ষের ফ নেওয়ারও রেওয়াজ হয়েছে। পরীক্ষা ক'রে দে এই সব পায়রার গতিবেগ সাধারণতঃ ঘণ্টায় মাইল। অর্থাৎ দ্রুতগামী রেলগাড়ী বা মোট নেহাৎ কম নয়।

পায়রা ছাড়া অন্যান্য দ্রুতগামী পাখী নিয়েও গবেষণা করেছেন। তা'তে জানা গেছে পাখী এক জাতের শকুনি—বার্ডেড ভালচার (দ শকুনি? হচ্ছে সব চেয়ে দৌড়বাজ (বা ঠিক ভা বলতে হয় 'উড়নবাজ')। এরা ঘণ্টায় প্রায় ১০ ১১০ মাইল বেগে উড়তে পারে। অর্থাৎ এ সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়া এদের পক্ষে অস

আল্পস্ পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় এই জাতের শকুনি দেখা গেছে।

সোয়ালো পাখীদের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ! এদেরও উড়বার বেগ নেহাৎ কম নয়—ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১০৫ মাইল। পেলিকান্ পাখী (গলায় বিরাট থলি-

যুদ্ধের সংবাদবাহী শিক্ষিত দ্রুতগামী পায়রা

ওয়ালা মাছখেকো এই পাখী চিড়িয়াখানায় অনেকে দেখে থাকবে) ঘণ্টায় ৫০ মাইল যেতে পারে। আর আমাদের পরিচিত দাঁড়কাকও খুব হেলাফেলার নয়—ঘণ্টায় ৪০ মাইল তার গতিবেগ।

পাখীদের মধ্যে উটপাখী সবচেয়ে বড়। এদের উড়বার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ছুটবার ক্ষমতা আছে। ডাঙ্গার ওপর দিয়ে এরা ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারে।

সমুদ্রের ড্রাগন

ড্রাগন নামে কাল্পনিক এক জীবের কথা সেকালের লোকেরা বিশ্বাস করত। ড্রাগনের অনেক কাহিনী তোমরাও হয়তো শুনেছ। শুধু ডাঙ্গার ড্রাগন নয়, প্রাচীন লোকেদের মধ্যে সামুদ্রিক ড্রাগনের কাহিনীও প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ বলতেন—সামুদ্রিক মহাসর্প; তা ব'লে সমুদ্রে যে ছোটখাট সাপ দেখা যায় (পুরীতে সমুদ্রের ধারে ঢেউয়ে ভেসে আসা এ রকম সাপ যারা পুরী গেছ তা... অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে) তা নয় কিন্তু। বিরা... আকারের জলদৈত্যের মতই ছিল এ 'সাপ' সম্বন্ধে লোকে... ধারণা। যেমনি বীভৎস, তেমনি হিংস্র।

ড্রাগন জীবটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ যুগের লোকে অবা... আর বিশ্বাস করে না—কিন্তু সমুদ্রের সম্পূর্ণ রহ... আজও মানুষের অজ্ঞাত। সুতরাং ঠিক ড্রাগন ... হ'লেও ওর কাছাকাছি কোন সামুদ্রিক জীব বা... জগতে থাকা যে একেবারে অসম্ভব এ কথা জো... ক'রে বলা যায় না। মানুষের কল্পনাকেও ছাড়ি... গেছে এমন অনেক 'রহস্যই' ক্রমে ক্রমে সমু... থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

১৯০৫ সনে ভলহাল্লা নামে একখানা জাহা... ব্রেজিলের কাছাকাছি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছিল... জাহাজের নাবিকেরা ঐ সময়ে একটি অতিকা... প্রাণীকে চকিতের জন্য জলের ওপর মাথা তুল... দেখতে পায়। আকারে এবং আকৃতিতে জীব... সঙ্গে নাকি শুধু সামুদ্রিক ড্রাগনেরই তুল... করা চলে। এর পর বহুদিন ও সম্বন্ধে আ... কিছু শোনা যায় নি। তার পর ১৯১৭ সনে আই... ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূব দিয়ে হিলারি নামে একখানা জাহা... আসছিল। হঠাৎ দেখা গেল, জাহাজ থেকে মাত্র ... গজ দূরে একটি অদ্ভুত আকৃতির কুচকুচে কা... জানোয়ার জল থেকে মাথা তুলে ঘুরে ঘুরে জাহাজটি... দেখছে। জন্তুটির মাথাটা অনেকটা গরুর মত দেখতে... অবশ্যি তা'তে শিং-টিং কিছু নেই। সেই মাথার নী... লম্বা গলা। সে গলাও লম্বায় কম ক'রে ২০।২১ ফুট... কম হবে না। এ ছাড়া তার পিঠের তিনকোণা এক... চকচকে ডানাও জলের খানিকটা ওপরে উঁকি মারছি... জাহাজশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে এই অদ্ভুত জীবটি... লক্ষ্য করতে লাগলেন। এই কি তবে সেই সামু... মহাসর্প বা সমুদ্রের ড্রাগন! জাহাজের ক্যাপটেন্ ... ধৈর্য্য ধরতে পারলেন না, জন্তুটি একটু দূরে যে... জাহাজ থেকে তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়া হ'... গুলি গিয়ে তার দেহে আঘাত করা মাত্র জন্তুটি ...র সেই যে ডুব দিল আর তার সন্ধান পাওয়া ... না। জাহাজের আরোহী ক্যাপটেন্ ডিন্ সুবিখ্যাত বৈজ্ঞা-নিক পত্রিকা "নেচার"-এ এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছি... কিন্তু তার পর আজও প্রাণিতত্ত্ববিদদের কাছে ব্যা... 'রহস্য'ই রয়ে গেছে।

বাংলাকে চিনতে শেখ

ব্যাণ্ডেল

শ্রীগৌরী দেবী

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলপথে সোজা ...শ্চিমে যেতে হ'লে নৈহাটী-ব্যাণ্ডেল হয়ে যাওয়া যায় ...খবর তোমরা নিশ্চয়ই রাখ। যাঁরা বি. এ. আর রেলপথে ...র্ব বা উত্তর বঙ্গ থেকে পশ্চিমে যেতে চান তাঁরাও ...নেকেই কলকাতায় এসে শিয়ালদহে নেমে, সেখান ...কে হাওড়া গিয়ে ই. আই. আর-এর গাড়ীতে উঠবার ...টি স্বীকার করতে চান না। বি এ. আর-এর নৈহাটী ...জায়গাটি গঙ্গারই উপরে। আর সেখানেই নদীর উপর রয়েছে এক মস্ত পোল—'জুবিলী সেতু'। নদীর ওপারে ব্যাণ্ডেল। আর ঐ ব্যাণ্ডেল হচ্ছে ই আই আর-এর প্রধান রেলপথের একটি স্টেশন। কাজেই নৈহাটী থেকে ট্রেনে গঙ্গা পার হয়ে ব্যাণ্ডেল দিয়ে সহজেই পশ্চিমে যাওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেল নামটি হয়তো এই জন্যেই তোমাদের পরিচিত এবং ঐ স্টেশন দিয়ে তোমরা অনেকেই হয়তো অনেক বার যাতায়াত করেছ। কিন্তু কখনও ওখানে নেমে ব্যাণ্ডেল জায়গাটি ঘুরে দেখেছ কি?

ব্যাণ্ডেল কিন্তু একটি ঐতিহাসিক জায়গা। মোগল-...গর এবং পর্তুগীজ আমলের বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে ওর ...ম বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যাণ্ডেলের পাশেই ...লী সহর, এবং এই হুগলী বন্দর যে এক সময়ে বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে ...র নিশ্চয়ই জান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ব্যবসা-সূত্রে বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং হুগলীতে একটি কুঠি এবং পরে দুর্গ তৈরী করে। হুগলীর মালিক এ...

ব্যাণ্ডেলের বিখ্যাত পর্তুগীজ গীর্জ্জার ভিতরকার একটি

তারাই ছিল, সেই সঙ্গে ব্যাণ্ডেলও ছিল তাদের ... সম্ভবতঃ 'বন্দর' কথা থেকে ব্যাণ্ডেল শব্দটির সৃষ্টি হ... যাই হোক্, এই ব্যাণ্ডেল সহরেই ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে...

হয় বাংলার সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় গীর্জ্জা। পর্ত্তুগীজরা ছিল রোমান্ ক্যাথলিক্ কাজেই এই গীর্জ্জাটিও ছিল ক্যাথলিক্ গীর্জ্জা।

সম্রাট্ শাজাহানের আমলে মোগলদের সঙ্গে পর্ত্তুগীজদের খিটিমিটি বাধে। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের জন্যই বিশেষ ক'রে এই ব্যাপারটি হয়। সুবেদার কাশেম খাঁর অধীনে একদল শিক্ষিত মোগল সৈন্য এসে হুগলী অবরোধ করে। ৩।৪ মাস অবরোধের পরও যখন পর্ত্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করল না তখন মোগলেরা এক কৌশল অবলম্বন করল। ব্যাণ্ডেলের এই গীর্জ্জা ঘিরে ছিল পরিখা। মোগলেরা পরিখার জল সেঁচে ফেলে সেখানে বারুদ পুঁতে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। বিস্ফোরণের ফলে প্রাচীরের খানিকটা অংশ উড়ে গেল, মোগল সৈন্য সহজেই সেই ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এর পর মোগলদের সঙ্গে পর্ত্তুগীজদের একটা বড় রকম যুদ্ধ হয়—বহু পর্ত্তুগীজ নিহত হয়, বন্দী হয় আরও বেশী। হুগলী দুর্গ ও ব্যাণ্ডেলের এই গীর্জ্জা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

নদীর উপরেও কতকগুলি পর্ত্তুগীজ জাহাজ ছিল। মোগলদের সঙ্গে তাদেরও প্রবল যুদ্ধ হয়ে গেল। হুগলীর এই জলযুদ্ধ ইতিহাসবিখ্যাত। শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই দেখে পর্ত্তুগীজরা বারুদ দিয়ে নিজেদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে অনেকগুলি জাহাজ পর্ত্তুগীজ আরোহী সমেত গঙ্গাগর্ভে ডুবে যায়। মোগলেরা ওর কাছাকাছি গঙ্গার উপর একটা পোল তৈরী করে নিয়েছিল—সেটিও সেই আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ হয়েছিল—তাই ইতিহাসের পাতায় জায়গাটি এত উল্লেখযোগ্য।

পর্ত্তুগীজরা অবশ্য পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত গীর্জ্জাটি আমূল সংস্কার করে নিয়েছিল। আজও এই গীর্জ্জাটি বাংলার প্রাচীনতম গীর্জ্জা রূপে দাঁড়িয়ে আছে—এবং স্মৃতি একটি দেখবার মত জিনিষ। গীর্জ্জাটি শুধু আকারেই নয়, ভিতরেও অনেক দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে। দেয়ালের বহু উৎকৃষ্ট ছবি—এবং বিশেষ করে যীশু ও তাঁর মা মে মূর্ত্তি দেখবার জিনিষ। আজও এখানে রীতিমত উপা হয়, বহু ধর্ম্মপ্রাণ ক্যাথলিক খৃষ্টান মনস্কামনা পূর্ণ করার এখানে আসেন, মানত করেন, যীশু ও মাতা মে আরাধনা করেন।

গীর্জ্জাটি ঠিক গঙ্গার উপরেই। একটা স্নিগ্ধ, আবহাওয়া জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে। যারা কলকা কাছাকাছি থাক তারা সুযোগ পেলে একদিন এটি দে আসতে ভুল না। কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ মাইল প

গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে কয়েকটি কবরের পাশে এ বিরাটাকার প্রাচীন জাহাজের পোড়া মাস্তুল পে আছে। সম্ভবতঃ জলযুদ্ধের সময় যে সব জাহাজ হয়েছিল এটি তারই কোন জাহাজের অংশ। এ অবশ্যি একটা গল্পও প্রচলিত আছে। এক পর্ত্তু নাবিক বঙ্গোপসাগরে জাহাজ নিয়ে যাবার সময় ঝড়ে প উদ্ধারের কোন উপায় না দেখে সে মাতা মেরীর প্রার্থনা ও মানত করতে থাকে। ঝড় থামলে দেখা সে এই বন্দরে এসে হাজির হয়েছে। মানত রাখবার সে এই মাস্তুলটি খুলে গীর্জ্জায় উপহার দেয়।

ব্যাণ্ডেলের দ্রষ্টব্যের মধ্যে এই গীর্জ্জাটিই প্র এর অনতিদূরেই হুগলী সহর, এবং সেখানেও অ কিছু দেখবার আছে। তা ছাড়া এর কাছাকাছি একটি বিখ্যাত গ্রাম আছে দেবানন্দপুর। বাংলার দু খুব বড় সাহিত্যিক—কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হিসাবে গ্রাম বাঙ্গালীর একটি তীর্থক্ষেত্র। সেখানে গেলে তঁ স্মৃতিচিহ্নও দেখতে পাবে।

রুরু

(পুরাণের গল্প)

শ্রীরাধারাণী দেবী

সেকালে এক মহাশক্তিশালী দানব ছিল, তার নাম ল রুরু। রুরুর যেমন ছিল শক্তি, তেমনি ছিল জেদ। যা করবে মনে করত কিছুতেই তা থেকে তাকে কেউ রস্ত করতে পারত না।

একদিন রুরু হিমালয়ে গেছে বেড়াতে, হঠাৎ দেখল ক পরমাসুন্দরী কন্যাও সেখানে বেড়াচ্ছে। অমন দর চেহারা রুরু এর আগে কোন দিন দেখে নি। ই সে অবাক্ হয়ে ভাবতে ভাবতে ফিরে এল। বাড়ী স তার মনে হ'ল, অমন সুন্দরী মেয়েকে, যে ভাবে হোক্, য়ে করতেই হবে।

এখন, মেয়েটি আর কেউ ন'ন,—স্বয়ং হিমালয়ের কন্যা র্ব্বতী। মহাদেবের সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্ব্বেই বিয়ে হয়ে ছে।

রুরু প্রথমটা এ খবর জানত না, কিন্তু কিছুদিন পরেই জানতে পারল তার পছন্দসই পাত্রীটি কে। পরিচয় জেনেও কিন্তু সে কিছুমাত্র দমল না। তার জেদ পার্ব্বতীকেই সে বিয়ে করবে—তা তিনি শিবের স্ত্রীই হোন আর যেই হোন।

কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব! রুরুর অবশ্যি শক্তি কম ছিল না কিন্তু কাজটিও তো নেহাৎ সহজ নয়। অবশেষে সে ঠিক করল তপস্যার বলে সে পার্ব্বতীকে লাভ করবে। এই ভেবে সে সুরু করে দিল ভীষণ তপস্যা—ব্রহ্মার তপস্যা; ব্রহ্মাই তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

না খেয়ে না দেয়ে, কঠোর শীত-গ্রীষ্ম তুচ্ছ ক'রে, দিনের পর দিন রুরু তপস্যা করে চলেছে। এমনি ভাবে কেটে গেল এক এক করে অযুত বছর। তার তপস্যা দেখে দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। ব্রহ্মাও স্থির থাকতে পারলেন না, এসে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি বর চায়।

রুরু বললে, "আমাকে এই বর দিন যেন আমি পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে পাই, আর মহাদেব ও অন্য দেবতারাও যেন আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন।"

"অসম্ভব বর। পার্ব্বতী জগতের জননী, তোমার জননী। এ বর দেওয়া যায় না। তুমি অন্য বর চাও।"—ব্রহ্মা বললেন।

কিন্তু রুরু নাছোড়বান্দা। এ ছাড়া অন্য কোন তার চাই না। তার কিসের অভাব? পার্ব্বতীকে ব করতে পারলেই তার সব সাধ পূর্ণ হবে।

ব্রহ্মা বিরক্ত হয়ে বর না দিয়েই চলে গেলেন।

রুরু কিন্তু থামল না। আবার তপস্যা সুরু করে দি এবার আরও কঠিন তপস্যা। তার তপস্যার তেজে স মর্ত্ত্যে আগুন জ্বলে উঠল।

মহাদেব এত দিন কিছু বলেন নি। এবারে আর করতে পারলেন না, পার্ব্বতীকে সব কথা খুলে বল্লে শুনে পার্ব্বতী বল্লেন, "বটে? রুরুর সাধ মেটাচ্ছি।"—ব'লে তিনি খড়্গ নিয়ে রুরুর উদ্দেশে রওনা হলে পথে একটা সিংহ একটা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করছি পার্ব্বতী সিংহটাকে বধ করে তার চামড়াটা নিলেন কো জড়িয়ে, আর তার রক্ত নিয়ে নিজের মাথায়, চুলে সর্ব্বাঙ্গে মাখলেন। তখন তাঁরও চেহারা হ'ল দান মতই ভয়াবহ।

যে গুহায় রুরু তপস্যা করছিল পার্ব্বতী সেখানে হাজির হলেন, তারপর পদাঘাতে গুহার কপাট ে হুঙ্কার দিয়ে রুরুকে বললেন, "তুই যার জন্যে তপস্যা কর আমিই সেই। সাহস থাকে এগিয়ে আয়।"

পার্ব্বতীর সেই বিকট মূর্ত্তি দেখে রুরু শুধু অব হ'ল না, ভয়ও পেয়ে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে উদ্ধত বলল, "মিথ্যাবাদী, পার্ব্বতীকে কি আমি চিনি না? স সুন্দরী ত্রিভুবনে কোথাও নেই। ভাল চাস্ তো শীগ

এখান থেকে সরে যা, আমার তপস্যায় বাধা দিস না। নইলে এখনই তোকে বধ কর্ব।" বলতে বলতে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে রুরু এক ভীম গদা ছুঁড়ে পার্ব্বতীকে আঘাত করল।

পার্ব্বতীও রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর খড়্গের আঘাতে রুরুর শরীর থেকে অজস্র ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। রুরু তপস্যার বলে সেই রক্তবিন্দু থেকে রাশি রাশি দানব সৈন্য সৃষ্টি করল। তখন পার্ব্বতীও মায়াবলে সৃষ্টি করলেন অসংখ্য স্ত্রীসৈন্য। দুই পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম সুরু হ'ল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দানবেরা আর পেরে উঠল না। স্ত্রীসৈন্যেরা তাদের ধরে ধরে গিলে ফেলতে লাগল। রুরুর রক্ত আর মাটীতে পড়বারও সুযোগ পেল না। রুরু ভয় পেয়ে যুদ্ধ ছেড়ে লাগাল দৌড়। সে কি সোজা দৌড়! স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল সে চষে বেড়াতে লাগল। পার্ব্বতী তার পেছন পেছন তাড়া করলেন।

শেষে দানব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পার্ব্বতী খড়্গ দি তার মাথা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। পর ফিরে এলেন স্বামীর কাছে। রুরুর আর তাঁকে করার সাধ পূর্ণ হ'ল না।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুরা,

এই সংখ্যায় রামধনু কুড়ি বছরে পা দিল। রামধনুর এই শুভ জন্মদিনে তার অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নতুন বছরের অভিনন্দন জানিয়ে তোমাদের কাছ থেকে এবারে যত চিঠি পেয়েছি সে রকম বহুদিন পাই নি। ইচ্ছা করছিল সব চিঠি এখানে তুলে দিই—রামধনুর প্রতি তোমাদের স্নেহ ও আগ্রহের নিদর্শন হয়ে থাক্ এ সংখ্যা। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়—অত স্থান কোথায়? তাই রামধনু মারফৎ তোমাদের ধন্যবাদ জানান ছাড়া আর কিছু করা গেল না। চিঠিগুলির মধ্যে শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত, শ্রীকল্যাণ কুমার সেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়, শ্রীবনশ্রী দত্ত, শ্রীসেবা দেবী, শ্রীঅপরাজিতা বরা, নূরজাহান বেগম, শ্রীনন্দিতা চৌধুরী, শ্রীকনকলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশুভ্রা মিত্র, শ্রীসরোজ গুপ্ত, শ্রীরেণুকণা কুমার, শ্রীবন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজলুর রহমান প্রভৃতির লেখা চিঠি ও অভি খুব ভাল লাগল।

কাগজের বিভ্রাট এখনও মেটে নি। তার স্থানীয় বন্দর ও কাগজের কারখানায় দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট চ থাকায় নিউজ্ প্রিণ্ট, সাদা কাগজ—সবই দুষ্প্রাপ্য পড়েছে। 'প্রথমটি তো দীর্ঘদিন ধরে একেবারেই পা যাচ্ছে না। যুদ্ধ থেমে গেল, অথচ আমাদের ঝঞ্ঝাট মিটল না! রামধনুর চেহারা শীগ্‌গিরই ফেরাতে আশা করেছিলাম—এখনও তা অনির্দ্দিষ্টই রয়ে এই সব কারণে মাসের ঠিক ১লা পত্রিকা প্রকাশ করাও হ'ল না। তার ওপর সহরে অস্বাভাবিক আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছ।

আমাদের গ্রাহিকা শ্রীউষসী সেনগুপ্তা প্রবে পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, গ্রাহক শ্রীমনোজ রা শ্রীশুকদেব বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন খেলাধূলায়। অভিনন্দন জানিয়ে আজ চিঠি শেষ করি। —রা

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

দুপুর বেলা

শ্রীচম্পা মুখোপাধ্যায়

শান্ত, নীরব দুপুর বেলা দূরে বাঁশের বনে
ঝড়ো হাওয়া গুমরে মরে কেই বা তাহা শোনে!
ঘূর্ণি হাওয়া উড়িয়ে নে' যায় পথের রাঙ্গা ধূলি,
শিউলি গাছের ছায়ায় খেলে শালিখ পাখীগুলি।
অশথতলার পাশ দিয়ে ঐ দীঘির উঁচু পাড়ে
খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়াল, ছোট্ট কাহার কুঁড়ে।
চাল বেয়ে তার উঠেছে ঐ কুমড়ো গাছের লতা,
এধার ওধার পড়ছে খসে শুক্‌নো অশথ পাতা।
লাল ধূলার ঐ সপিল পথ গেছে অনেক দূরে,
মনটা কেমন করে আমার ঘুঘুর উদাস সুরে।
আম গাছেরই ছায়ায় হোথা বসে কে এক বুড়ো
ঝুড়িতে তার করছে যত শুক্‌নো পাতা জড়ো।
এই আমারও একদিন ত' অমনি বয়স হবে—
অতীত দিনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু না রবে।
ঐ বুড়োরই কুড়োনো ঐ শুক্‌নো পাতার মত
আমিও সেদিন করব জড়ো অতীত স্মৃতি যত।
এমনি কত দুপুর বেলা আসে আমার কাছে,
তাই ত' তারে শুধুই দেখি—হারাই কিছু পাছে।

জানবার মত

শ্রীঘোরপ্যাঁচ

সংবাদপত্র যে কাগজে ছাপা হয় তার নাম "ি প্রিণ্ট"। এই কাগজ তৈয়ারী হয় কাঠের মণ্ড হ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাঠের মণ্ড পাওয়া যায় ক্যা নোভাস্কেরিয়া জায়গা হ'তে।

আরশোলার কান তাদের শুঁড়ের মধ্যে। মাথার দিকের শুঁড়ে নয়, পিছন দিকের শুঁড়ে। অ শুঁয়োপাকা শুনতে পায় তাদের গায়ের শুঁয়ো কোন কোন জাতীয় গঙ্গাফড়িংএর কান পায়ের মধ্যে। তাদের সামনের দিকের পায়ে থাকে তা দিয়ে তারা শুনতে পায়। যাহক আমর ফড়িংয়ের ডাক বলি তা তাদের কণ্ঠস্বর নয়, গ শব্দ করে তাদের করাতের মত পা তাদের ডানার দিকের পাতলা পর্দ্দায় ঘষে ঘষে। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীই এই ভাবে ডাকে।

বাতাসে ধূলো আছে বলেই আকাশ নীল সূর্য্যোদয়ে আর সূর্য্যাস্তে আকাশে যে রংয়ের খে যায় তাও ঐ ধূলোর জন্যে। বাতাসের এই ধূ মেঘ আর কুয়াসা সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি দিল্লীতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'পুরানা কেল্লায়' সম্মারোহের সঙ্গে আন্তঃ এসিয়া সম্মেলন হয়ে গেল। মহা-যুদ্ধের পর এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে একটা নব জাগরণের সাড়া দেখা যাচ্ছে—এই সম্মেলন তারই প্রতীক। পণ্ডিত জওহর-লালের উদ্যোগে এই সম্মেলন হয়। সভানেত্রী হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা সরোজনী নাইডু। এসিয়ার প্রায় সম থেকেই প্রতিনিধিরা এসে এই সম্মেলন সার্থ তোলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ২৫০।

* * *

আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের হেনরি ফোর্ড

৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টা ও প্রতিভার বলে তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়েছিলেন। বিখ্যাত 'ফোর্ড' মোটর গাড়ীর নাম তোমরা সবাই জান, হেনরি ফোর্ড ছিলেন তারই কারখানার মালিক। ফোর্ডের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনী তোমাদের বারান্তরে শোনাব।

* * *

সম্প্রতি স্যর আজিজুল হকের মৃত্যু হয়েছে। বাংলার মন্ত্রী, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার, বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য, বিলাতের ভারতীয় হাই কমিশনার প্রভৃতি নানা উচ্চ পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর থাকার সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল শান্তিপুরে। বর্ত্তমান বাংলার কৃতী মুসলমানদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

কলকাতায় আবার নতুন ক'রে হাঙ্গামা সুরু হওয়ায় নাগরিক জীবন পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। হাঙ্গামার জন্য কলকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগ্ প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেছে, বাইটন প্রতিযোগিতাও পরিত্যক্ত হয়েছে। ফুটবল লীগ্ও হতে পারবে বলে মনে হয় না। ক্রীড়ামোদীর কাছে খবরটি সুখের নয় নিশ্চয়ই।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক মহাত্মা গান্ধী নো... খালি থেকে বিহা... গিয়ে সেখানকা... দাঙ্গাবিধ্বস্ত অ... ঘুরে বেড়াচ্ছিলে... সঙ্গে ছিলেন "সীম... গান্ধী" খান আ... গফ্ফুর খান। ... মধ্যে গান্ধীজি ... বার বড়লাটের ... আলোচনার ... দিল্লী যান ও ... এসিয়া সম্মেল... বক্তৃতা দেন। আ... তিনি বিহারে ... গেছেন।

মহাত্মা গান্ধী ও সীমান্ত গান্ধী

* *

বিহারের কংগ্রেস-নায়ক অধ্যাপক আবদুল বা... মৃত্যুর খবর হয়তো তোমরা শুনেছ। দেশের জন্য উ... প্রাণ এই কর্ম্মবীরকে শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে নি... হ'তে হ'ল এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা এই রকম হবে :—

স্নেহের আদিত্য,

বহু কাল গত হল তোমাদের সবাইকার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে সময় কাটাচ্ছি। পরন্তু একবার জামাই বাবুর দেখা পেয়েছিলাম। আর কারুর কোন খবর পাই নি। শ্যামলাল নাকি পরীক্ষায় পাশ হয় নি! বেচারা! ওর বরাত বরাবরই এমন। যাক ও কথা। খবরাখবর দিও।

—ইতি রাঙ্গা মামা।

উত্তরদাতাদের নাম :

মীরা সেনগুপ্তা, জয়তী, অরুণ, তমাল দাশগুপ্ত (খুলনা); নবেন্দু সেন (কলিকাতা); অপরাজিতা বরা, মাধুরী, র... পাপা (দিল্লী); শশিশেখর কবিরাজ (কাশী); গৌরাঙ্গ... মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); দ্বিজেশচন্দ্র ভৌ... (বালীগঞ্জ); অমলা বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া); ডাকু, ... কিশোর, কোকিলা মৈত্র (পাটনা); উষসী সে... (ঢাকা); রেখা ও কবিতা মিত্র (কানপুর); ঝর্ণা ... (বর্দ্ধমান); শ্রীলেখা ও প্রতিমা বসু (সসারাম); ... সেন, বড়মা, মা, বঙ্গুদা (বরিশাল); শিবু, বোদো, ডলি, কমলা, মঞ্জু, মীনা, টিটি (জামসেদপুর)।

নূতন ধাঁধা ও পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

শব্দশৃঙ্খল (ক্রস্ ওয়ার্ড্ পাজ্ল্)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এই ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৭শে বৈশাখ। আমাদের প্রস্তুত উত্তরের সঙ্গে যাঁর উত্তর ঠিক ঠিক মিলবে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। একাধিক নির্ভুল উত্তর এলে পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হবে। কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকারাই উত্তর পাঠাতে পারবেন। সঙ্গে নিজের গ্রাহক নং দেওয়া না থাকলে উত্তর গ্রাহ্য হবে না।

১	২	৩	৪	৫	৬	*
৭	*	৮	*	৯	*	১০
১১	১২	১৩	১৪	*	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	*	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	*
২৯	৩০	৩১	*	৩২	৩৩	৩৪
*	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০

পাশাপাশি—১-৬ ভারতীয় চিত্রকলায় ইনি নতুন প্রাণ দেন। ১১-১২ কালো নয়, কিন্তু ফর্সার উল্টো। ১৩-১৪ শকুনি। ২০-২২ সারথির আধুনিক সংস্করণ। ২৫-২৬ সভ্যতার শত্রু। ২৯-৩০ একে রামায়ণে খোঁজ। ৩৫-৪০ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ।

উপর-নীচে—১-২৯ প্রাচীন সমাজের এ আমাদের বুকের উপর চেপে আছে। ৩-৮ নিপুণ হংসের মতন এ-টা ফেলে দিয়ে ক্ষীরটুকু নিতে শেখ। ৫-৯ জলে ভাসে অনায়াসে। ১০-২২ প্রাণ নেই, কথা বলে; ঘড়ি ধ'রে ঠিক চলে। ১২-৩০ প্রাচীন বাংলার স্বনামধন্য রাজা। ১৩ ৩১ এ-তে স্বাধীনতার শত্রুদেরই সুবিধা। ১৫-২৮ এর মধ্যে তোমরা এই ধাঁধার উত্তর পাঠাবে। ২০-৩৮ বৌদ্ধ বাংলার বিশাল কীর্ত্তি। ৩৩-৩৯ এখানে বৌদ্ধ স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন। ৩৪-৪০ কবিতার দৃষ্টি।

৮৪ বছর বয়সে পরলোক
থেকে নিজের চেষ্টা ও প্রতি
শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েছিলেন।
নাম তোমরা সবাই জান,
কারখানার মালিক। যে
তোমাদের বারান্তরে শো

*

সম্প্রতি স্যর আজিজু
মন্ত্রী; বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষ
পরিষদের সদস্য, বিলাতের
নানা উচ্চ পদে তিনি প্রতি
বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সে
প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির
তাঁর বাড়ী ছিল শান্তি
মুসলমানদের মধ্যে তাঁর

*

কলকাতায় আবার না
নাগরিক জীবন পদে পদে
কলকাতার প্রথম বিভাগে
হয়ে গেছে, বাইটন প্রতি
ফুটবল লীগ ও হতে পারে
মোদীর কাছে খবরটি সু

চিঠিখানা এই রকম
স্নেহের আদিত্য,
বহু কাল গত হল তো
ভাবে সময় কাটাচ্ছি।
পেয়েছিলাম। আর
শ্যামলাল নাকি পরীক্ষায়
বরাত বরাবরই এমন।

উত্তরদা
মীরা সেনগুপ্তা, জয়ন্ত

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

মহিম ডাকাত
বইটির আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্যিকার বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে। পাতায় পাতায় অদম্য কৌতূহল। সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য দুই টাকা।

খেলার মাঠ
নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক
একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণ মনোরম। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বালক কেশব
মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। কয়েকখানা একবর্ণ ছবি আছে। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। ৷৷৵০ আনা।

কিশোরক
দশম বর্ষ — বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ আনা
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। দুইখানা ধারাবাহিক উপন্যাস চলিতেছে। তা ছাড়া সাত সাগরের ঢেউ, মানুষের মত মানুষ, সবুজ পাতা বিভাগগুলি কৈশোরকের বৈশিষ্ট্য।

প্রাপ্তিস্থান
কৈশোরক কার্য্যালয়
৩৫।১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের — **ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি** — নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের — **অলিভার টুইষ্ট্** — ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের — **দমাদম্ দামোদর** — দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের — **অয়েল পেণ্টিং** — দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কলকাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের জন্য সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ্-গ্রন্থাবলী

পীরামিড্ সিরিজ

...নজব্বা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এত দিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্ বই প্রকাশ ক... আসিতেছিলাম। তাই সারা বাংলার উপেক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে তাঁহাদের দাবী জানাইয়াছেন বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্ বই চাই।

তাঁহাদের দাবী ও অনুরোধ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি।
ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্
মিঃ পিটার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্
মৃত্যু বরণ করিয়াও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাহাই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।
পীরামিড্ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ

চতুর জার্ম্মাণ
এইমাত্র বাহির হইল
মূল্য ১৷৷০ মাত্র

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd, No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

… বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ দ্বিতীয় সংখ্যা

রামধনু

ছোটদের

সচিত্র মাসিক পত্র

[illegible] শ্রীমতী [illegible] ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

কার্যালয়

১২, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা [illegible]

ফোন: সাউথ [illegible]

ভৌঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

২৪৩ সাপার সারকুলার রোড কলিকাতা ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লিলি ব্র্যাণ্ড

বার্লি

স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও জন-কল্যাণে

লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি

তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।

তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার **সমান আদর!**

লিলি বিস্কুট কোম্পানী : কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। ওপারের দূত—(প্রবোধ সান্যাল)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। জয়পতাকা—শৈলবালা ঘোষজায়া
৬। অভিশপ্ত ম্যামী—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—রক্ততৃষা—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—নকলের হিমালয়—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—বি, এল, এ-২০৫—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—জয়-পরাজয়—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—পূজনীয় দস্যু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—দুযোগের রাতে—শ্রীসব্যসাচি
ভাদ্র—সবই যখন অন্ধকার!—অশোক মিত্র

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান-কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

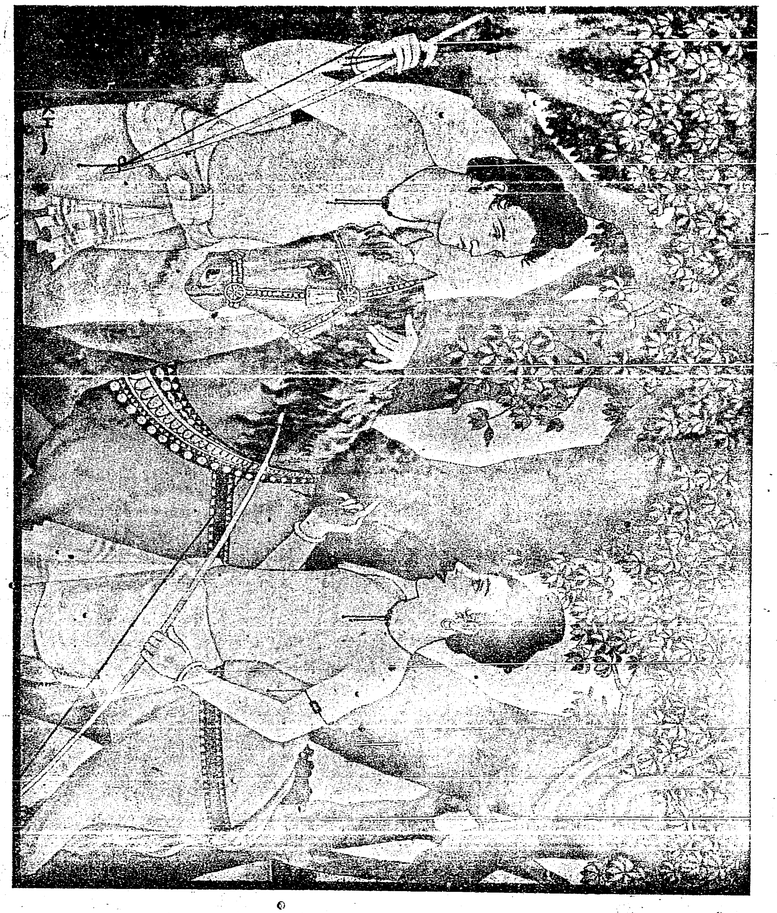

রাম-লক্ষ্মণ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

...শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ { ২য় সংখ্যা

স্বপ্নে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাগ করে দেছে জাতির রাষ্ট্র
পৃথিবী খণ্ডে খণ্ডে,
স্থানান্তরিত করিয়াছে মোরে
একেবারে ল্যাপ্ লণ্ডে।

চারি দিকে শুধু জমাট তুষার
যেন রজতের রাজ্য,
বল্গা হরিণ শ্লেজ গাড়ী টানে,
শীল মাছ ধরা কার্য্য।

তাম্বুও নয়—বরফের ঘর,
দুয়ার কোথায়?—ক্ষুদ্র ফুকর,
নয়নের বারি গড়াইয়া এসে
জমিয়া যেতেছে গণ্ডে।

নাই ঢেঁকী, নাই গম কি ধান্য,
হিম ছাতু দিয়ে করি নবান্ন,
মিলে নাকো ভাত, মিলে নাকো ধুতি,
ব্যাপার বুঝতে পারছো!

সূর্য্য উঠে না, আরোরার আঁচে
রৌদ্র পোহাই রাত্রে,
লোমের পোষাকে 'হনু' হয়ে থাকি
তবু হিম লাগে গাত্রে।
নাই টিকা, নাই কলকে কি হুঁকো,
বসে থাকি সদা হয়ে বিষমুখো,
এমন সোনার সুমেরুতে এসে
খুসী হয় জীব মাত্রে।

'হিন্দু তো তুমি?' কহে এস্কিমো,
'নাহি লজ্জার লেশ হে?
চেন না তোমার এ মাতুলালয়
"সূয্যি মামা"র দেশ যে!'
কানে খাটো আমি শুধালেম জোরে
'এ বাতুলালয়ে কে আনিল মো…
মাতুলের দেখা পাবার আগেই
ভাগিনার দফা শেষ যে!'

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

আবার রত্নহার

সূতানুটি হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গা হইতে একটি ছোট খালের মত বাহির হইয়া পূব দিকে চলিয়া গিয়াছে। দেখিতে জায়গাটা অনেকটা ফাঁড়ির মত। ফাঁড়ির মুখে দু'পাশে ঘন জঙ্গল—ছোট-বড় নানা ধরণের গাছে ভরিয়া আছে। এখানে নদীর ভাঙ্গনও বেশী। স্রোতের বেগে মাঝে মাঝে মাটি ধ্বসিয়া গিয়া ছোট ছোট খাদ অথবা গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। তার দু' পাশে ঘন হোগলা-বন—হয়তো নানা জাতের বিষধর সাপের আবাসভূমি।

জায়গাটি নির্জ্জন, আশেপাশে খুব কাছাকাছি লোকের বসতি আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু ঢেউএর একটানা ছুপ্ ছুপ্ শব্দ আর থাকিয়া থাকিয়া নানা জাতের একঘেয়ে মিঠা অথবা কর্কশ আওয়াজ জায়গাটিকে … করিয়া রাখিয়াছে। ফাঁড়ির মুখের কাছে এ… সুসজ্জিত বজরা অপেক্ষা করিতেছিল। বজরাখানি … বড়। ছাদের উপর বন্দুক হাতে পাহারারত ক… পাইক বজরার মালিকের আভিজাত্যের পরিচয় দি… বজরার সঙ্গে আরও খান দুই ছোট নৌকা পাড়ে ভি…

"ওহে সুজন সিং, দেখ তো দূরে কোন নৌকো… দেখতে পাচ্ছ কিনা?" বজরার ভিতর হইতে … কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল।

সুজন সিং একবার দূরে দিকচক্রবালে সন্ধানী …য়া লইয়া কহিল, "আজ্ঞে না হুজুর, এখনও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা হুঁসিয়ার আছি।"

…হুজুরে'র কণ্ঠের তীব্র বিরক্তি এবার আর চাপা রহিল … বজরার ভিতরের আর কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া সে …, "ডোবালে দেখছি! এই ফিরিঙ্গী বেটাদের … বিশ্বাস নেই। কি মতলব আছে কে জানে! সব …স বেটাদের,—সব মুখোস।"

…ভিতর হইতে কে বলিল, "দাঁড়ান না, আগে কাজটা …য়ে নেওয়া যাক্, তার পর দেখা যাবে ফিরিঙ্গীরা …ন ব্যবসা চালায়। সেদিন আপনি ঠিকই বলছিলেন— …শাঠ্যং সমাচরেৎ। বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুল … আর কি দাওয়াই আছে?"

…বজরার মালিক আর কেহ নয়, চাঁদপাল। পাদ্রী …টোর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আজ এই জায়গাটিই …ষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, …টোর দেখা নাই। চাঁদপাল কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী … বহুক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে, বিরক্ত হইবার …ই তো!

…হসা উপর হইতে সুজন সিংএর সাড়া পাওয়া গেল। …র কালো মত একটি বিন্দু যেন এদিকেই আগাইয়া …িতেছে!

একটু পরেই অনুমান সত্য বলিয়া বুঝা গেল। এক…নি ছিপ গঙ্গার জল কাটিয়া তীরবেগে আগাইয়া …সিতেছে। ফিরিঙ্গীর ছিপ না হইলে কি এত বেগে …সিতে পারে!

…খনিকক্ষণের মধ্যে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে …ড়াইল। কয়েকজন পর্ত্তুগীজ সৈন্য চট্‌পট্ বজরার উপর …ইয়া পড়িল। তাদের পিছন পিছন প্রৌঢ় পাদ্রী …টোও নামিলেন। চাঁদপাল আগেই বজরার ভিতর …ত বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বিব্বু আসিয়া পরিচয় …ইয়া দিল।

…বারেটো চাঁদপালের পিঠে চাপড়াইয়া কহিলেন, "আমি …নেছি। সুবেদার সাহেবকে খুব জব্দ করেছেন। … আমাদের পেছনেও লেগেছিল।"

…চাঁদপাল কৃতার্থের হাসি হাসিয়া কহিল, "সে তো …মারই জন্ম সম্ভব হয়েছে।"

এবারে কথা বলিল বিব্বু; কহিল, "যা বলেছেন। যে অদ্ভুত জিনিষ ওঁকে দিয়েছিলেন ও কি টাকায় কেনা যায়? কত দিনের—কত পরিশ্রমের ফল ও! তা ধন্যি আপনার ওষুধবিষুধের জ্ঞান বলতে হবে! আচ্ছা, বারদীঘির ওনাদের হাতে জিনিষটা পড়ল কি ক'রে—আমি তো আজও বুঝতে পারছি না!"

বারেটোই জবাব দিলেন। চাঁদপালকে দেখাইয়া কহিলেন, "এখন আর তোমাদের কাছে বলতে বাধা নেই, ওঁর সঙ্গে আমার কথা ছিল এমন একটা অদ্ভুত কিছু যোগাড় করে দিতে হবে যা দিয়ে সুবেদার সাহেবকে ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে ঘায়েল করা যায়। অবশ্যি ওর জন্য উনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজী ছিলেন। ভাবলাম এ দেশে ব্যবসা করতেই যখন আসা তখন আপত্তি কিসের! এও তো ব্যবসারই সামিল। কিন্তু কি দেওয়া যায়! শেষে মনে পড়ল চিকিৎসা ব্যাপারে নানা ওষুধবিষুধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন কয়েকটা ব্যারামের বিষ আমার জানা হয়ে গেছে যা নাকি যে কোন জায়গায় ফেললে সেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর সে এমন ব্যারাম যা শুধু আমাদের ঐ পশ্চিমের দেশেই দেখা যায়—এ দেশের লোকে তার নামও শোনে নি। ভাবলাম এই রকম কিছু বিষ পাঠিয়ে দেওয়া যাক। বিষ তৈরী করলাম, কিন্তু তার পরেই বাধল একটু গোল। গোয়ার গভর্ণর, আমার বিশেষ বন্ধু, হঠাৎ গেলেন চলে, তাঁর জায়গায় নতুন যে লোকটা এল সে বেটা এক ধর্ম্মপুত্তুর। বলে কিনা জোর-জুলুম, ডাকাতি—এ সব ছেড়ে দাও, সহজ ভাবে এ-দেশী লোকেদের সঙ্গে কারবার সুরু কর। আরে মোলো, তার মানে প্রেমধর্ম্ম প্রচারও ছেড়ে দিই আর কি! বোঝাতে গেলে বেটা উল্টো বুঝে সুরু করল তম্বী। কি করব, খোদ সম্রাট্ পাঠিয়েছেন, না করতে পারি না। শেষে এক নতুন মতলব মাথায় এল।"

একটু থামিয়া বারেটো বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইয়া লইলেন, তার পর আবার সুরু করিলেন।—"হ্যাঁ, ভাবলাম 'এক' কাজ করা যাক্—দেশ থেকে ব্যবসার ব্যাপারে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান্ রত্নহার এসেছিল—কথা ছিল খুব বড় বড় রাজা-উজীর দেখে চড়া দামে

সেগুলো ছাড়তে হবে। ভাবলাম ওরই সাহায্য নেই—সাধারণ লোকে তো আর ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। ঐ ধরণের একটি মালা"—চাঁদপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"যেন ওঁর কাছে পাঠাচ্ছি—বিক্রীর জন্য। আর সেই ফাঁপা মালার মধ্যে ভরে দিলাম সেই বিষ। মালাটির গায়ে চিহ্ন দিয়ে ব্যাপারীদের বলে দিলাম, "এ মালা চাঁদপাল সাহেবের ফরমাসি মাল; যেন আর কাউকে বেচিস নে। চার-পাঁচটা এক ধরণের মালার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যা।—অর্থাৎ যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে। বুঝলে না?

"কিন্তু এমনি কপাল, পথের মধ্যে কোন্ চটিতে বাবুরা বসলেন বিশ্রাম করতে, আর সেখানে এল ঐ বারদীঘির জমিদার বাবুর কোন্ আত্মীয়। মালা দেখে লোকটা তো তাজ্জব বনে গেল। তখনই গেল জমিদারের কাছে। আর সে বেটাও আর তিলমাত্র দেরী না ক'রে এক গাদা মোহর এনে ওটাকে কিনে ফেল্‌ল—তার সখের পুতুলের গলায় নাকি পরাবে! আমার লোক-গুলোও এমনি হাঁদা, তাড়াতাড়িতে সেই চিহ্নওয়ালা মালাটিই—যা চাঁদপাল সাহেবকে দিতে বলেছিলাম,—সেইটিই দিলে বার করে।

"ভুল ধরা পড়ল কয়কেদিন পরেই। কিন্তু তখন নাকি বারদীঘির জমিদার বাবু কি সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে সে মালা পুতুলের গলায় চাপিয়ে দিয়েছে, খুলে নেওয়া নাকি এই কাফেরদের মতে ভীষণ পাপ! কি আর করি, পাছে সন্দেহ করে তাই ভাবলাম, গায়ের জোরে বন্দুকের খোঁচায় ওটা কেড়ে আনা যাক। কিন্তু তা করতে গিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল—সেই ভূতুড়ে তীরের কথাই বলছি!—বিব্বু, তুমি তো নিজেই ছিলে হে!"

বিব্বু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, সেই ভূতুড়ে তীর না এলে অত হাঙ্গামা ক'রে, শেখরেশ্বরকে ভাঁওতা দিয়ে মালা নিতে হ'ত না। যাক্ গে, সে মালা তো শেষ পর্য্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া গেছে।"

"তা গেছে। বাহাদুরী দেখিয়েছ তুমি। তা যাক্, পাল মশাই, কি যেন জানতে চেয়েছিলেন—রত্নহার সম্বন্ধে?"

চাঁদপাল ধীরভাবে সমস্ত শুনিতেছিল, কহিল, "হ্যাঁ, আপনার পরামর্শ মত মালার সরু মটরগুলো একটা ক'রে খুলে যে গ্রামে ভাঙ্গতে বলেছি সেখানেই আপন অদ্ভুত ব্যারাম ছড়িয়ে পড়েছে। ১০।১২টা মটর গেছে। কিন্তু আপনি মাঝের ত্রিশূল-আঁকা দানাটা বারণ করেছিলেন। সেইটে সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা চেয়েছিলাম।"

"ও! ওটা দেওয়ার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল না—বিপদে পড়লে যাতে একটা সুরাহা হয় তারই জন্য দেওয়া। ওটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ওটা ফুটো তার ওপর জোরে আঘাত করলে এক রকম বিষাক্ত শব্দি ক'রে বেরিয়ে আসে আর আশপাশের সব কিছু ক'রে ফেলে। তাই ওটা সম্বন্ধে সাবধান হ'তে বলেছি —আর ভাঙ্গতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। আগে নি—কখন কোন্ আনাড়ি কি কাণ্ড বাধিয়ে ব বের করুন না মালাটা, দেখিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে এনে তো?"

চাঁদপাল ঘাড় নাড়িল; তার পর একটু ইত করিয়া জামার ভিতর হইতে সেই মহামূল্য রত্ন টানিয়া বাহির করিল। মালাটি আর তত বড় কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। মাঝ সব চেয়ে বড় দানাটির গায়ে নিপুণ হাতে আঁকা ত্রিশূল-চিহ্ন তখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। কার বুঝিতে পারে ইহার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ রহিয়াছে!

বিব্বু তারিফ করিয়া কহিল, "অদ্ভুত আপনার যা হোক!"

বারেটো হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এবারে আসল সুরু হোক্। কিন্তু তার আগে, রোসো, শুভ আলোচ আগে—মেনেলাস্, বড় বোতলটা এ দিকে নিয়ে এস —আর কয়েকটা গেলাস।"

বোতল আসিল, গেলাস সফেন তরল পদার্থে কানায় পূর্ণ হইল, এবং একটু পরেই বারেটোর দীর্ঘ বাহিয়া সেই ফেনিল রস গড়াইয়া পড়িয়া বজরার পাটা ভিজাইয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অনতিদূরের হোগলা-বন ঈষৎ ন উঠিল। পলকের জন্য মনে হইল একটা কালো

বা ঐ ধরণের কিছুর উপর একটি দীর্ঘ দেহ যেন তলা হইতে মাথা গলাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে! ণেই আচম্‌কা শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে তীর য়া বজরার উপর পড়িতে লাগিল—সেই ভূতুড়ে

্যাপারটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার আগেই একটি তীর আসিয়া চাঁদপালের হাতে, একেবারে সেই রত্নহারের উপর, গিয়া পড়িল। প্রায় বজ্রপাতের মতই বিকট একটি শব্দ! পরক্ষণেই রাশি রাশি কালো ধোঁয়ার আড়ালে বজরা ও ছিপ তার সমুদয় আরোহী সহ গঙ্গার অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীন ভারত ও ইংরাজি ভাষা

(খোলা চিঠি)

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

ষ্টার মশাইদের কাছে হয়ত তোমরা মাঝে মাঝে ত পাও যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা আগের মত করে ইংরাজি লিখতে ও শিখতে পারে না। হয় এ কথাও তোমাদের কানে এসেছে যে আমাদের —বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে—ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দ্ধতি বর্তমানে চল্‌ছে তার কোথাও মস্ত একটা গলদ ছ। তোমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যে একটা ণী ভাষার সাহায্যে কোন কিছু করতে উৎসুক নও ত সন্দেহ নেই। তোমাদের এ মনোভাব নিশ্চয়ই খুব বিক। আমাদের নিজের ভাষা যতই উন্নত হচ্ছে আমরা বুঝছি যে বিদেশী ভাষার সাহায্যে আমাদের নদিন সাধারণ কাযকর্মগুলো করা, নানা বিদ্যা শেখা কষ্টকর তা নয়, হাস্যকরও বটে। চল্লিশ পঞ্চাশ আগে আমাদের দেশে বাপ ও ছেলের মধ্যে ইংরাজি য় পত্রালাপ, সভাসমিতিতে কেবল মাত্র ইংরাজির ার—এ সবগুলো যে খুবই নিরর্থক ও লজ্জাজনক এখন আমরা তা বুঝতে পেরেছি। পরের ভাষার দিয়ে একটা জিনিষ শেখা ও শেখান যত কষ্টসাধ্য র ভাষার সাহায্যে সেটা শেখা ও শেখান যে তার অনেক বেশী সহজ তা তোমাদের কাউকেই আজ দিতে হবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তাই ক্রমেই ভাষার মধ্য দিয়ে বিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ ছেন।

তবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। সেগুলির কী উত্তর তোমরা দেবে তা জেনে নিতে চাই। আমরা, যারা কলেজে পড়াই, তারা জানি যে আজকাল যে সব ছাত্রী ও ছাত্র বি. এ, এম্. এ পড়েন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চান যে ক্লাসে বক্তৃতা যেন মাতৃভাষায় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি মাতৃভাষায় রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিকে বাহন রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা যেন চিরকালের জন্যে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে এত দিন যদি ইংরাজির কদর এ দেশে হয়ে থাকে তা হলে ভবিষ্যতে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যক আছে কি না। ১৯৪৮ সনে ইংরেজরা যদি বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কী বেঁধে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যায় তা হ'লে তার পর ইংরাজি শেখবার জন্যে পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করবার সার্থকতা কোথায়, যদি আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সব মাতৃভাষায় রচিত হয়, তা হ'লে ইংরাজির মত একটা বিদেশী ভাষা শেখবার প্রয়োজনই বা কী—ইত্যাদি।

আমাদের চোখের সামনে স্বাধীন ভারতের যে ছবি ভাস্‌ছে সেখানে ইংরাজিকে আজকালকার মত অবশ্যপঠনীয় করা হ'তে পারে না সে কথা আমরা সবাই বুঝি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি আমরা নিজের ভাষার মধ্য দিয়ে শিখব এ ইচ্ছে আমাদের সকলেরই রয়েছে। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হবার কোন কারণ দেখি না। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে আমরা যা কিছুই শিখি না কেন তা শিখব কম সময়ে, বুঝব ভাল করে।

সেগুলো ছাড়তে হবে। ভাবলাম ওরই সাহায্য নেই—সাধারণ লোকে তো আর ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। ঐ ধরণের একটি মালা"—চাঁদপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"যেন ওঁর কাছে পাঠাচ্ছি—বিক্রীর জন্য। আর সেই ফাঁপা মালার মধ্যে ভরে দিলাম সেই বিষ। মালাটির গায়ে চিহ্ন দিয়ে ব্যাপারীদের বলে দিলাম, "এ মালা চাঁদপাল সাহেবের ফরমাসি মাল; যেন আর কাউকে বেচিস নে। চার-পাঁচটা এক ধরণের মালার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যা।—অর্থাৎ যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে। বুঝলে না?

"কিন্তু এমনি কপাল, পথের মধ্যে কোন্ চটিতে বাবুরা বসলেন বিশ্রাম করতে, আর সেখানে এল ঐ বারদীঘির জমিদার বাবুর কোন্ আত্মীয়। মালা দেখে লোকটা তো তাজ্জব বনে গেল। তখনই গেল জমিদারের কাছে। আর সে বেটাও আর তিলমাত্র দেরী না ক'রে এক গাদা মোহর এনে ওটাকে কিনে ফেল্‌ল—তার সখের পুতুলের গলায় নাকি পরাবে! আমার লোক-গুলোও এমনি হাঁদা, তাড়াতাড়িতে সেই চিহ্নওয়ালা মালাটিই—যা চাঁদপাল সাহেবকে দিতে বলেছিলাম,—সেইটিই দিলে বার করে।

"ভুল ধরা পড়ল কয়কেদিন পরেই। কিন্তু তখন নাকি বারদীঘির জমিদার বাবু কি সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে সে মালা পুতুলের গলায় চাপিয়ে দিয়েছে, খুলে নেওয়া নাকি এই কাফেরদের মতে ভীষণ পাপ! কি আর করি, পাছে সন্দেহ করে তাই ভাবলাম, গায়ের জোরে বন্দুকের খোঁচায় ওটা কেড়ে আনা যাক। কিন্তু তা করতে গিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল—সেই ভূতুড়ে তীরের কথাই বলছি!—বিব্বু, তুমি তো নিজেই ছিলে হে!"

বিব্বু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, সেই ভূতুড়ে তীর না এলে অত হাঙ্গামা ক'রে, শেখরেশ্বরকে ভাঁওতা দিয়ে মালা নিতে হ'ত না। যাক্ গে, সে মালা তো শেষ পর্য্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া গেছে।"

"তা গেছে। বাহাদুরী দেখিয়েছ তুমি। তা যাক্, পাল মশাই, কি যেন জানতে চেয়েছিলেন—রত্নহার সম্বন্ধে?"

চাঁদপাল ধীরভাবে সমস্ত শুনিতেছিল, কহিল, "হ্যাঁ, আপনার পরামর্শ মত মালার সরু মটরগুলো একটা এক ক'রে খুলে যে গ্রামে ভাঙ্গতে বলেছি সেখানেই আপনা অদ্ভুত ব্যারাম ছড়িয়ে পড়েছে। ১০।১২টা মটর দা গেছে। কিন্তু আপনি মাঝের ত্রিশূল-আঁকা দানাটা খুল বারণ করেছিলেন। সেইটে সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা কর চেয়েছিলাম।"

"ও! ওটা দেওয়ার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল না—নে বিপদে পড়লে যাতে একটা সুরাহা হয় তারই জন্য দেওয়া। ওটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ওটা ফুটো ক তার ওপর জোরে আঘাত করলে এক রকম বিষাক্ত শব্দ ক'রে বেরিয়ে আসে আর আশপাশের সব কিছু ক'রে ফেলে। তাই ওটা সম্বন্ধে সাবধান হ'তে বলেছি —আর ভাঙ্গতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। আগে নি—কখন কোন্ আনাড়ি কি কাণ্ড বাধিয়ে বস বের করুন না মালাটা, দেখিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে এনেছে তো?"

চাঁদপাল ঘাড় নাড়িল; তার পর একটু ইতস্ত করিয়া জামার ভিতর হইতে সেই মহামূল্য রত্নহার টানিয়া বাহির করিল। মালাটি আর তত বড় না কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। মাঝখা সব চেয়ে বড় দানাটির গায়ে নিপুণ হাতে আঁকা এ ত্রিশূল-চিহ্ন তখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। কার সা বুঝিতে পারে ইহার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ ল রহিয়াছে!

বিব্বু তারিফ করিয়া কহিল, "অদ্ভুত আপনার ক্ষম যা হোক!"

বারেটো হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এবারে আসল ক সুরু হোক্। কিন্তু তার আগে, রোসো, শুভ আলোচনা আগে—মেনেলাস্, বড় বোতলটা এ দিকে নিয়ে এস —আর কয়েকটা গেলাস।"

বোতল আসিল, গেলাস সফেন তরল পদার্থে কানা কানায় পূর্ণ হইল, এবং একটু পরেই বারেটোর দীর্ঘ শ্ব বাহিয়া সেই ফেনিল রস গড়াইয়া পড়িয়া বজরার পাটাত ভিজাইয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অনতিদূরের হোগলা-বন ঈষৎ নড়ি উঠিল। পলকের জন্য মনে হইল একটা কালো জে

ঙ্গি বা ঐ ধরণের কিছুর উপর একটি দীর্ঘ দেহ যেন র তলা হইতে মাথা গলাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে! ক্ষণেই আচম্‌কা শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে তীর সিয়া বজরার উপর পড়িতে লাগিল—সেই ভূতুড়ে র!

ব্যাপারটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার আগেই একটি তীর আসিয়া চাঁদপালের হাতে, একেবারে সেই রত্নহারের উপর, গিয়া পড়িল। প্রায় বজ্রপাতের মতই বিকট একটি শব্দ! পরক্ষণেই রাশি রাশি কালো ধোঁয়ার আড়ালে বজরা ও ছিপ তার সমুদয় আরোহী সহ গঙ্গার অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীন ভারত ও ইংরাজি ভাষা

(খোলা চিঠি)

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

মাষ্টার মশাইদের কাছে হয়ত তোমরা মাঝে মাঝে তে পাও যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা আগের মত ল করে ইংরাজি লিখতে ও শিখতে পারে না। হয় া এ কথাও তোমাদের কানে এসেছে যে আমাদের শ—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে—ইংরাজি ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি বর্তমানে চল্‌ছে তার কোথাও মস্ত একটা গলদ য়ছে। তোমাদের মধ্যে, প্রায় সকলেই যে একটা দেশী ভাষার সাহায্যে কোন কিছু করতে উৎসুক নও তে সন্দেহ নেই। তোমাদের এ মনোভাব নিশ্চয়ই খুব ভাবিক। আমাদের নিজের ভাষা যতই উন্নত হচ্ছে ই আমরা বুঝছি যে বিদেশী ভাষার সাহায্যে আমাদের নন্দিন সাধারণ কাযকর্মগুলো করা, নানা বিদ্যা শেখা যে কষ্টকর তা নয়, হাস্যকরও বটে। চল্লিশ পঞ্চাশ র আগে আমাদের দেশে বাপ ও ছেলের মধ্যে ইংরাজি বায় পত্রালাপ, সভাসমিতিতে কেবল মাত্র ইংরাজির বহার—এ সবগুলো যে খুবই নিরর্থক ও লজ্জাজনক ল এখন আমরা তা বুঝতে পেরেছি। পরের ভাষার য় দিয়ে একটা জিনিষ শেখা ও শেখান যত কষ্টসাধ্য জের ভাষার সাহায্যে সেটা শেখা ও শেখান যে তার য়ে অনেক বেশী সহজ তা তোমাদের কাউকেই আজ ল দিতে হবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তাই ক্রমেই তৃভাষার মধ্য দিয়ে বিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ রছেন।

তবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। সেগুলির কী উত্তর তোমরা দেবে তা জেনে নিতে চাই। আমরা, যারা কলেজে পড়াই, তারা জানি যে আজকাল যে সব ছাত্রী ও ছাত্র বি. এ, এম্. এ পড়েন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চান যে ক্লাসে বক্তৃতা যেন মাতৃভাষায় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি মাতৃভাষায় রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিকে বাহন রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা যেন চিরকালের জন্যে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে এত দিন যদি ইংরাজির কদর এ দেশে হয়ে থাকে তা হলে ভবিষ্যতে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যক আছে কি না। ১৯৪৮ সনে ইংরেজরা যদি বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কী বেঁধে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যায় তা হ'লে তার পর ইংরাজি শেখবার জন্যে পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করবার সার্থকতা কোথায়, যদি আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সব মাতৃভাষায় রচিত হয়, তা হ'লে ইংরাজির মত একটা বিদেশী ভাষা শেখবার প্রয়োজনই বা কী—ইত্যাদি।

আমাদের চোখের সামনে স্বাধীন ভারতের যে ছবি ভাস্‌ছে সেখানে ইংরাজিকে আজকালকার মত অবশ্যপঠনীয় করা হ'তে পারে না সে কথা আমরা সবাই বুঝি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি আমরা নিজের ভাষার মধ্য দিয়ে শিখব এ ইচ্ছে আমাদের সকলেরই রয়েছে। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হবার কোন কারণ দেখি না। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে আমরা যা কিছুই শিখি না কেন তা শিখব কম সময়ে, বুঝব ভাল করে।

সুতরাং ভবিষ্যতে অবশ্যপঠনীয় ভাষাগুলির মধ্যে পড়বে আমাদের মাতৃভাষা এবং সম্ভবতঃ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা।

তা হ'লে ভবিষ্যতে ইংরাজি ভাষার স্থান হবে কোথায়? আমার মনে হয় খুবই উঁচুতে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বশ্যতা ছিঁড়ে ফেলার মানে এ কথা নয় যে ইংরাজি ভাষার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমাদের এত দিন ছিল তা একেবারে মুছে ফেলতে হবে। এ কথা মনে রাখলেও আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করব যে ইংরাজি শুধু ইংরেজের ভাষা নয়, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান জগতের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যদি ভবিষ্যতে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখতে হয় তা হ'লে ইংরাজি ভাষাজ্ঞান কি আমাদের অনেকটা উপকার করবে না? বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় এত অধিক এবং ব্যাপক কাজ হয়েছে এবং হবে যে আমাদের দেশে যাঁরা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানলাভ করতে চাইবেন ইংরাজি ভাষা কি তাঁদের কাজ অনেকটা এগিয়ে দেবে না? এদিক্ থেকে দেখলে ইংরাজি ভাষা শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বললে নেহাৎ ভুল হবে কি? ভারতে বিদেশী শাসন আমাদের অনেক ক্ষতি, অনেক অপকার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরাজি ভাষা আমাদের কতটা উপকার করেছে সে কথা না ভাবলে আমাদের ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা ক্ষুণ্ণ হবে না কি? ইংরাজি ভাষা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একতাবন্ধন সুদৃঢ় করেছে, আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বাড়িয়েছে, পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের অনেক কুসংস্কারকে গলা টিপে মেরেছে, নিজেদের মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে আর 'দূরকে নিকট বন্ধু এবং পরকে ভাই' করেছে। যে ইংরাজি ভাষা দেড় শ' বছর ধরে আমাদের এত উপকার করেছে, যার সঙ্গে এত দিন আমরা এমন গভীরভাবে জড়িত, হঠাৎ তার সমূল উৎপাটন আমাদের ক্ষতি কি লাভ ঘটাবে সেটাও ভাল করে ভেবে দেখবার বিষয়।

আর একটা কথা। আজকাল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে স্বাধীন ভারতে জীবিকার জন্যে আমাদের
যদি ইংরাজির উপর নির্ভর করতে না হয়, তা হলে কে[illegible]
রকমে সামান্য কিছুটা ইংরাজি বলতে এবং লিখ[illegible]
পারলেই যথেষ্ট। সব সময়েই যে ব্যাকরণ শুদ্ধ ইংরা[illegible]
লিখতে হবে, ইংরাজি পড়ে আমাদের যে রস গ্রহণ কর[illegible]
হবে এমন কোন কথা নেই। আমার এক বন্ধু য[illegible]
আগে জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে এক নাপি[illegible]
দোকানের সাম্‌নে বড় বড় ইংরাজি অক্ষরে 'হেড্‌স্ [illegible]
ওয়েল্' কথা ক'টি পড়ে তিনি জাপানী নাপিতকে জিজ্ঞ[illegible]
করেছিলেন—"এমন অদ্ভুত ইংরাজি তোমরা লেখ কেন[illegible]
সে উত্তরে বলেছিল—"পাঁচজন বিদেশী আমাদের ব্যব[illegible]
উদ্দেশ্য বুঝুক আমরা এই চাই। ইংরাজি ভুল [illegible]
শুদ্ধ তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।" এ রকম ধর[illegible]
তর্ক যাঁরা করেন তাঁদেরকে আমার দু'টি কথা [illegible]
বলবার আছে। প্রথমতঃ ইংরাজি ভাষার সঙ্গে ব্যব[illegible]
খাতিরে জাপানীদের যে সম্পর্ক আমাদের সেই সম্[illegible]
নয়। প্রায় দু' শ' বছর এই ভাষার সঙ্গে আমা[illegible]
দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ি[illegible]
ব্যবসার খাতিরে দু' চারটে ইংরাজি বুলি কপ্‌চাব এ[illegible]
মনোভাব নিয়ে আমরা ইংরাজি শিখি নি। যত্ন ক[illegible]
যে ভাষা এতটা আয়ত্ত করেছি এখন তাকে অনা[illegible]
করে হারালে আমাদের তাতে কী লাভ হবে সেটাও ভে[illegible]
দেখবার বিষয়। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না [illegible]
আমাদের দেশে ভবিষ্যতে সকলেই সেক্‌সপিয়র, মি[illegible]
কি জন্‌সন্ পড়বার জন্যে ইংরাজি শিখবে। 'ইয়েস্-[illegible]
ভেরি গুড্'-বলিয়ে রাম-শ্যাম-যদুর দল আমাদের দে[illegible]
ছিল, আছে এবং থাকবেও। আমি শুধু এইটুকু বল[illegible]
চাই যে ইংরাজি ভাষা আমাদের দেশের শিক্ষিত জ[illegible]
সাধারণকে যেমন অনুপ্রাণিত করেছে তেমন আর কো[illegible]
বিদেশী জাতিকে করে নি। সুতরাং যে চোখ বা [illegible]
মন নিয়ে জাপান ও মিশরের লোক ইংরাজিকে দে[illegible]
আমরা সে রকম দেখি না। আমার দ্বিতীয় কথা হ[illegible]
এই যে একটা বিদেশী ভাষা শিখতে হ'লেই যে যেন-তে[illegible]
প্রকারেণ তার ব্যবহার সারতে হবে তার কোন মা[illegible]
নেই। হয় সে ভাষা একেবারেই শিখো না, নয় [illegible]
যেটুকু শিখেছে তা ভাল করে পড়তে, লিখতে এ[illegible]
বুঝতে শেখো। দশ বছর আগে ইংরাজি আমা[illegible]

[illegible]া ব্যবহারে আসত দশ বছর পর নিশ্চয়ই ততটা আসবে
[illegible] দশ বছর আগে ইংরাজি শেখবার জন্যে যত সময়,
[illegible]শ্রম এবং পয়সা দিতে পারতুম—দশ বছর পর ততটা
[illegible]য়া সম্ভব হবে না। বিদেশী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্তের
[illegible] আনতে কেউই পারে নি, আমরাও পারব না।
[illegible] যেটুকু আমরা শিখব সেটুকু মোটামুটি ভাবে বলতে,
[illegible]তে এবং বুঝতে শিখব না কেন? দেড় শ' বছর
[illegible]ষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ইংরাজি ভাষায় আমাদের
[illegible] জন্মেছে, ইংরাজি সাহিত্যে আমাদের রসবোধ
[illegible]ছে। আজ ইংলণ্ডের সঙ্গে দাসত্বপাশ ছিন্ন করবার
[illegible] এসেছে বলে ইংরেজ সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারের মধ্যে প্রবেশ
[illegible]তে ভয় পাব কেন?
[illegible] ইংরাজি ভাষা অফুরন্ত সৌন্দর্যের খনি। বহুমূল্য ধন-
[illegible]র খোঁজে কষ্ট ক'রে যদি কেউ সেই খনিতে নামতে
[illegible] তা হ'লে তাকে উৎসাহ না দিয়ে আমরা বাধা দেব
[illegible]? কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথকে পড়বার এবং বোঝবার
[illegible] যদি কোন বিদেশীর বাংলা ভাষা শিক্ষা আমাদের
[illegible]ছ সার্থক প্রতীয়মান হয় তা হ'লে সেক্‌সপিয়র থেকে
[illegible]টু রস গ্রহণ করবার জন্যে অপর দেশের লোকের কষ্ট ক'রে ইংরাজি শেখাকে মূর্খতা বললে মূর্খতা করা হবে না কি?

ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভবিষ্যতে ইংরাজি শিক্ষার স্থান কোথায় হবে সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন তার ইঙ্গিত তোমাদের দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। মৌলানা সাহেব বলেছেন:

"এক শ' পঞ্চাশ বৎসরের অন্তরঙ্গতার ফলে ইংরাজি ভাষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি এ ভাষাকে আমরা ত্যাগ করি তা হ'লে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ভাষার আমরা ক্ষতি করব আর নিজেদের ক্ষতি করব আরও অনেক বেশী। চারদিক্ বিবেচনা করে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে এত দিন যে উচ্চ স্তরে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলে এসেছে স্বাধীন ভারতে তা বজায় রাখতেই হবে। তবে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার স্থানে ইংরাজী ভাষার ব্যবহারও কিছুতেই চল্‌বে না।"

স্বাধীন ভারতকে গড়বে তোমরা। তাই ইংরাজি ভাষাকে তোমরা কোন্ স্থানে বসাতে চাও জানতে আগ্রহ হয়।

চেতনা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্.এ

[illegible]পরিচিত বন্ধুরা অশনিকে রীতিমত শ্রদ্ধাই করত আর
[illegible]রিচিতেরা দূর থেকে তার পানে বিস্ময় ভরে তাকাত।
[illegible]লের চোখেই সে যেন ছিল একজন আদর্শ ছাত্রের
[illegible]তরূপ। অশনিদের পরিবারে দু'-দু'জন ছিল বিলেত-
[illegible]ত, তা ছাড়া সে নিজে পড়ত সাহেবী স্কুলে, তাই
[illegible]রজিতে কথা বলতে পারত অনর্গল, আর ইংরেজি
[illegible] বহু বই সে পড়ে ফেলেছিল যার নামই তার বন্ধুরা
[illegible]তা শোনে নি। বিজ্ঞান ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় এবং
[illegible] বিষয়ে সে পড়াশোনাও করত যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে।
[illegible] বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্বও অদ্ভুত ভাবে আয়ত্ত
[illegible]ছিল সে। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানা ধরণের নূতন
[illegible] আশ্চর্য্য আবিষ্কারের খবর সংগ্রহ করে বন্ধুদের সে যেমনি বিস্মিত করত তেমনি আনন্দ দিত। সভ্য জগতের প্রাচীন এবং আধুনিক নানা খবরাখবর রাখত বলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে অনেক সময় তাকে 'বিশ্ববার্ত্তা' বলে ডাকত। অশনি নিজেও মনে মনে গর্ব্ব বোধ করত এবং সাধারণ ছেলেদের করুণার চক্ষে দেখত।

'ফটোগ্রাফি' ছিল তার 'হবি'। এ জন্যে সে দু'-তিনটে ছোট বড় ক্যামেরা কিনে ফেলেছিল এবং নানা ভাবে এর পেছনে বহু অর্থ ব্যয় করত। কম্‌পিটিশানে ফোটো পাঠিয়ে অনেক বার সে প্রথম পুরস্কারও পেয়েছিল।

সেদিন রবিবারে সে তার ছোট ক্যামেরাটী কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সহরের প্রান্তে জনবিরল অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের কয়েকটী ফোটো তুলে

TIGHT BINDING

নেবে এই তার অভিপ্রায়। নানা জায়গা থেকে কয়েক-খানা 'স্ন্যাপ্' সংগ্রহ করার পর ঘুরতে ঘুরতে সে একটা নির্জ্জন বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন শরতের শেষ। গাঢ় নীল আকাশের মাঝে মাঝে হালকা সাদা মেঘগুলো পেঁজা তূলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুরফুরে উত্তুরে হাওয়ায় ঘাসের ফুলগুলোর মাঝে অবিশ্রান্ত দোলা লাগছে। আগতপ্রায় শীতের আভাসে সোনালী রোদের বাঞ্ছিত উষ্ণতাটুকু কেমন মিষ্টি! অশনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। মখমলের মত নরম আর গদির মত পুরু সবুজ ঘাসের বুকে ভারী বুট ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল সে। হঠাৎ ওপাশের কৃত্রিম দীঘির কিনারায় দু'তিনটে পত্রনিবিড় গাছের তলায় অশনির নজর পড়ল। সেখানে একখানা বেঞ্চির ওপরে বসে তারই বয়সী একটী ইংরেজ ছেলে অসীম মনোযোগের সঙ্গে একখানা ছবি আঁকছে। কোলের ওপর ছোট একখানা বোর্ডে গাঁথা কাগজ। পাশেই একটা রঙের বাক্স খোলা পড়ে আছে। লম্বা সরু একটা কাগজের বাক্সের ভেতর থেকে কতকগুলো তূলি মাথা বের করে রয়েছে। তারই কাছে একটা ছোট জলের পাত্র। একখানা টীনে মাটীর প্লেট নানা রকমের মৌলিক ও মিশ্রিত রঙ-এ আচ্ছন্ন। পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ্।

অশনি কৌতূহলী হ'ল। পেছন দিক্ থেকে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলে ছেলেটী একটী পত্রবিরল গাছের অসংখ্য শাখাপ্রশাখার আঁকাবাঁকা ভঙ্গি ছবির মধ্যে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। মেঘ দিয়ে সাজানো নীল আকাশের দৃশ্যে সুন্দর পশ্চাৎপটের সৃষ্টি করেছে। মুগ্ধ কণ্ঠে অশনি বলে ফেললে—চমৎকার!

ছেলেটি সচকিত হয়ে ফিরে তাকাল এবং অশনির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললে।

পরিষ্কার ইংরেজিতে অশনি বলল—যদি তুমি কিছু মনে না কর আর ব্যাঘাত বোধ না কর তা হ'লে আমি এখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তোমার ছবি আঁকা দেখি।

অশনি ভেবেছিল তাকে এমন অনায়াসে ইংরেজি বলতে দেখে ইংরেজ ছেলেটী নিশ্চয় অত্যন্ত বিস্মিত হবে, কিন্তু সে তেমন কোনো ভাবই দেখাল না। অশনির কথার জবাবে হেসে বললে,—আমার এই সাধারণ ছবি দাঁড়িয়ে দেখলে আমি গৌরব বোধ করব।

অশনি বললে,—সাধারণ যদে তোমার ছবির কমাতে চাইছ, কেন? এখনি তুমি যে রকম আঁকতে পার তাতে ক'রে ভবিষ্যতে তুমি যে র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলো হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে?

তূলিতে ক'রে হালকা সবুজ রং তুলে নিয়ে গা কয়েকটা পাতা তৈরী করতে করতে ছেলেটী জবাব ঠাট্টা করছ কেন! ওঁদের ছবি তুমি দেখেছ?

—শুধু ওঁদের কেন, বড় বড় অনেক শিল্পীর ছ দেখেছি। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ড ভিঞ্চি, বোটিসেলি, ফিলিপ্পো-লিপ্পি—অনেকের ছ আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

বিদেশী ছেলেটী অশনির দিকে চেয়ে বললে,—তোমারও শিল্পের দিকে উৎসাহ আছে!

—তা কিছুটা আছে বৈকি! তবে ছবি আমি নে। আমার 'হবি' ফোটোগ্রাফি। সঙ্গের ক্যামে ছাড়া আমার আরো দু'টো ক্যামেরা আছে। জানি নে একে তোমরা শিল্পের মধ্যে ধর কি না।

ছেলেটী ছবির ওপরে তূলি চালাতে চালাতে বললে,—ফোটোগ্রাফিও এক ধরণের আর্ট বৈকি!

অশনি বললে,—আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে বইও পড়েছি। 'রিয়ালিজ্‌ম্,' 'সাব্‌রিয়ালিজ্‌ম্', 'ইমপ্রেশনি ইত্যাদি কত কী ব্যাপার!

ছেলেটী বলল,—তুমি অনেক কিছুই জান দে আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয়, না?

—হ্যাঁ, ভারতীয়। বাঙ্গালী।

তূলিটী প্লেটের ওপর নামিয়ে রেখে সাগ্রহে ছে বললে,—ভালই হ'ল। তোমার কাছ থেকে ভারতী সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নেয়া যাবে।

অশনি মনে মনে শঙ্কা বোধ করলে। সর্ব্বনা ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সে তো এমন কিছুই জানে না! কোলের ওপর থেকে ছবির বোর্ডখানা এবং নামিয়ে রেখে ছেলেটী একটু সরে বসল, তারপর অশ পাশে বসবার ইঙ্গিত করে বল্‌ল,—অনেকক্ষণ ধরে

ছি, এবারে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্। ছা দেখ, আমি তোমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে ন ট্যাগোর আর একজন বোসের নাম শুনেছি। তা া তোমাদের দেশে আধুনিক বড় শিল্পী আর কে ছেন?

অশনি কিছুক্ষণ ভেবে দেখলে কিন্তু কারু নামই মনে তে পারলে না। একটুখানি লজ্জিত হয়ে সে বললে,—াদের দেশে অনেক বড বড় শিল্পী আছেন বটে, কিন্তু ি দুঃখিত যে তাঁদের কারুর নামই মনে করতে পারছি ।

ইংরেজ ছেলেটী একটু আশ্চর্য্য হ'ল, বল্‌ল,—সে কী! লীর অতগুলো শিল্পীর নাম করলে আর নিজের দেশের নো শিল্পীর নাম করতে পারছ না! সে যাই হোক, মাদের শিল্প আমার খুব ভাল লাগে। আমি অজন্তা র ইলোরার গুহায় তোমাদের প্রাচীন চিত্রগুলো খছি। সেগুলো কি তোমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ল মনে হয় না?

অশনি বললে—অজন্তা, ইলোরায় আমি কখনো যাই ।

ইংরেজ ছেলেটী অধিক বিস্মিত হয়ে বললে,—কেন? ি যে বলছিলে এ বিষয়ে তুমি উৎসাহী! তবে যাও নি ন?

অশনি কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বললে,—ও ন্ত জায়গায় যেতে হ'লে অনেক টাকার দরকার।

হাসতে হাসতে শিল্পী বললে,—তোমাকে দেখে তো বীব বলে মনে হয় না। একটু আগেই তুমি বলছিলে তোমার আরো দু'টো ক্যামেরা আছে। তা ছাড়া টোর প্লেট আর ফিল্‌মের পেছনেও বোধ হয় কম খরচ না, কি বলো? আর অজন্তা, ইলোরা তো এক রকম মাদের দোরের কাছে!

অশনি কী আর বলবে, চুপ করে রইল। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে ছেলেটি বললে—ভারত সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেল' তুমি দেখেছ?

অশনি বললে,—শুধু দেখা কেন, স্কুলে যে আমাদের বাইবেল পড়তে হয়।

—আচ্ছা, তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কি?

অশনি বললে,—আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তো একখানা নয়, অনেক। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, গীতা—কত কী!

—তুমি এ সব পড়েছ?

—না। উত্তর দিতে গিয়ে অশনি একটু লজ্জা বোধই করলে। বললে—এ সব বই সংস্কৃত ভাষায় লেখা আর সংস্কৃত আমি জানি নে।

বিস্ময়ের সুরে ছেলেটী বললে,—তা হ'লে তোমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো না?

—তা জানব না কেন?—অশনি একটু বিব্রত হয়ে বললে।—সব মানুষকে ভালবাসা—সদাচরণ করা—অসত্য পথ পরিত্যাগ করা এবং এরই সাহায্যে ভগবান্‌কে লাভ করা আমাদের ধর্ম্মের কথা।

ছেলেটী বললে,—সে তো সব ধর্ম্মেরই কথা। কিন্তু আমি জানতে চাই তোমাদের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি? শুনেছি ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আধ্যাত্মিকতা জগৎকে নূতন কথা শুনিয়েছে। কী সে কথা?

অশনি বললে,—এ সব বড় জটিল বিষয়। আমি এ সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলতে পারব না।

বিদেশী শিল্পী বললে,—আমি আরো কয়েকটী ভারতীয় ছেলেকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছি; কিন্তু কেউ-ই কিছু বলতে পারে নি। এ তো ভারী আশ্চর্য্য!

অশনি বললে,—আজ এই বিজ্ঞানের যুগে—বস্তুতন্ত্রের যুগে ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা এ সব নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না।

তরুণ শিল্পী হেসে বললে,—দেখ, রাগ ক'রো না। বিজ্ঞান বা বস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ভারতকে কেউ করতে আসবে না। ভারতের কাছ থেকে মানুষের যদি কিছু জানবার থাকে—প্রশ্ন করবার থাকে—তা তার ধর্ম্ম সম্বন্ধে—দর্শন সম্বন্ধে। এ সব বিষয় কি তোমাদের জানা উচিত নয়?

অশনি কোনো জবাব দিলে না, দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তার পর শিল্পীই প্রথমে কথা বললে,—'আচ্ছা, তুমি তো বাঙ্গালী, বাঙ্গালীদের ভীরু বলে বড় বদ্‌নাম আছে, তুমি কি তা স্বীকার কর?'

অশনি প্রতিবাদ করে বললে,—মোটেই না। বাঙ্গালীর বীরত্বের বহু প্রমাণ আছে প্রাচীন ইতিহাসের পাতায়।

ইংরেজ ছেলেটা বললে,—ভারতের ইতিহাস আমি পড়েছি। ভারতে অনেক বড় বড় বীরের আবির্ভাব হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কি কেউ বাঙ্গালী ছিলেন?

অশনি বললে,—কেন, বিজয়সিংহ?

—যিনি 'সিলোন' জয় করেছিলেন? কিন্তু তাঁর ব্যাপার নিয়ে যে অনেক সন্দেহ আছে! অনেকে তো বলেন যে বিজয়সিংহ মোটে বাঙ্গালীই ন'ন। এ ছাড়া আর কারুর নাম বলতে পারো?

অশনি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় নেই।

বিদেশী ছেলেটা বললে,—তুমি নিজের দেশের কথা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই জানো দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, চারটে বেজে গেছে, এবারে আমাকে উঠতে হবে। পাঁচটায় চা, এরি মধ্যে বাড়ী গিয়ে পৌছানো চাই। শুভরাত্রি।

ব্যাগের মধ্যে আল্...। জিনিষগুলো গুছিয়ে নিয়ে সে উঠে পড়ল। অশনি মনের মাঝে একটা বেদনা [অনুভব] করতে লাগল। তার সমস্ত শিক্ষা—সমস্ত সভ্যতা মূলহীন তরুর মতই নিষ্প্রাণ, মিথ্যা ব'লে মনে হ'তে লা[গল]। নিজের দেশ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, এমন কি বিদেশী ছেলেটা যতটুকু জানে ততটুকুও নয়। ... তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। শিল্পীটী তখন কিছু দূর এ[গিয়ে] গিয়েছে, অশনি ছুটে গিয়ে তার কাছে দাঁড়াল, ... কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—আবার কবে তোমার সঙ্গে [দেখা] হবে?

বিস্মিত হয়ে বিদেশী ছেলেটি বললে,—তা তো ব[লতে] পারি নে। আমি কখন কোথায় যাই কিছুই ঠিক নে[ই]। জান তো শিল্পীর মন?

কণ্ঠস্বরে অনেকখানি: জোর দিয়ে অশনি বললে,— তোমার সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হতেই [হবে]। যেখানে হোক্—যতদিন পরে হোক্। আজ যে ... প্রশ্ন তুমি আমায় করলে সেদিন তার প্রত্যেকটীর জ[বাব] আমি দিতে চাই। এ সুযোগটুকু আমায় তুমি দাও।

তরুণ শিল্পী আশ্চর্য্য হয়ে অশনির মুখের পানে তা[কিয়ে] রইল।

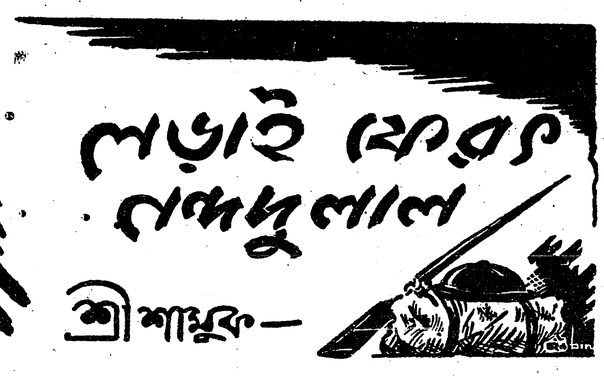

সাত

— পথে এরা ঘুরে বেড়ায় —

আপিস পর্ব শেষ করে নন্দ বাড়ি ফিরবে বলে ট্রামে [ও]ঠে পড়ে। এই সময়টা সবে ছুটি হয়েছে, সুতরাং [রো]জকার মত ট্রামে বেশ ভিড়। জানালার কাছে একটু [খা]লি জায়গা পেয়েছে দাঁড়াবার মত এই ভাগ্য। দাঁড়িয়ে [দাঁ]ড়িয়ে লোকেদের ঠেলাঠেলি দেখে তার মার কথা মনে [পড়]ায় নিজে নিজে হাসে।

বাড়ি পৌঁছলে সব শুনে মা নিশ্চয় বলবেন,—আমি ত' [জা]নতাম তুই একটা খুনোখুনি না ক'রে কোন কাজে [ই]স্তফা দিবি না। পিসেমশাই বড়বাবু, তাই রক্ষে, নইলে [পু]লিসের হাজতে গিয়ে পচতে হ'ত আজ। আর তোকে [কো]ন কাজকর্ম করতে হবে না বাপু! খা দা, একটু মাথা [ঠা]ণ্ডা ক'রে বাড়িতে থাক।

নন্দর চিন্তায় বাধা পড়ে। এক জায়গায় ট্রাম থামতে [অ]নেকগুলি লোক এক সঙ্গে ওঠা-নামা করে। সে ভিড় ও [ঠে]লাঠেলি দেখবার মতন।

—ও মশাই, শুনছেন? মেয়েদের জায়গাটি ছেড়ে দিন। ... কানে শুনতে পান না নাকি? আচ্ছা ত' ভদ্দর [লো]ক!

কে একজন বলে ওঠে ঐ কথা। পাশাপাশি বসে, [স]ব স্বামী ও স্ত্রী, কোথায় যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোকটি চমকে [জা]য়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন ও সরে যান।

নন্দ দেখে একজন মহিলা এসে সেই স্থানে বসলেন। ভারি লম্বা চওড়া চেহারা তাঁর, অনেকটা পুরুষের মতন কাঠখোট্টা। যেখানে তিনি বসলেন তার পিছনেই একটা গোলমাল সুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। কলকাতার ট্রামে, বাসে এ রকম ত' হামেশা হচ্ছে দিনরাত, নন্দ কান দেয় না ওদিকে। কিন্তু ক্রমশঃ চীৎকারের দাপটে তর্কের কথাগুলি শুনতে পেল।

—আমি বলছি এ জায়গা ছেড়ে দিন, আমি বসতে চাই।

—কেন ছেড়ে দেবো? আমি আপনার অনেক আগে এসে বসেছি।

—আমি বলছি ছেড়ে দিন জায়গা, বসতে দিন আমায়।

এ কি মগের মুল্লুক নাকি! ছাড়বো না, কি করতে পারেন করুন।

—ছাড়বেন না ত'? বেশ। একবার আমার চোখের দিকে তাকান দেখি। ও কি, উঠে দাঁড়ালেন যে? ভাল ভাল। ধন্যবাদ। বসি তা হ'লে একটু আরাম ক'রে।

নন্দর আশেপাশে লোকেরা ফিস ফিস করে,—যাদু নাকি! অমন তর্জন-গর্জন করে শেষে লোকটা চোখের দিকে তাকিয়েই সুশীল বালকের মত উঠে দাঁড়াল! ব্যাপার, কি?

TIGHT BINDING

অনেক লোকের চোখ ও কান ঐদিকে সজাগ হয়ে পড়ে, ভাবে, দেখি এর পরে করে কি। মোটাসোটা, শক্ত সমর্থ চেহারা মানুষটির, মাথায় এক ঝাঁকড়া বাবরী চুল। কপালের মাঝখানে গোল টিপ টকটকে লাল—তেলে সিঁদুর মেশানো! ট্রামের কর্মচারী কাছে এসে হাঁকে—টিকিট?

—গোপাল বাবু, আমার টিকিটটাও দিয়ে দিন।

পাশে বসা লোকটি চমকে হাঁ ক'রে তাকায় ওর মুখের দিকে, যেন বোঝবার চেষ্টা করছে কত কিছু। জিজ্ঞেস করে,—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? আমি ত' চিনি না আপনাকে!

—আহা, বেশ ত', আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। উপস্থিত আমারও পয়সাটা দিয়ে দিন।

—আপনার পয়সা দিতে আমার দায় পড়েছে! লোকটি বিরক্তভাবে জবাব দেয়।

—দেবেন না? বেশ। দেখুন দেখি একবার সোজা তাকিয়ে? তা বেশ বেশ, দিচ্ছেন তা হ'লে এবারে? ভাল কথা।

লোকেদের হট্টগোল একেবারে থেমে গেল। সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে মাথার ফাঁকে ফাঁকে ঝুঁকে লোকটির কথা শোনে ও হাত-মুখ নাড়া দেখে। নিজেদের অস্তিত্বের কথা যেন ভুলে যায়। ট্রামের কর্মচারীও টিকিট নেওয়া বন্ধ করে দর্শক ও শ্রোতা বনে গেল।

ওপাশে দাঁড়ানো একজনকে উদ্দেশ করে সেই লোকটি ব'লে ওঠে,—কি জিতেন বাবু, দুঃখের ভারে অমন চুপসে, কুঁকড়ে 'রয়েছেন কেন? আমি বলে দিচ্ছি ভয় নেই। বাড়ি গিয়ে দেখবেন আপনার ছেলের অসুখ অনেকটা ভাল। আর টারনার মরিসনে চাকরি করেন ত', আসছে মাসে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়বে নির্ঘাৎ।

জিতেন বাবু যোড় হাত করে অতটুকু জায়গার মধ্যেই বার বার প্রণাম করলে এবং অস্ফুট স্বরে বললেও,—বেশ শোনা গেল,—আমায় চেনেন না অথচ বলে দিলেন সব! মহাপুরুষ! মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন হ'ল আজ, কী সৌভাগ্য আমার!

ট্রামশুদ্ধ লোক প্রাণহীন জড়ের মত দাঁড়িয়ে বসে থাকে, তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না। শুধু ক্লান্ত মুখ আরো শুখনো—আরো লম্বা দেখায় উত্তেজনায়।

নন্দ অবাক্ হয়ে দেখে আর ভাবে। সত্যি মহাপুরুষ—সিদ্ধপুরুষ নাকি! কিন্তু অতি সাধারণ, বৈশি হীন চেহারা যে! চোখের দীপ্তি কোথায়, মুখেও কোন তেজোময় ছাপ নেই! তবে কি কোন সত্যিকা মহাপুরুষ ছদ্মবেশে এই কলকাতার সহরে এই ট্রা ভিড়ের মধ্যে লীলাখেলা দেখাতে এসেছেন!

সকলের চমক ভাঙে একটি লোকের কান্নার শ ঐ ওপাশের কোণ থেকে একটি লোক ভিড় ঠেলে এ আসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। মহাপুরুষের কাছে পায়ে হাত দিয়ে বসে পড়ে, বলে,—প্রভু, আমার করুন, আমার মতন দুঃখী সারা পৃথিবীতে আর কেউ।

লোকেরা উৎসাহে ও উত্তেজনায় ঠেলাঠেলি করে পড়ে প্রায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। এবারে মহা করেন কি দেখা যাক। নন্দ মজা করে দেখে আর এই কলকাতা সহরে কত অদ্ভুত জীবই না বাস ক মহাপুরুষের দেখাই না হয় পাওয়া গেছে, ত' নিজেদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা আশ মিটিয়ে ঘুচিয়ে হবে! এ কী হয়, না সম্ভব? চমকে দেখে, আরে—ও কী। সেই মহিলাটির সামনে এক ভদ্রলোক ঝুঁকে প ভক্তের পা ধরে কান্না মন দিয়ে দেখবার মহিলাটি তার ভিতরের বুক পকেট থেকে মনিব্যাগ নিলে যে! ঐ ত' নিজের বুকের মধ্যে জামার স্যুট করে ঢুকিয়ে দিলে!

নন্দর মাথার ভিতরটা বোঁ করে ঘুরে গেল, যাকে একেবারে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল বিস্ময়ে। একদিকে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব, তার পাশেই অমন চমৎকার হাতসাফাইএর কেরামতি আবার কিনা মেয়ে চোর! একটা মানুষের পক্ষে উল্টোপাল্টা জিনিষ চোখে দেখা ও সুস্থির মনে করা অসম্ভব ব্যাপার।

এই সময়ে এক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রা বাইরের গোলমাল শুনে বোঝা গেল কোন তুখোড় আসা যাওয়া দু'টি ট্রামের ঠিক মাঝখান দিয়ে সাঁ

য়ে ছুঁই ছুঁই করে বেরিয়ে গেছে। আর একটু ই হয়েছিল আর কি, বিপজ্জনক দুর্ঘটনায় দুষ্টু ছেলে হারাতো নিশ্চয়। ঘণ্টা বাজিয়ে আবার ট্রাম চলতে করে দেয়।

সেই পকেট-খালি-হওয়া লোকটির এই বাইরের গোল- এতক্ষণে হুঁস হয় যে সে যেখানে নামবে তা অনেকটা ছাড়িয়ে চলে এসেছে। সম্ভব দরকারী কাজ ছিল। তে মানুষ ঠেলে দরজার দিকে এগিয়ে যায় নামবার য়। এতক্ষণে কর্মচারীরও খেয়াল হ'ল যে অনেকের ট নিতে বাকি আছে। ঐ লোকটির সঙ্গে সামনা- নি হতে টিকিটের পয়সা চেয়ে বসে।

ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাত আর বেরোয় না। কটির মুখের সমস্ত আলো যেন কে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ল। সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে গেছে! টাকা—তার সমস্ত া পকেট মেরে নিয়ে নিয়েছে। ওতে অন্য লোকের াও ছিল যে অনেকগুলি! এ আবার বসে পড়ে, অন্য মের কান্না সুরু হয়ে গেল। শোকের কান্না, টাকা ানোর হাউমাউ কান্না। শুনে সত্যি বড় খারাপ লাগে। নন্দ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে। তাকে দু'হাতে বলে,—উঠুন উঠুন, কাঁদবেন না। আমি জানি কে া নিয়েছে। ঐ উনি নিয়েছেন টাকা, ওঁর বুকের মধ্যে ছে আপনার মনিব্যাগ।

অন্য আরোহীদের যা মুখের চেহারা ও মনের অবস্থা র্ণনা করা অসম্ভব। এ আজ হ'ল কী কলকাতা রে! এ ত' টিকিট-জানালায় ঝুলে ঝুলে টিকিট কিনে নমায় কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী দেখা নয়! সারা নর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরবার থ ট্রাম-গাড়ির ভিতরে এ যে অসম্ভবের দেশে এসে ছানো গেল! আজ কি পৃথিবীর যত কিছু আশ্চর্য, অদ্ভুত ঘটনা পর পর ঘটে যাবে চোখের সামনে এই অল্প সময়ের ভিতরে! সকলে কি যে করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না।

সেই মহিলা রুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বলেন,—কী, এত বড় বেয়াদপ, বেল্লিক আপনি যে একজন ভদ্রমহিলার নামে দোষারোপ করতে সাহস করেন? আর আপনারা সকলে চার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে দেখছেন, মেয়েদের সম্মান রাখতে হয় কি করে সে শিক্ষা পান নি?

এরপর সেই ট্রাম-গাড়ির ভিতরে যা হট্টগোল সুরু হয়ে গেল তা পথ-চলা পথিকেরাও থমকে দাঁড়িয়ে শুনলে এবং ভাবলে আজ এখন হঠাৎ গণ্ডগোল কেন? আজ ত' মোহনবাগানের কোন খেলা ছিল না এবং মোহনবাগান হেরেও যায় নি ত'!

আরোহীরা প্রায় সকলেই একজোটে নন্দকে বাক্‌যুদ্ধে আক্রমণ সুরু করে দেয়, কয়েকজন হাতে পায়ে এগিয়েও আসে। কিন্তু তাকে অত সহজে কাবু করতে পারবে কেন? কাছে আসা মানুষদের পুকুরের পানার মত অতি সহজেই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে সে।

এবারে আরো জোর গলায় বলে,—আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই আমার। কিন্তু হাতে হাতে প্রমাণ চান ত' ওঁকে কোন পুলিসের থানায় নিয়ে চলুন। একজন মেয়ে-পুলিস দিয়ে অনুসন্ধান করালেই ওঁর জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে মনিব্যাগ—এতখানি নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

আবার গোলমাল সুরু হচ্ছিল কিন্তু এবারে মহাপুরুষ উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে থামিয়ে বলেন,—উনি যা বলছেন তাঁর তদন্ত হওয়া দরকার। চোর হলে চোরকে শাস্তি পেতে হবে—এই দুনিয়ার নিয়ম। আসুন, আমিও যাবো আপনাদের সংগে থানায়। (ক্রমশঃ)

"আমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ—এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ নির্ভীক্ হইয়া উঠে। নির্ভীক্ হইতে পারিলে মানুষ কোন স্থানে বদ্ধ হয় না,—কোন বাধাবিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।"

—নেতাজি সুভাষচন্দ্র

এলো

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

এলো রে ভেসে,
চাঁদিনীর জ্যোছনায় আমার দেশে—
চৈতালি মেঘগুলি শুভ্র বেশে
এলো রে ভেসে !

এলো মেঘ—এলো আজ আকাশ-পথে,—
হাল্কা রূপালি মেঘ পবন-রথে
সবুজ-ঘোড়ার মুখে লাগাম ক'ষে
এলো রে ভেসে !

দুই তীর ঘাসে ঢাকা নদীর বুকে—
কোন্ সে মায়ায় যেন পড়ছে ঝুঁকে !
দেখছে কি নিজ মুখ রূপালি জলে ?
এলো কি ছলে !

এলো মেঘ—এলো আজি কেন রে হেথা ?
এমন রূপালি জল নেই কি সেথা ?
সুদূর সুনীল পুর, কেন তা ফেলে—
এলো রে চলে !

সবুজ, সোনালি ক্ষেত পেরিয়ে এসে—
যেখানে আবছা মাঠ আকাশে মেশে—
এলো কি শেষে !

আজি মেঘ দল্ বেঁধে তারার দেশে—
সবুজ স্বপন ভরা চাঁদের দেশে—
এলো কি ভেসে !

এলো মেঘ—এলো আজি আমার দেশে—
এলো রে ভেসে !

চিঠি

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

চিঠি কি নেই আমার নামে
পোস্ট্ কার্ডে কিম্বা খামে ?
দেখো না ছাই একটুখানি !
আমায় চিঠি কে দেবে আর ?
আসতে কি নেই চিঠি আমার ?
বয়স না হয় অল্প মানি—

তাই ব'লে আর খোকা তো নই—
পড়তে পারি এই মোটা বই,
দেখবে তুমি আসবো নিয়ে ?
এত্ত চিঠি তোমার কাছে
দাদার, বাবার, সবার আছে,
নেই কো শুধু আমার কী এ !

মঞ্জু, ধরো, বিহার থেকে
যদি-ই হঠাৎ আমায় লেখে—
'বুঝলি গাধা—ডিয়ার খোকন !'
এমনি কত, অনেক.যে তা
(তাও জানো না মঞ্জু কে তা !)
মঞ্জু আমার মাসতুতো বোন।

দিব্যি চালাক চতুর মেয়ে,
বছর খানেক আমার চেয়ে
হয়তো বড় হ'তেও পারে !

পুতুল-বিয়ের নিমন্ত্রণে
আমাকে তার পড়লে মনে
একটা চিঠি যদি-ই ছাড়ে—

তখন তো ঠিক আপনি ডেকে
সকাল বেলাই বলবে হেঁকে—
'খোকন বাবু, তোমার চিঠি !'
আমি তখন ঘরের কোণে
চুপ্‌টি ক'রে আপন মনে
হাসবো ব'সে মিটি মিটি।

পলাইতে পথ নাই

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

তবুও সেদিন দাঙ্গায় প্রাণের ভয়ে এই শহর ছেড়ে ...লাম, বিদেশে, বিহারের একটি শহরে।

সন্ধ্যা তখন উত্তরে গেছে, ট্রেনখানা ছুটতে ছুটতে এসে ...ন স্টেশানটিতে থেমে দম নিতে লাগলো। সঙ্গের ...না ও স্যুটকেসটি জানালা গলিয়ে কুলির হাতে দিয়ে ...জও সেই পথে নেমে পড়লাম।

তারপর ওভারব্রীজ দিয়ে বিপরীত দিকের প্ল্যাট্ফর্মে ...তেই একটি দশ-এগারো বছরের খোট্টা ছেলে এসে ...নে দাঁড়িয়ে বাংলায় বললে, "টাঙা লাগবে, হুজুর ?"

জায়গাটায় আলো-আঁধারি ছিল। তাই মুখখানি ঠাহর ...তে পারলাম না, কেবল চোখে পড়লো তার গায়ের ...া পাঞ্জাবি আর হাতের ছিপটি।

কুলিও বললে, "ও গাড়ি ছাড়তে দেরি হবে হুজুর! ...ায় গেলে আগেই বাড়ি পৌঁছে আরাম করতে ...বেন।"

সামান্য সঙ্গতির মানুষ আমি। 'হুজুর' কেউ কোন ... বলে না, তাই সম্বোধনটাতে আনন্দ ও লজ্জা দুই-ই ...।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "টাঙাওয়ালা কই ?"

সে বললে, "আমি।"

অবাক্ হ'লাম। বললাম, "তুমি !"

—"হাঁ হুজুর !"

—"তোমার গাড়িতে চড়ে কি প্রাণ হারাবো ? পথের পাশে খাদে কি ধানক্ষেতে গাড়ি ফেলে দিয়ে মরে পড়বে না তো ?"

ইতিমধ্যে আরও তিন-চারটি বয়স্ক গাড়োয়ান এসে জড় হয়েছিল। তারা বললে, "ওর গাড়িতে যাবেন না হুজুর। এই যে ভাল গাড়ি আছে। ও গাড়াতে গাড়ি নামিয়ে দেবে।"

তাদের মধ্যে একটা আধ-চাপা হাসি বয়ে গেল।

ছেলেটি ভারিক্কী চালে বললে, "আরে যাও, যাও। চলুন, হুজুর !"

—"কত নেবে ?"

—"কোন্ কুঠিতে যেতে হবে ?"

ঠিকানা বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, "চেন সে বাড়ি ?"

—"হাঁ হুজুর! চিনবো না কেন ?" দেড় টাকা দেবেন।"

শোনা ছিল গাড়োয়ানরা সেই পথে সময় আর যাত্রী বুঝে কোপ মারে। তাতে যতটা নামে। কিন্তু সময়টা তখনও পূজো আসতে দিন কতক দেরি, আর

গাড়োয়ানটিও একটি ক্ষুদে মানুষ। ওর অস্ত্রে ধারই বা কতটুকু যে আমার মতো শক্ত লোককে কাটবে? বললাম, "না। পুরাপুরি।"

—"হুজুর, এক টাকায় দু'ক্রোশ রাস্তা যাবো! গরিব মানুষ। দু' পয়সা মেঙে খাচ্ছি।"

—"আচ্ছা, চল তো। ও কথা পরে।"

আর কোন যাত্রী ছিল না। সেও তাই আর আপত্তি না করে রাজি হয়ে গেল।

গাড়ির আড্ডায় এসে পড়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কৈ গাড়ি?"

—"এই যে, হুজুর!"

দু'টি লোহার গরাদের ওপর টিনের চাল খাটানো, রঙ ওঠা, ধূলোমাখানো একখানি ছোট টাঙা। তার গদি দু'খানিও কাপড় মোড়া, নোংরা। সামনে দড়ির সাজ পরা, হাড় বার করা, লালচে রঙের একটা ছোটখাটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছিল।

কুলি বিছানাটা সামনে, স্যুটকেসটা পিছনে পাদানিতে রেখে বললে, "উঠে আরাম করে বসুন হুজুর!"

ছেলেটিও বললে, "চড়ুন হুজুর!"

সে ঘোড়াটার মুখ থেকে অভুক্ত ঘাসগুলো কেড়ে নিয়ে গাড়ির সামনে থলির মধ্যে পুরে বিট ধরে টানতে টানতে তাকে রাস্তার দিকে নিয়ে চললো। ঘোড়াটাও ঘাড় ঘুরিয়ে, পিছু হটে আপত্তি জানাতে লাগলো। ইচ্ছে করে কে খাটতে চায়?

তারপর গাড়িতে উঠে, দড়ির রাশ টেনে, ছিপটি ঘুরিয়ে জিভের শব্দ করতেই ঘোড়াটা খুট্ খুট্ করে চলতে লাগলো।

আমিও স্বস্তি বোধ করলাম। কিছুদিনের মতো গরিষ্ঠ দলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। শহরের সেই বীভৎস চীৎকার আর ভয়ঙ্কর দিন-রাত্রিগুলো সেখানকার শান্তিতে একেবারে তলিয়ে মনটা হালকা হয়ে গেল।

গাড়ি স্টেশানের এলাকা ছাড়িয়ে পড়লো গ্রামখানির অন্ধকার পাথুরে পথে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার গাড়িতে আলো নেই?"

—"না, হুজুর!"

—"পুলিশে ধরবে না?"

—"না।"

—"কেন?" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো এখানে কেরো তেলের সরকারী বরাদ্দ এত কম যে ঘরে জ্বালতে কু না।

গাড়ি আস্তে চলছিল। বাচ্চা-গাড়োয়ান ঘো ধমক দিলে, "তোর খাটতে মন চায় না? ভেড়ীর বা চল্—"

পথের দু'পাশে কোঠাবাড়ি, বাগান, বড় বড় গা গাছের ছাল-পাতা, ফুল, ঘাস, ঘোড়ার গায়ের ও ধূ গন্ধ নাকে লাগছিল। মাঝে মাঝে দু'-একটি গ্রাম্য কু এধার ওধার থেকে হঠাৎ ডেকে উঠছে।

বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে এসে পড়লাম ফাঁকায়। সা চার মাইল জনহীন পথ। চড়াই-উৎরাইয়ে কা পথের সঙ্গে দু'পাশের মাঠ, ক্ষেত, পাথর, শালবন ও ম গাছগুলো অন্ধকারে গলে মিশে চাপ বেঁধে গে মাথার ওপর তারাগুলো যেন ঘুলঘুলির আলো। ওপা আলোর দেশ থেকে এসে অন্ধকারের গায়ে ঝরে পড় ঝিঁ ঝিঁগুলোর ডাককে মনে হচ্ছে, পাতালপুরীতে যেন বুক চিরে কাঁদছে।

মনে পড়লো, এই রাস্তাতেই বছর কতক আ একজনকে কেটে ফেলে ডাকাতে তার সব-লুটে নি ছিল। কিন্তু এ ভয়টা অন্ধকার রাতে নির্জ্জন পথে জায়গাতেই আছে। এখানে আর যাই হোক দা ভয় নেই তো!

ছেলেটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "হুজুর, কোলক থেকে আস্‌ছেন?"

—"হাঁ।" মনে করলাম, সে এখনই কোলকা গোলমালের খবর জিজ্ঞেস কর বসবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ কেটে গেল, সে সম্বন্ধে আর এ কথাও জিজ্ঞেস করলে না। মনে একটু সন্দেহ জাগলে এমন একটা ব্যাপার জানতে এর কৌতূহল নেই কেন?

একটি সিগারেট ধরালাম।

ছেলেটি ঘোড়াটিকে বলে উঠলো, "তোর ঘুম ধ নাকি? ঠিক পথে চল্।" তারপর আমাকে ব "মেচটা একবার দিন হুজুর। এখানে মেচিস্ পাওয়া না।"

গাড়ি তখন কষ্টে একটি চড়াইয়ে উঠছিল। ঘোড়াটা টানতেই পারছে না। গাড়িখানি চড়াইয়ের মাথায় বাচ্চা অম্লান বদনে একটি বিড়ি ধরিয়ে দেশলাইটা কে ফিরিয়ে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ঘর কোথায়?"

—"এখানে। হিরনা গাঁ।"

—"হিরনা? আচ্ছা, সেখানে আবদুল নামে কাউকে ?"

—"আবদুল আমার বাবা।"

আমার বুক কেঁপে উঠলো। এ ছোঁড়াটাও ঐ দলের! ল যাঁর খানসামা ছিল তিনি আমার বন্ধু। দাঙ্গার নে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আসবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন, আবদুলের খোঁজ করে তাকে কোলকাতায় কাছে পাঠাতে। লোকটা বিশ্বাসী আর ভারী ।

আফশোস হতে লাগলো, কেন ভাড়া করবার সময় নিলাম না ছোঁড়াটা কোন্ জাতের! আবদুল এত দিনে খবর পেয়েছে, এই ছেলেটিও জানে মনিবের কি দশা হয়েছে। তাই ছোঁড়াটা কোল- খবর তখন আর কোন কিছু জানতে চায় নি। ন, এই অন্ধকার নির্জ্জন পথে, যদি আমাকে কেটে তার কথঞ্চিৎ শোধ নেয়? পকেটে কিছু টাকা, সের মধ্যে দু'-চারখানি কাপড়ও আছে। এগুলি গরিবের কিছু লাভ।

বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। সেই অবস্থায় টার হাবভাব যথাসম্ভব লক্ষ্য করতে লাগলাম। আর পেতে শুনতে লাগলাম, সে পথে কোন টাঙা বা মানুষ আস্‌ছে কিনা। না, কিছুই শুনতে পেলাম সারা পৃথিবীতে সেই ছোট্ট গাড়োয়ানটি আর আমি যেন আর কোন মানুষ নেই। এখন বাঁচবার এক উপায় একে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে বশ করা।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি?"

—"মনসুর।"

—"তুমি গাড়ি চালাও যে?"

—"কি করবো, হুজুর? গরিব মানুষ। বাবা কাজ থেকে এসে ছ' মাস বেমারিতে ভুগলো। ক্ষেত খামার আছে কম। তাতে চলে না। বাবা বললে, 'তুই গাড়ি চালিয়ে খা।' কর্জ্জ করে এই গাড়ি আর ঘোড়াটাকে কিনে দিয়েছিল। এক বছর এই গাড়ি চালাচ্ছি।"

—"এতে তোমাদের চলে?"

—"চলছে তো। দেনা শোধ হয়ে গেছে।"

—তোমার বড় ভাই নেই?"

—"আমিই বড়। ছোট দু' ভাই আছে।"

—"তারা লেখা-পড়া করছে?"

—"না।"

—"আবদুল এখন কি করছে?"

—"একটা ডাকবাংলায় খানসামার কাজ করছে। হুজুর, আমার বাবাকে আপনি কি করে চিনলেন?"

আমার বন্ধুটির নাম ও ঠিকানা বললাম; আর বললাম, "তোমার বাবাকে সেখানে আমি অনেক বার দেখেছি। সেও আমাকে দেখলে চিনতে পারবে।"

—"সাহেব ভাল আছে তো?"

অম্লান মুখে বললাম, "হ্যাঁ। তোমার বাবা আর কোলকাতায় যাবে না? সাহেব যে যেতে বলেছে!"

—"এখন কোলকাতায় যাবার কথা—হেই টক্ টক্! আরে! হুঁ হুঁ। এই বাঁয়ে আমাদের গ্রাম।"

হিরনায় অনেক মুসলমানের বাস।

ঘোড়াটা হঠাৎ সেখানে থেমে গেল।

রাস্তার বাঁ ধারে বড় বড় গাছ যেন ঐরাবতের দল, ডান ধারে ছোট ছোট গাছের একটানা জঙ্গল যেন জন্তুর পাল ওৎ পেতে বসে আছে। গাছগুলোর অন্ধকার তলা থেকে একটা গলার আওয়াজ এল—বিকট। মনসুর চট করে গাড়ি থেকে নেমে গেল। বুঝলাম আর রক্ষা নেই। একবার মনে হ'ল, লাফ দিয়ে নেমে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকোই। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, মনসুর ঘোড়াটার বিট ধরে টানছে আর বলছে, "খাটবি না, কেবল ঘরে গিয়ে খাবি? চল্—চল্—হেট—হেট—" এবং তার পরই এক লাফে গাড়িতে উঠে এসে রাশ ধরে ঘোড়াটার পিঠে এক ঘা ছিপটি বসিয়ে দিল। গাড়ির চালে ছিপটি দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে লাগলো।

ঘোড়াটা আবার উৎরাইয়ের পথে ছুটে চললো।

আমারও মন হাল্কা হয়ে গেল।

মনসুর বললে, "আর একটা ঘোড়া কিনেছি, হুজুর! সেটা ভাল। এটা বেয়াড়া। কথা শোনে না।"

পথের বাঁক ঘুরতেই দূরে দেখা গেল শহরের আলো। বাড়ি আর বেশী দূর নয়। বিপরীত দিক্ থেকে একখানা টাঙা আসছিল। তার আরোহীর হাতের টর্চের আলো গাছ, পথ ও জঙ্গলের অন্ধকার তলোয়ারের মতো ক্ষণে ক্ষণে কেটে মিলিয়ে যাচ্ছিল।"

জিজ্ঞেস করলাম, "মনসুর, তুমি কি আরও সওয়ারি নেবে?"

—"না, হুজুর! ঘর যাবো।

গাড়ি শহরের ধূলো ভরা পথে ঢুকলো। তারপর কিছু ঘুরে আমার গন্তব্য স্থলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কিছু দূরে পথের ধারে একটি সরকারী আলো জ্বলছিল। আমার বাড়িখানির জানলাগুলি ছিল বন্ধ, সামনেটা ছিল প্রায় অন্ধকার। বারান্দায় শুয়েছিল একটি পথের কুকুর। সে আমাকে দেখে ডাকতে ডাকতে উঠে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে বিছানা ও স্যুটকেসটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে ব্যাগ খুলে একখানি নোট বার করে মনসুরের হা[illegible] দিলাম।

সে বিনা আপত্তিতে সেখানি নিয়ে সেলাম করে গা[illegible] হাঁকিয়ে চলে গেল। আমি বারান্দায় উঠে ফিরে দে[illegible] গাড়িখানি আলোটার কাছে গিয়ে থামলো।

তার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে বাড়ির লোক[illegible] ডাকছি, দেখি মনসুর ছুটতে ছুটতে এসে নোটখানা আ[illegible] সামনে বাড়িয়ে বললে, "এ কি সরকার?"

ছেলেটির ওপর ঘৃণা জাগলো। একে 'ছোটলো[illegible] তার ওপর গাড়োয়ান। ওর লোভের আর শেষ নে[illegible] রুক্ষ ভাবে বললাম, "কেন? কি হয়েছে?"

—"দু' টাকার নোট দিয়েছেন, হুজুর!"

লজ্জায়, ধিক্কারে মনটা মুষড়ে পড়লো। কোন রক[illegible] বললাম, "ঠিক আছে, মনসুর!"

সে আবার সেলাম করে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চ[illegible] গেল।

ঘরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটির ওপর বসে ভাব[illegible] লাগলাম, সেই ছোট্ট ছেলেটির কথা। সে চলেছে, ত[illegible] ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। সেই আঁধার [illegible] নির্জ্জন পাহাড়ে পথে সেই তার সঙ্গী ও বন্ধু।

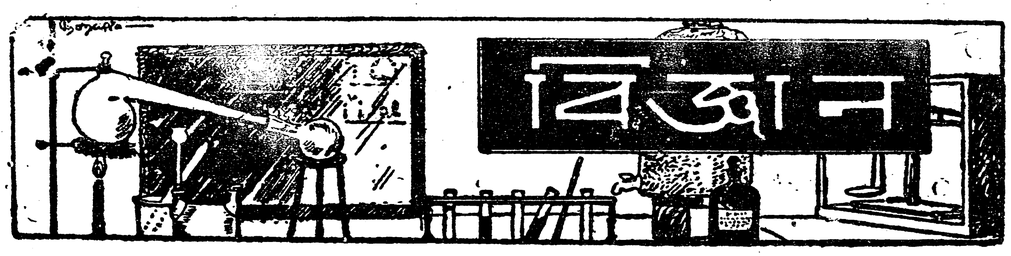

আলো

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি.এস্-সি

তোমরা কখনও সূর্য্যের আলো ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? সূর্য্যের যে আলো বা কিরণ অমরা খালি চোখে দেখিতে পাই তাহা সাদা। কিন্তু এই কিরণ যদি একটা তিন-কোণা ঝাড়ের কাচের (ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'প্রিজ্ম্') মধ্য দিয়া দেখা যায় তখন সে[illegible] সাদা কিরণ ভাঙ্গিয়া সাতটি বর্ণ দেখা যায়—রামধনুর ব[illegible] গুলির কথাই বলিতেছি।

পদার্থ বিদ্যার ছাত্রেরা ইংরাজী 'vibgyor' এই [illegible] রাখিয়া ঐ রংগুলির নাম ও সংস্থান-পদ্ধতি মনে [illegible]

V—violet—বেগুণি বর্ণ বা বেগুণের বর্ণ

I—indigo—নিবিড় নীল বর্ণ

B—blue—নীল বর্ণ বা আকাশ-বর্ণ

G—green—সবুজ বর্ণ বা হরিত বর্ণ বা দূর্ব্বা-বর্ণ

Y—yellow—হলুদ বর্ণ বা পীত বর্ণ

O—orange—কমলা লেবুর বর্ণ বা মনঃশিলা বর্ণ

R—red—রক্ত বর্ণ বা লোহিত বর্ণ

প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় সূর্য্য সাত ঘোড়ায় টানা রথে [illegible] বেড়াইতেন এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। সূর্য্যের [illegible] সাতটি ঘোড়া কি সূর্য্যের কিরণের সাতটি রং?

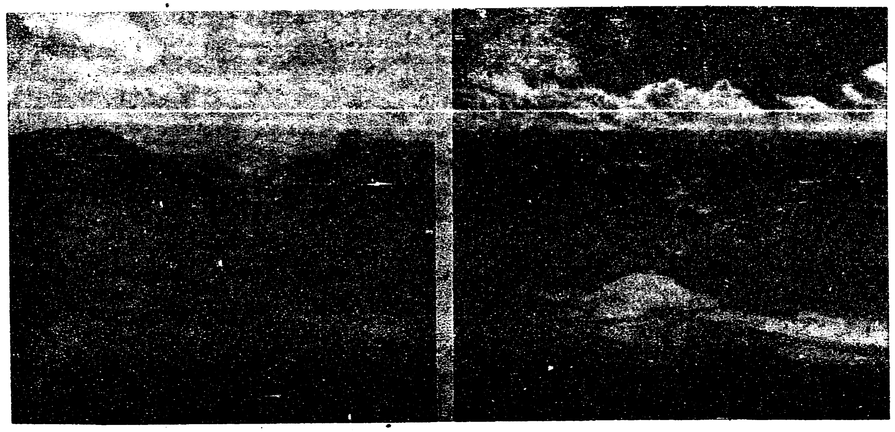

'ইন্‌ফ্রা-রেড' কিরণ সাধারণ চোখে দেখা যায় না কিন্তু অন্য ভাবে ধরা পড়ে। বাঁ-দিকে সাধারণ আলোয় তোলা ফটো, ডান দিকে সেই দৃশ্যেরই ইন্‌ফ্রা-রেড কিরণে তোলা ফটো—কেমন স্পষ্ট!

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের 'সহস্র কিরণ' বা [illegible]াংশু' এই নামও আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কি [illegible]ান করিয়াছিলেন যে সূর্য্যের ঐ সাতটি রংএর ছাড়া [illegible]ও অনেক রকম কিরণ আছে?

[illegible] কিরণগুলিকে উপর নীচ ভাবে সাজাইলে—উপরে [illegible]ণে কিরণ এবং নীচে রক্ত কিরণ স্থাপিত হয়। রক্ত [illegible]ণের নীচের দিকে কতকগুলি অদৃশ্য কিরণ (ইন্‌ফ্রা-রেড) আছে। ইহাদিগকে আবিষ্কার করিতে কোনও বেগ পাইতে হয় নাই কারণ এগুলি অদৃশ্য হইলেও ইহারা অত্যন্ত উত্তপ্ত কিরণ। বেগুণি কিরণগুলিরও উপরি-ভাগে অবস্থিত কতকগুলি কিরণ আছে; সেগুলিও অদৃশ্য। ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে কিন্তু বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

আজকালকার দিনে এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলিতেছে। এই সূক্ষ্ম পদার্থ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন গল্প বলিতেছি :-

গল্পটী বৈদিক যুগের—উপনিষদ্ যুগের গল্প। শ্বেতকেতু নামক এক মেধাবী ছাত্র অল্প বয়সেই বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজেকে খুব পণ্ডিত মনে করে এবং বেশ একটু গর্ব্বিত হইয়া পড়ে। তাহার পিতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি পুত্রের এই ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্বেতকেতু, তুমি আজ-কাল আর বেদ বেদান্ত আদি শাস্ত্র পাঠ কর না কেন?"

"শাস্ত্র সব আমি পড়িয়াছি।"—শ্বেতকেতু উত্তর দিল।

পিতা তাহাকে বেদের পুরুষ সূক্ত আবৃত্তি করিতে বলিলেন। পুত্র তাহা নির্ভুল আবৃত্তি করিল। এইরূপে

সে অন্যান্য সূক্ত গাথা অনর্গল আবৃত্তি করিল। পিতা পুত্রের মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

পিতা বলিলেন, "তুমি শাস্ত্র শিখিয়াছ, এখন শাস্ত্রার্থ অনুধ্যান কর না কেন?"

পুত্র বলিল, "আমি ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, এ সকল কিছুই মানি না।"

"কেন মান না?"

"ঐ সকল বস্তু প্রত্যক্ষ নহে।"

"যাহা প্রত্যক্ষ নহে তুমি তাহাই অস্বীকার করিবে?"

"হ্যাঁ।"

নিকটে একটি ঘটিতে জল ছিল। পিতা কয়েকটি লবণ-খণ্ড লইয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। বলিলেন, "এই লবণের অস্তিত্ব স্বীকার কর?"

"হ্যাঁ। যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ।"

পিতার নির্দ্দেশ মত শ্বেতকেতু লবণ-খণ্ডগুলি ঘটির মধ্যে স্থাপন করিল। কিছুক্ষণ পরে পিতা পুত্রকে লবণ-খণ্ডগুলি ঘটি হইতে উঠাইতে বলিলেন। পুত্র তাহা উঠাইয়া দেখিয়া ও দেখাইয়া নির্দ্দেশ মত পুনরায় ঘটিতে স্থাপন করিল।

কথোপকথনে আর কিছুক্ষণ কাটিল। পিতা এইবার আবার পুত্রেকে ঘটি হইতে লবণ-খণ্ডগুলি তুলিতে বলিলেন। পুত্র আর লবণ-খণ্ড পায় না, সে পিতাকে ইহা জানাইল।

পিতা বলিলেন, "তুমি লবণ-খণ্ড সকল দেখিতে পাইতেছ না, অতএব তাহাদের অস্তিত্ব কি অস্বীকার করিবে?"

পুত্র। "তা বই আর কি!"

পিতা। "ঘটির জল আস্বাদ কর।"

পুত্র। "ইহা লবণাস্বাদ; লবণ জলে গলিয়া গিয়াছে।"

পিতা। "অতএব লবণ নষ্ট হয় নাই, উহা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য হইলেও জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাকে অনুভব করা যাইতেছে।"

পুত্র স্বীকার করিল।

পিতা পুত্রকে একটি ছোট উনান ও কড়াই আনিতে বলিলেন। উনানে কড়াই স্থাপিত করিয়া তাহার উপর লবণ-জল নিক্ষেপ করিলেন। খানিক পরে জল উ গেল, কড়াইএর ভিতর লবণের গুঁড়া পড়িয়া রহিল।

পিতা বলিলেন, "অতএব দেখা যাইতেছে—যে একবার প্রত্যক্ষের অগোচর হইয়াছে উপায় বি অবলম্বন করিলে তাহাই আবার প্রত্যক্ষীভূত হয়।"

শ্বেতকেতুর এখন বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে উঠি জন্য নিস্‌পিস্ করিতেছিল। পিতা বলিলেন, "ব্রহ্মত আলোচনায় অত অধীর হইলে চলিবে না।"

পিতার কথা মত শ্বেতকেতু বেদের ভিন্ন ভিন্ন আবৃত্তি করিতে লাগিল। পিতাও মাঝে মাঝে শা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং বেশ একটু বেলা ক দিলেন। যখন শ্বেতকেতু ক্ষুধার জ্বালায় একান্ত অ হইয়াছে তখন পিতা তাহাকে পূর্ব্বের সূক্তগুলি পুনরা করিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু আর কিছুই আ করিতে পারে না, ক্ষুধার তাড়নায় তাহার সব বি হইয়াছে। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্বেতকেতু, তো অধীত বিদ্যা এখন কোথায়?"

পুত্র। "আমার ত' কিছুই মনে পড়িতেছে না!"

পিতা। "তাহা হইলে সে সব বিদ্যা তোমাতে ন বলিবে?"

পুত্র। "তা বই আর কি!"

পিতার নির্দ্দেশ মত পুত্র কিছু খাদ্য গ্রহণ করি কিছুক্ষণ বাদে সে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল পিতা ত তাহাকে পুনরায় বেদের গাথা আবৃত্তি করিতে বলিলে গাথা আবৃত্তি হইল, কোনও ভুল হইল না।

পিতা বলিলেন, "কিছুক্ষণ আগে যে বলিলে এই জ তোমাতে নাই তবে উহা এখন কি করিয়া আসিল? উ নিশ্চয়ই তোমার মনের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে ছিল?"

পুত্র তাহা স্বীকার করিল।

এই রূপ পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের সাধা ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ীভূত নহে। প্রাচীন ঋষিগণ উহা "অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়" বলিতেন। প্রসিদ্ধ জা দার্শনিক কাণ্ট্ ঐ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে "ক্রিটিক্ অব্ পি রিজন্" বলিতেন। এমার্সন ইহাকেই "ট্রান্‌সেনডেণ্ট সেন্স" বলেন। কিন্তু যাক্ ও সব বড় বড় কথা।

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্ম বিষয়, যাহা সহজে ম্য হয় না, তাহা সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হইয়াছে। আল্ট্রা-ভায়োলেট কিরণগুলি আলো না, কাজেই চক্ষু দ্বারা তাহাদিগকে দেখা যায় না। লি তাপ দেয় না, কাজেই স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা- ক অনুভব করা যায় না। কিন্তু সেগুলি অদ্ভুত নিক পরিবর্ত্তন-ক্ষমতাশালী। ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর এই কিরণ সম্পাত হইলে র রৌপ্য লবণের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেগুলি া হইয়া পড়ে।

আল্ট্রা-ভায়োলেট কিরণ জীব ও সবুজ উদ্ভিদ্-দেহে নিপতিত হইয়া দেহের মধ্যে ভিটামিন ডি নির্ম্মাণ করে। ভিটামিন ডি শরীরের অস্থি গঠন কার্য্যের বিশেষ সহায়ক। উহার অভাবে ছেলেদের অস্থি সুচারুরূপে গঠিত হইতে পারে না, অস্থি নরম থাকিয়া যায়। এই অস্থি-ব্যাধিকে রিকেট বলে। রিকেটি শিশুর হাড়গুলি বহুদিন নরম থাকিয়া যায়। এরূপ শিশুকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের নরম পাগুলি বাঁকিয়া যায়। দু'-একটি পরিণতবয়স্ক লোকের যে বাঁকা পা দেখা যায় তাহা ঐরূপেই হইয়াছিল।

আল্ট্রা-ভায়েলেট্ কিরণ এবং সূর্য্যালোক সম্বন্ধে তোমাদের পরের বার ভাল করিয়া বলিব।

বাংলার নববর্ষ উৎসব

শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস

উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে জাতির সত্যিকার য় পাওয়া যায়। একটা জাতি যখন প্রাণশক্তিতে থাকে তখন তার উৎসব আনন্দগুলোও প্রাণবন্ত ওঠে। আবার প্রাণ-উদ্দীপক উৎসবের ভিতর দিয়েও কে প্রাণ পরিবেশন করা যায়।

াংলার এবং ভারতবর্ষের গত কয়েক শতাব্দীর াস গৌরবের নয়, দুঃখের ও লজ্জার। এই লজ্জা দেশই ডেকে এনেছিল, আবার সবার আগে বাংলা চেষ্টা করেছে এই লজ্জাকে দূর করতে।

ত পঞ্চাশ বছরের বাংলার ইতিহাস সংগ্রামের ও ণের। ভারত ধর্ম্মের দেশ। এখানকার সমাজ- রাজনীতি, আইন সমস্তই একদিন ধর্ম্ম শাসন করত। বিবেকানন্দের পর থেকেই হিন্দুধর্ম্মের গতি এক পথে এগিয়ে চলে। সেই সময়েই জীবনের প্রত্যেকটি একটা নতুন চেতনা দেখা দেয়।

ময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেরও র্তন হচ্ছে এবং আমাদের আনন্দ-উৎসবগুলোরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার য়ারী পূজাই আজকালকার সার্বজনীন পূজার রূপ ছে। পূজা হয়তো ঠিকই হয়, কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠান সবই বদলে গেছে। পূজাই বা আগের মত হচ্ছে কি করে বলি? আজকাল সব বর্ণের লোক মিলে অঞ্জলি দেবার প্রচলন হয়েছে সর্বত্র। আগেকার মত আর মেলা বসে না, যাত্রা হয় না। হয় প্রদর্শনী, সভা, দরিদ্রসেবা, থিয়েটার ইত্যাদি।

নববর্ষ উৎসব প্রত্যেক দেশেই হয়। আমাদের দেশেও বরাবরই হয়ে আসছে। কিন্তু আজ তার একটি নতুন, মনোহর রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাংলার নববর্ষ উৎসব বর্ত্তমানে বাঙালীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবে পরিণত হ'তে চলেছে।

বাঙালীরা সংগ্রামে ও সংস্কৃতিতে আজও যে সারা ভারতের মধ্যে অগ্রবর্তী, আবার তার একটী পরিচয় এই নববর্ষ উৎসব। গত পয়লা বৈশাখ বাংলার কয়েক লাখ ছেলেমেয়ে উন্মুক্ত আকাশের তলে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের যে সব বীর সৈনিক জীবন বলি দিয়েছে তাদের প্রতি মৌন শ্রদ্ধা জানাল, বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে সব দিক্ থেকে গৌরবময় ক'রে গড়ে তুলবার জন্য প্রতিজ্ঞা করল, সমবেত ভাবে শক্তিচর্চ্চা করল। এর চেয়ে গৌরবের আনন্দ-উৎসব আমাদের আর হয়েছে কি?

নববর্ষে মিলিত ভাবে কুচ কাওয়াজ করবার রেওয়াজ আজকাল অনেক সভ্য দেশেই হয়েছে। এজন্য কেউ

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসবের (দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র) দু'টি দৃশ্য

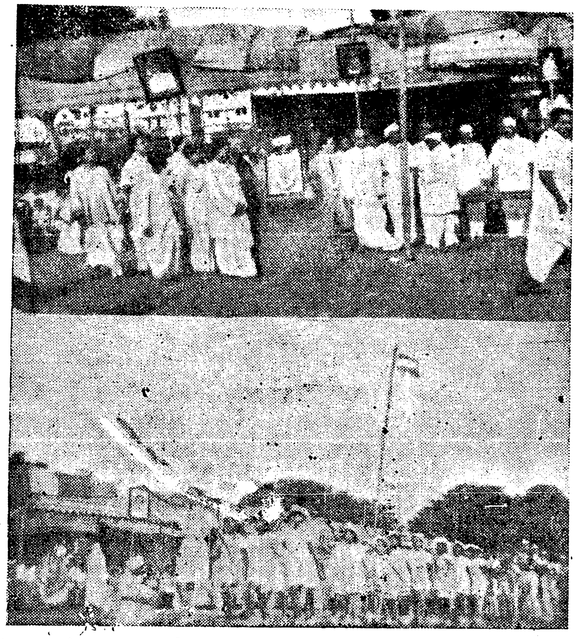

কেউ বলেন, আমাদের নববর্ষ উৎসবও বিদেশীরই অনুকরণ। সার্বজনীন দুর্গা পূজাতে আমরা যে শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রদর্শনী করি, তাই বা কোন্ ভারতবর্ষীয় অনুষ্ঠান? তাও তো পাশ্চাত্য দেশ থেকেই নেওয়া! বিদেশী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যা যা আমাদের উপযোগী ও উ সেগুলো নিতে দোষ কি? দোষ তো নেই-ই, কাছ থেকে ভাল জিনিষ না নিলে কখনও কোন বড় হ'তে পারে না।

সমবেত ভাবে কুচ কাওয়াজ বা সমষ্টি ব্যায়াম করলে মনে নিয়ম-শৃংখলা, একতা ও সাহস আসে। গুণগুলো আমাদের জাতির বিশেষ প্রয়োজন। শুধু উৎসব নয়, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও যদি তোমরা সমষ্টি ব কুচ কাওয়াজ ও সামরিক বাদ্যাদির অনুষ্ঠান কর তা তোমাদের অনেক উপকার হবে। এই সব অনুষ্ঠান দেখে তাদের মনেও সাহস বাড়ে এবং নিয়ম-শৃ ভাব জাগে।

তোমাদের অনেকেই হয়তো কোন না কোন পা ক্লাব ইত্যাদির সভ্য। হয়তো কুচ কাওয়াজ প্র তোমরা অভ্যাস কর। একটি কথা তোমাদের ক'রে বলছি, কুচ কাওয়াজ প্রভৃতি বাংলা ভাষায়ই ক

এখানে এ বছরের দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্রে নিখি নববর্ষ উৎসবের দু'খানি ছবি দিলাম। এই উ পৌরোহিত্য করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে যোগ দিয়েছিলেন। যে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ স্নেহময় দত্ত, ডেভিড ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে. ডি. ঘোষ, ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সভাপতি ডাঃ যোগেশচন্দ্র পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজরঞ্জন রায়, ডাঃ লুয়ান, শ্রীযুক্তা রায়, শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস এবং আরও বহু খ্যা ব্যক্তি। ছবিতে এঁদের অনেককেই দেখতে পাচ্ছ।

"বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যায়াম-শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব নাই; বল ও সা হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যা বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

—বঙ্কিম

নানা রকম

শখের মিউজিয়াম

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আমাদের বাপ্পা, লব, কুশ মিলে বাড়ীতে একটি ছোট-মিউজিয়াম্ বসিয়েছে। মিউজিয়ামের নামকরণ নিয়ে শ্চি একটু গোলমাল হয়েছিল (শুধু গোলমাল নয়, মাদের চুপি চুপি বলছি, একটা ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ—বা ও ভাল ক'রে বললে যাকে বলতে হয়—'গৃহযুদ্ধ', তাও গিয়েছিল।) তবে শেষ পর্য্যন্ত সমাপ্তিটা 'মধুরেণ'ই ছে।

মিউজিয়ামের প্রচলিত বাংলা হচ্ছে 'যাদুঘর'—যদিও গ্রহশালা' শব্দটি ব্যবহার করলে বোধ হয় অর্থটা আরও হয়। আমাদের ছেলেবেলায় ধারণা ছিল, যেখানে ন্ত জীবজন্তু রাখা হয় তাকে বলে 'চিড়িয়াখানা' আর ানে মড়া জীবজন্তু থাকে তাকে বলে 'যাদুঘর' বা উজিয়াম্'। এর কারণ আর কিছু নয়, কলকাতার জিয়ামে গেলে প্রথমেই আমরা ছুটতাম প্রাণিবিজ্ঞানের টিতে—যেখানে রয়েছে ঘর-যোড়া তিমির কঙ্কাল এবং জা-যোড়া তিমির চোয়াল, বিকট মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছে গরিলা, পাশাপাশি বসে আছে বাঘ, সিংহ, সিন্ধুঘোটক, ার, জিরাফ ইত্যাদি। পাখী, সাপ বা কুমীরের ঘরটিও অপছন্দ করতাম তা নয়। আমার দিদি অবশ্যি যেতে ত সেই ঘরে যেখানে রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট পুতুল—কালী-ীতে পূজো হচ্ছে, চাষীরা মাঠে চাষ করছে, কারখানায় িরা কাজ করছে, বিয়েবাড়ীতে লোকেরা নেমন্তন্নে ছে। ছোট ছোট পুতুল দিয়ে তৈরী—কিন্তু একেবারে সত্যিকারের! ছোট মেয়েদের পক্ষে পুতুলের অমন রাট সমারোহ থেকে চোখ ফিরিয়ে আনা কঠিন বই কি! বশ্যি মিউজিয়াম্ বা যাদুঘরে, যেখানে পূর্ব্ব সংজ্ঞা মানলে শুধু মড়া জানোয়ারদেরই থাকবার কথা, সেখানে ওসব পদার্থ কেন এল সে প্রশ্ন মনে জাগলেও তার রহস্য উদ্ঘাটনের কষ্ট কেউ করতেন না। আর ও সব ছাড়া সারা মিউজিয়াম্ যুড়ে যে বিচিত্র 'সংগ্রহ' সাজান থাকত তার তাৎপর্য্য বোঝাতে পারে এমন লোকও কেউ বড় একটা সঙ্গে যেতেন না। ফলে বাকি বিরাট বিরাট গ্যালারীগুলো আমাদের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা শেষ হয়ে যেত। তোমরা যারা মাঝে মাঝে মিউজিয়ামে গিয়ে থাক তারাও এ ব্যাপারটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ফসিল, সামুদ্রিক সংগ্রহ প্রভৃতির ঘরে লোকই দেখা যায় না, অথচ জন্তু-জানোয়ারের গ্যালারী দিয়ে ভীড় ঠেলে যেন হাঁটাই মুশ্কিল।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মিউজিয়াম্ জিনিষটি কি আজ-কালকার ছেলে তোমরা, নিশ্চয়ই জান। জ্ঞানের নানা বিভাগের বিচিত্র সংগ্রহ চোখের সামনে ধরাই হচ্ছে মিউজিয়ামের কাজ। লোকশিক্ষার এত বড় উপায় বোধ হয় কমই আছে। একটু বড় হয়ে মিউজিয়ামের যে সব গ্যালারীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি, হয়তো একটা গ্যালারীও একদিনে শেষ করতে পারি নি—দিনের পর দিন একই গ্যালারীর প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, ছেলেবেলায় ২।৩ মিনিটের ভিতর সে সব গ্যালারী দেখা শেষ করেছি ভাবলে হাসি পায় না কি?

কিন্তু মিউজিয়াম্ বলতেই যে লণ্ডনের বৃটীশ মিউজিয়াম্, নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়াম্ বা কলকাতার ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের মত বিরাট ব্যাপার বুঝতে হবে তার কোন মানে নেই। ছোটখাট, প্রাইভেট্ অর্থাৎ ঘরোয়া বা নিতান্ত ব্যক্তিগত মিউজিয়াম্ও হ'তে পারে।

ইয়োরোপ, আমেরিকায় প্রায় প্রত্যেক স্কুল-কলেজে এ রকম ছোটবড় নিজস্ব মিউজিয়াম্ আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে (যেমন নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি) এ ধরণের মিউজিয়াম্ আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কোন কোন কলেজেও আছে। আজকাল এ দেশের অনেক স্কুলেও ছোটখাট মিউজিয়াম্ রাখবার চেষ্টা হচ্ছে—অবশ্যি এখনও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

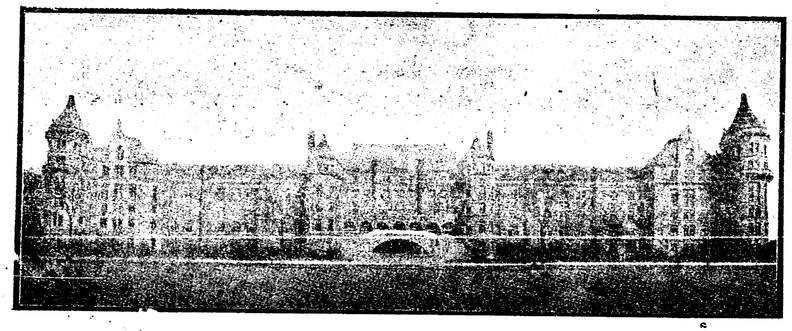

নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিষ্ট্রী মিউজিয়াম্

কয়েক মাস আগে রামধনুর একজন গ্রাহক রামধনুতে 'হবি' বা 'হেয়ার্ল-বাতিক' সম্বন্ধে একটি বিভাগ খুলবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমার মনে হয়—ছোটদের যত রকম 'হবি' আছে—এই রকম সখের মিউজিয়াম্ বা 'সংগ্রহশালা' গড়ে তোলা তার মধ্যে বেশ একটি লোভনীয় বিষয়। ভাল একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলবার আনন্দ বড় কম নয়—আর 'জেনারেল নলেজ' অর্থাৎ 'সাধারণ জ্ঞান' বাড়াবার পক্ষেও এর যুড়ি নেই। আমার তোমাদের চুপি চুপি বলছি, ছেলেবেলায় আমার নিজের এই রকম একটি ছোট্ট সংগ্রহশালা ছিল। প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং আরও নানান ধরণের টুকিটাকি জিনিষ (আজেবাজে ছেলেমানুষী 'সংগ্রহ'ও তার মাঝ বাদ পড়ত না) পেলেই তা যোগাড় করতাম, আর আমার বিদ্যেবুদ্ধি মাফিক তাকে একটা বিজ্ঞান-সম্মত রূপ দেবার চেষ্টা করতাম। এ জন্য ঠাট্টা-টিটকারিও কম সহ্য করতে হ'ত না। শিশুমনে সে আঘাত সময় খুবই দুঃসহ হয়ে পড়ত সন্দেহ নেই, কিন্তু বয়সীদের কাছে খাতিরও যে জুটত না এমন নয়। যাক্ সে সব পুরোনো কথা।

তোমাদের অনেকেরই হয়তো নানা দেশের টিকেট সংগ্রহের বাতিক আছে। নানা দেশের ও নতুন মুদ্রা সংগ্রহও হয়তো কেউ কেউ ক'রে এ ছাড়া দিয়াশলাই-বাক্সের ছবি, সিগারেট-বাক্সের চকোলেটের ছবি, সেফ্‌টি রেজারের মোড়কের ইত্যাদিও অনেকে জমাও। ভাল ভাবে য়্যাল্‌বামে সাজা পারলে এর সবগুলিই দেখতে অতি চমৎকার হ বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের হাতের লেখা, নামস ইংরাজিতে যাকে বলে "অটোগ্রাফ্", বিখ্যাত সাহিত্যি শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক, খেলোয়াড় প্রভৃতির ছবি এ সব সংগ্রহ করার বাতিকও হয়তো কারো কারো আছে এর সব কিছুই তোমার ছোট্ট মিউজিয়ামে রাখতে পা সেই সঙ্গে লেবেল এঁটে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যুড়ে দি পারলে তো কথাই নেই।

বাংলা দেশের নানা জায়গায় নানা রকম ফসল অন্য বাণিজ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কোথাও হয় প্রচুর প কোথাও হয় চা, কোথাও তামাক, কোথাও বা কিছু। এই সব জিনিষ সংগ্রহ ক'রে ছোট ছোট শি বা কাগজের বাক্সে ভরে জেলা অনুসারে ভাগ ক রাখতে পারলে চমৎকার হয়। সেই সঙ্গে যদি ঐ জিনিষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—উৎপন্নের পরিমাণ, স

যোগাড় ক'রে লিখে দিতে পার তবে তা আরও হবে। এই ভাবে বাংলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ টা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চল নিয়েও সংগ্রহ ারে। ঝরিয়া বা রাণীগঞ্জের কয়লা, কোডর্মা, াগ, মধুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অভ্র, সিংভূমের াথর, মানভূমের লোহা-পাথর ইত্যাদি কত রকম দার্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোন্ পাথর থেকে রোয়, কোন্‌টা থেকে য়্যালুমিনিয়াম্ পাওয়া যায়, তামার আকর, কোন্‌টা ম্যাঙ্গানীজের আকর জানতে কম আনন্দ হয় কি? এমন কি যে পাথরে সোনা থাকে চেষ্টা করলে সে পাথর সংগ্রহ কিছু কঠিন নয়। খনিজ পদার্থ ছাড়া বিশেষ জায়গায় বেড়াতে গেলে কত অদ্ভুত জিনিষ সংগ্রহ করতে পার। সমুদ্রের ধারে তো মিউজিয়ামের ভাণ্ডার পড়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে ই হ'ল। রাজমহল পাহাড়ের কালো পাথরের ইতিহাস জান? ওখানে তেমন জায়গায় খোঁজ করলে অধুনালুপ্ত তিহাসিক যুগের গাছপালার ফসিল যেতে পারে এ খবর রাখ কি? ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর সংগ্রহ করাও যত কঠিন বাইরে থেকে মনে হয় এর সবই তোমার মিউজিয়ামের পরম সম্পদ্ পারে।

নিজ পদার্থের মত বিশেষ বিশেষ জায়গার শিল্প করা যেতে পারে। কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল, রের সূক্ষ্ম কাপড়ের টুকরো, খাগড়ার কাঁসার নমুনা, শাঁখার কাজের নমুনা, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের নমুনা, পুরীর শিঙের কাজের নমুনা—এ সব যদি ভাবে ভাগ ক'রে সাজিয়ে রাখতে পার তবে দেখে অনেকেরই তাক লেগে যাবে, দেখো। শুধু শিল্প নয়, আমাদের দেশের গ্রামের কারিগরেরা হাতে রকম জিনিষ গড়ে। এই সব গ্রাম্যশিল্পের সঙ্গেও থাকা উচিত। চিত্রবিচিত্র মাটীর বাসন, কাপড় বা সুতোর জিনিষ, বাঁশের, কাঠের বা বেতের জিনিষ প্রভৃতি এক এক জায়গার বৈশিষ্ট্য এক-এক জিনিষ। এগুলো সংগ্রহ করা কিছুই কঠিন নয়, কিন্তু তোমার মিউজিয়ামের কদর বাড়াতে এগুলি অদ্বিতীয়। অমনি ধারা নানা জায়গায় প্রচলিত দেশী খেলনার সংগ্রহও কম মূল্যবান্ হবে না।

আজকাল ইস্কুলের নীচু ক্লাস থেকেই বিজ্ঞান পড়ান হয়। গাছপালা, পশুপাখী—এদের বিষয়ই বেশী। উদ্ভিদ্ বিষয়ক সংগ্রহ আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ সন্দেহ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফার্ণ গাছের পাতা থেকে সুরু করে

প্রাচীন মুদ্রা—সখের মিউজিয়ামের একটি লোভনীয় 'সংগ্রহ'

ঠাণ্ডা দেশের পাইনের পাতা আর খোলা বীচি, সুন্দরবনের নোনা জলের উল্টোমুখী শিকড় (ইংরাজীতে যাকে বলে 'ব্রীদিং রুট্'), পোকামাকড়ভোজী রাক্ষুসে গাছ—এর সবই তোমার মিউজিয়ামের পক্ষে লাভনীয় সম্পদ্ হ'তে পারবে। গাছপালার সংগ্রহ দু'রকম ক'রে রাখতে হয়। এক—শুকিয়ে, কাগজের গায়ে এঁটে, আবার কোন কোনটা তরল ওষুধে ডুবিয়ে। এর প্রক্রিয়া বা মালমশলা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়।

প্রাণিবিজ্ঞানের নমুনা সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে একটু কঠিন হ'লেও অনেক ছেলের এদিকেও মহা উৎসাহ দেখা যায়। তারা ফড়িং, কাঁচপোকা, গুটিপোকা, প্রজাপতি থেকে আরম্ভ ক'রে নানা রকম অদ্ভুত পোকামাকড় সংগ্রহ ক'রে (অবশ্যি জ্যান্ত নয়) সাজিয়ে রাখতে পিছপা হয় না।

এ বিষয়ে অবশ্যি একটু সাবধান হওয়া উচিত—কারণ অনেক বিষাক্ত পোকামাকড়ও আছে। না জেনে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিপদ্ হ'তে পারে।

মিউজিয়ামের জন্য সংগ্রহকারীরা পাহাড়ে-জঙ্গলে পাখীর ডিমের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমেরিকার ধনী লোকদের মধ্যে সখের মিউজিয়াম্ তৈরী করার বাতিক খুব বেশী। এই সব মিউজিয়ামের জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে তারা প্রচুর অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। ফলে মিউজিয়াম্‌ওয়ালাদের জন্য সেখানে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও গজিয়ে উঠেছে—যাদের কাজ হচ্ছে এই সব সখের সংগ্রাহকদের নানা ধরণের জিনিষ যোগান দেওয়া। অবশ্য পয়সার বিনিময়ে। কিছুদিন আগে একখানা আমেরিকান্ পত্রিকায় এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পড়েছিলাম। এখানে কত হরেক রকম জিনিষ—কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ যে সর্ব্বদা মজুত থাকে এবং তা কি প্রচুর পরিমাণে তা শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না। সামান্য একটু ফর্দ্দ শোন:

এক নম্বর—পোকামাকড়ের সংগ্রহ। এর সংখ্যা হচ্ছে চার কোটি। এর মধ্যে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য এবং বিষধর পোকাও বাদ নেই। কোন কোনটা জ্যান্ত রাখা হয়। সেগুলো অবশ্য সখের মিউজিয়ামের জন্য নয়; পোকামাকড়ের উপর ওষুধপত্র দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবার জন্য সেগুলো বিজ্ঞানীরা কিনে নেন। কোন কোন পোকার জন্য সংগ্রহকারীরা শত শত টাকা খরচ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

২ নম্বর—পাথর বা খনিজ পদার্থের সংগ্রহ। এ… সংখ্যা দশ হাজার। তার মধ্যে অতি সাধারণ পাথর—যা… এক টুকরোর দাম কয়েক পয়সা … আনা,—তা থেকে সুরু ক'রে নানা রকম মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য পাথর—যার একটি ছোট টুকরোর দাম ক… ক'রে ২।৩ হাজার টাকা—সবই পাবে… স্কুল-কলেজের মিউজিয়ামের জন্য এ… সব খনিজ পদার্থ ও পাথরের চাহি… খুব বেশী।

৩ নম্বর—সামুদ্রিক প্রাণীর সংগ্রহ। … এও কয়েক হাজার। তারামাছ, জেলিফিশ, কটলফিশ, সামুদ্রিক শ্যাওলা, প্রবাল, সি-য়্যানিমোন, শামুক-ঝিনুক—কিছুই বাদ যায় না। এমন কি অক্টোপাসের বাচ্চার দরকা… হ'লেও তুমি এখানে কিনতে পাবে।

৪ নম্বর—জীবজন্তুর কঙ্কাল। মানুষ থেকে আরম্ভ ক… গরিলার কঙ্কাল—যা চাও। সাপ, ব্যাঙ, পাখী, গিরগি… এ সবের তো আছেই, এমন কি অনেক প্রাগৈতিহাসি… যুগের লুপ্ত জীবজন্তুর ভাঙ্গা হাড়ের টুকরোও চাই… তোমাকে হয়তো এখানকার কর্ত্তারা যোগাড় ক'রে দেবে… এই সব কঙ্কালের অধিকাংশই দরকার হয় মেডিক্যা… কলেজের বা প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য। প্রতিষ্ঠানে… কর্ত্তারা নানা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায়ই এ… ধরণের অর্ডার পান—'৪০টি কুমীরের কঙ্কাল পাঠাও… '১০০টা কুকুরের মাথার খুলির বিশেষ দরকার।'

ডাক্তারী ছাত্রদের জন্য কঙ্কাল ছাড়া শরীরের আ… নানা অংশের দরকার হ'তে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে … সবই সংগ্রহ ক'রে দরকার মত ওষুধপত্র দিয়ে তাজা রা… হয়। মগজ, লীভার, হৃদ্‌পিণ্ড, অন্ত্র, কিডনি—… যা চাও মুহূর্ত্তে এনে হাজির করবে। আসল জিনি… বদলে মডেলও দিতে পারবে।

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যও হরেক রকম জিনিষ, যা তা… কাজে লাগতে পারে অথচ সচরাচর সংগ্রহ করা কষ্ট… …ষ্ঠান থেকে সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়। স্কুল-কলেজ… চড়া দামে কেনা হয়, ছাত্রেরা নিজেরাও অনেক …তে কসুর করে না।

…ছাড়া আজগুবি সখের জিনিষ—যা বেশীর ভাগ …উজিয়াম্‌ওয়ালারাই কেনেন—এবং তার জন্য ভাল …ম দিতে পিছ-পা হন না—তাও এদের কাছে …জার সংগ্রহ করা থাকে। যেমন ধর—নানা রকম …ডিম—পাখীর; সাপের, কুমীরের। পাখীর বাসা, …ছবি, অসভ্য জাতের লোকদের ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্র …ক, দুষ্প্রাপ্য বই, নামকরা লোকদের অটোগ্রাফ্, …শের ডাকটিকেট, মুদ্রা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাছ …র চিহ্ন—ফসিল, নানা দেশের প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন …দিনের পুরোনো দুষ্প্রাপ্য হাতে-লেখা পুঁথি, দলিল-পত্র বিখ্যাত লোকদের ব্যবহৃত জিনিষ, নানা জিনিষের মডেল, প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র,—এমন কি আদিম মানুষের ব্যবহৃত ব্রোঞ্জ বা পাথরের অস্ত্র, আকাশ থেকে খসে-পড়া উল্কাপিণ্ড—এমনি ধারা কত কি! এ সব জিনিষ যোগাড় করা অবশ্য কম হাঙ্গামা নয়। এ জন্য বহু টাকা মাইনে দিয়ে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হয়—আর পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা বয়সের, নানা জাতের, নানা ধরণের লোকের ভিতর থেকে বেছে নেওয়া হয় সংগ্রহকারী। তেমন তেমন সংগ্রহকারীরাও পারিশ্রমিক হিসাবে বড় কম টাকা পায় না।

আমাদের দেশে অবশ্যি ঠিক এই ধরণের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়েছে ব'লে শুনি নি। কাজেই তোমাদের মিউজিয়ামের "সংগ্রহ" তোমাদের নিজেদেরই যোগাড় করতে হবে। আর সেইটেই তো ভাল! নয় কি?

আধ গাড়ি খড় ফাঁক

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

…খো, দেখো লোকটাকে! একটা ডাহা আধ গাড়ি … ক!'

…মাদের এই শ্রমিক ব্যক্তিটিতে সব চেয়ে চল্‌তি কথা …ছিল: আধ গাড়ি খড় ফাঁক। যদি কমাণ্ডার …টের প্যাকেট লুকিয়ে রাখতেন আর কাউকে … না চাইতেন, আমরা অমনি ব'লে উঠতুম: … কমাণ্ডার, আধ গাড়ি খড় ফাঁক।' কিংবা কেউ …জোরে হেঁচে উঠে জামার আস্তিনে তার আঙ্গুল মুছতো, আমরা তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতুম, 'এক্কেবারে আধ গাড়ি খড় ফাঁক!'

এক কথায়, যাকে তাকে যে কোন সময় আমরা ব্যঙ্গ করতুম, 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' ব'লে। কথাটা সেখানে খাটে কিনা, ওর কোন মানে হয় কিনা, সে সব ভাববার দরকার হ'ত না। তবে আমাদের কোন দুরভিসন্ধি থাক্‌তো না কথাটার মধ্যে। আর ওইটাই আমাদের একমাত্র রহস্যের কথা ছিল ব'লে কত বারই যে কথাটার

ব্যবহার করতুম আমরা! ওটাকে বাদ দিলে জীবন যেন শীতের পাহাড়ের মতন শুক্‌নো নীরস হয়ে উঠতো।

যে-কোন লোককেই আমরা ওই নাম দিতুম বটে, কিন্তু আসল 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' অনেক দিন আগে আমাদের সৈন্যদল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর সত্যি সে ছিল এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক, ও রকম বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দলে যোগ দেবার সময় থেকে সুরু করে তাকে আজ্ঞান অবস্থায় স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে তাকে সেরা কমরেড বলেই মনে করতুম আমরা।

আমাদের কেউই তাকে ভোলে নি। এমন কি আমাদের কমাণ্ডারও 'আধ গাড়ি'র পুরোনো পাইপটা অতি প্রিয় স্মৃতিচিহ্নের মতন যত্ন ক'রে রেখেছিলেন। হ্যাঁ, এই পাইপ ছাড়া কক্ষনো দেখা যেত না 'আধ গাড়ি'কে, তাতে তামাক থাকুক বা না, তা' সে জ্বলুক বা নিভে যাক্—কিছুই এসে যেত না তার কাছে। কোন কাজ না থাকলেই সে একা একা ঘুরে বেড়াতো, বসতো একটা গাছের তলায় পাইপ মুখে দিয়ে, আর ভ্রূ যোড়া কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো ঢেউ খেলানো মাঠের শেষে। কখনো বা আপনা থেকেই পাইপে টান দিত সে আর ধূসর ধোঁয়ার দু'টো কুণ্ডলী বেরুতে থাকতো তার নাকের মধ্যে দিয়ে। আমরা তাকে ঘিরে দাঁড়াতুম, জিজ্ঞেস করতুম:

'আধ গাড়ি, এখনো সেই খড় আর ছেলের কথা ভাবছো বসে বসে?'

সে উত্তেজিত হয়ে উঠতো, আবেগে তার কথা আটকে যেত: 'কে-কে-কেন ভাববো না? ক-ক-ক-কমাণ্ডার কত দিন তাদের খবর দেন নি!'

তার মতে, আমাদের কমাণ্ডার সর্বজ্ঞ; আর আধ গাড়ির পরিবারের সন্ধান তাঁর না দিতে পারবার কারণ সে ভাবতো তিনি নাকি মনে করতেন যে বাড়ির খবর পেলেই এই স্বেচ্ছাসৈনিকটি আমাদের দল ছেড়ে ঘরে পালাবে।

'আধ গাড়ি' কিন্তু সর্বদাই ঘর-সংসারের দিবাস্বপ্ন দেখতো না—ফলন্ত জমি চাষ করবার আশায় গাঁয়ে ফিরে যাবার কামনাই সে করতো বেশী।

'দেখছো', অঙুল উঁচু ক'রে সে বলতো, 'বুনো ঘাস ক্ষেতের মধ্যে কী সব হ'য়ে জন্মাচ্ছে!'

আর তার পর ভাবগম্ভীর মুখে পাইপটা টেনে, কথা শেষে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে যোগ করতো:

'জাপানীরাই যত নষ্টের গোড়া। আগে লোকে শান্তিতে বাঁচতে পারতো, খেতে পরতে পেত। তবে তো বুনো ঘাস এমন ক'রে বাড়তে পেত না!'

চোখের কোণ পরিষ্কার করে নিয়ে, জমির ওপর ঝুঁকে পড়ে সে খানিকটা মাটি মুঠো ক'রে নিত। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে তার গড়নটা সে বেশ ভালো ক'রে পরীক্ষা করতো, শুঁকতো, চেখে দেখতো। তারপর আপন মনে মাথা নেড়ে বিড় বিড় ক'রে বলতো: 'আঃ, কী উর্বর জমি!'

'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' একটা স্বদেশী গানও কোন দিন শিখতে পারে নি। একবার সে আমাদের সকলের সঙ্গে মিলে কোরাস্ গাইবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার গলা ছেড়ে গান ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ডাক শুনে আমরা হাসিতে ফেটে পড়ি, হাসতে হাসতে আমাদের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তার পর থেকে সে আর এক কলিও গাইতে চাইতো না আমাদের সঙ্গে। গান গাইবার সময় আমাদের মুখের ওপর তার লাজুক চোখ দু'টি রেখে, পাইপ মুখে সে শুধু হাসতো।

তবে ছেলেবেলায় শেখা একটা গানের দু'টো সাদাসিধে লাইন সে জানতো আর দুঃখে-সুখে কুচকাওয়াজে শিবিরে সর্বদাই সে গাইতো এই লাইন দু'টো:

'রাজধানী ছেড়ে যবে চলে যাই আমরা,
হয় তো তা বেজে ওঠে, নয় তো ঝরে...'

তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এই ভাবে।

সে সন্ধ্যেটা ছিল কুয়াশায় ঢাকা। বাইরে কিসের গোলমালে আমরা সবাই ছুটে বেরিয়ে এসে শুনলুম, এক বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়েছে কমাণ্ডারের হাতে। কমাণ্ডারের চারদিকে ভিড় ক'রে আমরা উঁকি দিয়ে দেখতে গেলুম বন্দী দেশদ্রোহীকে। হতভাগাকে তখন পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখটা তার মড়ার মতন ফ্যাকাশে, আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে সারা দেহ। বাদামি রঙের ফারের টুপি তার মাথায়, আর কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে একটা কাস্তে আর পাইপ।

তার কাছ থেকে পাওয়া ছোট্ট একটা 'সূর্য-পতাকা' (জাপানী নিশান) হাতে নিয়ে কঠোর ভঙ্গীতে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কমাণ্ডার।

আমরা পা ঠুকে চীৎকার ক'রে উঠলুম: 'জাহান্নামে যাক্। কেমন চাষা সেজেছে দেখো!'

'বিশ্বাসঘাতকটাকে গুলি করলেও ভাল করা হয়!'

কে একজন তাকে লাথি কষিয়ে দিলে—অম্‌নি সে একেবারে টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে কমাণ্ডারের পায়ের নীচে পঙ্গুর মতন পড়ে রইল।

এতখানি কাপুরুষতা আমাদের অসহ্য লাগলো; এক-জন বললে: 'হা, হা! এটা দেখছি একতাল গোবর!'

কিন্তু এই নির্লজ্জ দৃশ্যেও অবিচলিত রইলেন আমাদের কমাণ্ডার। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আরো খবর বার ক'রে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

'হুজুর!' পাজিটা অনুনয় ক'রে বল্‌লে, 'আমি কিন্তু নির্দোষী। আমার নাম ডু-ডু-ডুস্ ওয়াং—সবাই আমাকে ওই নামে জানে, সবাই—'

'এটা কি তোমার ছোট নাম?'* কমাণ্ডারের চোখে যেন কৌতুকের আভাস দেখা গেল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! আমার বাবা আমাকে এই ছোট নামটা দিয়েছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না, তাই ভূত তাড়াবার জন্যে এই নাম আমায় দেন।'

'তা হ'লে তোমার ভাল নাম কি? দাঁড়িয়ে উঠে বলো।'

'ভালো নাম নেই, হুজুর!' বেচারা ডুস্ ওয়াং সেই দুঃখে কেঁদে ফেল্‌লে। 'বাবা বলতেন,—চাষা কখনো ইস্কুলে যায় না, জমিদারের খানা-ঘরে বসতে পায় না, তাই তার ভালো নাম রাখবার কোন দরকার নেই।'

'কী ব'লে তা হ'লে ডাকতো তোমায়?'

'ওই, আধ—আধ হুজুর, আধ গাড়ি খড় ফাঁক।'

'য়্যাঁ!' আমরা বেশ বুঝতে পারলুম কমাণ্ডারের গাল কুঁচকে উঠেছে হাসি চাপতে গিয়ে; 'কি ফাঁক?'

'আধ গাড়ি খড় ফাঁক, হুজুর!'

'কে তোমার এ নাম রেখেছে?'

'আমায় সবাই মিলে ওই ব'লে ডাকতো', ডুস্ ওয়াং লজ্জায় মুখ-চোখ লাল ক'রে জবাব দিলে। দাগী মুখো ওয়াং আমায় নামটা দেয়। সে কেবলি বল্‌তে আমি কোন কম্মেরই না, আমি একটা ভূত।'

আমরা আর নিজেদের সামলাতে না পেরে গলা ছেড়ে হেসে উঠলুম।

কমাণ্ডার কিন্তু হাসলেন না। বিশ্বাসঘাতকটাকে জেরা ক'রে চললেন।

'ওয়াং চুয়াং গাঁয়ে আমার ঘর', ডুস্ ওয়াং আবোল-তোৎলামি ক'রে বল্‌লে, 'ব-ব-ব-ড় ওয়াং চুয়াং, ছোটখাট নয়। চাষবাস ক'রে দিন কাটছিল বেশ। এমন সময় 'উত্তুরে ফৌজ'† হাজির হ'ল দেশে। তারা আমাদের ছেলেদের খুন করতে আরম্ভ করলে, মেয়েদের ধ'রে নিয়ে যেতে লাগলো, লোকদের গুলি ক'রে, গলা কেটে গাঁ-কে গাঁ উজাড় ক'রে দিতে লাগলো। উঃ, সে কি ভয়ানক!

'আমার বৌ বল্‌লে: "চলো, এইবার আমরা পালিয়ে যাই; সবাই তো পালাচ্ছে। আর এখানে থাকা চলবে না। আর কোন জায়গায় গেলে শুধু জল খেয়েও আমরা এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে-শান্তিতে থাকবো।"

'তাই আমরা গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম—আমার ছেলে পাপ্পি, আমার বৌ আর আমি। আজ দু'দিন ধ'রে আমার বৌ জল, ভাত কিছুই খায় নি, শুকনো থলের মতন পেটটা তার খালি হয়ে গেছে। পাপ্পি দুধের জন্য সারাদিন কাঁদছে, কিন্তু তার মার বুকে একটি ফোঁটাও দুধ নেই।'

এই পর্য্যন্ত ব'লে আমাদের বন্দী মাথা নীচু করলে আমরা দেখলুম, তার গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল।

কমাণ্ডার আরো গম্ভীর গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'সংক্ষেপে বলো আমায়, কেন ওই সূর্য-নিশানটা কাছে রেখেছো?'

'হুজুর, আমার বৌ বললে: "দেখো, এই রকম যুদ্ধের দিনে কোন সময় আমরা না খেয়ে মরে যেতে পারি

* চীনা কৃষকেরা তাদের শিশুদের গোড়াতে একটা বাজে নাম দেয়, তাকেই এখানে 'ছোট নাম' বলা হয়েছে। শিশুরা বড় হ'য়ে ওঠবার পর এই নামটা পালটানো হয়। তাদের ধারণা, এমনি যা তা নাম রাখলে শয়তানের কুদৃষ্টি এড়িয়ে শিশুরা ভাল ভাবে বাড়তে পারবে।

† জাপানী সৈন্যদল।

কিন্তু আমাদের ছেলেকে বাঁচাতে হবে। তাকে তোমায় দেখতেই হবে। বাছা পাপ্পি কেন মরবে? সে তো কোন দোষই করে নি!" তাই আমার বৌ আবার বললে: "গাঁয়ে ফিরে যাও, গিয়ে ক্ষেত খুঁড়ে গোটাকতক গাজর নিয়ে এসো। খোকা তা হ'লে খেয়ে বাঁচতে পারবে।"

'সকাল বেলা আমি গেলুম গাঁয়ের দিকে। গিয়ে যেই গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি, অমনি গোটাকতক সেপাই কোত্থেকে এসে, একেবারে বলা নেই কওয়া নেই, আমার ওপর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি দৌড়ে পালিয়ে এলুম। এক ছুটে আমাদের কুঁড়েতে এসে দেখি, পাপ্পি তখনো তার মার বুকে প'ড়ে কাঁদছে।'

বলতে বলতে ওয়াং নিজেই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

'কান্না থামাও', কমাণ্ডার তাকে ধমক দিলেন। 'তা হ'লে এমনি ভাবে তুমি বিশ্বাসঘাতক হয়েছো?'

'ভূতে ধরুক বিশ্বাসঘাতককে! আমি যদি তাই হতুম, হুজুর, আমার মাথায় তা হ'লে আকাশ ভেঙ্গে পড়তো।' কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে উত্তেজিত গলায় ব'লে চললো 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক': 'কেউ কেউ বলে, যাতে একটা সূর্য-নিশান থাকলে 'উত্তরে ফৌজ' আর গুলি চালায় না, ছেড়ে দেয়। তাই আমার বৌ এই নিশানটা আমায় দিলে। এটা তার নিজের হাতেই তৈরি। "আর একটুও সময় নষ্ট ক'রো না"—সে বললে আমায়, "এখুনি চলে যাও আর তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

'তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম: "দক্ষিণে ফৌজের সামনে যদি পড়ি তা হ'লে এই ঘেন্নার জিনিষটাকে নিয়ে কী ভয়ানক বিপদ্ হবে আমার!"

'বৌ আমার মুখের ওপর জবাব দিলে: "বোকা তারা আমাদেরই মতন চীনে—জাপানী নয়।"

'চীনে হ'য়ে আমি কেন বিশ্বাসঘাতক হ'তে যা হুজুর! কি কুক্ষণেই যে বৌ আমায় নিশানটা নি বলেছিলো!'

কমাণ্ডারের দিকে নির্বোধের মতন চাইলে সে; তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন।

আরো গোটাকতক প্রশ্ন করবার পর তাঁর মুখের রেখাগুলো অদৃশ্য হ'ল। তিনি হাসতে হাসতে বাঁধন খুলে দিতে বললেন আমাদের। মুক্তিলাভ ক'রে 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' দু' আঙুলে চেপে সশব্দে নাকটা নিলে। আমি লক্ষ্য করলুম, তার প্রায়-নতুন জুতো যো শুকনো কি যেন আলোয় চক্‌চক্ করছে।

'এখন থেকে আর জাপানী শয়তানদের 'উত্তরে ফৌ ব'লো না, বুঝলে?' কমাণ্ডার তাকে বন্ধুর মতন ব্যা করলেন: 'আগেকার সঙ্গে এখনকার অবস্থার অ তফাৎ। এখন দু'টি মাত্র ফৌজ আছে—চীনা জাপানী। আমার কথা বুঝতে পারছো?'

'নিশ্চয়ই!' মাথা নেড়ে সে বললে, 'আমি কি যে এই কথাটা বুঝতে পারবো না?'

কমাণ্ডার তার সূর্য-পতাকাটা তাকে ফিরিয়ে দি বললেন: 'আজ রাতে আমাদের সঙ্গে সুপ খাবার নিম রইল তোমার। শত্রুকে আগে আমরা তাড়িয়ে দি তারপর যদি তোমার ইচ্ছে হয়, গ্রামে ফিরে গিয়ে খা তুলো, কেমন? নিশানটা সঙ্গে নাও, আর যদি ও সামনে পড়ো, ওটা দেখিয়ে দিও; কিন্তু আমরা কো আছি, ওদের ব'লো না যেন।'* (ক্রমশ

* ইয়াও শুয়ে-ইনের গল্প

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

শ্রীকৌটিল্য.

আমাদের বাংলা দেশ একদিক্ দিয়ে খুব ভাগ্যবান্। সে হচ্ছে বাংলার কবি-ভাগ্য। বাংলা দেশে এমন এমন সব কবি জন্ম গেছেন যাঁদের লেখা নিয়ে বাংলা সাহিত্য যে কোন বড় সাহিত্যের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে, এবং এ রকম কবির সংখ্যাও খুব কম নয়। এ যু রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাচীন যুগের বাং বৈষ্ণব কবিদের নিয়েই যে কোন দেশ গর্ব্ব করতে পার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বিদ্যাপ

কবিতাকেও বাংলা কবিতার মধ্যেই ধরা হয়) এঁদের বলছি। বৈষ্ণব কবি ছাড়াও বাংলায় বড়দরের অভাব ছিল না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, স ওঝা, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, াদ সেন প্রভৃতি কত নাম করব?

ারতচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল নরেন্দ্রপুর, বর্দ্ধমান । সেইখানেই ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রায় ছিলেন একজন জমিদার। বাংলা দেশে তখন আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব চলছে।

ারতচন্দ্র কিন্তু বেশী দিন নরেন্দ্রপুরে থাকবার সুযোগ ন। তাঁর বাবার সঙ্গে বর্দ্ধমানের মহারাণীর কি নিয়ে ালিন্য ঘটে, ফলে তাঁদের জমিদারী কেড়ে নেওয়া অল্প বয়সেই ভারতচন্দ্রকে মামাবাড়ীতে আশ্রয় হয়। মামাবাড়ীতেই ভারতচন্দ্রের লেখাপড়া হয়। কৈশোর পর্য্যন্ত তিনি মামবাড়ীতেই দেন, তার পর চলে আসেন দেবানন্দপুর। জেলার ব্যাণ্ডেলের কাছে এই গ্রাম। সেখানে মুন্সী নামে এক ভদ্রলোক তাঁকে আশ্রয় দেন। কেউ বলেন ভারতচন্দ্র এই দেবানন্দপুরেই জন্মে- । যাই হোক, এই দেবানন্দপুর যে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ভালভাবেই জড়িত তা তাঁর নিজের রচনা জানা যায়—

"দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম—রামচন্দ্র মুন্সী।"

বানন্দপুরে এসে ভারতচন্দ্র খুব ভাল ক'রে ফার্সী র সুযোগ পেলেন। মামাবাড়ীতে থাকতেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তাঁর প্রচুর দখল জন্মেছিল। তখন রাজভাষা—কাজেই ভাল ফার্সী জানা থাকলে ময় নানা দিকে সুবিধা হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত ও ভাল জানতেন ব'লে ভারতচন্দ্র যে মাতৃভাষা বাংলার করতেন না এ কথা মনে ক'র না। পনেরো বছর থেকেই তিনি বাংলায় চমৎকার কবিতা লিখতে তেন এবং দেবানন্দপুরে এসে সে কাব্যচর্চ্চা কিছু মাত্র তে দেন নি।

বছর কুড়ি বয়সের সময় ভারতচন্দ্র আবার নিজের ফিরে যান; সেখান থেকে বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্যের কথা আগেই শুনেছ, এখানে এসে আবার তা নতুন ক'রে বেড়ে ওঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্রকে কারা-গারে আটক থাকতে হয়। শোনা যায়, এই কারাগার থেকে কৌশলে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে তিনি চলে যান উড়িষ্যায়—কটকে।

কটকে গিয়ে ভারতচন্দ্র সুরু করলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চ্চা। সুবাদার শিবভট্ট তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু কটকেও তাঁর বেশীদিন মন টিকল না। একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে আবার তিনি বাংলা দেশে ফিরে এলেন।

ভারতচন্দ্রের তখনও সন্ন্যাসী বেশ। তাঁর জনৈক স্নেহপ্রবণ আত্মীয়ের চোখে এ দৃশ্য বড় কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। এই তরুণ সন্ন্যাসীকে সংসারে ফেরাতেই হবে। ভারতচন্দ্র তখন একজন উঁচুদরের কবি। যাঁরা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিল তারা সকলেই তা পড়ে মুগ্ধ হ'ত। তাই ভদ্রলোক ঠিক করলেন এই কবিপ্রতিভা দিয়েই তিনি ভারতচন্দ্রকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ভারতচন্দ্রের কবিতারও প্রচারের দরকার ছিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তখন নদীয়ার রাজা। গুণীর অসাধারণ আদর ছিল তাঁর কাছে। তাঁর রাজসভা অনেকটা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মতই নানা 'গুণিরত্নে' সাজান থাকৃত। ভারতচন্দ্রকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল।

বলা বাহুল্য প্রথম পরিচয়েই কৃষ্ণচন্দ্র এই বিরাট প্রতিভাবান্ পুরুষকে চিনতে পারলেন এবং তাঁকে তাঁর সভাকবি পদে বরণ করে নিলেন। রাজ-সরকার থেকে তাঁর জন্য একটা বৃত্তির ব্যবস্থা হ'ল। ভারতচন্দ্রের কাজ হ'ল রাজাকে নিয়মিত স্বরচিত কবিতা শোনান'। নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি কাব্যচর্চ্চায় মন দিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভারতচন্দ্র একটির পর একটি কাব্য রচনা ক'রে চললেন। তার মধ্যে 'অন্নদা মঙ্গল' এবং তার অংশ 'বিদ্যাসুন্দর' বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। ভারতচন্দ্রের ছন্দ-জ্ঞান, শব্দালঙ্কার, ভাষার মিষ্টত্ব এবং বর্ণনা-ভঙ্গী ছিল অপরূপ। বাংলা ভাষাকে তিনি এক অপরূপ রূপে সাজিয়ে তুললেন। খুব কম কবিই এদিক্ দিয়ে তাঁর সমকক্ষ হ'তে পেরেছেন। কৃষ্ণ-

চন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিও কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়েও তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর করে গেছেন—

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা—হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।"

প্রভৃতি রচনার কথাই বলছি। বড় হয়ে তোমরা এই সব রচনা নিশ্চয়ই পড়বে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে শুধু রায় গুণাকর উপা... মূলাজোড় গ্রামখানিও তিনি ভারতচন্দ্রকে ... সে যুগেও এর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ছ' ... ভারতচন্দ্র সেখানে বাড়ী তৈরী করে শেষ ক'টা ... দেন। কিন্তু বেশী দিন নয়, মাত্র ৪৮ বছর ব... এই মহাকবির মৃত্যু হয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ... চন্দ্র চিরকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে ...

তিনটি প্রশ্ন

শ্রীসীতা দেবী

এক ছিলেন রাজা, তাঁর ছিলেন এক সভাপণ্ডিত। সত্যিকারের পণ্ডিত। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি অমায়িক ব্যবহার; অথচ তাঁর প্রখর বুদ্ধির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

এ হেন লোককেও রাজা, কুলোকের কথায় ভুলে, বিনা-দোষে দিলেন নির্ব্বাসন দণ্ড। পণ্ডিত কোন আপত্তি করলেন না, মাথা নীচু ক'রে রাজ-আজ্ঞা মেনে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

কিছু দিন যায়। এক বিদেশী রাজা এসে রাজ্য আক্রমণ করলেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এই বিদেশী রাজার। তাঁর পরাক্রমে সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে পড়বার গতিক হ'ল। রাজা সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। বিদেশী রাজা বললেন, "আমি তিনটি প্রশ্নের জবাবের জন্য এসেছি। আপনার রাজ্যের কেউ যদি এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে তবেই আমি চলে যাব, নইলে এ রাজ্য আমার। প্রশ্ন তিনটি এই: প্রথম প্রশ্ন—ভগবান্ কি দেখতে পান, আর কি দেখতে পান না? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভগবান্ কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না? তৃতীয় প্রশ্ন—ভগবান্ এখন কি করছেন?"

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। কে আছে ... প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। একবার তাঁর সভা... কথা মনে পড়ল। কিন্তু তাঁকে তো দেশ থেকে ... দিয়েছেন।

বিদেশী রাজা সাত দিন সময় দিয়েছেন। ... দেখতে ছ'দিন কেটে গেল, প্রশ্নের জবাব ... রাজা রাজ্যের জ্ঞানী, গুণী সবাইকে নিয়ে ... বসালেন, কিন্তু নাঃ, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ... হঠাৎ এক বুড়ো ভিখারী এসে বলল, "মহারাজ ... রাজা এলে আমাকে সভায় বসতে দেবেন, ... জবাব দেব।" কতক অবিশ্বাসে, সন্দিগ্ধ চিত্তে ... হলেন।

বিদেশী রাজা সশস্ত্র সৈন্য-পরিবৃত হয়ে ... বসেছেন। আজ প্রশ্নের জবাব দেবার দিন ... উৎকণ্ঠায়, অধীর হয়ে আছে। সেই ভিখারী ... সভার এক কোণে আসন নিয়েছে।

বিদেশী রাজা প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রথ... "ভগবান্ কি দেখতে পান, কি দেখতে পান না ... নিস্তব্ধ, সূচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ ...

...কে জবাব এল—"ভগবান্ সবই দেখতে পান শুধু ... পান না এমন কাউকে যে নাকি তাঁরই সমকক্ষ।" ...কটা অস্ফুট সপ্রশংস গুঞ্জনে সভা ভরে উঠল।

...দেশী রাজা বললেন, "জবাবে খুসী হলাম। এবার ... প্রশ্ন—ভগবান্ কি করতে পারেন আর কি করতে ... না?"

...বার ভিখারীর কণ্ঠ শোনা গেল—"ভগবান্ সবই ... পারেন কিন্তু কাউকে তাঁর রাজ্যছাড়া করতে ... না—কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর রাজ্য।" আবার ...ঞ্জনে সভা মুখরিত হয়ে উঠল।

...দেশী রাজা বললেন, "এবারে আমার শেষ প্রশ্ন। ...ন্ এখন কি করছেন?"

...ত্তর এল—"ভগবান্ এখন ভিখারীকে রাজসম্মান ...বার মতলব করছেন।"

রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। কে এই ভিখারী তাঁকে এত বড় বিপদ্ থেকে মুক্তি দিল! যেই হোক্, এ তাঁর মনের কথা জানতে পেরেছে। তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর রাজমুকুট খুলে ভিখারীর পায়ের কাছে রাখলেন। ভিখারী সসঙ্কোচে সরে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমায় চিনতে পারলেন না? আমি আপনার পুরোনো সভাপণ্ডিত।"

বিদেশী রাজাও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন, বললেন, "রাজসম্মান শুধু এ রাজাই দেখাবেন না—আমিও দেখাব। আমার সব ক'টি প্রশ্নের জবাবই আমি পেয়ে গেছি।" বিদেশী রাজা তাঁর কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলে পণ্ডিতের গলায় পরিয়ে দিলেন।*

* প্রাচীন গল্প থেকে

...র প্রিয় বন্ধুরা,

...ঘট, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং তার উপর কলকাতা... সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এখানকার ...াংশ পত্রিকাই সময় মত প্রকাশিত হ'তে পারে নি। ...বের রামধনুও তাই তোমাদের হাতে পৌছতে কিছু ... হয়েছিল। কাগজের সে দুষ্প্রাপ্যতা এবং পারিপার্শ্বিক ...ল অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ মেটে নি—তবু জ্যৈষ্ঠের ... মাসের গোড়ার দিকেই তোমাদের হাতে পৌছে...ম।

...ারতবর্ষে খুব শীঘ্রই একটা বড় রকম রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন আসছে এ কথা তোমরা সবাই জান। বিদেশীর হাত থেকে আমাদের নিজেদের হাতে দেশের শাসনভার আসবার সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমাদের সকলকেই নানা দিক্ দিয়ে এই নতুন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। তোমাদেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কম নয়। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার—কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণাও দিতে হবে বৈকি!

আমাদের বাংলা দেশের ভাগ্য এখনও অনেকটা অনিশ্চিত। সম্প্রতি বাংলা দেশকে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ও মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গে ভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে এবং এ নিয়ে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়েছে। হয়তো পক্ষ

কালের মধ্যেই এ বিষয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানা যাবে। পাঞ্জাবেও ঠিক এই অবস্থা।

এ সংখ্যায় 'সখের মিউজিয়াম্' নামে একটি প্রবন্ধ দেওয়া হ'ল। 'হবি' হিসাবে এই ধরণের 'সংগ্রহশালা' তৈরী তোমাদের কেমন লাগবে জানি না। যদি এ বিষয়ে তোমাদের আগ্রহ দেখা যায় তবে এ নিয়ে বারান্তরে আলোচনা করব—এবং প্রয়োজন হ'লে কিছু পরামর্শও দেব। সখের বাগান তৈরীর 'হবি'র কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাবে।

মেয়েদের জন্য যে বিশেষ বিভাগ খুলবার প্রস্তাব পেয়েছিলাম তার উপযোগী উল্লেখযোগ্য কোন লেখা এখনও পাই নি। এ বিষয়ে গ্রাহিকাদের সহ চাই।

রামধনুতে আরও কয়েকটি বিভাগ দেবার ই কিন্তু কাগজের বর্ত্তমান অবস্থায় তা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়াতে পারলে তার ব্যবস্থা হবে। নিউ কণ্ট্রোল সম্বন্ধে তোমাদের অনেকের ভুল ধারণা দেখছি। কণ্ট্রোল এখনও আছে।

শ্রীশৈফালী দত্ত, শুক্লা বসু, মৃগাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন, কুমুদ দত্ত, সৈয়দউদ্দীন, চম্পাবতী দেবী, দত্তগুপ্ত, রিটা মিত্র ও রাবেয়া খাতুন—এঁদের বিষয়েও বারান্তরে আলোচনা করব।—প্রীতি ও জেন।—রাঃ সঃ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার নতুন ক'রে যে অশান্তি সুরু হয়েছিল তা এখনও সম্পূর্ণ থামে নি। বড়লাট লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না জনসাধারণকে শান্ত হয়ে গৃহদ্বন্দ্ব থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন। বাংলাকে ভেঙ্গে দু'টি প্রদেশ করবার জন্য সম্প্রতি যে প্রবল জনমত ও আন্দোলন দেখা দিয়েছে এ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বোধ হয় তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসও, খোলাখুলি ভাবে না হ'লেও মোটামুটি ভাবে, এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন।

* * *

আর এক বছরের মধ্যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার যে ঘোষণা করেছেন তদনুযায়ী ব্যবস্থা ও তার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য আগামী ২রা জুন বড়লাট ভারতের নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। হয় সময়েই ভারতীয়দের এবং আমাদের, বাঙ্গালীদের, ভাগ্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে। ই বড়লাট ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরাম আসবেন।

* * *

মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলীর কথা তোমাদের আগে ছিলাম। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রকাশমের জায়গায় ও. পি. রামস্বামী রেড্ডিয়ার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। আরও ১২ জনকে নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছে

* * *

ইতিমধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী পরলো করেছেন। এঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপা পৌত্র বিখ্যাত বৈমানিক ৺ভবদেব মুখো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ৺যোগেশচন্দ্র চ

কোর্টের বিচারপতি ৺জাষ্টিস্ খোন্দকার ও কলকাতা রেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার ৺রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিক্রমে ৪০ বছর কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ন। তোমরা সেকালের 'সাবাস আটাশের' কথা কে শুনে থাকবে। পুরোনো আমলের কর্পোরেশনে চারের প্রতিবাদে আটাশ জন কাউন্সিলার একযোগে াগ ক'রে বাংলা দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। নটরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'সাবাস আটাশ' নাটকে সে ঘটনা অমর ক'রে রেখে গেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিখ্যাত আটাশ জনের একজন ছিলেন।

* * *

কলকাতা কর্পোরেশনের নতুন মেয়র হ'লেন কংগ্রেস দলের শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায়চৌধুরী। কর্পোরেশনের মধ্যে এঁর খুবই প্রভাব। ডেপুটি মেয়র হয়েছেন শ্রীযুক্ত গফ্‌গোভিয়া। ইনি জাতীয়তাবাদী য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্। কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম বার একজন য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ এই পদে নির্ব্বাচিত হলেন।

ওগো মানুষের দেবতা

মোগল এ. ছামাদ

গো জাগো আজ মানুষের মাঝে ওগো মানুষের দেবতা,
ী ঢেকেছে পশু-আচরণে, সহিছ কেমনে কহ তা ?
ছারখার হ'ল সোনার এ দেশ—
যেদিকে তাকাই বিভীষিকা-বেশ,
ইয়ের অঙ্গে ভাই হানে শেল—ভাষায় কেমনে কব তা !
এস আজ হে চির সত্য, ওগো মানুষের দেবতা !

ছি, আজো তুমি ঘুমায়ে রয়েছ !—মানুষ সেজেছে পশু হায়,
রে তারা পঞ্জর কেটে লাল ক'রে দিল বসুধায়।
জাগো জাগো, আর সহে নাকো দেরী,
বাজাও বাজাও তব রণভেরী,
ওগো মহাবলী, সত্যকুশলী, সকল শক্তি হানো তায় ;
স্বর্গ আজিকে হ'ল যে শ্মশান, ফিরে আনো তারে পুনরায়।

ঐ শোন ঐ কাঁপিছে ভূধর থর থর করি' পাপে কার,
কান পাতি শোন চাপা ক্রন্দন সন্তানহারা কোন্ মার !
সর্ব্বহারারে দাও বরাভয়—
ঈশ্বর-খোদা চির দয়াময়,
'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ বাণী ছড়াও চারিধার ;
বিশ্বে এ বাণী ধ্বনিয়া তুলিতে হে দেবতা, তুমি লহ ভার।

সবজান্তা

শ্রীকল্যাণী রায়

ভারতবর্ষে যত গ্রন্থাগার আছে তার মধ্যে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরীই সব চেয়ে বড়। ইহার পুস্তক-সংখ্যা গত বছর ছিল ৪ লক্ষ। অবশ্য ইহার মধ্যে বাংলা বইএর সংখ্যা খুবই কম—মাত্র ১৫ হাজার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারেই বোধ হয় বাংলা বই সব চেয়ে বেশী আছে।

* * *

বাংলা দেশে হাসপাতালের সংখ্যা (১৯৪৫ সনের হিসাব) মোট ১৮৮৩। ইহার মধ্যে ১৪১টি সরকারী হাসপাতাল। সমস্ত হাসপাতাল মিলিয়া মোট ৬১৩৬টি বেড্ আছে। কলিকাতা সহরে মোট ৮টি সরকারী হাসপাতাল আছে। শীঘ্রই দক্ষিণ কলিকাতায় অঞ্চলে একটি নূতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপা খোলা হইবে। এখানে যুদ্ধ-ফেরৎ ডাক্তারদের উচ্চশি ব্যবস্থা হইতেছে।

* * *

কলিকাতা সহরে কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত অ যে সমস্ত রাস্তা আছে তাহা পর পর যুড়িয়া দিলে মোট মাইল লম্বা হইবে। ঐ সব রাস্তায় যে সব পাকা আছে তার সংখ্যা ৭৫,৬২৭। কলিকাতার বর্ত্তমান সংখ্যা অনুযায়ী উহা খুবই অপ্রচুর। কলিকাতায় আজ গৃহসমস্যা খুবই নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

জয়ন্তী শিশুসাথী—১৩৫৩। সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ধর। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ৪৲

ছোটদের মাসিক পত্র "শিশুসাথী"র ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাহারই স্মারক হিসাবে এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"বাংলা দেশে শিশুমৃত্যুর হার কম নয়, কিন্তু শিশুপত্রিকার অকাল-মৃত্যুর হার বোধ হয় ততোধিক।" যে দেশের অবস্থা এই রকম সে দেশে কোন শিশুপত্রিকার পক্ষে একাদিক্রমে পঁচিশ বছর পার হইয়া আসা কম গৌরবের কথা নহে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর মহাশয়কে এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। বাংলা দেশের ইতিহাসে মাত্র আর একখানি শিশুপত্রিকার ভাগ্যে এইরূপ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সৌভাগ্য হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনাসম্ভার ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক্ দিয়া অতি মনোরম হইয়াছে। বহু খ্যাতনামা লেখক ও শিল্পী ইহাকে রূপ দিয়াছেন। ছেলেমহলে এ বইএর আদর অবশ্যম্ভাবী। আমরা শিশুসাথীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অলিভার টুইষ্ট—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপা কৃত মর্ম্মানুবাদ। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫। দাম ॥৵০

আলোচ্য গ্রন্থখানি "ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ ফেনিমোর কুপারের "দি অফ্ দি মোহিকান্‌স্" ইতিপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়া ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (অনেকের মতে সর্ব্বশে ঔপন্যাসিক ডিকেন্স। অলিভার টুইষ্ট্ তাঁর শ্রেষ্ঠ গুলির অন্যতম। তাঁর অন্য কোন বই-ই বোধ হয় ছোট এতখানি আকর্ষণ করে না। লেখক বাংলার ছেলেমেয়ে এই অনবদ্য উপন্যাসখানির গল্পাংশ উপহার দিয়া ধন্যব ভাজন হইয়াছেন।

লেখকের অনুবাদভঙ্গী সুন্দর; ভাষা প্রাঞ্জল ও ঝরঝ ছেলেদের মন কাড়িবার কৌশলও তাঁর জানা আ ছেলেমেয়েরা এ বই কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবে।

বইখানি বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ঝরঝরে ভাবে ছা একখানি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবিও আছে। সুন্দর রঙ্গিন মলাট সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থমালার পরবর্ত্তী গ্র অপেক্ষায় রহিলাম।

গত মাসের ধাঁধা

বৈশাখের রামধনু বছরের প্রথম সংখ্যা ব'লে অনেক কই ভি. পি.তে নিয়েছেন। ভি. পি.তে পত্রিকা আজকাল সময়ে সময়ে অসম্ভব দেরী হয়। ফলে নু পেয়ে তার ধাঁধার উত্তর পাঠাবার উপযুক্ত সময় কেউ নাকি পান নি। বৈশাখের ধাঁধাটিতে (শব্দ-) পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, সে জন্য তাঁরা তার পাঠাবার সময় আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের অনুরোধ মত ঐ ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ করা হ'ল। জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তরও ঐ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। বৈশাখের ধাঁধার উত্তর ও পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। চৈত্র (১৩৫৩) সংখ্যার "মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার" ফলাফলও আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

নূতন ধাঁধা

(১)

রাম বাবু দেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে এক আশ্চর্য্য র গল্প করলেন। এ দেশের এক তৃতীয়াংশ বাদ ও নাকি মাত্র সিকি অংশ পড়ে থাকে! কোথায়— সে আজব দেশ বলতে পার?

(২)

নীচের সংখ্যাগুলির বদলে এক-একটি শব্দ বসালে অর্থ বোধগম্য হবে। কিন্তু মনে রেখ, প্রত্যেক সংখ্যার জন্য একই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ ১-এর বদলে একবার যা বসাবে ২য় বারেও তাই বসবে। তেমনি অন্য সংখ্যার বেলায়ও—

১ যেন একটি ২। ৩ ১ দেয় না। কোনও দিকে তা ৪ না। বেসুরো গলায় ৩। খেতে দিলে হয়তো শুধু ৫ খেল, নয়তো সঙ্গে বিলিতি ৪ দায় ২ দেওয়া ৫।

TIGHT BINDING

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণ মনোরম। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। কয়েকখানা একরঙা ছবি আছে। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। ৷৷৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

বইটির আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্যিকার বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে। পাতায় পাতায় অদম্য কৌতূহল। সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য দুই টাকা।

দশম বর্ষ **কৈশোরক** বার্ষিক মূ ৩৸০ আ

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। দুই খানা ধারাবাহিক উপন্যাস চলিতেছে। তা' ছাড়া সাত সাগরের ঢেউ, মানুষের মত মানুষ, সবুজ পাতা বিভাগগুলি কৈশোরকের বৈশিষ্ট্য।

প্রাপ্তিস্থান

কৈশোরক কার্য্যালয়

৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম্ দামোদর

দাম ৷৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ৷০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের জন্য সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ্-গ্রন্থাবলী

পীরামিড্ সিরিজ

'নজন্যা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এত দিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্ বই প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। তাই সারা বাংলার উপেক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে তাঁহাদের দাবী জানাইয়াছেন বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্ বই চাই।

তাঁহাদের দাবী ও অনুরোধ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্

মিঃ পিটার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্

মৃত্যু বরণ করিয়াও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাহাই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

পীরামিড্ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ

চতুর জার্ম্মাণ

এইমাত্র বাহির হইল

মূল্য ১৷৷০ মাত্র

দেব সাহিত্য-কুটীর ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSU

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। **হারান বই**—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। **ওপারের দূত**—(প্রবোধ সান্যাল)
৩। **রাতের আতঙ্ক**—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। **স্বর্গের সিঁড়ি**—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। **জয়পতাকা**—শৈলবালা ঘোষজায়া
৬। **অভিশপ্ত ম্যামী**—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। **বিভীষণের জাগরণ**—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রত্নভূষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয় পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি
ভাদ্র—**সবই যখন অন্ধকার !**—অশোক মিত্র

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান-কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ❁ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩য় সংখ্যা

বরণী আলো,
া ভালো!
াকে
র বাঁকে।

লার পড়া,
রাণীর ছড়া।
ত—
ল হাতে।

"ব

(গোয়েন্দা

আট রকম ব
বাকি বইগু

১। হারান ব
২। ওপারের
৩। রাতের
৪। স্বর্গের সি
৫। জয়পতাব
৬। অভিশপ্ত
৭। বিভীষণে

প্র

দেব

টাক

নাকুর ব
টাব
নরুনের
টাব
হাঁড়ির
টাব
টোপরে
টাব
বউয়ের ব
টাব

শ্রীযুক্ত

আমরা দুটি ভাই

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৫৪ | ৩য় সংখ্যা

পড়ার সময় নাই

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলমারির ওই দরজা খুলে পুতুল এলো নেমে,
ল-বাগানে দৌড়ে যেতে হঠাৎ গেলো থেমে।
জড়িয়ে ধ'রে হাতখানি মোর বলে
—এসো কানন-তলে।

সোনার মুকুল উঠলো ফুটে—মিষ্টি হাওয়া এলো,
হাওয়ার দোলায় বনে কারা দুলছে এলোমেলো।
ভ্রমর এলো—এলো পাখীর দল,
ভাব করি গে চল্।

নীল চোখে ওর উপছে পড়ে নীল বরণী আলো,
নীল পদ্মের মেয়েকে ও বাস্‌ল বুঝি ভালো!
নীল পাখীটী আজকে ওরে ডাকে
নীলাই নদীর বাঁকে।

কাকার কাছে দিতে হবে সকাল বেলার পড়া,
মামীর কাছে শিখতে হবে পারুল রাণীর ছড়া।
দিদির কাছে বসতে হবে ছাতে—
শ্লেট পেন্সিল হাতে।

নীল পুতুলের নীল দু'চোখে ঘুম গিয়েছে টুটে,
চলেছে সে সবার সাথে ভাব করতে ছুটে।
প্রথম ভাব সে করলে আমার সাথে
হাতটী রেখে হাতে।

মিষ্টি হাওয়ার পরশ লাগে সোনার সকাল বে
নীল পুতুলের সাথে আমার আজ যে নতুন
ওর সঙ্গে বন-কিনারে যাই ;
পড়ার সময় নাই।

দলপতি

শ্রীসুকুমার দে সরকার

চৈত্রের শেষ। নদীর ওপারে গোছা গোছা রক্ত পলাশের লাল ফুলগুলো যেন বনের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নদীর এপারে ঝাউবনে একটা সম্বর হরিণের দল তখনও দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। সূয্যি বসেছে পাটে। এই কিছু আগেই হরিণের দলটার একটা সর্ব্বনাশ ঘটে গেল। এই দলকেই বাঁচাবার জন্য দলের অভিজ্ঞ দলপতি ঝিকমিককে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হ'ল। ঝিকমিক টের পেয়েছিল যে একটা বাঘ তাদের পেছু নিয়েছে। সাবধানে সে দলকে চালিয়ে নিয়ে ওপারের বনের দিকে চলেছিল—যেখানে আছে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়। হঠাৎ সামনে পড়ে একটা পাহাড়ী নদী, আর বেজায় চালাক বাঘটাও আক্রমণ করে সেই সময়ে। হরিণের দল বিদ্যুৎ-বেগে লাফিয়ে নদী পার হ'তে সুরু করেছিল বটে কিন্তু দলে বাচ্চাও ছিল অনেক, আর বাঘের লাফও সামান্য নয়। বাচ্চাগুলোকে পালাবার সময় দিতেই ঝিকমিক বাঘটার সামনে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু বাঘে আর হরিণে কতক্ষণ? তবু যেটুকু সময় পাওয়া গিয়েছিল সম্বর হরিণের দলটা তাইতেই বেঁচে গেল।

নায়কহারা হরিণের দলটায় তখন ছিল একদল হরিণী, কতগুলো বাচ্চা আর দু'টো উঠতি বয়সের শিঙাল পুরুষ হরিণ, মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবা। এই দু'টো জোয়ান হরিণকেই তাদের বিগত দলপতি বাচ্চা থেকে বনের অভিজ্ঞতা শিখিয়ে এসেছে।

নদীর এ পারে একটু থেমে, দম নিয়ে, সম্বর হরিণের দলটা আবার ছুটে চলল ওপারের জঙ্গল পানে। দলের আগে একটা হরিণী পথ দেখিয়ে চলেছে, পেছনে মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবা। হরিণদের চলার নিয়ম ওই। দলের থাকে একটা হরিণী, আর পুরুষ দলপতি পেছন থেকে আগলে চলে। একমাত্র বিপদের সম্ভাবনাতেই আগে এগিয়ে আসে দলপতি। রক্ত পলাশের বন ফেলে এল হরিণের দল, বন-ঝাউএর দীর্ঘ চূড়া অনেক—অনেক পেছনে। শালের বন এখান থেকে মহুলের দল ছড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে। এখানে বন নিথর, অথচ প্রাণবন্ত।

পথ চড়াই—উঁচু, উঁচু আরও উঁচু। বুনো সুবাসে পথ মধুর, আর লতাঁয় পাতায় গম্ভীর ও গ পাহাড়ী ঝর্ণা নেমে বেয়ে চলেছে কোথাও, কোথাও শান্ত, স্নিগ্ধ আর সবুজে সমাহিত।

অনেকখানি উঁচুতে একটা কালো পাথরের ধারে এসে দলকে থামবার ইঙ্গিত-ধ্বনি করে উচ্চৈঃশ্রবা। (সুদীর্ঘ যুগ যুগান্তর ধরে ঢল নামা জলের ঘায়ে ক্ষয়ে গিয়ে পাহাড়ী পাথরের গায়ে যে জলা সৃষ্টি হয়, তাকে বলে কুণ্ডী।) সূর্য্য তখনও দিক্‌চক্র হেলে পড়ে নি। বনের পাতায় বিচ্ছুরিত সূর্য্যাদে তখনও তেজ আছে। তখনও ওঠা যায় আরও গভী

অনেকখানি উঁচুতে একটা কালো পাথরের ধারে এসে দলকে থামবার ইঙ্গিত-ধ্বনি করে উচ্চৈঃশ্রবা। (সুদীর্ঘ যুগ যুগান্তর ধরে ঢল নামা জলের ঘায়ে ক্ষয়ে গিয়ে পাহাড়ী পাথরের গায়ে যে জলা সৃষ্টি হয়, তাকে বলে কুণ্ডী।) সূর্য্য তখনও দিক্‌চক্র হেলে পড়ে নি। বনের পাতায় বিচ্ছুরিত সূর্য্যাদে তখনও তেজ আছে। তখনও ওঠা যায় আরও গভী

মনে কুণ্ডীর জলে স্বচ্ছ স্নিগ্ধতা। হঠাৎ আবার চলার ম পাওয়ায় হরিণীর দল চমকে তাকাল মৃগ আর উচ্চৈঃ- বার দিকে।

আর লাল চোখে, শিং নীচু করে তেড়ে এল উচ্চৈঃশ্রবা র দিকে। মাথা নেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বের ডাক ডেকে উঠল —"খবরদার! এখন থেকে আমি চালাব দল।"

স্থির চোখে মৃগ তাকাল তার দিকে—"এ জায়গা াপদ নয়, আরও উঠতে হবে সম্বরদের।"

আবার মৃগর গলায় চলার ডাক শোনা গেল। দল রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে চ্চৈঃশ্রবা মৃগকে মারল এক প্রচণ্ড ঢুঁ। মৃগ তৈরী ছিল সেই ধাক্কায় সে মাটিতে পড়ে গেল এবং চকিতে াতের মত লাফিয়ে উঠে সক্রোধে নীচু একটা গর্জ্জন র উঠল। সেই সময় দ্বিগুণ বেগে উচ্চৈঃশ্রবা মাথা নীচু র তেড়ে আসছিল তার দিকে। নিমেষে মৃগ পাশে গিয়ে কাটিয়ে নিল তার আক্রমণ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্র একটা গতি নিয়ে এক পাল্টা ঢুঁ লাগাল উচ্চৈঃ াকে। সে ধাক্কা সামলাতে পারে নি উচ্চৈঃশ্রবা। কিন্তু ন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর আক্রমণ করল না মৃগ। সে াল তৈরী হয়ে। উঠুক ত'! আজ এই রক্ত সন্ধ্যায় ঝাপড়া হওয়া দরকার কে হবে দলনায়ক। কৌশলে শক্তিতে আর ক্ষিপ্রতায় যে বড়, সেই শুধু দল চালাবার যোগী।

ধাক্কার পর ধাক্কা, ঢুঁএর পর ঢুঁ। সূর্য্য বনের মাথায় াড়ের আড়ালে হেলে পড়ল। মাথার ওপর সাঁই সাঁই উড়ে গেল একদল বাদুড়। মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবার তখন ফেণা গড়াচ্ছে। ধাক্কার বেগ আসছে কমে। শিঙে শিঙে বাধিয়ে মৃগ প্রচণ্ড একটা চাড় দিতে ল। সামনের পা দু'টো তার ফাঁক হয়ে মাটিতে চেপে ছে, কাঁধের পেশীগুলো সুদীপ্ত। সেই প্রচণ্ড চাড় তে রুখতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে আসতে লাগল উচ্চৈঃশ্রবা। পরে হঠাৎ এক সময় আছড়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। ঘনায়মান সন্ধ্যায় কাঁপা কাঁপা গলায় বিজয়ের ডাক ক উঠল মৃগ। দলনায়কত্ব সে জিতে নিয়েছে। ণের দলকে এগিয়ে চলার হুকুম দিল সে। উচ্চৈঃশ্রবা নও মাটিতে পড়ে হাঁফাচ্ছে।

নির্জ্জন বনপ্রান্তরের ওপর জ্যোৎস্না যেন হঠাৎ ফেটে ছড়িয়ে গেল। কালো পাথর ছড়ান জমির মাঝে মাঝে চকচকে সাদা বালির ওপর চাঁদের কুচি কুচি যেন ধূলি-গুঁড়ো হয়ে মিশে গেছে। দেখতে দেখতে প্রান্তর বিছিয়ে দুধলি ফুলের দল ফুটে উঠে, জ্যোৎস্নাশুভ্র রাতে ছড়িয়ে দিল সুবাস। হঠাৎ মৃগর কানে এল একটা মৃদু ভীত আর্ত্তনাদ। উচ্চৈঃশ্রবার গলা না? চকিতে দলকে থেমে বনের ভেতর মিশে যেতে হুকুম দিয়ে ফিরে গেল মৃগ। কোন জানোয়ারের আক্রমণের গর্জ্জন নেই অথচ, অথচ ওই ভয়-পাওয়া আর্ত্তনাদ! বিগত দলপতি ঝিকমিকের শিক্ষা তার ছবির মত একে একে ভেসে যেতে লাগল মনে। ওই সেই কুণ্ডীর ধারে সরু পায়ে চলা পথটা গোড়া থেকেই তার মনে স্বস্তি দেয় নি। কি ওটা? কাদের? সে চেনে বাঘের চলার পথ, ভাল্লুকের এলোমোলো নখের চিহ্নও তার অজানা নয়, বুনো দাঁতাল শূয়োরদের উদ্ধত পদরেখাও সে জানে। ও পথ ত' তাদের নয়! হঠাৎ চমকে উঠল মৃগ। বুঝেছে, বুঝেছে সে। ওই পথ সাপ ডহর, অহিরাজ শঙ্খচূড়দের চলার পথ। ওই কুণ্ডীটা তাদের আড্ডা।

আর একটু এগিয়েই সে দেখতে পেল যে উচ্চৈঃশ্রবাকে ঘিরে ফেলে লম্বা লম্বা কালো সাপের ফণা দুলছে। বিস্তৃত ফণার ওপর চক্রগুলো তাদের চক্‌চক্ করছে চাঁদের আলোয়। সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খচূড় সাপের দল! যারা দল বেঁধে থাকে, ভয় করে না কোন জানোয়ারকে। যারা তাদের রাজ্যে যে কোন প্রাণীকে দেখলেই ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে। গরমের মুখে মুখেই তারা বেছে নেয় একটা ছোট কুণ্ডী। জ্যোছনা রাতে কুণ্ডীর জলে নেমে তারা খেলা করে। ওই কুণ্ডীটা বিষধর শঙ্খচূড়দের আড্ডা।

সেই সাপ ডহরের পাশে এসে মৃগ শিঙাল হরিণের উন্মত্ত যুদ্ধ-ডাক ডেকে উঠল।

"খবরদার উচ্চৈঃশ্রবা, নড়বে না!"

আর শিঙ নাড়তে নাড়তে সে এগিয়ে যেতে লাগল, যেন সে সাঁপেদের আক্রমণ করতে চায়! যে কোন মুহূর্ত্তে আশপাশ থেকে কয়েকটা কালো সাপের মাথা লাফিয়ে উঠে তাকে ছোবল বসাতে পারে। আর ওই

সাপগুলো এমন এক শত্রু যে ওদের একটা ছোবলই যথেষ্ট। বাঘের থাবা খেয়েও পালাতে পারলে বাঁচার আশা থাকে, কিন্তু ক্রুর শঙ্খচূড়দের আক্রমণ ব্যাহত করার শক্তি খুব কম জানোয়ারেরই আছে। কিন্তু তাই বলে সে তার দলের একজনকে ওই শঙ্খচূড়দের হাতে ফেলে যেতে পারে না। সে দলপতি।

ওদিকে মৃগর সেই যুদ্ধ-ডাক শোনা মাত্র উচ্চৈঃশ্রবার আশপাশ থেকে সাপেদের ফণাগুলো সড়াক সড়াক করে নেমে গেল। বিদ্যুতের মত তারা তেড়ে গেল মৃগ একটা গোদা কালো সাপের ফণা মৃগর তিন হাতের গর্জ্জে উঠল। হাওয়ার মত ঘুরে ডেকে উঠল "উচ্চৈঃশ্রবা, পালাও, পালাও!"

উচ্চৈঃশ্রবাকে আর বলতে হয় নি। এঁকে ছুটতে ছুটতে সে মৃগর পাশে এসে পড়ল। তারপরে বন্ধুর মত পাশাপাশি তারা ছুটতে লাগল, মৃগ পথ দেখায় সে দিক্ পানে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

তীরন্দাজ কোথায় গেল!

সংসারে কোন খবরই চাপা থাকে না। গঙ্গাগর্ভের দুর্ঘটনা, আবার ভূতুড়ে তীরের উৎপাত এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্সিস্‌কো বারেটো ও চাঁদপাল প্রভৃতির সলিল সমাধির সংবাদও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বজরার সঙ্গে যে দু'খানি ছোট নৌকা ছিল তারই একখানি দৈবক্রমে রেহাই পাইয়া গিয়াছিল। সে নৌকায় ছিল চাঁদপালেরই দুইজন বরকন্দাজ। কোন রকমে পালাইয়া আসিয়া তারাই ঘটনাটি রাষ্ট্র করিয়া দিল। রত্নহারের রহস্যও তারাই প্রকাশ করিয়া দিল কিন্তু অপর রহস্যের সমাধান করিতে পারিল না। ভূতুড়ে তীরের কাণ্ডই শুধু জানা গেল—তীরন্দাজের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

বারেটোর মৃত্যুতে পর্ত্তুগীজ্ দল বড় মুষড়াইয়া পড়ি ডি'মেলো আড্‌মিরাল্ হিসাবে দলের নেতৃস্থানীয় হই বারেটোই ছিল তাদের প্রাণ। পাণ্ডিত্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞ দল পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তার ছিল যেমন অ ক্ষমতা, তেমনি শঠতা, কূটবুদ্ধি এবং অত্যাচার ইত্য ব্যাপারেও তার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কেন যে অন্য সব পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মযাজকের পদ বাছিয়া লইয়াছি বলা কঠিন। হয়তো উহারই আড়ালে প্রতি বিস্তারের সুযোগ জুটিত বেশী। সে যুগের পর্ত্তু পাদ্রীদের মধ্যে এই ধরণের নৃশংস লোক আরও অ ছিল, ইতিহাস আজও তার সাক্ষ্য দিতেছে। নি বিদেশীদের উপর তারা যে অমানুষিক শারীরি

নসিক উৎপীড়ন চালাইত—সে কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের তা হইতে কোন দিনই হয়তো মুছিবে না। যে ধর্ম্মের চারের জন্য তারা নিযুক্ত হইত, নিজেদের ব্যবহারের তিটি পদে ঠিক তার বিপরীত রূপই তারা দেখাইত।

বারেটোকে হারাইয়া পর্ত্তুগীজ্ দলে তাই শুধু ভাঙ্গনই ল না, ভয়ও দেখা দিল প্রচুর। ফলে গোটা দলটার ধ্যেই একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শৃঙ্খলাহীন দল, সে যত শক্তিশালীই হোক্ না কেন, শেষ পর্য্যন্ত কোন াজেই আসে না। বারেটোর জায়গায় ঐ অঞ্চলের তৃহীন ফিরিঙ্গীদের পরিচালনা করিতে পারে এমন উই ছিল না—ফলে কিছুদিনের জন্য নিম্নবঙ্গে পর্ত্তুগীজ্ তিপত্তি অনেকখানি হ্রাস পাইল। পর্ত্তুগীজ্‌রা সপ্তগ্রাম ড়িয়া হুগলী ও ফিরিঙ্গীর চকেই আশ্রয় লইল। পূর্ব্ব বিকল্পনা মত আক্রমণ করা দূরে থাক্, এই নতুন াপারের প্রতিশোধ লইবার মত সাহসও যেন তাদের ধ্য আর রহিল না।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। আগেই লিয়াছি, ফার্ণাণ্ডিজ্ সাহেব—যিনি গোয়ার নতুন পর্ত্তুগীজ্ সনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন—তিনি লোকটি লেন কতকটা নির্ব্বিরোধী। পর্ত্তুগীজদের অতটা দস্যু-ত্তি তাঁর ভাল লাগিত না। সহজ ভাবে—বন্ধুভাবে বসা-বাণিজ্যের দিকে নজর দেওয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছা। স্তু পর্ত্তুগীজ্‌রা তখন দস্যুবৃত্তিতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া ড়িয়াছে যে সে নির্দ্দেশ, শাসনকর্ত্তার হইলেও, মানিতে হত না। ফার্ণাণ্ডিজ চেষ্টা করিয়াও তাদের স্বমতে নিতে পারেন নাই। তা ছাড়া সুদূর নিম্নবঙ্গে রেটোর প্রতিপত্তির কথাও তাঁর অজানা ছিল না; ই বারেটোর কার্য্যকলাপ পছন্দ না করিলেও তিনি হাকে ঘাঁটাইতে সাহস পান নাই। বারেটোর মৃত্যুর তিনি এদিক্‌টা নতুন ভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলেন—মেলোর কাছেও তদনুযায়ী নির্দ্দেশ আসিল। এমন গোয়া হইতে ইব্রাহিম খাঁর কাছেও বন্ধুত্বপূর্ণ হারের প্রতিশ্রুতি লইয়া দূত আসিল। মনে হইল তা বা বাংলা হইতে পর্ত্তুগীজ্-ভীতি অদৃশ্যই হয় বা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হয় নাই। ফার্ণাণ্ডিজের পক্ষে শী দিন ভারতবর্ষে থাকা সম্ভব হয় নাই; হয়তো বা ভিন্ন মতাবলম্বী পর্ত্তুগীজ্‌দেরই চক্রান্তে। তাঁর নীতিতে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও পর্ত্তুগাল রাজ-সরকারের আয় কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। ফার্ণাণ্ডিজের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই আবার বাংলায় পর্ত্তুগীজ্‌দের স্বমূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। তাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। কারণ ফার্ণাণ্ডিজের মত দূরদর্শী লোক বেশী থাকিলে বোধ হয় অত তাড়া-তাড়ি তাদের এ দেশ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হইত না।

এদিকে চাঁদপালের মৃত্যুসংবাদেও কম সোরগোল পড়িল না। দেশের বেশীর ভাগ লোকই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্ষুদে হইলে কি হয়, শয়তান হিসাবে চাঁদপালও বড় কম ছিল না।

চাঁদপালের দলেও ভাঙ্গন দেখা দিল। যে সব ছোট-খাট জমিদার সুযোগ বুঝিয়া চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল তাদের মধ্যে কেহ কেহ গা ঢাকা দিল, কেহ বা বেগতিক দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল। নবাবের ফৌজ সহজেই নিমপুকুর দখল করিয়া লইল।

চন্দনা গাঁয়েরও সেই অবস্থা। চন্দনাও যে চাঁদপালের সঙ্গে জুটিয়াছিল সে খবর চাপা থাকিবার কথা নয়। এ ব্যাপারে যার আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশী সেই রাস-বিহারীর অবস্থাই হইল সব চেয়ে গুরুতর।

বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চন্দনার জমিদার-বাড়ীর দরজায় রাসবিহারী খুব উত্তেজিত অবস্থায় পায়চারী করিতেছিল। আজ তিন দিন ধরিয়া সে ক্রমাগত হাঁটাহাঁটি করিতেছে—কিন্তু তরুণ জমিদারের সাক্ষাৎ পায় নাই। নন্দ চৌধুরী নাকি দরজায় খিল দিয়া পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। খাওয়ার সময় হইলে একবার ওঠে, কিন্তু কাহারও সঙ্গে দেখা করে না। খাওয়ার পর আবার বিছানায় গা ঢালিয়া দেয়। কি নেশা করে ভগবান্ জানেন! নেশা না করিলে সুস্থ মানুষের পক্ষে কি এ রকম সম্ভব? অবশ্য ব্যাপারটা নতুন নয়, নন্দ চৌধুরীর এ অভ্যাস অনেক দিনের। এই ভাবে দরজা আঁটিয়া,—বাহিরের জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, দিনের পর দিন বিশ্রাম সে ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক বার লইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই ভীষণ বিপদের দিনেও কি কেউ অমন ভাবে ঘুমাইতে পারে? রাসবিহারীর ইচ্ছা হইতে-

ছিল, দরজা ভাঙ্গিয়া সে এই অপদার্থ জমিদার-পুত্রকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করে। সহের সীমা তার প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

"ওহে, বলি তোমাদের কত্তা মশাই কি আজও উঠবেন না? দেখ তো আর একবার গিয়ে। বাইরে একটা পটকা-টটকা ফাটাও না, আওয়াজে যদি কাজ হয়!"— নন্দ চৌধুরীর খাস ভৃত্য রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া অসহিষ্ণু রাসবিহারী চেঁচাইয়া কহিল। রামচরণ কন্দর্প চৌধুরীর আমলের ভৃত্য, রাসবিহারীকে সে ছোট হইতে জানে; কহিল, "বসুন বসুন। আজ দুপুরে উঠে খেতে বসেছিলেন, তখন বলেছি আপনার কথা। আজ বিকালে দেখা হবে বলেছেন।"

"তোমার বিকেলের তো ভারী বাকি আছে! সন্ধ্যে পার হতে চল্‌ল তার—"

সহসা ভিতরে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল—এবং একটু পরেই হাই তুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্দ চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। রাসবিহারীকে দেখিয়া কহিল, "এই যে, কি ব্যাপার? সকাল বেলা উঠেই যে!"

"সকাল!" রাসবিহারীর স্বরে গভীর ক্ষোভ। "একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন না?"

নন্দ একবার ভ্রূকুটি করিয়া পশ্চিম আকাশে তাকাইল। হাসিয়া কহিল, "ও, দিনটা মেঘলা বলে আর সময় খেয়াল করতে পারি নি। তা এস, ঘরে এস, খবর কি?"

"খবর অত্যন্ত গুরুতর। শোনেন নি কিছু?" রাসবিহারী নন্দর পিছু পিছু বসিবার ঘরে ঢুকিল, তার পর এক এক করিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া জানাইল। এখন উপায়?

এতক্ষণ পরে এইবার নন্দ চৌধুরীর মুখেও গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাস্তবিকই উপায় কি?

"আমার মনে হয়"—রাসবিহারী বলিল, "আমাদেরও দেরী না ক'রে গা ঢাকা দেওয়া উচিত। এ জমিদারী আর থাকবে না—নবাব খাস করে নেবেই; তবু যদি প্রাণটা রক্ষা পায়।"

নন্দ চৌধুরী কি যেন চিন্তা করিতেছিল, একটু থামিয়া কহিল, "কোথায় যেতে চাও?"

"সে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে। আওলা... আর শুকদ্বীপের ওরাও যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে যোগ ... যেতে পারে। আপাততঃ কিছুদিন দক্ষিণের কোন ... গিয়ে লুকিয়ে থাকা যাক্। তার পর দরকার হ'লে কিছু... গৌড় বঙ্গ ছেড়েও যাওয়া যেতে পারবে। নইলে, বুক... না, ওদিকে আবার মৃগাঙ্ক রায়ের দল ক্ষেপে আছে, সু... বুঝে পেছনে লাগতে দেরী করবে না। তিন পুরু... শত্রু তো?"

নন্দ চৌধুরী চট্ করিয়া জবাব দিল না। মনে হ... প্রস্তাবটা তার খুব পছন্দ হইতেছে না। আবার খানিক... কি ভাবিয়া কহিল, "আর যদি অন্য সবাইকার মত আ... সমর্পণ করা যায়?"

"তা হ'লে হয় প্রাণদণ্ড নয় তো আজীবন কারাবাস।"

"সে বরঞ্চ প্রথমটার চাইতে ভাল ..."

"আপনি তো তা বলবেনই। ভাবছেন কারাগা... পূরলে আর কি, সময় মত খাওয়া আর দিনের পর ... তোফা ঘুম। কিন্তু নবাবের কারাগার অত সহজ জি... নয়। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্যই তার স... মাটীর তলায় সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন সে এক ভ... নরককুণ্ড। ভগবান্ করুন, শত্রুরও যেন তা দেখতে ... হয়।"

"কিন্তু তোমাদের জন্যই তো এ কাণ্ডটা হ'ল! আ... তো চুপচাপ থাকতেই চেয়েছিলাম, তুমিই তো ... ক'রে চাঁদপালের সঙ্গে গিয়ে কথা পাড়লে। যা... হবার হবে। কি করা যায় ভেবে দেখব এখন।"— চৌধুরী নাকে একটিপ নস্য গুঁজিয়া তাকিয়া টানিয়া ... করিয়া হেলান দিয়া শুইল।

রাসবিহারী বিড় বিড় করিতে করিতে ঘর হ... বাহির হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, এখনও ... দেখব! ঐ ভাবতে ভাবতেই তোমার মরণ ... আসবে। নাঃ, এ অপদার্থের সঙ্গে আর নয়, আজই ... আওলাৎগঞ্জের ওদের কাছে রওনা হ'তে হবে।"

এইবার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর একটু খোঁজ ... দরকার। এত বড় একটা ব্যাপার হইতে যে ... অভাবনীয় ভাবে উদ্ধার পাওয়া যাইবে তা তিনি কল্প...

...তে পারেন নাই। বিস্ময় এবং আনন্দের প্রথম ...টা কাটিলে পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিল—এমন অসম্ভব ...র সম্ভব হইল কি করিয়া! কে এই অদৃশ্য তীরন্দাজ? নবাব চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন—এই তীর-...র সন্ধান চাই। এমন উপযুক্ত লোককে খুঁজিয়া ...ত করিতে না পারিলে তাঁর রাজ্য শাসনের সম্মান ... না যে! ঘোষণায় আরও বলা হইল কেহ এই ...ন্দাজের সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর দিতে পারিলে ...কেও উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

...কয়েক মাস কোন দিক্ হইতেই কোন সাড়া আসিল ... তীরন্দাজ নিজে তো পরিচয় দিলই না, অন্য কেহও ... সন্ধান দিতে আগাইয়া আসিল না।

তার পর ঘটিল আর এক অভাবনীয় ঘটনা। সপ্ত-...র ফৌজদার কি কাজে সদলবলে সুতানুটির আশ-... তদন্ত করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহারই লোকেরা ...দিন এক বুড়া জেলেকে ধরিয়া আনিল। জেলে ...দের এক অদ্ভুত গল্প শুনাইয়াছে। ফৌজদার জেলেকে ...া করিয়া যা জানিলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই: প্রায় ...তিনেক আগে একদিন জেলে আর তার ছেলে মাছ ...বার জন্য কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে সোনার বালিয়া ফাঁড়ির ...চ একটা ছোট খাল দিয়া নৌকা করিয়া আসিতেছিল। ...র কাছাকাছি আসিতেই একটা ছপ্ ছপ্ আওয়াজ ...য়া চাহিয়া দেখে একখানা ছিপ তীব্র বেগে জল কাটিয়া ...াইয়া আসিতেছে। ছিপের আকৃতি আর গতি ...য়াই তারা বুঝিতে পারে এ ছিপ ফিরিঙ্গীর ছাড়া ...র কাহারও নয়। ভয়ে তাড়াতাড়ি তারা পাশের ...টা হোগলা-বনের মধ্যে নৌকা ঢুকাইয়া আত্মগোপন ...র। ঠিক সেই সময়ে তাদের নজরে পড়ে অদূরে আর ...টি খাদের ভিতর আর একখানা জেলে ডিঙ্গী তাদেরই ... হোগলা-বনে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ... ফিরিঙ্গীর ভয়ে এ ভাবে আত্মগোপনের চেষ্টার মধ্যে ...য়ের কিছুই নাই—কিন্তু তারা বিস্মিত হয় নৌকার আরোহীকে দেখিয়া। ও অঞ্চলের অনেকেই তাঁকে চেনে। সবাই তাঁকে ফকির সাহেব বলিয়া ডাকে। সেই পাগড়ী, সেই লম্বা দাড়ি, সেই পরিচিত আলখাল্লা—চিনিতে পিতাপুত্রের কারোই ভুল হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল ফকির সাহেবের দেহসজ্জা। পিঠে তীর-ভরা তূণ, কাঁধে ঝুলান দীর্ঘ ধনুক—ফকির সাহেবের এ যোদ্ধবেশ তারা এর আগে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তারা তাঁকে নির্ব্বিরোধী, পরোপকারী, হাস্যমুখী একজন মুসলমান সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিত। কিন্তু আজ তাঁর এ কি মূর্ত্তি! ফকির সাহেব তাদেরই মত লগি ঠেলিয়া ডিঙ্গীটাকে ভিতরে লুকাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, তাই তাদের লক্ষ্য করেন নাই।

তার পর আর এক কাণ্ড। ছিপ আসিয়া কেন যেন অদূরে থামিয়া যায়—চোখে না দেখিলেও দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় বুঝিতে কষ্ট হয় না। জেলে ও তার ছেলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত্ত গণিতে থাকে; নিশ্চয়ই ফিরিঙ্গীরা তাদের দেখিতে পাইয়াছে, নহিলে এমন অসময়ে এই জঙ্গুলে আঘাটায় ছিপ থামাইবে কেন? কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়; অল্পক্ষণ পরেই, বারুদে আগুন দিলে যে রকম বিস্ফোরণের শব্দ হয় তেমনি, এক বিকট শব্দে তারা চমকাইয়া ওঠে—এবং দেখিতে দেখিতে ঘন কালো ধোঁয়ায় জায়গাটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বেগতিক দেখিয়া পিতাপুত্রে কোনও রকমে নৌকা টানিয়া খাল দিয়া পিছু ফিরিয়া আত্মরক্ষা করে। ফকির সাহেবের কোন খোঁজ লইবার সময় বা সাহস তাদের হয় নাই। তবে সেই হইতে ফকির সাহেবকে এ অঞ্চলে আর কেহ দেখে নাই।

জেলের বিবরণ শুনিয়া ফৌজদার যেন এক নতুন আলোর সন্ধান পাইলেন। ফকির সাহেব! নামটা যেন তিনিও দু'-একবার কোথায় শুনিয়াছেন। নাম যখন পাওয়া গিয়াছে তখন লোকটিরও সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাইবে। নবাব তাকে বন্ধুরূপে চান, কেন সে ধরা দিবে না?

(ক্রমশঃ)

সব সত্যি

শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ

তোমরা জান যে ভগবান্ অনেক জানোয়ারকে, মানুষের মতন কথা বলবার শক্তি না দিলেও, কিছু কিছু বুদ্ধি দিয়েছেন। আজ কয়েকটি বুদ্ধিমান্ বেড়াল কুকুরের কথা তোমাদের বলব। এর একটিও কিন্তু মিথ্যে নয়, সব সত্যি।

বহুদিন আগে ঢাকার এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি বেড়াল ছিল, তার নাম ছিল কামিনী। বেড়ালের চিরদিন বদ্‌নাম যে সে মাছ চুরি করে খায়; কিন্তু বেড়াল যে মাছ পাহারা দেয় তা তোমরা কখনও শুনেছ? এই বেড়ালটির সামনে বাড়ীর গিন্নী অনেক সময় মাছের থালা রেখে অন্য কাজে যেতেন, আর বলে যেতেন, "দেখিস্ কামিনী, বেড়াল কিংবা কাক যেন মাছ না নিয়ে যায়।" কামিনী নিজে তো সে থালা স্পর্শ করতই না, এমন কি অন্য কোন বেড়াল, কাক কিংবা ছেলেপুলেদের কাউকেও সেই মাছের থালার সামনে যেতে দিত না।

এবার একটি দুষ্টু বেড়ালের কথা শোনো। পূর্ণিয়ায় পি, ডব্লিউ, ডি আপিসে অজিত বাবু বলে এক ভদ্রলোক কাজ করতেন। তিনি আপিস থেকে ফিরে যখন খেতে বসতেন তখন প্রত্যহ কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে তাঁর দুধের বাটিটা উল্টে দিয়েই পালিয়ে যেত। অজিত বাবু খুব অবাক্ হয়ে যেতেন—বেড়ালটা দুধটা খায় না অথচ রোজ বাটিটা উল্টে দেয় কেন? একদিন বেড়ালটা পালিয়ে যেতেই তিনিও খাওয়া ছেড়ে তার পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন। দেখলেন খাবার ঘরের নর্দ্দমা দিয়ে ঘরের পেছন দিকে সেই উল্টে ফেলা দুধটা গড়িয়ে আসছে আর বেড়ালটা চুক্‌চুক্ ক'রে তাই খাচ্ছে!

কুকুর যে কত দূর সৌখীন হয় তা তোমরা জান কি? ভাগলপুরে প্রদীপ ঘোষাল বলে এক ভদ্রলোকের নামে একটি কুকুর আছে। সে রোজ পান খায় তার সেই পানে জর্দ্দা থাকা চাই। প্রদীপ বাবু পানের সঙ্গে জর্দ্দা খান। যেই তিনি পান মুখে দে অমনি জলি তাঁর সঙ্গ নিল। যতক্ষণ না তিনি এক চিবিয়ে মাটিতে ফেলবেন ততক্ষণ জলি তাঁর সঙ্গ না; কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে মাটির পানটুকু মুখে জলি যদি দেখে যে তাতে জর্দ্দার স্বাদ-গন্ধ নেই, সেই পানটুকু সে ফেলে দেয়। তারপর যখন একটু জর্দ্দা মুখে দিয়ে আবার তাকে পানের ছিব্‌ড়ে তখন সে লেজ নাড়তে নাড়তে মহানন্দে সেই ছিব খায়। জলির আরো একটি সখ আছে। সে ডা খেতে রাজী আছে, কিন্তু যদি তাকে মসুর ডাল ভাত মেখে দেওয়া হয় তবে তাতে পেঁয়াজ সম্ভার পেঁয়াজের গন্ধ না থাকলে সে মসুর ডাল স্পর্শ করে না

আর একটি কুকুরের বুদ্ধির কথা বলি। পূ অজিত বাবুর একটি কুকুর ছিল, নাম তার মিঠ্‌ঠু। অ বাবুর বাড়ীতে আরো দু'টি কুকুর ছিল এবং মিঠ্‌ঠুর বাচ্চা ছিল। এই বাচ্চাটির সঙ্গে অন্য কুকুরগুলির রোজই লড়াই লাগত। মিঠ্‌ঠু যেই দেখত ঝগড়া হয়েছে, অমনি সে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াত, একবার একে ধমকে, একবার ওকে ধমকে, একবার কান কামড়ে, একবার ওর লেজ কামড়ে তাদের করবার চেষ্টা করত। শেষ পর্য্যন্ত তার চেষ্টা বিফল সে গিয়ে তার প্রভুকে ঘটনাস্থলে টেনে আনত, এবং সাহায্যে নিজের বাচ্চাটিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত নিয়ে যেত।

"মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"

—বঙ্কি

আলোর কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

গত বারে তোমাদের আলোর সম্বন্ধে কিছু বলিয়াম। সেই প্রসঙ্গে সূর্য্যালোকের অদৃশ্য কিরণ আল্‌ট্রা-লেট রশ্মি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিগুলির শরীরের উপচয়কর শক্তি মহাযুদ্ধের সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জনৈক নিক কতকগুলি ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন।

কৃত্রিম আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা

ভিন্ন বাক্সে ভিন্ন ভিন্ন দল ইঁদুর রাখিয়া তিনি পর্য্যবেক্ষণ য়া দেখিলেন—একটি বাক্সের ইঁদুরগুলি বেশ সুস্থ য়াছে এবং দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাদের স্বাস্থ্যকার কারণ অনুসন্ধান কালে তিনি দেখিলেন তাঁহার য়ক কর্ম্মচারী ঐ বাক্সের তলাকার কম্বল ও বনাতের রাগুলি প্রত্যহ একবার রৌদ্রে দিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক মান করিলেন, সম্ভবতঃ রৌদ্রের একটা শক্তি আছে া দ্বারা জীবদেহে ঐ হিত সাধিত হয়। কাঠের গুঁড়া, শুষ্ক ঘাস প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যহ রৌদ্রে দিয়া ইঁদুরের য় দিলে উহাদের উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল।

ঠিক ঐ সময়ে হল্যাণ্ড, ডেন্‌মার্ক্ প্রভৃতি দেশের লেরা রিকেট নামক অস্থি-ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। যুদ্ধের সময় অর্থলোভে ঐ দেশের অধিবাসীরা দুগ্ধ, মাখন, পনির প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য ইংলণ্ড প্রভৃতি যুদ্ধকারী দেশকে বিক্রয় করিত। ফলে ছেলেদের আহার্য্যে যথেষ্ট মাত্রায় দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বশতঃ তাহাদের পীড়া হইতে থাকে। সূর্য্যরশ্মি সেবনে তাহাদেরও অদ্ভুত উপকার দেখা যাইতে লাগিল।

আলোকের ঐ অদ্ভুত শক্তি আবিষ্কার হওয়ায় দলে দলে বৈজ্ঞানিক নানান গবেষণা আরম্ভ করিলেন। কেহ বা কৃত্রিম আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রকারে উদ্ভূত আলোকের কোন্‌টির মধ্যে কত স্বাস্থ্য-রশ্মি আছে তাহা নির্ণয় করিতে লাগিলেন।

কুকুরকে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়া বলিষ্ঠ করা হইতেছে।

মা-
নার
তাকে
গল।
বে।
?

সূর্য্যের আলোকে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ রশ্মি আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে অনাবিল সূর্য্যালোকে যেমন অধিক মাত্রায় আছে সহরের আলোকে তেমন নাই। সহরের ধূলার ভিতর দিয়া, ধোঁয়ার ভিতর দিয়া এবং মেঘ ও কুয়াসার মধ্য দিয়া যে সূর্য্য-রশ্মি আসে তাহার আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি

অনেক কমিয়া যায়। সহরে আবার প্রাতঃকালের আলোকে ঐ রশ্মি অনেক বেশী থাকে। প্রাতঃকালের পর হইতেই সহরে চলাফেরা আরম্ভ হয়, ধূলা উড়িতে থাকে। ক্রমে লক্ষ লক্ষ বাসগৃহের উনান হইতে এবং কলকারখানার চিমনী হইতে শত শত মণ ধোঁয়া বাহির হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে। আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সেই ধোঁয়া ও ধূলিমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে অতি অল্প মাত্রায়ই আসিতে পারে।

একটি হাসপাতালে শিশুদের লইয়া উন্মুক্ত সূর্য্যালোকে ক্লাস্ করা হইতেছে।

বৃষ্টির পর যখন আকাশের ধূলা ও ধোঁয়া দ্রবীভূত হইয়া বা ধুইয়া আসিয়া মাটীতে পড়ে, বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, তখন সূর্য্যরশ্মির কি প্রখর তেজ! তখন পাহাড়ে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির মাত্রা খুবই বেশী। বেদ্রিতটের বায়ুমণ্ডলও অনন্তবিস্তৃত সমুদ্রের উপরকার ঘরেমণ্ডলের সম্পর্কে থাকিয়া বেশ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ থাকে। আররূপ উঁচু পাহাড়ের উপরকার বায়ুও সাধারণতঃ বেশ র্ম্মল হয়। এজন্য পাহাড় ও সমুদ্রতীরের স্থানসমূহের সূর্য্যকিরণে যথেষ্ট মাত্রায় আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থাকে। ঐ সকল স্থান ঐ কারণেই এত স্বাস্থ্যপ্রদ।

সূর্য্যকিরণের স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তি আবিষ্কারের পর আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের অনেক উচ্চ শৃঙ্গে এবং ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের সমুদ্রতটে অনেক নরনারী খালি গায়ে সূর্য্যকিরণ সেবন করিয়া স্বাস্থ্যার্জ্জন করে।

আমাদের দেশের দুপুর বেলাকার প্রচণ্ড সূর্য্য... দেখিয়া মনে হইতে পারে যে উহা খুব স্বাস্থ্যপ্রদ ... কিন্তু আসলে তাহা নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ... বেলায় বায়ুমণ্ডলে অধিক মাত্রায় ধূলা ও ধোঁয়া ... থাকে; আর দুপুর বেলাকার সূর্য্যালোকও ... তাপপ্রদ। শরীরকে বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত করিলে স্বা... ক্ষতি হয়। তা ছাড়া আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির ... সেবনও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হি... এই প্রাচীন মহাবাক্যটি জীবনের সকল ... সম্বন্ধেই খাটে।

সূর্য্যালোক ছাড়া আর কোথায় আ... ভায়োলেট রশ্মি পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও ... গবেষণা হইয়াছে। কয়লা, কাঠ ও অন্য... পোড়াইয়া যে আলোক পাওয়া যায় তাহা... ঐ রশ্মি যথেষ্ট থাকে। কিন্তু সাধারণ ই... ট্রিক্ বাতিতে ঐ রশ্মি পাওয়া যায় না। ঐ ... সাধারণ কাচের ভিতর দিয়া যাইতে পারে... যাঁহারা নিত্য কাচের শার্সি দিয়া জানালা... বন্ধ রাখেন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজের ... ভিতর আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রবেশের ... বন্ধ করেন।

উত্তর ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্র... দেশে শীতকালে সূর্য্যকে খুব কম সময়েই দেখা ... তা ছাড়া ঐ সব স্থানে প্রায়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ... পৃথিবী অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। ঐ সব দেশে ... আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিসৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। "কোয়া... মার্কারি-ভেপার-ল্যাম্প" নামক বাতি আবিষ্কৃত ... ঐ অভাব অনেকটা মোচন হইয়াছে। ঐ সকল ... আবরক কাচ আসলে কাচ নহে—কোয়ার্টজ-নির্ম্মিত ... আর উহার অভ্যন্তর ভাগ পারদের বাষ্প দ্বারা পূর্ণ ... রোগীকে নগ্নগাত্র করিয়া তাহার দেহের সন্নিকটে এ... একাধিক ঐ বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ ... মিনিট ধরিয়া রোগীর দেহকে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট র... উন্মুক্ত রাখা হইবে তাহা চিকিৎসক স্থির করেন।

সূর্য্যালোকের আর একটি পরম প্রয়োজনীয় কার্য্য ...

...অধিকাংশ ব্যারামের জীবাণু উক্ত আলোকের সম্পর্কে ...সিয়া নিহত হয়। আমাদের বস্ত্রাদি প্রত্যহ সূর্য্যের ...লোকে মেলিয়া দিলে স্বাস্থ্যের কত বেশী উপকার হয় ...হা হিসাব করিয়া বলা যায় না।

কিন্তু আলোকের দ্বারা আরও যে গঠনক্রিয়া হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। ফলতঃ আমাদের যাবতীয় খাদ্যই সূর্য্যালোকের সাহায্যে সংগঠিত হয়। সে কাহিনী তোমাদের আর একদিন শুনাইব।

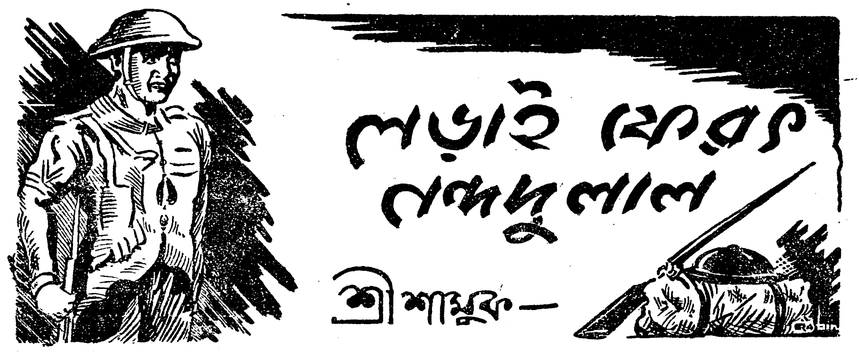

আট

মহাপুরুষের মাকড়সা রূপ

ট্রাম থেকে অনেকেই নেমে পড়ে—মহাপুরুষের সংগে ...নায় যাবে চোর ধরা দেখতে। তিনি বুঝিয়ে বলেন,—... না, এত লোকের ভিড় করে গিয়ে কোন লাভ নেই। ...র খোওয়া গেছে তিনি যাবেন, যাঁকে সন্দেহ করা ...য়েছে তিনি যাবেন, যিনি সন্দেহ করেছেন তিনিও যাবেন ...শ্চয়, আর নয়—জিতেন বাবুও আমাদের সংগে চলুন। ...স্, আর কেউ নয়। আপনারা কিছু ভাববেন না। ...মি সমস্ত ভাল রকম বন্দোবস্ত করে দেবো।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলে ওঠে,—এই ত' কাছেই ...না, দু' মিনিটের পথ।—আরে না না, ওসব ছোটখাটো ...নার ওপর আমার বিশ্বাস নেই কিছু। যাবো ত' যাবো ...কেবারে লালবাজারে, সমস্ত বখেড়া এক সংগে মিটে ...বে। আপনি কি বলেন?

নন্দকে প্রশ্ন করা হ'ল। তার এতে অমত করবার ...আছে কি? বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ নিশ্চয় ভাল বোঝেন এ ...সমস্ত বিষয়।

মহিলাটি কয়েক বার আপত্তি করেন, বলেন,—আমি যাবো না। আমার সময় নেই অত। মিথ্যা দোষারোপ করা দুষ্ট লোকেদের পেশা, তার জন্যে মিছামিছি ঘুরে বেড়াতে আমার এতটুকু আগ্রহ নেই।

মহাপুরুষ বলেন,—আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমাদের মাপ করুন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার যাওয়াই উচিত। দোষ যখন ঘাড়ে এসে পড়েছে তাকে সকলের সামনে মিথ্যা প্রমাণ করে দেওয়াই মংগল! থানায় গিয়ে দু' মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারা যাবে। আপনার কাছে মনিব্যাগ লুকানো আছে কিনা এই তো?

ঠিক হ'ল একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। কিন্তু মহাপুরুষের ট্যাক্সি আর পছন্দ হয় না। কেবল বলেন—না না, ঐটা নয়, ঐটা নয়, খারাপ গাড়ির ঝাঁকুনি আমি সহ্য করতে পারি না।

একটা বন্ধ ট্যাক্সি ধীরে ধীরে যাচ্ছিল, এদের দেখে

সামনে এসে দাঁড়াল এবং মহাপুরুষের পছন্দও হয়ে গেল তখুনি।

সকলে এক চোট মহা ধুমধাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে তবে মহাপুরুষকে ছেড়ে দেয়। মহিলাটি এক পাশে, মাঝখানে নন্দ, ও তার পাশে মহাপুরুষ বসলেন পিছনের গদিতে। সামনে চালকের পাশে টাকা-হারানো মানুষটি, ও পরে পরম ভক্ত জিতেন বাবু—যিনি ট্রামের ভেতরে সর্ব প্রথমে 'মহাপুরুষ মহাপুরুষ' বলে উঠেছিলেন।

ট্যাক্সি কিছুটা পথ যেতেই মহাপুরুষ চালককে একটু ঘুরে অন্য দিক্ দিয়ে যেতে বললেন। নন্দকে বুঝিয়ে বলেন—আপনার সামান্য একটু আরো দেরি করে দেবো কিন্তু। আমার এক জায়গায় যাবার কথা ছিল—অনেক ভক্ত সেখানে এসে জমা হবেন, তাদের শুধু খবর দিয়ে যাবো যে পরে আসছি।

নন্দ রাজী হয়ে যায়। তার মনে হ'ল বটে যে ইনি ট্রামে যেদিকে যাচ্ছিলেন এখন তার উলটো দিকে যেতে চান কিন্তু কিছু বললে না। মানুষের কত রকম কাজ ত' থাকতে পারে, আর বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যখন।

মহাপুরুষ অনর্গল বকতে থাকেন। নন্দকে ডেকে ডেকে পথের ধারে তাঁর ভক্তদের সব বাড়ি-ঘর দেখান এবং তাদের পরিচয় ও অবস্থার কথা সবিস্তারে বলে যান। নন্দর ভাল না লাগলেও ভদ্রতার খাতিরে জানলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখে ও মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করে। এই সময়ে ট্যাক্সি একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লীতে এসে ঢোকে।

একটা ভারি মিষ্টি গন্ধ পেল নন্দ, হঠাৎ গাড়ির ভিতরেই। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেছে আর বাঁ দিক্ থেকে সেই মহিলা একখানি রুমাল তার নাকে চেপে ধরলেন আচমকা। কিছু করবার আগেই মহাপুরুষ মাকড়সার মত জাপটে ধরেন তার দু'টি হাত ও নিজের বুক দিয়ে চেপে ধরেন তার শরীর। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল বৈকি। শব্দ শুনে টাকা-হারানো মানুষটি চালকের সামনের আয়না দিয়ে দেখলে সব, এবং অনুভব করলে তার হাতের কব্জি শক্ত করে জমপেশ ধরেছে জিতেন বাবু।

তার মাথার চুল সত্যি খাড়া হয়ে গেল, তার থেকে কয়েকটি মাত্র কথা বেরিয়ে এল তোৎলা ভাষায়—ছে-ছে-ছে-ড়ে দিন আ-আমায়, তা-তা-তারা চা-চাই না।

একটি খুব সরু গলির সামনে ট্যাক্সি আপনি দাঁড়ি গেল। পথে কাছাকাছি তখন অন্য লোক ছিল না বে জিতেন বাবু নেমে সেই লোকটিকে হাত ধরে নামিয়ে বলে,—এই গলি দিয়ে সোজা চলে যদি ফিরে তাকিয়েছেন বা গাড়ির নম্বর দেখবার করেছেন ত' শেষ করে ফেলবো তখুনি।

ভদ্রলোক ছাড়া পেয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে পিছন থেকে দেখা গেল ঘামে তার জামাটা সমস্ত গেছে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের সংগে সংগেই গড়িয়ে চললো আবার।

নন্দর জ্ঞান ফিরে আসতে শরীরের ব্যথায় পারলে যে কোন এবড়ো-খেবড়ো শক্ত জায়গায় শোওয়া অবস্থায় পড়ে আছে সে। চোখ খুলে মাথার ওপর অন্ধকার আকাশে তারারা মিটিমিটি হা পাশে একটি নতুন বাড়ি তৈরী হ'তে হ'তে আধখানা কংকালের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মনে পড়ে সব। ক্লোরোফর্ম্ অজ্ঞান করে এই ইটের স্তূপের ওপরে ফেলে বদমাসরা। তা'হ'লে সব ক'জনই এক দলের, ঐ ট্যা চালক পর্যন্ত! কি রকম সব সাজানো ছিল গোড়া চমৎকার অভিনয় করে গেল। জায়গা ছেড়ে টিকিটের পয়সা দিলে, একজন জিতেন বাবু সেজে আর যখন আরোহীরা খুব মেতে গিয়ে অন্যমনস্ক আঙুল লম্বা করে হাত সাফাইএর ভেলকি শুরু দিলে। সে দেখতে পেয়ে বলে না দিলে আরো কত মানুষের পকেট খালি হয়ে যেত নিশ্চয়।

শহরের পথেঘাটে সম্ভব এদের এই নিত্য ক পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে,আ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে মজার কথা যে কত অল্পে সামান্য ব্যাপারে লোকেরা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস নেয়! সেই দুঃখী লোকটির পা জড়িয়ে কি কান্না!

মনে পড়ে যেতে নন্দ বেদম হেসে ওঠে আপনি আপনি, এই হাসিতেই হয়ে গেল এক নতুন বিভ্রাট। এক গ অনেকগুলি কুকুর তার খুব কাছেই চীৎকার সুরু দেয়।

চারপাশে যে অতগুলি কুকুর নিঃশব্দে এতক্ষণ তাকে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল সে খবর জানবে কি করে? রদের ভীষণ চীৎকারে দূর থেকে সব লোকেরা সাড়া ভাবে চোর-টোর এল বুঝি। নন্দ কয়েকটি ইট আত্মরক্ষা করে, এবং তাড়াতাড়ি সেখান থেকে লিয়ে বাঁচে। এর পর লোকেরা এসে যদি কোন নতুন দ বাধায় তবে আরো মুশকিল।

সেদিন অনেক ঘুরে অনেক রাত করে সে বাড়ি গিয়ে ছালো। কারুকে বিশেষ কিছু বললে না তবে নিজের মনে ঠিক করে ফেললে যদি সুযোগ ঘটে ত' আর এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করতেই হবে, এবং সেদিন একহাত সোজাসুজি বোঝাপড়া।

আপিস নেই সুতরাং আবার আগের মত তার সময় তে থাকে। বাড়িতে শুয়ে বসে থাকে, পথে পথে বেড়ায়, আর মন খুসি থাকলে একটু-আধটু বিদেশী গায়। মা আর বাজার করতে বলেন না, এবং টর দল এসে ধরাধরি করলেও নিয়ম মত তাদের ড়াতে আর যায় না। মাঝে মাঝে গিয়ে একটু-আধটু খিয়ে দিয়ে আসে।

একটি বিষয়ে তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আজকাল। লীর করাতের চালু হবার বা বন্ধ হবার সময়ে আর ন শুয়ে পড়তে হয় না টেবিলের নীচে বা খাটের য়। সামান্য একটু চমকে ওঠে এই যা। কিন্তু আবার সেই পুরানো মুশকিল—সময় যে কাটতে চায় না, সময় কাটে কি করে?

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরুচ্ছে, দেখে মোড়ের মাথায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার আপিসের সেই গোবেচারী কেরানি, ভালমানুষ বিষ্টুপদ, ও তার সংগে আর এক জন মাঝাবয়সী ভদ্রলোক। বিষ্টুপদ ইসারা করে কাছে ডাকলে।

নন্দকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে বলে,—উনি হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, কানাইলাল বসু। উকিল হলেও ওকালতির চেয়ে দেশের ভাল করাই হচ্ছে ওঁর আসল পেশা। ছেলেমেয়েদের ইস্কুল, ব্যায়াম-মন্দির প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান উনি গড়ে তুলেছেন এই শহরের ভিতর। আপনার সংগে একটি বিশেষ দরকারী আলোচনা করতে চান।

—তা চলুন না আমাদের বাড়ি, বসে কথা কওয়া যাবে।

তিন জনে প্রায় বাড়ির দরজার সামনে এসেছে, দেখা গেল উলটো দিক্ থেকে নন্দর পিসেমশাই আপিস ফেরত তাদের বাড়িতে আসছেন। বিষ্টুপদ হঠাৎ বোঁ করে ফিরেই ভোঁ দৌড়। দু'জনকে আবার ফিরে আসতে হ'ল চৌমাথার মোড়ে।

বিষ্টুপদ কিছুতে বাড়ি যেতে রাজী হয় না, বলে,—বড়বাবুর সামনে এই সব কথা হ'লে টিটকারির জ্বালায় আর আপিসে টিকতে পারবো না।

সুতরাং ঠিক হয় কাছের বাগানে বসে নিরিবিলি কথা কওয়া যাবে। চলতে চলতে নন্দ ভাবে—এক ত' নিজের পিসেমশায়ের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া গেছে, এখন আবার আর এক জনের পিসেমশাই তাকে কি নতুন ফ্যাসাদে ফেলেন কে জানে! (ক্রমশঃ)

সাংহাইয়ের গপ্প

শ্রীনারায়ণ দত্ত

ববির সঙ্গে সবাই পালিয়ে এলো।

—'কি? হ'ল কিরে?' নীতাদি' জিজ্ঞেস করলেন।

নীতাদি' নতুন মানুষ। অথচ তাঁর কাছে গপ্প আদায় করে এ বাড়ীর সবাইকার অতি পরিচিত তিনি, অতি আপনার।

কোলে মাথা গুঁজে ববি বলে ফেল্লে, 'চীনে, চীনেম্যান নীতাদি'!'

নীতাদি' হাসলেন, বল্লেন, 'বড্ড ভয় করে, নারে?'

'হ্যাঁ', কোলে মাথা গুঁজে দিব্যি স্বীকারোক্তি করলে ববি,—'কুৎকুতে চোখ, চ্যাপ্টা নাক···'

'আমিও করতাম', নীতাদি' বললেন। 'ঐ ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ, চ্যাপ্‌টা নাক, হলদেটে রং, দেখলে আমারও মাথা ঘুরে উঠতো। তোদের মত ছোট বয়সে ত' বটেই, বড় হয়েও এ ভয় আমার কমে নি।

'অথচ, কাজের খাতিরে আমরা গিয়ে পড়লাম এই চীনেদের রাজ্যে—সাংহাইএ!'

নীতাদি' সুরু করলেন, : 'আমরা এক ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলাম। আর কিছু দূরে একটা নাম-করা হোটেলে থাকতেন আমার এক দূর সম্পর্কের পিসীমা আর তাঁর স্বামী এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—মিঃ সেন।

'তাঁর কাছে থাকারও অসুবিধা ছিল না কিন্তু পরদিন মিঃ সেন আর ছোট পিসীমা দু'জনেই সিংগাপুর চলে যাচ্ছিলেন।

'ওঁদের সঙ্গে দেখাশুনা শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। শ্রান্তিতে শরীরটা এলিয়ে পড়েছে। চাকরটাকে এক কাপ্ কফি বানাতে বলে গা-হাত ধুতে গেলাম।

'হঠাৎ হাতের আঙুলে নজর পড়তে চমকে উঠলাম। আংটিটা আমার হাতেই রয়ে গেছে যে! বড় ভুলো মন ছোট পিসীর। আমার আঙুল মোটা না ছোট পিসীর এই নিয়ে তর্ক হওয়ার পর অবশ্য প্রমাণ হ'ল আমরা দু'জনেই সমান মোটা বা রোগা, কারণ ছোট পিসীর আংটিটা আমার আঙুলেও ঠিক হয়ে যায়। এই পরেছিলাম আংটিটা।

'কিন্তু শেষকালে ভুলে নিয়ে অসবো এটা ভাবি

'কত শত বছরের পুরানো এই চীনা সহর। ধূসর আবরণে রাত্রির কৃষ্ণ ছোপ স্পষ্ট হয়ে উ রাস্তার মাঝে মাঝে শহরের দীপ্তি ছড়িয়ে আছে। উঁচু করা ল্যাম্প পোষ্টের আলো, দোকানের আঁব সাইনবোর্ডের মাঝে বিজলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। বন্দরের এই বিস্তৃত নৈশ রাজ্য। এর পেছুতে আছে কত ছোরা-ছুরি, রাহাজানি,···খুন···

অথচ কাল সকালেই সিংগাপুর চলে যাবে ছোট সামান্য শীতও যে নেই তা নয়, কেমন যেন আ বোধ করছিলাম। শেষ বেশ সোয়েটারটা গায়ে মনিব্যাগ্‌টা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

'রিকশ' ডাকতে সাহস হ'ল না। শুনেছি রাতে ওরা না পারে এমন কাজ নেই। একবার করলাম ট্রামে উঠে পড়ি। কিন্তু মনে এতেও ভরসা পেলাম না। ট্রামে ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি চলে হাজার হাজার চীনেম্যান্। চাকা মুখ, চ্যাপ্টা ছোট ছোট চোখে সাপের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি···

'শেষে পায়ে চলাই ঠিক করলাম। 'গার্ডেন থেকে "সান্ হোটেল' আর কতই বা দূর হবে? রা জোর মিনিট তিরিশ বাড়বে।

'খানিকটা এগিয়ে এসেছি, এমন সময় শুনি কে ডাকছে,—"ও মিসি, মিসি!···"

'চমকে উঠলাম। পিছু ফিরে দেখি একখানা মুখ, সাহেবী টুপি, পরনে প্যাণ্টালুন,—তীক্ষ্ণ এক চোখ, তড়বড় করে এগিয়ে আসছে ও! 'বুকখানা করে উঠল। আড়ষ্ট চীৎকার ক'রে প্রায় ছুটতে করলাম।

'হাতের হীরের আংটিটা বুকে জোরে চেপে ধরে বাড়িয়ে দিলাম।

'রাস্তা কমিয়ে এনেছি প্রায়। ঐ একটু দূরেই দেখা ছে চীনের জাতীয় নেতা ডাঃ সানইয়াৎ সেনের ব্রোঞ্জ-র্ত। ঐ ত' উড়ছে চীনের জাতীয় পতাকা! পিছু রে লক্ষ্য করতেই দেখি সেই বিকট-দর্শন চীনা, আমায় ওয়া করে আসছে প্রায়! ওর পায়ের গতিও কম নয়!

'দৌড়ে গিয়ে হোটেলের দরজায় ঢুকতে যাবো, এমন য় কাঁধে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলাম। চকিতে রে চেয়ে দেখি, সেই মুখ!

'ও হাসছে!

'ওর উজ্জ্বল দৃষ্টির মাঝেও এক ঝলক উচ্ছল হাসি স্পষ্ট য় উঠেছে। আমি ভীতু বাংগালী মেয়ে, ওর কাছে ড়ে হেরে গেছি, কিংবা এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমি যে ত দুর্ব্বল এই মনে ক'রেই ওর এই পরিহাস নাকি?

'আংটিটা বুকের মাঝে চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে বল্লাম, কি? কি চাও তুমি?"

'আবার হাসলো ও। ভাংগা ভাংগা ইংরিজীতে , "বড্ড জোলে হাঁতো তুমি মিসিবাবা!"

'ওর শান্ত উত্তরের মাঝেও যেন অবর্ণনীয় এক ঠাণ্ডার য়াচ!

'অজ্ঞানের মত বললাম, "এটা আমার নয়, আমার ছে পয়সা পেতে পারো।" চমকে উঠ্‌লো চীনেম্যান। জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বলী-খা। ধীরে ধীরে মুখে ফুটে উঠ্‌ল তাচ্ছিল্যের রেশ। ছু বললে না। ঝলমলে নগরীর উপরে ঐ নীল কাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, পরক্ষণে হা-করে হেসে উঠে বলল, "দাও, দাও—।"

'দিতে গেলাম। সোয়েটারের পকেট হাতড়াতে গিয়ে গালে হাত দিলাম। কোথায় মনিব্যাগ্? আমার মাথার ওপরে ঝুলছে কালান্তক এই চীনেম্যানের তীক্ষ্ণ অস্ত্র; কি দিয়ে তুষ্ট করব ওকে, খুসী করব ওকে?

'আবার হাসল ও। তেমনি বিকট হাসি, ঝড়ো হাওয়ার মতো বুকখানা কাঁপিয়ে দিল যেন!

'বললে, "পেল্‌লে না তো মিসি! পড়ে গিছিল যে!" বলতে বলতে আমার হাতেই এনে দিল আমারই হারানো মনিব্যাগটা!

'যন্ত্রচালিতের মত হাত পেতে দিলাম।

'কি বলবো ভেবে পেলাম না। কিছু বলবার আগেই কখন সরে পড়েছে ও। আলোকোজ্জ্বল এই নগরীর কোন গলিঘুঁজির একটা দোকানে বসে হয়ত বা আড্ডা দিচ্ছে, কিংবা হয়ত নিছক যন্ত্রণায় চণ্ডুর পাইপটা ধরে মৃদু মৃদু টান দিয়ে চলেছে!

'মনিব্যাগের ভিতরে যা ছিল তেমনি আছে, স্থানচ্যুত হয় নি কিছু!

ছোট পিসী এগিয়ে এলেন।

'আংটিটা ফেরৎ পেয়ে খুবই খুসী হলেন সন্দেহ নেই। আমায় এতটা শ্রান্ত দেখে বল্লেন: "কিরে, এলি কিসে? রিক্সাগুলোয় ঝাঁকুনী কম হয় না আজকাল!"

'কোন উত্তর দিই নি। দিতে ভালো লাগছিল না। রাস্তার কথা মনে হ'লেই মনে পড়ছিল সেই বিকট-দর্শন চীনা। ওর মুখখানা কি ওর মুখোস নাকি?*

* ইংরিজী থেকে

কলিযুগের কুবের

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামজীবনপুর একটি ছোট্ট মফঃস্বল সহর। নদীর ধার ঘেঁষে দিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের লাল সুড়কি-বাঁধানো পাকা রাস্তা চলে গেছে সদরের দিকে। আজ সকাল থেকেই সেই রাস্তায় দলে দলে লোক ছুটেছে—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো —কেউ বাদ নেই। কি ব্যাপার, মেলা বসেছে নাকি ওখানে?

আসলে কিন্তু তা নয়। কলকাতা থেকে একখানা হাওয়া-গাড়ী অর্থাৎ কলের গাড়ী অর্থাৎ মোটর-গাড়ী

এসে হাজির হয়েছে। সেই অপরূপ পদার্থটি একবার চোখে দেখে নয়ন যুগল সার্থক করার জন্যই নাকি এই জনস্রোত!

একালকার ছেলে তোমরা, ব্যাপারটা শুনে ফিক ক'রে একটু হেসে নেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করবে! আজ-কাল ইস্কুলের ছেলেরাও যে নিজে হাতে মোটর-গাড়ী হাকায়! (যদিও আঠারো বছরের কম বয়সীদের মোটর চালানোর আইন নেই।) আর শুধু ছেলেরাই বা বলি কেন, অবলা বাঙ্গালী মেয়েরাও দলে দলে এ কাজে এগিয়ে আসছেন! পথেঘাটে একটু লক্ষ্য করলে হামেশাই চোখে পড়ে।

হেনরি ফোর্ড

কিন্তু ওপরের যে চিত্র দিলাম সে ঘটনাও খুব বেশী দিনের পুরোনো নয়। আমার নিজের ছেলেবেলায়ই এ রকম ঘটনা আমি অনেক বার দেখেছি। মোটরকার তখন দুর্ল্লভ বস্তুই ছিল, কোন মফঃস্বল সহরে (জেলার সদরে পর্য্যন্ত) দু'-চারখানির বেশী তা দেখা যেত না। কেবল মাত্র রাজা-মহারাজা বা খু-উব বড় সরকারী কর্ম্মচারীরাই সখ ক'রে মোটর রাখতেন। সাধারণ বড়লো রাখতেন ঘোড়ার গাড়ী - যুড়ি গাড়ী – ল্যাণ্ডো, ব্র ফীটন্, টম্‌টম্—যার বেশীর ভাগই এখন অচল এসেছে। ৩০।৪০ বছরের মধ্যে এই বিরাট পরি যাঁদের জন্য সম্ভব হয়েছে তাঁদেরই একজনের কথা শোনাব। হেনরি ফোর্ডের কথা বলছি।

এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব'লে ফোর্ড সা নাম ছিল। 'ফোর্ড' নামে বিখ্যাত মোটর-গা ব্যবসা ক'রে তিনি অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েছি এই ফোর্ড গাড়ী তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এই আগেও 'ফোর্ড'ই ছিল বোধ হয় সব চেয়ে সস্তা মো কার। কিন্তু সস্তা ব'লে বাজে মনে ক'র না। নতুন মডেলের ফোর্ড গাড়ী যা দেখা দিয়েছে সে একটা দেখবার জিনিষ।

হেনরি ফোর্ডের মৃত্যুসংবাদ বৈশাখ মাসের রামধ পেয়েছ। মাত্র মাস দুই হ'ল ৮৪ বছর বয়সে এই ক পরলোক গমন করেছেন।

হেনরি ফোর্ডের বাড়ী ছিল আমেরিকা। ১৮৬৩ ডিয়ারবর্ণের কাছে একটি ছোট্ট জায়গায় তাঁর জন্ম তাঁদের আদি বাড়ী অবশ্যি আমেরিকা নয়। তাঁর আসলে ছিলেন ইংরেজ,—হেনরির জন্মের অনেক থেকেই তিনি আমেরিকায় গিয়ে বসবাস সুরু ক আর হেনরির মাও ছিলেন আসলে ওলন্দাজ,—তাঁ পরিবারও আগে থেকেই আমেরিকায় থাকতেন।

হেনরির বাবা উইলিয়াম্ ফোর্ড ছিলেন কৃষিজ চাষবাস ক'রেই তাঁর সংসার চলত। যদিও ও চাষারা ঠিক আমাদের দেশের চাষার মত নয়, হেনরিকেও, ছোট বেলা থেকেই নিজের হাতে ঠেলতে হয়েছে। ইস্কুল থেকে ফিরে এসেও তাঁকে সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে হ'ত।

উইলিয়ামের ইচ্ছা ছিল হেনরি তাঁরই মত কলমে চাষের কাজ শিখে মানুষ হবে। ছেলের ঝোঁক ছিল অন্য দিকে। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এই দিকেই ছিল তার নজর। একবার হেনরির বাবা একটা ঘড়ি কিনে দেন। তেরো বছরের ছেলে ঘড়ি পেয়েই তার ভিতরকার যন্ত্রপাতি আগাগোড়া

লেন, তার পর তা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে আবার মত যুড়ে দেন। এই সামান্য ঘটনাটিতে তাঁর কারি-বুদ্ধি এবং যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্ভুত আগ্রহের পরিচয় ওয়া যায়।

নিজের ঘড়ি যুড়েই কিন্তু হেনরির মন উঠল না। র কাজ তাঁকে যেন নেশার মত পেয়ে বসল। নি আশপাশের যত পরিচিত লোক সকলকার কাছ ক ঘড়ি বিগড়োলেই তা চেয়ে আনতেন আর নিজের ত তা ঠিক ঠিক মেরামত ক'রে দিতেন। এ জন্য র বিশেষ কোন যন্ত্রপাতিরও দরকার হ'ত না। টা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একযোড়া চিমটে। সে দু'টোও বার তাঁর নিজের হাতে তৈরী। একটা পুরোনো বার কাঁটা ভেঙ্গে তৈরী হয়েছিল প্রথমটি, আর দ্বিতীয়টি রী হয়েছিল একটা ভাঙ্গা ঘড়ির স্প্রিং কেটে।

বলা বাহুল্য ঘড়ি মেরামতের জন্য হেনরি কারও কাছ ক পারিশ্রমিক নিতেন না—ব্যাপারটা ছিল তাঁর র্ণ সখের কাজ। হেনরির বাবা অবশ্যি তা পছন্দ তেন না, ফলে হেনরিকে অনেক সময় রাত্রে লুকিয়ে কয়ে কাজ করতে হ'ত।

আগেই বলেছি, চাষের কাজে হেনরির মন উঠত —তাঁর সর্ব্বদাই ইচ্ছে হ'ত কল-কারখানায় বসে পাতির কাজ শেখা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করার পর ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে। শেষে একদিন তিনি য়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েন নিকটবর্ত্তী ডেট্রয়েটের দেশে। সেখানে একটা ছোট যন্ত্রপাতির কারখানায় র কাজ জুটে গেল। মাইনে হ'ল সপ্তাহে আড়াই ার (আমাদের হিসাবে প্রায় সাড়ে সাত টাকা)। নরির বয়স তখন সবে ষোল বছর।

কিন্তু আমেরিকার মত জায়গায় সপ্তাহে আড়াই ডলার চ ক'রে, সে যুগেও, খাওয়া-থাকা চালান সম্ভব হ'ত না। রি দেখলেন শুধু বাসা ভাড়া আর খাওয়ার জন্যই র কম ক'রে সাড়ে তিন ডলার খরচ লাগছে। তবে হবে, শেষে কি আবার গ্রামে ফিরে ক্ষেত-খামারের জেই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে? উঁহু, সে ত্রই ন'ন তিনি। কারখানায় তাঁকে খাটতে হ'ত জ দশ ঘণ্টা ক'রে। সন্ধ্যার পর তিনি আর একটি কাজ জুটিয়ে নিলেন এক সেকরার দোকানে। চার ঘণ্টা কাজ,—মাইনে সপ্তাহে দু' ডলার। ফলে তাঁর দৈনিক ১৪ ঘণ্টা করে খাটুনী সুরু হ'ল। সপ্তাহের শেষে খাওয়া-থাকা বাদ দিয়ে এক ডলার ক'রে থাকত।

কিছু দিন ঐ ভাবে কাজ করার পর হেনরির আর একটি নতুন কাজ জুটে গেল। এই কারখানায় ষ্টীম্ রোলার, ষ্টীম্ এঞ্জিন, প্রভৃতি মেরামত হ'ত। হেনরির মনের মত কাজ। অল্প দিনেই তিনি ঐ সব এঞ্জিন সম্বন্ধে হাতে-কলমে অনেক কিছুই শিখে ফেললেন। এর পর তিনি আর একটি কেম্পানীর হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই কোম্পানীর কাজ ছিল ছোট ছোট ষ্টীম্ এঞ্জিন তৈরী করা আর হেনরির কাজ ছিল ক্রেতাদের দরকার মত তা বসিয়ে দিয়ে আসা।

বছর দুই পরে হেনরি বাপের কাছে ফিরে এলেন, এবং বাপের ইচ্ছামত চাষবাসের কাজেই মন দিলেন। কিন্তু এঞ্জিনের ভূত তাঁর মাথা থেকে যায় নি। খামার-বাড়ীর পাশেই তিনি একটি ছোট্ট ঘরে কতকগুলি যন্ত্রপাতি নিয়ে জড় করলেন আর অবসর সময়ে সুরু করলেন তাই নিয়ে পরীক্ষা। কৃষি কাজের উপযোগী হাল্কা ধরণের একটা কলের লাঙল তৈরী করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। লাঙল তৈরীও হ'ল, কিন্তু তা চালাবার বয়লারটি তাঁর মনঃপূত হ'ল না। খুব সস্তা এবং হাল্কা জিনিষ চাই তাঁর।

উইলিয়াম্ ফোর্ডের কিন্তু ছেলের এই কলকব্জার ওপর ঝোঁক ভাল লাগত না। কি ক'রে ওর মতিগতি ফেরে এই হ'ল তাঁর ভাবনা। শেষে তাঁর মাথায় এক মতলব এল। সেখান থেকে কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে তাঁর খানিকটা জমি কেনা ছিল—প্রায় এক শ' সওয়া শ' বিঘা হবে। তার সবটাই জঙ্গল,—বড় বড় গাছে ভর্ত্তি। উইলিয়াম্ ছেলেকে সেইখানে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

জঙ্গলে হেনরি নিজে হাতে গাছ কাটেন, করাতের কল বসিয়ে কাঠ চেরেন আর সেই কাঠ বিক্রী করেন। সব কাজই প্রায় নিজেকে করতে হয়। এমন কি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরটিও কাঠ কেটে নিজে হাতে তৈরী ক'রে নিতে হ'ল। কিন্তু এঞ্জিনের ভূতটা তখনও যায় নি। ঐখানেই তিনি তাঁর এঞ্জিনের কারখানা উঠিয়ে নিয়ে এলেন আর অবসর সময়টুকু তারই পেছনে কাটাতে

লাগলেন। ১৮৮৭ সনের কথা বলছি। হেনরির বয়স তখন চব্বিশ। এই সময় তিনি বিয়ে করেন।

এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছ, চাষের কাজে বা কাঠের কারবারে হেনরির মন উঠবার নয়—তা তাঁর বাবা যতই চেষ্টা করুন না কেন। হ'লও তাই। কিছুদিন পরেই তিনি আবার ডেট্রয়েটে চলে এলেন। এবারে এলেন এক বড় কারখানায় এঞ্জিনীয়ার হয়ে।

এত দিন পর্য্যন্ত হেনরি যে সব এঞ্জিন নিয়ে গবেষণা করতেন তা সবই ষ্টীম্ এঞ্জিন—অর্থাৎ বাষ্পের শক্তি দিয়ে তা চালান হত'। এখানে কাজ করবার সময়ে একটা নতুন ধরণের এঞ্জিন তাঁর চোখে পড়ল। এটি চলে পেট্রোলের শক্তিতে। হেনরির মাথায় এল—ষ্টীম্ বা বাষ্পের বদলে পেট্রোল দিয়ে এঞ্জিন চালানোর হাঙ্গামা তো অনেক কম! আচ্ছা, এ এঞ্জিন এমন একটা গাড়ীতে যুড়ে দেওয়া যায় না—যা রাস্তা দিয়ে চলতে পারে? যেমন ভাবা তেমনি কাজে লাগা। পুরানো লোহালক্কড়, কলকব্জা কাজে লাগিয়ে তিনি একটি ছোট্ট কলের গাড়ী তৈরী ক'রে ফেললেন। সেই হ'ল তাঁর প্রথম মোটর-কার। 'মোটর-কার' কথাটার মানে 'কলের গাড়ী' তা নিশ্চয়ই জান। এই গাড়ী দেখতে ছিল অনেকটা ঠেলা-গাড়ীর মত, গতিবেগও ছিল খুব কম। ফোর্ড্ যখন এই গাড়ী চড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তখন অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও ছাড়ল না। কিন্তু ঐ ছোট্ট কিম্ভূতকিমাকার গাড়ীর মধ্যেই ভবিষ্যতের যে বিরাট্ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা কেউ নিশ্চয়ই ভাবতে পারে নি। হেনরি কিছুদিন ঐ গাড়ী চালিয়ে তা ২০০ ডলারে বেচে দেন। ইচ্ছা, ঐ টাকায় আরও উন্নত ধরণের গাড়ী তৈরী করবেন।

এর কিছু দিন পরেই হেনরি এঞ্জিনীয়ারের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে একটা মোটর-কার তৈরীর কারখানা খুলে বসেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা, যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায়ই একটি ছোট্ট কারখানা তৈরী ক'রে বসলেন। এখানে কয়েকখানা মোটর-গাড়ী তৈরী হ'ল—তার মধ্যে দু'খানা রেসিং কার। একটির নাম 'য়্যারো', অপরটির নাম ৯৯৯। ৯৯৯ যে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগ দিল তাতেই বাজি জিতে নিল। হেনরির বাহাদুরীর কথা চারদিকে ছড়িয়ে প

হেনরি ঠিক করলেন, এবার আর ছোটখাট কা ক'রে তিনি সময় নষ্ট করবেন না। মোটর-গাড়ীর ব্য করবেন কিন্তু এমন ভাবে করবেন যাতে তাঁর দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে—সর্ব্ব সাধারণের তা সহজলভ্য হ'তে পারে। ১৯০৩ সনে ১ লক্ষ মূলধন ঠিক ক'রে তাঁর বিখ্যাত ফোর্ড্ কোম্পানী ষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু আসলে ২৮ হাজার ডলারের টাকার প্রয়োজন হ'ল না। হেনরির কারখানায় নূতন উন্নত ধরণের মোটর-গাড়ী তৈরী হ'তে লা ১৯০৯ সনে বেরোল "টি" মডেলের বিখ্যাত গা ১৯২৮ সনে আর একটি মডেল, ১৯৩১ সনে আর এ হাল্কা অথচ মজবুত আর অসম্ভব সস্তা হওয়ায় দে দেখতে 'ফোর্ড্' কোম্পানীর গাড়ী পৃথিবীর বাজার ফেলল। হেনরি ফোর্ড্ (এখন থেকে ফোর্ড্ না বল্‌ব) বল্লেন, 'দাঁড়াও না, আমেরিকার প্রত্যেকটি র মজুরকে আমি প্রত্যহ তাদের নিজের নিজের মো চাপিয়ে কাজে পাঠাব।' অর্থাৎ এত সস্তায় তিনি রা গাড়ী ছাড়বেন।

ফোর্ড্ কোম্পানী দেখতে দেখতে কি রকম বড় উঠল তা শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। ১৯০৩ ২৮ হাজার ডলার নিয়ে যে কোম্পানীর গোড়াপত্তন ছিল ১৯২৬ সনেই তার বাজার দর হ'ল ১০০ কোটি ডলা পৃথিবীর মধ্যে এইটেই হ'ল সব চেয়ে বড় মোটর-কা কারখানা। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কারখানার মধ্যে এর স্থ হ'ল তৃতীয়। মূল মোটরের ব্যবসা ছাড়া এর অধীনে আ ৫০টি আনুষঙ্গিক বড় বড় ব্যবসা গড়ে উঠল। কোম্পা নিজস্ব লোহার খনি, কয়লার খনি, কাঠের জঙ্গল, নি রেলওয়ে, ষ্টীমার, সমুদ্রগামী জাহাজ—এক ক মোটরের ব্যবসার জন্য যত রকম কাঁচা মালের এ সরঞ্জামের দরকার কোম্পানী সাধ্যমত নিজস্ব প্রতি থেকেই তা উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করল। পৃথিবীর স ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানীর শাখা এবং তার ফলে প্রত্ ভাবে ২ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষ ভাবে আরও ২ লোকের এর অধীনে কাজ ক'রে জীবিকার ব্যবস্থা হ এত বড় ব্যবসার একমাত্র মালিক হলেন কিন্তু

র্ড্ আর তাঁর ছেলে এডসেল ফোর্ড্। ১৯১৯ সনে ম্পানীর সমস্ত শেয়ার বা অংশ, যা অপরের হাতে ল, তা এঁরা কিনে নিলেন। এই সময়ে হেনরি ফোর্ড্ ন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

সামান্য অবস্থা থেকে শুধু নিজের প্রতিভা ও সততার রে কত বড় হওয়া যায় ফোর্ডের জীবন তার একটি ত আদর্শ। "মাই লাইফ্ এণ্ড ওয়ার্ক্" নামে তাঁর যে ত্মজীবনী আছে তা থেকে এর সুন্দর পরিচয় পাওয়া । বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই বইটা পড়বে। ফোর্ডের ট্ কারখানা আজও বেড়ে চলেছে। শুধু মোটর-কার মোটর-ট্রাক্টর এবং বিশেষ ক'রে এরোপ্লেন তৈরীর জও এঁরা হাত দিয়েছেন। নিজে যুদ্ধবিরোধী হলেও শর প্রয়োজনের দিনে ফোর্ড্ নানা ভাবে আমেরি- ক প্রচুর সাহায্য করতে পিছ-পা হন নি।

হেনরি ফোর্ডের ব্যক্তিগত জীবনও উল্লেখযোগ্য। য়িক, নিরহঙ্কার ও মানবপ্রেমিক ব'লে তাঁর সুনাম । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েও তাঁর চালচলন ছিল ন্ত সাদাসিধে। খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও তাই। তিনি ান পর্য্যন্ত করতেন না। নিজের কর্ম্মচারীদের প্রতি ব্যবহারও ছিল চমৎকার। তাদের তিনি প্রচলিত র তুলনায় অনেক বেশী পারিশ্রমিক দিতেন। তাদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অসুস্থদের ভাল রকম সার বন্দোবস্ত করা—এই রকম নানা ধরণের ছোট ুটিনাটি বিষয়গুলির ওপরও তিনি দৃষ্টি দিতেন। ফলে কারখানায় কাজ চলত সুষ্ঠু ভাবে। কর্ম্মচারীরা থাকায় কাজ পাওয়া যেত অনেক বেশী।

ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মত এখানে তুলে দিচ্ছি। বলতেন, ভবিষ্যৎকে ভয় ক'র না। তেমনি সততার কাজ ক'রে কোন কাজে বিফলমনোরথ হলেও ভয় কিছু নেই, অপমানেরও কিছু নেই তা'তে। র বিফল হওয়া মানে দোষ-ত্রুটিগুলো বুঝে নিয়ে ক'রে কাজ সুরু করার একটা সুযোগ লাভ করা মাত্র। ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি আমল দিতেন না। বরঞ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে ব্যবসায়ে বড় হওয়া যায় না এটাই ছিল তাঁর মত। ব্যবসায়ে বেশী লাভ করাটাকে অনেকে দোষের মনে করে। তিনি তাদের সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি। ব্যবসা করে লোকে লাভেরই জন্য, এবং বেশী লাভ না হ'লে ব্যবসার উন্নতি হ'তে পারে না। কিন্তু লাভের আগে কাজ দেখাতে হবে—এ জিনিষটি কখনও ভুললে চলবে না। আগে কাজ দেখিয়ে তবেই লাভ চাইতে পার। আর একটি কথা—ব্যবসায়ে সততা হচ্ছে একটা মস্ত বড় কথা। সততা থাকলে একদিন না একদিন লাভ হবেই।

হেনরি ফোর্ড্ কেমন কোমলস্বভাব ছিলেন তার একটি ছোট্ট গল্প ব'লে আজ শেষ করব। একবার ফোর্ড তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। বন্ধুরা এসে দেখেন বিরাট সদর দরজা, কিন্তু তার গায়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, "অনুগ্রহ ক'রে এই দরজা দিয়ে না ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকুন।" সবাই বিস্মিত হ'লেও কিছু না বলে পেছনের দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আগন্তুকদের একজন সাইনবোর্ডর তাৎপর্য্য জানতে চাইলেন। অমন সুন্দর বিরাট্ সদর দরজা থাকতে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে বলা হ'ল কেন? ফোর্ড বল্লেন, "আর কিছু নয়, সদর দরজার ফাটলে একটি ছোট্ট চড়াই পাখী ডিম পেড়েছে। ছোট্ট মা-পাখী ডিমের ওপর বসে তা দিচ্ছে। মানুষের হট্টোগোলে হয়তো ভয় পেয়ে যাবে তাই এই ব্যবস্থা করেছি।"

ফোর্ড মাত্র অল্প কিছু দিন আগে (এক বছরের সামান্য বেশী) তাঁর একমাত্র পৌত্রের ওপর ব্যবসার সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে অবসর নিয়েছিলেন জীবনের বাকী ক'টা দিন নিশ্চিন্ত ভাবে কাটাবেন ভেবে। কিন্তু ভগবান্ বোধ হয় তাঁকে শুধু কাজ করবার জন্যই পৃথিবীতে পাঠিয়ে-ছিলেন, তাই তাঁর কর্ম্মময় জীবনে বেশী দিন অবসর যাপন সম্ভব হ'ল না।

জ্যোৎস্নায়

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

চাঁদ-ঝরা রাত্রির নিঝ্‌ঝুম জ্যোৎস্নায়
উন্মন হ'য়ে ওঠে মনটা,
চারদিক্ বিলকুল ঝিল্‌মিল্ ক'রে ওঠে
আমাদের পরিচিত বনটা।
চক্‌চকে সাদা মেঘ ঝিক্‌মিক্ করে শুধু—
তাই দেখি উৎসুক নয়নে,
ঘুম ভুলে চুপচাপ্ নীলাকাশ কথা কয়—
তাও দেখি শুয়ে শুয়ে শয়নে।
ঝুম্‌ঝুমি তাল তোলে নির্জনে ঝিঁঝিরা—
বেশ লাগে এই মধু জ্যোৎস্নায়,
তারা এসে টিপ দেয় এ রাতের পৃথিবীরে
ভালোবেসে তারি প্রিয় রোস্‌নায়।

ওই ছোট পুকুরের দুই তীর অস্থির—
শাপ্‌লারা কত আলো মাখছে,
মৃদু মৃদু ঢেউগুলি চঞ্চল খুসী নিয়ে
উচ্ছল চপলতা আনছে।
তার মাঝে বাতাসের দোলনায় দুলে দুলে
ফুল হ'তে ছুটে আসে গন্ধ,
তাই যেন চারধার বড় ভালো লেগে ওঠে,
মনে জাগে গুণ্ গুণ্ ছন্দ।
'শিলচরে' এসে এই জ্যোৎস্নারে দেখলাম—
দেখলাম এত ভালো রাতকে,
'বরাক' নদীর ধারে তবু যেতে ভয় হয়,
মন যেন কেঁপে ওঠে আঁৎকে।

সন্ধ্যামণি

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক

সন্ধ্যামণি, সত্যি তব দেহের রূপে
আলোর ছটা ঠিকরে পড়ে আঙ্গিনাতে,
গন্ধ তব হার মানিয়ে দেয় যে ধূপে—
মাণিক তুমি দিনের শেষে আঁধার রাতে।

ঊর্দ্ধে নভে তারার মত তোমায় হেরি,
তারই মত উজল তব অঙ্গখানি,
তা'র চেয়েতে তুমিই কাছে আমায় ঘেরি'
ঢালছো হাসি সন্ধ্যাবেলার দীপ্তিরাণী!

তারই মত এখন তব জাগার পালা—
সমস্ত রাত রইবে জেগে নিদ্রা ভুলি',
যখন হ'বে সূর্য্য মামার আলোক জ্বালা,
তারার মত তোমার আঁখি পড়বে ঢুলি'।

ঘুমের সুরু তখন হ'তে নিত্য-তরে
হবে তোমার—ভয় পেয়ো না সন্ধ্যামণি,
দেবের দু'টি চরণ-তলে পড়বে ঝরে—
সেই ত' তব মুক্তি, ওগো, চিরন্তনী!

এক ঝাঁক নীল পাখী

শ্রীঅধীর দাস

এক ঝাঁক নীল পাখী ওড়ে আকাশে—
উড়ে যায় ডানাগুলো মেলে বাতাসে।
ঝাঁকে ঝাঁকে যায় উড়ে,
নাহি চায় পিছু ফিরে,
থেকে থেকে নানা সুর তোলে বাতাসে;
নীল পাখী দলে দলে ওড়ে আকাশে।

দূরে দূরে—বহুদূরে কোন্ সে দেশে
আকাশের নীলিমায় চলে যে ভেসে!
কত নদী, কত নালা,
গিরি, বন, গাছপালা,
পাখার পিছনে ফেলে মেঘেতে মেশে;
নিরজনে উড়ে যায় অচিন দেশে।

উড়ে চলে কোন্ দেশে জানে কি তারা?
পাহাড়তলীর পাশে হ'ল কি হারা?
ছোট ছোট ঢেউগুলি
থেকে থেকে ওঠে ফুলি,
এঁকে বেঁকে নদীগুলি যেথায় মেশে
উড়ে যায় নীল পাখী সেই সে দেশে।

আধ গাড়ি খড় ফাঁক

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

২

রাত্রে খাবার সময় আমরা 'আধ গাড়ি'কে ঘিরে বস্‌লুম। মটা সে খুব ঘাবড়ে গেল, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলে আমরা বন্ধুর মতন ব্যবহার করছি, আর আমাদের ছে লজ্জা করবার কিছুই নেই, তখন সে রীতিমত সী হ'য়ে উঠলো আর গোগ্রাসে খেতে শুরু করলে। র পাত্র খালি ক'রে ফেলে সে তলাটা পর্যন্ত চেটেপুটে ল। খাওয়া শেষ করবার পর আবার তেমনি বে সে নাক মুছে ঢেঁকুর তুললে একবার, তারপর তর ফাঁক থেকে এক টুক্‌রো পেঁয়াজের খোসা ক'রে একজন কম্‌রেডের মাথার ওপর দিয়ে ল ছুঁড়ে।...

দিন কতক পরে একদিন বিকালবেলা আমাদের ানায় আবার আবির্ভূত হ'ল 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক'। কমাণ্ডার আমাদের জানালেন যে কৃষকটি আমাদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। খবরটা শুনেই আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে "গেরিলার গান"টা গেয়ে উঠলুম। কিন্তু 'আধ গাড়ি' চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল তার সনাতন পাইপটি মুখে দিয়ে।

সে রাত্রে আমি আর 'আধ গাড়ি' পাশাপাশি শুলুম।

'আমাদের সৈন্যদলে তুমি যোগ দিলে কেন?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম শোবার একটু পরে।

'তোমাদের দলে ঢুকবো না কেন?' সে প্রায় ভক্তি ভরা গলায় উত্তর দিলে, 'তোমরা সবাই কত ভালো লোক!'

তারপর তার পাইপটা চুষে নেবার জন্যে একটু থেমে,

সে আবার বললে, ‘ওই শয়তানদের তাড়াতে না পারলে আর কখনও আমাদের জমি চাষ করা যাবে না।’

হেসে তাকে জিজ্ঞেস করলুম: ‘তোমার ‘সূর্য-পতাকাটা কই ?’

‘আমার বৌ সেটাকে পাপ্পির তেয়ালে করেছে!’ এমন ভাবে সে জবাব দিলে যেন ওটার কোন দাম নেই।

তারপর সে আমাকে তার ঘর-সংসারের কথা বলতে আরম্ভ করলে। দেখলুম, আগেকার অর্থাৎ শান্তির দিনগুলির মতন এখন আর জমি চাষ করতে পারছে না বলেই সে জাপানীদের উৎখাত করতে চায়! আমাদের গেরিলা দলে যোগদান করবার জন্যে সে তার স্ত্রী-পুত্রকে অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে সীমান্তের বহু পশ্চাতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

গেরিলা যোদ্ধারা রাত্রে সাধারণতঃ আলো জ্বালিয়ে রেখে শোয়—অবশ্য যদি সম্ভব হয়। আমাদের বাহিনীতে ‘আধ গাড়ী খড় ফাঁক’ আসবার পরই উপরো উপরি দু’ রাত্রে দু’টো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। এক রাত্রে আমাদের একজন কমরেড ঘুম-চোখে বাইরে বেরুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে আর একজনের উপর পড়লো আর তার নাকটি দিলে ভেঙে। আলোটা নিবিয়ে রেখেছিল কে? কিছুতেই জানতে পারা গেল না। তার পরের রাত্রে আমরা সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠলুম গুলি ছোড়ার শব্দে। শত্রু খুব কাছে এসে পড়েছে এ বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ রইল না। আমরা বন্দুক, তরোয়াল যে যা পারলুম নিয়ে ছুটলুম বাইরে, তারপর যখন আবিষ্কার করলুম যে আমাদের একজন শান্ত্রী অন্ধকারে তার বন্দুকের ঘোড়া ভুল করে টেনে ফেলেছে তখন রাগে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। কে আলো নিবিয়েছে ধরবার জন্যে আমরা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুললুম।

কমাণ্ডার আমাদের হট্টগোল থামিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, কে আলো নিবিয়েছে। আমি মনে মনে আন্দাজ করলুম অপরাধী কে, আর ‘আধ গাড়ি’র দিকে আড়-চোখে তাকালুম একবার। তার মুখের ওপর আমার চোখ পড়তে দেখেই সে বিবর্ণ হয়ে গেল, পা দু’টো তার কাঁপতে সুরু করল।

কমাণ্ডার তার সামনে এগিয়ে গেলেন।

‘এই রে! বেচারা গেল এইবার।’ মনে [illegible] বললুম আমি।

ততক্ষণে তার পা দু’টো এমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ[illegible] মনে হ’ল এইবার সে পড়ে যাবে।

কমাণ্ডার আশাতীত ভাবে হেসে ফেললেন [illegible] অমায়িক মুখে জিজ্ঞেস করলেন তাকে: ‘আমাদের [illegible] এই জীবন ভালো লাগে তোমার ?’

‘নিশ্চয়ই, হুজুর!’ বলেই তার বেল্ট থেকে পা[illegible] বার ক’রে কমাণ্ডারকে উপহার দিতে গেল। ‘হুজু[illegible] তামাক খেতে ভালবাসেন ?’

ব্যাপার দেখে আমরা হৈ হৈ ক’রে হেসে উঠ[illegible] কমাণ্ডারও যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু [illegible] গাড়ি খড় ফাঁক’ তার মুখের শান্তভাব ঠিক বজায় রা[illegible] মাথাটা চুলকে, বুকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সে [illegible] চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইল যেন বেফাঁস কথা সে [illegible] বলে নি।

তার পরদিন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে [illegible] গলায় জিজ্ঞেস করলুম: ‘আলোটা নিবিয়ে দিয়ে[illegible] কেন ?’

প্রশ্ন শুনে সে লজ্জিত হ’ল, একটু হেসে ব[illegible] ‘তেলের এখন বড় দাম, আগেকার চেয়েও দাম, তা[illegible] তার পর বুকটা একবার চুলকে নিয়ে শেষ করলে: ‘[illegible] জ্বালা থাক্‌লে আমি ঘুমোতে পারি না। যাক [illegible] তামাক খাবে একটু ?’

আমাদের সম্মিলিত জীবন-যাত্রার শৃঙ্খলায় [illegible] আস্তে অভ্যস্ত হ’য়ে উঠলো সে। তার সাহস আর জী[illegible] শক্তিও আরো বেড়ে গেল। কখনো কখনো আম[illegible] সাধারণ কায-কর্মের ওপর সে মন্তব্য করতো, তার গ্র[illegible] জানাতো, আমাদের সকলের সঙ্গে আলোচনাতেও [illegible] দিত। তার কতকগুলো অদ্ভুত পরিভাষা ছিল-[illegible] গুলোকে সে যখন তখন ব্যবহার করতো। এই [illegible] রাস্তাকে বল্‌তো সে ‘লাইন’, নদীকে ‘ফিতে’, মুর[illegible] ‘ছুঁচালো ঠোঁট’, চাঁদকে ‘পাথর’—এমনি আরো [illegible] কথা ছিল তার। এ সবের যে কী মানে হয়, তা[illegible]

[illegible]তো। আমরা এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করলে সে [illegible]টে আমাদেরই সমালোচনা করতো গম্ভীর মুখে: [illegible]নক অপয়া কথা আছে; সে সব বলা উচিত নয়। [illegible]তে যখন জন খাটতুম ওসব উচ্চারণ করতে কোন ক্ষতি [illegible] না। কিন্তু এখন, জানো তো, আগুন নিয়ে খেলছি [illegible]রা। ও সব আর বলা ঠিক নয়।’

[illegible] আমরা তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে বল্‌তুম, ‘বিপ্লবীরা [illegible] অপয়া মানে না।’

[illegible] সে তৎক্ষণাৎ আমাদের কথা স্বীকার করতো, কিন্তু [illegible] নিজেকে সমর্থন করবার জন্যে রসিকতা ক’রে বলতো: [illegible]মি চাষার ছেলে, নতুন ফ্যাশান্ আমি অত শত বুঝি [illegible]’ তার পর চুপ ক’রে যেত সে।

‘শোনো, শোনো’, একদিন তাকে ডেকে বল্‌লুম, [illegible]ন থেকে আমায় তুমি ‘কমরেড্’ বলবে।’

[illegible] মাথা নেড়ে সে হাসলে। কথাটা তার পছন্দ হ’ল না, [illegible] বিড় বিড় ক’রে বল্‌লে: ‘আমরা শান্‌টুঙ্ অঞ্চলের [illegible]ক, সবাইকে ‘মেজো ভাই’ বলে ডাকি; এর চেয়ে [illegible]ের ভালো নাম, অনেক মানী খেতাব।’

‘কিন্তু আমরা বিপ্লবী সেনাদল, জানো না সে কথা ?’

‘য়্যাই আবার একটা নতুন ফ্যাশান্!’ মুখ ভার ক’রে বল্‌লে; ‘আমি বুঝতে পারি না—’

‘কম্‌রেড মানে “এক সঙ্গে কায করা”—এই মহান্ [illegible]র্শের জন্য জীবন-মরণের সঙ্গী হওয়া’, আমি তাকে [illegible]য়ে বল্‌লুম। ‘ভেবে দেখো তো ভালো ক’রে. কি [illegible]বে এক সঙ্গে দিন কাটাই আমরা, এক সঙ্গে মরণের [illegible]মুখী দাঁড়াই, একই সঙ্গে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি. [illegible] করি এক সঙ্গে জাপানীদের বিরুদ্ধে! “কম্‌রেড্” নই [illegible]মরা ?’

‘ঠিক বলেছো, মেজো ভাই’, আনন্দে সে চেঁচিয়ে [illegible]লো, ‘সত্যি, যত দিন আমরা “কম্‌রেড” হ’য়ে কায [illegible]বো ততদিন আমাদের কোন ভয় নেই।’

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা কুচকাওয়াজ ক’রে যুদ্ধে [illegible]ছি। ‘আধ গাড়ি খড় ফাঁক’ ছিল আমার পাশে। [illegible] সে চোরের মতন আল্‌গোছে আমার কাঁধ ছুঁয়ে

অস্ফুট স্বরে বল্‌লে, ‘কম্‌রেড্!’ বলে, ছোট ছেলের মতন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

‘কম্‌রেড্!’ আমার কাঁধে হাত দিয়ে সে বল্‌লে, ‘জাপানী ডাকাতদের সঙ্গে আজ আমরা সামনা সামনি লড়বো ?’

ঘাড় নেড়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম: ‘ভয় হচ্ছে নাকি ?’

‘আ-মি ভয় পাই নি’, সে বল্‌লে। ‘ডাকাতের সঙ্গে অনেক বার লড়েছি আমি।’

আমরা দু’জনে একেবারে গায়ে গায়ে মার্চ ক’রে চলেছিলুম। একটু পরেই তার হৃদ্‌পিণ্ডের এমন দ্রুত স্পন্দন শুনতে পেলুম যে অনেক চেষ্টা করেও হাসি আটকাতে পারলুম না।

‘এইবার তোমায় ধরেছি!’ হাসতে হাসতে তাকে বল্‌লুম, ‘এখুনি মিথ্যে কথা বল্‌লে যে? তোমার বুক ধড়ফড়ানি আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি।’

থতমত খেয়ে গেল সে, তার পর পাইপটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বাধো বাধো গলায় ব’লে উঠলো: ‘ক-ক-ক-ক-কক্ষণো ভ-ভ-ভয় পাইনি আমি, কক্ষণো না! শয়তানদের যদি ভয় করি তা হ’লে আমি মা-মা-মা-মানুষ নই। ডাকাতদের সঙ্গে যখন লড়াই করতুম, গোড়ার দিকে বুকের ভেতরটা আমার কী ধড়ফড় ক’রতো, তার পর মিনিট কতক পরে আবার ঠিক ঠাণ্ডা হ’য়ে যেত। মেজো ভাই, আমার মতন গেঁয়ো লোকেরা ভয় করে শুধু সরকারী আমলাদের!’

জাপানীদের অধিকৃত গ্রামটা থেকে প্রায় মাইল খানেক কাছাকাছি একটা গোরস্থানে এসে থাম্‌লুম আমরা। কমাণ্ডার বললেন, দু’জন চট্‌পটে কম্‌রেড্ এগিয়ে যাবে জাপানীদের জায়গাটা গা ঢাকা দিয়ে দেখে আসবার জন্য। তারপর একটা ছোট দল ঘুরে গিয়ে গ্রামের পেছনকার ঝোপের মধ্যে ঢুকে থাকবে। আর বাকি আমাদেরও তাদের কাছে যাওয়া স্থির হ’ল।

হঠাৎ ‘আধ গাড়ি খড় ফাঁক’ কমাণ্ডারের সামনে এসেই প্রস্তাব করলে: ‘আমি এই “লাইন”টা খুব ভালো চিনি। আমাকে দয়া ক’রে আগে গাঁয়ে ঢুকতে দিন।’

আমরা অবাক্ হ’য়ে গেলুম তার কথা শুনে। কমাণ্ডার যেন তা’র কথা চট্ ক’রে বিশ্বাস করতে পারলেন না, এক

মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে আশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'মানে, তুমি আমাদের হ'য়ে গুপ্তচরের কাজ করতে চাও? সত্যি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাকাতদের সঙ্গে লড়বার সময় আগে অনেক বার এ রকম করেছি, এ সব আমার অভ্যেস আছে।'

জন কতক কমাণ্ডারের পেছনে ফিস্ ফিস্ ক'রে তাঁকে বললে, এ কাজের উপযুক্ত নয় সে, এ ভার তাকে দিলে সব পণ্ড ক'রে ছাড়বে। কিন্তু আমাদের নেতা কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে 'আধ গাড়ি'কে বললেন : 'বেশ, যাও। কিন্তু খুব সাবধানে যাবে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : 'তুমি ওর সঙ্গে থাকো আর খুব খেয়াল রেখো।'

হাত ধরাধরি ক'রে আমরা লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলুম গোরস্থানটা থেকে। পেছন থেকে অসন্তোষের একটা গুঞ্জন আর তার পর কমাণ্ডারের গলা আমাদের কানে এল : 'কিছু ভেবো না। দেখতে বোকা হ'লেও লোকটা আসলে চালাক।'

গ্রামটার কাছাকাছি এসে আমরা মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লুম আর অন্ধকারে তাকিয়ে কান খাড়া শত্রুর সাড়াশব্দ পাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। চারদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ এমনি যাবার পর 'আধ গাড়ি' আমার কানে কানে 'জাপানী ব্যাটারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এক মিনিট করো, আমি এখুনি আসছি।

জুতো জোড়া খুলে কোমরে বেঁধে সে গুঁড়ি এগিয়ে চললো গ্রামের দিকে। সে চলে যাবার ভারি উৎকণ্ঠা জাগলো আমার মনে। আমি ক এগিয়ে গিয়ে একটা উইলো গাছের আড়ালে দাঁড়ালুম আর বন্দুকের ঘোড়াটা টেনে ধরে একদৃষ্টে রইলুম গ্রামটার দিকে।

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। 'আধ গাড়ির' দেখা নেই! অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রে আমি হেঁটে এগিয়ে যেতে সুরু করলুম। কুয়োর কাছটায় এসে দেখি একটা কালো ছায়া মাটির দিয়ে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল আর আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছুটন্ত ঘোড়ার তাল ঠুকতে আরম্ভ করলে ;

মনোহরপুর

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রিয় বিশু,

সুদূর মীরাটে বসে বাংলা দেশের একটি পাড়াগাঁর কাহিনী শুনতে চেয়েছ। উপলব্ধিটা মনের জিনিষ, কিন্তু তার প্রকাশ ক্ষমতাসাপেক্ষ। সে হিসাবে বাংলার শোভা বর্ণনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। ঐ প্রবাসে ব'সে আর এক প্রবাসীর চিঠি হয়তো

...সিংসু মনের কাছে মূল্য পাবে। আমার ডায়েরীর ...কটা তাই তুলে দিলাম।

...১লা মার্চ, ১৯৪৭, শনিবার। আজ যাব মনোহরপুর, ...নে আমার বোন মঞ্জরীর শ্বশুর-বাড়ী। বহুদিন বাংলা ... যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। বিয়ের পর এইবার তাকে ...ম দেখবো।

...নদীয়া জেলায় এই গ্রামটি। শিয়ালদহ থেকে ৬৬ ...ল দূরে মাজদিয়া (ঢাকা মেল দুর্ঘটনার জন্য যে জায়গা ...ও বিখ্যাত হয়ে আছে) স্টেশনে নেমে কোটচাঁদপুরের ...পাওয়া যায়। সেই বাসে মাইল পাঁচেক দূরে দৌলত- ... নামতে হয়। দৌলতগঞ্জ থেকে মনোহরপুর আরও ...মাইল।

...বাসে অত্যধিক ভিড় হয় ব'লে মঞ্জরী লিখেছিল ...দিয়ার পরের স্টেশন বাণপুরে নামতে, সেখানে গরুর ...ী থাকবে ও স্টেশনে লোক যাবে।

...বেলা এগারোটার সময় ঢাকুরিয়া থেকে বেরুলুম, ...দি, ভাইঝি পরিমল ও ভাইপো দুর্গাকে নিয়ে। ...লদ'য় গাড়ী বদলে বেশ একটি ছোট্ট কামরা বেছে ...ম আমরা। একটু বাইরে গেছি, ফিরে এসে দেখি ...টি ছেলেমেয়ে ব'সে আমাদের কামরায়। সোনারপুর ...ক একই ট্রেনে এসেছে তারা। তারা দুই বোন ...রতী মিত্র ও শেলী মিত্র) ও দুই ভাই (সমীর ও ...ল) বেশ সপ্রতিভ। এত অল্প বয়সে তাদের মা-বাবা ...দূরে ছেড়ে দিয়েছেন তাদের, সঙ্গে আর কোন লোক ...দিয়ে, এতেই অনুমান করতে পারবে তারা কেমন ...ক-চতুর। আর সুন্দর তাদের আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার, ...ই মনকে স্পর্শ করে।

...গাড়ী ছাড়বার কিছু আগে এক ভদ্রমহিলা এলেন; ...রা যাচ্ছে শিমুরালি—তাদের বড়দির কাছে। ইনি ...ই বান্ধবী। ইনিও শিমুরালি যাবেন। এঁরও কথাবার্ত্তা, ...র বেশ ভাল লাগলো। ভদ্রমহিলার নাম শ্রীসন্ধ্যা- ...বসু, তোমারই মত হবু গ্রাজুয়েট (বিজ্ঞানের নয় ...ও)।

...গাড়ী ছাড়লো। দমদম্, ব্যারাকপুর, নৈহাটী, কাঁচড়া- ..., মদনপুর। তার পরই শিমুরালি।

...শেলীরা নেমে গেল; বেশ কেটেছিল সময়টা ওদের সঙ্গে—হাসি, গল্পে, তামাসায়। সেদিনকার সেই ট্রেনের আলাপ আজও বজায় রেখেছে তারা—শুধু বজায় রাখা নয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়ে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে সে আলাপ।

বেলা পৌণে পাঁচটার সময় বাণপুরে পৌছলুম। আমার বোনের দেওর বিমল বাবু ও তাঁদের পাইক "খোকাই সর্দ্দার" নিতে এসেছিল আমাদের। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলুম "রথ" (গরুর গাড়ী) সাজানো আমাদের জন্যে। "ঘোড়ার গরুর গাড়ী"ও (কথাটা শোনালো "সোনার পাথর বাটি"র মত)—মানে, গরুর গাড়ীরই মত তার অঙ্গাবয়ব, টানে ঘোড়ায়—দেখলুম সেখানে।

এখান থেকে মনোহরপুর পাঁচ মাইল। স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে আমি গরুর গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম ও সারা পথ হেঁটেই গেলুম। প্রথমে "মতিয়ারি" গ্রাম পড়ে, সেখানকার এম্. ই. স্কুল দেখলুম রাস্তায় যেতে। এর পরে "ধূপখালি" গ্রাম। মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলার পথ, আমরা (আমি ও সর্দ্দার) এগিয়ে চলতে লাগলুম, আমাদের পেছনে বৌদিদের গাড়ী। গরুর খুরের ধূলো আর চাকার "রাগিনী" গাড়ীর একটানা গতি সম্বন্ধে অশ্বাস দিচ্ছে।

পথে যেতে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের রাজার খুব বিশাল এক দীঘি পড়ে। দীঘির এক কিনারায় একটি নৌকা বাঁধা। দীঘি এখন মজে এসেছে। দীঘিটি দেখলেই মনে হয়, বিরাট একটি ইতিহাস জড়িত আছে এর অতীতকে নিয়ে।

আরও মেঠো পথ পার হ'য়ে "ভৈরব"। হাঁটু প্রমাণ জল, তারই ওপর দিয়ে গাড়ী গেল। আমরা একটু ঘুরে চরের ওপর দিয়ে নদী পার হলুম। এই ভৈরবের দুই কূলে ধূপখালি ও মনোহরপুরের সীমানা। এখান থেকে মনোহরপুর গ্রাম (বসতি) এক মাইল। অস্তমান সূর্য্যের আভা ভৈরবের জলকে রাঙিয়ে তুলেছে, রাঙিয়ে তুলেছে আকাশের মেঘকে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের লাল রশ্মি পড়ছে এসে উঁচু গাছের শাখাগুলিতে, দোদুল্য-মান গাছের পাতাগুলি বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছে দিনান্তের সূর্য্যকে। বারে বারে পিছন ফিরে সে দৃশ্য

দেখি।—হেলে-পড়া ধূপখালির আকাশে সূর্য্য কখন অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

ভৈরব পার হ'য়ে আবার সেই একটানা মাঠের পথ।—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।"

এগুলি আমন ধানের ক্ষেত, হেমন্তের শেষে ধান কেটে নেওয়া হয়েছে, মাঠ শূন্য পড়ে আছে। পথের আর এক পাশে ছোলা, মসুর, বুট, সরষে, "ভ্যান্নার" (রেড়ী) ইত্যাদির ক্ষেত।

আমাদের চালকটি মুসলমান, বিমল বাবুদেরই প্রজা, বেশ সরল ছেলেটি। হঠাৎ সে বলে উঠলো, "হুই যে বাবুদের পুষ্করিণী। পুষ্করিণী জার্ম্মানে ভরে গিয়েছে।" ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলুম। 'জার্ম্মান'! এত দূরে! এই গ্রামে, তাও 'পুষ্করিণী'তে!! পরে বুঝলুম, জার্ম্মান বলে কচুরিপানাকে।

এইখান থেকে বন সুরু হয়েছে।—"হুই যে বাবুদের বাড়ী।" কোথায় বাড়ী কিছুই চোখে পড়ে না। আসলে, ঘন বনের ফাঁকে বাড়ী দেখা গেলেও পথ গেছে অনেক ঘুরে, আমাদের অনভ্যস্ত চোখে বাড়ীটি দেখা যায় নি। গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছলুম কবির কথায় সময়টি তখন—

"অস্ত রবির শেষ আলোটুকু এখনও হয় নি শেষ,
ধীরে, অতি ধীরে ছড়ায় সন্ধ্যা আঁধারের কালো কেশ।"

"স্মৃতি স্মরণ করিতে বসিয়া অতীত এই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান হইয়া উঠিয়াছে।" দিদি (মঞ্জরীর বড় জা), তাঁর মেজ জা ও মঞ্জরীর অভ্যর্থনা, আদর-যত্নের প্রতিটি কথা মনের কোণে উঁকি মারছে। আর মনে হচ্ছে ছেলেমেয়ে দু'টি—অমল ও বাণীর কথা, প্রথম দেখাতেই কেমন আপন ক'রে নিয়েছিল তারা।

আমরা পৌঁছবার অল্প পরেই "আগুন, আগুন" রব উঠলো। ওঁদের বাড়ীর পাশেই চারটি চালার ঘর মুসলমান চাষীদের, কোথায় একটি ঘরে আগুন লেগেছে। ক্রমে ক্রমে আগুন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়লো,—আকাশে প্রসার লাভ করলো, স্পর্শ করলো গাছের শাখাকে, স্পর্শ করলো পাশের ঘরগুলিকে। ধোঁয়ায় আর আগুনের লাল্‌চে আভায় নবমীর জ্যোৎস্না হ'য়ে উঠলো রহস্যমণ্ডিত। লোকজনের চেঁচামেচি, গৃহস্থদের ক্রন্দন-রোল, ফাটা বাঁশের শব্দ—সব মিলিয়ে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হ'ল [illegible] আগুন যদি এদিকে এগিয়ে আসে তার জন্য প্রস্তুত [illegible] লাগলুম আমরা। কূয়ো থেকে জল সংগ্রহ ক'রে [illegible] গোয়াল ঘর ইত্যাদির চালায় জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে [illegible] ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রাখলুম নিজেদের।

ভগবানের কৃপায় বাতাসের বেগ ছিল না, তাই [illegible] ক্ষতি হয় নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লোকজনের [illegible] চেষ্টায় আগুন নিভে গেল।

সদ্য মিলনের সব আনন্দকে ম্লান ক'রে দিল যে [illegible] অগ্নিকাণ্ড!

* * *

২রা মার্চ, রবিবার। সকালে ভূষণের সঙ্গে [illegible] পরিমল ও আমি পাড়াটিতে ঘুরে বেড়ালুম। "জার্ম্মা[illegible] ভরা পুষ্করিণী দেখলুম। কাল যাঁদের ঘরে আগুন [illegible] ছিল সে ঘরগুলি দেখলুম। কত দিনের পরিশ্রম, [illegible] যত্ন ও অর্থব্যয় ক'রে তৈরী ঘর, অল্প সময়ের মধ্যে কি [illegible] পরিণতি! যত্ন ক'রে বসালেন তাঁরা। একটি [illegible] মুখে শুনলুম, বাড়ীর কোন ছোট ছেলের অসাবধান[illegible] ফলে ঐ অগ্নিকাণ্ড। আরও শুনলুম, ওঁদের মধ্যে [illegible] প্রথা এত বেশী যে ঐ বিপদেও বাইরের লোকজন তাঁ[illegible] বাড়ী যেতে পারে না যতক্ষণ না অনুমতি দেন তাঁরা।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় দৌলতগঞ্জের বাজারে [illegible] ব'লে বেরুলুম "ডাক্তার বাবু" ও খোকাই সর্দ্দারের [illegible] প্রথমটা বেশ ইটে বাঁধানো রাস্তা, পরে কাঁচা রা[illegible] ভৈরবের পুল পার হয়েই দৌলতগঞ্জ। সপ্তাহে দু'দি[illegible] রবিবার ও বুধবার—সেখানে হাট বসে। দৌল[illegible] ডাকঘরের পাশেই বাজার। খুবই জীর্ণ ও ছোট [illegible] ঘরে ডাকঘর, দেওয়ালের আড়ালে অনুরূপ একটি [illegible] ঘরে গুড়ের দোকান। অথচ এই ডাকঘরের এলাকা[illegible] আশপাশের সব গ্রাম। সপ্তাহে দু'দিন গ্রামে গিয়ে [illegible] বিলি করা হয়। সাধারণতঃ যাঁরা হাটে যান তাঁরাই [illegible] নিয়ে আসেন।

ওঁরা বাজার করতে গেলেন, আমি একটি চা[illegible] দোকানে বসে রইলুম বাসের অপেক্ষায়। উদ্দেশ্য কা[illegible] নির্ব্বিঘ্নে ফিরবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আশ্বাস পে[illegible]

[illegible] ঠিক হ'ল গরুর গাড়ীতে গিয়েই বাণপুর থেকে [illegible]রা যাবে।

[illegible]রোর পথে আমাদের সঙ্গী হ'লেন সেখ রজব [illegible]। এঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। ইনি বিমল [illegible]র প্রতিবেশী, কালকের অগ্নিকাণ্ডে এঁরও খুব [illegible]সান হ'য়েছে। একটি জিনিষ এখানে দেখে খুব [illegible] হ'ল,—সে এখানে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি। [illegible]য়ে সম্প্রদায়ে যে বিদ্বেষের আগুন আজ ছড়িয়ে [illegible]ছে চারিদিকে, তার ছোঁয়াচটুকুও এসে পৌঁছয় নি [illegible]কে। তাঁরা পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী।

[illegible]রজব আলি সাহেবের কাছ থেকে এখানকার কথা [illegible]শুনলুম। ১৮৮২-৮৩ সনে এখানে মুন্সেফের আদালত [illegible]। এদিকের গ্রামগুলি এখন জীবননগর থানার [illegible]; বহু লোকের বাস ছিল মনোহরপুরে, দুইটি [illegible]রীতে গ্রাম প্রায় শূন্য হ'য়ে গেছে।

[illegible]দৌলতগঞ্জ থেকে ফেরবার পথটি বিশেষ উপভোগ্য [illegible]ছিল। পথের একদিকে ক্ষেত সবুজে সবুজ, কোথাও [illegible]দে রংএর ফুলগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—[illegible]ন্তের সূর্য্যের রশ্মি প'ড়ে এক অপূর্ব্ব রংএর সৃষ্টি [illegible]ছ। মাঠের সীমান্তে শ্রেণীবদ্ধ গাছগুলি আকাশকে [illegible] করেছে যেন। পথের আর এক দিকে বন, কত [illegible]র গাছ প্রতিবেশীর মত আছে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ [illegible]। যে দিকটিতে চাষের ক্ষেত, রাস্তার ধারে ফাঁকে [illegible] কোথাও বা আমের গাছ, কোথাও বা খেজুরের [illegible]! ঋতুরাজের আবির্ভাবে প্রকৃতিও অপরূপ সাজে [illegible]ছে যেন। আম গাছের বউল-ভরা রূপ, শাখায় [illegible]য় নতুন পাতার শোভা, পথ চলতে বউলের গন্ধ। রাখালের গান, কোকিলের স্বর, "বউ কথা কও", "চোখ গেল" ও আরও কত নাম-না-জানা পাখীর ডাক মনকে আকুল ক'রে তোলে! প্রকৃতির সে এক সম্পদ্‌পূর্ণ রাজ্য! শিবপুরের বোটানিক্যাল্ গার্ডেন নয়, এলাহাবাদের খস্‌রু-বাগ নয়, মীরাটের কোম্পানী-বাগান নয়—এখানে প্রকৃতি স্বয়ং সম্পূর্ণ। কি সুন্দর সেখানকার প্রকৃতির দৃশ্য, মীরাটে ব'সে আমার চিঠি প'ড়ে তা তুমি বুঝবে না। আমার লেখার মধ্যে দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলবার মত শক্তিই বা কই!

বাড়ীর কাছাকাছি এসে একটি খেজুর গাছের নীচে বসলুম আমরা। কবির ভাষায় বলি—

"আধেক দেখার আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্ত ঋষির আশীর্ব্বাদে ভরা।"

সেই আমার মনোহরপুরে অতিবাহিত শেষ সন্ধ্যা। ওখানে বিশ্রাম ক'রে ও টাট্‌কা এক "গাছান" (রসের ভাঁড়) খেজুরের রস উদরস্থ ক'রে বাড়ী ফিরলুম। সময় তখন প্রায় সাড়ে সাতটা।

* * *

পর দিন সকাল সাড়ে দশটায় মনোহরপুর থেকে বিদায় নিলাম। আজ সাত শ' মাইল দূরে ব'সে খুব বেশী ক'রে মনে পড়ছে সেই তিনটি দিনের কথা। কালের প্রভাবে হয়ত' আমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে মনোহরপুরের মনোহর ছবি, কিন্তু আমার এ-চিঠির পরমায়ু যদি বজায় থাকে তোমাদের হাতে, তবে উত্তরকালে আমার এ-চিঠিই সাক্ষ্য দেবে কি চোখে দেখেছি আমি মনোহরপুরকে।*

—তোমার প্রভাতকা'

---

* কানপুর থেকে মীরাটে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্রকে লেখা।

ছিটেফোঁটা

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী

গবুচাঁদ গয়লা রঙ তার ময়লা;
কিছু আসে যায় না, শোন তার বায়না—
খেতে চায় কয়লা!

বেচুরাম ময়রা পোষে খালি পায়রা;
সন্দেশ ছোঁয় না চায় শুধু গয়না—
পায়ে দেয় কয়ড়া।

বাংলা সাহিত্যের গল্প

গোলোকনাথ শর্ম্মা ও তারিণীচরণ মিত্র

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্.এ

এর আগে তোমাদের বাংলা গদ্য সাহিত্যের গল্প বল্‌তে গিয়ে উইলিয়াম্ কেরি ও রামরাম বসুর কথা বলেছি।

ভাষাকে আমরা সাধারণতঃ বলি ভাবের বাহন। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সেই জন্যই নদীর তুলনা করা হ'য়েছে। যতটা তার অগ্রগতি স্রোত তার ততটা গতিশীল। বাংলা ভাষার অবস্থাও তাই। কেরির পর (পরেই ধরা যাক) রামরাম বসু ভাষার মধ্যে জোর বাড়িয়ে দিলেন খানিকটা। তারপর এলেন গোলোকনাথ শর্ম্মা। বেশ বোঝা যায় ভাষাটা সরলতর হ'য়ে পড়েছে আরও খানিকটা।

বয়সের দিক্ থেকে গোলোকনাথ রামরাম বসুর সম-সাময়িক ছিলেন। ইনি "হিতোপদেশ" (১৮০১) অনুবাদ করেন। সংস্কৃতে জ্ঞান ছিল এঁর যথেষ্ট। সংস্কৃত গল্পের ভাবকে সোজা বাংলায় প্রকাশ করতেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। রামরাম বসুর মত আরবী আর পারসী ভাষার প্রতি তাঁর যে খুব দরদ ছিল না তাঁর রচিত নীচের গল্পাংশটি পড়লেই তা বেশ বোঝা যাবে। বলা বাহুল্য তখনও বাংলা ভাষায় ছেদ চিহ্নের প্রচলন বিশেষ হয় নি। বুঝবার সুবিধার জন্য ব্র্যাকেটে তা দিয়ে দেওয়া হ'ল, কোন কোন জায়গায় অর্থও দেওয়া হ'ল।

"কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে (;) সেখানে সর্ব্বস্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন (—) তাহার অর্থ এই (:) শাস্ত্র সকলের লোচন (;) অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন (,) ধন (,) সম্পত্তি (,) প্রভুত্ব (,) অবিবেক— ইহার (ইহাদের) যদি এক (একটি) থাকে তবেই অনর্থ (;) সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলে[ন] আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ (;) অতএব ইহারদের কি হ[...] এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য (একই কথা)। যে[...] অবিদ্যান (অবিদ্বান্) ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি [...] [অর্থাৎ তেমন পুত্র থাকবার প্রয়োজন নেই] (—) [...] কানার চক্ষুপীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত (;) [...] না হইত (—) সে কেবল একবার দুঃখ (দিত ;) [...] মূর্খ পুত্র প্রতি পদে (অর্থাৎ প্রতিপদে দুঃখ দে[য়] [...] বিদ্যাযুক্ত ও সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের [...] সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ (যেমন) রজনীতে চন্দ্র [...] না হইলে কোটি কোটি নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ ক[...] পারে না (,) তাদৃশ (তেমন) একশত মূর্খ পুত্র জ[...] (জানিয়ো) এক সুপুত্রের তুল্য নহে।" ইত্যাদি

রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্যচরিত্রের" ভাষার [...] এই ভাষার তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে ভাব[...] ভাষার অলিগলিতে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'তে হয় [...] ডাক দিলেও ভাবটা সাড়া দেয়। এক ছেদের [...] ব্যবহার ছাড়া পড়ার দিক্ থেকে বিশেষ কষ্টকর [...] ভাষা নয়।

এর পর শোন তারিণীচরণ মিত্রের কথা।

শোনা যায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তারি[ণী] [...] ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজে হিন্দুস্থানী বিভাগের [...] শিক্ষকের পদে (হেড মুন্সী) নিযুক্ত হন। "[...] ফেবল্‌স্' বাংলায় অনুবাদ করার কৃতিত্ব এঁরই। [...] গিলখ্রাষ্ট-এর তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজে [...] খৃষ্টাব্দে যে "ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট" প্রকাশিত হয় [...] ভিতর ঈশপ্-এর কিছু গল্প স্থান পেয়েছিল। মিত্র [...] সেই থেকেই অনুবাদ করেন। অনুবাদ বেশ ঝর[...]

[...]াদে গল্পাংশটাই বড়। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকায় [...]কাক আর খেঁকশিয়ালীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলছে [...]ড়লেই বেশ বোঝা যায় কত সরল আর প্রাঞ্জল এঁর [...]াদ।

"এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল [...]টুকরা পোনীর আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের [...] বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁকশিয়ালী বিবেচনা [...]তে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া [...] করিতে পারিব। কহিলেক, (:) হে প্রিয় কাক, [...] সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট [...]ছি (;) তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার [...]র জ্যোতি, যদি নম্রতা ক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া [...]কে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহে [...]তাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের [...] বটে। আনন্দোন্মত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে [...]া তাহাকে আপন স্বরের পরিপাটি দেখাইবার জন্যে [...]লিলেক (;) তখন পোনীর নীচে পড়িল, তাহা তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত (হইয়া) প্রস্থান করিলেক, আর দাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা গরিমার খেদ করিতে রাখিয়া গেল।" ইত্যাদি।

ভাষার গুরুচণ্ডালী যা আমাদের চোখে পড়ে এখন-কার যুগে তা আমাদের বাদ দিতেই হ'বে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হ'বে যে গদ্যের ভাষাটা তখনও একটা স্থায়ী অবয়ব পায় নি। তাই বেশ একটি সুসংযত বাক্যবিন্যাসের অসুবিধে ছিল যথেষ্ট। গদ্য নিয়ে গবেষণা করারই যুগ এটা। এমনি ক'রে ক'রেই আমাদের আরও খানিকটা পথ এগিয়ে চলতে হবে। এমনি ক'রেই খানিকটা ভেঙে, খানিকটা জোড়া দিয়ে—খানিকটা যোগ-বিয়োগের মত ক'রে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পৌঁছতে হবে।

যাই হোক, এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মিত্র মশায়ের লেখা কাঁচা নয়। দুঃখের বিষয় এঁর রচিত কোন মৌলিক গ্রন্থের নজির আমরা আজও পাই নি।

নাপিতের বুদ্ধি

ঘোর প্যাঁচ

[...]এক ছিলেন রাজা। তিনি এত গল্প শুনতে ভাল-[...]তেন যে লোকে তাঁকে বলত 'গল্প-পাগল রাজা'।

কিন্তু দিন দিন কে' তাঁকে অত অজস্র গল্প [...]বে? আর অত গল্পই বা কোথা থেকে সৃষ্টি হবে? [...]র হুকুমে প্রজারা তাদের জানা সমস্ত গল্প তাঁকে শুনিয়ে [...]। শেষে তাও গেল ফুরিয়ে। আর নতুন গল্প আসে না। শেষে রাজা ঘোষণা ক'রে দিলেন, যে তাঁর গল্প শোনার সাধ মেটাতে পারবে তাকে দেবেন রাজ্যের সিকি অংশ। তবে গল্পগুলি যে বলবে তার স্বরচিত হওয়া চাই।

প্রথমটা কেউ আসতে সাহস পায় না। শেষে এল এক নাপিত। সে নাকি নিজের গল্প বলে রাজার সাধ মেটাবে।

গল্প-পাগল রাজা প্রথম দিন নাপিতের গল্প শুনে ত' মহা বিপদে পড়লেন। নাপিত গল্প বলে চমৎকার। শুনে রাজা খুসীই হন। কিন্তু তাই বলে রাজ্যের সিকি অংশ তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না! ঝোঁকের মাথায় ঘোষণা ক'রে ফেলেছেন, এখন উপায়?

মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ-সভা বসল। অনেক ভেবে ঠিক হ'ল—পর দিন নাপিতের গল্প বলা শেষ হ'লে সভার সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠবে—"মহারাজ এ তো আমরা আগে থেকেই জানি। এ আবার স্বরচিত গল্প হ'ল কি করে?"

কথাটা সেদিনই গোপনে প্রজাদের মধ্যে প্রচার ক'রে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু দেওয়ালেরও কান আছে। কথাটা নাপিতের কানে গেল। নাপিত ত' শুনে প্রথমটা খুবই হতাশ হ'ল। স্বয়ং রাজার এই কাণ্ড! সারা রাত তার ঘুম এল না। শেষ রাতে হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খুল্‌ল।

সকাল হ'তে না হতেই নাপিত ছুটল রাজদরবারে। চারধারে ভীষণ ভীড়। হবেই তো! 'গল্প-পাগল রাজাকে' গল্প শুনিয়ে সাধ মেটাবে কিনা কোথাকার এক নাপিত!

নাপিত সুরু করল—"মহারাজ, আপনার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। আপনার বাবা নাকি খুব গরীব ছিলেন, আর আমার বাবার ছিল তখন অগাধ সম্পত্তি। একবার আপনার বাবা আমার বাবার কাছ থেকে এক কোটী টাকা ধার নিলেন। সেই টাকা দিয়ে কিনলেন এই বিশাল রাজ্য। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা যখন খারাপ হয়ে উঠল তখন আপনার ঋণগ্রস্ত বাবা ঋণদায় হ'তে মুক্ত হবার জন্য আমার বাবাকে রাজ্যের এক চতুর্থাংশ দেবেন বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আপনার বাবা মারা গেলেন। তিনি মরবার সময়ে বলে গেলেন—তাঁর ছেলেই এই ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু আপনি ত' সেই ঋণের বিষয় অ আছেন বলে মনে হয় না। জানলে নিশ্চয় দিতেন। ছাড়া আমার বাবাও যখন মারা যান তখন তিনি এ বিষয়ে যখন, কেউ জানে না তখন পাবার নিশ্চয়ই নেই। দয়া ক'রে সেই ঋণ পরিশোধ ক'রে আপনার ঋণগ্রস্ত পিতাকে ঋণমুক্ত করুন।"

গল্প শেষ ক'রে নাপিত চুপ করল। অমনি ব্যবস্থা মত সভাশুদ্ধ লোক তারস্বরে ব'লে উঠল—"মহা "এ তো আমরা আগে থেকেই জানি। এ আবার স্বর গল্প হ'ল কি ক'রে?"

নাপিত মাথা নীচু করে বলল, "মহারাজ, আমি মানলুম। এ গল্প আমার স্বরচিত নয়—দেখছেন সবাই এ কথা জানে। গল্প বলার পারিশ্রমিক রাজ্যের সিকি অংশ আমি চাই না—কিন্তু আপনার ঋণ শোধ করবার জন্য ঐ সিকি অংশ আপনি আমাকে দেবেন।"

হতভম্ব রাজা আর না করতে পারলেন না।*

* প্রাচীন হিন্দুস্থানী গল্প

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফালাফল

১৩৫৩ সালের রামধনুতে প্রকাশিত যে ৫টি গল্প, ৫টি প্রবন্ধ, ৫টি কবিতা ও ৫টি ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকের লেখা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ভোটে সব চেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয়েছে তা নীচে দেওয়া হ'ল :—

গল্প :—বি-কোর্স—শ্রীসুবোধ বসু, কোনো এক হাস-পাতালের গল্প—শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার, সম্পাদক সুরেশ্বর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, প্রাণকেষ্টর মোটর শিক্ষা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, আমার দেশের মানুষ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।

প্রবন্ধ :—হাওয়াই দ্বীপের সাদা শয়তান—শ্রীক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ইতিহাস পড়া নিয়ে—শ্রীঅ ভূষণ সেন, বিচিত্র ধরণী—শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, দেশবিদে ছেলেমেয়ে—রঞ্জিত ভাই

কবিতা :—মানুষ—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, অশিক্ষি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, এক যে ছিল মজার শিশু—শ্রীশৈ কুমার মল্লিক, হেমন্তের ডাক—শ্রীফটিক বন্দ্যোপা কবিতা-কণা—শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক :— পথভোলা—শ্রীজ কুমার দাশ, বীরপুরুষ—শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, রা রাতের খোকনমণি—শ্রীসীতা সরকার, বাঙলা মা—মো এ. ছামাদ, রামধনু—শ্রীমীরা ঘোষ।

এই তালিকা অনুযায়ী নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা গঞ্জ), ২য় পুরস্কার—শ্রীগীতা চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), ৩য় ার পাবেন : ১ম পুরস্কার—শ্রীঅনিলকুমার রায় (বালী- পুরস্কার—শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু (চুঁচুড়া)।

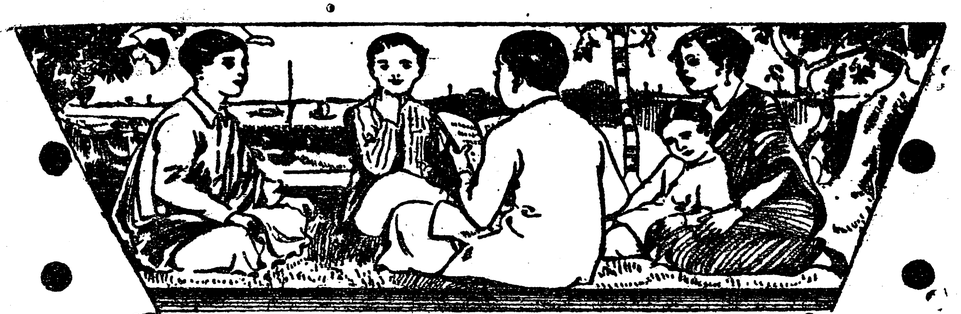

কাল বোশেখী

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

কাল বোশেখীর ঝড় উঠেছে,
কাল বোশেখীর ঝড়;
শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে নিল,
ডালপালা সব গুঁড়িয়ে দিল,
আকাশ চিরে উঠল জোরে
আওয়াজ কড়োকড়্।

শোঁ-শোঁ করে ঝড়ের কাঁপন
পাতার ভিতর দিয়ে
জমাট অন্ধকারের মাঝে
ঠেকল বুঝি গিয়ে!
নীচে ওড়ে ধুলার রাশি,
কাল বোশেখী হাসছে হাসি,
মত্ত বাতাস পাগল পারা
ছুটছে দিকে দিকে,
চমক্ হেনে তড়িৎ-শিখা
দিচ্ছে আলো এঁকে।

জড়তারে দিচ্ছে সাজা
ভীষণ রকম করে।
কাল বোশেখীর ঝড় উঠেছে,
চোখের কোলের নিদ টুটেছে,
কালোয় কালো—কেবল কালো
সারা গগন ভরে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারে ২টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা :— বিষয় : "ধুতি, ামা না প্যাণ্ট-কোট্—বাঙ্গালীর পক্ষে কোন্‌টি গ্রহণ করা উচিত?" যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা ক'রে ও বিরুদ্ধ মত (যা হ'তে পারে) খণ্ডন ক'রে লিখতে হবে।

লেখা যেন অনাবশ্যক দীর্ঘ না হয়। ১০ই শ্রাবণের মধ্যে লেখা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। শুধু গ্রাহক-গ্রাহিকারাই এতে যোগ দিতে পারবে। সঙ্গে নাম ও গ্রা নং থাকা চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে গণ্য হ

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের বিরাট পরিবর্ত্তনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আজ সকলের মুখেই ঐ এক আলোচনা—এক ভাবনা—এক চিন্তা। ইংরেজরা ভারতীয়দের হাতে এ দেশের শাসনভার ছেড়ে দিচ্ছে—এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই বিরাট পরিবর্ত্তন আরম্ভ হবে। কিন্তু এর মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা—একটি রাষ্ট্রের হাতে এই শাসনভার আসছে না। ভারতকে দু' ভাগ ক'রে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান এই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে—এবং আপাততঃ প্রথম পর্য্যায়ে এদের হাতে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হচ্ছে। দুই রাষ্ট্রের জন্য দু'টি পৃথক্ গণপরিষদ্ বসবে। এই দুই গণপরিষদ্ থেকে স্বাধীন হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র তৈরী হ'লে আবার সম্ভবতঃ অন্য ব্যবস্থা হবে। বাংলা ও পাঞ্জাব দু' ভাগ করবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়েছিল তাও মেনে নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই আইন পরিষদের সদস্যেরা এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করবেন। মনে হয় এই প্রদেশ ভাগ অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ সম্প্রদায়, খুব খুসীর সঙ্গে না হ'লেও, আপোষ হিসাবে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন।

যাঁরা পাকিস্থানের আন্দোলন করছিলেন তাঁদের অনেকেই খুসী হয়েছেন, কিন্তু সবাই নয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ায় যে পাকিস্থান তাঁদের কল্পনায় ছিল তা আর সম্ভব হবে না। যে পাকিস্থান পাওয়া যা তা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক্ দিয়ে কতটা কার্য্য হবে তা সন্দেহজনক। আর যাঁরা অখণ্ড ভার পক্ষপাতী তাঁরাও মোটেই খুসী হন নি। শক্তিশালী বিরাট ভারত এইবার রাশিয়া বা আমেরিকার মতই এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হ'তে চল্‌ল এই ধা তাঁদের ছিল; ভারত খণ্ডিত হওয়ায় তা অনেকখানি হ'ল বৈকি! এর ওপর দেশীয় রাজ্যগুলিও আলাদা হ'তে চাইবে। টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট ছোট বর্ত্তমান যুগে যে একেবারেই শক্তিহীন এই মহাযুদ্ধে আমরা বার বারই তার প্রমাণ পেয়েছি। আমেরিকার রাষ্ট্রের পাশেই তো রয়েছে প্যারাগুয়ে, ভেনেজুয়েলা উরুগুয়ে প্রভৃতি নগণ্য রাষ্ট্র। এরা স্বাধীন হ'তে কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের 'আদর্শ নয়। তবে ইংরেজ গেলে কয়েক বছর পরেই নানা অসুবিধা প্রত্যক্ষ দুই রাষ্ট্র আবার হয়তো এক হ'তে পারে—এই ক্ষীণ নিয়ে কেউ কেউ মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন। মহাত্মা হয়তো এর মধ্যে একজন। বর্ত্তমানে মন্দের ভালো এই নীতি কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। তবে হিন্দুস্থা তারা 'হিন্দুস্থান' না বলে 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' নাম দে পক্ষপাতী।

যাই হোক্, তোমাদের সামনে এল নতুন ভী

ীন ভারতের কিশোর সন্তান তোমরা। এই ভারতকে ক'রে গড়ে তুলবার দায়িত্ব কয়েক বছর পরে মাদেরই উপর পড়বে। এখন থেকেই তার জন্য উপযুক্ত র তৈরী হওয়া চাই।

তোমাদের অসংখ্য চিঠিপত্রের বোঝায় আমার টেবিল উঠেছে। কত জবাব দেব? শ্রীমতী শেফালী দত্ত লটনগঞ্জ) থেকে যে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন সেইটেই গ নেই। তিনি লিখেছেন, বড় হয়েও তিনি রামধনু আজও প্রচুর আনন্দ পান। গ্রাহক-গ্রাহিকারা বড় গেলে কেন যে শিশুপত্রিকা ছেড়ে দিতে চান তা তিনি ত পারেন না। তাঁর মা-বাবাও শিশুসাহিত্য পড়ে র রস পান। তাঁর জন্মের আগে থেকেই তাঁদের তে রামধনু যাচ্ছে, কাজেই রামধনুর প্রথম বছর থেকে সংখ্যাই পড়বার সুযোগ তাঁর হয়েছে। ২।১টি ছাড়া র্গান্ত কোন ত্রুটী তাঁর চোখে পড়ে নি। রামধনুকে াসেন বলেই তিনি এ কথা লিখেছেন। একটু য়েই বলেছেন বলব। ত্রুটী যে কিছু কিছু আছে তা রাও বুঝি। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা আদর্শ হ'লেও সে আদর্শে ান সহজ কথা নয়। বিশেষ ক'রে গত কয়েক বছরের পার্থিক অবস্থা সাহিত্যের কমলবনেও যে ঝড় তুলেছে থেকে রামধনুও রেহাই পায় নি। কিন্তু এ মেঘ দিন না একদিন কাটবেই—এবং আশা করি সেদিনের দেরী নেই। অবশেষে তিনি একটি প্রস্তাব করেছেন ধনুতে একটি সাহিত্য-পরিচয় বিভাগ খুলুন না? ক-গ্রাহিকাদের যদি কোনও বই, প্রবন্ধ বা গল্প পড়তে যায়—তবে সে সব কার লেখা, কোন্ বইএ আছে দি জ্ঞাতব্য তথ্য এই বিভাগে থাকবে। তা ছাড়া ত লেখকদের পুরোনো রচনার উদ্ধৃতিও এতে ছাপা পারে। গ্রাহক-গ্রাহিকারা ফরমাস করতে পারেন। দের বাণীও এই বিভাগে ছাপা যেতে পারে। টি ভাল। প্রস্তাবের প্রথম অংশ সম্বন্ধে কোনই নেই। তবে গ্রাহকদের জ্ঞাতব্য প্রশ্নের উত্তর গ্রাহক- আগে দেওয়া উচিত। তাঁরা না পারলে আমরা সাহায্য করতে পারি। দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে বলা যায়—খুব পুরোনো লেখার বেলায় হয়তো কোন অসুবিধা নেই কিন্তু আধুনিক লেখকদের রচনা তুলে দেওয়া তাঁদের অনুমতি-সাপেক্ষ। অনুমতি পেলে আমরা সাদরে তা ছাপাতে পারি।

শ্রীশুক্লা বসু রামধনুতে একটি 'বিতর্ক' বিভাগ খুলবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা কোন বিষয় দিয়ে দেব, গ্রাহক-গ্রাহিকারা সে সম্বন্ধে বা প্রশ্নের ধরণ অনুযায়ী তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ ক'রে আলোচনা করবেন। এ প্রস্তাবটি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। এবারকার পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় এই জিনিষটি দেওয়া হ'ল। শ্রীমৃগাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজগদীশ সেন 'মণিমঞ্জুষা' বিভাগটির জন্য এবং শ্রীকুমুদ দত্ত, সৈয়দউদ্দীন, শ্রীচম্পাবতী দেবী, শ্রীনির্ম্মল দত্তগুপ্ত, শ্রীরিটা মিত্র বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য ফরমাস করেছেন। ধীরে ধীরে এঁদের সকলকেই সন্তুষ্ট করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কুমারী রাবেয়া খাতুনের অনুরোধ—"আপনাদের শিশুসাহিত্য-সংবাদ বিভাগে শুধু প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিশু-সাহিত্যে তো হামেশাই কত ভাল বই বেরোচ্ছে—তার তালিকা যেমন সব সময়ে পাওয়া যায় না তেমনি সেগুলি আমাদের পড়ার যোগ্য কিনা সে বিষয়েও অভিভাবকদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ পাওয়া যায় না। আপনারা রামধনু মারফৎ প্রতি মাসে এই রকম একটি ভালো বইএর ছোটখাট তালিকা প্রকাশ করুন না।" এ অনুরোধও শীগ্‌গিরই রাখা হবে।

শ্রীঅমলকুমার মিত্র মৌলিক প্রবন্ধ লিখে 'যশোহর সাহিত্য সংঘ' থেকে সম্মান লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন; তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খেয়াল বা 'হবি' বিভাগে অনেকেই খুব আগ্রহ দেখিয়েছ। বিশেষ ক'রে সংগ্রহশালা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছ। ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির উত্তর ব্যক্তিগত ভাবেই দেওয়া হবে। বারান্তরে আমরা ও বিষয়ে আলোচনা করব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।—ইতি রাঃ সঃ

গত ৩রা জুন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটীশ সরকারের হ'য়ে বড়লাট লর্ড মাউণ্ট্‌ব্যাটেন এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশও এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি দুই ভাগে ভাগ করা হবে—অবশ্য যদি ঐ দুই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ্ থেকে ঐ সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। এবং এই সিদ্ধান্তই যে গৃহীত হবে তার সম্ভাবনা খুব বেশী। বৃটীশ সরকার হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের নেতাদের হাতে ভারত শাসনের ভার বুঝিয়ে দেবেন—এবং এই ব্যাপারের প্রথম ধাপ হিসাবে আপাততঃ ঐ দু'টি রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ('ডোমিনিয়ান্ স্টেটাস্') প্রতিষ্ঠিত হবে। দুই রাষ্ট্রের জন্য দু'টি পৃথক্ গণপরিষদ্ বসবে—ভাবী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তারাই ঠিক করবে। এবং তা হয়ে গেলে পরবর্ত্তী পর্য্যায় সুরু হবে।

* * *

এই তো গেল পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের কথা। সীমান্ত প্রদেশ মুসলমানপ্রধান হ'লেও সেখানে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট্ চলছে। শ্রীহট্টও আসামের একটি মুসলমানপ্রধান জেলা, এবং আসামেও রয়েছে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব। তাই ঠিক হয়েছে এ দু' জায়গায় গণভোট নিয়ে সেখানকার লোকেরা কোন্ রাষ্ট্রে যেতে চায় তাই ঠিক করা হবে। বেলুচিস্থানেও হবে তাই। সিন্ধু দেশের কোন কোন অঞ্চল হিন্দুপ্রধান, আর সিন্ধুতে রয়েছে মুসলিম লীগের কর্ত্তৃত্ব। সেখানেও, অনেকে ভেবেছিলেন, এই নিয়মই চলবে। কিন্তু তা হয় নি। ও-ছাড়া সমস্ত ব্যবস্থাটা হয়েছে শুধু বৃটীশ ভারতের জন্য, দেশীয় রাজ্যগুলি এর মধ্যে পড়বে না।

* * *

বাংলা দেশের মধ্যে হিন্দুপ্রধান জেলা হচ্ছে বর্দ্ধমান বিভাগের সবটা, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলীং ও জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রাম বিভাগের পার্ব্বত্য ত্রিপুরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। অবশ্যি এ ছাড়া কতকগুলি মুসল প্রধান জেলার অংশ বিশেষে আবার হিন্দুদের সংখ্যা তেমনি ধারা হিন্দুপ্রধান জেলায়ও কোন কোন মুসলমান বেশী আছে। কাজেই বাংলাকে বিভক্ত ক সময় অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে। এ জন্য সীমানা-নির্দ্ধারক কমিটির ব্যবস্থা হচ্ছে।

* * *

মিল্টন রেনল্ড্‌স্ নামে আমেরিকার এক ব্যব ৭৮ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে এরোপ্লেনে গোটা পৃথিবী চক্কর এসেছেন। এজন্য তাঁকে প্রায় ২০,০০০ মাইল এরো চালাতে হয়েছিল, এবং এটাই হ'ল এ ব্যাপারের রে বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল ভার্ণে যখন "৮০ দিনে ভূপ্রদ নামে বইখানি লিখেছিলেন তখন তাঁর কাছে কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। আজ তিনি বেঁচে নিশ্চয়ই লজ্জা পেতেন।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বাছাই-করা ক্রিকেট খে দল ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেছে। সম্প্রতি ই সঙ্গে তাদের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ্ হ'য়ে গেল। আফ্রিকা প্রথম ইনিংস্‌এ করে ৫৩৩ রান্। এদে অধিনায়ক মেল্‌ভিল্ একাই করেন ১৮৯ রান্। নৌর্স ১৪৯ রান্। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস্‌এ হয় মাত্র ২০৮ ফলে তাদের 'ফলো অন্' করতে হয়। ২য় ইনিংসে ইংলণ্ড চমৎকার খেলে মোট ৫৫১ রান্ করেছে। মধ্যে ডেনিস্ কম্পটনের ১৬৩ রান্ ও অধিনায়ক ইয়া ৯৯ রান্ উল্লেখযোগ্য। ২য় ইনিংস্‌এ দক্ষিণ আ ১ উইকেটে ১৬৬ রান্ করে। মেল্‌ভিল্ এই ইনি ১০৪ রান্ ক'রে বাহাদুরী দেখিয়েছেন। খেলা শে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

বৈশাখ মাসের ধাঁধা ও পুরস্কার-প্রতিযোগিতার উত্তর

অ	ব	নী	ন্দ্র	না	থ	*
চ	*	র	*	ব	*	বে
না	ধ	গৃ	ধ্র	*	লে	তা
য়	র্ম	হ	*	সো	ফা	র
ত	পা	যু	দ্ধ	ম	ফা	*
ন	ল	দ্ধ	*	পু	সাঁ	দি
*	রা	শি	য়া	র	চি	ঠি

সঠিক উত্তর দিয়েছেন একমাত্র শ্রীগায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)। ইনিই পুরস্কার পাবেন। শ্রীশিশিরকুমার (কলিকাতা) উত্তরটিও খুব কাছাকাছি হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) সিকিম (২) ১=জামাই, ২=চীজ্, ৩=গায়, ৪=কায়, ৫=চাই।

উত্তরদাতাদের নাম: অমলা বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া); অসিতরঞ্জন সেন (বালীগঞ্জ); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); মঞ্জুশ্রী, বাপ্পা, লব, কুশ, পম্পা ও রত্নাবলী দেবী (ভবানীপুর); অমলশংকর ভাদুড়ী ও মামা (কলিকাতা); গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা); নূরজাহান বেগম (ঢাকা); খোকা, বাচ্চু ও টুকুন (দিল্লী); রেবা রায় (এলাহাবাদ); মণীশ ও অর্চ্চনা বসু (পাটনা); মলিন (খঞ্জনপুর—বগুড়া)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এমন এক-একটি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যে তা সোজাসুজি পড়লেও যা হয় উল্টে পড়লেও তা হয়। যেমন—কনক। এইভাবে পড় তো:—

— বাবু বললেন, " — -এর জমি বেশ —। শোনা যায় এক সময়ে — থেকে জন — ব্যবসায়ী সেখানে এসেছিলেন — গাছ লাগাতে। কিন্তু তা কি হয়? — গাছ হ'লেও তবু কথা ছিল। আমাদের — -এর খুড়ো ছিল সেই সাহেবদের —। সে-ই এ গল্পের —।"

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণ মনোরম। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। কয়েকখানা একরঙা ছবি আছে। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। ॥৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

বইটির আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্যিকা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে। পাতায় পাতায় অ কৌতূহল। সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য দুই টাকা।

দশম বর্ষ

কৈশোরক

বা তৎ

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। দু খানা ধারাবাহিক উপন্যাস চলিতেছে। ত ছাড়া সাত সাগরের ঢেউ, মানুষের মত মানু সবুজ পাতা বিভাগগুলি কৈশোরকের বৈশিষ্ট্য

প্রাপ্তিস্থান
কৈশোরক কার্য্যালয়
৬৫।১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

জন্য,

বিত
পর

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট্
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের জন্য সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ্-গ্রন্থাবলী

পীরামিড্ সিরিজ

বজ্রা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এত দিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেকটিভ্ বই প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। তাই সারা বাংলার উপেক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে তাঁহাদের দাবী জানাইয়াছেন বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্ বই চাই।

তাঁহাদের দাবী ও অনুরোধ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ড়িটেক্‌টিভ্

মিঃ পিটার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্

মৃত্যু বরণ করিয়াও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাহাই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

পীরামিড সিরিজের প্রথম গ্রন্থ
চতুর জার্ম্মাণ
এইমাত্র বাহির হইল
মূল্য ১॥০ মাত্র

পীরামিড্ সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ
ডেঞ্জার্স সিগন্যাল
এই মাসেই বাহির হবে
দাম—১॥০

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

২০শ বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩৫৪   চতুর্থ সংখ্যা

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

INTENTIONAL
DUPLICATE EX

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাস্থ্য সংরক্ষনে ও জন-কল্যানে
লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি
তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।
তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার সম্মান আদর!

লিলি বিস্কুট কোম্পানী : কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
ওপারের দূত—(প্রবোধ সান্যাল)
রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
জয়পতাকা—শৈলবালা ঘোষজায়া
অভিশপ্ত ম্যামী—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রক্তভৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয় পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি
ভাদ্র—**সবই যখন অন্ধকার!**—অশোক মিত্র

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান-কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

আগামী পূজোয়—

মানিক-মেলা

—সেরা লিখিয়েদের সেরা লেখায় ভরা—

গল্প—নাটক—কবিতা—ভ্রমণ—প্রবন্ধ—ধাঁধা—ম্যাজিক
ইত্যাদি ইত্যাদি।
সামনের মাসে আরও খবর পাবে।
সম্পাদনা—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এম্. এল.. দে এন্ড কোং

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১৩/১ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

"কাঞ্চ
(গোয়েন্দা-কা
ি
আট রকম বইএর
বাকি বইগুলিও
হারান বই—
ওপারের দূ
। রাতের আ
স্বর্গের সিঁ ি
জয়পতাকা—
। অভিশপ্ত ম
বিভীষণের
প্রত্যে
দেব স
াগামী
মানিক

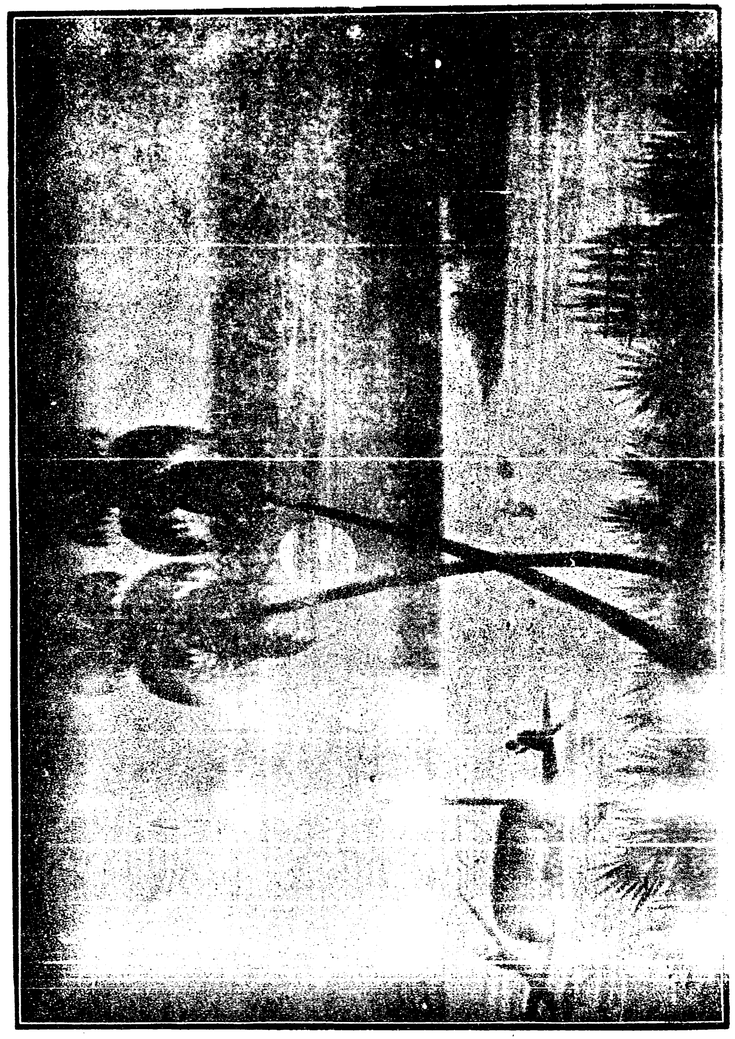

জ্যোৎস্না রাতে

রামধনু—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫৪ | ৪র্থ সংখ্যা

বৈদিক যুগের প্রার্থনা

(বাজসনেয় সংহিতা হইতে)

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

তেজ তুমি, কর তেজ আমাতে সঞ্চার,
বীর্য্য তুমি, দাও বীর্য্য অন্তরে আমার ;
বল তুমি, দেহে বল করহ প্রদান,
ওজ তুমি, কর শক্তি জীবনে বিধান ;
মন্যু তুমি, দাও ক্রোধ অন্যায় যথায়,
ধৈর্য্য তুমি, সহ্যগুণ শিখাও আমায়।

দেশের ছেলে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাবো কি আজ পেলে,—
রাত পোহালে তোমরা হবে
স্বাধীন দেশের ছেলে।
যেমন বৃটিশ, আমেরিকান,
সমান আসন—সমান যে মান,
আজকে শোনো আমার কথা
খানিক খেলা ফেলে।

মানুষ মেরে, দেশ পুড়িয়ে
অন্যে স্বাধীন হয়,
অহিংসাতে তোমাদের এই
পূর্ণ দিগ্বিজয়।
প্রাণ দেওয়া ত' তুচ্ছ কথা,
প্রাণ নেওয়াতে কম কি ব্যথা ?
মানব দিলে মাথায় বয়ে
মানবতায় জয়।

জাতকে বড় করতে নারে
মানুষ ছোট হয়ে,
বৃটিশ ছিল এত দিবস
স্বার্থ আপন লয়ে।
আজকে হ'ল মহৎ জাতি,
বৃহৎ জাতি—মহৎ ছাতি,
ইতিহাসে আপন গুণে
বড়ই গেল রয়ে।

মহামানব কটিবাসে
যিনি একাই কোটী,
জানিয়ে দিলেন আর কিছু নই
মানুষ মোরা বটি।
বুকের জোরে জাতটা টেনে
ভাবো কোথায় তুল্‌লে এনে,
ক্ষিপ্ত বৃষে শান্ত বাহন
করলে এ ধূর্জ্জটি।

মুক্তা-কণা

"আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র, ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি।"

* * *

"উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল।"

অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হি হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হউক আর মুসল হউক, সে নিকৃষ্ট।"

* * *

"সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।" —বঙ্কিম

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে—

অবশেষে ফৌজদারের চেষ্টা সফল হইল। এনায়েৎ খাঁ তাঁর সঙ্গে জুটিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় পাঁতি পাঁতি করিয়া নানা স্থান খুঁজিয়া শেষে শোনা গেল, শ্যামলাইএর দত্তজা মশাই ফকির সাহেবের পরম বন্ধু। তাঁদের বাড়ীতে ফকিরকে অনেক বার দেখা গিয়াছে। এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারকে সঙ্গে লইয়া শ্যামলাই গিয়া হাজির হইলেন। দত্তজাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভাবেই হোক ফকির সাহেবকে তিনি নবাবের কাছে পাঠাইতে পারিবেন।

ইব্রাহিম খাঁর যেন আর তর সহিতেছিল না। জাহাঙ্গীরনগরে বসিয়া থাকিতে আর তাঁর ভাল লাগিতেছিল না—তিনি খবর পাঠাইলেন, একবার দক্ষিণ বঙ্গটা সফর করিয়া বেড়াইবেন। সপ্তগ্রামেও বহুদিন যান নাই, সেখানেও আসিবেন। ঐ সময়ে সপ্তগ্রামে তিনি একটি দরবার বসাইতে চান। ফৌজদার যেন অবিলম্বে তার সকল ব্যবস্থা করেন এবং ঐ দরবারে যেন ফকির সাহেবকে শ্যামলাইএর দত্তজা মারফৎ অবশ্য অবশ্য আমন্ত্রণ করা হয়।

ফৌজদার খবর পাঠাইলেন, নবাবের আদেশ পালন করা হইয়াছে—এবং ফকির সাহেবও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দত্তজা মারফৎ সংবাদ দিয়াছেন।

দরবারের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। আশপাশের সম্ভ্রান্ত সকল লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইল। সবাই শুনিল ফকির সাহেবকে এই দরবারে পুরস্কৃত করা হইবে। ফকিরকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হইল। ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে উৎপীড়িত সপ্তগ্রাম বন্দর আবার বহুদিন পরে মুখর হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

বারদীঘিতেও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রাধামাধবের রত্নহারের পরিণামের কথা মৃগাঙ্ক রায়ও শুনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য খবরটিতে তিনি খুব খুসী হইতে পারেন নাই, কিন্তু কয়েক মাস পরে নতুন এক ব্যাপারে তিনি কিছুটা তৃপ্তিলাভ করিলেন। অন্যান্য খবরের মত রাধামাধবের রত্নহারটির কথাও গোয়ার শাসনকর্ত্তা ফার্ণাণ্ডিজ-এর কানে গিয়াছিল। বারেটোর মৃত্যুর পর তিনি ডি মেলোকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যেন অবিলম্বে ঐরূপ আর এক ছড়া হার মৃগাঙ্ক রায়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডি মেলো উপরওয়ালার আদেশ অমান্য করিতে পারেন নাই। কয়েক দিন হইল ঐরূপ এক ছড়া নূতন রত্নহার মৃগাঙ্ক রায়ের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং মৃগাঙ্ক রায় আগের বারের মতই সমারোহ করিয়া সেটি দেবতাকে নিবেদন করিবার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছেন। দি

কুড়ি পরে আগামী পূর্ণিমায় সেই উৎসব। বারদীঘির প্রজারা আবার নতুন করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তার আগে সুবেদারের এ নিমন্ত্রণও তুচ্ছ করিবার নয়। যে ফকির সাহেব তাঁর একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর মুখ হইতে,—হাঁ, মৃত্যুর মুখ হইতেই, উদ্ধার করিয়াছেন তাঁর সঙ্গে একবার পরিচিত হওয়া—তাঁকে ধন্যবাদ জানাইবার সুযোগ লাভ করা—এ সুযোগ কি মৃগাঙ্ক রায় ছাড়িয়া দিতে পারেন! দু' একদিনের মধ্যেই যাত্রার আয়োজন হইয়াছে। জয়ন্ত তো সঙ্গে যাইবেই, সুশ্বেতাও ছাড়িবে না। সেই কোন্ ছেলেবেলা সে একবার সপ্তগ্রাম দেখিয়াছিল, তা কি ছাই মনে আছে? আর তা ছাড়া এত বড় একটা দরবার—এ তো আর তোমার জন্য যখন তখন হইতেছে না! আর ফকির সাহেবের মত একজন লোককে দেখা যাইবে—সে-ই কি কম কথা! এরা ছাড়া রসরাজ এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু সঙ্গে যাইবেন।

দেখিতে দেখিতে দরবারের দিন আসিয়া পড়িল। সপ্তগ্রামকে যেন আজ আর চেনা যায় না! এমনিতেই তার পথঘাট সর্ব্বদা লোকজনে থই থই করে, এখন উৎসব উপলক্ষে নতুন নতুন লোকে রাস্তাঘাট যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাদের নানা রকম রং-চংএ পোষাকে পথের বাহার যেন আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বহু লোক নগরে আশ্রয় যোগাড় করিতে পারে নাই, তারা নদীতে নৌকায় আশ্রয় নিয়াছে। হাজার রকম ছোট বড় নৌকায়, বজরায় সরস্বতীর জল প্রায় ঢাকা পড়িবার যোগাড়!

নদীর ধারে প্রশস্ত ময়দানে বিরাট্ দরবার-মণ্ডপ। লতায় ফুলে, রঙ্গিন কাপড়ের ঝালরে সাজান সে যেন এক ছোটখাট ইন্দ্রসভা। সুবেদার ইব্রাহিম খাঁও আসিয়া পৌছিয়াছেন। ফকির সাহেবও নাকি আসিয়াছেন।

সভা লোকে লোকারণ্য। মাঝখানে সুবেদারের জন্য মখমলের সিংহাসন পাতা। তারই অনতিদূরে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। মৃগাঙ্ক রায় প্রভৃতি এখানেই বসিয়াছেন। মেয়েদের জন্যও পিছনে আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু সুশ্বেতা সেখানে বসিতে রাজি হয় নাই। পর্দার আড়াল হইতে কি আর ভাল করিয়া দেখা যায়! সেও বাপের আর জয়ন্তর ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, এবং ভাইবোনে ফিস্‌ফিস্ করি উপস্থিত অতিথিবর্গ সম্বন্ধে নানা রকম সমালোচনা—টীপ্প কাটা সুরু করিয়া দিয়াছে।

সুশ্বেতা চারিদিক্ চাহিয়া কহিল, "কই, তোদে চন্দনার জমিদায়-রত্ন কোন্‌টি?"

জয়ন্ত চারদিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া কহি "কই, তাকে দেখছি না তো! এলে তো কাছাকাছি বসা উচিত ছিল।"

"এমন একটা ব্যাপারেও আসবে না? আজ কুঁড়ে তো! নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই পেয়েছে?"

"পাওয়া তো উচিত; কিন্তু, দাঁড়া, ও তো শেষটা চাঁদপালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল না—নবাবের শত্রুপক্ষে তবে কি আর আসতে সাহস পাবে? হয়তো জমিদা ছেড়ে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

সুশ্বেতা হাসিয়া কহিল, "না, তাও নয়। তাতেও একটু নড়তে চড়তে হয়। ও বোধ হয় ধরা দিয়ে এখ নবাবের আতুর-আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তুই এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? সে তো তোরই বন্ধু এক সময় তো লুকিয়ে লুকিয়ে হামেশা তার বাড়ে যাতায়াত করতিস্!"

"বন্ধু না কচু! তখন তো ওর স্বরূপ চিনতে পারি নি লোকটা কোত্থেকে গাদা গাদা পুঁথিপত্তর যোগাড় করে ছিল। তাই শুয়ে শুয়ে পড়ত আর তা থেকে মজার মজার গল্প শোনাত, সেই লোভেই যেতাম। তখন কি জানতাম ও এত বড় অপদার্থ?"

"শুধু অপদার্থ নয়"—সুশ্বেতা ঝঙ্কার দিয়া কহিল "শত্রু—শত্রু;—আমাদের তো তিন পুরুষের শত্রু বটেই দেশেরও শত্রু।"

চুপ্, চুপ্। সহসা মুখর জনতা নির্ব্বাক হইয়া গেল। সুবেদার আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে তিনি নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁর পিছন পিছন ফৌজদার এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি সপ্তগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

দরবারের কাজ সুরু হইল। সুবেদার উঠিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক

বর্ণনা করিয়া ফকির সাহেবের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। শেষে কহিলেন, "এমন একজন লোক আজও এ দেশে আছেন,—প্রৌঢ় বয়সেও যিনি এতখানি বীরত্ব দেখাতে পারেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। কিন্তু আজও তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু আমরা তা হ'তে দিতে পারি না। দেশের লোক তাঁর পরিচয় পেয়েছে, তারা তাঁকে দেখতে চায়—তাঁকে নিজেদের মধ্যে ভাল ক'রে পেতে চায়। তাঁরই সম্মানের জন্য আজকের এই উৎসব।" সুবেদার একটু চুপ করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, পাশে উপবিষ্ট একটি লোক রঙ্গিন রেশমি কাপড়ের তৈরী একটি মাঝারের তোড়া তুলিয়া তাঁর হাতে দিল। সুবেদার কহিলেন, "শুনেছি তিনি সন্ন্যাসী, ধনরত্নের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তবু তাঁরই দেশবাসীর দেওয়া এই স্নেহের উপহার তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না। দেশের প্রতিনিধি রূপে আমি তাঁকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।"

সমস্ত সভা স্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলেও বোধ হয় তার আওয়াজ শোনা যায়। সকলেই ব্যাকুল চোখে কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা ভীড়ের মাঝখান হইতে একটি দীর্ঘ, সৌম্য-দর্শন মূর্ত্তি সলজ্জভাবে সুবেদারের দিকে আগাইয়া আসিল। মাথায় পাগড়ী, পরনে ঢিলা আলখাল্লা—দীর্ঘ কাঁচা-পাকা দাড়ি বুকের উপর দুলিতেছে। সুবেদার উঠিয়া আসিয়া তার হাতে তোড়াটি জোর করিয়া গুঁজিয়া দিলেন, তার পর অকৃত্রিম আবেগে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলে সমস্ত সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল।

জয়ন্ত এতক্ষণ কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল; ফকির সাহেব নবাবের আলিঙ্গনমুক্ত হইতেই সে ছুটিয়া গিয়া তাঁর হাত ধরিল। ফকির হাসি তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

এর পর সুরু হইল পরিচয়ের পালা। ফকির সাহেবকে যাঁরা আগে চিনিত তারা তো যোগ দিলই, আরও অনেকে আসিল। রসরাজও তাদের মধ্যে একজন। ফকির স্মিতহাস্যে সকলের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

কিন্তু তার পরেই ঘটিল আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সভা তখনও ভাঙ্গে নাই, কথা বলিতে বলিতে রসরাজ হঠাৎ পাগলের মত এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। ফকিরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁর মনে কি সন্দেহ জাগিল তিনিই জানেন, হঠাৎ অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তিনি ফকিরের দীর্ঘ দাড়ি ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিলেন। ফকির হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিবার আগেই রসরাজের হাতে তাঁর দীর্ঘ কাঁচা-পাকা নকল দাড়িটি সশব্দে উঠিয়া আসিল, এবং তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিল এক সৌম্যদর্শন তরুণ যুবকের মুখ। আকস্মিক বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিবার আগেই আশপাশে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—"আরে, এ যে নন্দ চৌধুরী! চন্দনার জমিদার নন্দ চৌধুরী!" তবে কি বৈরাগীও এ-ই?

এর পরের ঘটনা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় নন্দ যতটা লজ্জা পাইল, মৃগাঙ্ক রায় এবং তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা খুসী হইলেন তার চেয়ে অনেক বেশী। ইব্রাহিম খাঁও প্রচুর কৌতুক বোধ করিয়া নন্দের পিঠ আর এক দফা চাপড়াইয়া দিলেন। সভার শেষে মৃগাঙ্ক রায় নন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা তোমাকে আমরা চিনতে পারি নি। পূর্ব্বেকার বিরোধের কথা মনে ক'রে শুধু সন্দেহই ক'রে এসেছি। অবশ্যি তুমি নিজেও চিনতে দেও নি, বরঞ্চ, কেন জানি না, বরাবর ভুল ধারণা জন্মাতেই সাহায্য করেছ! যাই হোক্ আজ আমার মনে যে কী আনন্দ হচ্ছে! সত্যি সত্যি শেষটা চন্দনা বারদীঘিকে এ ভাবে হারিয়ে দেবে আমরা ভাবতে পারি নি। কিন্তু যাক্, পরাজিত হ'লেও, দেখো আমারই জিৎ হবে। তুমি যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলে, না বুঝে আমরা তখন তা'তে আমল দেই নি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না। এখন সুশ্বেতাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে পারলে আমার পক্ষে তার চেয়ে সুখের আর কিছুই হ'তে পারবে না। সুশ্বেতাও তেমনি সুখী হবে। সুশি! কোথায় গেল সুশ্বেতা! এই তো এখানে ছিল!"

জবাব দিলেন রসরাজ। কহিলেন, "লজ্জায়

পালিয়েছে। এত দিন চন্দনার সম্বন্ধে যা তা বল্‌ত, এখন কি আর সামনে আসতে পারে!—"

নন্দ কোন জবাব দিল না। হেঁট হইয়া মৃগাঙ্ক রায়ের পায়ের ধূলা লইয়া সম্ভবতঃ ভাবী সম্পর্কটা মানিয়া লইল।

রসরাজ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "খুশির বিয়েতে কিন্তু, রায় মশাই, তোমার ও বোষ্টুমি কাণ্ড আর চলবে না! নেমন্তন্নের মাছের ভার আমি নেব। টাটকা ইলিশ—গঙ্গায় না পাই, খোদ পদ্মা থেকে আনিয়ে নেব। হুঁ। স্বয়ং সুবেদার সাহেব এখন আমাদের বন্ধু!"

অদূরে একটু সামান্য সোরগোল শোনা গেল। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ বগলে ছাতা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছেন। চিনিতে বিলম্ব হইল না—আর কেউ নয়, স্বয়ং ব্যাকরণবাগীশ মহাশয়।

কিন্তু এ কি কাণ্ড! ব্যাকরণবাগীশ আজ তাঁর চিরাভ্যস্ত প্রাথমিক কুশল প্রশ্ন বা কুশল জ্ঞাপন ব্যাপারটি বেমালুম ভুলিয়া গেলেন,—হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন, "ঘটক-বিদায়টা কিন্তু আমার পাওনা রায় মশাই! সেটি ভুললে চলবে না।"

— শেষ —

সহযাত্রী

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

ঘ্যাস ঘ্যাস, ঘ্যাকস্ ঘ্যাস্,—আবার গাড়ীটার সেই রোগ সুরু হ'ল। দিনের মধ্যে বার চারেক বিগড়োয়। আজ দুপুর পর্য্যন্ত কোনো ট্যাঁ ফোঁ করে নি, এই সুরু হ'ল একগুঁয়েমীর পালা। কাঁদ কাঁদ মুখ ক'রে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। যদি একটু ঠেলাঠেলি ক'রে ওকে রাজী করাতে পারি।

রাজী হয়, রোজই শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়। তবে রীতিমত ঠেলাঠেলি করতে হয়, তবে। আর হবেই বা না কেন, এক কালে ছিল কুলীন জাত—ফোর্ড, এখন না হয় দশ হাত ঘুরে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে! ঝরঝরে হ'লে কি হয়, জাত ভাল। তবে প্রথম প্রথম একটু অনুরোধ; ঠেলাঠেলি করতে হয় বটে!

কিন্তু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে একটা লোককেও দেখতে পেলাম না। ব্যস্ত হয়ে এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'গাড়ী ঠেলতে হবে নাকি বাবু?' ভাঙ্গা ঘসঘসে গলা। চেয়ে দেখি ছেঁড়া জামা, চোখ লাল, বাবরি চুলওয়ালা একটা লোক। রাত্তির বেলা দেখলে ভয় পেয়ে যেতাম। ওর সমস্ত চেহারাটা এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় কোনো বস্তির গুণ্ডা, এ পাড়ায় হয়ত এসেছিল কাজকর্ম্মের চেষ্টায়।

আমার 'হ্যাঁ না' বলবার আগেই লোকটা বলল, 'আপনি সিটে গিয়ে বসুন বাবু, আমি ঠেলছি পেছন থেকে।' বলেই চটপট পায়জামাটা গুটিয়ে ফেলল।

বললাম, 'একা একা কি পারবে ঠেলতে?'

'কি যে বলেন বাবু!' ঠেলতে ঠেলতে পিছন থেকে লোকটা জবাব দিল।

হেলতে হেলতে গাড়ী চলল, একবার—দু' বা… আপত্তি করল নানা রকম যান্ত্রিক ভাষায়, শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শান্ত সুবোধের মত একবাক্যে ষ্টার্ট নিল। লোকটাকে কিছু বখশীস দেব ভেবে মুখ বাড়াতেই … কাছে এসে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'কত দূর যাবেন বা… আপনি?'

বললাম, 'শ্যামবাজার।'

লোকটা সবিনয়ে ঘাড় কাৎ করল, 'আমায় যদি … বাবু একটু মেছোবাজারের মোড়ে নামিয়ে দেন ত' বড্ডো উবগার হয়।' হেঁ হেঁ করতে করতে লোকটা তা… হলুদ রঙের এক পাটি দাঁত বের করল।

অকারণে আমি চট করে না বলতে পারি না। তা… বলে চোর-ছ্যাঁচোড়কে নিয়ে হাওয়া খাওয়ানো! প্রথমে ভাবলাম 'না' বলি, তারপরে ভাবলাম নিলেই বা কি… ক্ষতি হবে, আমার পিছনের সিটটা যে কেটে নিয়ে বিক্রি করবে সে উপায়ও নেই। ঝুরঝুরে মড়ার খাটের ম… …টার অবস্থা হয়েছে। শেষ অবধি বললাম, 'আচ্ছা, …।'

…লোকটা ভিতরে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

এ গাড়ী চালানোও এক কেরামতি। ব্রেক কষলে …মানেই দাঁড়িয়ে পড়বার পাত্র এ নয়, হর্ণ টিপলেই …ক পাড়বে এমন কোনো কথা নেই। রীতিমত কসরৎ …র যন্ত্রণা দিলে তবে হয়ত একটু হাঁক-ডাক দেবে। …বার মাঝে মাঝে ব্রেক কষলে হয়ত মাঝ রাস্তায় একে… …র দাঁড়িয়ে গেল। সেই গোঁ ভাঙ্গাতে হয়ত রাস্তায় …গাদা লোক জড় করতে হবে।

তা হোক, মোটর ত'। ঠেলাগাড়ী নয়। ক' জনই … গাড়ী হাঁকায় এ পাড়ায়? এত বড় রাস্তাটাতে …ড়ীওয়ালা লোক ত' তিন জন। নরেন রায়, আই. সি. …, এঞ্জিনিয়ার উপেন বাবু, আর এই শর্ম্মা। গাড়ী …ঘোড়া নয় যে সবাই হাঁকাবে।

…বন্ধুদের হিংসে হয়, আর হবেই বা না কেন? …ক না ভাঙ্গা গাড়ী, কিন্তু যখন ঐ গাড়ী হাঁকিয়ে …কলে পাঞ্জাবী উড়িয়ে হাওয়া খেতে বের হই, তখন …াই বা কে, আমিই বা কে! ওদের তখন হিংসায় জ্বলতে থাকে। দেখা হলেই বলে, 'এ গাড়ী …কাতায় না হাঁকিয়ে পম্পেইতে চালা গে।' কেউ …উ বলে, 'তোর গাড়ীর হর্ণ বাদে আর সবই বাজে।' …তে পারি হিংসায় ওদের বুক ফেটে যাচ্ছে।

…পাড়ার লোকের কথা ছেড়ে দাও গাড়ী কিনেছি বলে …ার লোকেও যে একটু খাতির করবে, তাই বা কই? …কা একদিন চড়ে চটেমটে জবাব দিয়ে দিয়েছে। …বাও তাই, বলে, 'শিক্ষা হয়ে গেছে একদিন চড়েই।' … ইস্কুল যাচ্ছিল সেদিন; বললাম, 'চড়বি নাকি …ড়ীতে? তোকে ইস্কুলে দিয়ে আসি।'

…ও এমন মুখ করে তাকাল যে রাগে আমার গা জ্বলে …ল। বলল, 'ওর চাইতে দীপালী গীতালীদের সঙ্গে …টে গেলে আগে ইস্কুলে পৌঁছাব। তোমার গাড়ী …লেই ত' মাঝ রাস্তায় ঠেলতে হবে।'

রেগে-মেগে বললাম, 'তোকে যদি আমি আজ মাঝ …ায় গাড়ী চাপা না দিই ত' তোর দাদাই নই আমি।'

'ও বলল, 'দাও ত' দেখি কেমন পার? তোমার গাড়ী ষ্টার্ট নেবার আগে আমি ইস্কুলে পৌঁছাব।'

সেদিন সত্যি পাক্কা দু'টি ঘণ্টা নিয়েছিল ষ্টার্ট নিতে। মাঝে মাঝে ঐ প্রথম দিকটায় একটু কেমন যেন হয়ে যায়, কিন্তু চলতে থাকলেই সব ঠিক।

যাক আজ ত' গাড়ী ঠিকমত চলেছে। বেশ ভাল ভাবেই চলেছে। ট্রাম ষ্ট্রাইক, বাদুড় ঝোলা হয়ে সব আফিস যাচ্ছে ট্রাকে করে। ভোঁপ ভোঁপ আওয়াজ করে ওদের ডান দিকে ফেলে গাড়ী ছুটালাম।

শ্যামবাজার যেতে হবে। সেখান থেকে কাজ সেরে মাণিকতলা, সেখান থেকে ডালহৌসি। উঃ, এ সব কি বাসে ঝুলে পারা যায়! গাড়ীটাকে আরও ভাল-বাসতে ইচ্ছে করল। ভালবাসতে গিয়ে স্পীডের মাত্রা বাড়ালাম।

'বেশ গাড়ী আপনার আছে বাবু, আরও লাগান না 'ইস্পিড', এ ত' ফাঁকা রাস্তা!' পিছন থেকে সহযাত্রী উৎসাহ দিল।

গাড়ীর প্রশংসা, আহা, এ যেন আমারই প্রশংসা! আচ্ছা, লাগালাম 'ইস্পিড'; ফাঁকা রাস্তায় কার তোয়াক্কা করি?

কালো পিচ ঢালাই ল্যান্সডাউন রোড, পার্ককে ডাইনে ফেলে গাড়ী ছুটল। লেক ইস্কুল, কে, সি, মাইতি, হাজরা রোড, পদ্মপুকুর পার হয়ে এলাম। এক এক সেকেণ্ডে এক একটাকে পিছনে ফেলে ছুটছি। গাড়ী নয়ত যেন সিপাই বা ঘোড়া!

'বেশ ইস্পিড আছে!' পিছনের সিট থেকে উল্লাস-ধ্বনি আসে। গাড়ীও তীরবেগে ছুটে চলে। স্পীড—স্পীড, আরও স্পীড। এ না হ'লে হাওয়া-গাড়ী?

কিন্তু ঐ রোগেই ঘোড়া মরল শেষ পর্য্যন্ত। দুপুরের দিকে ফাঁকা রাস্তায় কোথায় কেউ থাকে না, আচমকা একটা সার্জ্জেণ্ট যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে এল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কোন রকমে একটা নরহত্যা থেকে নিজেকে বাঁচালাম।

গাড়ী থামতেই কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বেরিয়ে আসতে

TIGHT BINDING

হ'ল। এ ছাড়া আর উপায় নেই। কে জান কপালে এই লেখা ছিল, তা হ'লে কেউ স্পীড বাড়াত?

সার্জ্জেণ্টটা মুখ লাল করে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে নাক ফোলাচ্ছিল। তাকে তোয়াজ করে বললাম, একটা রোগী দেখতে যাচ্ছি তাই জোরে চালাতে হয়েছে। তারপর আরও একটু মিথ্যাটা বিশদ ক'রে বললাম, 'রোগটা এপেণ্ডিসাইটিস্, আরও জোরে না চালালে তাকে বাঁচাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।'

কিন্তু গোঁয়ার গোবিন্দ সার্জ্জেণ্টের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সোজা পকেট থেকে একটা কালো রংএর নোটবুক্ বের করে পেন্সিলটা জিভে ছুঁইয়ে হাতে নিল।

'এই মরেছে!' বাংলাতেই বললাম। তারপর তাড়াতাড়ি ইংরাজী করে বললাম, 'দাঁড়াও দাঁড়াও।' তারপর পকেট থেকে যথাসর্ব্বস্ব দু' টাকার নোট বের করে তার সামনে মেলে ধরলাম।

'দু' টাকায় কিচ্ছু হবে না,' সার্জ্জেণ্টটা গর্জ্জে উঠল। তারপর পিছনে গিয়ে নাম্বারটা টুকতে টুকতে বলল, 'রিপোর্ট পাঠাব এ নাম্বারের নামে, তারপর তোমার লাইসেন্স কি করে থাকে দেখব।' নোটবুক্টাতে পেন্সিলে বড় বড় করে নাম্বারটা সে বসাল।

সর্ব্বনাশ হ'ল। এই সব এ্যাংলোগুলো সব করতে পারে। পিছনের লোকটার জন্যেই তো এই দুর্দ্দশা। তার দিকে তাকালাম, সে তখন হাঁ করে সার্জ্জেণ্টের পাশে দাঁড়িয়ে খাতা দেখছে।

'এ উল্লু, কেয়া দেখতা?' সার্জ্জেণ্ট এবার তাকে এক ধমক দিল, তারপর ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে বলল, 'ভাগ, বদমাস কাঁহাকা!'

এইবার আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'চালাও গাড়ী, তারপর কাল নাগাদ দেখব তুমি কেমন গাড়ী হাঁকাও।' বীরদর্পে হেলতে দুলতে সে পাশের রাস্তা দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বোকার মত হাঁ করে থেকে লোকের… সরিয়ে কোনো রকমে গাড়ীতে উঠে বসলাম। … কাজ আছে, নয়ত কোনো গাছতলায় গাড়ী থামিয়ে … হাত দিয়ে বসে থাকতাম। এবার কিন্তু গাড়ী … কথায় ষ্টার্ট নিল।

রাগ হ'তে লাগল, কেন কিছু টাকা নিয়ে বের… নি। নীল শার্টটা হাতে নিয়েও কেন পরলাম … ওর পকেটে ত টাকা ছিল গোটা দশেক। নিজের গা… নিজের চড় মারতে ইচ্ছে করতে লাগল। কেন … বাড়ালাম, কেন ঐ পিছনের বদমাসটার কথায় মাতলা… ওর কি? নিশ্চিন্ত মনে আধ বোজা চোখে রাস্তা দে… মেছোবাজারে নেমে গিয়ে হয়ত বাড়ী গিয়ে ঘুম লাগা… আর আমার…!

নাম্বার টুকে নিয়ে গেছে, কাল পরশু লাই… বাতিল হয়ে যাবে। গাড়ী যাবে, মান যাবে, সব যা… বন্ধুদের হাসিমুখ মনে করতেই ডুকরে কাঁদতে … করছিল গলা ছেড়ে।

গাড়ী চালানো আমার এ জন্মের মত শেষ … গেল!

মেছোবাজারের মোড়ে আসতেই গাড়ীর … কমালাম। পিছন থেকে সহযাত্রী হাঁকল, 'রুখ… বাবু।' তার পর গাড়ী থেকে নেমে দরজা বন্ধ … নীল রঙের ফতুয়ার পকেটে হাত দিল।

এঃ, ছোটলোকরাও আজকাল ভদ্রতা শিখে… বললাম, 'ভাড়া তোমায় দিতে হবে না, ও তুমি … দাও।'

ওর চোখ বুজে গেল, তারপর সেই সঙ্গে সঙ্গে বেরি… এল এক পাটি হলদে দাঁতের সারি। হেসে বলল, '… লয় বাবু, এই লিন।'

ফতুয়ার পকেট থেকে হাত বের করতেই … দেখলাম ওর হাতে সার্জ্জেণ্টের সেই নাম্বার টুকে… ছোট্ট কালো নোটবইখানা।

আমি যখন ছোট ছিলাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মৌচাক ভাঙ্গবার গল্প তোমাদের কাছে আগের বার …লেছি। আর একবার এক মহা দুঃসাহসিকতার কাজ ক'রে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলাম। সে গল্প শোন। আমাদের গ্রামে সে সময় ভয়ানক বনজঙ্গল ছিল। প্রত্যেকের বাড়ীই ছিল অনেকটা যায়গা নিয়ে, আর এঁদো পুকুরের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। পুকুরের পাড়ে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, সুপুরি, বেতবন, হিজলি, …রুণ, সপ্তপর্ণী, তাল—এ সব নানা গাছপালায় এক ভীষণ অন্ধকারের সৃষ্টি করে রাখতো। দিনের বেলাও সেই বড় বড় গাছপালায় ঢাকা অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে ভয় করত। বুনো শূয়োর," সাপ, গোসাপ, সজারু, শৃগাল, বনবিড়াল এ সব নির্ভয়ে করত বিচরণ। আর বানরের …ল যা ছিল তাকে অনায়াসে এক অক্ষৌহিণী বানর সেনা বললেও অত্যুক্তি হ'ত না। এদের উৎপাত ছিল অতি ভয়ঙ্কর রকমের। কারুর বাড়ীর খাবার ফল থাক… না, এমন কি মহিলারা হয়ত পুকুর-ঘাটে চলেছেন চা… ধোবার জন্য, একলা পেয়ে কেড়ে নিলে সেই চালে… ভাণ্ড। ঘরে ঢুকে খাবার জিনিষপত্রও লুঠ ক'রে খেতে তারা ছাড়ত না। ভয় কা'কে বলে তা জানত না।

আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের একটি বন্দুক ছিল, তিনি একবার একটা বাঁদরকে গুলি করে মেরে… ছিলেন বলে সারা গাঁয়ে উঠেছিল তুমুল আন্দোলনের ঢেউ।—আহাহা! শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত ভক্তদের হত্যা! গ্রাম যে রসাতলে যাবে! এই কুসংস্কার এখনও গ্রা… থেকে উঠে গেছে বলে ত' মনে হয় না! এই বাঁদর ব্যূহের সঙ্গে হয়েছিল আমার লড়াই। দোষ ছিল আমারই।

সেদিন স্কুলের ছুটির পর বাড়ী এসেছি। দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। শুনলাম দিদিমা আর এক বাড়ীতে ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতে গেছেন। এ দিকে আমার ত' ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে। যে বাড়ীতে চিঁড়ে কুটতে গেছেন সে বাড়ীর নাম পুরোনো বাড়ী। আমি দিদিমাকে ডেকে আনবার জন্য রওয়ানা হয়েছি, সেই জঙ্গলে ঘেরা সংকীর্ণ পথে দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট বাঁদরের বাচ্চা চুপ করে মাটির উপর বসে আছে। আমি মহা আনন্দে বাচ্চাটাকে কোলের উপর চেপে ধরে দৌড়ে চললাম। পথের মাঝখানে ছিল একটা নালা। যেমন নালায় নেমেছি, তখন আমার বুকের ভিতর থেকে বাচ্চাটা কিচিমিচি শব্দ করে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম অন্ততঃ একশ'টি বানর—সে কি ভীষণ চেহারা সবার, সব গাছের এ ডাল ও ডাল হ'তে নেমে এসে আমায় ঘিরে ফেলেছে! আমি সেই নালার উপরে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হোঁচোট খেয়ে পড়ে গেলাম। কোন রকমে উঠে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলুম—বাঁদরে আমায় মেরে ফেল্লে! ভাগ্যিস কাছে ছিল একটা গাছের ডাল পড়ে, সেটা দিয়ে বানরদের তাড়া করতে করতে বাড়ীর দিকে দৌড়ে চললুম। কিন্তু কোন পথ নেই, পথ আগলে বাঁদরেরা এসে আমায় আক্রমণ করলে,—আঁচড়ে কামড়ে দিল, আমি একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান হ'লো দেখলাম বাড়ীর সকলে আমায় ঘিরে বসে রয়েছেন, দিদিমা নানা ওষুধপত্র লাগিয়ে দিয়েছেন। আমায় বললেন—'ভারি ত' গিয়েছিলে

বাঁদরের সঙ্গে লড়াই করতে—এখন থাক বিছানায় শুয়ে!' আমি বললাম—'বাচ্চাটা কোথায়?' দিদিমা মুখ ভেংচিয়ে বললেন, 'বাচ্চাটা ঘরে বসে দুধ খাচ্চে!'—তার পর অন্যান্য সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: 'আমি কালই লিখে দেব ওর বাবা-মাকে—আমি এমন মোষাসুরকে (মহিষাসুর) রাখতে পারবো না।' বাঁদরের সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও আমার দেহে আছে। এ ঘটনার পর আমার দুঃসাহসিকতার কাহিনী আরও ছড়িয়ে পড়লো গ্রামের ভিতর।

সে সময়ে ঢাকা বিভাগের একজন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন—তাঁর নাম ছিল দীননাথ সেন। দীননাথ সেনের নাম তখন খুবই প্রচারিত ছিল। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার স্বরূপ। দীননাথ বাবু একখানা পাঠ্য বই রচনা করেছিলেন, সে বইখানির নাম ছিল 'মানসিক গণনা'। সে জাতীয় বই এখন বড় দেখি না। আমরা সে বইয়ের উপর ছড়া বেঁধেছিলাম—

মানসিক গণনা,
মূল্য তার তিন আনা।
দীননাথ সেন
পাঠ্য দিল কেন?

'মানসিক গণনা' যেমন পড়েছি তেমনি তাঁর লেখা 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' ব'লে একখানা বইও আমাদের পাঠ্য ছিল।

একবার পণ্ডিত মশায় ঢাকা থেকে এসে বললেন—'দীনু বাবু সাহেব কামারপাড়া স্কুল দেখতে আসবেন, আমাদের স্কুলও দেখবেন, খুব ভাল করে পড়াশুনা করো। কাপড়চোপড় সব পরিষ্কার করো।' এই দীন বাবু বড় সোজা লোক ন'ন্—নিজের বুদ্ধিবলে কলের তাঁত তৈরী করেছেন, ছাপাখানা, আরও কত কি করেছেন—এ সব গল্প বললেন। তার পর ভয় দেখিয়ে বললেন—'বড় রাগী মানুষ। পড়ার জবাব দিতে না পারলে তোমাদের হবে মহা বিপদ্।' একদিন সত্যই তাঁর বিরাট্ বজরা নদীর বাঁধানো ঘাটে এসে লাগলো। তিনি কিন্তু আমাদের স্কুল না দেখে বরাবর কামারপাড়া চলে গেলেন—পণ্ডিত মশায়কে বললেন, 'যাবার বেলায় সময় পেলে দেখে যাব।' পণ্ডিত মশায় আমাদের নিয়ে নদীর পাড়ে বসে রইলেন, [illegible] এ সুযোগ কি তিনি ছাড়তে পারেন?'

বেলা চারটের পর দীন বাবু ফিরলেন। আমাদে[illegible] দেখে হাসিমুখে বললেন: 'আমাকে নিতে এসেছ! [illegible] আচ্ছা চল।' পণ্ডিত মশায় বিজয়গর্ব্বে আমাদের সঙ্গে[illegible] তাঁকে নিয়ে এলেন। আমার মনে পড়ে তাঁর সুগোল [illegible] বৃহৎ মুখ ও মস্তক। চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল, প্রতিভামণ্ডি[illegible] ও বেশ বড়। নিমেষ মধ্যে সব বুঝে নিলেন—ভিসিটবু[illegible] বুকএ কি যেন লিখলেন, তারপর বললেন—'স্কুলের জন্[illegible] আলাদা বাড়ী নেই কেন? নাটমণ্ডপে স্কুল! আচ্ছা [illegible] আমি ঢাকা গিয়ে অক্ষয় বাবুকে বলবো।' অক্ষয় বা[illegible] ছিলেন আমাদের গ্রাম নিবাসী ঢাকার বিখ্যাত ডেপুটি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট। শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি দীননাথ বাবুর চেহার[illegible] এখনও আমার আবছায়ার মত মনে পড়ে। দীননা[illegible] বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ আদিনাথ সেন ঢাকাতে আমা[illegible] সহাধ্যায়ী ছিলেন। এখনও তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব[illegible] সৌহার্দ্য বিদ্যমান আছে। এই দীন বাবু নূতন রকমে[illegible] প্রদীপ, কাপড়ের কল, গানের স্বরলিপির উদ্ভাবনও [illegible] করেছিলেন।

সেকালের উৎসব, আনন্দ, ব্রতপার্ব্বণ প্রায় বারো [illegible] মাসই চলত। মনে পড়ে বারুণীর স্নান, অষ্টমী স্নান[illegible] ও গলৈয়ার বৈশাখী মেলার কথা। নানা গ্রামের ছোট[illegible] বড় পুরুষ ও মহিলারা এসে জুটত। চৈত্রের সংক্রান্তি[illegible] শেষে বৈশাখের শুভ প্রথম দিনে এ মেলা হ'ত; এখন[illegible] হয়, তবে সে আনন্দ ও উৎসব কোথায়? আমাদে[illegible] চাঁচরতলা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর মন্দির-প্রাঙ্গণে [illegible] গ্রামের কাছে মেলা বসতো সে ছিল বিখ্যাত। আম[illegible] রাত্রি শেষে গ্রামের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে মেলার পানে[illegible] হেঁটে যেতাম। দিদিমা বড় জোর চার আনা কি দু' আনা[illegible] পয়সা দিতেন, তখন সে দু' আনা বা চার আনা পয়[illegible] খরচ করবারও সুযোগ পেতাম না!

ঊষার আলো ভাল ক'রে না ফুটতে গ্রামের তরুছায়[illegible] শীতল পথে পথ চলা সুরু করতাম। তখনও পল্লী[illegible] লোকদের ঘুম ভাঙে নি, বৌ-ঝিরা কেউ কেউ ঘাটে এসে[illegible] বাসন মাজা সুরু করেছে। আম-বাগানের আমে[illegible] মুকুলের সৌরভে চারদিক্ সুবাসিত, কোন কোন গাছে[illegible]

[illegible]র গুটি ধরেছে। দলে দলে লোক চলেছে—[illegible] পাড় দিয়ে, বড় বড় গাছের ছায়া দিয়ে, খোলা [illegible] দিয়ে—প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলেছে। [illegible]দের আগে একদল কীর্ত্তনীয়া গেয়ে চলেছে—

"গৌর চললো ব্রজ নগরে,
ছেঁড়া কাঁথা মুড়ো মাথা হেরবো নীরে নয়নে।"

[illegible]র ছেলেবেলার শোনা, এ গানের শুধু ঐ দু'টি [illegible]ই মনে আছে। কি মধুরই না শোনাত এই গান!

[illegible]মাঠের ভিতর দিয়ে আইল পথ। সে পথে সার [illegible] একজনের পর একজন চলেছে। বাউলের দল [illegible]পুরুষে গোপীযন্ত্র নিয়ে গানে সুর দিয়ে চলেছে মেলার [illegible]।

[illegible] ক্রমে মেলায় এসে পৌঁছে যেতাম। কি সুন্দর ছিল [illegible]স্থান! চারি দিকের মাঠ হ'তে উচ্চ ভূমি সিদ্ধেশ্বরী [illegible]লীবাড়ী। সম্মুখে খাল। খালের পরপারে সবুজ, [illegible]র, শ্যামল মাঠের দূর প্রান্তে পদ্মা নদী। পদ্মার বুক [illegible] গোয়ালন্দগামী এলিগেটর, পরপোয়েস, ক্রোকো-[illegible]ইল নামের বড় বড় ষ্টীমার সব ধোঁয়া উড়িয়ে, পদ্মায় [illegible]ন লাগিয়ে ছুটে চলেছে গন্তব্য স্থানের দিকে। [illegible]রা সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠতাম।

[illegible] বিরাট বিশাল বটবৃক্ষ, বিরাট এক তেঁতুল গাছ, [illegible]রও কত সব গাছ মন্দিরের চারিদিকে ছায়া ক'রে [illegible]খেছে। খালের ঘাটে নৌকো বাঁধা। ছেলেমেয়েরা [illegible]টোছুটি করছে। বাতাসা, ফেণী, তেলে ভাজা [illegible]লিপীর অজস্র বিক্রী। একটা মোরগ বাঁশী কিনে [illegible]ফেললাম চার পয়সা দিয়ে। বাঁশী বেজে উঠলো [illegible]কড় কোঁ করে! রঙিন লাল, নীল, সবুজ কাগজ [illegible]নে ফেললাম দু' পয়সার—ঘুড়ি তৈরী করতে হবে ত'! [illegible] সময়ে গৃহস্থেরা এক বৎসরের প্রয়োজনীয় মশলা সব [illegible]নে ফেললেন। ভীড় ক্রমে বেড়ে চললো। এ [illegible]লীর বাড়ীতে এক সময়ে হ'ত নরবলি, সে যূপ কাঠ [illegible]এখনও দেখে ভয় পেলাম। বাজনা বাজতে লাগলো, [illegible]জোর ভীড়। হিন্দু, মুসলমান সকলে মানত মেনেছে—[illegible]াই পাঁঠা ছেঁড়ে দিচ্ছে, কবুতর ছেড়ে দিচ্ছে। ঢাক [illegible]বাজছে, সারা মেলাখানিকে প্রতিধ্বনিত ক'রে। এক জায়গায় পুকুরপাড়ে বসে বাউল পুরুষ ও মেয়েরা মিলে গান ধরেছে গোপীযন্ত্রে সুর তুলে—

"তোরা দেখবি যদি অ সজনী,
আয় সকলে ছুটে আয়,
ওই দেখ প্রেমে ভরা শচীর দুলাল
প্রেম বিলাইছে নদীয়ায়।
গৌরপ্রেম নদীর এমি ধারা,
উঁচু নীচু বাছে নাকো, ভাসায়ে দেয় সকল পাড়া!
অ তার ঘূর্ণা পাকে ডুবায়ে রাখে
স্রোতের মুখে যারে পায়।"

জানি না কোন পল্লীকবির রচিত এ সঙ্গীত। সব কথা মনেও পড়ে না। যেটুকু মনে আছে তাই তুলে দিলাম।

তার পর মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তেন তখন বাড়ী ফিরে আসতাম। দিদিমা সযত্নে নানা ব্যঞ্জন রান্না ক'রে বসে থাকতেন। সেদিনের কথা আজ স্বপ্নের মত মনে পড়ে। সেই সিদ্ধেশ্বরী চাঁচরতলার কালীবাড়ী কয়েক বৎসর হ'লো পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আছে শুধু স্মৃতি!

সেকালে গ্রামে কোন চিকিৎসক ছিল না। পাশের গ্রামে দু' জন ফেল-করা ডাক্তার ছিলেন। দু'জনই সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁদের পসার-প্রতিপত্তিও বড় কম ছিল না। একজন ছিলেন—তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোগীর বাড়ী যেতেন, বর্ষার সময় নিজের উদ্ভাবিত এক কাঠের নৌকো ষ্টীমারের মত ক'রে তৈরী করেছিলেন; দু' পাশে দুই চাকা ছিল, হল ছিল, কামরা ছিল। একটি লোক অতি সহজে চাকা ঘুরাত—সে নৌকো চলত খুবই বেগে। আর একজন ডাক্তার যিনি ছিলেন তিনি কানে শুনতেন না, চেঁচিয়ে ঢাক পিটিয়ে কথা শোনাতে হ'ত। একবার তাঁর সঙ্গে এক ডাক পিয়নের দেখা হ'ল বাজারের পথে। পিয়ন চেঁচিয়ে বল্লে, 'আপনার টাকা এসেছে!'—মানি অর্ডারের ফরম দেখিয়ে। তিনি রেগে লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে বললেন—'বেটা, তুমি কি আমাকে কালা পেয়েছ! কানে শুনতে পাই না আমি, না? টাকা এসেছে টাকা এসেছে বলে পথে চেঁচাচ্ছ—যদি চোর যায় আমার বাড়ী কে ঠেকাবে?' ওদিকে তাঁরা রাত্রিতে

স্বামী-স্ত্রীতে যখন কথা বলতেন আধ মাইল দূরের লোকও তা শুনতে পেত!

একজন কবিরাজ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গোবিন্দ কবিরাজ। জাতিতে ছিলেন নাপিত। ম্যালেরিয়ার বছরে তিনি এক আরক আবিষ্কার ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন 'গোবিন্দ সুধা'! সে যে কি রকম সুধা তোমরা যদি সে সুধা পান করবার সুযোগ পেতে তবে বুঝতে পারতে।

আমার একবার জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে বাবা-মার কাছে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে হ'লো ম্যালেরিয়া জ্বর। উঃ, সে কি জ্বর! সত্য সত্যই

না জানি কতেক মধু
ম্যালেরিয়ায় আছে গো।
বদন ছাড়িতে নাহি পারে!

শীতের দারুণ কাঁপুনি! দিদিমা কত যে প্রলেপ দিলেন পেটে! কত তেতো বড়ি, পাঁচন ও গরুর চনা যে খাওয়ালেন সে কথা মনে করতে এখনও প্রাণ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। অবশেষে ডাক পড়লো কবিরাজের।

বৃদ্ধ মানুষটি দিদিমাকে প্রণাম ক'রে, আমার দেখে তাঁর বোঁচকা থেকে বার করলেন এক গোবিন্দ সুধা। কবরেজ মশায়ের অভ্যেস ছিল কথার সঙ্গে 'সুতরাং এবং বরং' বলা। দিদি বললেন, 'সুতরাং এবং বরং নাতির পেট জোড়া সুতরাং এবং বরং এই ঔষধ সেব্য! তিক্ত রস সুতরাং এবং বরং অমৃত!' সেবনের পরে বললেন, 'বালক! এক দাগ খেয়ে সুতরাং এ জিলিপি সেব্য!'

এই জিলেপী ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খে শুনে মহা আনন্দ হ'লো। দিদিমা আমার জন্যে সংগ্রহ ক'রে রাখতেন—সুতরাং এবং বরং গো রাজের গোবিন্দ সুধা সেবন ক'রে আমি ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম। সুতরাং এবং বরং আমার কথাটি ফুরুল।

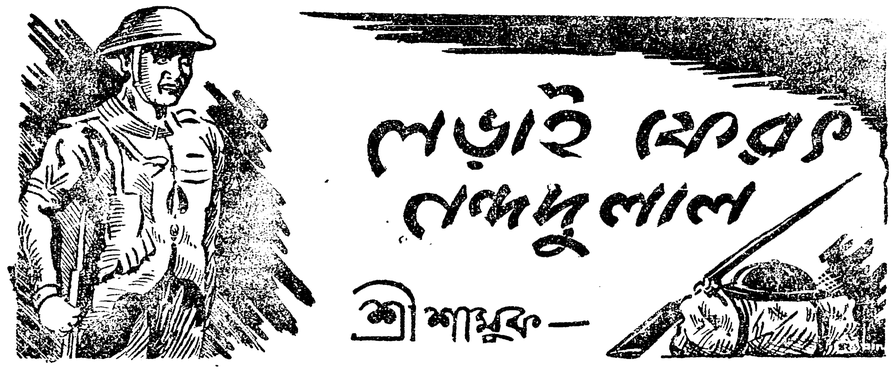

নয়

— কলি যুগের তপোবন —

নন্দর মনে হ'ল কানাই বাবু লোকটি বেশ ভাল, যদিও কথা কয়ে যান একটানা এবং একই জিনিষ বারে বার। দেশসেবা, দেশের ভাল করবার চেষ্টা ওঁর একটি প্রবল ঝোঁক বলা যায়। সারাক্ষণ ঐ সব নিয়েই আছেন নিজের সময়ের ও অর্থের ক্ষতি করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে একমত করিয়ে নি

সঙ্গে, এবং রাজী হতে হ'ল তাঁর আদর্শ অনুযায়ী করতে। নন্দ সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেল ওঁর বক্তৃতা শুনতে।

—আপনি ত' এই দেশেরই ছেলে, কোন দিন ভেবে ছেন একটি কথা? ভেবেছেন কি যে এই কলকাতার অনেক ডানপিটে, দুরন্ত ছেলে সব আছে? তারা হোক কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। বেশী বুদ্ধি আছে ঐ সব করে, কোন শাসন বা শাস্তি মানতে চায় এদের যদি মানুষ করা যায়, এদের বুদ্ধি যদি পথে নিয়ে যাওয়া যায় ত' দেশের একটা কত বড় কার হয় ভাবেন দেখি? আপনাকে সেই কাজেরই নিতে হবে। আমার বিষ্টুপদর কাছে যেদিন ম আপনার কথা, আপিসে সেই চোর ধরার কথা, দিনই মনে হ'ল এবারে মনের মতন মানুষ পেয়েছি। াজের জন্যে আমি কত দিন ধরে একজন লড়াই ফেরৎ বেল অথচ ভদ্র মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম!

সেই বাগানে বসেই সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। নন্দর চালনায় একটি বোর্ডিং করা হবে, তার নাম দেওয়া 'তপোবন'।

শহরের বাছা বাছা কুড়িটি সেরা ডানপিটে ও দুর্দান্ত লে সেখানে থাকবে। তারা একটি খুব কড়াকড়ি ন ইস্কুলে পড়বে, এবং ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়ের সব কিছুর ভার নন্দর ওপর। কানাই ইতিমধ্যে বাড়ি দেখে ঠিক করে রেখেছেন এবং বেছে খছেন কুড়িটি সেরা ছেলেকে। ছেলেদের বাড়ির কেরা খরচ করতে এবং সব রকমে সাহায্য করতে নক রকম রাজী, কারণ অনেকগুলি ইস্কুল ও বোর্ডিং ছেলেদের দুষ্টামির দাপটে সামলাতে না পেরে পত্র ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। নন্দর সেদিন বাড়ি তে ফিরতে মনে হ'ল এবারে সত্যি এক মজার ল পেয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট দিনে বিকালে নিজের জিনিষপত্র নিয়ে টিতে গিয়ে পৌছয়। দেখে চমৎকার বড় দোতালা , কৌটার মত; সামনে রঙিন সাইনবোর্ড টাঙানো— পোবন'। দোতালায় পাশাপাশি অনেকগুলি শোবার বড় বড়, একটির মধ্যে দিয়ে অন্যগুলিতে অবাধে যাওয়া যায়। আসবাবপত্র, খাবার জিনিষ, চাকর, বামুন, দরোয়ান প্রভৃতি সমস্তর ব্যবস্থা কানাই বাবু নিখুঁত ভাবে করেছেন। সত্যি, ভদ্রলোকের কর্মযোগ্যতার প্রশংসা না করলে দারুণ অন্যায় করা হবে।

নন্দর মনে হয় এমন সুন্দর গোছানো বন্দোবস্তের মধ্যে তার কাজ হবে খুব সোজা এবং খানিকটা মজারও। ছেলেরা কম বয়সে কিছু দুষ্টু হয়েই থাকে। সে নিজেও ত' বড় কম ছিল না। ওদের সামলানো এমন কি বৃহৎ মুস্কিলের ব্যাপার! কিছু ধমকানি, কিছু আদর, এবং বিশেষ দরকার হ'লে কয়েকটা চড় চাপড় দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে নিশ্চয়।

ছেলেদের সকলকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলে। জিজ্ঞাসা করলে তাদের নামধাম, বাড়ির সব কথা, এবং গল্পের ছলে বুঝিয়ে দিলে শৃংখলা ও নিয়ম পালনের কত সুবিধা—তার সৈনিক-জীবনের নানা উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে দিয়ে। দেখলে ছেলেরা বেশ মন দিয়ে তার কথা শুনলে, ছোট ছোট পরিষ্কার উত্তর দিলে তার প্রশ্নের, এতটুকু না ঘাবড়ে, এবং ব্যবহারও বেশ ভদ্র।

বুদ্ধি যে এদের আছে অল্প পরিচয়েই তা প্রমাণ হয়ে যায়। এদের শান্তশিষ্ট মুখ দেখে ও সহজ, সরল ব্যবহারে কে বলবে যে এরা কলকাতার শ্রেষ্ঠ কুড়ি জন! কানাই বাবুর কোথাও মারাত্মক ভুল হয়ে যায় নি ত'? যে রকম সদাশয় ভালমানুষ, ভুল হওয়া কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। এ কি শেষ পর্য্যন্ত সেই পুরাকালের তপোবন ও তার সত্যি ঋষি-বালকেরা হয়ে গেল নাকি! যাই হোক, খুসি মনে নন্দ সকলকে নিয়ে এক সংগে খাওয়াদাওয়া করলে। আরো খানিকটা গল্প করে ওদের শুতে বলে দিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেল সে।

খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ এক ভীষণ সোর-গোলে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। শুনতে পায় বাড়ির সামনে অনেকগুলি ঘুম-ভাঙা রাগী মানুষের চীৎকার ও তার নিজের চাকর-বাকরদের হৈ চৈ। ব্যাপার কী? কোন চুরি-ডাকাতি হয়ে গেল না ত'?

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতেই ঐ চীৎকার-করা লোকেরা তার ওপর নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে

নাকের সামনে ঘুষি ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলে হাংগামা কি ও কোথায়। ওরা তার পাড়ার লোক—প্রতিবেশী, এক দারুণ অভিযোগ জানাতে এসেছে।

সকলে যেই ঘুমিয়েছে, পাড়া যেই শান্ত, অমনি বাড়ির ওপরে ইটপাটকেল পড়তে সুরু হয়ে গেল। হঠাৎ। তপোবনের ছাদের ওপর থেকে যে তাগ করে ঐ সব ছোড়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারুর, কারণ ছাদের ওপর দৌড়ে পালানো ও লুকিয়ে-পড়া ছায়া-মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা গেছে কয়েকটি।

নন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুদ্দাড় ছাদে ওঠে যায়। কেউ নেই কোথাও, চিলে কোঠার দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি আছে। ছাদে গিয়ে দেখলে, বাড়িতে মিস্ত্রি লাগার জন্যে কিছু ইটের টুকরো প্রভৃতি এক কোণে জড় করা আছে বটে তবে তা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই।

তাড়াতাড়ি নেমে ছেলেদের ঘরগুলি সন্তর্পণে এক চক্কর ঘুরে নেয়। কই, সকলেই ত' ঘুমাচ্ছে অঘোরে! আলো জেলে কয়েকজনকে ধাক্কা মেরে উঠিয়ে দিলে গভীর ঘুম থেকে উঠলে মানুষ যেমন ব্যবহার করে, যেমন ভাবে কথা কয় এরা করলে ঠিক তাই। বিছানাগুলিও এতটুকু হাঁটকানো—ওলোট পালট নেই!

নন্দর মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যায়, তা হ'লে হ'ল কি! বৃথা কি এদের সন্দেহ করছে? এরা কি নির্দোষ? বুঝতে পারে না। আলো নিভিয়ে, ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল যেন একটা অস্পষ্ট চাপা হাসি শুনতে পেল অনেকগুলি 'গলায় একসংগে, কিন্তু তখুনি তা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

প্রতিবাসীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করে দিলে যে কাল সকালে এর তদন্ত করা হবে। তারপর ছাদের দরজায় চাবি লাগিয়ে নিজের ঘরে অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে রইলো চুপ করে, যদি ছেলেদের ঘর থেকে কোন শব্দ বা দুষ্টামির চাপা হাসি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতটুকু টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত হ'ল না। ওদের নাক ডাকার আওয়াজ বার বার প্রমাণ করে দেয় যে ওরা নিশ্চিন্তভাবে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সকালে উঠে নন্দ মনে মনে ঠিক করছিল কি ভাবে ছেলেদের এক লম্বা বক্তৃতা দেবে, এবং পালের গ খুঁজে বার করে নেবে। চিন্তায় বাধা পড়ে প্রথমে বিলটু চাকর এসে অভিযোগ জানালে যে রাত্রে তার অতি সাধের আধ হাত লম্বা টিকি নিয়েই ঘুমিয়েছিল, কিন্তু আজ সকলে দেখা যা সেটি মাথায় যথাস্থানে নেই। এমন চমৎকার কেটে নিয়েছে যে তার অংশমাত্রও আর খুঁজে যাচ্ছে না।

বিলটুর যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এসে জা একটি বড় ঠোঙায় চিনি রাখা ছিল রান্নাঘরে, ঠিক বসানো আছে কিন্তু তাতে চিনি নেই দানাও।

নন্দ উঠে দাঁড়ায় ছেলেদের কাছে যাবার জন্ বিলটু আবার এসে খবর দিল যে পাড়ার কয়েক লোক এসেছেন দেখা করতে, নীচের ঘরে বসে আ

প্রতিবাসীরা প্রত্যেকেই এক একখানি কাগজ নন্দর সামনে মেলে ধরলে। তাতে একই আঁকা এবং লেখা। এই কাগজগুলি নাকি চিঠি খামে বন্ধ করে আজ ভোর বেলায় ছেলেরা হাতে এদের দিয়েই সরে পড়েছে। কাগজের এ আঁকা এক অদ্ভুত মূর্ত্তি মানুষের গলায় দড়ি বাঁধা তার পাশে বড় বড় হরফে, 'আজ রাত দুপুরে বাড়িতে ডাকাতি করতে যাবো। বাধা দিতে অমনি অবস্থা হবে।' লেখার শেষে একটি তীর এ ছবিটিকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নন্দর বেদম হাসি পেলে এই ছেলেমানুষি কা খানা দেখে। কিন্তু ভদ্রলোকদের মুখের চেহারায় তার আর হাসতে সাহস হ'ল না। বলে,—ছে যদি আপনাদের সামনে নিয়ে আসি ত' চিনিয়ে পারবেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়! এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠে উত্তর দেয়।

ছেলেরা এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কুচকাওয়াজ করছে। প্রতিবেশীরা প্রতিহিংসার উ এদিক্ থেকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করে খোঁজাখুঁ

করে দেয়। কিন্তু উত্তেজনায় তখুনি তাঁটা পড়ে গেল। সঠিক ধরতে পারে কই!

—এই ত' এই আমার বাড়ি গিছলো নিশ্চয় আজ ভোরের বেলা—না না, এ নয়, ঐ ঐটা—কিন্তু তার যেন রঙটি আর একটু চাপা ছিল—তা হ'লে কি ঐটি—ঐ যে চুপ করে দাঁড়িয়ে? এ ত' বড় বিভ্রাটে পড়া গেল দেখছি!

সে এক বিষম হট্টগোলের ব্যাপার। ছেলেরা নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের মুখে মনের কথার এতটুকু লেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় না। দুরন্ত হ'তে পারে তবে বাহাদুর ছেলে সব।

একজন বুড়ো ভদ্রলোক বলে ফেলেন সে কথা অকপটে। বলেন,—সাবাস, বাহাদুর ছেলে তোমরা। হ্যাঁ, কলকাতার সেরাই বটে। আজ জন্ম সার্থক হ'ল তোমাদের সব এক সঙ্গে দেখে। তোমরা ইচ্ছে ক সব কিছু করতে পারো, কি ভালো কি খারাপ ক আমরা যোড় হাত করে হার মানছি, আমাদের রে দাও। উনি তোমাদের অধ্যক্ষ, ওঁর ওপর যত দুষ্টামি চালাও, আমরা কিছু বলতে আসবো না। আমাদের রেহাই দিও বাবারা, হাত যোড় করে মানছি।

খাইয়ে দাইয়ে ছেলেদের ইস্কুলে পাঠিয়ে নন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। এদের যাওয়া-আসার জন্যে মোটার বাসের আলাদা বন্দোবস্ত করা ছিল। খানিক পরে বাস-চালক ব্যস্ত ভাবে এসে খবর দিলে যে যখন ইস্কুলে গিয়ে পৌছালো দেখা গেল তার ভি আরোহী একজনও নেই। ছেলেরা পথের মাঝে সুযোগে চুপচাপ নেমে পড়েছে। (ক্রম

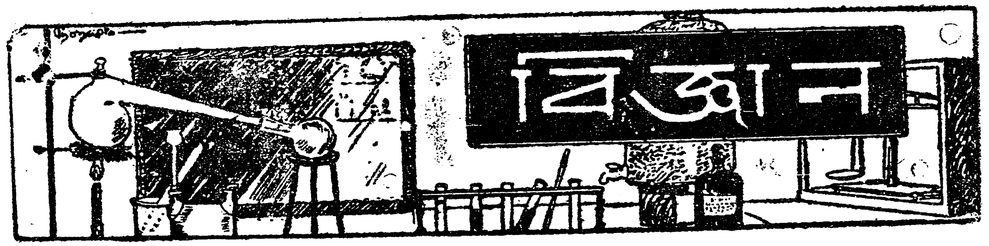

তরল বায়ু

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

তোমরা কি তরল বায়ু দেখিয়াছ? ইহা দেখিতে ঠিক যেন জল কিন্তু নীলাভ। আমরা বায়ু দেখিতে না পাইলেও নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ইহার উপস্থিতি অনুভব করি। ইহা একটি গ্যাস, বর্ণহীন বলিয়া অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বায়ুকে তরল দৃশ্য বস্তুরূপ আমরা পাইয়াছি। তোমরা হয়ত মনে করিবে ইহা একটি অসম্ভব কথা। বায়ু আবার জলের মত হইবে কি করিয়া? সত্যই তরল বায়ু যদি পাওয়া যাইবে আমরা ইহা দেখি না কেন? এ সমস্ত প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশ সেরূপ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা-সম্পন্ন নয় বলিয়া তরল বায়ু সচরাচর আমাদের তৈয়ারী হয় না—বিশেষ বিশেষ গবেষণা-ক্ষেত্রে ও জেন তৈরীর ব্যাপারে কেবল ইহার ব্যবহার দেখা য

ইহার প্রস্তুতির প্রণালীটা একটু আলোচনা যাক্। কঠিন পদার্থ যেমন তাপের সাহায্যে তর যায়, বায়বীয় পদার্থ সেরূপ পারা যায় না। এ পদার্থ সাধারণতঃ চাপ ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পাইলে হইয়া থাকে। বায়ুকে তরল করিতে হইলে শূন্য (বরফের তাপ) হইতে আরও ১৯০ ডিগ্রি নামিয়া হইবে। মনে কর, আমাদের দেশ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা

লাগিল। উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রিতে পৌছিলে আমাদের সমস্ত জল বরফ হইয়া যাইবে। তখন আমরা বরফের দেশে বাস করিব। উষ্ণতা ক্রমশঃই নীচের দিকে চলিয়াছে! ঠাণ্ডায় বায়ু ক্রমশঃ ঘন হয়। কাজেই তাপের এই ক্রমিক অবনতির জন্য আমরা ভীষণ ঠাণ্ডা অথচ ঘন বায়ুতে বাস করিতে লাগিলাম। উষ্ণতা এখন ক্রমশঃ আরও কমিতে কমিতে –১০০° ডিগ্রি, তারপর –১৫০° ডিগ্রি, এবার –১৯০° ডিগ্রিতে নামিয়াছে। তোমরা কি কল্পনা করিতে পার কি ভীষণ ঠাণ্ডা রাজ্যে আমরা পৌছিয়াছি? এরূপ মারাত্মক ঠাণ্ডা কল্পনাতে অতীত। এবার বায়ুর অবস্থা কি হইবে? আকাশের বায়ু এবার র্গ ছাড়িয়া বৃষ্টিধারায় ধরাধামে নামিয়া আসিবে।

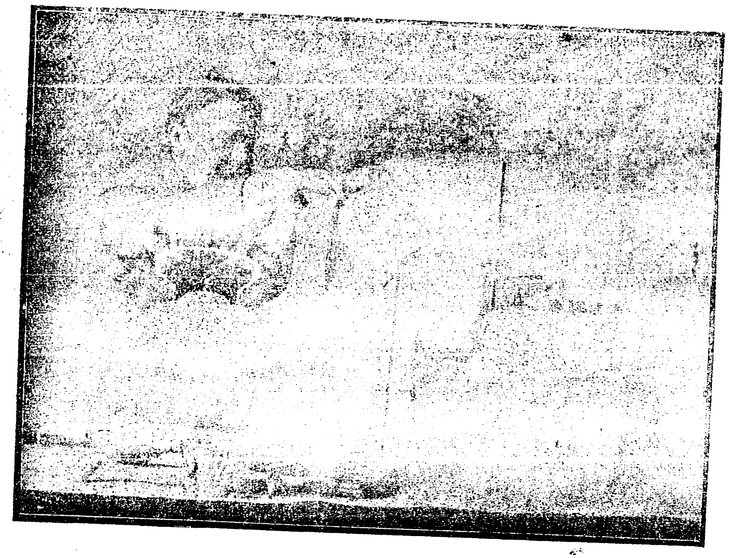

বৈজ্ঞানিক তরল বায়ু লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন

বশ্য ইহা কল্পনারই ছবি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। নয়াছি চন্দ্র নাকি অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সেখানে তরল বায়ু া প্রবহমান ছিল কিনা কে জানে!

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবেশে ঐ অপরিসীম ঠাণ্ডা ব কিনা জানি না, কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আজ ত্রম উপায়ে ঐরূপ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তরল বায়ু প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই পরিপক্ক বৈজ্ঞা নিক ব্যবস্থা দেখিয়া তোমরা চমৎকৃত হইবে। ইহা প্রস্তুত করিতে দুইটী বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। বায়ুর উপর চাপ বৃদ্ধি ও তাপ হ্রাস। চাপ বৃদ্ধির জন্য পাম্প ব্যবহার করা হয়। এবং উষ্ণতা হ্রাসের জন্য একটি পূরাপূরি যান্ত্রিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তোমরা হয়ত' জান আকাশের বায়ু প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর ১৫ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। ইহাকে বলা হয় এক বায়ু চাপ (য়্যাট্‌মস্‌ফারিক্ প্রেসার); তরল বায়ু প্রস্তুতির জন্য উহার ২০০ গুণ চাপ দরকার হয়। ঐরূপ প্রবল চাপে বায়ু প্রথমেই অনেকটা ঘন হয়। এই ঘনীভূত বায়ু এখন একটি কৌশলপূর্ণ যন্ত্রের মধ্যে চালিত করা হয়। যন্ত্রটা আর কিছুই নহে, একটি কুণ্ডলিত নল। চাপ দ্বারা বায়ুকে ঐ নলের মধ্যে চালিত করিয়া নলের প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা একটি বাক্সের মধ্যে ইহাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করা হয়। অভিজ্ঞতার ফলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে চাপগ্রস্ত বায়ু যদি সরু ছিদ্র দিয়া মুক্ত করা যায় তবে বায়ুর তাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই প্রকৃষ্ট বিধানটীই উঁহাদের জয়-মাল্য দান করিয়াছে। প্রথম বার চালনার ফলে বায়ুর তাপ কিছুটা কমিল; এখন এই বায়ু আবার চাপের সাহায্যে সেই পাকানো নলের মধ্যে প্রেরণ করিয়া বাক্সের মধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় মুক্ত করা হইল। এবার বায়ু আরও ঠাণ্ডা হইল। একই বায়ু বার বার ঐ প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিলে শেষ পর্য্যন্ত তাপ এমন কমিয়া যায় যে বায়ু বাক্সের মধ্যে তরল হইয়া পড়িতে থাকে। তরল বায়ু প্রস্তুতির মোটামুটি প্রণালী ইহাই। কিন্তু ঠিক কার্য্য-ক্ষেত্রে পাকানো নলটীর চারি দিকে আর একটি পাকানো নল থাকে। বাক্স হইতে ঠাণ্ডা বায়ু পুনঃ পুনঃ প্রথম কুণ্ডলিত নলে ঢুকিবার পূর্ব্বে এই কামিজ

নলের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে, ফলে মূল র বায়ু এই কামিজের ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে থাকিয়া কতর ঠাণ্ডা হয়।

প্রারম্ভে তরল বায়ু প্রস্তুত করিয়া বৈজ্ঞানিক মহা ায় পড়িয়াছিলেন। রাখিবার পাত্র নিয়াই সর্ব্বা- া সমস্যা হইয়াছিল। এরূপ কল্পনাতীত ঠাণ্ডা নিষ যেখানে রাখা যাইবে সেখানেই টগবগ করিতে করে। কারণ তরল বায়ুর তাপ ও পাত্রের তাপের য আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তোমরা কি একটি ৫০০

বরফের চাঁইএর উপর কেটলীতে তরল বায়ু ফুটিতেছে

্রী তাপযুক্ত পাত্রে জল ঢালিতে পার? জলের অবস্থা হয়? পাত্রে পড়িতে না পড়িতেই উহা বাষ্প হইয়া ড়িয়া যাইবে। এখানেও সেই অবস্থা। কিন্তু যদি প সম্ভব হয় যে পাত্রটী মোটেই বাহিরের হাওয়ার, তাপের সংস্পর্শে আসে না, তাহা হইলে এরূপ পাত্রে ল বায়ু রাখা যাইতে পারে। উদ্যম ও আন্তরিকতা কি না হয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ থার্মো ফ্লাস্ক নামক প্রকার পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—যাহার ভিতরটা হরের হাওয়ার সংস্পর্শে আসে না। ইহা একটি চের পাত্র। ভিতরের পাত্রটি অপর এক পাত্রের কামিজ ড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু দুইটী পাত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান বায়ু- হওয়া চাই। কারণ বায়ুই সাধারণতঃ বাহিরের প চালনা করে। এ ক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তী স্থান তাপ বাহকারী বায়ু হইতে বঞ্চিত হওয়াতে ভিতরের পাত্রটী কোন তাপদ্বারা উৎপীড়িত হয় না। কাজেই ভিতরের জিনিষটীও যতটা সম্ভব বাহিক তাপ হইতে

ঘরের ভিতর তরল বায়ু ছড়াইয়া মেঘের সৃষ্টি

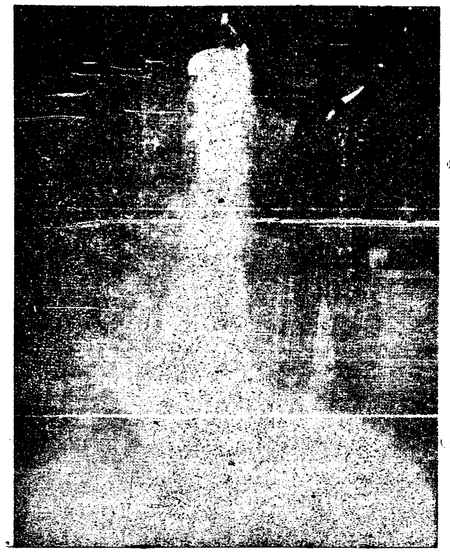

মুক্ত থাকে। এই পাত্রের আবিষ্কার-কর্ত্তার নাম মহাত্মা ডেওয়ার। এই বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের দান মনুষ্যসমাজের অমূল্য সম্পদ্। এই পাত্রের সাহায্যে নানাবিধ উষ্ণ পানীয় (চা, দুধ, কোকো ইত্যাদি) আমরা সারাদিন গরম রাখিতে পারি।

তরল বায়ুর গুণাগুণ পরীক্ষা করা হইয়াছে। পারদ ইহার সংস্পর্শে আসিয়া এরূপ শক্ত হয় যে হাতুড়ী দ্বারাও ইহা ভাঙ্গা যায় না। আঙ্গুর ফল ইহার মধ্যে ফেলিয়া দিলে একটি মার্বেলের গুলির মত শক্ত হইয়া যায়। খোলা বায়ুতে ইহার উপরিভাগ সর্ব্বদাই ধূম্রজালে আচ্ছাদিত থাকে। হাত দিয়া এই ধূম্রজাল স্পর্শ করিলে ঠিক যেন তুলার গদির মত মনে হয়। কিন্তু খাঁটি তরল বায়ুতে হাত দিলে আর রক্ষা নাই। তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ভীষণ ঘা হইবে—ঠিক যেন একটি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডে হাত

দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায় কোন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার তরল বায়ু দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসা করেন।

আচ্ছা, যদি বরফের পাত্রে তরল বায়ু রাখা হয় তবে কেমন হয়? তোমরা কি মনে কর? বরফ-পাত্রের তাপ তরল বায়ুর চেয়ে ১৯০° ডিগ্রী বেশী কাজেই বরফের পাত্রে তরল বায়ু টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। খুবই আশ্চর্য্য নয় কি?

বায়ুর রাসায়নিক গঠন হয়ত' তোমরা জান না। ইহা প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বা নেত্রজানের সমষ্টি। তরল বায়ুতেও ঐ মিশ্রণই আছে। কা ইহা বলিলে ভুল হয় না যে তরল বায়ু ১ ভাগ অক্সিজেন ও ৪ ভাগ তরল নাইট্রোজেনের সমষ্টি। নাইট্রোজেন তরল অক্সিজেন হইতে হাল্কা, কাজেই উপরে থাকে' এবং উড়িবার সময় ইহাই সর্ব্ব উড়িয়া যায় ও অক্সিজেন পড়িয়া থাকে। সতর্ক সহিত কাজ করিলে আমরা অল্পায়াসে উক্ত গ্যাসকে এই প্রণালী দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি। পক্ষে আজকাল অক্সিজেন তৈরী করিবার ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপায়।

কয়লা ভারী ময়লা জিনিষ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেদিন প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে দূর থেকে মনে হলো আমাদের কালীকেষ্টকে কে যেন পথে বসিয়ে গেছে।

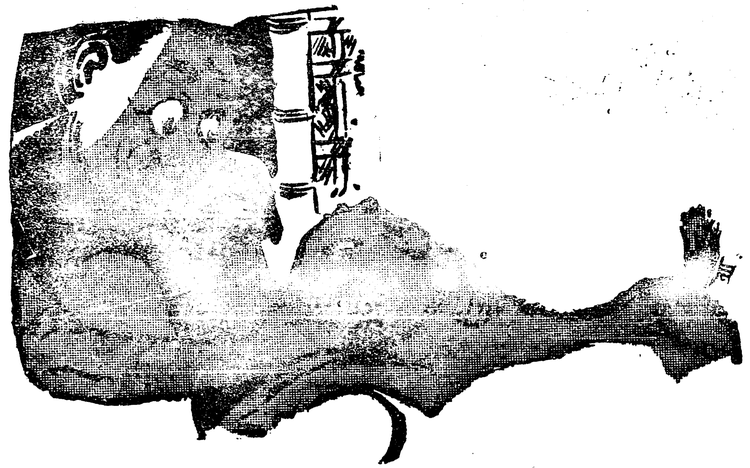

কয়লা বড় ময়লা জিনিষ—বুঝলিরে পাঁঠা?

কাছে গিয়ে দেখলাম, না, একেবারে অতটা নয়, নিজের আড়তের দোর গোড়ায় বসে কালীকেষ্ট বলছে—"কয়লা অতি ময়লা জিনিষ, বুঝ্‌লিরে পাঁঠা?"

বলছে একটা পাঠাকেই। পাঁঠাটি তার পো...া, ভারী আদরের। কবে উদরের হবে এখানে বলা কঠিন কেবল উপোষমানা কালীকেষ্টই তা বল্‌তে পারে।

পাঁঠার থেকে চোখ হটিয়ে কালীকেষ্টর দি তাকালাম। তার মুখখানা কয়লার মতই মলিন।

"পাঁঠার সঙ্গে এই তত্ত্বকথা কেন? হঠাৎ আ হোলো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কী আর হবে! কয়লা জিনিষটাই খারাপ। ...ময় খারাপ।" দীর্ঘশ্বাস ঝাড়ল ও।

কালীকেষ্ট কয়লার ব্যাপারী। এই যুদ্ধের বাজারে তিনখানা কোঠা তুলেছে—স্রেফ্‌ কয়লার জোরে। ...লের সঙ্গে কাঁকর চালিয়ে, আটার গর্ভে তেঁতুল-বীচি ...য়ে কিংবা চায়ের মধ্যে ও চা মিশিয়ে অনেকের বাড়ী ...লার মত অতখানি বাড়াবাড়ি কালীকেষ্ট করে নি। ...লার সঙ্গে কোনরূপ ভেজাল দিয়ে নয়—একেবারে ...লা না দিয়েই কালীকেষ্টর বাড়ী।

আশপাশের কারখানাগুলোয় ও টন্ টন্ কয়লার ...গান দেয়। আর যোগান না দিয়েই আমাদের চোখ ...টন্ করে। ওর বাড়ীর দিকে তাকালেই যেন কয়লার ...চ লাগে, গনগনে আঁচ, আর মনটা আমাদের পুড়তে ...কে। কত মণ কয়লার বাড়ী কে জানে! কয়লা ...ড় এসে পড়ে চোখ কর্‌কর্ করে যেন।

একটু খুসি হয়ে বল্লাম, "ব্যবসা বুঝি ভালো চল্‌ছে—নাকি?"

"ব্যবসা? ব্যবসার কথা আর বোলো না। আমাকে ...থ বসিয়ে দিয়েছে।" বল্লে কালীকেষ্ট।

একটু আগে আমারও তদ্রূপ সন্দেহ হয়েছিল।—...তামাকে পথে বসায় এমন কে আছে দাদা?" সাগ্রহে ...নতে চাইলাম।

"ভাটিয়া কারখানার নতুন ম্যানেজারটা, সেই তো। ...বার কে?" কালীকেষ্টর মুখখানা এবার কয়লার ...য়েও কালো হয়ে যায়: "বলে কিনা আমি কয়লা ... করি!"

এখন, কয়লা চুরির কথা কেউ বল্লে কালীকেষ্টর ...ণে লাগে। কালীকেষ্টকে চোর বলো, জোচ্চোর ...লো, ও সইবে; ডাকাত বলো, তাও হয়তো হাসিমুখে ...নে নেবে, কিন্তু কয়লা-চোর বল্লে ও আহত হয়।

আর সত্যি বল্‌তে, সে আর কী এমন কয়লা সরায়? ...রোটার সময় খেয়ে দেয়ে ল্যরী নিয়ে বেরিয়ে সরকারী ...পো থেকে ছ'টন কয়লা, সে নেয়, তারপর ঘুরে ঘুরে ...ই কয়লার থেকে টন দু'য়েক এর কাছে ওর কাছে তার ...ছে পাচার ক'রে সন্ধ্যে নাগাদ কারখানায় গিয়ে পৌঁছয়। সারাদিন খাটুনির পর কারখানার কুলীরা তখন শ্রান্ত ক্লান্ত, আর যে ওভারসীয়ারটি কয়লা বুঝে নেয় তারও তখন মাথার ঠিক নেই। সেই যোগাযোগে অবশিষ্ট কয়লার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে কালীকেষ্ট চলে আসে।

কাজ করার গুমোরে সদাই ডগমগ, এমন এক একটি লোক থাকে। ওভারসীয়ারটি হচ্ছে সেই গোছের মানুষ। একতিল কাজকে এক তাল করে না বলতে পারলে তার সুখ নেই। সারাদিন ধরে কত কাজ তাকে করতে হচ্ছে সর্ব্বদাই তার মুখে লেগে আছে। কাজেই হাজার রকমের কার্য্যকারিতার পর দিনান্তে যখন কালীকেষ্টর ল্যরী গিয়ে দাঁড়ায়, আর কুলীদের সাহায্যে তদারক করে সেই কয়লা বোঝার পর বোঝা তাকে নামাতে হয় তখন স্পষ্টতঃই তাকে চেঁচিয়ে বলতে শোনা যায়—"বাবা! এই কি ছ' টন কয়লা? ছ' টনের নাম করে ছত্রিশ টনের বোঝা চাপানো হচ্ছে—তা কি আর বুঝি নে? ভালো করছ না কালীকেষ্ট! কম ব'লে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই যে বেশী কয়লা চালিয়ে দিচ্ছ এ কাজ তোমার উচিত হচ্ছে না। কোম্পানীর উপকার করছ বটে, কিন্তু সাধু সরলবিশ্বাসী লোকদের ফাঁকি দিয়ে এইভাবে খাটিয়ে নেওয়া ভালো নয়।"

"তা ম্যানেজার তোমায় ধরলে কি ক'রে?" আমি জানতে চাই।

"আমায় ধরবে? ম্যানেজার? পাগল হয়েচ তুমি?" কালীকেষ্ট বলে: "আমায় ধরবে সামান্য একটা ম্যানেজার? তা হ'লে সাত জন্ম ওকে খনির গর্ভে আগে কয়লা হয়ে জন্মাতে হবে! ধরাধরি নয়, কেবল সন্দেহ করেছে এই মাত্র। আর তা ছাড়া, তুমি তো জানো, কালীকেষ্ট কখনো তেমন কম্ম করে না। সরকারী কয়লা সরাবে কালীকেষ্ট? এতটা কয়লাহারাম হয় নি সে!"

"না—না—তা কি হয়?" আমি সায় দিই।

"ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।"—কালীকেষ্ট বিবৃতি দেয়: "ডেকে বল্লে, 'কালীকেষ্ট, তোমার কয়লার ব্যাপারে আমি মোটেই খুসি নই। এর মধ্যে গলদ্ আছে—আমার কানে অনেক কথা এসেছে।'

দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায় কোন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার তরল বায়ু দ্বারা ক্যান্‌সার চিকিৎসা করেন।

আচ্ছা, যদি বরফের পাত্রে তরল বায়ু রাখা হয় তবে কেমন হয়? তোমরা কি মনে কর? বরফ-পাত্রের তাপ তরল বায়ুর চেয়ে ১৯০° ডিগ্রী বেশী কাজেই বরফের পাত্রে তরল বায়ু টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। খুবই আশ্চর্য্য নয় কি?

বায়ুর রাসায়নিক গঠন হয়ত' তোমরা জান না। ইহা প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বা নেত্রজানের সমষ্টি। তরল বায়ুতেও ঐ মিশ্রণই আছে। ইহা বলিলে ভুল হয় না যে তরল বায়ু ১ ভাগ অক্সিজেন ও ৪ ভাগ তরল নাইট্রোজেনের সমষ্টি। নাইট্রোজেন তরল অক্সিজেন হইতে হাল্কা, কাজেই উপরে থাকে এবং উড়িবার সময় ইহাই সর্ব্ব উড়িয়া যায় ও অক্সিজেন পড়িয়া থাকে। সতর্কতা সহিত কাজ করিলে আমরা অল্পায়াসে উক্ত গ্যাসকে এই প্রণালী দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি। পক্ষে আজকাল অক্সিজেন তৈরী করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপায়।

কয়লা ভারী ময়লা জিনিষ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দূর থেকে মনে হলো আমাদের কালীকেষ্টকে কে যেন পথে বসিয়ে গেছে।

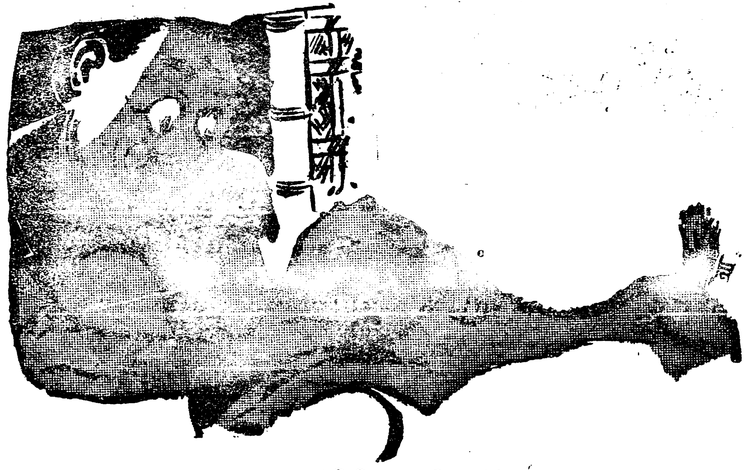

কয়লা বড় ময়লা জিনিষ—বুঝলিরে পাঁঠা?

কাছে গিয়ে দেখলাম, না, একেবারে অতটা নয়, নিজের আড়তের দোর গোড়ায় বসে কালীকেষ্ট বলছে—"কয়লা অতি ময়লা জিনিষ, বুঝ্‌লিরে পাঁঠা?"

বল্‌ছে একটা পাঁঠাকেই। পাঁঠাটি তার পোষমানা, ভারী আদরের। কবে উদরের হবে এখানে বলা কঠিন কেবল উপোষমানা কালীকেষ্টই তা বল্‌তে পারে।

পাঁঠার থেকে চোখ হটিয়ে কালীকেষ্টর তাকালাম। তার মুখখানা কয়লার মতই মলিন।

"পাঁঠার সঙ্গে এই তত্ত্বকথা কেন? হঠাৎ কী হোলো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কী আর হবে! কয়লা জিনিষটাই খারাপ। খারাপ।" দীর্ঘশ্বাস ঝাড়ল ও।

কালীকেষ্ট কয়লার ব্যাপারী। এই যুদ্ধের বাজারে তিনখানা কোঠা তুলেছে—স্রেফ্ কয়লার জোরে। সঙ্গে কাঁকর চালিয়ে, আটার গর্ভে তেঁতুল-বীচি ঢুকিয়ে কিংবা চায়ের মধ্যে ওঁচা মিশিয়ে অনেকের বাড়ী লার মত অতখানি বাড়াবাড়ি কালীকেষ্ট করে নি। লার সঙ্গে কোনরূপ ভেজাল দিয়ে নয়—একেবারে লা না দিয়েই কালীকেষ্টর বাড়ী।

আশপাশের কারখানাগুলোয় ও টন্ টন্ কয়লার গান দেয়। আর যোগান না দিয়েই আমাদের চোখ টন্ করে। ওর বাড়ীর দিকে তাকালেই যেন কয়লার চ লাগে, গনগনে আঁচ. আর মনটা আমাদের পুড়তে কে। কত মণ কয়লার বাড়ী কে জানে! কয়লা ড় এসে পড়ে চোখ কর্‌কর্ করে যেন।

একটু খুসি হয়ে বল্লাম, "ব্যবসা বুঝি ভালো চল্‌ছে —নাকি?"

"ব্যবসা? ব্যবসার কথা আর বোলো না। আমাকে থ বসিয়ে দিয়েছে।" বল্লে কালীকেষ্ট।

একটু আগে আমারও তদ্রূপ সন্দেহ হয়েছিল।—মাকে পথে বসায় এমন কে আছে দাদা?" সাগ্রহে নতে চাইলাম।

"ভাটিয়া কারখানার নতুন ম্যানেজারটা, সেই তো। ার কে?" কালীকেষ্টর মুখখানা এবার কয়লার য়েও কালো হয়ে যায়: "বলে কিনা আমি কয়লা করি!"

এখন, কয়লা চুরির কথা কেউ বল্লে কালীকেষ্টর াগে লাগে। কালীকেষ্টকে চোর বলো, জোচ্চোর লো, ও সইবে; ডাকাত বলো, তাও হয়তো হাসিমুখে নে নেবে, কিন্তু কয়লা-চোর বল্লে ও আহত হয়।

আর সত্যি বল্‌তে, সে আর কী এমন কয়লা সরায়? রাটার সময় খেয়ে দেয়ে ল্যরী নিয়ে বেরিয়ে সরকারী পো থেকে ছ'টন কয়লা, সে নেয়, তারপর ঘুরে ঘুরে কয়লার থেকে টন দু'য়েক এর কাছে ওর কাছে তার ছে পাচার ক'রে সন্ধ্যে নাগাদ কারখানায় গিয়ে পৌছয়। সারাদিন খাটুনির পর কারখানার কুলীরা তখন শ্রান্ত ক্লান্ত, আর যে ওভারসীয়ারটি কয়লা বুঝে নেয় তারও তখন মাথার ঠিক নেই। সেই যোগাযোগে অবশিষ্ট কয়লার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে কালীকেষ্ট চলে আসে।

কাজ করার গুমোরে সদাই ডগমগ, এমন এক একটি লোক থাকে। ওভারসীয়ারটি হচ্ছে সেই গোছের মানুষ। একতিল কাজকে এক তাল করে না বলতে পারলে তার সুখ নেই। সারাদিন ধরে কত কাজ তাকে করতে হচ্ছে সর্ব্বদাই তার মুখে লেগে আছে। কাজেই হাজার রকমের কার্য্যকারিতার পর দিনান্তে যখন কালী কেষ্টর ল্যরী গিয়ে দাঁড়ায়, আর কুলীদের সাহায্যে তদারক করে সেই কয়লা বোঝার পর বোঝা তাকে নামাতে হয় তখন স্পষ্টতঃই তাকে চেঁচিয়ে বলতে শোনা যায়—"বাবা! এই কি ছ' টন কয়লা? ছ' টনের নাম করে ছত্রিশ টনের বোঝা চাপানো হচ্ছে—তা কি আর বুঝি নে? ভালো করছ না কালীকেষ্ট! কম ব'লে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই যে বেশী কয়লা চালিয়ে দিচ্ছ এ কাজ তোমার উচিত হচ্ছে না। কোম্পানীর উপকার করছ বটে, কিন্তু সাধু সরলবিশ্বাসী লোকদের ফাঁকি দিয়ে এইভাবে খাটিয়ে নেওয়া ভালো নয়।"

"তা ম্যানেজার তোমায় ধরলে কি ক'রে?" আমি জানতে চাই।

"আমায় ধরবে? ম্যানেজার? পাগল হয়েচ তুমি?" কালীকেষ্ট বলে: "আমায় ধরবে সামান্য একটা ম্যানেজার? তা হ'লে সাত জন্ম ওকে খনির গর্ভে আগে কয়লা হয়ে জন্মাতে হবে! ধরাধরি নয়, কেবল সন্দেহ করেছে এই মাত্র। আর তা ছাড়া, তুমি তো জানো, কালীকেষ্ট কখনো তেমন কম্ম করে না। সরকারী কয়লা সরাবে কালীকেষ্ট? এতটা কয়লাহারাম হয় নি সে!"

"না—না—তা কি হয়?" আমি সায় দিই।

"ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।"—কালী-কেষ্ট বিবৃতি দেয়: "ডেকে বল্লে, 'কালীকেষ্ট, তোমার কয়লার ব্যাপারে আমি মোটেই খুসি নই। এর মধ্যে গলদ্ আছে—আমার কানে অনেক কথা এসেছে।'

আমি শুনলাম কিন্তু কিছু বল্লাম না। সব্‌সে চুপ্ ভালো ব'লে একটা কথা আছে। বোবার শত্রু নেই, এও আমি জানি। আমি চুপ ক'রে রইলাম। ম্যানেজার নিজেই বলতে লাগলো, 'আমার বিশ্বাস আমাদের কয়লা তুমি অন্যান্য জায়গায় বিক্রী করছ।' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি বল্লাম, 'মশাই, আপনার ওভারসীয়ারকে ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন—'

আমি ওভারহিয়ার করতে থাকি.

'আমার কেনো সাক্ষী সাবুদের দরকার করে না। আমার দৃঢ় ধারণা যে আমাদের কয়লা তুমি অন্য কোথাও পাচার করছ। কেবল তোমাকে হাতে নাতে পাক্‌ড়ানো দরকার। একটু প্রমাণ পেলেই তোমাকে আমি সোজা আদালতে খাড়া করবো, ঠিক জেনে রেখো'।"

"তুমি কী করবে ভেবেছ তা হ'লে?" আমি জি করি।—"আদালতে সোজা হবে?"

"না, আমি একবার সেই ওভারসীয়ারের সঙ্গে কইতে চাই। ম্যানেজার তাকে তলব করতে পা তার আগেই তাকে তৈরী ক'রে রাখা দরকার।" কালীকেষ্ট: "এই পথ দিয়েই সে কাজে যায়—জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

"ঘুষ ঘাস দিয়ে বুঝি—" আমি ইঙ্গিত করি।

'ঘুষ? ঘুষ কেন? আমি কি কোন বে-আই কাজ করেছি যে ঘুষ দিতে যাবো?"—কালীকেষ্ট অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখায়।—"তা ছাড়া, ঘুষ দেওয়াটা বে-আইনি।" সে বলে।

"বিষে বিষক্ষয়।" আমি বাৎলাই—"উপায় কি?"

"রামোঃ! কালীকেষ্ট সে বান্দাই নয়। কোনে অন্যায় কাজ তার কুষ্ঠিতে লেখে না। আর তা ছাড়া কী বল্লে? ঘাসের কথা কী বল্লে? কত কষ্টে যে ঘা যোগাড় করতে হয় তা আমিই জানি। তাতে আমা পাঁঠারই কুলোয় না—তাই থেকে যে আমি তোমার ও সাধের ওভারসীয়ারকে খওয়াতে যাব—"

বল্‌তে বল্‌তে কালীকেষ্ট অদূরে সেই ওভারসীয়ারে ছাতা দেখতে পায়।

"ওহে ওভারসীয়ার, শোনো শোনো। তোমার আমার একটা কথা আছে।" হাঁক পাড়ল ও।

কাছে এল ওভারসীয়ার। "কিসের কথা?"

"আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই। কা অবহেলার চাপ আসবে তোমার ঘাড়ে—আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি।" কালীকেষ্ট বলে।

কাজে অবহেলা! কেজো লোকের নামে এ অভিযোগ! এতে সে বিস্ময়বিমূঢ় না হয়ে পারে না ওভারসীয়ার হাঁ হয়ে যায়।

আমি ওভারহিয়ার করতে থাকি।—"গত কাল দু কয়লা খতিয়ে নাও নি। ম্যানেজার সে জন্য খুব খা হয়েছেন।" কালীকেষ্ট জানায়।

ওভারসীয়ারের হাঁ বুজে আসে। "কেন, কয়ল তো ঠিকই ছিল, কালীকেষ্ট।" সে বলে।

"সে কথা বল্লে তো চলছে না। আমি তো ঠি

আমি জানি। কিন্তু তোমার তো কর্ত্তব্য ছিল র নেওয়া। তুমি তা কর নি, তোমার কোম্পানীর অবহেলা করেছ। আর সেই কথাই ধরেছেন ার।"

ভারসীয়ারের চোয়াল ঝুলে পড়ে। সে কী বল্‌বে পায় না। কিংবা সে যা ভাবে বলতে পারে

আজ তুমি কারখানায় গেলেই ম্যানেজার তোমাকে ন। কালকে কত কয়লা খালাস করেছিলে জিজ্ঞেস করবেন তোমায়। এখন, তুমি তো না যে কত নামিয়েছিলে—অতএব কী মুস্কিলে , বুঝতেই পারছ! কিন্তু যেহেতু তুমি বন্ধু —বিপদে পড় এটা আমি চাই না, গোড়ায় খবর আগে-ভাগেই তোমায় হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি । আমি তোমাকে ছ' টন কয়লা দিয়েছিলাম, মনে । তুমি ম্যানেজারকে বল্‌বে তুমি ছ' টন কয়লা করে খতিয়ে দেখে নিয়েছ। ম্যানেজার আমায় স করলে আমিও বল্‌ব যে হাঁ। বল্‌ব যে তুমি ওজন করে নিয়েছ। তোমার কথায় আমার দেব, বুঝেছ? তা হলেই তোমার আর কোনো হবে না। আমি তোমায় বাঁচিয়ে চলব। নতুন জারের সঙ্গে আমার কেমন দহরম মহরম—জানো

সত্যি, কালীদা, কী বলব তোমায় আমি—!' তুমি যা বাঁচান্ আজ আমায় বাঁচালে—!" ওভারসীয়ার হাঁফ ছেড়ে ভ্রাতৃবৎ হয়ে পড়ে।

"কিছু না—কিছু না! কিছু বলতে হবে না, এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। বন্ধুর কর্ত্তব্য করেছি মাত্র, বেশী আর কি? বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী দেখে না, সেই তো দুঃখ। কেবল কে ক'টা বাড়ী তুলেছে তাই দেখে, আর বুক ফেটে মরে। কিন্তু আমি বলি—" এই বলে আমার দিকে সে 'বঙ্কিম'-দৃষ্টিতে তাকায়—"বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না দেখিলে কে দেখিবে?···কয়লার ব্যবসা করি ব'লে মনটাকে তো আর কয়লার মতো করতে পারি নি ভাই!"

ওর বেশী বলতে হয় না। কালীকেষ্ট-কথামৃত পান করে চাঙ্গা হয়ে থরথর করে কারখানার দিকে পা চালায় ওভারসীয়ার।

"দেখলে তো?" এবার আমাকে সম্বোধন করল সে: "এরা কিরূপ না জেনে বিপদে পড়ে—নিজের চোখেই দেখলে! কি করব, আমাকেই সামলাতে হয়। ওরা মুস্কিল ডেকে আনে আর আমাকে মেটাতে হয়। কি করি—না করে রেহাই কোথায়? জেনেশুনে তো আর বাছাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না! আমাকে ওরা পিতৃতুল্য জ্ঞান করে। আমিও ওদের ঠিক সেই চক্ষে দেখি—পুত্রবৎ মনে করি।···আয় বাবা, আয়।"

এই ব'লে সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, পরহিত-চিকীর্ষু-কালীকেষ্ট পাঁঠা সমভিব্যাহারে নিজের আড়তের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

আধ গাড়ি খড় ফাঁক

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

৩

ছায়ামূর্তিটার দিকে বন্দুক বাগিয়ে আমি হাঁকলুম:
ওখানে?'

'আমি! কমরেড!' পরিচিত গলায় জবাব এল:
টারা সব পলিয়েছে। মিছিমিছি এতক্ষণ ধরে
খাঁজি করলুম।'

আমি লাফিয়ে গেলুম তার কাছে, উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: 'সমস্ত গ্রামখানা তল্লাস করেছ নাকি?'

'প্রত্যেকটা বাগান, প্রত্যেকটা ঘর আমি তন্ন তন্ন করে দেখেছি। কিন্তু মানুষের টিকিটিও খুঁজে পাই নি।'

'তা' এতক্ষণ আমায় কিছু জানাও নি কেন ?' 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' আমার কাঁধ ছুঁয়ে তোৎলামি শুরু করলে : 'এই—এই—মো-মো-মো-মো-মোষ-গরুর জন্য আমার একটা দ দ-দ-দড়ির দরকার ছিল কিনা, তাই। কি চ-চ-চমৎকার, না ? আগে আগে ডা-ডা-ডা-ডাকাত-দের সঙ্গে লড়তে গিয়ে অন্য লোকের জিনিষ নিতুম আমি।'

আনন্দে আটখানা হয়ে আমাকে দড়িটা সে দেখালে।

'শীগ্‌গীর ফেলে দাও', ধমক দিয়ে বল্‌লুম, 'কমাণ্ডারের চোখে পড়লে তোমায় আর আস্ত রাখবেন না।'

'আধ গাড়ি' নিরাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে, কোমরে জড়ানো দড়িটা আস্তে আস্তে খুলে ফেল্‌লে। আমি হুইসল্ বাজিয়ে দিতেই ঝিলিক দিয়ে উঠলো অনেকগুলো টর্চের আলো। আমাদের কমরেড্‌রা চারদিক্ থেকে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

'মেজো ভাই !' কাঁদো কাঁদো গলায় 'আধ গাড়ি' আমায় চুপি চুপি বললে, 'এই দেখো, দড়িটা ফেলে দিয়েছি আমি—'

ফেরবার সময় 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' চললো আমার ঠিক পেছনে পেছনে। কাপ্ ভেঙে ফেলে শাস্তি পাবার ভয়ে মুহ্যমান শিশুর মতন তখন তার অবস্থা। বুঝতে পেরে তার কাণে কাণে বললুম, কমাণ্ডারের কাছে তার কথাটা আমি তুলবো না। শান্ত হয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে পাইপ টা গুঁজে দিলে আমার হাতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম : 'লোকের কাছ থেকে জিনিষ চুরি করা আমাদের উচিত নয় কেন, জানো ?'

'আমরা বিপ্লবী সৈন্য ব'লে।'

তার পর এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে 'আধ গাড়ি খড় ফাঁক' হঠাৎ অন্তরঙ্গ সুরে ব'লে উঠলো : 'আচ্ছা কম্‌রেড্, বিপ্লব ক'রে আমরা কি লাভ করতে পারি না কিছু ?'

'বিপ্লব অনেক ভালো করবে আমাদের আর অন্য অনেকের অবস্থা।' আমি বল্‌লুম। 'আক্রমণকারীদের আমাদের দেশ থেকে যদি তাড়াতে পারা যায়, কোটি কোটি লোক তা হলে সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারবে। তার থেকে আমাদেরও কি লাভ হবে না ?'

'নিশ্চয়ই। শান্তিতে যদি আমরা বাঁচতে ... করতে পারি, সেই সঙ্গে আমরাও তা হলে—'

'তা হলে সে কী গৌরবের, সুখের দিন ... আমাদের ! 'মাথা উঁচু ক'রে চল্‌বে আমাদের ... আর নাতিরা।'

তার পর থেকে সে একজন অদম্য উৎসাহী ... যোদ্ধা হ'য়ে উঠলো।

ঘর-সংসারের কথা নিয়ে আর তার দুশ্চিন্তা ছিল ... সাগ্রহে পড়া শিখতে শুরু ক'রে দিলে সে। ... দিন একটা ক'রে কথা সে মুখস্থ করতো। ক্রমে ... কথা তার শেখা হয়ে গেল।

সে রাতটা ছিল চমৎকার। ঢালা জ্যোৎস্নায় চা... ভেসে যাচ্ছিলো। মায়াময় হয়ে উঠেছিল দি... কোলে বনরেখা।

কিন্তু সে সব দৃশ্য উপভোগ করবার সময় ... আমাদের নয়।

একটা রেল-রাস্তা আর একখানা ট্রেন ধ্বংস ... দেবার ভার পড়েছে আমাদের ওপর। অথচ আ... হাতে ডিনামাইট্ বা কোন আধুনিক যন্ত্রপাতিও ... তাই আমরা ফন্দী করলুম, রেল-রাস্তাটার খানিকটা ... ক'রে দেব, তার পর মিলিটারি ট্রেনখানা লাইন... হয়ে পড়লে তাকে আক্রমণ করা হবে।

খুব সন্তর্পণে লাইন তুলে ফেলতে লাগলুম আ... কিন্তু লাইনের একটা যোড়ের মুখ খুলবার সময় ... ঠঙ্ ক'রে আওয়াজ হয়ে পড়লো। নিস্তব্ধ, গভীর ... রাত্তে শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে রাইফেল গর্জ্জন ... উঠলো ! তার পর অতি দ্রুত গুলিবর্ষণ !

'শুয়ে পড়ো !'

ঠিক সেই সময় মেশিনগানের শব্দও আমাদের ... গেল। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ক'রে আমাদের চারদিকে ... পড়তে লাগ্‌লো বুলেট। মিনিট দশেক পরে ... থামলো। লাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন আ... শব্দ পাওয়া গেল।

...আমাদের দলের কমাণ্ডার জানতেন, এ অবস্থায় কি ... উচিত। দু'টো বোমা একসঙ্গে বেঁধে তিনি লাইনের ...রেখে দিলেন।

তার পর আমাদের সবাইকে ছুটে চলে আসতে ...লেন।

আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে হাজির হলুম কাছের একটা ...স্থানে, এবং এসেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ... গাড়ি খড় ফাঁক' পাইপ মুখে দিয়ে এমন ভাবে ...য়ে রইল যেন কিছুই হয় নি।

আমাদের দলপতি চাপা, উত্তেজিত গলায় বললেন : ...গির মাথা নীচু ক'রে শুয়ে পড়ো !'

'আধ গাড়ি' বিড় বিড় ক'রে বললে, 'বুলেটের চোখ ... শুধু খারাপ লোকদের ওপর।'

মিলিটারি ট্রেনটা হুড়মুড় ক'রে লাইনের সেই ...গায় এসে গেল। আর আমাদের বোমাগুলো বজ্র-...াদে ফাটবার পরই ট্রেনটা ধোঁয়া আর ধূলোর মধ্যে ...জমিতে উল্টে পড়লো।

আমাদের কুড়িটা গলা থেকে একই শব্দ ফুটলো : ...গেছে !'

আবার নীরবতা।

তার পর কমাণ্ডারের নির্দ্দেশ আর বিপুল জয়ধ্বনি। ... গোলমালের মধ্যে একটা করুণ সুর ভেসে এল :

'রাজধানী ছেড়ে যবে চলে যাই আমরা...'

গোরস্থান থেকে আমরা বেরিয়ে ছুটলুম ভাঙা গাড়ি-...ার দিকে। তৎক্ষণাৎ আবার ভীষণ ভাবে মেশিন...নের অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেল। দেখলুম ছুটছে 'আধ গাড়ি'। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করতে করতে, টলতে টলতে সে ছুটে চলেছে। আমরা এগিয়ে চললুম তার দিকে। হঠাৎ সামনে ছুটে এল একদল জাপানী অশ্বারোহী। আমাদের একটু পেছিয়ে আসতে হ'ল। 'আধ গাড়ি' তখনো পাগলের মতন জাপানীদের ওপর গুলি চালাচ্ছে।

তার পর তার কাছে এসে পড়লুম। 'কোথায় গুলি লেগেছে, কম্‌রেড ? হেঁটে যেতে পারবে ?'

'পায়ে।' সে বললে। 'কিন্তু আমি পালিয়ে যেতে চাই না। শয়তানদের শেষ করতে হবে।'

সেই আহত শরীরেও সে কিছুতেই ফিরে আসতে চাইলে না। আমি তাকে জোর ক'রে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলুম দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। যে করেই হোক তাকে ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনতে হবে, বাঁচাতে হবে। এই তখন আমার একমাত্র চিন্তা। জাপানী অশ্বারোহীদের আক্রমণ, গুলি কিংবা পিঠের ভার সমস্তই যেন ভুলে গেলুম আমি। শুধু মনে হতে লাগলো— আমি ছুটে পালাচ্ছি আর পালাতে আমাকে হবেই......

সেই ছুটে আসবার সময় আরো একটা গুলি এসে লাগলো 'আধ গাড়ি'র গায়ে। সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো।

কোন রকমে তাঁবুতে এসে পৌঁছে, তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হ'ল। তার পর স্ট্রেচারে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আমাদের নিরাপদ হাসপাতালে। জ্বরের ঘোরে সে তখন বিড়বিড় করে বলছিল : 'ডা, ডা, ডা— আমার বলদ, আমার হল্‌দে বলদ—ডা, ডা, ডা......'*

* ইয়াও শুয়ে-ইনের গল্প

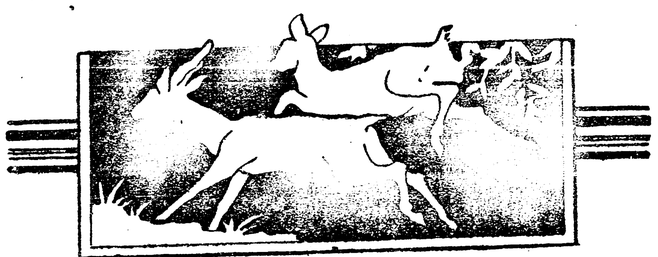

বাংলা সাহিত্যের গল্প

চণ্ডীচরণ ও রাজীবলোচন

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ.

প্রাচীন বাংলা গদ্য-লেখকদের মধ্যে চণ্ডীচরণ মুন্সী একজন। এঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এঁর 'তোতা ইতিহাস' একটি অনুবাদ গ্রন্থ। আরব্য-উপন্যাসের পরিকল্পনায় বইটি লেখা হয়। অনেকের মতে পারসী ভাষায় লিখিত "তুতা নামার" অনুবাদ এটি। কিন্তু সংস্কৃতেও যে এ ধরণের গল্প প্রচলিত ছিল না এমন নয়। 'শুক সপ্ততি' বা শুকপাখীর মুখ দিয়ে বলা সত্তরটি গল্প এর উদাহরণ। "তোতা ইতিহাসে"ও গল্পের কথক হ'চ্ছে একটি বিশিষ্ট তোতাপাখী।

"তোতা ইতিহাসের" ১ম সংস্করণের শিরোনামা হ'চ্ছে এই : তোতা ইতিহাস। বাঙ্গালা ভাষাতে। শ্রীচণ্ডীচরণ মুনশীতে রচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫।

বইটিতে ৩৪টি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলির প্রস্তাবনা হিসেবে এই কথা বলা যায় : একটি মহিলা তার স্বামীর অনুপস্থিতির সময় একটা অন্যায় কাজ করবার মতলব করে, এবং তার স্বামীর একটি শিক্ষিত তোতা পাখীর কাছে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তোতা পাখী তার ইচ্ছার বিরোধিতা না ক'রে তাকে ৩৪টি গল্প বলে ৩৪ দিন ভুলিয়ে রাখে। তার পর তার স্বামী এসে পড়ে। মহিলাটিরও সে কাজ করবার সুযোগ নষ্ট হয়।

নীচে একদিনের ঘটনার খানিকটা অংশ দেওয়া গেল :

"যখন দিবাগত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খাজেস্তা (ঐ মহিলাটি) বহুমূল্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া ··শুকপক্ষির সমীপে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। শুক কহিলেক·····যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দ্রাক্ষ্য করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদ্রূপ ভাবনা করিও (;) তবে ··· অবশ্য পা খাজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তে রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ।"

গল্প আরম্ভ হ'ল :

"শুক উত্তর করিল যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা ও এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্নব্যঞ্জন এবং প্রকার মদ্যমাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া ঐ রাজপুত্র, মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদিগকে স্থানে উপস্থিত করিয়া সেই সব উত্তম দ্রব্য তাঁহারদি ভোজন করাইতেছিলেন (.) ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সেই একজন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজ প্রধানেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথা হইতে আসিয়াছ (?) কি কার্য্য কর। (?) ব্যক্তি উত্তর করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে ব্যাঘ্র ধরিতে পারি (;) ইহা ব্যতিরেক আর আর শিল্পকর্ম্ম জ্ঞাত আছি (.) আর তাঁর এমত মারিতে যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া হয় এবং খজেন্দর নাম। একজন ধনবান আছে আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম (.) খজেন্দর আমার কিছু গুণ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন অতএব আমি তাঁহার চাকুরী ত্যাগ করিয়া মহা তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকুরী ক আসিয়াছি। মহারাজ তেবরস্তান এই কথা রাজদরবারের' লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর। পরে কর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চা নিযুক্ত করিলেন।"

এই ভাবে গল্প করতে করতে রাত শেষ হ'য়ে গে

"তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করি

প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল (;) এ কারণ সেই দিবস স্তার যাওন (যাওয়া) হইল না। খাজেস্তা সমস্ত এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রত ছিলেন (;) অতএব লের বিছানাতে শয়ন করিলেন।"

গল্পগুলি একটির পর একটি ক'রে ঠিক চৌত্রিশ দিন ছে। গল্পগুলির মধ্যে ভাবের বা ভাষার আড়ম্বর একটুও।

কারও কারও মতে চণ্ডীচরণ সংস্কৃত থেকে "ভাগবত ও" অনুবাদ করেন।

রাজীবলোচনের জীবনী বলতেও আমরা বিশেষ জানি না। অনেকের ধারণা তিনি কৃষ্ণচন্দ্র রাজ-ায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ১৮০৫ সনে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী রচনা করেন। প্রথম রণে বইটির শিরোনামা ছিল এই :

tory of Raja Krishnu Chundru Roy—
রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। শ্রীযুত রাজীবলোচন াপাধ্যায়ের রচিতং। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ ার অধিকার নবদ্বীপ সমাজ। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে করিব বিস্তার। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫।"

অনেকের মতে বইটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি নির্ভর-যোগ্য ইতিহাস। কিন্তু আসলে বইটির অনেকাংশেই লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বলেই মনে হয়। জীবনীটির মধ্যে মাঝে মাঝে গল্প বলার বা উপকথা সৃষ্টি করার বেশ একটি চেষ্টা রয়েছে। এই কৃষ্ণচন্দ্রকে আমরা অনেকেই চিনি। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সময়ে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হ'য়েছিল ইনিও তার মধ্যে ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সময় নদীয়ার রাজবংশ দেনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল; কিন্তু মৃত্যুর সময় কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধিমত্তা-বলে তিনি তাঁর রাজত্বের ভোল বদলে দিয়ে গিয়েছিলেন। গুণীর আদর জানতেন ব'লে এঁর সুনাম ছিল। এঁরই সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র; এঁরই বিদূষক ছিলেন গোপাল ভাঁড়।

রাজীবলোচনের ভাষার জড়তা স্বীকার করেও এ কথা বলা যায় যে জীবনীর একঘেয়েমি নেই এখানে। যতটা পারেন সরস করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এখানে গল্পাংশটাই বড় কথা।

সুয়েজ খাল

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্ এ

মরুভূমির দেশ। দিনের বেলায় রোদ্দুরে চোখ সে যায়, বালির ওপর সেই রোদ্দুর প'ড়ে ঝিকমিকিয়ে । চাঁদনি রাতে ধবধবে জ্যোৎস্নায় দূর থেকে দেখলে হয় যেন বরফের দেশ। থমথমে দুপুরে আকাশ যাঝে কালো হ'য়ে আসে, তারপর ছুটতে থাকে র ঝড়—সে ঝড়ে ধারে পাশে সব কিছু পড়ে বালি । এমনি দেশের পাশ দিয়ে মানুষ হাতে কোদাল খাল কেটে দুই সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়েছে। যেমন যেন খাল নয়,—৯৯ মাইল লম্বা, ১৯৮ ফুট চওড়া বিরাট । ছোটখাট নদী বললেও চলে। দু'খানা সমুদ্র-জাহাজ এ খালের ভেতর দিয়ে অনায়াসে পাশাপাশি যেতে পারে। কথায় বলে কোথকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সুয়েজ খালের পক্ষে এ কথা যত সত্যি তত বুঝি আর কিছুতে নয়।

এসিয়াকে ইউরোপের বহু কাছে এনে দিয়েছে এই খাল। দু' মহাদেশের মধ্যে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ, যানবাহনের ক্ষিপ্রতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সব কিছু এত দিন সম্ভব হ'য়ে এসেছে এই খালটির জোরে। শুধু তাই নয়, এ খাল যার হাতে থেকেছে সেই হয়েছে পৃথিবীতে শক্তিশালী ক্ষমতাগুলির অন্যতম। অবশ্যি এই বিমানযুগে যুদ্ধবিগ্রহের দিক্ থেকে আগেকার মত প্রয়োজনীয়তা সুয়েজ খালের আর নেই। কিন্তু এসিয়াতে

প্রভাব বিস্তার করা, এসিয়ার বাজারে জিনিষপত্র চালান দেওয়া—এ সব ব্যাপারে এখনও ইউরোপের কাছে এ খাল অপরিহার্য।

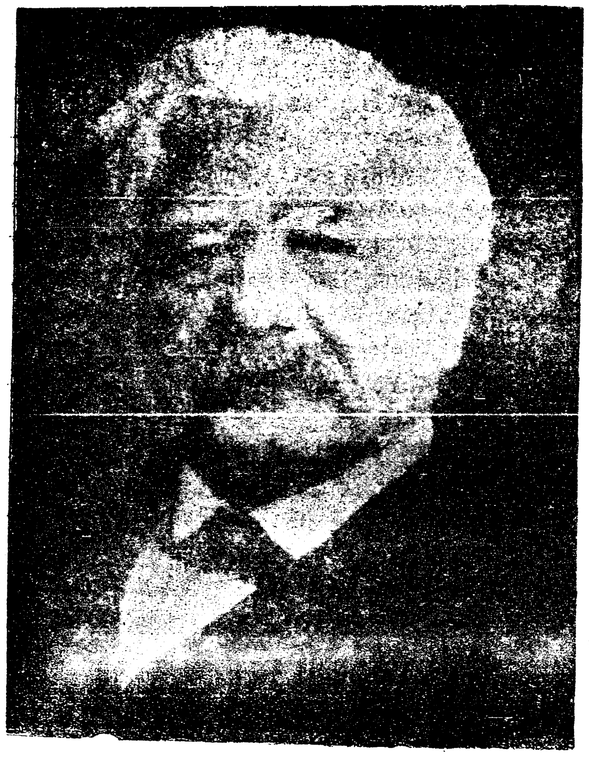

ডি লেসেপ্‌স্—ইনিই সুয়েজ খাল কেটেছিলেন।

১৪৯৮ সনে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসবার পর ইউরোপ থেকে জলপথে এসিয়ায় আসা সম্ভব হ'ল বটে কিন্তু সময়ের দিক থেকে তাতে সুবিধে হ'ল না। এ পথে পূর্ব-ইউরোপ থেকে এসিয়ায় আসতে লেগে যেত প্রায় ছ' মাস। কাজেই কি করে ইউরোপ থেকে এসিয়ায় যাতয়াতের পথটি আরও ছোট করা যায় তাই নিয়ে বহুদিন ধরে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর বেশ মন দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে মিশর এবং পশ্চিম আরবের মধ্যে যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থল-যোজক ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগর থেকে ... করে রেখেছে তার মধ্যে দিয়ে খাল কেটে দু'টি ... যদি মিলিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে এসিয়া ... ইউরোপে যাবার পথ হয়ে যায় অনেক সহজ ও ... কাজে হয়েছেও তাই। শোনা যায় আরব-বাদশা ... হারুন্-অল্-রশিদ নাকি প্রথমে এই খাল ... মতলব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পারিষদেরা তাঁকে ... দেয় যে তা হ'লে আরব দেশের উপকূল ... বাইজেনটাইন নৌবলের আয়ত্তের মধ্যে এসে ... তাই তিনি তাঁর মতলব নিয়ে আর বেশী এগোন ... এর পর ভেনিসের নাবিকেরা এ কাজ করতে ... তুর্কীরা তাদের বাধা দেয়। নেপোলিয়নও দু'টি ... যুক্ত করবার জন্যে তোড়জোড় করেছিলেন। ... আদেশে এ প্রদেশের জরীপ পর্যন্ত হ'য়ে গিয়েছি ... কিন্তু তারপর কাজ আর অগ্রসর হয় নি।

সমুদ্রবিহারীদের স্বপ্ন সফল হ'ল শেষ পর্যন্ত ... খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর ডি লেসেপ্‌স্ নামে একজন ... ভদ্রলোক মিশরের সুলতানকে রাজী ক'রে সত্যি ... খাল কেটে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরকে ... করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসিয়ায় ফরাসী, ... প্রভৃতি জাতিগুলির বাণিজ্য শুধু যে বেড়ে গিয়েছে তাই নয়, তারা এসিয়ার নানা দেশে রাজনৈতিক আধিপত্যের চেষ্টা করতেও ত্রুটি করে নি। ভারতের আধিপত্য নিয়ে তো ফরাসী এবং ইংরেজদের মধ্যে ধরে যুদ্ধবিগ্রহই চলেছিল! তা ছাড়া আফ্রিকার দু'জাতির অধিকারভুক্ত দেশের সংখ্যা নেহাৎ ছিল না। কিন্তু যে স্থানের মধ্যে দিয়ে খাল ... কথা তা ছিল মিশরের অধিকারে। সুতরাং ... রাজী না ক'রে এবং তাকে এই খালের বিশেষ অধি... না দিয়ে খাল কাটার কথা উঠতেই পারতো না। ... লেসেপ্‌স্ ছিলেন চতুর যুবক। তিনি মিশরের ... ইসমাইলকে নানা যুক্তি দেখালেন এবং খাল কাটা ... ইসমাইল সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ পাবেন বলে অ... করলেন। ইসমাইলও খুসী হ'য়ে খাল খননে ... দিলেন।

তারপর নিপুণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত অধ্যবসায়ের

...লেসেপ্‌স্ খাল কেটে ফেলেন। আজ যদি মিশর ...খালের সম্পূর্ণ মালিক হ'ত তা হ'লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ...গুলির মধ্যে যে তার স্থান থাকত তাতে কেন সন্দেহই ...। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান ইসমাইলের অদূর-...ার ফলে তা হ'ল না। ইসমাইল এমন জাঁকজমকে ...তে ভালবাসতেন এবং তিনি এত অমিতব্যয়ী ছিলেন ...কছুদিনের মাধ্যেই অত্যধিক খরচের ফলে মিশরের ...ষাগার শূন্য হ'য়ে। এদিকে টাকা না হ'লে ...ানের চলে না। তখন কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ ...যে সুয়েজ খালের অংশগুলো তাঁরই নামে রয়েছে ...তিনি সেগুলো বিক্রী করে ফেললেই আবার প্রচুর ...র মালিক হ'তে পারেন। ...য়ান্তর না দেখে ইসমাইল ...ই রাজী হ'য়ে গেলেন। ...ইংলণ্ডের মন্ত্রী ডিজরেইলি এ ...াগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। ...া জানতেন যে ইংলণ্ড যদি ...গুলি কিনে ফেলে তা হ'লে ...্যাতে সেগুলি থেকে যে তার ... প্রচুর লাভই হবে তা নয়, ...মস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকাকে ... রাখতে পারবে। তাঁর অনু-... যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে ...ত হ'য়েছে তা আমরা জানি। ...শ লক্ষ পাউণ্ড খরচ ক'রে ...রেইলি সুয়েজ খালের অংশ-... ইসমাইলের কাছ থেকে ...ন নেন। আজ সেগুলির দর ...ড়িয়েছে এর পঁচিশ গুণ! তিনি যে মূল্য দিয়ে ...গুলি কিনেছিলেন এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ...র পনের গুণ লাভ করেছেন। তা ছাড়া এসিয়া এবং ...ফ্রিকাতে ব্রিটিশ শক্তি কি পরিমাণ বেড়েছে তা তো ...কলেই জানে। সুয়েজ খালের অংশগুলি ইসমাইলের ...ছ থেকে কিনে নিতে ডিজরেইলি এত ব্যগ্র হ'য়ে ...ঠেছিলেন যে ব্রিটিশ পার্ল্যামেণ্টের মতামতের ...পেক্ষা পর্য্যন্ত তিনি করেন নি; ধনকুবের রথস্-...ল্ডের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিজের নামে সেগুলি কিনে ফেলেন। পরে অবশ্য এগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি রূপেই পরিগণিত হয়েছে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে সুয়েজ খালের ইতিহাস।

এ খালের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের কথা আগেই বলেছি। বর্তমানে এর গভীরতা হচ্ছে ৩৬ ফুটেরও বেশী। সুয়েজ খালের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন পর্য্যন্ত রয়েছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে। খাল রক্ষা করবার জন্যে ইংলণ্ড মিশরে সৈন্য রেখেছে। যে সব জাহাজ খাল দিয়ে যাতায়াত করে তারা সকলেই শুল্ক দিয়ে থাকে। সেই শুল্ক থেকে খালটিকে ঠিক মত রাখার জন্যে নানা খরচ করা হয়। খাল থেকে অনবরত বালি খুঁড়ে তুলে ফেলা

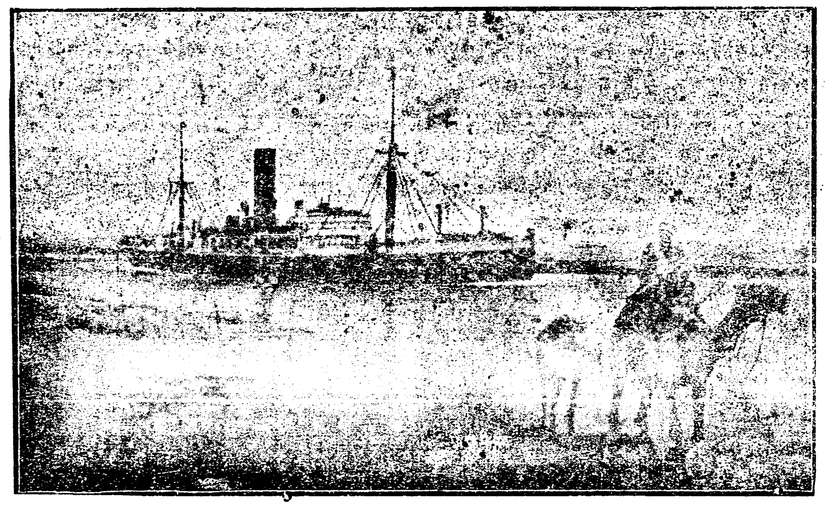

সুয়েজ খালের সাধারণ দৃশ্য

হয়। তা না করলে চার পাশের মরুভূমি থেকে অনবরত বালি উড়ে এসে কবে খালটিকে বুজিয়ে দিত! রাত্রে খালের প্রত্যেক পাশে উজ্জ্বল আলোর বন্দোবস্ত করা আছে। এরই জন্যে সঙ্কীর্ণ হ'লেও জাহাজে জাহাজে এখানে কখনও ঠোকাঠুকি হয় না। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জাতির জাহাজকে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও, এর মধ্যে দিয়ে নিরাপদে যেতে দেওয়া উচিত।

আগেই বলেছি যে সুয়েজ খালের অংশগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ রয়েছে ইংলণ্ডের হাতে। ফ্রান্সেরও কিছু

TIGHT BINDING

কিছু অংশ আছে। তা ছাড়া ইংলণ্ড মেনে নিয়েছে যে এ খালের প্রয়োজনীয়তা মিশরেরই সব চেয়ে বেশী এবং সময় হ'লেই মিশরের হাতে খাল রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে। ইংলণ্ড এবং মিশর এই দু' দেশের মধ্যে সুয়েজ খাল নিয়ে যে চুক্তি হ'য়েছিল তা'তে বলা হয়েছে যে ১৯৬৭ সনের পর থেকে সুয়েজ খাল মিশরের সম্পূর্ণ অধিকারে আসবে, ব্রিটিশের তাতে কোন দখলু থাকবে না। মিশর কিন্তু বর্তমানে তত্দিন অপেক্ষা করতে রাজী নয়। সে দেশের রাজনীতিজ্ঞেরা আজকাল বলছেন যে সন্ধির সময় মিশর ও পৃথিবীর যা অবস্থা ছিল তা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে খালের ভার মিশরের হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত। কিছুদিন হ'ল যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মিশরের রাজদূত স্পষ্টই বলেছেন যে সামরিক প্রয়োজনীয়তার দিক্ থেকে সুয়েজ খালের আগেকার দাম আর নেই। অতএব ব্রিটিশ শক্তি বোধ হয় এ খালের অধিকার ত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করবেন না। ইংলণ্ড কিন্তু ১৯৬৭ সালের আগে ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ।

এসিয়ার বাণিজ্য ইউরোপের যে দেশ হাতে রা... চাইবে তার পক্ষে এখনও সুয়েজ খালের আধিপত্য... আবশ্যক। আর যতদিন সুয়েজ খালের ওপর ব্রি... অধিকার থাকবে ততদিন মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা... হবে অসম্ভব। বর্তমানে মিশরে ব্রিটিশ শক্তির ... যে বিরুদ্ধ মনোভাব চলেছে তার মূলে রয়েছে ... কথা।

সুয়েজ খাল থেকে এসিয়ার লাভ আর ক্ষতি ... ঘটেছে। এই ক্ষীণ জলপথ নির্মাণের সঙ্গে ... এসিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশ হয়ে পড়েছে ... সাম্রাজ্যবাদের চাপে অস্থির; আবার দূরকে ... টেনে এনে এই জলধারা এসিয়ার কম উপকার করে... ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উদার মনোভাব সুয়েজ... এসিয়ার দিকে দিকে বহন করে এনেছে। আ... লাভ আর ক্ষতি বিবেচনা করে আমরা এসি... ইউরোপের এই মিলনের পথকে মিলনের ... বলেই চিন্‌ব, শত্রুতার বা অত্যাচারের পথ ... জানব না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

উড়ন্ত ল্যাবোরেটরী

ভূগোলে তোমরা 'বায়ুমণ্ডলের' কথা পড়েছ। বায়ুমণ্ডল বেশ একটি গাল-ভরা কথা—আসলে ও জিনিষটি হচ্ছে বাতাসের পর্দা বা আবরণ—যা নাকি প্রায় দু'শ' মাইল পুরু, এবং ঠিক কম্বলের মত আমাদের পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই দু'শ' মাইল বাতাসের পর্দা পার হয়ে যেতে পারলে যে রাজ্যে পৌছান যেত বৈজ্ঞানিকের ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে মহাশূন্য। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—"পার হয়ে পৃথিবীর সীমা।"

কিন্তু শুনতে যতটা সহজ আসল ব্যাপারটি ... তা নয়। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উঁচু যে জায়... এভারেষ্টের চুড়ো, তা হচ্ছে মাত্র ৫ মাইল। পৃ... পিঠ ছেড়ে ঐ পাঁচ মাইল উঠতেই মানুষকে হি... খেয়ে যেতে হয়, ২০০ মাইল উঠে যাওয়ার কথা ...

...ই কঠিন। অবশ্যি এরোপ্লেনে এবং বেলুনে চড়ে ... এভারেষ্টের উপরেও কয়েক মাইল উঠেছে, কিন্তু ...বিক অবস্থায় নয়। বিশেষ ভাবে তৈরী বলের ...একটি ঘরে বসে চারদিক্ 'এয়ার টাইট্' ক'রে ...ং তার মধ্যে এক ফোঁটা বাইরের বাতাস যাতে ...ত বা বেরোতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে, ভিতরে ...ক্ত পরিমাণ অক্সিজেন ভরে, কৃত্রিম উপায়ে তাপ ...ন্ত্রিত ক'রে এবং আরও হরেক রকম সাজসরঞ্জাম ... সেই সুরক্ষিত ঘর বা বল বেলুনের সঙ্গে বেঁধে তবেই ...সব অভিযান সম্ভব হয়েছে।

...যাঁরা এই সব অদ্ভুত অভিযানে অগ্রসর হয়েছেন ...র বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিক। আব্‌হাওয়া সম্বন্ধে ...বণার জন্যই তাঁরা ঐ সব বিপদসঙ্কুল কাজে এগিয়ে ...ন। তোমরা নিশ্চয়ই জান আমাদের ঠিক মাথার ... যে বায়ুমণ্ডলকে আমরা দেখি ডাঙ্গা থেকে পাঁচ ...া উঠলে বায়ুমণ্ডলের আর সে চেহারা থাকে না। ...ও খানিকটা উপরে উঠলে তার রূপ আরও বদলে ...। বায়ুমণ্ডলের সেই উপরকার অংশকে বৈজ্ঞানিকেরা ...ন 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' এবং এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে ...র আগ্রহ আজও অসীম।

...অবশ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ...জ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই অনেক নতুন নতুন তথ্য বার ...রেছেন কিন্তু আরও ঢের বেশী আছে বাকি; কাজেই ...জ্ঞানিকদেরও যেন আর বিশ্রাম নেই। স্ট্র্যাটো...স্ফিয়ারের একটি বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে সেখানকার অদ্ভুত ...আলো—'কস্‌মিক্ রে', যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ..."ব্যোম-রশ্মি" বা "আকাশ-রশ্মি"। এই রশ্মি আকাশ ...রাজ্যের এক মহারহস্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যদি ... রহস্য সম্পূর্ণ রূপে মানুষের আয়ত্তে আসে তবে তা ...কে শুধু যে সৃষ্টির এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত বহু ব্যাপারের ...কারণই জানা যাবে তাই নয়—এমন অনেক আশ্চর্য্য ...আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটানো যাবে যা এখন হয়তো কল্পনাই ...করা যায় না।

...কস্‌মিক্ রে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক ...গবেষণা হয়েছে। আমাদের দেশেরও অনেক বৈজ্ঞানিক ... সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু জানবার আছে এখনও অনেক। এই গবেষণায় মস্ত বাধা হচ্ছে—কস্‌মিক্ রে সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের খুব উপরের দিকে থাকে, ডাঙ্গা থেকে অনেকখানি উপরে যেতে না পারলে তার নমুনা সংগ্রহ করা যায় না। আর দূর থেকে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করার চাইতে কাছে গিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করতে পারলে যে ফল পাওয়া যাবে অনেক বেশী এ তো সহজেই বোঝা যায়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল ঐ ভাবেই পরীক্ষা করার চেষ্টা করছেন। পিকার্ড সাহেবের বিখ্যাত বেলুন-অভিযানের কথা তো তোমরা রামধনুতেই পড়েছ!

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ার দু'জন বৈজ্ঞানিক—ডক্টর য়্যাণ্ডারসন্ ও ডক্টর ব্রোড্ কস্‌মিক্ রে নিয়ে গবেষণা করার জন্য এক নতুন ব্যবস্থা করেছেন। এই মহাযুদ্ধে নানা জিনিষের সঙ্গে বিমান-শিল্পেরও অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে তা তোমরা জান। আমেরিকান্‌রা এমন সব বোমারু বিমান তৈরী করেছে যা নাকি আকাশের অতি উচ্চ স্তরে অতি দ্রুত বেগে উঠে যেতে পারে, এবং সঙ্গে যথেষ্ট ওজনও বয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া এগুলি এমন ভাবে তৈরী যে সেই উঁচু আকাশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, হাল্কা চাপ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক অসুবিধা অনায়াসে সহ্য করতে পারে। ঐ বৈজ্ঞানিক দু'জন এই ধরণের একখানি বোমারু বিমানকে তাঁদের পরীক্ষাগারে পরিণত ক'রে নিয়েছেন। বিমানের মধ্যে নানা রকম যন্ত্রপাতি, ফটো তোলার ক্যামেরা, এবং ল্যাবোরেটরীর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম বসিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত সাজসরঞ্জামের ওজন কম ক'রে ধরলেও আশী মণের কম হবে না। তা ছাড়া উঁচু আকাশের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে বৈজ্ঞানিকদের আত্মরক্ষা করার যাবতীয় বন্দোবস্তও তার মধ্যে করা হয়েছে।

এই উড়ন্ত ল্যাবোরেটরী নিয়ে তাঁরা উর্দ্ধলোকে উঠে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার রাজ্যের—বিশেষ ক'রে কস্‌মিক্ রে সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা করেছেন। আকাশের কোন্ স্তরে কি পরিমাণ কস্‌মিক্ রে পাওয়া যেতে পারে তার মাপ-ঝোঁক করেছেন, কস্‌মিক্ রে সম্বন্ধীয় নানা রকম ফটোগ্রাফ্ নিতেও কসুর করেন নি। মহাশূন্যে কত জ্যোতিষ্ক পদার্থ—ছোট বড় উল্কাপিণ্ড ভীম বেগে ছুটে

TIGHT BINDING

বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কস্‌মিক্ রে'র সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে, ফলে হয়তো দু'টিই ভেঙ্গেচুরে যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই রকম সংঘর্ষের ফলে যে অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো বা 'বস্তুকণার' সৃষ্টি হয় তা নাকি পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে পরম মূল্যবান্। সৃষ্টির অনেক রহস্যই নাকি তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। য়্যাণ্ডারসন্ ও ব্রোড সাহেব এ ধরণের নমুনাও অনেক সংগ্রহ করেছেন। ডাঙ্গা থেকে ৪২ হাজার ফুট অর্থাৎ ৮ মাইল ওপরকার কস্‌মিক্ রে'র নানা কাণ্ড তাঁদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন শীগ্‌গিরই তাঁরা হয়তো এমন ব্যবস্থা করতে পারবেন যার ফলে তাঁরা ডাঙ্গা থেকে এক লক্ষ ফুটেরও উপর অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মাইল উপরকার বাতাসে গিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারবেন। এ কাজ অবশ্য বোমারু এরোপ্লেন দিয়েও হবে না; এর জন্য দরকার হবে এক সঙ্গে যোড়া কয়েকটি বেলুনের। পরীক্ষাগার থাকবে তারই সঙ্গে বাঁধা। সেই নতুন রাজ্যের কস্‌মিক্ রে আবার কোন্ নতুন রহস্যের সন্ধান দেবে কে জানে?

জাল প্রতাপচাঁদ

তোমরা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর বিখ্যাত মামলার গল্প বোধ হয় সকলেই শুনেছ। ঢাকার কাছে ভাওয়াল ব'লে একটা জায়গা আছে, সেখানকার মেজ জমিদার (মেজ কুমার) ছিলেন কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে দার্জ্জিলীং সহরে তাঁর মৃত্যু হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতদেহ পোড়াবার জন্য শ্মশানে নিয়ে যায় এবং সেই শ্মশানে গিয়ে সুরু হয় দারুণ ঝড়বৃষ্টি। ফলে খানিকক্ষণের জন্য মৃতদেহ সৎকার বন্ধ রাখা হয়। এর পর মৃতদেহ সৎকার ক'রে তারা বাড়ী ফিরে আসে।

এই ঘটনার প্রায় ১২ বছর পরে হঠাৎ ঢাকায় এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন এবং নিজেকে 'ভাওয়ালের সেই মৃত মেজ কুমার ব'লে দাবী জানালেন। শোনা গেল, দার্জ্জিলীং এর শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের আগে যখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল তখন নাকি একদল নাগা সন্ন্যাসী সেখানে অপেক্ষা করছিলেন; তাঁরা বুঝতে পা যে কুমারের আসলে সম্পূর্ণ মৃত্যু হয় নি—তাঁরা দেহ সরিয়ে নিয়ে এসে নানা প্রক্রিয়ার পর তা'তে সঞ্চার করেন, তার পর তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। মেজ কুমারও সন্ন্যাসীদের কাছে দীক্ষা তাদের সঙ্গে এতদিন নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন পূর্ব্বস্মৃতি তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এতদিন এইবার তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে দেশের সর্ব্বত্র প্রচণ্ড পড়ে গেল। কুমারের বন্ধুবান্ধব এবং অনেক নি আত্মীয় সন্ন্যাসীকে কুমার ব'লে চিনতে পারলেন; কেউ কেউ আবার বল্লেন, 'না, এ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই জুয়াচোর, সম্পত্তির লোভে নিজেকে কুমার ব'লে দিচ্ছে। মরা মানুষ কি আবার কখনও দার্জ্জিলীং-এ তো কবে তাঁকে পুড়িয়ে ছাই করে হয়েছে!' এই বিপক্ষ দলের মধ্যে কুমারের স্ত্রী বিভাবতীও ছিলেন একজন।

তারপর সুরু হ'ল মামলা। এত বড় মামলা এ আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ দিন—বছরে বছর ধরে চল্‌ল সেই মামলা। নানা সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ঢাকার বিচারক রায় দিলেন—সন্ন্যাসী মিছে বলছেন না। প্রকৃতই তিনি কুমার। তাঁকে সম্পত্তির অংশ দিয়ে দেওয়া হোক্। বিপক্ষ দল হাইকো আপীল করল। সেখানেও হ'ল সন্ন্যাসীর জয়। প্রিভী কাউন্সিল। সেখানকার বিচারকেরাও প্রমাণ ঘেঁটে সন্ন্যাসীরই অনুকূলে রায় দিলেন। লোক—ভাওয়ালের প্রজারা নিঃসন্দেহ হ'ল—সন্ন্যা তাদের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ।

কিন্তু এই মামলা শেষ হ'তে বহু বছর গেল। সন্ন্যাসী যখন প্রথম ফিরে আসেন তখনও বয়স খুব বেশী হয় নি, কিন্তু মামলা যখন শেষ হ'ল তিনি বেশ বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন। তবু, লোকে এত দিনের ঝঞ্ঝাট নিষ্পত্তি ক'রে এইবার তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবেন। ইতিমধ্যে তিনি একবার বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু কুমারের আর সে সুখ সইল না। প্রিভী কাউন্সিলের রায় বে

য়েক দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। এবং এবারকার ত্য সত্যই মৃত্যু।

াওয়াল সন্ন্যাসীর এই ব্যাপারটি যে কোন রোমাঞ্চ-সের কাহিনীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে। ত্যি ঘটনা ব'লে একে আরও রোমাঞ্চকর বল্‌ব। ্যাপারটিকে সম্পূর্ণ নতুন বলা যায় না,—অনেকটা রণেরই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদেরই —বর্দ্ধমানে, আজ থেকে প্রায় এক শ' সওয়া শ' াগে।

র্দ্ধমানের মহারাজা বাংলা দেশের মধ্যে বেশ নামকরা ার তা তোমরা জান। যে সময়কার কথা বলছি র্দ্ধমানের মহারাজা ছিলেন তেজচন্দ্র। তাঁর ছেলে াত্র একটি—প্রতাপচাঁদ।

তেজচন্দ্রের বয়স হয়ে গিয়েছিল। বিষয়-সম্পত্তি খানা করতেন প্রতাপচাঁদই। সবাই তাঁকে বল্‌ত রাজা। মিশুক এবং অমায়িক স্বভাবের জন্য সবাই শেষ করে প্রজারা তাঁকে খুবই পছন্দ করত। কার আমলের সাহেবসুবোদের মধ্যেও তাঁর খুব র ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বনত না একটি লোকের। নাম পরাণ বাবু। জমিদারী, সংক্রান্ত ব্যাপারে পচাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল নিয়ে প্রায়ই মাল বাধত। পরাণ বাবু আবার শেষে হলেন চন্দ্রের শ্বশুর। বুড়ো বয়সে রাজা তাঁর এক মেয়েকে করে ফেল্‌লেন। কাজেই পরাণ বাবুর প্রতিপত্তিও বাড়ল।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। কিছুদিন ক প্রতাপচাঁদকে কেমন অন্যমনস্ক দেখা যাচ্ছিল। দিন সকালে তিনি স্নান ক'রে এসে বল্লেন, "আমার র বড্ড খারাপ লাগছে, আমার মনে হচ্ছে আমি বাঁচব না। তোমরা সবাই আমার গঙ্গাযাত্রার া কর।" সেকালের লোকের ধারণা ছিল অন্তিম যদি গঙ্গার মধ্যে নাভি পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দেহত্যাগ যায় তবে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। তাই মৃত্যু নিশ্চিত লে পুণ্যলোভীরা গঙ্গাতীরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি ুতেন। গঙ্গার ঠিক পাড়েই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ত এবং শেষ সময়ে এলে সকলে ধরাধরি ক'রে মুমূর্ষুকে গঙ্গাগর্ভে নিয়ে যেত। এরই নাম ছিল গঙ্গাযাত্রা।

যাই হোক্, প্রতাপচাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন, এবং সেদিনই অনেক রাত্রে সেখানে তাঁকে পুড়িয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। সমস্ত বর্দ্ধমান বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যও রয়ে গেল। কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল—"প্রতাপচাঁদ আসলে মরেন নি, ছদ্মবেশে কোথাও আত্মগোপন করেছেন।"

এই ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন বর্দ্ধমানে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। ঠিক প্রতাপচাঁদের মতই চেহারা। সন্ন্যাসী নিজেকে প্রতাপ-চাঁদ ব'লে দাবী করলেন। ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতই।

এদিকে মহারাজ তেজচন্দ্রের আর ছেলেপেলে না থাকায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। ছেলেটি আর কেউ নয়, পরাণ বাবুরই ছোট ছেলে। এখন সে-ই বর্দ্ধমানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কাজেই সন্ন্যাসী নিজেকে তেজচন্দ্রের আপন ছেলে প্রতাপচাঁদ ব'লে দাবী করায় খুবই গোলমাল বাধল। প্রজারা বেশীর ভাগই সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ ব'লে স্বীকার করল। এমন কি ছোট রাজার ইংরেজ বন্ধুরাও সেই কথা বলতে লাগলেন। দেশ যুড়ে প্রবল হৈ-চৈ পড়ে গেল। অবশেষে সুরু হ'ল মামলা।

বহু বড বড় লোক এসে সন্ন্যাসীই যে আসল প্রতাপ-চাঁদ সে বিষয়ে সাক্ষী দিলেন। এঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছাত্রবন্ধু ডেভিড্ হেয়ারও ছিলেন একজন। কিন্তু এ সন্ন্যাসীর ভাগ্য ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মত সুপ্রসন্ন ছিল না। মামলায় তাঁর শুধু হারই হ'ল না, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জুয়াচুরি করার অপরাধে পাঁচ বছর জেলের হুকুম হ'ল। অবশ্য উপর আদালতে আপীল ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তিনি জেলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে তাঁকে একটা মোটা টাকা জরিমানা দিতে হ'ল আর ইতিহাসে 'জাল প্রতাপচাঁদ' এই নামে কুখ্যাত হ'য়ে থাকতে হ'ল।

কিন্তু মামলায় সন্ন্যাসীর হার হলেও সমসাময়িক

অনেকেই তাঁকে সত্যিকারের প্রতাপচাঁদ ব'লে মনে করতেন। আজও ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় বলে বোধ হয়। 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে এই ঘটনা নিয়ে লেখা একখানা বিখ্যাত বই আছে। তোমরা বড় হয়ে সেখানা পড়ে দেখতে পার।

স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় মূর্ত্তি কোন্‌টি? প্রাচীন রোড্‌স বন্দরের প্রবেশদ্বারে যে এপোলো দেবের বিরাট পিত্তলের মূর্ত্তিটি ছিল তার কথা তোমরা, যারা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের কাহিনী পড়েছ, তারা নিশ্চয়ই জান। এই মূর্ত্তিটি লম্বায় ছিল ১০০ ফুট; বন্দরের দু'দিকে দু' পা দিয়ে মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে থাকত আর তার তলা দিয়ে জাহাজ এসে বন্দরে ঢুকত। মূর্ত্তিটিকে বলা হ'ত কলসাস্। কিন্তু এ মূর্ত্তিটি বহুদিন থেকেই নেই; যীশুখৃষ্টের জন্মেরও আগে এক প্রবল ভূমিকম্পে এটি উল্টে পড়ে যায়, আর দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। আমরা শুধু এর বর্ণনাই শুনে এসেছি এবং শুনে অবাক্ হয়েছি।

মিশরের স্ফিংস মূর্ত্তির কথাও তোমরা শুনেছ। এটি অবশ্যি কালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীতেও একটি বড় মূর্ত্তির ছবি আমাদের খুবই চেনা, এবং কারও কারও চোখেও দেখা। আমি আমেরিকার স্বাধীনতা-মূর্ত্তির কথা বলছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নগর নিউইয়র্ক বন্দরে ঢুকবার মুখে সমুদ্রের ধারে একটা উঁচু বেদীর ওপরি এই বিরাট্ মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে। এটিই বোধ হয় এখন নব্য পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় মূর্ত্তি। এর চেহারার একটু পরিচয় শোন:

মূর্ত্তিটি ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে তৈরী—সব শুদ্ধ ওজনে প্রায় ৫৬২৫ মণ। শুধু মূর্ত্তিটুকুর ওজনই ২৫০০ মণ। উচ্চতায় এটি ৩০০ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার মনুমেণ্টের প্রায় ডবল। মূর্ত্তির ডান হাতখানি ঊর্দ্ধে প্রসারিত—সেটি লম্বায় ৪২ ফুট। তার আঙুলগুলো এক-একটি প্রায় ৮ ফুট লম্বা, এমন কি নখগুলো পর্য্যন্ত এক ফুটের বেশী বড়। মূর্ত্তির মুখ লম্বায় ১৭ ফুট। কোমরের পরিধি ৩৫ ফুট।

এই মূর্ত্তিটি আসলে হচ্ছে স্বাধীনতার (দি প্রতীক্। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের অধীনত

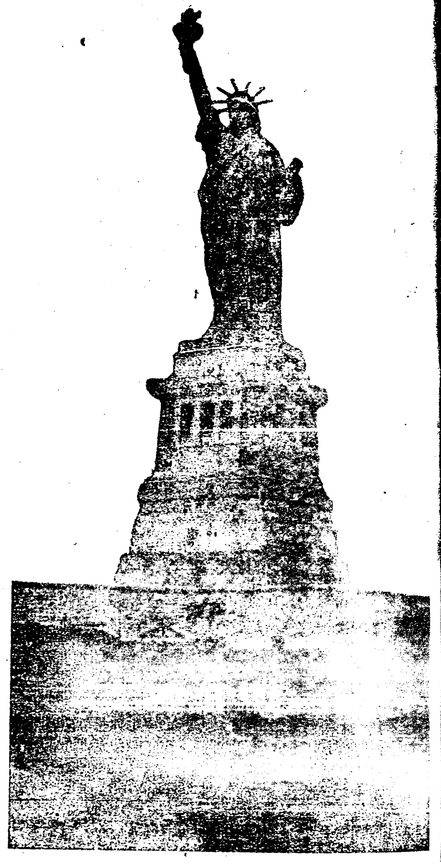

আমেরিকার স্বাধীনতা-মূর্ত্তি

থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হবার এক শ' বছর পরে যে যে স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসব হয় সেই উ স্বাধীনতার পূজারী ফরাসী জাতির পক্ষ থেকে রিকাকে এই মূর্ত্তিটি উপহার দেওয়া হয়। যে ভাস্ক তৈরী করেন তাঁর নাম বার্থলদির। শোনা যায় পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করতে তাঁকে পুরো দশ বছর ভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

মূর্ত্তি তৈরী করার পরও হাঙ্গামা কম ছিল না। বড় একটি মূর্ত্তি সুদূর আমেরিকায় পাঠানও বড় কম নয়। যে জাহাজে ক'রে এটি পাঠান হয় তাতেও ক কল কৌশল করতে হয়েছিল। এক জাতি কর্ত্তৃক র জাতিকে এ ধরণের একটি উপহার দেওয়া বোধ হয় গাতে নতুন।

আমেরিকানরা এ উপহারের অমর্য্যাদা করে নি। এমন জায়গায় মূর্ত্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যাতে শ থেকে কেউ জাহাজে ক'রে নিউ ইয়র্ক ঢুকলে দূর থেকে প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়বে এই স্বাধীনতা-মূর্ত্তির দিকে। রাত্রিকালে প্রখর বৈদ্যুতিক আলোকে মূর্ত্তিটি ঝক্‌মক্ করে—সমুদ্রের নীল জলে পড়ে তার ছায়া। তখন নাকি দেখতে হয় তা অপরূপ! যে দেখে তারই বুক স্বাধীনতার গর্ব্বে ফুলে ওঠে।

ভারতবর্ষও স্বাধীন হ'তে চলল। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা জাগাবার জন্য আমাদের দেশেও কি এমনি ধারা একটা কিছুর ব্যবস্থা হবে না?

ময়ের প্রিয় বন্ধুগণ,

আমাদের দেশ আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে ত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যার জন্য এত আন্দোলন এত ত্যাগ—এত কারাবরণ চলছিল, সম্পূর্ণ রূপে না ও সেই প্রার্থিত বস্তুর প্রথম পর্য্যায় আজ আমাদের । আর মাত্র একমাস পরেই ভারতীয়দের হাতে দের দেশ শাসনের ক্ষমতা আসছে। এই শুভ দিনের দেশের লোক পরম নিশ্চিন্তে, শুদ্ধ মনে, আনন্দ-ত অপেক্ষা করবে এই সবাই আশা করেছিল। কিন্তু হচ্ছে কই? যে ভ্রাতৃবিরোধ, দেশ যুড়ে হানাহানি, কাটি—অশান্তি গত বছর থেকে সুরু হয়েছিল, ও তা থামছে কই? কিছুদিন যাবৎ কলকাতায় ার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সুরু হয়েছে—ফলে বিশাল নগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় পদে পদে পড়ছে। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠিক সময় ধনু প্রকাশ করা যে কি রকম অসাধ্য ব্যাপার তা ভোগী মাত্রই বুঝবেন। আষাঢ়ের রামধনু ঠিক ১লা আষাঢ় তারিখেই বেরিয়ে গিয়েছিল, শ্রাবণ সংখ্যাও ঠিক তেমনি বার করা যাবে বলে আমরা আশা করেছিলাম; কিন্তু আমাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অল্প কয়েক দিন দেরী হয়ে গেল। তার উপর কাগজের বিভ্রাট তো আছেই। হাঙ্গামার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানপাটও ঠিকমত না খোলায়, যখন তখন যত্র তত্র হঠাৎ একটানা সান্ধ্য আইন জারি হওয়ায় এবং সহরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ায় নানা ভাবে কলকাতাবাসী আজ উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কে জানে কবে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে?

ইতিমধ্যে তোমাদের চিঠিপত্র অনেক পেয়েছি। বেশীর ভাগ চিঠিরই উত্তর দেবার মত কিছু নেই। "চিঠি পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি," বা "বড্ড রাগ করেছ বুঝি ভাই?" ইত্যাদি ধরণের জবাব রামধনুর পাঠকরা নিশ্চয়ই চাও না। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত 'হবি' এবং 'সংগ্রহশালা' সম্বন্ধে কয়েকটি চিঠির জবাব আজ দেব।

শ্রীনবেন্দু সেন জানতে চেয়েছেন সংগ্রহশালায় গাছ

কি ভাবে সংরক্ষিত করা যায়। এর পদ্ধতি নীচে দিচ্ছি :—(১) একটি শুকনো বড় ব্লটিং পেপার খুলে তার মধ্যে নমুনাটিকে (গাছটি বা তার অংশ) ভাল ক'রে বিছিয়ে দাও। রাখবার সময় কতকগুলো পাতা পিছন দিক্ এবং কতকগুলো পাতা সামনে দিক্ ক'রে রাখতে হবে। পাতার সঙ্গে ফুল, কুঁড়ি এবং ফলও (ছোট হ'লে) রাখবে। এবারে ব্লটিং পেপারটি ভাঁজ করে দু'টো কাঠের তক্তার মধ্যে রেখে উপরের তক্তার উপর একটা ভারী ওজন (ইট কি পাথর) চাপাতে হবে। যদি খুব রসাল গাছ হয় (যেমন দোপাটি) তবে একদিন পরে ব্লটিং পেপারটি ভিজে যাবে। তখন আর একটি শুকনো ব্লটিং পেপারে গাছটিকে আস্তে আস্তে রেখে আগের মতন ইট বা পাথর চাপা দিতে হবে। ভিজে ব্লটিং পেপারটি শুকিয়ে নিয়ে পরে আবার ব্যবহার করা চলবে। এই ভাবে কয়েক দিন চালালেই গাছটি শুকনো হয়ে যাবে।

এইবারে শুকনো গাছটিকে উলটিয়ে মাটীতে রেখে তার ওপর শিরীষের আঠা একটি তুলিতে ক'রে লাগিয়ে শক্ত পরিষ্কার কাগজের ওপর তাকে লাগাতে হবে। শিরীষের আঠায় একটু তুঁতে মিশিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। কাগজে আটকাবার পর তার নীচে একটা লেবেলে গাছের নাম, কবে, কোথায় পেলে ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য লিখে রাখবে। যে সব নমুনা বড় হয় ব'লে কাগজে আটকান যায় না (যেমন ফার্ণ বা ছত্রাক পাইন, ফল ইত্যাদি) সেগুলো সুতো দিয়ে কাগজের সঙ্গে বাঁধা যেতে পারে, কিংবা একটা খামে ভরে সেই খাম শক্ত কাগজের গায়ে এঁটে দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময়,—বিশেষ ক'রে বর্ষা কালে, নমুনার গায়ে ছাতা ধরতে পারে বা পোকা লাগতে পারে। এর জন্য ডাইলিউট মার্কিউরিক্ ক্লোরাইড্ লাগিয়ে দিতে হয়। কিম্বা ন্যাফ্থালিনের গুলি দিয়ে রাখলেও চলে।

যদি শিশির মধ্যে গাছের নমুনাগুলি সরস অবস্থায় রাখতে চাও তবে ৭০%—৯০% এল্‌কহল কিংবা ডাইলিউট্ ফর্মালিন্ যোগাড় ক'রে তার মধ্যে রাখতে হবে। দু'টো মিশিয়েও রাখা যায়। কিন্তু শিশির ছিপি খুব ভাল ক'রে আটকাতে যেন ভুল না হয়, তা'হলে কিন্তু নমুনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে 'নমু... রং ঠিক থাকে না। সবুজ রং রাখতে হলে ... নমুনাটি নিয়ে কপার সালফেট দিয়ে ফুটিয়ে নি... হবে।

শ্রীসতী দেবী, শ্রীব্রজেন্দ্র বসু, শ্রীকণা পাল ... শ্রীসত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহশালার জন্য নি... বদলাবদলি করা যায় কিনা জানতে চেয়েছেন। ... যেতে পারে। যে সব পাঠক-পাঠিকার এ ... সংগ্রহশালার খেয়াল আছে এবং একই জিনিষ ... পরিমাণ আছে তারা আমাদের কাছে তার তা... পাঠাতে পার এবং তার বদলে কি জিনিষ চাও ... জানাতে পার। এই রকম তালিকা পেলে আমরা ... পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

শ্রীনন্দিতা রায়, শ্রীনন্দিনী দেবী, শ্রীবিমল সেন—... সংগ্রহশালার জন্য 'নমুনা' কিনতে পাওয়া যায় ... জানতে চেয়েছেন। 'কেনা'র চাইতে 'সংগ্রহ' ... আমোদ এবং কৃতিত্ব বেশী। তবে কোন কোন ... কিনতে পাওয়া যায় বৈকি! তালিকা পেলে হয়... বিষয়েও সাহায্য করা যেতে পারে।

কুমারী রাবেয়া খাতুনের অনুরোধ মত প্রতি ... কয়েকখানা ক'রে বিভিন্ন ধরণের ভাল বাংলা ... (ছোটদের) নাম,—যা তোমাদের উপযুক্ত এবং ... ভাল লাগবে, জানাব বলেছিলাম। তা এবারে দি... সবই যে নতুন বই তা নয়, তবে এগুলি মুদ্রিত ... বলেই আমাদের জানা। আসছে বারে আবার ... গুলির নাম দেব। এ দিক্ দিয়ে প্রকাশক ... গ্রন্থকারদেরও সহযোগিতা কামনা করছি। কারণ ... সময় প্রচারের অভাবে অনেক ভাল বইএর খবরও ... যায় না।

শ্রীঅহীন্দ্র নন্দী, শ্রীসুচারু দেবী এবং আরও কয়ে... রামধনুতে নিয়মাবলী ও সূচীপত্রের অভাব ... করেছেন। পত্রিকার পৃষ্ঠা কমাতে হয়েছে বলে ... দেওয়া হচ্ছে না। নিয়মাবলী এ মাসে দেওয়া হ'ল।

অনেক গ্রাহক আমাদের কাছে ইংরেজীতে ... অত্যন্ত ভুল ইংরেজী দেখতে পাই। মাতৃভাষার ব্যবহার যত বেশী করা যায় ততই ভাল নয় কি?

...ন—এমন কি ধাঁধার উত্তর বা প্রবন্ধ পাঠাবার ...ও। বাংলা পত্রিকায় ইংরেজীতে চিঠি লেখার ...জন কি?—বিশেষতঃ সে সব চিঠির কোন কোনটায়

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সঃ

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

[গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা]

কল্পনা

শ্রীঅরুণিমা (লিলি) সেন

আচ্ছা মাগো, ঐ যে দেখি নীল আকাশের পারে
নানান্ রকম গাছপালারা দাঁড়িয়ে সারে সারে।
ঐখানে কি রাখাল ছেলে হেসে মধুর হাসি
মধুর সুরে গাছের তলে বাজায় ব'সে বাঁশী?
ঐখানে কি সোনার নদী বইছে এঁকে বেঁকে,
বুলবুলি গায় মিষ্টি স্বরে বকুল গাছের থেকে?
ঐ নদীটির তলে কি মা, রাজার বাড়ী রাজে?
রাক্ষসীরা থাকে কি মা, সেই বাড়ীটির মাঝে?
রাজার মেয়ে ঘুমোয় সেথায় পালঙ্ক শয্যায়,
সোনার কাঠি শিয়রে যার, রূপোর কাঠি পায়?
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী সেথা করে কি বসত—
দেখিয়ে দেয় রাজপুত্রে পাতালপুরীর পথ?
যে পথ দিয়ে রাজপুত্র গিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে
দেখতে পাবে রাজকুমারী ঘুমোয় খাটের 'পরে।
চুলগুলো তার মেঝের 'পরে পড়ছে লুটি লুটি,
দুই কানে তা'র পান্না হীরার দুলিছে দুল দুটি।
রঙটি যে তা'র ফুটফুটে আর মুখটি কমল ফুল,
চাঁপার কলি আঙুলগুলি, চোখ দুটি ঢুলুঢুল্।
আমায় যদি দাও ছেড়ে মা, এক্ষণি যাই চলে,
রাজকন্যা এনে দিতে পারি তোমার কোলে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ দু' ভাগ ক'রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান নামে দু'টি স্বতন্ত্র 'ডোমিনিয়ান্' রাষ্ট্রে গঠিত হবার কথা তোমরা আগেই শুনেছ। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এ সম্পর্কে আইন পাশ হয়ে গেছে এবং আগামী ১৫ই আগষ্ট থেকে ঐ দু'টি রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে।

* * *

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের ভোটের ফলে বাংলা দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। প্রথমটি পাকিস্থান এবং ২য়টি ভারতীয় রাষ্ট্রে থাকবে। তেমনি পাঞ্জাবও দু'ভাগে ভাগ হয়ে পূর্ব্ব পাঞ্জাব ভারতীয় রাষ্ট্রে ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্থানে যাবে ঠিক হয়েছে। আসামের শ্রীহট্ট ও বেলুচিস্থান প্রদেশের লোকেরা গণ-ভোটের দ্বারা পাকিস্থানে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট সুরু হয়েছে, কিন্তু এখানকার অবস্থা একটু অন্য রকম। এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই মুসলমান কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এ যাবৎ

কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। তাই সেখানকার কংগ্রেস নেতা খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ বলেছেন,—'সীমান্ত প্রদেশে যদি গণভোট নেওয়া হয় তবে তা পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের ভিত্তিতে হ'তে পারে না, পাকিস্থান ও পাঠানীস্থানের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। মুসলমান হিসাবে তারা হিন্দুস্থানে যেতে পারে না, আবার কংগ্রেসপন্থী ব'লে পাকিস্থানেও যেতে পারে না। কাজেই তাদের জন্য পাঠানীস্থানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।' সীমান্তের কংগ্রেস তাই গণভোটে যোগদান করে নি।

* * *

পশ্চিম বঙ্গ পৃথক্ প্রদেশ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই অঞ্চলের জন্য বাংলার বর্ত্তমান লীগ মন্ত্রিসভার কর্ত্তৃত্বের কোন অর্থ হয় না। এ বিষয়ে এই অঞ্চলে জনমত অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী সময়ের জন্য পশ্চিম বঙ্গে একটি আলাদা "ছায়া" মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। এঁরা এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নীতি ঠিক করবেন, লীগ্ মন্ত্রিসভা কাজ করে যাবেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য সকলকার মনঃপূত হয় নি, তবু মন্দের ভালো ভেবে কংগ্রেস এতে রাজী হয়েছে। পশ্চিম... কংগ্রেসী দলের নতুন নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছেন... প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কাজেই ইনিই হয়েছেন প্রধান... ইনি ছাড়া এই মন্ত্রিসভায় আছেন—ডাঃ বিধান... রায় (ইনি এখন বিদেশে), শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, ... যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ... নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, ... কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস ও ... মোহিনীমোহন বর্ম্মণ।

* * *

নতুন দু'টি দেশে ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্ট সুরু... একজন ক'রে গভর্ণর জেনারেল থাকবেন, যদিও ... ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হাতেই বেশী থাকবে। প্রথমে ... ঠিক হয়েছিল লর্ড্ মাউণ্টব্যাটেনই দুই রাষ্ট্রের গ... জেনারেলের কাজ করবেন। পরে মুসলিম লীগ্ ... মিঃ জিন্নাকে পাকিস্থানের এই পদের জন্য মনো... করেছেন। লর্ড্ মাউণ্টব্যাটেন শুধু ভারতীয় রা... গভর্ণর জেনারেল থাকবেন।

নতুন বই

কোরক—শ্রীসিদ্ধিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বেঙ্গল পাব্লিশার্স। দাম।৴০

এটিকে কয়েকজন উদীয়মান তরুণ লেখকের রচনা-সমষ্টী বলা যেতে পারে। কয়েকটি লেখায় মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাঁচা হাতের রচনাও ... আছে। সঙ্গে ২।৪ জন খ্যাতনামা লেখকের রচনা... সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তা ছাড়া "আশীর্ব্বাদ", "শুভেচ্ছা"... ইত্যাদিকে যেন একটু অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে...

যে বই তোমরা পড়তে পার

(চিঠিপত্র বিভাগ দেখ)

পাগলা দাশু—৺সুকুমার রায়, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান-কাহিনী—উত্তমচাঁদ (অনুবাদ), যারা ছিল দিগ্বিজয়ী—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গান্ধীজির জীবনপ্রভাত—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, গান্ধীজি—অনাথনাথ বসু, ছোটদের আবৃত্তি, গান, অভিনয়—সুনির্ম্মল বসু, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বাড়ী থেকে পালিয়ে—শিবরাম চক্রবর্ত্তী, ডাক্তারের দিগ্বিজয়—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী (অনুবাদ), মধুমতীর বাঁকে—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, একবিংশ শতাব্দী—প্রিয়কুমার গোস্বামী, ছোটদের কংগ্রেস—ধীরে... লাল ধর, চরণিক—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। (আগা... বারে আরও নাম দেওয়া হবে।)

শোক-সংবাদ

তোমাদের প্রিয় লেখক ও রামধনুর প্রিয় বন্ধু শ্রী... ধীরেন্দ্রলাল ধরের মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা কমলকুমারী দে... সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। অল্প বয়সে বি... হয়েও নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা-বলে নানা প্রতি... অবস্থার মধ্যে তিনি ৩টি নাবালক ছেলেকে মানুষ ক... তোলেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ ধীরেন্দ্র বাবু...

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৵০ ; প্রতি সংখ্যা।৴০ ; ভি. পি. চার্জ্জ স্বতন্ত্র। ...মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২০ দিনের ...আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম সপ্তাহে ...শিত হয়।

৩। প্রবন্ধাদি ...

...য় তো তোমরা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়েই পেয়েছ, ...জিতেন্দ্র বাবুও সরকারী উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। ...পুত্রটি অল্প বয়সেই মারা যান।

...কমলকুমারী দেবী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। হরিদ্বার থেকে রামেশ্বর এবং দ্বারকা থেকে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত তীর্থ স্থান পর্য্যটন করেছিলেন। আমরা ধীরেন্দ্র বাবু ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

নরেন, কটক, সরস, ওহিও, কতক, রবার, জলজ, নবীন, সহিস, কথক।

উত্তরদাতাদের নাম:—অমলা বন্দ্যোপাধ্যায় (...কুড়া) ; শিশিরকুমার নাগ (কলিকাতা) ; গৌরাঙ্গ-... মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা) ; প্রবোধ ও বৈদ্যনাথ (জামসেদপুর) ; শর্ম্মিলা সরকার (কলিকাতা) ; চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর) ; শিপ্রা দেবী (নিউ দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

...মেজ বৌদির বাপের বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসেছে। চার ...ড়ি আম। অমনি গুবলু, থুবলু, ভাবলু, গাবলু, পাইলু, ...ইলু, টেঁকলু, মেকলু—সবাই এসে ঘিরে ধরল। ...ড় বৌদি চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, 'সব নিজের নিজের ...জায়গায় বস, আমি ভাগ ক'রে দিচ্ছি।'

বড় বৌদি প্রথম ঝুড়ির আমগুলিকে ৩ সমান ভাগ ক'রে তার ২ ভাগ একত্র করলেন। তার পর ২য় ঝুড়ির আমগুলিকে ২ সমান ভাগ করে তার ১ ভাগ নিলেন। তার পর ঐ দু'টি ভাগ মিশিয়ে তাকে সমান ৮ ভাগ করলেন। এর পর তিনি ৩য় ও ৪র্থ ঝুড়ির বেলায়ও ঐ রকম করলেন কিন্তু এবার শেষ দু'ভাগকে না মিশিয়ে প্রত্যেকটিকে সমান ৮ ভাগ করলেন। দেখা গেল এবারকার প্রত্যেক ভাগে ১ম বারের ভাগের ঠিক সমান সমান আম পড়েছে। বড় বৌদি ৮ জনের প্রত্যেককে ক'রে তিনটে ভাগ দিয়ে দিলেন।

বলতে পার কোন্ ঝুড়িতে সব চেয়ে কম সংখ্যক ক'টা আম থাকলে এই ভাবে ভাগ করা সম্ভব হয়?

মূল্য ১॥০ মাত্র | দাম—১॥০
দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

১৫

কং
থা
যদি
ভি
ভি

মনোরঞ্জ
চক্রবর্ত্তী,
(অনুবাদ

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-চিত্রণ মনোরম। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৹ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। কয়েকখানা একরঙা ছবি আছে। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। ৷৵৹ আনা।

মহিম ডাকাত

বইটির আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্যি... বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে। পাতায় পাতায় ... কৌতূহল। সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য দুই টাকা।

দশম বর্ষ

কৈশোরক

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। ... খানা ধারাবাহিক উপন্যাস চলিতেছে। ... ছাড়া সাত সাগরের ঢেউ, মানুষের মত মানু... সবুজ পাতা বিভাগগুলি কৈশোরকের বৈশিষ্ট্য...

প্রাপ্তিস্থান
কৈশোরক কার্য্যালয়
৬৫।১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৵৹ ; প্রতি সংখ্যা ।৵৹ ; ভি. পি. চার্জ্জ স্বতন্ত্র। ...মাঘ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২০ দিনের ...আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম সপ্তাহে ...প্রকাশিত হয়।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। ...মনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কপি ...রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক নং উল্লেখ ...না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা থাকে।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র যিনি গ্রাহক ...তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

...। টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
...কার্য্যালয় ঃ ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের জন্য সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ্‌-গ্রন্থাবলী

পীরামিড্‌ সিরিজ

'...জ্যা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এত দিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্‌ বই প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। তাই সারা বাংলার উপেক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে তাঁহাদের দাবী জানাইয়াছেন

বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্‌ বই চাই।

তাঁহাদের দাবী ও অনুরোধ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্‌

মিঃ পিটার ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্‌

মৃত্যু বরণ করিয়াও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা ধারাবাহিক ভাবে তাহাই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

পীরামিড্‌ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ
চতুর জার্ম্মাণ
এইমাত্র বাহির হইল
মূল্য ১৷৹ মাত্র

পীরামিড্‌ সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ
ডেঞ্জার্স সিগন্যাল
এই মাসেই বাহির হবে
দাম—১৷৹

দেব সাহিত্য-কুটীর ✻ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

Regd. No. C—1641

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSUR

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।/০ ; ভি. পি. চার্জ্জ বৈশাখ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক নং উল্লেখ না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা থাকে।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র যিনি গ্রাহক তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয় : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

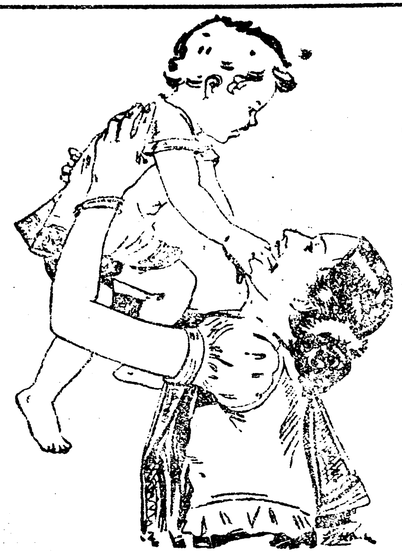

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ছেলেমেয়েদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

রাঙারাখি

মাতোয়ারা গল্প! ঝরঝরে কবিতা!

উচ্ছল হাসি-ব্যঙ্গ! অফুরন্ত চিত্র!

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

রাঙা হাতে 'রাঙারাখি' মানাইবে ভালো,

কোহিনুর-উপহার, ঝলমলে আলো!

দেব সাহিত্য কুটীর

রামধনু—

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

স্বাধীনতার দিনে যাঁরা স্মরণীয়—১

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৫৪ | ৫ম সংখ্যা

সাত ভাই চম্পা

বন্দে আলী মিয়া

"সাত ভাই চম্পা, জাগো রে!"
"কেন বোন্ পারুল, ডাকো রে?"

"আমি ডাকি ফুল হতে উঠে এসো সব ভাই,
ঘুম ভেঙে উঠে এসো—সময় যে আর নাই।
স্বপন দেখিছো বুঝি, ঘুমে তাই অচেতন?
ফিরে যায় ডেকে ডেকে রবি-কর সারা 'খণ!

"মোদের দুখিনী মাতা করিছেন হাহাকার—
পরনে কাপড় নাই—পেটে ভাত নাই তাঁর।
মায়ের ঘুচাবো দুখ ভাই বোন মিলে সবে,
তাঁর মুখে এলে হাসি আমাদের জয় হবে।
যারা মাকে ভুলে থাকে তারা যে মানুষ নয়,
ভুলি ভেদ ঘৃণা লাজ করি কাজ হবে জয়।"

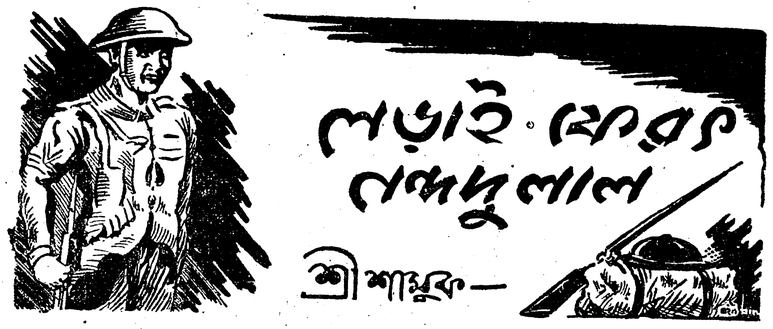

দশ

— বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো —

ইস্কুলে যাবার পথে ছেলেরা চলতি বাস্ থেকে নেমে পালিয়েছে শুনে নন্দর রাগে যেন ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। মনে হ'ল, হ্যাঁ, তপোবনই বটে, কী চমৎকার আমার তপোবন রে! আর কত শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট ঋষি-বালকেরা সব! রাগে ইচ্ছা হ'ল বাড়ির সামনের সাইন-বোর্ডটা নামিয়ে নিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। তা যখন পারলে না তখন সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে চালকের ওপর।

বাস্ চালক হাত যোড় করে জানায় যে তার কসুর নেই কিছু। পুলিসে হাত দেখালে মোড়ের মাথায় থামতেই হয় এবং ভিড়ের মধ্যে বেশ ধীরে চালাতে হয় গাড়ি। সুতরাং ইচ্ছে করলে সহজেই নেমে পড়তে পারেন। অবশ্য তার একটু অন্যায় হয়েছে যে বারম্বার পিছনে ফিরে দেখে নি সব ঠিক আছে কিনা।

বসে রাগ করলে চলে না। একটা খবর ত' নেওয়া চাই ছেলেরা সব গেল কোথায়। ইস্কুলে টেলিফোন করে জানা গেল সে সকলেই সেখানে উপস্থিত তবে দেরি করে এসেছে। নন্দ ঠিক করলে যে ওদের ফিরিয়ে আনবার সময় সে নিজে যাবে বাসে, কারণ ছুটির পর পথে পথে ঘুরে বেড়াবার লোভ আরো বেশী হওয়াই সম্ভব।

ইস্কুলের ছুটির পর খালি বাস্ আবার ফিরে এল নন্দ সমেত। নদীর স্রোতের মত ছেলেরা যখন বেরিয়ে এল তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না গুণধরদের কতক্ষণ অপেক্ষা করে ইস্কুল বাড়ির মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে কোন হদিস মিললো না। সুতরাং বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় কি?

নন্দ ফিরে দেখে ছেলেরা ফিরে এসেছে আগে হারাধনের কুড়িটির মধ্যে খোওয়া যায় নি কেউ, এ সকলে নির্ব্বিবাদে বসে জলখাবার খাচ্ছে, যেন হয় কিছুই।

সেদিন সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা চেষ্টা করলে বোঝাতে ও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে। অনেক করলে জানতে যে ওদের এমন নিছক দুষ্টামি করার মতলবটি কি, এবং দলের পাণ্ডা বা পালের গোদাটি আলাদা আলাদা দু'-চার জনের সংগে ঘনিষ্ট হবারও করলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়।

বেশ শান্তশিষ্টের মত ব্যবহার করে, ছোট পরিষ্কার উত্তর দেয় সরল ভাবে, কিন্তু তার বেশী নয় কিছু। কত বার তার ইচ্ছা হ'ল যে একটি চাবুক সপাসপ্ লাগায়, সব ক'টাকে একেবারে চিট্ করে কিন্তু কানাই বাবুর কথা মনে পড়ায় নিরস্ত নিজেকে।

কানাই বাবু বলেছিলেন,—আপনার যা কিছু করবেন—যা খুসি ওদের শাসনের জন্যে, শুধু বেশী মারধোর নয়। ওদের আত্মীয়স্বজনের আপত্তি

ছেই, তা ছাড়া বেধড়ক মারপিট করলে ছেলেরা আরো যড়ে যাবে, শেষে সব হয়ে দাঁড়াবে খুনে বা ডাকাত।

কিন্তু হাজার হোক নন্দর শরীরও ত' মানুষের, ক্ষণ—কত বেশী সহ্য করতে পারে? মিষ্টি কথায় নয় বিনয় করে যখন ফল হ'ল না—হঠাৎ এক নিষ্ঠুর ণা করে বসে। যতক্ষণ না সকলে এসে এক সংগে প চাইবে সমস্ত দোষের জন্যে, আর দলের পাণ্ডার ম বলে দেবে ততক্ষণ পাবে না রাত্রের খাবার।

কেউ এল না শেষ পর্য্যন্ত, একটি প্রাণীও নয়। বেশী ত হতে শুয়ে পড়লো নিজের নিজের বিছানায়। নন্দ বার-দাবার সব তুলে রেখে চাবি দিয়ে যেতে বললে, সে নিজেও না খেয়ে শুয়ে পড়লো।

সকালে বিলটু এসে চাবি নিয়ে গেল রান্নাঘর খুলবার এবং তখুনি ফিরে এসে খবর দিলে যে খাবার জিনিষ খেয়ে ছড়িয়ে ফেলে রেখেছে কে বা কারা। নন্দ কে ওঠে। ঐ চাবি যে তার বালিশের তলায় ছিল সারারাত সেই বালিশ মাথায় দিয়ে সে ঘুমিয়েছে! হ'লে এরা পারে না কি? শেষ পর্যন্ত নিজেই শুধু থেকে ওদের দোষের জন্য নিজেই শাস্তি পেয়ে একলা।

নন্দ চুপ ক'রে বসে বসে ভাবলে কি করা যায়। ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে সে? না না, তা কি করে অত বড় লড়াইয়ের কত দুর্দ্দান্ত সেপাইদের নিয়ে করে এল আর এই শহরের কুড়িটি পুঁচকে ছেলেদের হার মানবে। লোকেরা সব বলবে কি? কানাই ও কি ভাববেন—এত খরচপত্র, জোগাড়যন্ত্র করে এই! না, এত অল্পে—এত সহজে হেরে যাওয়া না।

শয়তানদের সঙ্গে শয়তানি করে জিততে হবে। র সঙ্গে হতে হবে আসল বিচ্ছু। হিসাব করে সমস্ত ঘাট বেঁধে কড়া নিয়মে জবরদস্ত আইন হবে চালাতে। র কাছে হয় না কি? বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল আর এরা ত' তুচ্ছ কয়েকটা পুঁচকে ছেলে।

নন্দ সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেললে। চাকর বাকর ানদের হুকুম দেওয়া হ'ল নিয়মমত কাজের এবং দারির। এক চুল এদিক্ ওদিক্ যেন না হয়।

বাড়ির চারিদিকে সমস্ত জিনিষে তালাচাবি পড়ে গেল, সে সব চাবি নন্দর কাছে থাকবে ও সে রাত্রে ঘর বন্ধ করে শোবে। একজন গুর্খা রাখা হ'ল ভোজালি নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ইস্কুলে যাবে ও আসবে। এক কথায় এই বলা যায় যে নিয়ম-কানুনের দাপটে তপোবনের সঙ্গে কোন সরকারী জেলখানার এতটুকু তফাৎ রইলো না কোন।

বেশ কিছুদিন চুপচাপ কাটে শান্তিতে। দুষ্টামি যে একেবারে ছিল না তা নয় তবে সে সব খুবই তুচ্ছ—নগণ্য ঘটনা। নন্দ মনে মনে ভাবে আর হাসে। কেমন জব্দ! পাহারার চাপে বাছাধনরা এতদিনে সব আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। হবে না ত' কি! কড়া আইন কি আর সোজা কথা? বনের পশুকেও বশ করে তবে ছাড়ে।

বেচারী নন্দ জানতো না যে দস্যির দলটি খুব সতর্ক হয়ে ফাঁক খুঁজছে—সুযোগের অপেক্ষা করছে, তাকে মুসকিলে ফেলে একেবারে নাজেহাল করে দেবার জন্যে। সময় পেলেই ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ও নানা মতলব ভাঁজে। তবে এমনি সাবধানে যে নন্দ ত' দূরের কথা, কাক পক্ষীও টের পেতে পারে না।

আরো কেটে গেল কিছুদিন। নন্দর মনটি স্বভাবতঃই ভাল। ভাবে, এরা এখন কথা শুনে বাধ্য হ'য়ে রয়েছে এদের জন্যে এবারে কিছু করা দরকার। ঠিক করলে একটা দিন পিক্‌নিক্ ক'রে বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসবে। বেড়ানো হবে এবং খাওয়া-দাওয়া করে ফুর্তিও করা যাবে।

এক ছুটির দিন সদলবলে গেল পিক্‌নিক্ করতে দক্ষিণেশ্বরে। সারাটি দিন রাঁধাবাড়া করে, খেয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে, হল্লা করে, ভারী চমৎকার চট্ করে কেটে গেল। ছেলেরা এতটুকু গোলমাল করলে না, নন্দ যা বললে তাই শুনলে বাধ্য হয়ে। সন্ধ্যায় ফিরবার সময় নন্দ ভাবলে নদীর ওপর দিয়ে নৌকায় ফেরা যাক, বেশ কিছু আনন্দ পাওয়া যাবে—যদিও পূর্ণিমা নয়। তা হলেই বা।

একটি ছোট নৌকা ভাড়া করে যাত্রা সুরু হ'ল। নন্দ নিজে খানিকটা দাঁড় টানলে কিন্তু ছেলেদের কারুকে ছুঁতে পর্যন্ত দিলে না। কে জানে দুষ্টু ছেলে সব কি করতে কি করে বসে! তখন সামলাবে কে? ছেলেরা বার বার অনুরোধ করেও যখন দাঁড় টানতে পেল না

তখন এক জায়গায় জড় হয়ে বসে নিজেদের মধে চাপা গলায় গল্প করতে থাকে।

বড়বাজারের ঘাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, আর খানিকক্ষণ পরে ডাঙায় এসে লাগবে, এই সময়ে একটি অঘটন ঘটে গেল অকস্মাৎ।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে ঝুঁকে নদীর জল দেখছিল, নৌকার টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে গেল হঠাৎ। অন্য ছেলেরা হৈ হৈ করে সেদিকে ছুটে যায় ও ঝুঁকে পড়ে। ছোট নৌকা এক পাশে অমন আচমকা ভার সইতে পারবে কেন? সমস্ত মানুষ ও জিনিষপত্র নিয়ে নৌকাটি উপুড় হয়ে উলটে গেল।

নন্দ হঠাৎ এমন ভয় পেয়ে গেল যেন সে দম আটকে মরে যাবে এখুনি। ভয় নিজের জন্যে নয়, ছেলেদের জন্যে। এক আধটা নয়, কুড়িটি ছেলে এক সংগে জলে পড়ে গেল যে! সব ক'জনকে যদি তাড়াতাড়ি তুলতে না পারা যায় তখন?

নন্দ ও মাঝিরা সাঁতার কেটে অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা সোজা করে নিয়ে আবার ভাসালে। কিন্তু ছেলেরা কোথায়? কারুর চিহ্নও দেখা যায় না যে! সব ঘটি-বাটির মত টুপ টুপ ডুবে গেল নাকি!

জলে ভিজলেও নন্দর শরীরে কাল ঘাম ছুটে গেল। তার এত বড় দায়িত্ব, কি বলবে সে? কি করে মুখ দেখাবে মানুষের কাছে? বেশ ত' ছিল বাড়িতে, কেন তাদের আনতে গেল পিক্‌নিক্ করতে, আবার এই নৌকা করে ফেরা?

ডুব সাঁতার কেটে কেটে অনেক খোঁজাখুঁজি করলে তারা ক'জনে, তার পর ডাকাডাকি করে অন্য মাঝিদেরও সাহায্য নেওয়া হ'ল। এত বড় একটা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জলপুলিসেরও আসতে বেশী দেরি হ'ল না। গংগার জল তোলপাড় করে ঘোলাটে করে দিলে, তবু সন্ধান মিললো না। যারা উপস্থিত ছিল একবাক্যে স্বীকার করলে এ রকম এত জন মানুষ এক সংগে অ ভাবে ডুবে যাওয়া তারা জীবনে দেখে নি, শোনে কোনদিন। সকলে হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দি বললে, যদি হঠাৎ কেউ আপনি ভেসে ওঠে ত' আর নয়তো কাল সকালে একবার চেষ্টা করে দেখা পারে। রাত্রের অন্ধকারে এর চেয়ে বেশী কিছু আর সম্ভব হবে না।

নন্দ সেই ভিজে জামা-কাপড়ে সপ্‌সপ্ করতে কানাই বাবুর বাড়িতে গিয়ে বললে সব। তারপর পুলিসের থানায় ও সমস্ত ছেলেদের বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে এল। যখন কাজ শেষ হ'ল তখন ভোর আর মাত্র কিছু বাকি। ঠিক হয় নন্দ বাড়ি ফিরে কাপড় বদলে আবার যাবে বড়বাজারের ঘাটে পুলিস লোকেদের সংগে।

বাড়ি পৌঁছে চাকরদের ডেকে তুলে জানলে ছেলেরা সকলে—পুরোপুরি কুড়ি জন—কাল রাত্রে ফিরে এসেছে ভিজে জামা-কাপড়ে। নিয়ম মত খে দেয়েছে, আর বেশ খানিকক্ষণ হৈ-হল্লা করে ঘু পড়েছে। এখনো ঘুমোচ্ছে তারা ওপরে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনলে সে এ সব কথা। তা হ'লে এক বিরাট শয়তানি বিচ্ছুদের! সত্যি ঘটনার নিছক অভিনয় করে গেল মতলব করে! তা প্রত্যেকেই হচ্ছে পাকা সাঁতারু! ডুব সাঁতার কেটে এড়িয়ে ডাঙায় উঠে পালিয়ে এসেছে তাকে এমে ভরা ডুবি করে! সে আর ভাবতে পারলে না। উঠে উঁকি মেরে দেখলে ছেলেরা নির্ব্বিবাদে ঘুমোচ্ছে।

নন্দ জামা-কাপড় ছেড়ে নিজের বিছানায় মুড়ি শুয়ে পড়ে। এতক্ষণে খেয়াল হ'ল যে প্রবল জ্বরে তার পুড়ে যাচ্ছে, হাত-পা কাঁপছে ঠক্‌ঠক্।

(ক্রম

আলোক-গঠন

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

আষাঢ় সংখ্যা রামধনুতে আলোর গল্প বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম আমাদের যাবতীয় খাদ্যই সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তৈয়ারী হয়। কেমন করিয়া? সেই গল্পই আজ বলাইব।

এই ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় "আলোক-গঠন" বলা হয়। এই গঠন কার্য্য কোথায় চলিতেছে? আর কোথাও নয়, আমাদের চারদিকে যে বিশাল সবুজ উদ্ভিদ-রাজ্য ছড়াইয়া আছে তাহারই ভিতর। গাছপালা, তৃণ-গুল্মের সবুজ পাতা, পুষ্করিণী ও সমুদ্রের সবুজ শেওলা—ইহারা সকলেই আমাদের চোখের আড়ালে বিশ্ববাসীর খাদ্য তৈরী করিতেছে—প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক্ আর পরোক্ষ ভাবেই হউক্। বাঘ জীবজন্তুর মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু গোড়া খুঁজিয়া দেখিলে দেখিবে ইহার খাদ্যও আসে পরোক্ষভাবে হরিণ প্রভৃতি জন্তুর খাদ্য তৃণ-পত্র হইতে। রেঙের ছাতার সবুজ রং নাই, ইহা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না; উহার খাদ্য আসে সবুজ উদ্ভিদের অর্দ্ধবিশ্লিষ্ট দেহাবশেষ হইতে। পুরানো গোময়-স্তূপ বা পুরানো পচনশীল কাঠের উপর রঙের ছাতা হইতে দেখিয়া থাকিবে।

গাছের একটি সবুজ পাতা হইতে তীক্ষ্ণ ক্ষুর দিয়া একটি পাৎলা চাকতি কাটিয়া লইয়া একটি কাচের স্লাইডের উপর রাখিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কিংবা এক টুক্‌রা পুষ্করিণীর বা সমুদ্রের শেওলা ঐ প্রকারে দেখিলে কতকগুলি গোল বা ডিম্বাকার বা জটার আকারের সবুজ পদার্থ দেখা যায়। এই সবুজ পদার্থগুলিকে বিজ্ঞানীরা বলেন "ক্লোরোপ্লাষ্টিড্"—ইহারাই খাদ্য নির্ম্মাণের প্রথম কর্ম্মভূমি। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে আমাদের প্রথম খাদ্য চিনি নির্ম্মিত হয়।

একটি সবুজ পাতা লইয়া খলে পিষিয়া উহার সহিত খানিকটা মিথাইলেটেড্ স্পিরিট (বিশুদ্ধ অ্যল্‌কহল্ হইলে আরও ভাল) ঘুঁটিয়া ছাঁকিয়া লইলে এক সবুজ রঙের দ্রব পাওয়া যাইবে। পাতার ভিতরকার ক্লোরোফিল স্পিরিটে দ্রবীভূত হইয়া উহার রং সবুজ করে। এই সবুজ রঙের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলে আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি-গুলি ঐ রঙের দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। এই জন্য ক্লোরোফিলকে সূর্য্যালোক ধরিবার ফাঁদ বিশেষ বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি উদ্ভিদের সবুজ পাতা বা দেহ খাদ্য নির্ম্মাণের প্রথম রঙ্গভূমি। প্রথম অভিনেতা ক্লোরোফিল, দ্বিতীয় অভিনেতা জল। এই জল জলমগ্ন উদ্ভিদের চারি পাশ দিয়াই শোষিত হইয়া ক্লোরোফিলের কাছে হাজির হয়। স্থলজ উদ্ভিদের বেলায় উদ্ভিদের শিকড় মাটীর ভিতরকার জল শুষিয়া পাতায় লইয়া আসে। তৃতীয় অভিনেতা কার্ব্বন্ ডাই-অক্‌সাইড্ গ্যাস্। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাস সামান্য মাত্রায় (শতকরা ·৪ ভাগ) বিদ্যমান থাকে। জীব ও উদ্ভিদ-দেহ, কয়লা বা ঘুটিং পোড়াইলে এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়।

চতুর্থ অভিনেতা সূর্য্যকিরণ। সূর্য্যকিরণের মধ্যেকার অদৃশ্য রশ্মি আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি এই কিরণ-শক্তি। শক্তি আধারহীন হইয়া কাজ করিতে পারে না। ক্লোরোফিল রং ঘটকের কাজ করে। উহা জল, কার্ব্বন্ ডাই-অক্‌সাইড ও সূর্য্যকিরণ সম্মিলিত করিয়া চিনি নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করে। জলের বা কার্ব্বন্ ডাই-অক্‌সাইডের নিজেদের কোন শক্তি নাই অর্থাৎ উহাদের পোড়াইলে তাপ বা অন্য কোন রকম শক্তি (এনার্জ্জি) বাহির হয় না। কিন্তু চিনির শক্তি আছে। উহা পোড়াইলে তাপ বা অন্য প্রকার শক্তি নির্ম্মিত হইতে পারে।

এই ভাবে প্রস্তুত চিনি হইতে সহজেই শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। শ্বেতসার আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য—চাল, ময়দা, ডাল প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

সবুজ পাতায় প্রথমতঃ চিনি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পাতার দেহে অতিরিক্ত চিনি জমিলে জীবনপদার্থের (প্রোটোপ্লাজ্‌ম্) উপর কতকটা বিষবৎ কার্য্য করে। অতিমাত্রায় চিনি প্রোটোপ্লাজ্‌মের জল টানিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া কাতর করে। কেহ যদি খালি পেটে এক

গেলাস ঘন চিনির রস পান করে তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার পেটে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব হয়। ঘন চিনির রস পেটের ভিতরের কোষগুলির মধ্য হইতে জল টানিয়া লইয়া তাহাদিগকে শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলে।

অতএব সবুজ পত্রে যাহাতে অতি মাত্রায় চিনি না জন্মে সেজন্য ঐ চিনি 'আলোক গঠন' ক্রিয়ায় অব্যবহিত পরেই শ্বেতসারে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া বহু শ্বেতসার কণা উদ্ভিদের বীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভ্রূণের আহারের জন্য সঞ্চিত থাকে। শেতসার চিনির মত সহজে জলে দ্রবীভূত হয় না, এজন্য উহা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌কে শুষ্ক করে না।

পাতার গায়ে ছবি উঠিয়াছে।

সূর্য্যকিরণের সাহায্যে গাছের পাতায় শ্বেতসার প্রস্তুত হওয়ার ভারী সুন্দর একটি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ্' তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যাহাদের ফটো তোলার বাতিক আছে তাহাদের নিকট হইতে সহজেই এই রকম একটি নেগেটিভ সংগ্রহ করা যায়। এই রকম একটি নেগেটিভ লইয়া সকাল ... একটি গাছের পাতায় বাঁধিয়া রাখ। বিকাল বেলা ... পাতাটি ছিঁড়িয়া য়্যালকহলের সাহায্যে ক্লোরোফিল ... তাড়াইয়া পাতার গায়ে একটু আয়োডিন লাগাইয়া ... দেখিবে 'নেগেটিভের' আসল ফটোটি পাতার উপর ফুটি... উঠিয়াছে। সূর্য্যের আলোয় পাতায় শ্বেতসার তৈয়া... হইয়াছে। উপরে নেগেটিভ থাকায় পাতার সর্ব্বত্র সমা... সূর্য্যালোক পায় নাই, নেগেটিভের সাদা কালো অ... অনুযায়ী কম বেশী সূর্য্যালোক পাতায় ঢুকিতে পাইয়া... এবং তদনুযায়ী শ্বেতসারও কম বেশী প্রস্তুত হইয়াছে ... শ্বেতসারের সহিত আয়োডিন লাগিলে নীল হইয়া যা... তাই এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ একটি ছবি... নমুনা এই সঙ্গে দিলাম।

উদ্ভিদে চিনি প্রস্তুত হইবার পর উদ্ভিদের প্রোটো... প্লাজ্‌ম্‌ ঐ চিনিকে কতকাংশে তৈলে পরিণতঃ করি... নানা স্থানে, বিশেষতঃ বাদাম, নারিকেল, তিল, সরি... প্রভৃতির বীজে সঞ্চিত রাখে।

উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ চিনির সহিত শিকড়ে... সাহায্যে বা অন্য উপায়ে গৃহীত জলে দ্রবীভূত বিবিধ ল... পদার্থের সংযোগ সাধন করিয়া জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খা... প্রোটীনের সৃষ্টি করে।

আলোকের সাহায্যে উদ্ভিদ্-দেহে ভিটামিন 'এ... নির্ম্মিত হয়। উদ্ভিদ্-দেহ হইতে প্রোটীন, কার্ব্বোহাইড্রে... ও স্নেহ (তৈল) ও ভিটামিন জীবদেহে গমন করে... ফলতঃ আমাদের সকল খাদ্যই সূর্য্যের সাহায্যেই নির্ম্মি... হয়, এবং সূর্য্যালোকের অদৃশ্য আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি... গুলি ঐ সকল অত্যাবশ্যক কার্য্যে প্রধান কর্ত্তা।

যে সকল বস্তু আমরা চোখে দেখি না তাহাদের দ্বা... ব্রহ্মাণ্ডের কত বড় বড় কার্য্য সংঘটিত হইতেছে ভাবিলে... অবাক্ হইতে হয় না কি?

রাত্রি-গগনে হাজারো তারকা,
দিবার কপালে সূর্য্য টিপ,
বিশ্বের আলো ম্লান হবে তবু
নিভিলে দিবার একক দীপ।

রাজ্য ও রাজা তারকার সম
সীমাহীন দূরাকাশে
কভু জ্বলে, কভু নিভে পুনঃ তারা
বৃথাই শান্তি আসে।

—শ্রীনলিনীভূষণ দাশ...

মানুষ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

...বস্থা এখন অনেক শান্ত হ'য়ে এসেছে। বর্বর ...র মতন কালো, ভয়ঙ্কর সেই সব দিন আর রাত ... আর নেই। ধর্মের নামে সেই পাশবিক কীর্তি; ...লে বিধর্মীর বাড়ি চড়াও হয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড; ...র অন্ধকারে কিংবা রক্ষীদের সামনেই দিনের ...তেও বিকট চীৎকারের সঙ্গে অর্দ্ধ-সভ্যদের লুণ্ঠন আর ...লীলা!

...শান্তিপ্রিয় মানুষদের উদ্বেগে রাত জাগবার আর বড় ...দরকার হয় না। মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতির অভিজ্ঞতায় ... আসছে সাধারণ লোকের শুভবুদ্ধি আর সুস্থ ...।

কিন্তু রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মতন দুর্বৃত্তের দল ...া নিবৃত্ত হয় নি। এখনো তারা একঘরে হয় নি ...র সমাজে, নিজেদের স্বধর্মীদের কাছেও কোণ-ঠাসা ... শুভদিন এখনও উদয় হয় নি শহরে। সাত খুন ...য়ে যাবে যদি ধর্মের নাম মুখে রাখে—বছর খানেক ...বদ্ধমূল হতে-থাকা এ ধারণাটা তাদের মন থেকে ... ফেলা হয় নি এখনো। তাই প্রকাশ্য রাজপথের ...দিন দুপুরে ঝলক দেয় কাপুরুষ ছুরি—প্রাণ হারায় ... পথচারী। সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিক্ দেখে পথ চলে ... পথিকেরা; আর কোন রকমে অক্ষত শরীরে বাড়ি ...লে নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

...হরের বিভিন্ন অঞ্চল এখনো ভাগ হয়ে আছে ...সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। তবে, মিশ্র এলাকাগুলোর ...া খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পরস্পরের ... আড়চোখে চাউনি একেবারে যায় নি বটে, তবে ...ফুটপাথে পাশাপাশি চলা এখন অনেকখানি সহজ।...

...নেই একটানা ৪৮ ঘণ্টা কি ৭২ ঘণ্টা ঘরবন্দী থাকবার ... এখন কমে এসে ১০ ঘণ্টায় নেমেছে। এখন ... সাধারণতঃ একটা দু'টো খুন হয়। কোনদিন ...দু'টোর বেশি খুন হয় কিংবা সেই পাড়ার ছেলেরা ...দের শায়েস্তা করবার জন্যে তৈরি হয়—অমনি ১০ ...থেকে ৩৫ কি ৪০ ঘণ্টা বেড়ে যায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ। আর খুনী বদমায়েসদের বদলে হয়তো জন-কতক গোবেচারাকেই উত্তম-মধ্যম ঠেঙ্গিয়ে আর কিছু লোককে গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে খানিক আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এ-রকম ব্যাপার রোজ ঘটে না এই যা রক্ষা! তাই সাধারণতঃ ১০ ঘণ্টা ক'রেই থাকে সান্ধ্য আইন।

এমনি এক জায়গার একটি ছোট্ট ঘটনা। ঘটনাটা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও এখানকার লোকেদের একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনে একটু মজার খোরাক দিয়েছে।

গোটাকতক হত্যাকারীর অপরাধে এ-অঞ্চলের সমস্ত নিরপরাধ লোক ভোগ করছে অসাধারণ অসুবিধা। সন্ধ্যে সাতটা থেকে ভোর পাঁচটা সকলকে ঘরে আটক থাকবার ঢালাও হুকুম আছে কর্তাদের। তাই একদিকে আড্ডায় ব'সে পৈশাচিক হাসিমুখে ছুরি শানায় খুনীরা আর অন্য দিকে অভিশপ্ত জীবন কাটায় নির্দ্দোষী সাধারণ মানুষ। জীবন ধারণের জন্যে দরকারী জিনিষ এখন ঘরে আনাই অনেকের পক্ষে শক্ত। অর্ধেক দিন দোকান বন্ধ, আর খোলা থাকলেও অর্ধেক জিনিষ নেই!

দু' সম্প্রদায়ের লোকই এখানে থাকায় অনেক জায়গায় ডিঙিয়ে যেতে হয় অপর পক্ষকে। নানা বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে লোকের জীবন। তার ওপর আবার চোরা বাজারের সুড়ঙ্গ এই দুর্যোগের সুযোগে আরো বেশী অন্ধকার হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের এখন ঘোরবার সময়ও কমে এসেছে সান্ধ্য আইনের কল্যাণে। উপসর্গের আর শেষ নেই যেন!

সন্ধ্যে সাতটা থেকে সান্ধ্য আইন।...

সেদিন তখনো সাড়ে ছ'টা বাজে নি। কিন্তু এরই মধ্যে কোন্ অদৃশ্য হাতের তাড়া খেয়ে মানুষের দল ছুটছে ঘরমুখো! তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছতে হবে। হাতে কিছু সময় থাকা ভাল, যদি কোথাও কোন কারণে দেরি হয়ে যায়! আর কিছু না হোক্, এ বিষয়ে রক্ষকদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব-বোধ প্রখর! তাই ট্রামে, বাসে, পায়ে হেঁটে ফিরছে সবাই কাজের জায়গা থেকে। কারুর

হাতে রেশনের থলি, কেউ বা আনছে খুচরো বাজার, খালি হাত দুলিয়ে ফিরছে অনেকে। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ হয়ে এসেছে। ট্রাম, বাস্ আর নতুন ক'রে বেরুচ্ছে না, যে দু'একখানা বাইরে ছিল এখন ঘণ্টা বাজিয়ে ভেঁপু দিয়ে চলে আসছে ডিপোর দিকে।

হিন্দু মুসলমান দু'-এরই বাস এখানে বহুদিন থেকে। তারা এখানে পাশাপাশি মিলে মিশে বাস ক'রে এসেছে। ধর্ম-জড়ানো এই নীতিহীন রাজনীতি কোনদিন তাদের সদ্ভাব ও সভ্যতা নষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু গত আগষ্টের সেই বর্বর দাঙ্গার পর থেকে সে ভাব আর নেই। সন্দেহ আর অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এখন সকলের মন।

হিন্দু মুসলমানের পাড়া তাই মোটামুটি ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে এতদিন পরেও সম্পূর্ণ ভাগ হ'তে পারে নি—দু'সম্প্রদায়েরই লোক এমন মেশানো ছড়ানো রয়ে গেছে! এপারে ওপারে, এমন কি কোথাও আবার গায়ে গা লাগানো পরস্পরের বাড়ি, আর পাশাপাশি বস্তী!

সেই ধরণের একটি পাড়া। তার রাস্তাটা ট্রাম লাইন থেকে চলে এসেছে পশ্চিম দিকে।...

তখন সাতটা বাজতে আর মিনিট পনেরো বাকি। দেখতে দেখতে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। দু' চারজন মাত্র তাড়াতাড়ি ফিরছে বাড়ি। রাস্তার ধারে অনেক বাড়ির দরজাই বন্ধ হ'য়ে গেছে। কোথাও বা দরজার সামনে, বাড়ির বারান্দায় কিংবা ছাদের ওপর থেকে লোক চেয়ে দেখছে রাস্তার দিকে, নতুন কিছু ঘটে কিনা!

এমনি সময় হঠাৎ ট্রাম লাইনের দিক্ থেকে একটা লোক এসে হাজির হ'ল পাড়ার মধ্যে। ভিখিরির মতন চেহারা তার: পরনে একটা ছেঁড়া, ময়লা খাকি পাজামা; খালি গা, মাথায় এক চাপড়া চুল। শহরের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে বেঁচে-থাকা এই রকম লোককে সস্তা হোটেলের আশে পাশে, বস্তীর আনাচে কানাচে দেখা যায়। অন্য সময় হ'লে কেউ এ ধরণের চেহারার মানুষকে চেয়েও দেখত না। কিন্তু এই সময়ে লোকটাকে ঘাটে-এসে-আটকানো শ্যাওলার মতন কেউ ভাবলে না। তাকে দেখে অনেকেরই মনে একটু করুণার সঞ্চার হ'ল। এই দুঃসময়ে বেচারি বোধ হয় আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রাস্তায় তখন লোক প্রায় নেই। তাই তার সহজেই অনেকের নজর পড়ল।

লোকটা যেন রাস্তার অদ্ভুত জনশূন্য চেহারা কি রকম হয়ে গেছে। ভয় পাওয়া অবোধ জন্তুর মত মুখচোখের ভাব। সামনেকার বাড়িগুলোর দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে; আর বারান্দায় বা ছাদের ওপর লোক দেখলেই মুখ উঁচু ক'রে বলছে, 'আমার বড্ড পেয়েছে। আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

মুখে আর অন্য কোন কথা নেই। রাত্রের আশ্রয় ভিক্ষাও নেই!

অনেকেরই মায়া হ'ল তার অবস্থা দেখে। সাহায্য করবার কথাও ভাবলে কেউ কেউ। সম্প্রদায়ের গরীবের জন্যেও আজকাল সহানুভূতি কিনা!

কিন্তু সাহায্য করবার আগে ত' জানা দরকার লোকটা কোন্ সম্প্রদায়ের! যাকে তাকে ত' উপকার করা চলে না! সেই হয়েছে মুস্কিল!

সেইটা কায়দা ক'রে জেনে নেবার চেষ্টা করলে ও-বাড়ির লোকেরা।

'তোমার নাম কি?'—এদিকের একটা বাড়ি জিজ্ঞেস করলে তাকে।

লোকটা উত্তর না দিয়ে নির্বোধের মত লাগল এদিক্ ওদিক্।

'চট্‌পট্ নামটা ব'লে ফেল না, আর বেশি সময় নে

তবুও তার মুখে কোন জবাব ফুটতে না দেখে ও লোকেরা ভাবলে, 'তা হলে আমাদের লোক।'

'তুম্‌হারা নাম কেয়া হ্যায়, আঁ?'

কিন্তু চোখে তার তেমনি দিশাহারা ভাব আর নিরুত্তর সে।

'নিজের নামটাও কি মনে নেই নাকি রে?'— হয়ে বলে উঠল একজন।

লোকটাকে দেখে মনে হ'ল, এই সব কথা সে হয় একেবারেই বুঝতে পারছে না। তার মুখ

অবস্থা দেখে ততক্ষণে কেউ কেউ মজা দেখতে করেছে। সহানুভূতির জায়গায় জেগেছে কৌতুক।

ওদিকের একটা বাড়ি থেকে প্রশ্ন হয়—'আরে, কো নাম কেয়া হ্যায়?'

যার উদ্দেশে বলা তার বদলে জবাব দেয় এ-বাড়ির লোক: 'ভুলে গেছে, ভুলে গেছে।'

কথাটায় চারদিকে একটা অট্টহাসির ঢেউ খেলে গেল। লোককে এক সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখেই বোধ লোকটার মুখ ফুটল।

নিজের পেটটা দেখিয়ে আবার সে বোকা-মুখে বলে 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

তখনো যাদের মনে সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল তাদের কে একজন বুদ্ধি খরচ করে জিজ্ঞেস করলে, 'তুই চ' না 'এম্'? শীগ্‌গির বল্!'

ওদিক্ থেকে সোজাসুজি প্রশ্ন হ'ল, 'তুম্ কোন্ জাত?'

লোকটা কিন্তু কোন পক্ষকেই খুশী করতে পারলে না। কের এই চ্যাঁচামিচিতে আবার তেমনি ফ্যাল ফ্যাল- খ দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ওপর।

তখন একজন বলে উঠল, 'আরে, এ একটা পাগল!'

অমনি চারদিক্ থেকে অনেক গলা মিলে হৈহৈ করতে লাগল, 'পাগলা, পাগলা।...'

'এই পাগলা, পালিয়ে যা। ধরে নিয়ে যাবে, পালিয়ে যা...'

কিন্তু তখন সে পালাবে কোথায়? যে দু' একটা বাড়ির দরজা তখনো খোলা ছিল, দুড়দাড় শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কেউই আর বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে রাজি নয়।

সাতটা বেজেছে। ওই কর্ত্তব্যপরায়ণ রক্ষীদের গাড়ি আসছে।...

পাগলা তখন পুরোপুরি পাগলের মতন বন্ধ দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ছুটোছুটি করছে: 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

বাঁশী বাজিয়ে হু-হু শব্দে একখানা রক্ষীবাহী ট্রাক্ এসে থামল। অপরাধ গুরুতর। সাতটা বেজে গেছে। অপরাধীকে তখনই টেনে তুলে নেওয়া হ'ল, তার পর ট্রাক্‌টি ছুটে চল্‌ল যেদিক্ থেকে এসেছিল সেই দিকে।

বাংলা সাহিত্যের গল্প

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্ এ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বহুদিন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের ন পণ্ডিত ছিলেন। এঁর জীবনী সম্বন্ধে তেমন কিছু া যায় নি। ইনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ ন; লেখপড়া শেখেন নাটোরে। মার্সম্যান প্রভৃতি াদের মতে ইনি একজন "বিদ্বান্" ব্যক্তি ছিলেন। য়া ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল বেশ। এঁর সাহায্য পেলে কেরি সাহেবের পক্ষে উড়িয়া ভাষায় বাইবেল াদ করা বোধ হয় সম্ভব হ'ত না। "রাজাবলী" নামক থেকে বোঝা যায় বিদ্যালঙ্কার মশায় চট্টোপাধ্যায় ন: "গ্রন্থকারের পৌত্র শ্রীবেহারিলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ৫২নং ভবন হইতে প্রকাশিত" —বইটির প্রকাশ-কাল সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজা রামমোহন যে এঁকে ভট্টাচার্য্য বলে মনে করতেন তা তাঁর "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" নামে যে বইটি রয়েছে তা পড়লেই বেশ বোঝা যায়।

বিদ্যালঙ্কার মশায়ের নামে যে কয়খানি রচনা রয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ক'খানিই প্রধান:

(১) বত্রিশ সিংহাসন—১৮০২ (২) হিতোপদেশ—১৮০৮ (৩) রাজাবলী—১৮০৮ (৪) প্রবোধ চন্দ্রিকা—১৮১৩।

এই গুলির মধ্যে প্রথম দু'খানি হচ্ছে অনুবাদ গ্রন্থ।

"বত্রিশ সিংহাসন" সংস্কৃতের অনুবাদ। রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম আমরা সকলেই জানি। সেই বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে "বত্রিশ সিংহাসনের" নাম নিবিড় ভাবে জড়িত। গ্রন্থটিতে বত্রিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। রচনায় পারশী শব্দের প্রাধান্য নেই বললেই হয়। সংস্কৃতের প্রভাবই বেশী এখানে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর অনেক পরে উজ্জয়িনীর প্রান্তে তাঁর সিংহাসন মাটির তলায় চাপা পড়ে। তারও অনেক কাল পরে রাখালের ছেলেরা মাঠে খেলা করতে করতে একটু উঁচু ঢিপি দেখতে পেয়ে সেটাকে নিজেদের সিংহাসন মনে ক'রে রাজা রাজা খেলতে থাকে। তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজন রাজার অভিনয় করে—আর বাকি সবাই ঝগড়া ক'রে তার কাছে বিচারের জন্য যায়। রাজাও বিচার করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাখাল রাজা যে 'রায়' দেয় সত্যিই খুব জ্ঞানী রাজা ছাড়া আর কারুর পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে রাখাল রাজার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ওখানকার রাজার কানেও সে সংবাদ গেল। রাজা ভাবলেন নিশ্চয়ই ওখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন রয়েছে। লোকজন নিয়ে তিনি সিংহাসনটা তুলে নিয়ে এলেন নিজের রাজসভায়। সিংহাসনের চারপাশে বত্রিশটা পরী ছিল। পরীগুলো অবশ্য পাথরের। অনেক ধুমধাম ক'রে রাজা সিংহাসনে যেই বসতে গেলেন অমনি একটি পাথরের পরী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের তুল্য গুণশালী নয় সে এই সিংহাসনে বসবার অধিকারী নয়।' ব'লে পরী একটি গল্প বল্‌ল। এমনি ক'রে একটির পর একটি পরীর মুখ দিয়ে গল্পগুলি এগিয়ে চলেছে।

ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরীতে বত্রিশ সিংহাসনের ১ম সংস্করণের শিরোনামা হচ্ছে এই :

বত্রিশ সিংহাসন। সংগ্রহ ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০২।

গল্পাংশ :

মাটির ভেতর থেকে সিংহাসন উদ্ধার ক'রে রাজা সিংহাসনটিকে নিজের রাজসভায় আনিয়ে তার উপর বসবার উপক্রম করেছেন :

"তৎপর ধরাধামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন স্বর্ণরূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্ভতে শোভিত রাজসভা মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিতলোকেরদিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ করিয়া ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দুর্ব্বা চন্দন অগোর কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর অস্ত্রশস্ত্র পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পনাদি সামগ্রী সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক চর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আনয়ন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপর শ্রী রাজা গুরু পুরোহিত প্রতি ব্রাহ্মন পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সৈন্য-সেনাপতি পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উ হইলেন (;) ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রা কহিতে লাগিলেন। (:) হে রাজা (—) শুন (; রাজা গুনবান (,) অত্যন্ত ধনবান (,) অতিশয় দা অত্যন্ত দয়ালু (,) অতি বড় শূর (,) সাত্বিক স্বভ সদাউৎসাহশীল (,) প্রবল প্রতাপ হন (—) সেই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য (;) সামান্য উপযুক্ত নয়।"

ভাষা পড়তে বেশ কষ্টকর—যেন পাথর কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের সব সময় রাখতে হবে যে কোন স্থায়ী জিনিষ তৈরি করতে সব চেয়ে প্রথম যা আমাদের চাই তা হচ্ছে শক্ত গ উপরে যে অংশটুকু দেওয়া হ'ল তা থেকে এটা বেশ যায় যে বিদ্যালঙ্কার মশায় সংস্কৃতে বেশ একজন ছিলেন। আভিধানিক বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা তাই ব্যবহার করতে পেরেছেন।

বিদ্যালঙ্কার মশায়ের দ্বিতীয় অনুবাদ "হিতোপ গ্রন্থটি সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রকাশের তারিখ বলেই মনে হয়। গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণের শিরোনামা এই রকম :

"পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। মি সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এতচ্চতষ্টয়াবযক বিশিষ্ট পদেশ। বিষ্ণুশর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বাঙ্গালা ভ

য় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে তৃতীয় বার ছাপা । ১৮১৪।

মৌলিক রচনার মধ্যে "রাজাবলী" আর "প্রবোধ- কা" অন্যতম। "রাজাবলী" প্রকাশিত হয় ১৮০৮ ন্ধে। গ্রন্থটিকে কয়েকটি রাজার গল্প বলা হয়েছে। শিরোনামা হচ্ছে :

"রাজাবলী। অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের কার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ তিহাস।" গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুগ থেকে— শেষ হয়েছে সিরাজউদ্দৌলার পতনে বাংলায় াজদের শাসন প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত। বইটিকে একটি বাহিক ইতিহাস বলা চলে না—কল্পনাপ্রসূত গল্পই ।

জড়তা না থাকলেও মাঝে মাঝে ভাষাটি বেশ ল হ'য়ে পড়েছে। এখানেও সংস্কৃত ভাষাকেই আদর্শ র বিদ্যালঙ্কার মশায় এগিয়ে গেছেন। নিম্নলিখিত া পড়লেই 'রাজাবলী'র ভাষার সঙ্গে খানিকটা পরিচয় । রাজা জয়চন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইখানে : "কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল ক্রম ছিলেন (,) এবং বড় ধনী ছিলেন (;) কাহাকে ত।,) কাহাকে প্রীতিতে (—) এইরূপে প্রায় রিকা খণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়া ন।) তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক ছিলেন (;) তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর ত হয় তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল পরে রাজা একদিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা লেন যে আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর ত করি সে তোমার মনোনীত হয় না (—) তে তোমার মনস্থ কি তাহা আমাকে কহ (;) আমি রূপ ব্যবস্থা করি।"

ভাষার দিক্ থেকে "প্রবোধচন্দ্রিকা" লেখকের একটি ষযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাকাল—১৮১৩ খৃষ্টাব্দ। নামা হচ্ছে এই :

"প্রবোধচন্দ্রিকা। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ফোর্ট লিয়ম কলেজের ছাত্রদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীরামপুর দ্যালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৩৩।"

গ্রন্থটিকে আটটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ভাষা বেশ শক্ত আর সংস্কৃতবহুল। এই সময়কার ভাষাই আধুনিক বাংলা গদ্যের ভাষা সৃষ্টি করেছে। ভাষার মধ্যে বিশেষ শৃঙ্খলা নেই। কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার স্থান পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য বেশী; গ্রন্থটির মধ্যে গল্প আর প্রবন্ধ সব জড়ানো। কিন্তু তা হ'লেও বিদ্যালঙ্কার মশায় চেষ্টা করেছেন যাতে "প্রবোধচন্দ্রিকার" ভাষার ভারটা সংস্কৃতের দিকে পড়ে।

নীচে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে খানিকটা তুলে দেওয়া হ'ল; এখানে কথ্য ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাবে :

"ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল (,) তবে কি আজ খাওয়া হবে না (?) ক্ষুধার জ্বালায় কি মরিব, (?) তৎপত্নী কহিল মরুক ম্যানে (,) আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় (?) দেখি দেকি হাড়ীকুঁড়ী খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে।" ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের ব্রহ্মোপসনা ও বেদান্ত চর্চ্চার প্রতিবাদ ক'রে "বেদান্ত চন্দ্রিকা" (য়্যান্ য়্যাপলজি ফর্ দি প্রেজেণ্ট্ সিস্টেম্ অব্ হিন্দু ওয়ারশিপ্) প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা বইটির লেখক বিদ্যালঙ্কার মশায়ই। বইটি তিনটি ভাগে বিভক্ত : (ক) কর্ম্মকাণ্ড; (খ) উপাসনাকাণ্ড; (গ) জ্ঞানকাণ্ড। হিন্দুধর্ম্মে প্রতিমা-পূজাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করার জন্যই বইটি লেখা হয়।

হরপ্রসাদ রায়

এ যুগের শেষ গ্রন্থ বলা যেতে পারে হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষাকে'। বইটির শিরোনামা হচ্ছে : "শ্রীযুত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষ পরীক্ষা। হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮১৫"

গ্রন্থটিতে গল্প রয়েছে ৫২টি। গল্পগুলি বিদ্যাপতির লেখা সংস্কৃত গল্পের অনুবাদ। একদিন এক রাজা মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে কোন সাধুর পরামর্শ নেন। সাধু তাঁকে একজন "আসল মানুষের" সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা বলেন। কিন্তু আসল পুরুষ কাকে বলবো

আমরা? আসল পুরুষের কি কি গুণ থাকা উচিত গল্পগুলিতে তাই বলা হয়েছে।

ভাষার দিক্ থেকে এ বইটিতে বিশেষ কোন জিনিষ পাওয়া যায় না।

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

'ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্' নামটির সঙ্গে আশা করি তোমরা সকলেই পরিচিত। পৃথিবীর অদ্বিতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্র্যাড্‌ম্যানের নামটা কি আর শোন নাই?

তোমরা সকলেই জান, ক্রিকেট-জগতে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান কত উঁচুতে! একেবারে শীর্ষদেশে বলিলেও ভুল হয় না। আবার সেই শীর্ষস্থানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া আছেন এই ব্র্যাড্‌ম্যান্—অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। ক্রিকেট খেলায় প্রবল পরাক্রান্ত ইংল্যাণ্ড দলকে এবারেও টেষ্ট্ খেলায় তিনি কেমন করিয়া বার বার কাবু করিয়াছেন সে কাহিনী তোমরা রামধনুতেই পড়িয়াছ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ওয়াল্‌ট্ হ্যামণ্ড্ তাঁর কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ব্র্যাড্‌ম্যান্ বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্।" তিনি যে কত বড় খেলোয়াড় তার একটু আভাস স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের এই প্রশংসা হইতেই পাওয়া যায়।

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যানের পূরা নাম ডোনাল্ড্ জর্জ্জ ব্র্যাড্‌ম্যান্। ১৯০৮ সনে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌এ তাঁর জন্ম হয়। অর্থাৎ এখন তাঁর বয়স প্রায় ৩৯ বছর। ১৯ বছর বয়স হইতেই তিনি রীতিমত ক্রিকেট খেলা সুরু করেন এবং তার পরের বছরই (১৯২৮) ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট্ খেলিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া দলে নির্ব্বাচিত হন। তার পর বছরের পর বছর প্রত্যেকটি টেষ্ট্ খেলায় তিনি কেমন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে থাকেন সে কাহিনী যাহারা ক্রিকেট সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ রাখ তাহারাই জান। টেষ্ট্ খেলায় এত বেশী নাম কেউ কোন করে নাই।

ব্র্যাড্‌ম্যান্‌কে কিন্তু কেউ কখনও খেলা শেখায় নিজের চেষ্টায় এবং অদ্ভুত প্রতিভা-বলে তিনি খে কৌশল আয়ত্ত করেন।

তিনি একবার হ্যামণ্ডকে কথায় কথায় বলিয়াছি "আমাকে তো কেউ কোন দিন খেলা শেখা আমি নিজে নিজেই খেলতে শিখেছি। আমার হয়, আমাকে যদি কেউ খেলতে শেখাত তা হ'লে আমি এত নাম করতে পারতাম না। আমার মা তো দেখেছেন,—সময় সময় প্রায় চোখ বন্ধ ক'রেই আমার যদি একজন শিক্ষক থাকতেন, তা হ'লে আমার এই মারগুলো তিনি বন্ধ করে দিতেন। হলেই হয়েছিল আর কি! "স্কোরিং শট্" গুলিই ব গেলে আর কি ক'রে স্কোর করতাম বলুন তো!"

ব্র্যাড্‌ম্যান্ কি ভাবে নিজে নিজে খেলা শি তাহা শুনিলে খুবই মজা পাইবে। তাঁহার মত খেলা শিখিতে পারিলে কালে হয়তো তোমরাও ক্রিকেট খেলোয়াড় হইতে পার।

ব্র্যাডম্যান্ একটি ক্রিকেট ষ্টাম্প্ লইয়া সেটিকে ব মত করিয়া ধরিতেন আর দেয়ালটিকে উইকেট ম একটা টেনিস বল্ লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পি চলিতেন। মারিতে মারিতে ক্লান্ত হইয়া গেলেও হাল ছাড়িতেন না। তাঁহার লক্ষ্য থাকিত, কিছুতেই তিনি দেয়ালে আস্‌য়িা লাগিতে দিবেন এইরূপ ভাবে খেলা অভ্যাস করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তিনি কদাচিৎ 'বোল্ড্ আউট্' হ'ন। সম্বন্ধে একজন নাম-করা ক্রিকেট সমালোচক বলিয়াছি "ডন্‌কে বোল্ড্ আউট্ করা দুঃসাধ্য কেন,

...ার!" তিনি সাধারণতঃ "ক্যাচ্ আউট্" কিংবা ...ড্ আউট্' হ'ন।

...ব্র্যাড্‌ম্যানের ২।১টি ক্রিকেট রেকর্ডের কথা শোন। ...ম্যাচে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৩৪ রান্ করিয়া ...ড করেন। পরে অবশ্য হাটন্ ইহার চেয়েও বেশী ...ন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ব্র্যাড্‌ম্যান্ ৪৫২ রান্ করিয়া ...আউট্ থাকিয়া পৃথিবীর রেকর্ড করিয়া রাখিয়াছেন। ...ও কত রকম রেকর্ড যে তিনি করিয়াছেন তাহার ঠিক

ইংলণ্ডের একটি টেষ্ট্ মাঠের দৃশ্য।
ব্যাট্ হস্তে ব্রাড ম্যানকে খেলিতে যাইতে দেখিয়া ইংলণ্ডের 'বাচ্চা' দর্শকেরা সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে।

...। শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে মার্চেণ্টের নেতৃত্বে একটি ...ঠাই করা দল অষ্ট্রেলিয়ায় খেলিতে যাইবে। ব্র্যাড্‌ম্যান্ ...লের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব করিবেন। এই ধরণের ...নিজস্ব ১০০ সেঞ্চুরি শেষ হইতে তাঁর খুব বেশী দেরী নাই। ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলিয়াই তিনি সে রেকর্ড ভঙ্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। যে লোক টেষ্টের মত কঠিন খেলায় ইংলণ্ডের বাঘা বাঘা বোলারদের পরাস্ত করিয়া একদিনের মধ্যে (অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টায়) ২৪৪ রান্ তুলিতে পারে তার অসাধ্য কী-ই বা আছে!

ব্র্যাডম্যান্ যে শুধু বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় তাই নয়, তাঁর দেশপ্রেমও প্রচুর। অষ্ট্রেলিয়াকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শোন:

ব্র্যাড্‌ম্যান্ যেবার প্রথম ইংল্যাণ্ডে যান সেবারই টেষ্ট্ খেলায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। প্রথম তিনটি টেষ্টে তাঁহার স্কোর হয়—৮, ১৩১, ২৫৪, ১, ৩৩৪, ১৪, এবং ২৩২। দেখিয়া তো সকলের চক্ষুস্থির। তরুণ ব্র্যাড্‌ম্যান্‌কে ইংল্যাণ্ডে আটকাইয়া রাখিবার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের কর্ত্তৃপক্ষ অক্লান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখান হইল। প্রতি মাসে বাঁধা বেতন, তাহার উপর বছরে ৫০০ পাউণ্ড বোনাস্। কিন্তু ব্র্যাড্‌ম্যান্ বিনীত ভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রিকেট যদি তিনি খেলেন তবে নিজের দেশ অষ্ট্রেলিয়ার হইয়াই খেলিবেন; খেলোয়াড় হিসাবেই হউক আর যে ভাবেই হউক, স্বদেশের গৌরব বাড়ানই হইবে তাঁহার লক্ষ্য।

ব্র্যাড্‌ম্যান্ সম্বন্ধে আর একটি মজার গল্প শোন:

১৯৩৪ সনের কথা। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল সেবার ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়াছে। টেষ্ট খেলা চলিতেছে। ব্র্যাড্‌ম্যানের খেলার সময়ে অনেকেই লক্ষ্য করিলেন যে যদিও তিনি পূর্ব্ব খ্যাতি অনুযায়ী অপূর্ব্ব ভাবেই খেলিতেছেন, তবুও মাঝে মাঝে ফিল্‌ডিং করিবার সময়ে কোমরে হাত দিয়া কেমন নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িতেছেন! মাঠে আড়ষ্ট ভাব দেখান ব্র্যাড্‌ম্যানের পক্ষে একেবারেই নতুন, তাই দর্শকেরা সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। আসল

ব্যাপারটা জানা গেল সর্ব্বশেষ টেষ্ট খেলার পর। বিশ্ববাসী ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে শুনিল—ব্র্যাডম্যান্‌কে খেলা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি নার্সিং হোমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি এপেনডিসাইটিসে আক্রান্ত হইয়া সঙ্কটজনক অবস্থায় রহিয়াছেন।

সিডনীতে, লণ্ডন হইতে তেরো হাজার মাইল দূরে, মিসেস্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ খবরের কাগজে পড়িলেন যে ব্র্যাড্‌ম্যানের পেটে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে, এবং তাঁহার অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। সংবাদপত্রেই তিনি প্রথম খবরটি জানিতে পারিলেন।

মিসেস্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ খবর পাইয়া স্যার চার্লস্ কিংফোর্ড স্মিথ নামক একজন বৈমানিককে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে। স্মিথ্ সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার এরোপ্লেনটি তখনও ছিল কারখানায়, তাই তৎক্ষণাৎ রওনা হইতে পারিলেন না।

মিসেস্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ কালবিলম্ব না করিয়া ফ্রিমেনটিলে জাহাজ ধরিতে গেলেন। কিন্তু ধরিবার পূর্ব্বেই রেডিও খবর শোনা গেল—ব্র্যাড্‌ম্যান মারা গিয়াছেন।

মিসেস্ ব্র্যাড্‌ম্যানের মনের অবস্থা ভাবিয়া দে এমন স্বামী পাইয়াও এমন অকালে তাহাকে হারাইতে হইল! খবরটি তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিলেন তখনই চলিলেন ট্রাঙ্ক কল্ করিতে। বন্ধুবান্ধব যাঁহা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই খবরটি সত্যি বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং কাহা চোখই শুষ্ক ছিল না। যাক্, মূহূর্ত্তের মধ্যে দুইটি দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়া গেল।

যখন অপর দিক্ হইতে শোনা গেল নার্স বলিতেছে "মিঃ ব্র্যাড্‌ম্যান্ তাড়াতাড়ি আরোগ্য হচ্ছেন", তখ মিসেস্ ব্র্যাড্‌ম্যানের আর রিসিভারটি তুলিয়া রাখিবা ক্ষমতা ছিল না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ব্র্যাডম্যান্ সে যাত্রা ভালয় ভা বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। নহিলে পৃথিবীর সর্ব্বযুগের এক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে আমরা অকালে হারাইতাম।

জুজুবুড়ী

শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য

অশান্ত চোখে কার ঘুম নেই?
রাতদিন দুষ্টুমি করছে,—
দুধ-বার্লির বাটী দেখলেই
কোন্ ছেলে নাকী সুর ধরছে?

কে কোথায় যুড়ে দিল কান্না,
পুতুলটা রাগ ক'রে ভাঙ্‌লো?
ধূলোবালি দিয়ে ক'রে রান্না
রোদ্দুরে কার মুখ রাঙলো?

পাঠ্যের বই করি' তুচ্ছ
ডাং-গুলি খেলা কার ইচ্ছে?
উড়ে মালীটার শিখাগুচ্ছ
কার কাঁচিটারে পীড়া দিচ্ছে?

মার কোলে চড়বার বায়না
কোন্ ছেলে এইবার ধরলো?
বাবা কেন ঘোড়া হ'তে চায় না
এরি লাগি কার আঁখি ঝরলো?

মামার দোয়াত হ'তে হায় গো,
কে আবার কালি ঢেলে ফেললে?
অঙ্ক কষার খাতাটায় গো
কোন্ ছেলে কাটাকুটি খেল্‌লে?

কোন্ ছেলে চায় শুধু পয়সা,
ইচ্ছেটা তেলেভাজা কিনতে;
জানে নাকো 'স'য় আকারে হয় 'সা',
হ্রস্ব 'উ' পারে নাকো চিনতে!

জুজুবুড়ী খোঁজ রাখে এ-সবার,
দিনে তার মুখে নেই বুলিটা;
অপেক্ষা করে শুধু সন্ধ্যার
সেলাই করিয়া লয় ঝুলিটা।

সন্ধ্যা হ'লেই শুনি ও নাকি
সূর্যটা কুচি কুচি করিয়া,
বানাইয়া দেয় শত জোনাকি,
জ্বেলে দেয় সারা মাঠ ভরিয়া।

তারপর আঁধারের বক্ষে
পাতাদের খস্ খস্ শব্দ!
খুকুদের ঘুম নাই চক্ষে,
খোকারাও ভয়ে নিস্তব্ধ।

কী যে ভয় করে মাথা তুলতে!
কোল ঘেঁষে শোয় মা'র শেষটায়;
আঁধারের বিভীষিকা ভুলতে
বোজে চোখ প্রাণপণ চেষ্টায়।

ঘুম যদি আসে ভীরু চোখেতে,
স্বপন-দোলায় দোলে চিত্ত,—
তবু সেই স্বপনের লোকেতে
জুজুবুড়ী আসে-যায় নিত্য!

একটি রাতে

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অলোভরা চাঁদখানি গগন-কোণে
হাসিতেছে নিরবধি আপন মনে।
ঝকমকে আলো তার রাঙায়েছে চারিধার,
লুটিতেছে বালুচরে ফুলের বনে,
নদীজলে, বনতলে, সবার মনে!

অজানা ফুলের বাস বাতাসে ভেসে
উতলা হাওয়ায় গিয়ে আকাশে মেশে।
চারিদিক নির্জ্জন, বায়ু শুধু শন্ শন্
উড়িয়ে চরের বালু কোন্ সে দেশে
ক্লান্তিবিহীন যেন চলেছে ভেসে!

গাং-চিল অবিরাম রাত্রি জেগে
উদাস করুণ স্বরে মরিছে ডেকে।
দূরে দূরে— আরো দূরে বনানী ও মাঠ ঘুরে
ঝিলমিল নীল নদী গিয়েছে বেঁকে—
কাশ ফুল দু'টি কূল ফেলেছে ঢেকে।

দিক্‌শেষে বনানীর কোলটি ঘেঁষে
মেঘগুলি বায়ুভরে চলেছে ভেসে।
কত মেঘ লাল নীল— জ্যোছনায় ঝিলিমিল
ঝলে আর চলে সদা রঙিন হেসে,
নিরজন আকাশেতে অচেনা দেশে।

আমরা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ, বিদ্যাবিনোদ

বিন্দু আমরা, তবু সিন্ধুতে মিশি,
ক্ষুদ্র আমরা, তবু ত' মহান্ জাতি ;
মোদের বংশে জন্মেছে যত ঋষি,
মানুষ আমরা, দেবতা মোদের সাথী।

গোপাল খেয়েছে ক্ষীর, ননী, সর করে,
সে গোপাল আজো ফিরে শিশুরূপ ধরি ;
'অমু' 'অংশুরে' কোলে তুলে নিই যবে
গোপাল-ছোঁয়ায় যত জ্বালা বিস্মরি।

মোদের শক্তি ভক্তি হইয়া ঝরে,
প্রেমে স্বার্থেরে দিয়াছি বিসর্জন।
মোদেরে ত্রাণিতে নব শিশুরূপ ধরে
আসে ধরাধামে কাঙালের নারায়ণ।

বিস্ময়

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

হুল্লোড় করে ধূলো উড়িয়ে আসতে আসতে আচমকা মাঝপথে গাড়ীটাকে থামিয়ে ফেলতে হ'ল। নীলার কপালে ব্যথা উঠেছে,—ভয়ানক ব্যথা।

আচমকা এমনি একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। পাংশু মুখে দুই হাতে কপালের বগ চেপে ধরে ও মুখ গুঁজে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক রকমের ব্যথা। ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিলাম, তারপর সুরু করলাম 'ম্যাসেজ' করতে। মিনিট দশেকের মধ্যে বুঝতে পারলাম ম্যাসেজে ওর কিচ্ছু হবে না, মাথা ধরার জাতের এ জিনিষ নয়। কপালের শিরায় কোথাও কোন সাংঘাতিক রকমের ত্রুটি ঘটেছে, এ তারই ব্যথা।

সারাদিনের শালবনের চড়ুইভাতির স্বপ্নের পর এমনি জিনিষ ভাইবোনের মধ্যে কেউ ভাবতে পেরেছিলাম! গাড়ীর একপাশে ঢলে পড়ে আছে নীলা,—অসহ্য ব্যথায় সারা দেহটা বার বার নীল হয়ে যাচ্ছে, শাদা মুখটা ক্রমশঃ রক্তহীন হ'য়ে আসছে সাপে কাটা রোগীর মত। এই জনমানবহীন ফাঁকা রাস্তায় ডাক্তার কোথায় মিলবে? একটা লোকও নেই পথে-ঘাটে। কেবল দূরের অশথ গাছ থেকে কাকের এলোমেলো ডাক ভেসে আসছে অবিশ্রান্ত।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পেছনের ফেলে-আসা রা একটা লাল ইটের ডিস্‌পেন্সারি দেখেছিলাম। ফেরালাম, আবার ধূলো-ওড়ানো রাস্তায় দু' পাশে চোখ রেখে গাড়ী চালিয়ে চললাম। প্রায় এক চালিয়ে যখন বাগানওয়ালা লাল ইটের সেই একটু ডিস্‌পেন্সারিটা আবিষ্কার করলাম তখন উত্তেজনায় গা কাঁপছে।

থমথমে লাল ইটের ছোট্ট বাড়ীটা ; ডক্টর এম, বসু আর তাঁর বিলিতি ডিগ্রির প্রকাণ্ড নেম্‌প্লেটটা ধূলোয় ম্লান হ'য়ে গেছে। খোলা দরজা, ভিতরে ঢু ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। সৌম্য, ছোটখাট চেহারার ভদ্রলোক, বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে ; 'ষ্টেথোস্‌কোপ্‌টা' হাতে নিতে নিতে মুখের দিকে শান্ত গলায় বললেন, 'কি হ'য়েছে ?'

দাঁড়িয়ে কথা বলার মত শক্তি তখন আমার না। কোন রকমে তাঁকে দু'কথায় বুঝিয়ে ব'লে নীলাকে ধরাধরি ক'রে গাড়ী থেকে 'ডিস্‌পেন্সারির নিয়ে এলাম তখন তার আর জ্ঞান নেই। ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

মিনিট পনেরো ডাক্তার তাকে ভাল ভাবে

লেন, তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'কোন নেই আপনার। আপনার বোনের এ জিনিষ মাথা র জাতের নয়। এ ব্যথা ব্রেনের গোলমালে, অত্যন্ত ক্ষ বলেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন।'

বললাম, 'দু' বছর আগে এমনি একবার ব্যথা উঠেছিল, ব এমন ভাবে মাঝ রাস্তায় নয়।'

ডাক্তার হাসলেন, বললেন, 'আর যাতে এ ব্যথা নদিন না ওঠে তারই ব্যবস্থা করছি। ছোট্ট একটা পারেশনের ব্যাপার, মিনিট পনের কুড়ির জিনিষ।'

'অপারেশন!' আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

ডাক্তার বললেন, 'ভয় পাবেন না, আমি ভিয়েনার করা ছাত্র ছিলাম। এ অপারেশন ত' কিছুই না, কুড়ি নিটের মামলা। তারপরই আপনার বোনের এ অসুখ দিনের মত সেরে যাবে। তা ছাড়া—'ডাক্তার আমার খর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই রোগীকে যদি ন এই অবস্থায় টাউনে নিয়ে যান তবে পথে হয়ত লাপস্' করবে। ওষুধে কি করবে এই ব্যথায়? ত একটু চেপে রাখতে পারে, কিন্তু ও অনিশ্চয়তার নক বিপদ্।'

বললাম, 'তবে তাই করুন।'

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, 'আমাদের দেশে টেলি- নের ভয় আজও দূর হ'ল না। অপারেশনের ভয় যে ব দূর হবে কে জানে!' তারপর পিঠ চাপড়ে বললেন, পাবেন না, কিছু ভয় পাবার নেই এতে।'

নীলাকে ভিতরের অপারেশন করার হল্‌টাতে রেখে ইরে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তার বলেছিলেন, 'থাকলে কতে পারেন, তবে এটুকু অপারেশনের ব্যাপারে কোন সিস্ট্যাণ্টের প্রয়োজন নেই।' তবু থাকতে পারলাম না। ব জিনিষগুলোর ব্যাপারে আমি চিরকালই নার্ভাস্।

বাইরে বাগানটার ভিতরটায় পায়চারি করতে লাম। অযত্নে আগাছা, পরগাছা আর জঙ্গলে ভরে ছে বাগানটা। ডাক্তারের বোধ হয় যত্ন করবার ও নেই। সামনে বড় রাস্তার উপর একটা ভিজে ঘছা মাথায় জড়িয়ে একটা পশ্চিমা গরুর গাড়ী চালিয়ে ছে। কত জন্ম ঐ গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়া হয় না, টা বিশ্রী বিকট আওয়াজ উঠছে সেটা থেকে। চমকে উঠলাম, মনে পড়ে গেল নীলার অপারেশন হচ্ছে ভিতরে। ঘড়ি দেখলাম, এতক্ষণ নিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিট হয়েছে।

হঠাৎ দূরের পথের দিকে ধূলো উড়তে সুরু করল, তারপর কিছুক্ষণ বাদেই একটা প্রকাণ্ড কালো গাড়ী এসে থামল আমার গাড়ীটার পাশেই। তার ভিতর থেকে নামল উর্দ্দি পরা তিনজন লোক। একজনের উঁচু দরের অফিসারের মত চেহারা, তাঁর কোমরে গোঁজা একটা রিভলভার।

এমনি একটা নির্জ্জন জায়গায় হঠাৎ এতগুলো এমনি পোষাকের লোক দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

লম্বা মত চেহারার ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'পাগলা গারদের কর্ম্মচারী আমরা। এই ডাক্তারখানার পাগলা ডাক্তার প্রায়ই পালিয়ে আসে গারদ থেকে। আজও পালিয়ে এসেছে—এরই কাছাকাছি জায়গাতে থাকে।' তারপর বললেন, 'দেখেছেন নাকি কোন ভদ্রলোককে? ছোটখাট চেহারা, হাতে ষ্টেথোস্‌কোপ্?'

মনে হ'ল পায়ের আঙ্গুল থেকে চুল অবধি একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। স্তম্ভিতের মত বললাম, 'তিনি যে আমার বোনের মাথায় অপারেশন করছেন ভিতরে, ব্রেনের অপারেশন!'

পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক্ হয়ে ওঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সেই লম্বা ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এখন ভিতরে ঢোকা ঠিক হবে না। ডাক্তারকে নিজে থেকে বেরিয়ে আসতে দাও।'

আমি তখন দূরের মাঠের ধূলারণ্য দেখছি। গাছ-পালা, ঘাস, আকাশ সমস্তই ধূলোর মত ধূসর—অস্পষ্ট হয়ে আসছে আমার কাছে। পাশে যে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তা পর্য্যন্ত বুঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে চারটে কথা উচ্চারণ করি, 'তা হ'লে কি করি?'

একটা কথাও তাঁরা বলতে পারলেন না। ম্লান মুখে এ ওর দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন, তার পরে এক সঙ্গে আমার দিকে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ পেছনে শব্দ পেলাম, দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপরই ডাক্তার হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কম্‌প্লিট্; অপারেশন শেষ হয়ে গেছে, কোন ভুলচুক হয় নি। দেখে যান আপনার বোনকে। আর ঘণ্টা কয়েক বাদে জ্ঞান হয়ে যাবে, তার পর —'

তাঁর শেষের কথাটা আর সম্পূর্ণ হ'তে পারল না। পিছন থেকে দু'জন কর্ম্মচারী সবলে তাঁকে জাপটে ধরলেন। তারপর তুমুল হাতাহাতি ক'রে হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের গাড়ীতে ঠেলে তুললেন। একজন আমার সাহায্যের জন্য রইলেন, সহরে গেলে সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন।

কাউকে কোনদিন মাঝ রাতে বোবায় পেয়েছে? সেদিন ফিরবার পথে দিনের বেলায় আমাকে বোবায় পেয়েছিল। পিছনের সিটটায় স্থির হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে নীলা; এখনও স্পন্দন আছে, কতক্ষণ সেটা থাকবে কে জানে!

পাশের লোকটি কতগুলো কথা বললেন, তারপর একটা উত্তরও না পেয়ে চুপ করে রইলেন। আমি তখন গাড়ীর স্পীড্ বাড়াচ্ছি। ডাইনে বাঁয়ে গাছপালা সাঁ সাঁ করে পিছনে পালাচ্ছে! দূর ছবির মত গেঁয়ো চাষীর দল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার পরই হাওয়ার বেগে পিছনে সরে যাচ্ছে। নিজের বড় বড় নিঃশ্বাসগুলোর আওয়াজ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। হাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ কানে এসে বাজছে। কত দূর সহরের পথ?

দূরে ঝিকিমিকি জোনাকীর আলোর মত বুঝতে পারলাম প্রায় সহরে এসে গেছি। তারপর বাদে পাশের ভদ্রলোককে নামিয়ে দিয়ে প্রায় সেই বড় রাস্তার চেনা একটা বড় ডাক্তারখানার পাশে গাড়ী থামালাম। ধুলোয় গাড়ীটার তখন আর বাকি নেই। তারপর নীলাকে ডাক্তার রায়ের অপা রুমে নিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'দেখুন এ বসেছে, কোন রকমে বাঁচানো যায় কিনা একবার করুন।'

আমার পাগলের মত চেহারা আর ধূলোবালি জামা-কাপড় দেখে বিস্মিত ডাক্তার একটা কথাও না ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার ফিরে এসে বললেন, 'আ বোন এক্ষুনি সেরে উঠবেন। মরে যাবার মত অ অবিশ্যি হয়েছিল, কিন্তু একটা অদ্ভুত অপারেশনে ভাল হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ বাদেই জ্ঞান ফিরবে।'

তারপর শাদা দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তা চশমাটা হাতে নিয়ে বললেন, 'এইটাই সবচেয়ে অ লাগছে! আশ্চর্য্য লাগছে এমন অপারেশন ব্রেনের অপারেশনে এ সহরে কার এমন ভাল হাত আ তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এক ছিল, কেবল একজনই এমনি অপারেশন করতে পা কিন্তু সে ত' সুস্থ নয়। বহুদিন হ'ল আটক র পাগলা-গারদে!'

লড়ুয়ে চড়াই

শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ

ছোট্ট চড়াইয়ের সঙ্গে তোমাদের সবায়েরই পরিচয় আছে। পাখীটি দেখতে ছোট্ট এবং নিরীহ হ'লেও তার পেটে যে কত হিংসে এবং তার লড়াই করবার প্রবৃত্তি যে কতটা প্রবল, তার খোঁজ তোমরা কেউ রাখো কি? তা হ'লে শোনো চড়াইয়ের হিংসুটেপনার একটি কাহিনী। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে চড়াই পাখী বাড়ীর কড়িকাঠে বাসা বাঁধতে খুব ভালবাসে। এক একযোড়া চড়াই আমার শোবার ঘরে এসে বাসা বাঁ কয়েকদিন পরে আর একটি পাখী অন্য একটি কড়ি তার আস্তানা গাড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কি চড়াই দম্পতি কিছুতেই তাকে থাকতে দিল না। দে

া মাত্র এরা তাকে তাড়া ক'রে যায়, আর একেবারে র বাইরে বার ক'রে দিয়ে তবে নিরস্ত হয়। শেষ স্ত ও বেচারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হ'ল।

আমার শোবার ঘরে একটা প্রমাণ মাপের আয়না ছ। একদিন দেখি, পুরুষ পাখীটি ক্রমাগত তার র ঠুক্‌রে যাচ্ছে। কি ব্যাপার! পরে বুঝলাম, নিজের র সঙ্গে ও লড়াই করছে। তোমরা বল্লে বিশ্বাস বে না—সমস্ত দিন ও ঐ ভাবে আয়নাটাকে ঠোক্‌রাত। "ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হ'ত ব্যথা" তখন একটা জানলার ওপর বসত; কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে র দ্বিগুণ উৎসাহে আয়নাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। র মাঝে দেখতাম ওর সঙ্গিনীটিও এসে বসেছে জানলার —বোধ হয় ওকে উৎসাহ দেওয়াই উদ্দেশ্য!

দিনের পর দিন পাখীটা এইভাবে যুদ্ধ করতে লাগল। াম, আরও কিছুদিন এ রকম ছায়ার সঙ্গে কুস্তি চললে টা মারা যাবে। আয়নাটা আমি ঢেকে দিলাম। রা যদি ভেবে থাক আয়না ঢাকা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হ'ল তা হ'লে ভুল ছ। আমাদের দালানে একটা ছোট আয়না ঝোলান অবাক্ হয়ে দেখি সেই আয়নাটাতে ও গিয়ে বসেছে, আবার পূর্ণোদ্যমে লড়াই ক'রে চলেছে। আয়নাটা উল্টে দিলাম। কিন্তু তবুও ও নিরস্ত হ'ল না। তে যেখানে যেখানে আয়না ছিল, সর্ব্বত্র ও গিয়ে ত লাগল। শেষকালে আমিই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে য়।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন দুপুরবেলায় মি শোবার ঘরে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ একটি চড়াই (আমার ঘরের বাসিন্দা নয়) ফর্‌ফর্ ক'রে কড়িকাঠ ক নেমে এসে দরজার ওপর বসল। দেখলাম তার মুখে কতকগুলো খড়কুটো এবং লাল মত কি একটা জিনিষ। পাখীটা সেই লাল জিনিষটা ঠোঁটে চেপে ধরে ক্রমাগত দোরের ওপর আছড়াতে লাগল। আমি মনে করলাম, বোধ হয় খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধবে, লাল কাগজ-টাগজ কিছু একটা খড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেইটাই ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ওর দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে বিছানার দিকে চাইতেই দেখি ঠিক ঐ রকম আর একটা লাল জিনিষ বিছানায় পড়ে। ভাল ক'রে নজর ক'রে দেখলাম, সেটা একটা চড়াইয়ের বাচ্চা। গায়ে রোঁয়া গজায় নি, চোখও ফোটে নি—পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার হয়ে পড়েছে। আমার কেমন সন্দেহ হ'ল; উঠে গিয়ে দরজার ওপরকার সেই লাল জিনিষটা নামিয়ে আনলাম—ততক্ষণে পাখীটা উড়ে গিয়েছিল। দেখলাম সেটা কাগজ নয়, অনুরূপ আর একটি চড়াইয়ের বাচ্চা। তখন ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। পূর্ব্বোক্ত চড়াই দম্পতির বাচ্চা সবে ফুটেছিল হয়ত। যে পাখীটাকে এরা বিতাড়িত করেছিল, এদের অনুপস্থিতিতে সে-ই সম্ভবতঃ বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলে প্রতিশোধ নিয়ে গেল। সামান্য চড়াই পাখীর প্রতিহিংসা যে এত ভীষণ হ'তে পারে আমার ধারণাই ছিল না।

চড়াইয়ের একটি গুণ কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অসীম। আমার ঘরে যখন এরা প্রথম বাসা বাঁধতে সুরু করে তখন বিছানায় নানা রকম জঞ্জাল ফেলত ব'লে আমি এদের বাসা ভেঙ্গে দিতাম। কিন্তু যত বারই ভাঙতাম তত বারই এরা খড়কুটো নিয়ে আবার হাজির হ'ত। এইভাবে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল, তবুও এরা দমল না। শেষ পর্য্যন্ত এদের অধ্যবসায় দেখে মুগ্ধ হয়েই আমি এদের বাসা নষ্ট করা ছেড়ে দিলাম। এখনও এরা দিব্যি আরামে আমার ঘরে বসবাস করছে।

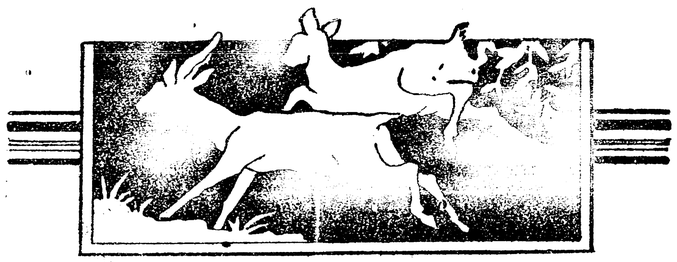

সিদ্ধপুরুষ

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

ক্রী-ী-ী-ী-ী-ী-ং-ং-ং- !

না, যত পারে বাজুক টেলিফোন। আজকের দিনের ভেতর এখন পর্য্যন্ত তিন-তিনটে রং-নাম্বার। কাঁহাতক আর সহ্য হয়! এবারে আর কিছুতেই না।

কিন্তু ক্রীং-নাদের ঠেলায় কানে তালা লাগবার যোগাড়। অগত্যা বাধ্য হয়েই অতনুকে রিসিভার তুলতে হ'ল—"হ্যালো, হ্যালো !"

ফোনের ওধার থেকে একটা মিহি স্বর ভেসে এলো—"আজ্ঞে, এটা কি প্রদ্যোত বাবুর বাড়ী? প্রদ্যোত সেন?"

"হ্যাঁ, প্রদ্যোত বাবুকে আপনার দরকার? তা' তিনি এখন বাড়ী নেই।"—ঝাঁঝালো গলা অতনুর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি, ভাল করেই জানি। তা আপনি প্রদ্যোত বাবুর কী হ'ন জানতে পারি কি?"

"প্রদ্যোত বাবু আমার বড় ভাই!…তা আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না!"

"আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি আপনার অচেনা একজন ভদ্রলোক। তা হ্যাঁ, দরকারটা আমার আপনাকে দিয়েই হবে।"

"তা বেশ তো, বলুন না যা আপনার কথা! তা একটু চট্‌পট্…"

সেই ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাসটা অতনুর কানে এসে বাজলো।—"এ কি আর, মশাই, তাড়াতাড়ি ক'রে বলবার মত কিছু! আমারো মশাই গত বছর এমনি একটা দুর্ঘটনায় একেবারে—।"

"কী হয়েছে?"—ব্যস্ততায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো অতনুর গলা।"

"অত ব্যস্ত হ'য়ে লাভ কি বলুন! দুঃসংবাদ শোনবার আগে বুকটাকে কঠিন ক'রে নিতে হয়, আর যে দেয় তারও সেটা আস্তে আস্তে ভাঙা উচিত।"

অচেনা হিতাকাঙ্ক্ষীর হিতোপদেশটা খুব বেশী ভালো লাগলো না অতনুর।

"আর দেখুন, বিধাতা পুরুষ কপালে যা লিখে রেখেছেন কার সাধ্য তার এক চুল এদিক্-ওদিক্ … কার সাধ্য তা খণ্ডায়?"

কী এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে অতনুর! অতনুর কপ… বিধাতা পুরুষ কী এমন লিখে রেখেছেন যা এই … পুরুষটির অজানা নয়!

"দয়া ক'রে যা বলবার বলে আমায় মুক্তি দিন, … আমায় এমনি ভাবে দগ্ধে মারবেন না।"—মিনতি … গলা অতনুর।

সেই ভদ্রলোকের স্বরটা ভারী হ'য়ে উঠলো।—"… দাতা কি আমি! দগ্ধে মারা-না-মারা কি আমার হাতে…"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই আপনার হাতে, মুক্তিদাতা… সবই স্বয়ং আপনি।"

আরো বেশ কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ও হিতোপদেশের … ভদ্রলোক জানালেন—"এই মাত্তোর আপনার দাদা হা… রোডের মোড়ে মিলিটারী লরী চাপা পড়েছেন।"

কান্নায় কাতর হ'য়ে উঠলো অতনুর গলা—"দাদা … এখনো আছেন? তাঁকে কি এখনো হাজরা রোডের মো… রাখা হয়েছে, না হাসপাতালে—?"

"না, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ই পাই… চাপা পড়বার সাথে সাথেই—।"

রিসিভারটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে গায়ে … আর পায়ে স্যাণ্ডাল গলিয়ে বেরুবার মুখেই বাবার … "এই অতনু, কোথা যাচ্ছিস্?"

"কোথাও না…এই এমনি… মানে এই ইয়ে… এমনি একটু…" —অতনু ধরা গলায় আমতা আ… করতে লাগলো।

"তার চেয়ে এখানে বসে একটু প্রেত-তত্ত্বের … শোন্। দেখ্ কি লিখেছে এখানে! আজকা… ছেলেরা তো ভূতে একদম বিশ্বাসই করিস্ না!" অ… বাবু একখানা বিরাট প্রেততত্ত্বের বইএর পাতা ও… লাগলেন।

চুপ ক'রে উস্‌খুস্ মনে অতনু ব'সে ব'সে প্রেত… মাহাত্ম্য শুনতে লাগলো। কি ক'রে এমন … …সংবাদটা সে দেবে! প্রেততত্ত্বের পঞ্চম সূত্রটা কেবল …খ্যা করতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে …নু ডুকরে কেঁদে উঠলো।

"কী রে! কী হয়েছে!!"—চশমার বেড়াজাল টপকে …কালেন অনুধ্বজ বাবু।

"যা হবার নয় তাই হয়ে গেছে বাবা! দাদা এই …ত্তোর হাজরা রোডের মোড়ে মিলিটারী লরী চাপা …ড়ে—"

"প্রদ্যোত লরী চাপা পড়েছে! প্র-দ্যো-ত!!"

অনুধ্বজ বাবুর গলা চিরে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার …রুলো। আর তার সাথে অতনুর বিলাপ।

রান্নাঘর থেকে অতনুর মা ছুটে এলেন। তাঁকে দেখে …নুধ্বজ বাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন—"ওগো, আমাদের …দ্যোত আর নেই—!" ব্যাপার বুঝে মা আছাড় খেয়ে …টিতে লুটিয়ে পড়লেন। কান্নাকাটি শুনে পাশের বাড়ী …কে চাড়ুয্যে মশাই ছুটে এলেন। ছুটে এলেন ভট্‌চায্, …ঙ্গুলী, চক্কোত্তি, মুখুজ্জে আর বাঁড়ুয্যের দল। মোট …া, আশপাশের কেউ আর ছুটে আসতে বাকী …খলেন না।

টিকি দুলিয়ে চাড়ুয্যে বললেন—"আহা, জীবন যে …দ্মপত্রে নীর সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়! আহা-হা, …দ্যোতের সাথে আজ সকালেও আমার কত কথা! …র সেই প্রদ্যোত কিনা এখন পরপারে!"

সকলের দীর্ঘশ্বাসে ঘরের আবহাওয়াটা শোক-মলিন …য়ে উঠলো।

কিন্তু কাঁদলেই তো আর অতনুর চলবে না। …দ্যোতের প্রাণহীন দেহ হয়তো এখনও রাস্তায় পড়ে। …াকেই সব করতে হবে। ভারী মনে অতনু হাজরা …াডের মোড়ের দিকে পা বাড়ালো।

"আর মশাই, প্রদ্যোতের মত ছেলে"—গাঙ্গুলী …াই সুরু করলেন—"হাজার থাক্, লাখে ক'টা মেলে …র করুন দেখি?"

হুঁকোয় একটা জবর টান মেরে চক্কোত্তি বললেন—"…ছেলে নয় মশাই, হীরের টুক্‌রো, বলুন চাঁদের কণা—!"

"কেঁদে আর কী হবে বলুন!"—চাড়ুয্যে মশাই অনুধ্বজ বাবুর দিকে ঘুরে বসলেন—"আপনি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাকে আর কি বোঝাব?"

"তার চেয়ে বরং একটা কাজ করলে ভালো হয়"—চক্কোত্তির পরামর্শ—"আপনি সেদিন বলছিলেন যে মরবার তিন ঘণ্টার মধ্যে হ'লে সাধনার জোরে আবার নাকি তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়! তা দেখুন না আপনিই একবার চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে!"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রেততত্ত্বের দশম পরিচ্ছেদে আছে বটে অমনি একটা সূত্র।—অনুধ্বজ বাবু খাড়া হ'য়ে বসলেন।

বইএ দেওয়া ফর্দ মত একশ' টাকার একখানা নোট ভাঙিয়ে তক্ষুনি বাজার থেকে রকমারী জিনিষপত্তর আনানো হ'লো। পাঁঠা, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, ঘি, ময়দা, তিজেল, ধুনুচি, পিদ্দিম,—এ ছাড়া আরও অনেক কিছু।

অনুধ্বজ বাবু পূজোয় বসলেন। পরনে তাঁর রক্তবর্ণ কাপড়, গলায় উপবীত, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা।

চৈত্রের মৌমাছির মত গুন্‌গুনানিটা নিমেষে থেমে গেল। সবাই চুপচাপ; মন্তরের জোরে সত্যিই প্রদ্যোত ফিরে আসে কিনা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠলো—"ওই এসেছে, এসেছে!"

"কে এসেছে?" চক্কোত্তি মশাই একবার সেদিকে তাকালেন। যা দেখলেন তা'তে তাঁর বুকের রক্তই শুধু হিম হয়ে গেল না, অনুধ্বজ বাবু যে সত্যিই একজন সিদ্ধপুরুষ এতেও আর সন্দেহ রইল না।

"বাবা, এ সব কী!"—চোখের সামনে দাঁড়িয়ে জল-জ্যান্ত প্রদ্যোত।

কোন উত্তর না দিয়ে প্রদ্যোতের দিকে একবার তাকিয়ে অনুধ্বজ বাবু দু' ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন। তারপর আগের মত বিড় বিড় ক'রে আবার মন্তর পড়তে লাগলেন।

কিন্তু এ সব কী! প্রদ্যোত তো অবাক্।

মা গুটি গুটি এগিয়ে এসে প্রদ্যোতকে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন, অমনি অনুধ্বজ বাবুর এক ক্রুদ্ধ ধমক—"সা-ব-ধান! ওকে ছুঁয়েছ কি মরেছ! ওকে তো পাবেই না, নিজেও অমনি সেই সাথে—।"

ধমকের ঠেলায় বসে পড়ে মা কলাপাতার মত কাঁপতে লাগলেন।

এক কুঁজো মন্তর পড়া বরফ-গলা জল অনুধ্বজ বাবু ঝুপঝুপ ক'রে প্রত্যোতের গায়ে মাথায় ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন, "হুঁ, এবার ছুঁতে পারো।"

মা প্রত্যোতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

চাড়ুয্যে মশাই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, বাবা প্রত্যোত, আসবার সময় তোমার কেমন লাগল?"

ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে প্রত্যোত বললো—"কেমন আবার লাগবে! ট্রামে চেপে ধর্ম্মতলা থেকে ভবানীপুর আসতে আবার কেমন লাগে? এখন অফিস ছুটির টাইম, ট্রামে বড্ড ভীড়, এই যা।"

শোন কথা! পরলোক থেকে প্রত্যোত্ ট্রামে ক'রে এসেছে!

চক্কোত্তি মাথা নেড়ে বললেন—"এমনিই হয়। সবই মন্তরের গুণ। মন্তরের গুণে সব ভুলে যায় কি না!"

কিন্তু ক্ষমতা বটে অনুধ্বজ বাবুর! একেই বলে গিয়ে সিদ্ধপুরুষ!—সকলে এ কথা একবাক্যে মেনে নিলেন।

বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটলে চক্কোত্তি বললেন—"আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তো এ সব বিশ্বাসই করতে চায় না, কিন্তু দেখলে তো নিজের চোখে? বলি দেখলে তো গাঙ্গুলী?"

সব কিছু দেখেশুনে অতনু তো হেসে কুটি-কুটি!

"আরে কিচ্ছু না, অনেক দিন আগে সেই যে দাদার মনিব্যাগ্‌টা চুরি গিয়েছিল না! যে তুলে নিয়েছিল সেই বেটাই বোধ হয় আজ হাজরা রোডের মোড়ে মি... লরী চাপা পড়েছে।...দাদার সেই ব্যাগ্‌টায় ... নাম-ঠিকানা, ফোন্ নাম্বার লেখা আছে কিনা। ওখা... এক ভদ্রলোক তাই দেখে—।"

"তার মানে! আমার এ সব কিছু নয়?"—... বাবু লাফিয়ে উঠলেন।

"নয়ই তো! যত তত্ত্বই বলো, মরলে পরে ... কাউকে বাঁচানো যায় নাকি!"

বাঁড়ুয্যে, চাড়ুয্যে, মুখুজ্জে, গাঙ্গুলী আর চক্কো... সকলে তখন এ বিষয়ে এক মত। সকলের হাসিতে ... ভরে উঠলো।

অবশ্যি তার ফলে সেই এক শ' টাকার দই সন্দে... সদ্গতি হ'তে কোন বাধা হ'ল না।

কিন্তু এক কুঁজো বরফ-গলা জল (তা সে যতই ... পড়া হোক না কেন) যদি শীতের বিকেলে গায়ে ... ঢেলে দেওয়া হয় তবে জ্বর না হয়ে উদ্ধার আছে?

পরদিন প্রত্যোতের একলার গায়ে দু'জনের জ্বর। ...

ডাক্তার আর ওষুধে আবার কড়কড়ে পঁচিশটা ... গেল বেরিয়ে।

মার কিন্তু সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল প্রেততত্ত্বের ... ওই প্রেততত্ত্বের নির্দ্দেশ মানতে গিয়েই না বাছার ... দুর্দ্দশা।...ষ্টোভে যে বার্লি জ্বাল দেবেন তার কোন ... নেই,—কারণ বাজারে স্পিরিট একদম পাওয়া যায় না...

কি মনে হ'তে আলমারী খুলে প্রেততত্ত্বের ... এনে মা সেখানাকে ছিঁড়ে বার্লি জ্বাল দিতে ... গেলেন।

যে বই তোমরা পড়তে পার

ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপন-কথা—অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শিশুকবিতা— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্রগ্রীব—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঝালাপালা—সুকুমার রায়, দাদামশায়ের থলে—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মেঘদূতের মর্ত্ত্যে আগমন—হেমেন্দ্রকুমার রায়, নীল নায়ের মাঝি—ধীরেন্দ্রলাল ধর, নূতন পুরাণ— মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পৃ... ইতিহাস—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আকাশের গল্প—... নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, কাজের বিজ্ঞান—রাধাভূষণ বসু, ... জগৎ—কুলদারঞ্জন রায় (অনুবাদ), ফোর হর্স্‌মেন্ অ... য়্যাপোক্যালিপ্ সি—খগেন্দ্রনাথ মিত্র (অনুবাদ)।

খাবার চিবিয়ে খাবে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

"সমস্ত খাবার বার বার চিবিয়ে খাবে। স্বাস্থ্য ভাল ...বার এবং দীর্ঘায়ু হবার এই হচ্ছে আসল মন্ত্র।" শরীর ...খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁরা সকলেই এ ...য়ে একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদের মধ্যে ...কেই এ ব্যাপারটির উপর একেবারেই গুরুত্ব দেও না। ...য়, পড়ায়, কাজেকর্ম্মে—হাজারো ব্যাপারে তোমরা সময় ...ত পার—এবং সময় নষ্টও করতে পার, কিন্তু খাবার ...য় একটু ধীরেসুস্থে চিবিয়ে খেতে হ'লেই সুরু হয় যত ...া। শুধু তোমরা কেন, বয়স্কদের মধ্যেও দেখেছি, ...কেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের এই প্রথম তত্ত্বটি সম্বন্ধে একে-...র উদাসীন। সকালে উঠে কাগজ পড়ে, গল্প ক'রে, ...ড্ডা দিয়ে, নানা কাজে ও অকাজে যতটা সম্ভব সময় ...য়ে তাঁরা যখন খেতে আসেন তখন যেন আর তাঁদের ...রও ফুরসৎ নেই। কেউ যদি তখন ভাল কথায় বলতে ...—'বাপু হে, আর একটু ধীরে ধীরে চিবিয়ে 'চিবিয়ে ...অমন গোগ্রাসে এক নিঃশ্বাসে খেলে খাবারের ...াদ তো পাবেই না, উপরন্তু অসুখ ক'রে বসবে যে!' ...অমনি মারমুখো হয়ে বলবেন, "কী যে বল! এখন ...আর ধীরে-সুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার সময় আছে! ...বেলা হয়ে গেছে। এমনিতেই আপিসের বেজায় ...হ'য়ে গেছে, না জানি কাজের কত ক্ষতি হয়ে গেল!" ...রকমে নাকে-মুখে ২।৪টে গুঁজেই তাঁরা উঠে ...ন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান, ঐ সব কাজই হচ্ছে ..., খাওয়া-টাওয়া ও সব পরের কথা।

কিন্তু প্রথমেই তাঁরা ভুলে যান খাওয়ার আসল ...টা। চাকরীর চাইতে স্বাস্থ্য অনেক বড় জিনিষ ...ঠিকমত খাওয়া সেই স্বাস্থ্যেরই জন্য। খাওয়া-পরা য়োগাবার জন্যই চাকরী। আপিসের উপরওয়ালাকে ব'লে ক'য়ে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে কিন্তু শরীর-যন্ত্র বড় কঠিন মনিব, অপরাধের শাস্তি সে দেবেই। এবং স্বাস্থ্যই যদি ভেঙ্গে গেল তবে আর পৃথিবীতে রইল কি! তোমাদের ইস্কুল যাওয়া সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। ইস্কুল যাওয়ার তাড়ায় নাকে-মুখে ভাত 'গুঁজে দৌড়ান'র মত অপরাধ আর নেই। শরীরের কাছে অপরাধ। তার শাস্তি দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য—চিরজীবন অশান্তি।

প্রত্যেক মানুষের মুখে বত্রিশটি ক'রে দাঁত আছে। এর সব ক'টির কাজ এক নয়, কোনটা কাটবার জন্য, কোনটা পিষবার জন্য—এই রকম। দাঁতের গঠন দেখলেই বোঝা যায় কোন্ দাঁত দিয়ে কি কাজ করা দরকার। তোমাদের হয়তো অনেকের ধারণা—দাঁতের কাজ হচ্ছে শক্ত খাবারকে পিষে নরম ক'রে দেওয়া। সেটা দাঁতের একটা কাজ বটে কিন্তু সেটাই একমাত্র কাজ নয়, তা হ'লে তো কেবল নরম খাবার খেলেই আমাদের চলে যেত, তার জন্য আবার পরিশ্রম ক'রে অতগুলি দাঁত পুষবার কোনই প্রয়োজন হ'ত না। আসলে ব্যাপারটা কি জান? দাঁত দিয়ে চিবোবার সময় মুখের ভিতরকার লালা এসে খাবারের সঙ্গে মেশে। যতই চিবোনো যায় ঐ লালা ততই বেশী ক'রে খাবারের সঙ্গে জড়াতে থাকে। আমাদের মুখের ভিতর কতকগুলি গ্রন্থি আছে, মুখের লালা সেই গ্রন্থি থেকেই বেরিয়ে আসে। এই লালা যে শুধু খাবারকে কাদার আকৃতি দিয়ে গিলবার উপযোগী ক'রে তোলে তাই নয়, এর মধ্যে থাকে পাচক বা হজমী রস—যা নাকি আমাদের খাদ্য হজম করিয়ে দিতে সাহায্য করে। এক টুকরো রুটী নিয়ে খানিকক্ষণ

ভাল ক'রে চিবুলেই দেখবে রুটীটা কেমন মিষ্টি মিষ্টি লাগছে! এর কারণ আর কিছু নয়, রুটীটা হজম হ'তে স্বুরু হওয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে ঐ রকম লাগছে। খাবারের সঙ্গে যদি প্রচুর লালা পেটের ভিতর না যেতে পারে তবে সে খাবার হজম না হয়ে অজীর্ণ রোগের স্বৃষ্টি করবে।

আমাদের মুখের দাঁত সামনে, পাশে—নানা দিক্ থেকে কেমন দেখায় এই ছবিতে তাই দেখান হয়েছে।

পেটের ভিতর যে পাচক রস খাবার হজম করায় মুখের ভিতরকার লালা তার কাজ অনেকটা লাঘব ক'রে দেয়। কাজেই বুঝতে পারছ সমস্ত খাবার কেন ভাল ক'রে চিবিয়ে খেতে বলা হয়।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনের নাম শুনে থাকবে। ৮২ বছর বয়সেও অত বড় একটা সাম্রাজ্য পরিচালনার গুরুভার তিনি সহজ ভাবেই পালন ক'রে গেছেন। এজন্য, তিনি বলতেন, তাঁর অটুট স্বাস্থ্য অনেকটা দায়ী; এবং তিনি নাকি খাবার সময় প্রত্যেকটি গ্রাস ৩২ বার ক'রে চিবোতেন। অবশ্যি প্রতিটি গ্রাস অত বার ক'রে চিবোনো সহজ নয়। (আমার এক বন্ধু বলেন, এক সজনে ডাঁটা * ছাড়া কোন জিনিষ কখনও অত বার চিবোনো সম্ভবও নয়, তার অনেক আগেই তা আপনি গলার ভিতর ঢুকে যায়), কি[...] ক'রে চিবুলে শরীর কেমন কর্ম্মঠ থাকে এ থেকে [...] নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারবে। এ সম্বন্ধে আর এক[...] শোন:

আমেরিকায় হোরেস্ ফ্লেচার নামে এক [...] অল্প বয়সে হজমের গোলমালে খু[...] পেতেন। খেতে তিনি খুব ভাল ব[...] এবং যা খেতেন হাপুস হুপুস ক'রে [...] কিন্তু তার কিছুই হজম হ'ত না, স[...] শরীর দুর্ব্বল বোধ হ'ত, কোন কাজই [...] লাগত না।

কিছুতেই যখন কিছু হয় না তখন [...] একজন তাঁকে পরামর্শ দিল 'সব জিনিষ [...] ক'রে চিবিয়ে খাবে, কোন খাদ্যই তাড়[...] ক'রে গোগ্রাসে গিলবে না।' ফ্লেচার [...] উপদেশ মত কয়েক দিন চলেই আশ্চর্য্য [...] পেলেন। তাঁর হজমের সমস্ত গো[...] সেরে গেল, দুর্ব্বলতা কমে এল, মনে [...] স্ফূর্ত্তি। শুধু তাই নয়, দেহেও হ'ল [...] শক্তি। চিবিয়ে খাওয়ার এই অশ্চর্য্য [...] দেখে তিনি সবাইকে সে কথা ব'লে বে[...] লাগলেন আর নিজেও সেই থেকে [...] অভ্যাস ক'রে ফেললেন যে কু-লোকে বলত তিনি [...] দুধ, চা, মদ, এমন কি জলও না চিবিয়ে খান না।

ডাক্তারেরা ফ্লেচারের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা নিয়ে স্বুরু করলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা। [...] গেল, চিবিয়ে খেলে যে শরীর শুধু স্বুস্থ, নীরোগ [...] তাই নয়, সাধারণ মানুষের চেয়ে শরীরের শক্তিও [...] বেশী হয়। ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাতে [...] প্রমাণিত হওয়ায় একদল বৈজ্ঞানিক এই [...] সাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য উঠে পড়ে লাগ[...] তাঁদের চেষ্টায় কত লোক যে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পে[...] আর লেখাজোখা নেই।

তোমরাও এ অভ্যাসটি আজ থেকেই কর না কেন!

* সজনের যে জিনিষটাকে চলতি কথায় আমরা ডাঁটা বলি, তা কিন্তু ডাঁটা নয়—ফল বলতে পার।

স্বাধীনতার পথে

[...]শে শ্রাবণ শুক্রবার, ইংরেজী ১৫ই আগষ্ট ভারতের [...] ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। প্রায় ২০০ [...] পরাধীনতার অভিশাপ কাটিয়ে এই দিনটি [...] আবার ভারতীয়দের হাতে স্বদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব [...] এল। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ মনে [...]

[...]৭—

[...] ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় সিপাহীদের যুদ্ধ [...]। ইতিহাসে একেই সিপাহী বিদ্রোহ বলা [...] ধরতে গেলে এটিই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ।

[...]—

[...] কংগ্রেসের জন্ম। বোম্বাই নগরে গোকুলদাস তেজ-[...]সংস্কৃত কলেজে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭২ জন [প্রতি]নিধি নিয়ে ভারতের জাতীয় মহাসভা বা "ইণ্ডিয়ান্ [ন্যাশ]নাল্ কংগ্রেসের" প্রথম অধিবেশন হ'ল। সভাপতি [...] উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[...]৮৬—

[...] কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। সভাপতি [...] দাদাভাই নৌরজী। এবারই প্রথম অভ্যর্থনা [সমি]তির সভাপতি হলেন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

[...]৭—

[...] অমরাবতীতে কংগ্রেসের প্রথম সংগ্রামের সূচনা।

[...]০৫—

[...] বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী [...] বর্জ্জন ক'রে স্বুরু হ'ল স্বদেশী শিল্পের আদর। রাষ্ট্র-[গুরু] স্বুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত দেশকে জাতীয়তায় [...] করলেন। দেশ তাঁকে ফুলের মুকুট পরিয়ে 'মুকুট-[হীন] রাজা' ব'লে অভিনন্দিত করল। রচিত হ'ল রবীন্দ্র-[নাথে]র দেশাত্মমূলক অপূর্ব্ব সব সঙ্গীত। কংগ্রেসের কাশী [অধি]বেশনে গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সভাপতিত্বে "বিদেশী [বর্জ্জ]ন" রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে গৃহীত হ'ল। ওদিকে [...] ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে বাংলায় দেখা দিল [...]বাদ।

১৯০৬—

কংগ্রেসে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী দলের আবির্ভাব। কংগ্রেসের লক্ষ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ঘোষণা।

১৯০৭—

স্বুরাটে নরম ও চরমপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে সংঘর্ষ।

১৯১৬—

কংগ্রেসের দুই দলে পুনর্ম্মিলন।

১৯১৯—

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বৃটীশ সরকার প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। এল রাওলাট বিল, ঝালিয়ানওয়ালাবাগের কলঙ্কময় হত্যাকাণ্ড।

১৯২০-২১—

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত ভারত মেতে উঠল। দেশের জন্য কারাবরণ সবচেয়ে বড় সম্মান ব'লে বিবেচিত হ'ল। আবার স্বুরু হ'ল বিদেশী বর্জ্জন, ঘরে ঘরে চলল চরকা।

১৯২২—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলের স্বৃষ্টি হ'ল। কংগ্রেস আইন-সভা অধিকার ক'রে শাসনকার্য্য অচল ক'রে তুলল।

১৯২৭—

সাইমন কমিশনের নিয়োগ। দেশ যুড়ে প্রবল আপত্তি। ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা। স্বরাজের নিয়মতন্ত্র গঠনের উদ্যোগ।

১৯২৮—

নেহ্রু রিপোর্ট। ইংরেজকে জানান হ'ল এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন্ শাসনতন্ত্র চাই।

১৯২৯—

বৃটীশ সরকারের তূষ্ণী ভাব। পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে "পঞ্চনদীর তীরে" ডোমিনিয়ন্ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করা হ'ল।

১৯৩০—

ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন। ডাণ্ডীতে

গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গের ঐতিহাসিক অভিযান। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করল।

১৯৩১—

গান্ধী-আরউইন চুক্তি। গান্ধীজির কংগ্রেসের হয়ে বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হ'ল।

১৯৩৫—

নতুন ভারত শাসন আইন। ভারতে ভেদনীতিমূলক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্তন। কংগ্রেসের না-গ্রহণ না-বর্জন প্রস্তাব ও ৮টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। মুস্‌লিম্ লীগ দলের পাকিস্থান দাবী।

১৯৩৯—

কংগ্রেসে বামপন্থীদের প্রভাব। সুভাষচন্দ্রের কাছে গান্ধীজির মনোনীত সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয়। ত্রিপুরীতে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের সংঘর্ষ। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ। ফরোয়ার্ড্ ব্লকের জন্ম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ। ভারত সম্বন্ধে বৃটীশ সরকারের নৈরাশ্যজনক মনোভাবে কংগ্রেস দলের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক্ পলায়ন।

১৯৪২—

ষ্ট্যাফোর্ড্ ক্রীপ্‌স্ মারফৎ বৃটীশ সরকারের আপোষ প্রস্তাব ব্যর্থ। গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের বাইরে স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট—"আজাদ হিন্দ সরকার" গঠন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কারাবরণ। ৯ই আগষ্ট তারিখে দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণআন্দোলন। মেদিনীপুরে স্বল্পস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৩—

পঞ্চাশের মহামন্বন্তর। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে … বাংলা ছারখার হয়ে গেল কিন্তু যাদের জন্য এত … ঘটে গেল তাদের কোন শাস্তিই হ'ল না। … মন ভিতরে ভিতরে তিক্ত হয়ে উঠল।

১৯৪৪—

আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত … তারা কোহিমা দখল করল, ইম্ফল অবরোধ … ভারতের মাটীতে বহুদিন পরে আবার স্বাধীন … উড়ল।

১৯৪৫—

চক্রশক্তির পরাজয়। আজাদ হিন্দ সরকারের … মহাযুদ্ধের অবসান। সিমলায় সর্ব্বদলীয় সম্মেলন ও … ব্যর্থতা। ইংরেজের আদালতে আজাদ হিন্দ সৈনি… বিচারে ভারতব্যাপী বিক্ষোভ। কলিকাতায় … অভ্যুত্থান। ধর্ম্মতলায় স্মরণীয় ও শোচনীয় দলনলীলা।

১৯৪৬-৪৭—

প্রথমে বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টারী মিশন ও পরে … মিশনের ভারত আগমন। আবার শাসনতান্ত্রিক স… আশার আলো। গণপরিষদের জন্ম।

ভারতে ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ। ভারতের … স্থানে কলঙ্কময় সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা। লর্ড ওয়া… বিদায় গ্রহণ। লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের শেষ রাজপ্রতি… রূপে ভারত আগমন। ৩রা জুনের ঐতিহাসিক ঘো… ভারত, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের আয়োজন। ভার… পাকিস্থান দুই রাষ্ট্রে ডোমিনিয়ন্ শাসনতন্ত্রের সূচনা।

কয়েকটি ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও গণবিপ্লব

ষষ্ঠ শতাব্দী—ভারতে হূণদের বিরুদ্ধে যশোধর্ম্মদেবের অভ্যুত্থান। মিহিরকুলের পরাজয়।

৮ম শতাব্দী—গৌড়ে জনসাধারণ কর্ত্তৃক গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচন।

১৩শ শতাব্দী—ইংলণ্ডের অত্যাচারী রাজা জন্ প্রজাদের দাবী স্বীকার ক'রে ম্যাগ্‌না কার্টায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন।

১৪শ শতাব্দী—স্কট্‌ল্যাণ্ডে রবার্ট্ ব্রুসের স্বাধীনতা-যুদ্ধ…

১৫শ শতাব্দী—রাজা গণেশের গৌড়ে হিন্দুরাজ্য স্থাপ…

১৬শ শতাব্দী—হলদিঘাটে রাণা প্রতাপের স্বাধীন… সংগ্রাম; বাংলায় বার ভূঞার অভ্যুত্থান…

১৭শ শতাব্দী—দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর অভ্যুত্থান; … পুতানায় রাজসিংহের স্বাধীনতা-… ইংলণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে … বছরের সাধারণতন্ত্র; ইংলণ্ডে রক্তপাতহীন বিদ্রোহ।

…শতাব্দী—আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম; ফ্রান্সে ফরাসী বিদ্রোহ; বাংলায় মীর কাশেমের স্বাধীন হওয়ার শেষ চেষ্টা।

…শতাব্দী—ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ; ইটালীতে গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনির নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন; আমেরিকার গৌরযুদ্ধ।

২০শ শতাব্দী—চীনে সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তন; ১ম বিশ্বযুদ্ধ; রাশিয়ায় বলশেভিক বিদ্রোহ; আয়ার্ল্যাণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব, শ্যামে রক্তপাতহীন বিদ্রোহ; ভারতের অহিংস সংগ্রাম; স্পেনে গৃহযুদ্ধ; বিশ্বব্যাপী ২য় মহাসমর; আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুত্থান; ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো-চীন, ব্রহ্ম ও ভারতব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

ভারতের জাতীয় পতাকা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বৌদ্ধ নৃপের শুদ্ধ বারতা
বিলাতে বিশ্বময়
হ'ল যে চক্রে ধর্ম্মের পথে
দিগ্ দিগন্ত জয়,
ধরেছ তাহারে বক্ষে তোমার
গৌরব বসুধার,
হে মোর দেশের স্বাধীন পতাকা,
নমি তোমা বার বার।

অন্ন বস্ত্র লভেছে বিদায়,
লাঞ্ছিত আজি দেশ,
ফিরায়ে আনিতে পরেছ শরীরে
শস্যশ্যামল বেশ।

ত্যাগের প্রতীক গৈরিক বাস
শোভিছে তোমার অঙ্গে,
হে মোর দেশের স্বাধীন পতাকা,
প্রণমি তোমারে রঙ্গে।

শান্তির বাণী ছড়া'তে ধরায়,
শুচিতা আনিতে ভবে
শুভ্র বসনে শিখাইছ তুমি
ভারতে সগৌরবে।
ভুলো না—শান্তি তেজের সঙ্গী,
নহে কভু ভীরুতার,
হে মোর দেশের স্বাধীন পতাকা,
নমি তোমা বার বার।

জাতীয় পতাকা

…আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচীর এরোড্রোম থেকে …খানা যাত্রীবাহী বিমান নীল আকাশের কোলে ভাসতে …তে উড়ে চল্‌ল সুদূর ইয়োরোপের দিকে। বিমানখানির …স্থান রাশিয়ার রাজধানী মস্কো, ভিতরে ছিলেন …পাঙ্গ সহ এক মহীয়সী মহিলা। ইনি রাশিয়ায় স্বাধীন …তের প্রথম রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। বিমানের উপর …শোভিত ক'রে যে পতাকাটি উড়ছিল বাইরের অনেকের চোখেই তা নতুন—সেটি ভারতের জাতীয় পতাকা। এই পতাকা এই বিমানখানিতেই সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

এতদিন ভারতবর্ষ ছিল ইংলণ্ডের খাস প্রজা। তাই ইংরেজের 'ইউনিয়ন্ জ্যাক্'কেই এতদিন ভারতের পতাকা ব'লে পরিচয় দিতে হয়েছে। কিন্তু এখন থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকার পাশে আমাদেরও নিজস্ব পতাকা স্থান ক'রে নিল। ২৯শে শ্রাবণ ভারতের

সর্ব্বত্র সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, আপিসে আদালতে, লাটভবনে, নেতাজীর স্বপ্ন—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় এবং দেশবাসীর ঘরে ঘরে এই পতাকা তোমরা উড়তে দেখেছ, নিজেরাও উড়িয়েছ।

জাতীয় পতাকা হচ্ছে স্বাধীনতার জীবন্ত চিহ্ন, দুর্ব্বলের আশা, দেশপ্রেমিকের সর্ব্বস্ব ধন। এই পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে কত দেশের কত বীর অকালে জীবন উৎসর্গ করেছে; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে কিন্তু পতাকার সম্মান বিসর্জ্জন দিতে রাজী হয় নি। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গেও এই পতাকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এই পতাকা তিন রংএর। উপরে গেরুয়া রং—ত্যাগ, সাহস, ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন। মধ্যে সাদা—শান্তি, সত্য ও পবিত্রতার নিদর্শন। নীচে সবুজ—তারুণ্য, শৌর্য্য, সজীবতা ও উর্ব্বরতার প্রতীক্। তা ছাড়া এই তিন রংএ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কেও বোঝাচ্ছে—হিন্দু, মুসলমান ও অবশিষ্ট সম্প্রদায়। মাঝখানে চক্র।—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের প্রবর্ত্তিত বোধিচক্র বা ধর্ম্মচক্র থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক্ এটি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অহিংস অস্ত্র চরকার স্মৃতিও এর মধ্যে রূপায়িত রয়েছে।

গণপরিষদে এই পতাকা গ্রহণ করবার সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল যা বলেছিলেন তার খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি: "ভারতের এই পতাকা কোন সাম্রাজ্য বা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ নয়, অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও এই পতাকায় প্রকাশ পাবে না। এই পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক্। শুধু আমাদের নয়, সমস্ত পৃথিবীর সকল লোকের স্বাধীনতার প্রতীক্।"

বিভক্ত ভারতবর্ষের অপর অংশ পাকিস্থানের জাতীয় পতাকা হয়েছে গাঢ় সবুজ রংএর। তার মধ্যে বাঁকানো চাঁদ ও পঞ্চমুখী তারা। চাঁদ ও তারা ইসলাম ধর্ম্মের প্রতীক্। তারার ৫টি মুখ সম্ভবতঃ পাকিস্থানের ৫টি প্রদেশকেও বোঝাচ্ছে। পতাকার সবটা কিন্তু সবুজ নয়, এক চতুর্থাংশ সাদা। তা দিয়ে মুসলিম ছাড়া পাকিস্থানের অন্য সম্প্রদায়দের বোঝান হয়েছে।

দুই রাষ্ট্রের সমস্ত নেতাই ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিজ নিজ রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার প্রতি ... দেখাবেন ব'লে জানিয়েছেন।

তিনরঙা পতাকা কিন্তু পৃথিবীর আরও কয়েকটি ... প্রচলিত আছে। আইরিশ্ ফ্রী ষ্টেটের পতাকায় ... আমাদের ভারতের পতাকারই মত কিন্তু রেখা ... আমাদের মত শোয়ান না হয়ে খাড়া ভাবে পাশাপাশি ... করানো। ভিতরেও কোন চিহ্ন নেই। ফরাসী, বেল ... ও রুমানিয়ার পতাকাও ঐ রকম, কিন্তু তাদের রং ... রকম। ফরাসীর নীল-সাদা-লাল, বেলজিয়ামের ... হলদে-লাল, রুমানিয়ার নীল-হলদে-লাল।

ভারতের মত পাশাপাশি শোয়ান তিন ... পতাকাও অনেক দেশে আছে। স্পেনের পতাকা ... এই রকম—ওপর থেকে লাল-হলদে-নীল। নেদারল্যা ... এর লাল-সাদা-নীল, ইরাণের সবুজ-সাদা-লাল,— ... ভিতর সিংহের ছবি, ইউগোস্লেভিয়ার নীল-সাদা ... লিথুয়ানিয়ার হলদে-সবুজ-লাল, এস্টোনিয়ার নীল- ... সাদা, বুলগরিয়ার সাদা-সবুজ-লাল।

লাটভিয়ার পতাকা উপরে নীচে খয়েরী, মাঝ ... সাদা। আর্জেন্টিনারও উপরে নীচে নীল, মাঝ ... সাদা কিন্তু ভিতরে একটা নাকমুখওয়ালা সূর্য্যের ছবি ...

অন্যান্য কয়েকটি নাম-করা দেশের পতাকা এই ... আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র—১৩টি সাদা ও লাল ... দণ্ডের দিকে উপরের কোণে নীল জমিনের উপর ... সাদা তারকা চিহ্ন। প্রত্যেকটি তারকা যুক্তরাষ্ট্রের ... রাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছে। ইংলণ্ডের পতাকা 'ইউনিয়ন্ জ্যা ... নীল জমিনের উপর খাড়া, শোয়া এবং কোণাকুণি ... টানা ৪টে লাল ডোরা দিয়ে তৈরী। রাশিয়ার প ... লাল রংএর, তার এক পাশে কাস্তে আর হাতুড়ীর ... আঁকা। চীনের পতাকাও লাল কিন্তু দণ্ডের দিকে উ ... কোণে নীল জমিনের ওপর সাদা সূর্য্য আঁকা। ডেন ... ও নরওয়ের পতাকা ঠিক চৌকো নয়। ডেন ... পতাকায় লালের ওপর সমস্তটা যুড়ে সাদা ক্রস্ চিহ্ন ... সুইডেনের নীলের ওপর সবটা যুড়ে হলদে ক্রস্ ... নরওয়ের পতাকা লালের উপর নীল ক্রস্ চিহ্ন ... যুড়ে। সুইট্জারল্যাণ্ডের পতাকা অনেকটা ডেনমা ... মত, কিন্তু চৌকো এবং ভিতরের সাদা ক্রস্ চিহ্ন ...

... নয়, রেড্ক্রসের চিহ্নের মত (যা এম্বুলেন্স্ গাড়ীতে ... তে পাও) ছোট আকারের। ফিন্ল্যাণ্ডের পতাকা ... র উপর সবটা যুড়ে নীল ক্রস্। পোল্যাণ্ডের পতাকা ... র সাদা, নীচে লাল। পর্ত্তুগালের খাড়া ভাবে এক ... য়াংশ সবুজ, বাকিটা লাল। তুরস্কের—লাল জমিনের ... র সাদা এক ফালি চাঁদ ও একটি তারা। মিশরেরও ... কটা ঐ রকম, কিন্তু জমিন লাল নয়, সবুজ এবং ... কার সংখ্যা তিনটি। গ্রীসের পতাকা সাদা ও নীল ... রা কাটা, এক কোণে ডোরার বদলে সাদা-ক্রস্ চিহ্ন। ... কাস্লোভাকিয়ার পতাকার উপরটা সাদা, নীচেটা লাল, দণ্ডের দিকে এক ফালি তিন কোণা নীল। শ্যামের (থাই) পতাকায় উপর নীচে লাল ডোরা কাটা, তার পর দু'দিকে সাদা, মাঝখানটা নীল; আর তারই ভিতর একটি শ্বেত হস্তীর ছবি।

যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মানীর লাল জমিনের ভিতর সাদা বৃত্ত এবং তার মাঝখানে নীল স্বস্তিক চিহ্ন-দেওয়া উজ্জ্বল পতাকা এবং যুদ্ধপূর্ব্ব জাপানের লাল প্রভাতসূর্য্যের ছবি আঁকা অতি সুন্দর পতাকার ছবিও তোমরা দেখে থাকবে।

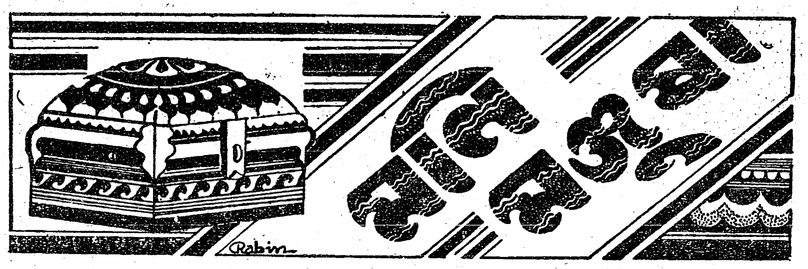

আরও অনেক ছোটখাট রাষ্ট্রের ও ডোমিনিয়নের নিজস্ব পতাকা আছে।

কাউণ্ট্ অব্ মণ্টেক্রিষ্টো

(বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেক্জান্দার দুমার লেখা একখানি পৃথিবীবিখ্যাত বই)

ফরাসী দেশে মার্সাই বন্দরে এদ্মন্দ্ দান্তে নামে ... টি যুবক বাস করত। এদ্মন্দের বয়স বেশী নয়, ... র স্বভাবটিও ছিল ভারী মিষ্টি। তাই সবাই তাকে পছন্দ করত। মার্সিদিস্ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ... র বিয়েরও সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে একদিন এক কাণ্ড ঘটল। এদ্মন্দ্ এক ... হাজে নাবিকের কাজ করত। জাহাজের কাপ্তেন ... কে খুব ভাল বাসতেন। একবার দেশে ফিরবার পথে ... প্তেনের হ'ল খুব অসুখ, তিনি বুঝলেন যে তিনি আর ... চবেন না। মরবার আগে তিনি এদ্মন্দ্‌কে ডেকে ... রই ওপর জাহাজের ভার দিয়ে গেলেন আর দিয়ে ... লেন একখানা গোপনীয় চিঠি। চিঠিখানা প্যারিসের ... ক ভদ্রলোকের কাছে গোপনে পৌঁছে দিতে হবে। এদ্মন্দ্ রাজী হ'ল—যদিও চিঠিখানায় কি লেখা আছে তা সে জানত না।

সেই জাহাজে ড্যাংলার নামে আর একজন পুরোনো নাবিক ছিল। তার আশা ছিল কাপ্তেনের পর সে-ই পাবে জাহাজের ভার। কিন্তু এদ্মন্দ্‌কে কাপ্তেন করায় সে গেল ভীষণ চটে। কি ক'রে এদ্মন্দ্‌কে বিপদে ফেলবে এই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। যে গোপনীয় চিঠিখানা এদ্মন্দ্‌কে দেওয়া হয়েছিল তার রহস্য সে জানত। সেই সময় মহাবীর নেপোলিয়ন ছিলেন এলবায় নির্ব্বাসিত। তাঁকে আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাবার জন্য তাঁর অনুরক্তদের মধ্যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল। ঐ কাপ্তেনও ছিলেন সেই দলে। ঐ চিঠিতে ছিল সেই বিষয়েই কতকগুলি গোপন তথ্য।

মার্সাইতে নেমেই দ্যাংলার ছুটল তার বন্ধু ফার্নান্দের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে। ফার্নান্দও মার্সিদিস্‌কে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছিল; কাজেই এদ্‌মন্দের ওপর তারও হিংসে ছিল। দু' জনে ষড়যন্ত্র ক'রে পুলিশের কাছে বেনামীতে সমস্ত খবর পৌঁছে দিল।

এদ্‌মন্দ্‌কে চিঠিখানা নিয়ে প্যারিসে যেতে হবে। প্যারিস্ অনেকটা পথ। এদিকে মার্সিদিসের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে। এদ্‌মন্দ্‌ ঠিক করল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নিয়ে তার পরই সে প্যারিস্ রওনা হবে চিঠি দিয়ে আসতে।

কিন্তু ঠিক বিয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পুলিশ এসে তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করল। এদিকে ভিলফোর্দ্ নামে যে রাজকর্ম্মচারীটির হাতে চিঠিখানা পড়ল, চিঠিখানা ছিল কিন্তু তারই বাবার নামে। কাজেই বাপকে বাঁচাতে গিয়ে এবং নিজেরও চাকরী-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে গিয়ে সে নিল মিথ্যার আশ্রয়। এদ্‌মন্দের সামনে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে ভিলফোর্দ্ তাকে জানাল যে শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আসলে সে বিনা বিচারে এদ্‌মন্দ্‌কে এক পার্ব্বত্য দুর্গে (শ্যাতু দ্য ইয়) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে দিল। কোন বিচার হ'ল না—নির্দ্দোষ এদ্‌মন্দ্‌ আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোন সুযোগ পেল না।

সমুদ্রের ধারে সেই নির্জ্জন পাষাণ কক্ষে দেখতে দেখতে এদ্‌মন্দের জীবনের চার 'বছর কেটে গেল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই—সে এক দুর্ব্বিষহ জীবন। এদ্‌মন্দের ইচ্ছা হ'ল কোন রকমে আত্মহত্যা ক'রে এ কষ্টের শেষ করবে। এদিকে সেই রাজকর্ম্মচারীটির চক্রান্তে বাইরে রটে গেল যে এদ্‌মন্দ্‌ মারা গেছে। তার বাগ্দত্তা মার্সিদিস্ আকুল আগ্রহে এত দিন তার প্রতীক্ষা করছিল; এই খবর পেয়ে সে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। এর কিছুদিন পরে ফার্নান্দের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

এদ্‌মন্দ্‌ যখন কারাগারে বসে মৃত্যু কামনা করছে তখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেল পাথরের দেয়াল থেকে কেমন একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ আসছে। কান পেতে শুনল সত্যিই তাই, কে যেন পাথরের দেয়াল শাবল দি খুঁড়ছে। এই দীর্ঘ কয়েক বছর রক্ষী ছাড়া এদ্‌মন্দ্‌ জীবন্ত মানুষের দেখা পায় নি, কাজেই তার মনের বুঝতেই পার। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এদ্‌মন্দের পাশের কামরাতে ছিলেন একজন বুড়ো পাদ্রী নাম য়্যাব্‌বে ফারিয়া। তাকেও বিনা দোষে বিপ্লবী সন্দেহ ক'রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হতাশ হন নি। যে লোহার পাত্রে তাঁকে খা দেওয়া হ'ত রক্ষীদের চোখের আড়ালে তাই ভেঙ্গে ঘষে তিনি একটা শাবলের মত অস্ত্র তৈরী ক'রে দিয়ে দেয়ালে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে সুরু ক'রে দেন—ইচ্ছা রকমে বাইরে বেরিয়ে পালাবেন। অবশেষে সুড়ঙ্গ শেষ হ'লে দেখা গেল তিনি ভুল ক'রে বাইরের দিকে না কেটে এদ্‌মন্দের কামরায় এসে পড়েছেন। বছরের পরিশ্রমের ফল শেষে এই!

যাই হোক্ এদ্‌মন্দের তবু একটি সঙ্গী জুটল। ছিলেন মহাপণ্ডিত। এদ্‌মন্দ্‌কে তিনি শুধু প্রবোধ আত্মহত্যা থেকেই নিবৃত্ত করলেন না—তাকে বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুললেন। নানা দেশের ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র ইত্যাদি দু' জনের সময় কাটতে লাগল। কয়েক বছরের এদ্‌মন্দ্‌ও পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত গেল। সেও হ'ল এক মহাপণ্ডিত। শুধু তাই ফারিয়া' তাকে একটা গুপ্তধনের সন্ধানও দিয়ে দি মণ্টেক্রষ্টো নামে জনহীন দ্বীপে এক গুহার মধ্যে গুপ্তধন পোঁতা আছে। ফারিয়া একখানা প্রাচীন ঘাঁটতে ঘাঁটতে এর সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ হওয়ায় সেখানে আর যেতে পারেন নি। তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, এদ্‌মন্দ্‌ যদি কখনও পায় তবে সে হয়তো ও ধন কাজে লাগাতে পারবে।

সত্যিই ফারিয়া হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। মন্দ্‌ প্রথমটা খুবই শোক পেয়েছিল কিন্তু হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল। ঐ দুর্গে কোনও কয়েদী মারা তাকে কবর দেওয়া হ'ত না—চটে মুড়ে সমুদ্রে দেওয়া হ'ত। রক্ষীরা ফারিয়াকে চটে মুড়ে যখন খাটিয়া আনতে গেল এদ্‌মন্দ্‌ সেই ফাঁকে ফারিয়ার

র তার নিজের কামরায় নিয়ে বিছানায় শুইয়ে তার পর চট্‌পট্ নিজে সেই চটের থলির মধ্যে ঢুকে ান ক'রে পড়ে রইল। সঙ্গে রাখল সেই সুড়ঙ্গ অস্ত্রটা। প্রহরীরা মৃত ফারিয়া মনে ক'রে তাকেই মুদ্রে ফেলে দিল। এদ্‌মন্দ্‌ নাবিকের কাজ করত, ই খুব পাকা সাঁতারু ছিল। জলে পড়ে সে কৌশলে বাঁধন কেটে সাঁৎরে গিয়ে একটা জলে ডোবা পাথর ঠল। ১৪ বছর পরে আজ সে মুক্ত! সৌভাগ্য এই সময় দূরে একটা জাহাজ যাচ্ছিল। এদ্‌মন্দ্‌কে বস্থায় দেখে জাহাজের লোকেরা তাকে জাহাজে নিল, মনে করল ঝড়ে জাহাজ ডুবি হয়ে বুঝি ওর বস্থা। এদ্‌মন্দ্‌ও সেই রকমই বোঝাল।

দ্‌মন্দ্‌ সেই জাহাজেই রয়ে গেল। তার পর দিন জাহাজটা মণ্টেক্রষ্টো দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সে কৌশলে শিকারের নাম ক'রে সেখানে নেমে । তার পর পাথরে হোঁচট খেয়ে পা ভেঙ্গে গেছে অজুহাতে দু' দিন সেখানে বিশ্রাম করতে চাইল। ঙ্গীদের অন্য কাজ ছিল, তাই তারা চলে গেল, রইল জাহাজ দু' দিন পরে আবার এসে তাকে তুলে । এদমন্দ্‌কে তখন পায় কে! তখনই সে ছুটল তিক জায়গায় গুপ্তধনের খোঁজে এবং খানিকক্ষণ খুঁজি ক'রে যে সিন্দুক বোঝাই ধনরত্নের সন্ধান পেল র ঐশ্বর্য্যও তার কাছে কিছু নয়।

ল্প কিছু হীরে-জহরৎ নিয়ে এদ্‌মন্দ্‌ তখনকার মত ক'রে ফিরে এল। তার পর দেশে এসে সেই বিক্রী ক'রে যে টাকা পেল তা দিয়ে নিজেই একটা ছোট জাহাজ কিনে আবার ফিরে গেল মণ্টেক্রষ্টো দ্বীপে। এবার আর বাকি ধনরত্নগুলি তুলে আনতে তার কোন অসুবিধা হ'ল না।

এদ্‌মন্দ্‌ এখন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। 'মণ্টেক্রষ্টোর কাউণ্ট' এই নাম নিয়ে সে ফ্রান্সে এসে জাঁকিয়ে বসল। এত দিন পরে আর তাকে কেউ সেই ছোকরা এদ্‌মন্দ্‌ দান্তে বলে সন্দেহও করল না। আর সে এদ্‌মন্দ তো কবে মারা গেছে!

এইবার এদ্‌মন্দ্‌ নানা কাজে হাত দিল। যারা এক সময়ে তার উপকার করেছিল তাদের খুঁজে বার ক'রে সে নানা ভাবে সাহায্য করল। তার পর তার কাজ হ'ল পুরোনো শত্রুদের একে একে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা। দ্যাংলার, ফার্নান্দ্‌ এবং ভিলফোর্দ্—এরা সকলেই তখন সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে। তাদের খুঁজে বার করতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। মিথ্যা খবর শুনিয়ে ফার্নান্দ্‌ কি ভাবে মার্সিদিস্‌কে বিয়ে করেছে সে খবরও জানা গেল। বিরাট্ ধনী কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রষ্টোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে কে না চায়? এদ্‌মন্দের ঐ পুরোনো শত্রুরাও সহজেই তার ফাঁদে পা দিল। এদ্‌মন্দ্‌ তখন কৌশলে নানা ফন্দী এঁটে একে একে তাদের তিন জনকেই সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ছাড়ল, এমন ভাবে তাদের দেশের সামনে অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করল যে জনসমাজে আর তাদের মুখ দেখাবার উপায় রইল না। ফলে একজন করল আত্মহত্যা, একজন্ হয়ে গেল পাগল, অপর জন্ হ'ল পথের ভিক্ষুক।

আসছে মাস থেকে

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের

একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

জয় হিন্দ। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৪র পুণ্যদিনে এই চিঠি লিখতে বসেছি। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে আজ সুরু হ'ল ভারতবর্ষের নতুন জীবন। এমন দিন পৃথিবীতে বারে বারে আসে না। এই দিনটী দেখে যাবার গৌরব যারা লাভ করল তারা কম ভাগ্যবান্ নয়। যে সব দেশপ্রেমিকের পরিশ্রমে, ত্যাগে এবং জীবন উৎসর্গের ফলে আজকের এই স্বাধীনতা, আজ এই পুণ্যদিনে সেই পুণ্যশ্লোকদের নমস্কার করি। এঁদের সকলকার সাধ্যমত পরিচয় রামধনুতে ক্রমে ক্রমে দেবার চেষ্টা করব।

এই শুভ দিনে কলকাতায় যে অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম তা একদিন আগেও কেউ কল্পনা করতে পারি নি। গত এক বছর ধরে এই সহরের বুকের উপর ভাইএ ভাইএ যে সর্ব্বনাশা আত্মবিনাশী বিরোধ চলছিল কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে একরাত্রির মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! হিন্দু-মুসলমান সমান উৎসাহে এই স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিয়েছে। মাত্র একদিন আগেও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়-অধ্যুষিত যে অঞ্চলে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারে নি, এই দিন নিঃশঙ্কচিত্তে তারা সেখানে মিলিত হয়ে পরস্পরকে প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়েছে! যে সাম্য, মৈত্রী ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে এই স্বাধীনতার সূচনা হ'ল তা চিরস্থায়ী হোক্ এই প্রার্থনা ক'র।

স্বাধীনতার দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমরা যে অসংখ্য চিঠি পাঠিয়েছ তার তালিকা দেবার মত জায়গা নেই। তার বদলে আমরা শুধু তোমাদেরও স... রামধনুর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কুমারী বিজয়া বরা (দিল্লী) লিখেছেন—"... আমাদের শুভদিনটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে।—... আগষ্ট! বহু লোকের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত ভারত... শৃঙ্খল আজ খুলে গেল। এই আনন্দের দিনে ... দান আমরা যেন সশ্রদ্ধ চিত্তে মনে করি।...কিন্তু ... আগে আর একটি কথা। শুধু দেশ স্বাধীন হলেই ... না—আমাদের মনগুলোকেও গড়ে তুলতে হবে স্বা... প্রশস্ত ভাবে।...আজ আমাদের শুধু দেশের স্বা... এসেছে, মনের নয়। যেদিন আমরা সব দিক্ ... স্বাধীন হ'তে পারব সেদিনই হবে আমাদের পূর্ণ স্বা... দিবস।"

শ্রীঅধীপ মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) লিখেছেন—"... ডোমিনিয়ন্ শাসনতন্ত্র হ'ল, এটি স্বাধীনতার প্রথম ... হ'লেও পূর্ণ স্বাধীনতা তো নয়! কাজেই পত্রিকার ... স্বাধীনতা-সংখ্যা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হবে ... বিশেষ 'স্বাধীনতা-সংখ্যা' না বার করলেও রামধনুর ... ও পরবর্ত্তী কয়েকটি সংখ্যায় জাতীয়তা, স্বাধীনতা... ও দেশপ্রেমমূলক বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা ... স্বাধীনতার প্রথম ধাপ যখন এসেছে, বাকিটা আ... আর দেরী হবে না নিশ্চয়ই।"

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'র। বন্দে মাতরম্।

—ইতি ...

আজ ২৯শে শ্রাবণ (ইংরাজী ১৫ই আগষ্ট) ভারতের ...হাসে স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে ভারতবর্ষ বৃটীশ ...ন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্থান এই দুই ...নিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। ভারতবাসীর জীবনে ...র এক নতুন অধ্যায় সুরু হ'ল।

* * *

...নতুন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে শীঘ্রই অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন ...। এখন থেকেই তা সুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের ...র বা শাসনকর্ত্তার পদে বেশীর ভাগ ভারতীয়েরাই ...ক্ত হয়েছেন। পশ্চিম বাংলার গভর্ণর হয়েছেন শ্রীযুক্ত ...গোপালাচারী। বিহারে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলত-..., উড়িষ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু, মধ্যপ্রদেশে শ্রীযুক্ত ...দাস পাকবাস, পূর্ব্ব পাঞ্জাবে স্যর্ চণ্ডুলাল ত্রিবেদী, ...মে স্যর্ আকবর হায়দারী। যুক্তপ্রদেশে হয়েছেন ... বিধানচন্দ্র রায়, কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে আমেরিকায় ...ন ব'লে তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী ...ডু সেখানে গভর্ণরের কাজ করবেন। বোম্বাই ও ...জ প্রদেশে যে ইংরেজ গভর্ণররা ছিলেন (কাল্‌ভিল্ ...নাই) তাঁরাই আপাততঃ থাকবেন। পাকিস্থান ... সিন্ধু প্রদেশে স্যর হেদায়াৎউল্লা গভর্ণর হয়েছেন। ...ন্য প্রদেশে ইংরেজ গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন। পূর্ব্ব ...য় হয়েছেন স্যর্ বোর্ণ।

* * *

পূর্ব্ব বঙ্গে লীগ্ দলের নেতা কে হবেন তাই নিয়ে মিঃ ...বর্দ্দী ও মিঃ খাজা নাজিমউদ্দীনের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা ... গেল। সুরাবর্দ্দী পরাজিত হয়েছেন। নাজিম-...ন সাহেবই হ'লেন পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী।

* * *

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল ১৫ই ...গষ্টের পূর্ব্বেই তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে সুভাষচন্দ্রের আরব্ধ 'মহাজাতি সদন'ও মুক্তি পেয়েছে। আশা করি এই স্মরণীয় জাতীয় মন্দিরটি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হয়ে কলকাতার গৌরব বৃদ্ধি করবে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

* * *

২২শে শ্রাবণ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি। আমরা জানি কবির মৃত্যু হয় নি, তিনি চিরকাল অন্তরীক্ষে থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন। তাই মৃত্যুতিথির চাইতে তাঁর জন্মতিথিটিই আমাদের কাছে বেশী স্মরণীয়। কিন্তু তবু কবির শেষ স্মৃতি বিজড়িত ২২শে শ্রাবণ তিথিটিও বাঙ্গালীর কাছে কম পুণ্যময় নয়।

* * *

মহাত্মা গান্ধী আবার নোয়াখালি রওনা হয়েছিলেন। ১৫ই আগষ্ট থেকে বাকি জীবন তিনি পাকিস্থানে কাটাবেন ব'লেই সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি মত পরিবর্ত্তন ক'রে সুরাবর্দ্দী সাহেবকে নিয়ে কলকাতার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন করবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে একদিনেই কলকাতার জীবনযাত্রায় যে অকল্পনীয় পরিবর্ত্তন এসেছে তার কথা ভাবলে বিশ্বাস করা যায় না।

* * *

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার দরজায় দাঁড়িয়ে তখন ব্রহ্ম-দেশের রাজনৈতিক গগনে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মন্ত্রিসভার অধিবেশন হচ্ছিল এমনি সময়ে অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্ম সরকারের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আউঙ্ সান ও তাঁর কয়েক জন সহকর্ম্মীকে অতর্কিতে হত্যা করা হয়েছে। সমস্ত ব্রহ্মদেশ তাই আজ শোকাচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ইউ স ও আরও অনেক পদস্থ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাঁচজন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় ইয়োরোপে ডেভিস্ কাপ্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন সে খবর তোমরা জান। এঁরা কিন্তু তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ২য় রাউণ্ডে ফরাসী খেলোয়াড়দের কাছে ৫-০ পয়েণ্টে সকলেই হেরে গেছেন।

* * *

ইংল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ক্রিকেট টেষ্ট্ খেলা চলছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু সুবি... করতে পারছে না। প্রথম টেষ্ট খেলাটি ড্র গিয়ে... তারপর পর পর তিনটেতেই দক্ষিণ আফ্রিকা পরা... হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ইংল্যা... যে ক'টি টেষ্ট্ খেলা হয়েছে (১৮৮৮ থেকে) তা... ইংল্যাণ্ড্ বিজয়ী হয়েছে ২৯ বার, দক্ষিণ আফ্রিকা হয়... ১২ বার। ২৩ বার খেলা অমীমাংসিত রয়ে যায়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

স্বাধীনতার গান

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আয় রে ছুটে ভারতবাসী, কোথায় আছিস্ কে!
স্বাধীনতার সূর্য্য ওঠে পূর্ব্ব গগনে!
দু' শ' বছর ঘুমের পরে
সিংহ জাগে নূতন ক'রে,
বীরের দেশে বীরের জাতি স্বাধীন হ'ল রে!

স্বাধীন মোরা—স্বাধীনতার পেলাম এবার স্বাদ;
নই ক্রীতদাস—এত দিনের ঘুচল অপবাদ।
আমরা হলাম বীরের জাতি—
আসুক বিপদ্ দিবারাতি
ভয় করি না—ঝরছে মাথায় ধাতার আশীর্ব্বাদ।

নতুনতর অস্ত্র মোদের—বিশ্ব অবাক্ হয়,
মনের বল সে বাহুবলে করল পরাজয়।
জগৎ মোদের চিনল এবার
স্বাধীনতার জয় জয়কার,
স্বাধীন ভারত বিশ্ব মাঝে আপন আসন লয়।

গাও গো সবে সমস্বরে স্বাধীনতার গান,
হব মোরা—হব মোরা সিংহ-বীর্য্যবান্।
দেশকে সবে বাসব ভালো,
ভারত হবে জগৎ-আলো,
নতুন প্রাতে পণ করিনু—রাখব দেশের মান।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১ম ঝুড়িতে ৬টা, ২য় ঝুড়িতে ৮টা, ৩য় ঝুড়িতে ১২টা এবং ৪র্থ ঝুড়িতে ১৬টা আম ছিল।

উত্তরদাতাদের নাম:—সুব্রত সনাতনি প্রভাতী, অসীমা, দীপা, কৃষ্ণা, দুষ্মন্ত, দিলীপ, বীণা ...ণী); বিজয়কৃষ্ণ পাল (সারেঙ্গা); রণেনকুমার ও (গোবরডাঙ্গা); অহীন্দ্রশেখর নায়েক (বোলপুর); ...তকুমার (কলিকাতা); দেবী বিশ্বাস (বেলগাছিয়া); শিপ্রা বসু (নিউ দিল্লী); সেবা ও কমল রায় (ঢাকা)।

নূতন ধাঁধা

ছাপাখানায় এক আনাড়ি কম্পোজিটর এসেছে। কেসে টাইপ্ ফেলবার সময় সে কয়েকটা টাইপ্ একটার আর একটা ফেলে বসেছে। ফলে কয়েক লাইন কম্পোজ করে কি দাঁড়িয়েছে তার একটু নমুনা তুলে ...ম। তোমরা ভুল অক্ষরের জায়গায় সঠিক অক্ষরগুলি বসিয়ে লাইন ক'টা পড়ে দিতে পার? একবার চেষ্টা ...তো—

কজমঅ দিম কীজগ কীনাজদব ভীবতবজর্ষ চন্দ্রনীণিঅ মীজন এঅ বীৌ ছিজলম। বীৌব দুই ...রাবনীণিঅ ও ধাবনীণিঅ। রড় বীপুেত্র খুর সীহসা যোদ্ধী ছিজলম, ছোটটি যুদ্ধবিগ্রজহব ধীব ধীবিজতম মী, ...তী লিখিজত পাইজলই খুসা।

যাঁদের মাণিক নিয়ে মেলা বসছে—

আসছে পূজোয় ছোটদের বার্ষিক

মাণিক-মেলা

সম্পাদক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

...মুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়, ...রীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশাপূর্ণা ..., শ্রীসুব্রতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ...নিরূ দেবী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী, ...সিরাশি দেবী, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ..., শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযোগেন্দ্র ..., শ্রীনির্ম্মল বসু, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ..., শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীসু কুমার সরকার, শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক গুহ, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল ঘোষ, শ্রীস্ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার, শ্রীঅসিত সেন, শ্রীদেবপ্রসাদ ...গুপ্ত, শ্রীমণি ঘোষাল, শ্রীঅনিল সরকার, শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য, শ্রীনরেন্দ্র মল্লিক, যাদুকর পি. সি. সরকার, শ্রীবিভূতিভূষণ ...পাধ্যায়, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যো-...ায়, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীঅশোককুমার শাস্ত্রী, বনফুল, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

এঁরা ছাড়া আরও অনেকে আছেন।

এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩/১, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২

"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা —— জীবনের জয় গান",—

যাদের আত্ম-বলির রক্তে মাখা দেশের মাটির উপর আজ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হলো,—

একদা-অবজ্ঞাত সেইসব শহীদের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে রচিত হয়েছে আমাদের এ-বৎসরের পূজা-বার্ষিকী—**'দেশের মাটি'**

'দেশের মাটি'র পাতায়-পাতায় চিত্রে-কথায় কাব্যে-গাথায় স্বাধীন-বাংলার বরেণ্য মনীষীবৃন্দ অশ্রুবিন্দুর যে মালা গেঁথেছেন তার দিগন্ত-প্রসারী সৌরভে দেশ নূতন সম্ভাবনায় মেতে উঠবে !!

৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

দেশের মাটি

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্ব-মায়ের)
আঁচল পাতা।"

—রবীন্দ্রনাথ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন—২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোষ্ট বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম দামোদর

দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কলকাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ :: ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

=য়্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস=

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

=সব্যসাচী বিরচিত=

। মুখোশের অন্তরালে
। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
। কবরের নীচে
। জীবনের মেয়াদ
। অস্তাচলের পথে
। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার

। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন

। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৩। মিঃ গশ, ডিটেকটিভ

বুদ্ধদেব বসু

১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু

১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২১। গ্রহের ফের
২২। রক্ততৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ

দেব সাহিত্য-কুটীর • ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

স্বাধীন ভারতের

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ

কামনা করি।

—'লক্ষ্মী ঘি'

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ।৵০

Regd. No. C—1041

স্বাধীন ভারতের

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ

কামনা করি।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPO

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা ।/০ ; ভি. পি. চা
বৈশাখ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২
মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথ
প্রকাশিত হয়।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইবে
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব
রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক ন
না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র যিনি
তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয় : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীকিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

রাঙা রামধনু

মাতোয়ারা গল্প ! ঝরঝরে কবিতা !
উচ্ছল হাসি-ব্যঙ্গ ! অফুরন্ত চিত্র !

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

রাঙা হাতে 'রাঙারাখি' মানাইবে ভালো,
কোহিনুর-উপহার, ঝল্‌মলে আলো !

দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫ বি, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

রামধনু—

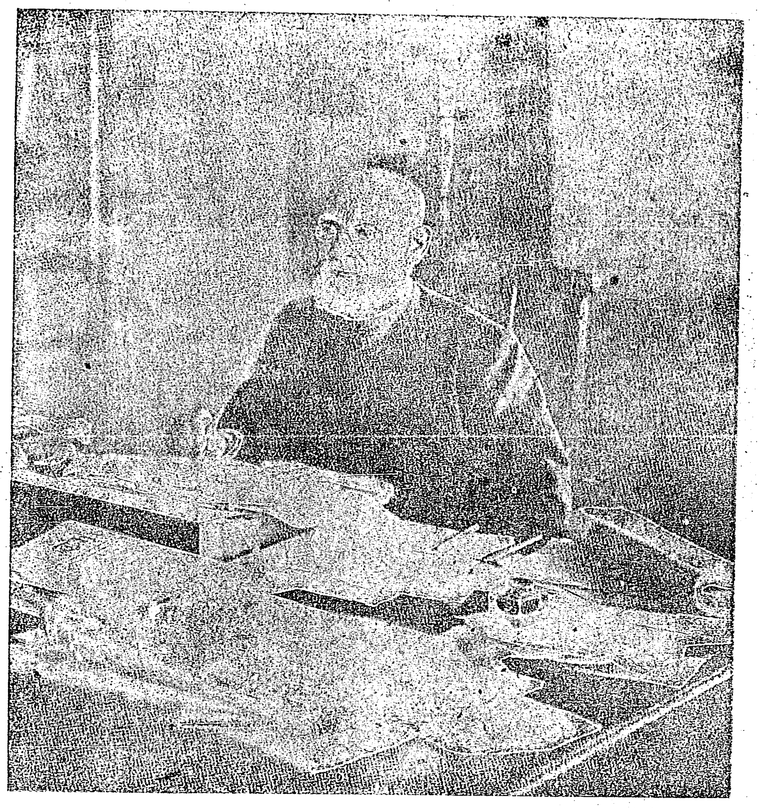

স্বদেশী আন্দোলনের 'মুকুটহীন রাজা'
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

স্বাধীনতার দিনে যাঁরা স্মরণীয়—২

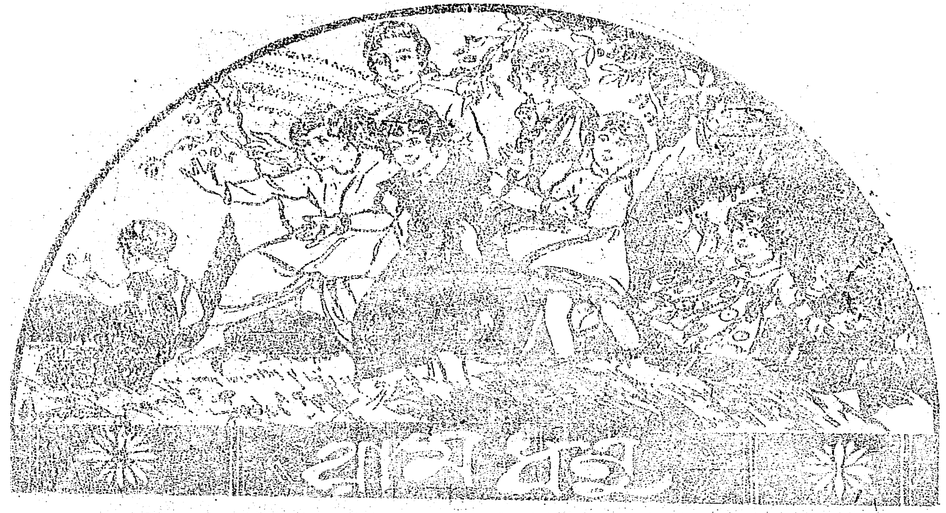

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৫৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

য়্যানি বেশান্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছিয়া যেতেছে দ্রুত বৃটিশের স্মৃতি,
চলচ্চিত্র শেষ—নিভে গেল বাতি,
কোথা দুর্জ্জয় সে পরাক্রম—ভীতি ?
ঘুমায় আজিকে ধূলায় শয্যা পাতি'।

বিজয়ী বীরেরা দাপটে কাঁপায়ে মহী
তোপের আওয়াজ সমান মিলালো হায়!
গল উপাধির গুরুভার শুধু বহি',
তাদের কাহিনী শুনিতে কেহ না চায়।

রঙ বেরঙের যেন ফুল মরশুমী
আড়ম্বরের তুবড়ি পড়িল ঝরি',
বিদেশী হ'লেও জহুরী চাঁপা যে তুমি,
এখনো সুরভি রাজিছে ভারত ভরি'।

তারা ধূমকেতু উল্কার মত সব,
সংশয় ভরা তাহারা আলেয়া আলো,
এনেছিল সাথে কেবলি উপপ্লব
এত বিভীষিকা সহসা মিলায়ে গেল।

হে অনুরাগিনী মহীয়সী বিদেশিনী,
অক্ষয় তুমি—তোমার হিতব্রত,
সম গৌরবে তুমি চির গরবিনী
এখনো শোভিছ সান্ধ্য তারার মত।

লড়াই ফেরৎ নন্দদুলাল

শ্রীশামুক—

এগারো

— কয়লা পুড়ে হীরে হ'ল —

ডাক্তার এসে বললেন, নন্দর খুব শক্ত অসুখ, বাঁচবার আশা নেই, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ছেলের দল বাধা দেয়। বলে, আমাদের দোষেই ওঁর অসুখ করেছে, আমরাই সেবা করে নিশ্চয়ই সারিয়ে তুলবো।

নন্দর বাড়ির লোকেরা তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে, তাও দিলে না। এমন কি ছেলেদের নিজেদের আত্মীয়েরা এসে সাধাসাধি—যে ছোঁয়াচে রোগ, এক সঙ্গে থাকা উচিত হবে না। তোমরা ক'দিনের জন্যে অন্ততঃ বাড়ি ফিরে চল।

ছেলেদের ঐ কথা,—আমাদের দোষে এমন অসুখ করেছে, আমরাই সারিয়ে তুলবো নিশ্চয়। জোর করে আমাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলে পালিয়ে আসবো তখুনি।

একটি ছেলেরও ভিন্ন মত দেখা গেল না। অদ্ভুত সেবা করলে ওরা, আশ্চর্য্যভাবে মেনে চলল দিনের পর দিন নিজেদের গড়া সব কঠিন আইন-কানুন। নন্দ জোর করে যা করাতে পারে নি আজ স্বেচ্ছায় তারা তাই করতে থাকলো।

সংসারের সমস্ত দেখাশুনা করে হিসাবমত, পালা করে পড়াশুনা করে ইস্কুলে যায়, আর পালা করে করে রোগীর সেবা—সারাদিন সারারাত, ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত, এতটুকু ভুলচুক হয় না। এতদিন অ... শাসনের বিরুদ্ধে দুষ্টামি করা ছিল ওদের একমাত্র... এখন তার রূপ বদলে সমস্ত শক্তি একটি মা... বাঁচাবার কাজে লেগে গেছে। নন্দকে ভাল ক... বিষয়ে ওদের এমন আগ্রহ—এত ব্যাকুলতা যে কেউ... বলে তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও, ও সেরে উঠবে ত'... দেবে তখুনি।

ডাক্তার বাবুকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হ... যে সেরে উঠছে তার মূলে আছে ছেলেদের অজেয় ম... জোর ও অপূর্ব্ব ভালবাসার সেবা। এ দু'টি ... সত্যি যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারে।

খানিকটা সেরে উঠে নন্দ শুয়ে শুয়ে দেখে ... কার্যকলাপ আর অবাক্ হয়ে যায়। ভেবে ঠিক ... পারে না এ কী করে সম্ভব হ'ল। তবে কি জো... মানুষকে দিয়ে কাজ করানোর চেয়ে তাকে ভা... তার ওপর সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে কাজ করানো ... সহজ—বেশী সুবিধা? এখন কত সহজে কত ... সমাধান হয়ে যাচ্ছে,—কোন হাঙ্গামা নেই, ... গোলমাল নেই এতটুকু।

এতদিনে সে বুঝতে পারে পালের গোদাটি ... সব চেয়ে নিরীহ মুখ, সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ ঐ সুশোভ... দলের পাণ্ডা। অথচ সে অন্য কত জনকে বৃথা সন্দে...

...ছ! আজ দলপতি নিজে ধরা দিল তাই ত' ধরা গেল, ...কি?

...তবে একটি জিনিষে সে দৃঢ়সংকল্প। আর নয়, আর ...াজ সে করবে না। তার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ে ...ছ। সম্পূর্ণ সেরে উঠলেই কানাই বাবুকে বলে অন্য ...কের ব্যবস্থা করে সে চলে যাবে নিশ্চয়।

...নন্দ একেবারে ভালো হয়ে যেতে সুশোভন এসে ...াবপত্র বুঝিয়ে দিতে চায়, ও তাকে আবার ...গকার মতন সমস্ত ভার নিতে বলে। ঠিক হ'ল যে ...ব পীড়াপীড়ি করছেন সে জন্য নন্দ দু'দিন বাড়িতে ... আসবে ও তারপর সমস্ত বুঝে-সুজে নেবে।

...বাড়ি যাবার দিন ছেলেদের এক সঙ্গে ডেকে নন্দ ...ল—আমি রবিবার বিকালে নিশ্চয় ফিরে আসছি। ...'দিন তোমরা যদি শান্ত ভাবে থাক তা হ'লে আমি ...হবো। আমি জোর করে বলছি না, তোমাদের ...রাধ জানাচ্ছি। আর একটি কথা বলে রাখাই ভাল। ...ি ঠিক করেছি একটু গুছিয়ে নিয়ে কানাই বাবুকে ...বা অন্য কোন লোকের ব্যবস্থা করবার জন্যে। ...ার মনে হচ্ছে আমার দ্বারা আর এ কাজ করা ... না।

...তার মনে হ'ল ঐ শেষের কথাগুলি বলবার সময় যেন ...েদের মুখগুলি কিছু বিষণ্ণ দেখালো। কিন্তু সত্যি ... হতে পারে, হয়তো তার নিজের চোখের দেখার ...।

...শনিবার বিকালে সুশোভনের সভাপতিত্বে তপোবনে ... জরুরী সভা বসলো। আলোচনার পর ঠিক হ'ল ...বিবারে যখন নন্দ ফিরে আসবে তখন তাকে মহা-...রোহে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তাকে আগে থেকে ...জানানো হবে না। তার আসবার আগেই সমস্ত ...োজন সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে।

...ুঁটিনাটি সব ঠিক হয়ে গেল—কে কি কি করবে ও কি ... করবে। সমস্ত বাড়িটা নিজেরা পরিষ্কার করবে, ... ভাবে সাজাবে—বিশেষ করে নন্দর ঘরখানি, এবং ...রাই নানা রকম রান্না করে একসঙ্গে, বসে রাত্রে ...। অভিনন্দন-পত্রে কি লেখা হবে তারও একটা ... হ'য়ে গেল, এবং ঠিক হ'ল ঐটি পড়বার পর সকলে মিলে নন্দকে অনুরোধ করবে যেন সে তাদের ছেড়ে চলে না যায়।

ছেলেদের উদ্দেশ্যটি খুবই সরল। অমন মরণাপন্ন অসুখ থেকে সেরে উঠবার পর নন্দকে কিছু আনন্দ দিয়ে এই উৎসবের মধ্যে নিজেরাও আনন্দ পেতে চায়। তা ছাড়া এদের একটি দুঃখজনক ধার আছে সেটিও শোধ করতে চায়।

পিক্‌নিকে নিয়ে গিয়ে এদের আনন্দ দিতে চেয়েছিল নন্দ। তার বদলে সে নিজে পেল কি? পেয়েছে কষ্ট ও দুঃখ, প্রায় হারাতেই বসেছিল নিজের জীবনটুকু। অমন নিদারুণ পরিণামের কথা অবশ্য এরা দুষ্টামি করার নেশায় আগে থেকে ভাবে নি কিন্তু হয়ে গেল ত' তাই। তার দাগা, তার পীড়ন এদের মনে সর্ব্বদাই আছে লেগে। এরা বয়সে ছোট, পৃথিবীর ছল চাতুরী বেশী জানে না, তাই ফাঁকি দিতে এদের মন সরে না। নন্দকে আনন্দ দিয়ে, তাকে খুশি করে নিজেদের কলঙ্কটুকু সাফ করে ফেলতে চায়।

রবিবারে সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে সে কি উৎসাহ —কী উত্তেজনা! ধুয়ে মুছে বাড়িটি তকতকে ঝকঝকে করে ফেললে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত। দেবদারুর পাতার মালায় মালায় বাড়ি গেল ছেয়ে, আর ফুল! কত ফুল—কাগজের তৈরি প্রাণহীন শুকনো সব নয়, টাটকা তাজা ফুল। প্রতি ঘরখানি হয়ে গেল যেন এক একটি সাজানো বাগান। স্বাগতম্ লেখা হ'ল বৈকি দরজার মাথায়, আর নীচে সারি সারি পাতাবাহারী টবের গাছ। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সব ছুটে দেখতে আসে, ভাবে আজ এদের বাড়িতে খুব ধুমধাম করে নতুন কিছু উৎসব হবে বা।

ছেলেরা দল বেঁধে বাজারে গেল। কিনে নিয়ে এল যত রাজ্যের ভাল ভাল জিনিষ, আজ আর নন্দকে খুশি করতে কর্পণ্য করবে না কোন দিকেই। সমস্ত দুপুরটি কেটে গেল মোটা চক্‌চকে কাগজে অভিনন্দনটি ছাপার হরফের মত লিখতে। লেখার চারপাশে কিছু কিছু কারুকার্যও এঁকে দিলে। তারপর বিকাল হতেই বিরাট রান্নার আয়োজন সুরু হয়ে গেল। সে সব কেউ দেখলে নিশ্চয় ভাবতো এ এক রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট হাঙ্গামা লেগে গেছে।

শীতকালের সন্ধ্যা। বিকাল শেষ হতে না হতেই তাড়াতাড়ি আঁধার এসে পৌছে গেল। কিন্তু নন্দ কই? এখনো ফেরে না কেন?' ছেলেরা মনে মনে ভাবে আর হাসে—মার আদুরে খোকা, খুব আদর খাচ্ছে।

পরম উৎসাহে ছেলেরা রান্না করে তাড়াতাড়ি। সমস্ত নিজেরাই করে, চাকর বামুনেরা সাহায্য করে, ফাইফরমাস খাটে। তারাও খুব মেতে গেছে এই মজার খেলায়। একজনকে বাইরে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহারায়, দূর থেকে নন্দকে আসতে দেখলেই সে যেন দৌড়ে এসে খবর দিয়ে দেয়। খবর পেলেই ছেলেরা হাত ধুয়ে এক ছুটে ওপরে গিয়ে সব বসে পড়বে—যেন কিছু জানে না, কিছু করে নি এই সমস্ত। বিজলীর আলোতে এমন চমৎকার সাজানো বাড়ি দেখে নন্দ চমকে যাবে ভয়ানক।

রান্না হয়ে গেল, আর কোন কাজ বাকি নেই। কিন্তু এখনো ত' এল না! তবে কি বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে? ছেলেদের ভয় হয় মনে।

সুশোভন বলে,—খেয়ে এলেনই বা! আবার আমাদের সংগে বসে যাবেন নিশ্চয়। তবে আমরা তাঁকে বেশী খেতে দেবো না, অসুস্থ শরীর ত'!

রাত গড়িয়ে চলে, তবু আসে না কেউ। ছেলেরা চাদর কম্বল মুড়ি দিয়ে রান্না ঘরে বসে বসে জটলা করে, আর কান খাড়া রাখে যদি সদর দরজায় হঠাৎ পায়ের শব্দ সুরু হয়ে যায়। তবু এল না কেউ। সারাদিনের উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে সকলে ঝিমিয়ে পড়ে, উৎসাহ নিভে নিভে যায়, হতাশার একটা গুরুভার ক্রমশঃ বুকের ভিতরে চেপে চেপে বসে।

গভীর রাত হয়ে গেল তবু এল না কেউ। চাকরেরা উঠানের রোয়াকে বসে ঢুলছিল, সেখানেই শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যায়। ছেলেদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে ক কথা বলবার আর নতুন কিছু খুঁজে পায় না। মাথায় হাত দিয়ে জলন্ত উনানের চারপাশে চুপ ক থাকে, ঘুমে আচ্ছন্ন চোখগুলি জোর করে খুলে এবং তখনো আশা করে কান পেতে থাকে দিকে।

উনানের আগুন দাউ দাউ জলে কয়লা পুড়ে হয়ে যায়, আর থরে থরে সাজানো থাকে নানা সব খাবার। নিস্তব্ধ পুরীতে বিজলীর আলো নিভিয়ে দেবার কথাও কারুর মনে এল না। অয়ন সাজানো ফুল, লতাপাতা শীতের ছোঁয়ায় ক্রমশঃ যেতে থাকে। সারাদিন বাতাসে আনন্দে দুলছি এখন প্রাণহীন জড়ের মতন ঝুলছে সব। ছেলে আশায় কত আয়োজন করলে কিন্তু এল না কেউ।

নন্দ ঠিক করেছিল বিকালেই চলে আসবে। তার এক দিদি শশুরবাড়ি থেকে এসে হাজির। কিছুতেই ছাড়লেন না, তাঁর নিজের হাতের রান্না খেতেই হবে। খাওয়া শেষ করতে রাত হয়ে গে বললেন, অসুস্থ শরীরে এত রাতে গিয়ে কাজ নেই ভোরে গেলেই চলবে।

খুব ভোর বেলা নন্দ এক ফিটন ভাড়া করে চলে তপোবনের সামনে এসে পৌছাতে যা চোখে পড়ল বিষম চমকে না উঠে পারলে না। বাড়ির সা চারপাশে লোকে লোকারণ্য, তাদের ছুটোছু গোলমালের যেন আর শেষ নেই। এক প্রকাণ্ড ওয়ালা দমকল দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। দম লোকেরা আগুন নিভানো শেষ করে নিজেদে সরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছে চলে যাবার আগে।

নয়া আগষ্টের শহীদ

শ্রীপরিমল সিংহ

সহরতলীটা একটু ছাড়িয়ে যেতে হয়। ঘিঞ্জি খোলার রের নোংরা সারি, মাঝখানে বিকেলের বৃষ্টিতে ভেজা চেপেচে কাদা ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। দু'পাশের ডাঙলো কয়লার ধোঁয়াতে ভরে গেছে। চালগুলোর ালার তামাটে রঙ বিবর্ণ হয়ে কালো হয়ে গেছে। ঝে মাঝে ধরেছে শ্যাওলা।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মাঝের সরু াটার জলের ওপর চিক্‌চিক্ করছে মোড়ের মাথার ত গ্যাসের আলো। এক হাঁটু জল হয়ে গেছে একটা গায়।

ছোট একটি ছেলে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। জলের র ভাস্‌ছে একটা কাগজের পতাকা। তে-রঙা, খানে চক্রচিহ্ন। সন্তর্পণে তুলে নিল পতাকাটা। পর তাকাল একবার বহু উঁচুতে; পৃথিবীর ধূলি- নতার স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে যেখানে জ্বলছে অসংখ্য লোকবিন্দু। তারপর চোখ নামিয়ে চলতে সুরু ন সে।

ছোট ঘরখানা, একটা মোটে জানালা তার। শ্রাবণের ট জেগেছে অসহ্য। চক্ চক্ করে কাসছে রাম- ন। বুকের পাঁজরা দুমড়ে যাচ্ছে কাসির ধম্‌কানিতে। আগষ্টের আন্দোলনে জেল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কঠিন রোগ। চোখ দু'টো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে ছে। কপালের বলীরেখাটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

—'বাবা, কাসিটা তোমার বেড়েছে আজকে। নাই লাম আজ। কাল সকলে শুনো।'

াসিটা সত্যিই বেড়েছে। আজ থেকে নয়, ক'দিন ই। ছেলেটী উঠে সস্নেহে পিতার শীর্ণ বুকের হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'জান বাবা, দেশ আজ স্বাধীন হয়ে গেছে। তুমি তো এবার ভাল হয়ে তাই না?'

াসিটা কমেছে একটু। সস্নেহে রামরতন তাকালো দিকে। কচি কিশলয়ের সবুজ আশাতে ঝল্‌মল খটা। তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। অসহায় ভাবে তাকাল সমস্ত ঘরটার দিকে। মাটী খসে পড়েছে পূব দিকের দেওয়ালটার। মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে কেরো-সিনের ধুমায়িত শিখাটি। স্থির, অচঞ্চল, রক্তাভ শিখাটি।

—'কি ভাবছো বাবা? তুমি ভাল হয়ে যাবে না? তবে যে তুমি বলতে দেশটা স্বাধীন হোক, তখন দেখিস, কিছু রোগ থাকবে না।'

ছেলেটীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল।

রামরতন সস্নেহে তার চুলগুলোর ওপর শীর্ণ হাতটা বুলোতে বুলোতে বললো—'হবে রে, হবে। ওরা আমাকে কত যত্ন করে ভাল করে দেবে দেখিস!'

ছেলেটী আরও নিবিড়ভাবে বাপের কোলের কাছে শুয়ে বলল—'আজ তো তোমাকে ডাকলো না বাবা! কত বাজনা হ'ল মাঠে, মিষ্টি খেতে দিল, কিন্তু তোমাকে তো ডাকলো না বাবা? কেউ তো তোমার কথা বললো না!'

বিব্রত হয়ে উঠলো রামরতন। তারপর বলল—'পাগল, ওদের কত কাজ, দেখিস না? কি করে মনে রাখে বল আমার মত একটা লোকের কথা?'

ছেলেটী বলল—'তবে যে তুমি বললে—'

বাধা দিয়ে রামরতন বলে উঠল—'দু'দিন সবুর কর, তখন ওদের মনে পড়বে আমার কথা। ওরে, আমার কথা ওরা কি ভুলতে পারে? আমি যে ভুলি নি কোন দিন। কত রাত ধরে চিন্তা করেছি। স্বপ্ন দেখেছি আজকের এই দিনটাকে। ওরা কি ভুলে যাবে ভাবিস?'

হঠাৎ ছেলেটি বলল—'আজ রাতে গল্প বল বাবা। আলো নিভিয়ে দিই।'

আলোটা নিভিয়ে দিল সে চট করে।

একটু বাতাস উঠেছে। ছোট জানালাটা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকছে ঘরটায়।

রামরতন বুক ভরে বাতাস টেনে নিল একবার। তারপর সুরু করল গল্প।

হ্যাঁ, গল্পই বটে।

, চায়ের টেব্‌লের রাজনীতি নয়। কুশনে বসে য়্যাসে-ম্বলির সভ্য হবার জন্য মোটা টাকার চেক্ কাটার কথা নয়।

শীতকালের সন্ধ্যা। বিকাল শেষ হতে না হতেই তাড়াতাড়ি আঁধার এসে পৌছে গেল। কিন্তু নন্দ কই? এখনো ফেরে না কেন?' ছেলেরা মনে মনে ভাবে আর হাসে—মার আদুরে খোকা, খুব আদর খাচ্ছে।

পরম উৎসাহে ছেলেরা রান্না করে তাড়াতাড়ি। সমস্ত নিজেরাই করে, চাকর বামুনেরা সাহায্য করে, ফাইফরমাস খাটে। তারাও খুব মেতে গেছে এই মজার খেলায়। একজনকে বাইরে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহারায়, দূর থেকে নন্দকে আসতে দেখলেই সে যেন দৌড়ে এসে খবর দিয়ে দেয়। খবর পেলেই ছেলেরা হাত ধুয়ে এক ছুটে ওপরে গিয়ে সব বসে পড়বে—যেন কিছু জানে না, কিছু করে নি এই সমস্ত। বিজলীর আলোতে এমন চমৎকার সাজানো বাড়ি দেখে নন্দ চমকে যাবে ভয়ানক।

রান্না হয়ে গেল, আর কোন কাজ বাকি নেই। কিন্তু এখনো ত' এল না! তবে কি বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে? ছেলেদের ভয় হয় মনে।

সুশোভন বলে,—খেয়ে এলেনই বা! আবার আমাদের সংগে বসে যাবেন নিশ্চয়। তবে আমরা তাঁকে বেশী খেতে দেবো না, অসুস্থ শরীর ত'!

রাত গড়িয়ে চলে, তবু আসে না কেউ। ছেলেরা চাদর কম্বল মুড়ি দিয়ে রান্না ঘরে বসে বসে জটলা করে, আর কান খাড়া রাখে যদি সদর দরজায় হঠাৎ পায়ের শব্দ সুরু হয়ে যায়। তবু এল না কেউ। সারাদিনের উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে সকলে ঝিমিয়ে পড়ে, উৎসাহ নিভে নিভে যায়, হতাশার একটা গুরুভার ক্রমশঃ বুকের ভিতরে চেপে চেপে বসে।

গভীর রাত হয়ে গেল তবু এল না কেউ। চাকরেরা উঠানের রোয়াকে বসে ঢুলছিল, সেখানেই শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যায়। ছেলেদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে ক... কথা বলবার আর নতুন কিছু খুঁজে পায় না। ... মাথায় হাত দিয়ে জ্বলন্ত উনানের চারপাশে চুপ করে... থাকে, ঘুমে আচ্ছন্ন চোখগুলি জোর করে খুলে... এবং তখনো আশা করে কান পেতে থাকে বা... দিকে।

উনানের আগুন দাউ দাউ জ্বলে কয়লা পুড়ে... হয়ে যায়, আর থরে থরে সাজানো থাকে নানা উ... সব খাবার। 'নিস্তব্ধ পুরীতে বিজলীর আলো... নিভিয়ে দেবার কথাও কারুর মনে এল না। অমন ... সাজানো ফুল, লতাপাতা শীতের ছোঁয়ায় ক্রমশঃ ... যেতে থাকে। সারাদিন বাতাসে আনন্দে দুলছিল... এখন প্রাণহীন জড়ের মতন ঝুলছে সব। ছেলেরা... আশায় কত আয়োজন করলে কিন্তু এল না কেউ।

নন্দ ঠিক করেছিল বিকালেই চলে আসবে। ... তার এক দিদি শশুরবাড়ি থেকে এসে হাজির। ... কিছুতেই ছাড়লেন না, তাঁর নিজের হাতের রান্না... খেতেই হবে। খাওয়া শেষ করতে রাত হয়ে গেল... বললেন, অসুস্থ শরীরে এত রাতে গিয়ে কাজ নেই— ভোরে গেলেই চলবে।

খুব ভোর বেলা নন্দ এক ফিটন ভাড়া করে চলে... তপোবনের সামনে এসে পৌঁছাতে যা চোখে পড়ল ... বিষম চমকে না উঠে পারলে না। বাড়ির সাম... চারপাশে লোকে লোকারণ্য, তাদের ছুটোছুটি... গোলমালের যেন আর শেষ নেই। এক প্রকাণ্ড ... ওয়ালা দমকল দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। দমক... লোকেরা আগুন নিভানো শেষ করে নিজেদের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছে চলে যাবার আগে।

(ক্রমশঃ)

নয়া আগষ্টের শহীদ

শ্রীপরিমল সিংহ

...সহরতলীটা একটু ছাড়িয়ে যেতে হয়। ঘিঞ্জি খোলার ...রের নোংরা সারি, মাঝখানে বিকেলের বৃষ্টিতে ভেজা ...প্যাচপেচে কাদা ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। দু'পাশের ...ড়ীগুলো কয়লার ধোঁয়াতে ভরে গেছে। চালগুলোর ...নার তামাটে রঙ বিবর্ণ হয়ে কালো হয়ে গেছে। ...ঝে মাঝে ধরেছে শ্যাওলা।

...সন্ধ্যে হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মাঝের সরু ...স্তাটার জলের ওপর চিক্‌চিক্ করছে মোড়ের মাথার ...লাভ গ্যাসের আলো। এক হাঁটু জল হয়ে গেছে একটা ...য়গায়।

...ছোট একটি ছেলে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। জলের ...র ভাস্‌ছে একটী কাগজের পতাকা। তে-রঙা, ...খানে চক্রচিহ্ন। সন্তর্পণে তুলে নিল পতাকাটা। ...রপর তাকাল একবার বহু উঁচুতে; পৃথিবীর ধূলি-...লিনতার স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে যেখানে জ্বলছে অসংখ্য ...আলোকবিন্দু। তারপর চোখ নামিয়ে চলতে সুরু ...ল সে।

...ছোট ঘরখানা, একটা মোটে জানালা তার। শ্রাবণের ...মোট জেগেছে অসহ্য। চক্ চক্ করে কাসছে' রাম-...ন। বুকের পাঁজরা দুমড়ে যাচ্ছে কাসির ধম্‌কানিতে। ...আগষ্টের আন্দোলনে জেল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ...কঠিন রোগ। চোখ দু'টো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে ...য়েছে। কপালের বলীরেখাটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

—'বাবা, কাসিটা তোমার বেড়েছে আজকে। নাই ...পড়লাম আজ। কাল সকলে শুনো।'

...কাসিটা সত্যিই বেড়েছে। আজ থেকে নয়, ক'দিন ...ই। ছেলেটী উঠে সস্নেহে পিতার শীর্ণ বুকের ...র হাত বুলোতে বুলোতে বললো, 'জান বাবা, দেশ আজ ...স্বাধীন হয়ে গেছে। তুমি তো এবার ভাল হয়ে ...তাই না?'

...কাসিটা কমেছে একটু। সস্নেহে রামরতন তাকালো ...র দিকে। কচি কিশলয়ের সবুজ আশাতে ঝল্‌মল ...মুখটা। তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। অসহায় ভাবে তাকাল সমস্ত ঘরটার দিকে। মাটী খসে পড়েছে পূব দিকের দেওয়ালটার। মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে কেরোসিনের ধূমায়িত শিখাটি। স্থির, অচঞ্চল, রক্তাভ শিখাটি।

—'কি ভাবছো বাবা? তুমি ভাল হয়ে যাবে না? তবে যে তুমি বলতে দেশটা স্বাধীন হোক, তখন দেখিস, কিছু রোগ থাকবে না।'

ছেলেটীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল।

রামরতন সস্নেহে তার চুলগুলোর ওপর শীর্ণ হাতটা বুলোতে বুলোতে বললো—'হবে রে, হবে। ওরা আমাকে কত যত্ন করে ভাল করে দেবে দেখিস!'

ছেলেটী আরও নিবিড়ভাবে বাপের কোলের কাছে শুয়ে বলল—'আজ তো তোমাকে ডাকলো না বাবা! কত বাজনা হ'ল মাঠে, মিষ্টি খেতে দিল, কিন্তু তোমাকে তো ডাকলো না বাবা? কেউ তো তোমার কথা বললো না!'

বিব্রত হয়ে উঠলো রামরতন। তারপর বলল—'পাগল, ওদের কত কাজ, দেখিস না? কি করে মনে রাখে বল আমার মত একটা লোকের কথা?'

ছেলেটী বলল—'তবে যে তুমি বললে—'

বাধা দিয়ে রামরতন বলে উঠল—'দু'দিন সবুর কর, তখন ওদের মনে পড়বে আমার কথা। ওরে, আমার কথা ওরা কি ভুলতে পারে? আমি যে ভুলি নি কোন দিন। কত রাত ধরে চিন্তা করেছি। স্বপ্ন দেখেছি আজকের এই দিনটাকে। ওরা কি ভুলে যাবে ভাবিস?'

হঠাৎ ছেলেটি বলল—'আজ রাতে গল্প বল বাবা। আলো নিভিয়ে দিই।'

আলোটা নিভিয়ে দিল সে চট করে।

একটু বাতাস উঠেছে। ছোট জানালাটা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকছে ঘরটায়।

রামরতন বুক ভরে বাতাস টেনে নিল একবার। তারপর সুরু করল গল্প।

হ্যাঁ, গল্পই বটে।

, চায়ের টেব্‌লের রাজনীতি নয়। কুশনে বসে য়্যাসেম্বলির সভ্য হবার জন্য মোটা টাকার চেক্ কাটার কথা নয়।

জীবন্ত মানুষের রক্তদানের ইতিহাসের কথা। অতীতের অন্ধকারে অজানা কত জীবনদীপ নিভে গেল, তারই কথা। কত মায়ের—কত বাপের চোখের জল, কত ছেলের হাহাকার, কত রিক্ততার ক্রন্দন! যাদের স্থান নেই ইতিহাসে তাদের কথা। যারা ঘর ছেড়েছে অকালে, পথে যারা দেশবাসীর লাঞ্ছনা কুড়িয়ে চলেছিল, তাদের কথা।

কণ্ঠস্বরে আবেগ জেগেছে রামরতনের।

ষোলোই আগষ্ট আজ।

ছোট জানালাটা দিয়ে প্রভাতের একটুকরো আলো এসে পড়েছে শমুর ছোট্ট মুখখানার ওপর। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে শমু। রামরতন ধীরে ধীরে উঠলো বিছানা থেকে। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে উঠলো তার। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই যেন। মাঝে মাঝে হাহাকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কি শক্তই না শরীর ছিল তার!

পেষা আমের ছিবড়ের মত হয়ে ফিরেছে চার বছর জেল খেটে। এসে দেখেছে মৃত্যুমুখী শমুর মাকে। আর দেখেছে তার তেরো বছরের ছেলেকে তার শিয়রে।

শমুর মা মরেছে আজ এগারো মাস হ'ল।

জানালার গরাদে ধরে কাঁপতে থাকে রামরতন। এক কণাও চাল নেই। তাই চট্ করে 'শুয়ে পড়েছিল শমু। সপাং করে কে যেন তাকে চাবুক মারলো। ফিরে তাকালো শমুর দিকে। গত রাত্রির অনাহারে ম্লান ক্লান্ত মুখখানা ও মাথার কাছে কাগজের একখানা জাতীয় পতাকা। চক্রশোভিত তে-রঙা ঝাণ্ডা।

রামরতনের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল শীর্ণ গালের দু' পাশে।

পা টিপে টিপে বের হয়ে এল রামরতন। বারান্দা থেকে লাঠি গাছটা নিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে ভিজে রাস্তার ওপর পা বাড়ালো অতি কষ্টে। তাকে এগোতেই হবে।

ময়দানটা সাজানো হয়েছে। চারদিকে তিনরঙা জাতীয় পতাকায় ঝল্‌মল্ করছে সভাপ্রাঙ্গণটী। রঙ্গিন কাগজের ফুলের মালা দুলছে গেটটার দু' পাশের বে দড়ি থেকে।

রামরতন ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালো। ভেতরে লোক জমতে সুরু করেছে।

স্বাধীন বাংলার মন্ত্রী আসবেন আজ।

রামরতনের চোখ দু'টো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে হ্যাঁ, তাকেই মুখ ফুটে জানাতে হবে আজ। তা না চলবে না। কচি ছেলে তার না খেয়ে আছে। নরনার অভুক্ত, অকল্যাণ হবে যে স্বাধীন ভারতের পত্তনের। লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে।

ঘাসের ওপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল রামরতন।

* * *

শমু স্বপ্ন দেখছিল। আঃ, বাবার কি সুন্দর চে হয়েছে! আজকে মিঠে পুলি হবে তাদের বাড়ীতে। কি সুন্দর পিঠে তৈরী করতো, আঃ! শমু লাফা আনন্দে। কিন্তু বাবা আসছে না কেন?

চোখ দু'টো কেমন জ্বলছে না বাবার! কে কই, না তো। ওই তো বাবা শুয়ে রয়েছেন, কি বাবার মুখটা!

* * *

ভিড় বাড়ছেই।

হঠাৎ হৈ-চৈ জেগে উঠলো গেটের সম্মুখে। 'মাইকে ভেতর থেকে গড় গড় শব্দে ভেসে এল—'চুপ করে থা স্বাধীন বাংলার শপথ নেওয়া হবে।'

—'আহা রে,' কে একজন বলে উঠলো, 'বড় দুঃখী রে রামরতন!'

উপুড় হয়ে পড়ে গেছে সে। সবুজ ঘাসের টাট্‌কা রক্ত জমে গেছে। স্থির হয়ে গেছে শরীরটা।

* * *

তোমরা শুনতে পাচ্ছ?

শমু কাঁদছে। সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁদছে ওই রতনের দুঃখে। কারা যেন একটানা দুঃখের কা পেশ করছে কোন এক নয়া বিধাতার কাছে।

কত রিক্ত তারা!

তাই জানাচ্ছে আবেদন।

এক আগষ্টে তারা জানিয়েছে দাবী। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি এই নয়া আগষ্টে কারা যেন আবেদনের আড়ালে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। তারা কাঁদবে না কোনদিন।

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্.এ

জোশুয়া মার্শম্যান্

বাংলা সাহিত্যের গল্প বলতে গিয়ে গত বারে দের কাছে হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে আলোচনা ছি। হরপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি ভাবে ট উইলিয়ম কলেজ" যুগের অবসান হয়। কিন্তু যুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আরও অনেকেই ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিশনরীদের সংখ্যাই । শ্রীরামপুর কলেজ ছিল তাঁদের পীঠস্থান। তাঁদের ক জনের নাম না করলে এ যুগের বিবরণ অসম্পূর্ণ রে।

উইলিয়ম্ কেরির কথা আগেই বলেছি; এঁর পরি- য় ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির প্রথম দল মপুরে আসেন; দ্বিতীয় দলে যাঁরা এলেন মার্শম্যান্ র মধ্যে একজন। বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তনির যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ম্যার্শম্যান্ তাঁদের অন্যতম।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েষ্ট বেব্রিলেতে মার্শম্যানের জন্ম হয়। এঁর বাবার নাম জন্ মার্শম্যান্। ছেলেবেলা থেকেই জোশুয়ার লেখাপড়ায় বেশ আগ্রহ ছিল। তাই ছেলে-বেলাতেই তিনি লণ্ডনে একটি পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানে পিওনের কাজ নেন। কিন্তু তাতে দেখা গেল পড়ার চেয়ে খাটুনিটাই বেশী। তাই তিনি সে কাজে ইস্তফা দিয়ে পৈতৃক ব্যবসা তাঁতের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। তার কিছুদিন পরে তিনি ব্রিষ্টলে কোন একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ নেন। এইখানেই তিনি গ্রীক্, লাতিন, প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা শিখবার সুযোগ পান। তারই কিছুদিন পরে তিনি মিশনরী দলভুক্ত হ'য়ে ভারতের দিকে যাত্রা করেন।

মার্শম্যানের রচিত বিশেষ কোন বাংলা মৌলিক গ্রন্থ আছে বলে আমাদের জানা নেই; তিনি ছিলেন কেরির একজন প্রধান সহযোগী; শিক্ষাবিভাগের

তত্ত্বাবধানই ছিল তাঁর প্রধান কাজ, তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :

(ক) চীনাভাষায় বাইবেল অনুবাদ

(খ) চীনাভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা

এ ছাড়া তিনি "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক একখানি পত্রিকার একজন সম্পাদক দিছেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জোশুয়ার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড্

ইনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শিখে ইনি কিছুদিন ছাপাখানার কাজ শেখেন, "ডার্বি মার্কারি" আর "হাল্ এড্ভার্টাইজার" নামে দু' খানি কাগজেরও সম্পাদনা করেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড্ ব্যাপটিস্ট মিশনে যোগদান করেন এবং কিছুদিন ডক্টর ফসেটের অধীনেও শিক্ষালাভ করেন। তার পর ১৭৯৯ সালে ভারতে আসেন্। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীরামপুরের প্রেসের জন্যে আমরা এঁর কাছে ঋণী। এঁর রচনার মধ্যে 'য়্যাকাউণ্ট্স্ অব্ রাইটিংস্', 'রিলিজিয়ন্ য়্যাণ্ড্ ম্যানার্স্ অব্ দি হিন্দুজ্' ইনক্লুডিং ট্রানস্লেশন্ ফ্রম্ দেয়ার প্রিন্সিপাল্ ওয়ার্কস্' (চার খণ্ড—শ্রীরামপুর ১৮১১)—এইগুলিই প্রধান। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রচার পুস্তিকাও ইনি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় অবশ্য এঁর জ্ঞান বিশেষ ছিল না; এমন কি বাংলা ভাষায় ভাল করে কথাও নাকি বলতে পারতেন না। তবু বাংলা ভাষায় রচিত এঁর নামে একখানি বই পাওয়া যায়—তার নাম হচ্ছে "পীতাম্বর সিংহের চরিত্র।" পীতাম্বর ছিলেন একজন দেশীয় খ্রীষ্টান; ভাষা বা আলোচ্য বিষয়ের দিক্ দিয়ে বইটি মোটেই উন্নত ধরণের নয়।

ক্লার্ক মার্শম্যান

এর পর যাঁর নাম করবো তিনি হচ্ছেন জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র—ক্লার্ক। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এঁর জন্ম হয়। অনুসন্ধিৎসা, পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মকুশলতার দিক্ থেকে ক্লার্ক একজন সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন বলে আমাদের ধারণা।

১৮ বছর বয়স থেকেই ধর্ম্ম প্রচার কাজে পিতাকে সকল উপায়ে সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা তখনকার দিনে ক্লার্ককে বাংলা ভাষায় একজন বলা হ'ত। তিনি সরকারের অধীনে বাংলা অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভক্লিফ তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্লার্ক মার্শম্যানের নামে অনেকগুলি বই দেখা তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কো বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইস্ হেস্টিংসের শাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়েরদের তাবদ্বিবরণ। ২ বালম। শ্রীরামপুর ১৮৩১।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস (সিরাজ-উদ্-দৌলা-উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক) ১৮৪৮

(৩) পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। অর্থাৎ প সৃষ্টি অবধি খৃষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্য্যন্ত। শ্রী ১৮৩৩।

(৪) দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ। অর্থাৎ যে আইন ও আইনের অর্থ সর্কুলার অর্ডার প্রভৃতি ই ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৩৪ সাল হইয়াছে তাহা। শ্রীযু মার্শমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুর ১৮৩৪

(৫) দারোগার কর্ম্ম প্রদর্শক গ্রন্থ।

(৬) সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। সকল লো হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা করা গেল। একদিগে ইঙ্গরাজী একদিগে বাঙ্গালা। শ্রীরা ১৮২৯।

(৭) ক্ষেত্রবাগান বিবরণ অর্থাৎ আগ্রিকালচরাল হটিকালচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্য্যের বিবরণ ১৮৩২ ৩৬

(৮) য়্যাব্রিজ্মেণ্ট অব্ কেরি'জ ডিক্শনারী।

কারও কারও মতে জ্যোতিষের ওপর একখানি নাকি ক্লার্ক মার্শম্যান্ সাহেব লিখেছেন। শিরোনামা হচ্ছে : জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়।

উপরি উক্ত বইগুলির নাম পড়লেই "বোঝা যায় ওদের কোনটিই সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না; সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে ওরা পড়ুক আর নাই

ক্লার্কের কদর কমে না; কারণ এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করতে বা ভাষার বিস্তার করতে হ'লে কেবল গল্প হ'লেই চলবে না, নানা বিষয়ের ওপর সেই ভাষায় বই চাই। তা না হ'লে কোন ভাষাকেই বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে বুঝি যে ক্লার্কের দান যৎসামান্য নয়। নীচে "দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ" থেকে খানিকটা অংশ তুলে দেওয়া হ'ল; ক্লার্কের ভাষা কেমন ছিল তা এথেকেই বেশ বোঝা যাবে :

"জমিদার ও তালুকদার ও ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার প্রভৃতির সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহারু মালগুজারীর বাকী দাওয়া কোন মফঃস্বল তালুকদার রাইয়ত প্রভৃতির উপর থাকিলে যদি সেই বাকী টাকা মাল ক্রোক করণের দ্বারা আদায় করিতে না পারেন তবে সেই বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনের স্থানে সেই বাকী তলব করিতে অথবা সেই বাকীদার মালজামিন পলাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে তলব না করিয়া ঐ পলায়নমুখ বাকীদার কি মালজামিনকে নীচের লিখিত মতে কয়েদ করিতে পারেন....."

বাড়ীওয়ালার সেই ব্যাপারটা

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

আমার বাড়ীওয়ালার ব্যাপারটা নিয়ে এই ক'দিন কাণ্ডটাই না হ'ল! চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে যে আমি নাকি তাকে মেরে ফেলেছি। আমার বাড়ীওয়ালাও অবশ্য আর সব বাড়ীওয়ালার মতই একজন খারাপ লোক। তবে কিনা একটু অন্য ধরণের খারাপ। একবারে মেরে ফেলবার মত ঠিক অতটা খারাপও নয়। হয়ত আপনারা শুনেছেন যে আমি তাকে মেরেই ফেলেছি। কিন্তু সকলে যা ভাবছে আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ঘটনাটা পুরোপুরি জানে না কেউই, তবু ঘটনাটা খুলে বলতে গেলে সকলেই বলে যে তার কোনও দরকার নেই।

এদিকে আমার অবস্থা দিন দিনই গুরুতর হয়ে উঠছে। গত চার পাঁচ দিনের মধ্যেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি অনেক অপরিচিত ভদ্রলোকও একজোট হয়ে আমাকে জব্দ করে তুলেছেন। সকলেরই মুখে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এমন সৎসাহস নাকি আর দেখা যায় না। কেউ কেউ লিখেছেন, 'দুনিয়ার উৎপীড়িত সর্ব্বহারা ভাড়াটেদের ম্লানমুক্ত মুখে আপনি আশার আলো ফুটিয়ে তুলেছেন,—অনাগত দিনের বাড়ীওয়ালাহীন জীবনের হে অগ্রদূত, আপনি আমার নম্র নতি গ্রহণ করুন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' কম-বেশী এই ধরণের চিঠি পেয়েছি এই পাঁচ দিনে মোট তিরাশীখানা। বেশীর ভাগেরই হাতের লেখা পড়তে কষ্ট হয়। তার মধ্যে আবার অনেকেই আমার ফটো অথবা তাদের ক্লাবের সরস্বতী পূজোর চাঁদা চেয়েছেন। সবই খরচার ধাক্কা। এ ছাড়া রোজ পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধবের উৎসাহপূর্ণ পিঠ থাবড়া খেতে হয় অগুণতি, আর বাড়ীতে অভ্যাগত চেনা-অচেনা লোকের জন্য প্রতিদিন দেড়টিন দু'টিন সিগারেট আর কাপ পঞ্চাশ-ষাট চা যোগাতে হচ্ছে। বুঝুন একবার ব্যাপারখানা!

এখানেই শেষ নয়। এই তো কালই ছ' টাকা সাত আনা দিয়ে একটা ভি-পি রাখতে হ'ল। খুলে দেখি সেটা মফঃস্বলের একখানা পাক্ষিক পত্রিকা। তা'তে খবরটা ছেপেছে এই রকম—

বাড়ীওয়ালার উচিত শিক্ষা

বাঙালীর কাপুরুষতাপবাদ ঘুচিল

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে সহর কলিকাতা মোকাম পাগলাডাঙ্গা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাড়ীওয়ালা হলধর মিত্র মহাশয় সম্প্রতি ৺লাভ করিয়াছেন। প্রকাশ যে উক্ত মিত্রজার ভাড়াটিয়া শ্রীযুত হৃদয়বল্লভ মুস্তাফী, মহাশয় কর্ত্তৃক মস্তকে লগুড়াঘাতই মিত্রজার কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে

যে বাড়ী ভাড়া সম্পর্কিত বিতণ্ডার ফলেই হৃদয় বাবু উক্ত-রূপে বীরত্ব প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে বাড়ীওয়ালাগণের বর্ব্বরতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হৃদয় বাবুর এই সৎসাহস সর্ব্বথা সময়োপযোগী ও সুধী-সমাজের সমর্থনযোগ্য। এক্ষণে আশা করা যায় যে বাড়ীওয়ালাগণ অতঃপর সাবধান হইবেন। শুনা যায় যে ইতিপূর্ব্বে শ্যামদেশে একবার এবং শেওড়াফুলিতে একবার এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, নচেৎ হৃদয় বাবুর এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে পৃথিবীর প্রথমতম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারিত।"

তারপর আবার আজই খেলা দেখতে যাবার আগে এক চিঠিতে জানলাম যে নিখিল-পাকুড়তলা-ভাড়াটীয়া-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ আস্‌ছে বেস্পতি বার বিকেলে একটী মহতী জনসভা করে আমাকে একখানা মানপত্র দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করতে চান। এই আর এক ফ্যাসাদ জুটল দেখছি! এরাও চাঁদা টাঁদা চাইবে না তো? দেখছি আসল কথাটা আর চেপে রাখা ঠিক হবে না। এর পর আর কি হবে কে জানে! কিন্তু বলি কা'কে?

ভেবে ভেবে শেষটায় খেলা দেখে ফেরবার পথে থানায় গিয়ে হাজির হলাম। দারোগা বাবু আমাকে চিনতেন কিনা, খুবই খাতির করলেন, কিন্তু বসতে বলতে পারলেন না। কেননা বসবার জন্য যে একটা টুল ছিল তার ওপর দারোগা বাবুর কুকুরটা ঘুমিয়ে ছিল। একটা সত্যি কথা বলতে এসেছি শুনেই দারোগা বাবু বললেন যে সেটা দস্তুর নয়। লোকটী ভদ্রও বেশ, আমাকে কি যেন একটা তেল মাথায় মাখতে উপদেশ দিলেন। আমি অবশ্য কবিরাজ মশায়ের কথায় মাথায় আজকাল মাখন দি, তাঁকেই না হয় তেলটার কথা জিজ্ঞাসা করব বলে ভাবলাম।

দারোগা বাবু এ কথাও বললেন যে আমি যেন এ বিষয় নিয়ে আর তাঁর বা আমার মাথা না ঘামাই। তাঁর আর কি, বলেই খালাস। এদিকে চিঠি পড়তে পড়তে রোজ আমার সময় মত কাজে যাওয়া হয়ে ওঠে না, খাবড়া আর ঝাঁকুনী খেয়ে খেয়ে সমস্ত শরীর টাটিয়ে উঠেছে। পাড়ার ভদ্রলোকেরা কেউই আর বাড়ীতে চা খান না, তাঁদের জন্য দু'বেলা চা করতে করতে হায়রাণ হয়ে

গিন্নী বাপের বাড়ী চলে গিয়েছেন। পথে
কারু না কারু থপ্পরে পড়ে যাই, অথচ ঘাপটী মেরে
বাড়ীতে বসে থাকব তারও যোটি নেই, দণ্ডে দণ্ডে রা
থেকে হাঁক উঠবে, 'এই যে হৃদয় বাবু! বাড়ী আ
দেখছি! আরে মশাই, সাড়া দিচ্ছেন না যে? আ
ভদ্দরলোক তো!' বাড়ীতে থাকলেই রাস্তা থেকে
যায় কিনা! উনিশ টাকা ভাড়ার বাড়ীতে তো থাক
ঘর আর লুকোবার ঘর আলাদা নেই, ওই রাস্তার ধা
যা একখানা ঘর। রান্নাঘরে লুকোলে হয়, কিন্তু সে
বড্ড আরসোলা।' আর একটা জায়গা আছে বটে,
আড়ালে, কিন্তু দিন কতক মেথর না আসায় সেখানে
শক্ত। কোন রকমেই বাঁচোয়া নেই। এক রক্ষা
যেতে পারে সত্যি কথাটা প্রকাশ করলে।

তাই গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আসল কথাটা বলতে আ
করলুম দারোগা বাবুকে। আমাকে নাছোড়বান্দা
শেষটায় তিনি বললেন, 'বেশ, তা হলে আপনার
আপনি এই ফরমে লিখে দিন।' বলে ছাপানো এক
কাগজ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বেড়াল?
না কাবলী?' সে কি রে বাবা! বেড়াল আবার
বললাম? লোকটা কিছু শোনে নি দেখছি। তাড়া
বললাম, 'আজ্ঞে, বেড়াল নয়, বাড়ীওয়ালা।' দা
বাবু বললেন, 'ওঃ! তার ফরম আলাদা, এই নিন।'
হাতের কাগজখানা রেখে অন্য একখানা কাগজ দি
আমাকে। আর বাড়ী থেকে কাগজখানা লিখে
আসতে বললেন, সেখানে বসে লেখবার সুবিধে হবে
বলে দুঃখ করলেন।

ফরমখানা হাতে নিয়ে দেখি তা'তে সব ঘর
রয়েছে,—মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, বর্ণনা (বাঙালী
বাঙাল তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন), খুনীর হাতের
আর পায়ের মাপ, ইত্যাদি সাত-সতেরো রকম
কথা। শেষের দিকে একটা ঘরে দেখলাম লেখা
'খুনের কারণ (প্রত্যক্ষ অথবা আনুমানিক)'। এ
বড় মুস্কিলের কথা হ'ল! দারোগা বাবুকে জিজ্ঞেস
তিনি বললেন, 'সাধারণতঃ ওখানে ঢেরা দিতে হয়,
কারণ কিছু নেই। আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে লি
পারেন 'নূতন কিছু নয়', অথবা সংক্ষেপে কেবলমাত্র

ছেড়ে দিতে পারেন।—আচ্ছা, আসুন তবে,
র।'
কি আর করি, বেরিয়ে এলাম। দারোগা বাবু যেন
টার গুরুত্ব বুঝলেন না। কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝবেন।
না যে রকম দেখতে পাচ্ছি এ ধরণের ঘটনা খুবই বেশী
থাকবে এখন থেকে। বাড়ীওয়ালাকে ঠ্যাঙাবার
অনেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মনে হচ্ছে। অবশ্য
র ব্যাপার হ'ল আলাদা। সাধারণতঃ বাড়ীওয়ালাকে
বার দরকার হয় ভাড়া বাড়ানো কিংবা বাড়ী
মতের কথায়। ধরুন, তিনি এসে বললেন, 'মশায়,
মাস থেকে আপনার ভাড়া চোদ্দ সিকে বেড়ে গেছে।'
নি তক্ষুনি বললেন, 'খুব ভাল কথা। আমিও দেখব
নি কেমন করে ভাড়া আদায় করেন। বাড়াবাড়ি
ন তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব আপনার।' ব্যস্‌,
মুখেই নগদ শোধ। কথাটা মনে থাকলে পরে ঠ্যাং
তে পারেন কিংবা তার সুবিধে না হ'লে মাথাও
তে পারেন। কথা একই।
আমার ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়, বরং একটু
টা। মাস আষ্টেক আগে যখন এই বাড়ীটা ভাড়া
আসি তখন বাড়ীওয়ালা নিজেই বাড়ীটা দেখিয়ে
ন আমাদের। সেদিনই তাঁর একটা কথা একটু যেন
ন কেমন বলে মনে হয়েছিল। তিনি বললেন,
ঘরটায় তাক নেই, সেটা তিনি শীগ্‌গিরই করিয়ে
ন। আমার অমনিই একটু সন্দেহ হ'ল, কি জানি
টার কি মতলব! বললাম, 'না না, সে সব কিছু
র নেই। দিব্যি রান্নাঘরটী, পাইখানার একেবারে
য়া, খুব সুবিধে। লম্বায় চওড়ায়ও বেশ, আড়াই
বে কম তো হবেই না, কি বলেন?' ব্যস্‌, ঐ এক
তেই বাড়ীওয়ালা একদম চুপ।
কিন্তু তাঁর পেটে পেটে এত ছিল তা কি তখন
তাম? দিন পনেরো হয় এ বাড়ীতে উঠে এসেছি, এর
ই বাড়ীওয়ালা একদিন এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার?
াকটা এবার করিয়ে দিতে চান। গরজ দেখে ভাল
হ'ল না, নিশ্চয় কোনও কুমতলব আছে। এবার বেশ
করেই বলে দিলাম যে তাক আমার চাই না।
ওয়ালা চলে গেলে বেশ খুশী হয়েই ভাবলাম, হুঁহুঁ,

আমার সঙ্গে চালাকী চলবে না। তখন কি জানি যে লোকটা তক্কে তক্কে রইল। দিন কয়েক বাদে একদিন আপিসে যাব বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখি একটু দূরে বাড়ী-ওয়ালা কয়েকজন লোক নিয়ে ঘুর ঘুর করছে,—আমাকে দেখেই গা-ঢাকা দিলে। আমি তখন কিছু খেয়াল করলাম না। তারপর সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে এসে দেখি যে চাকরটা রান্নাঘরের বারান্দা ধুচ্ছে। হ'ল কি? না, শুনলাম যে দুপুরবেলা বাড়ীওয়ালা মিস্ত্রী-মজুর নিয়ে এসে তাক বানিয়ে দিয়ে গেছে। কাজ এই খানিকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে, তাই সব ধোয়ামোছা হচ্ছে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি চারদিক্ ঘুরিয়ে তাক তৈরী হয়ে গিয়েছে, একেবারে তাকে তাকাকার।

কি সর্ব্বনাশ! তক্ষুনি ছুটলাম বাড়ীওয়ালার বাড়ী। যেতেই তিনি বললেন, 'এই যে, আসুন! দেখেছেন তো? তাকটা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। বলতে পাররেন না যে হলধর মিত্তিরের কথার নড়চড় হয়। কে আছিস্, হৃদয় বাবুকে এক পেয়ালা চা দিয়ে যা তো!'

চায়ে ভিজে মনটা একটু নরম হ'ল। ভাবলাম যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই, এখন আমিও একটা উলটো চাল চেলে যাই। বললাম, 'সে যাই হোক্, ভাড়াটা আপনার কিছু বাড়িয়ে নিতে হবে। তাকের জন্য তো আপনার কতগুলো টাকা খরচ হ'ল।' আমাকে বাধা দিয়ে বাড়ীওয়ালা বললেন, 'আহা, সে আর ক'টা টাকা! 'এই তো ধরুন মাল-মশলার দরুণ লেগেছে ছাব্বিশ টাকা সাড়ে চার আনা, মিস্ত্রী-মজুরদের দিয়েছি পৌনে সতেরো টাকা, আর কতগুলো খুচরো খরচ। সবশুদ্ধ আটাত্তর টাকাও নয়। এর জন্যে আবার ভাড়া বাড়াব কি?'

বলব আর কি? উঠে পড়লাম। একটু ধোঁকা লেগে গেল, লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি? নইলে ভাড়া বাড়াতে চায় না কেন? আটাত্তর টাকার সুদও তো মাসে কোন্ না আটটা টাকা হবে, সুদের হার যদি কম করেও শত করা বার্ষিক দশ টাকা হিসেবে ধরি। আমি আবার য়্যাল্‌জেব্রায় একটু কাঁচা, হিসেবটা তক্ষুনি মনে মনে ঠিক করে কষতে পারলাম না, নইলে ওকে এই বলেই চেপে ধরতে পারতাম। কিন্তু আট টাকাই হোক

আর আঠারো টাকাই হোক, বাড়ীওয়ালা লোকসানটা দিচ্ছে কেন? কোনও খারাপ ফন্দি এঁটেছে নিশ্চয়। আচ্ছা, দেখাই যাক্ না। আমি শর্ম্মারামও সোজা লোক নই, বাড়ীওয়ালাকে সোজা রাখতে হয় কেমন করে তা বেশ জানি।

তার পর অনেক দিন আর কিছু হ'ল না। বেশ ছিলাম। সেই প্রথম মাসেই যা উনিশ টাকা ভাড়া দি, তার পর কয়েক মাস আর কিছু দিতে হয় নি। হঠাৎ একদিন বাড়ীওয়ালা এসে বললেন, 'আমি বলি কি, হৃদয় বাবু, বাড়ীটা এবার রং করিয়ে ফেলি?' চমকে উঠলাম। বলে কি? তেরো বচ্ছরও হয় নি এ বাড়ীটা একবার আগা-পাশতলা রং করানো হয়েছিল ব'লে শুনেছি, এর মধ্যেই আবার রং করাতে চাওয়ার কারণটা কি? সোজাসুজি তো আর সে কথাটা জিজ্ঞেস করা যায় না, সেটা ভদ্রতা নয়। ঘুরিয়ে কথা বলাই হ'ল ভদ্রতা, এ কথা আমরা ছেলেবেলায়ই হারাণ মাষ্টার মশায়ের কাছে শিখেছিলাম। যেমন ধরুন, আপনি একটা আকাট মুখ্খু গোছের লোককে জিজ্ঞেস করতে চান যে, সে কত দূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে। তাকে কক্ষণো জিজ্ঞেস করবেন না, 'মশায় কি পাঠশালায় থাকতেই লেখাপড়ায় গাড্ডু মেরেছিলেন?' সেটা অভদ্রতা, লোকে তাতে চটে যায়। বলতে হয়, 'মহাশয় কোন্ বৎসর বি-এ পাশ করেন?' সেই কথা মনে করেই বাড়ীওয়ালাকে একটু ঘুরিয়ে বললাম, 'না, না, তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? রংএর দামটা একটু কমতে দিন না।' বাড়ীওয়ালা সে কথায় কানই দিলেন না, বললেন, 'সে হবে না, এখন রং করানই আমার সুবিধে।' তার পর তিন দিনের মধ্যে বাড়ী রং করানো হয়ে গেল।

ভাড়া তবুও বাড়ল না। তাতে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। চার-পাঁচ মাস কেটে গেল, এর মধ্যে একবারও ভাড়া বাড়াবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বাড়ীওয়ালা দেখছি ক্রমাগত টাকাই খরচ করে চলেছে। হ'ল কি!

ব্যাপারটা বুঝবার জন্য একদিন বাকী ভাড়ার টাকাটা নিয়ে বাড়ীওয়ালার কাছে গেলাম। এবার আর ভদ্রতা নয়, সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'মশায়ের মৎলবখানা কি, খুলে বলুন তো? ভাড়া বাড়াবার নামটাও যে করেন না!'

বাড়ীওয়ালা বললেন অবাক্ হয়ে, 'ভাড়া বাড়া... মশাই?'

'ভাল বিপদ্! সবাই বাড়ায়, আপনি বাড়া... কেন? জমি, বাড়ীর দাম কি রকম বেড়ে যাচ্ছে... খোঁজ রাখেন?'

'তা হোক। আমি তো আর নতুন বাড়ী কিনে... দিচ্ছি না। জানেন, আমার এ আজকের বাড়ী... আমার দাদুর ঠাকুর্দ্দা এই বাড়ীখানা তৈরী কর... বচ্ছর—'

'জানি, জানি, যে বচ্ছর ভগীরথ গঙ্গা আ... বাড়ী দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। তা হ'লেও, ... যে ভাড়া বাড়ান না এটা বড়ই অস্বাভাবিক। ... টাকার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আপনা... পুত্রের কথাটাও তো আপনার ভাবা উচিত।'

এই কথাটা আমি সেই দিনই শিখেছিলাম ... কাগজে লেখা একখানা চিঠি থেকে। একজন বাড়ী... লিখেছেন যে এতদিন স্ত্রী-পুত্রের কথা তিনি ভাবেন... কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে তা করলে আর চলে না। ... তিনি কেবল মাত্র তাদের মুখ চেয়েই আর কিছু... বাড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁর ভাড়াটে তাতে... হচ্ছে না। এখন তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কি হবে, দেশবাসী... একটা বিহিত করুন। কর্পোরেশনের কি এ বিষয়ে ... দায়িত্ব নেই? মাননীয় মন্ত্রিমণ্ডলী ও সদাশয় ... বাহাদুরের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছে। ... চিঠি! সেই চিঠি থেকেই এই যুক্তিটা ছাড়লাম।

কিন্তু আমার বাড়ীওয়ালা শুনবে কেন? ... অতি ধূর্ত্ত। বললে কিনা, 'এই বারেই হাসালেন ... আমি তো বিয়েই করি নি। স্ত্রী-পুত্তুরের কথা ... ভাবতে যাব কেন?'

শুনে তো আমি হাঁ হয়ে গেলাম। য়্যাঁ! বিয়েই ... নি! তবে হয় এ লোকটা সাংঘাতিক বদ্‌লোক, ... এর মাথার ঘিলুতে শেওলা পড়ে সেটা নষ্ট হয়ে ... ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম, কিন্তু এই কথাটা ... থেকে খালি মনে হ'তে লাগল।

এর মধ্যে যুদ্ধ গেল থেমে। আপনাদের মনে ... নিশ্চয় যে এই উপলক্ষ্যে বাড়ীওয়ালারা সবাই বাড়ী... ...কা প্রতি একেবারে ছ' আনা করে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের ...নন্দ প্রকাশ করল। তার কিছুদিন পরেই যখন ...মোদরের বন্যা হওয়াতে বহু লোক ঘর ছাড়া হয়ে এদিকে ...সে পড়ল তখন সব ভাড়া আরও কিছু বেড়ে গেল। ...ড়ীওয়ালাদের এই হ'ল শোকোচ্ছ্বাস। আমার বাড়ী-...য়ালা কিন্তু এ সবে যোগ দিলেন না। লোকটার ওপর ...মার ঘৃণা হ'ল, দেশের এই সুখ-দুঃখের দিনগুলিতে ... কিছুই করল না, লোকটা দেশদ্রোহী নয় তো?

... ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ভেবে ভেবে কাহিল ...য়ে পড়েছি, এমন সময় শেষ ধাক্কাটা এল। একদিন ...গজে দেখলাম যে চীনদেশে টাকার দাম খুব পড়ে ...ছে। সাধারণ লোকে এর তাৎপর্য্য বুঝবে না, কিন্তু আমি ...লাম। আমি কলেজে পড়বার সময় কয়েক বছর ... এ ক্লাসে থেকে বেশ ভাল করে ইকনমিকৃস্ শিখেছিলাম ...না, তাই চট্ করে বুঝে নিলাম যে এখনই সব বাড়ীর ...য় আর ভাড়া যদি না বাড়ানো হয় তা'হ'লেই সর্ব্বনাশ। ...নেরা তাদের সস্তা টাকার জোরে এ দেশের সব জমি, ...ড়ী কিনে নেবে, তার ফলে দেশটা চীনেদের চণ্ডুর ...য়ায় আর আরসোলার আড়তে ছেয়ে যাবে। ভাবলাম ...খি এতেও আমার বাড়ীওয়ালার টনক নড়ে কিনা।

তার পর তিন দিন কেটে গেল। বাড়ীওয়ালা এবারও ...। তখন আমার বড় রাগ হ'ল। লোকটা কি ...নেদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে চায় নাকি? চীনেরা ...নছি লোক ভাল নয়। পাঁচ সিকে দামের জুতোর ...সে দাম লিখে রাখে দশ টাকা, আর তা বেচে ছ' ...ায়। আমাকে অবশ্য ঠকাতে পারে না কখনও। ...বার তো দরাদরিতে হেরে গিয়ে বারো টাকা দামের ... যোড়া জুতো আমাকে সাড়ে চার টাকাতেই দিয়ে-...। দোকানের দালালটা আমাকে বলেছিল, 'মশায় ...হুঁসিয়ার লোক। সাড়ে চার টাকায় যে জিনিষ ...ন আর কেউ সেটা উনিশ সিকের এক পয়সা কমে ...তে পারত না।' আমাকে ঠকাতে পারে না বটে কিন্তু ...া বোকা মতন লোক পেলেই ঠকিয়ে নেয়। সেই ...নেদের সাহায্য করতে চায় বাড়ীওয়ালা!

...াগের চোটে হাতের কাছে একটা ছাতা পেয়ে তাই ...ই বেরিয়ে সটান গিয়ে উঠলাম বাড়ীওয়ালার বৈঠক-খানায়। আমাকে দেখেই হলধর বাবু একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। হাসি দেখে সর্ব্বাঙ্গ জলে গেল। দেশের সামনে এই দুর্দ্দিন, আর লোকটা কিনা হাসছে! তবু ধৈর্য্য ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনও যে ভাড়া বাড়ালেন না, ভেবেছেন কি বলুন তো?'

তিনি বললেন, 'কেন, এবার আবার কি হ'ল?'

'হ'ল এঁচোড়! কেন খবরের কাগজে দেখেন নি যে চীন দেশে টাকার দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁঃ! আপনিও যেমন। যত্তো সব বাজে পট্টি মারবে কাগজওয়ালারা, আর গাঁটের পয়সা খরচ করে তাই কিনে পড়ব আমি? কোথায় ধাপধাড়া চীনে মুল্লুকে কি হ'ল না হ'ল তা'তে আমার বয়ে গেল!' বলেই হলধর বাবু তাঁর নাকের সামনে উড়ন্ত একটা ভীমরুলকে তাড়াবার চেষ্টায় মন দিলেন।

উঃ, কি ভয়ানক লোক! ইকনমিক্‌স্ তো বোঝেই না, খবরের কাগজটা পর্য্যন্ত কেনে না, দেশের জন্য কোনও দরদ নেই, বিয়েটা পর্য্যন্ত করে নি,—আর ভাবতে পারলাম না। দিলাম ধাঁ ক'রে ছাতার এক ঘা ঝেড়ে। রাগের মাথায় একটু জোরেই হাঁকড়েছিলাম, যদিও একেবারে মেরে ফেলবার ইচ্ছে এবারকার মত ছিল না। কিন্তু বাড়ীওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মরেছি, মরেছি।' শুনতে যেন মনে হ'ল 'মরেছে, মরেছে', কিন্তু হয়তো আমারই শুনবার ভুল হ'য়ে থাকবে। যাক্ গে, আমি আর সে সব দেখবার জন্য দাঁড়ালাম না। লোকটা তো অক্কাই পেয়ে গেছে, তার আর দেখবার কি আছে? বরং ছাতাটাই দেখা দরকার। আঠারো আনার ছাতাটা নষ্ট হ'ল নাকি? একটু যেন মচমচ করছে।

ফেরবার পথে আমাদের পাড়ার গেজেট হরিশের সঙ্গে দেখা। ছাতার কথাটা বলতে গিয়ে তাকে বাড়ীওয়ালার কাণ্ডটাও বলতে হ'ল। শুনে সে বলল, 'বেশ করেছ ব্রাদার, এই তো চাই।' তার পর আরও কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলকেই বলতে হ'ল কথাটা। হরিশও যথাসাধ্য বলে বেড়িয়েছে নিশ্চয়। তাইতেই চারদিক্ থেকে ডাকে আর পিঠে অভিনন্দন বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। এক যা আমাদের আপিসের হীরেলাল শুনে বলেছিল, 'হ্যাঁঃ, ছাতার ঘায়ে আবার মানুষ মরে!'

হীরেলালটা ঐ এক রকম, কারু ভাল দেখতে পারে না, একটা ভাল কাজ করেছি তো হিংসেয়েই গেল।

এই তো হ'ল আমি যা করেছি। এই কথাগুলো গুছিয়ে দারোগা বাবুর ফরমে লিখতে হবে ভেবে থানা থেকে ফিরে এসেই দোয়াত কাগজ ঠিক করে রেখে কলমটা খুঁজছি, এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা গেল, 'হৃদয় বাবু নাকি? কি হচ্ছে কানে কলম গুঁজে?' চমকে চেয়ে দেখি আমার বাড়ীওয়ালা দিব্যি সুস্থ শরীরে আপিস ফেরতা বাজার করে ফিরছেন, বাঁ হাতে ধরা রেশনের থলের ভেতর থেকে তপসে মাছের দাড়ি আর হিঞ্চে শাকের ডগা বেরিয়ে রয়েছে। সে কি! এর দেখছি কিছুই হয় নি! ছাতাটা মিছিমিছিই নষ্ট হ'ল!

বেরিয়ে এলাম। হলধর বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি রকম হ'ল? আপনি দেখছি একটুও মরেন নি!' তিনি অবাক্ হ'য়ে বললেন, 'যাচ্চলে! আমি মরব কেন মশায়? মরেছে তো ভীমরুলটা। খুব বাঁচিয়ে দিচ্ছ সেদিন। নইলে নির্ঘাৎ কামড়াত। তা, আপনি ও রকম করে পালিয়ে এলেন কেন?' শুনে ভ্যাবা হ'য়ে থ মেরে গেলুম। এবারও তবে হার হ'ল আমার

কথাটা মনে হয়ে কোথায় দুঃখ হবে, তা না হ'য়ে যেন একটা আরাম হ'ল আমার বুকের মধ্যে। বাড়ীওয়ালা মরা দূরে থাকুক, খোঁড়াও হন নি। সকলে সে কথা জেনে যাবে তখন হয়তো নিখিল পা তলা ভাড়াটীয়া সঙ্ঘের দেওয়া মানপত্রটা আর পাব কিন্তু চা-সিগারেট খাওয়ান আর বন্ধুবান্ধবদের মারা প্রশংসার হাত থেকে তো বাঁচব। তাতে টাকাও কম না, চাই কি তার থেকে নিজের পছন্দ একটা মেডেল নিজের জন্য কিনে নিতেও পারব। ভাল।*

* লিককের গল্প থেকে

এটাওয়া ভ্রমণ

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

"মা-মণি"!

আজ তোমায় ছোট একটি কাহিনী বলি। কাহিনীটি আমার "এটাওয়া" ভ্রমণের। সংযুক্ত প্রদেশের সেই প্রাচীন সহর এটাওয়া;—কানপুর থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে পড়ে, দূরত্ব ৮৮ মাইল।

তোমরা যখন দিল্লীতে থাকতে, যাতায়াতের পথে কত বার এই ষ্টেশনটিকে ছুঁয়ে গেছ, মনে থাকতে পারে। কিন্তু ষ্টেশনটিতে নেমে সহরের মধ্যে যাও নি নিশ্চয়ই? আমিও এর আগে কত বার এই ষ্টেশনের ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছি, কিন্তু নামবার সুযোগও হয় নি, উপলক্ষ্যও ছিল না।

সেবার আমাদের মেসের এক পুরোনো বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এটাওয়ায় চলে গেলেন। এবং তার পরই ক্রমাগত অনুরোধ আসতে লাগল একবার ওখানে বেড়িয়ে যেতে। কিন্তু তা সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। গত'বার সরস্বতী পূজোর আগেই পড়ল রবিবার। উপরোউপরি দু'দিন ছুটি পাওয়া ভাগ্যে বড় জোটে না, কাজেই ছুটিটায়ই সদ্ব্যবহার করা স্থির করলুম আমরা পাঁচ বন্ধু – রমেশ বাবু, হীরেন বাবু, বিশ্বরঞ্জন বাবু, বাবু ও আমি।

* * *

২৬শে জানুয়ারী। ভোরে উঠে ঠিক পাঁচটার বেরুলুম আমরা পাঁচজনে (সময় ও সংখ্যায় সামঞ্জস্য যেন)।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন, এটাওয়া পৌঁছতে প্রায় সওয়া বা বাজিয়ে দিল। চৌধুরী মশাই ষ্টেশনে এসেছি তাঁর বাসা ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। জা নাম গাড়ীপুরা, এটাওয়া বাজার। পৌঁছতে বেলা পৌনে একটা। বাসায় থাকেন, চৌধুরী বৌদি ও তাঁদের দু'টি ছেলে। বৌদির সঙ্গে রমেশ ও আমার আগেই পরিচয় হয়ছিল লক্ষ্ণৌয়ে, কিন্তু যাঁরা আমাদের সঙ্গী ছিলেন বৌদির আদর-অ

মনেও হয় নি যে পরিচয় তাঁদের নূতন—যেন কত জানা-চেনা!

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা সবাই মিলে বেড়াতে লুম, চৌধুরী মশাইও আমাদের সঙ্গী হ'লেন। সহরের অংশে বেড়ালুম আমরা—সহর হিসাবে খুব পরিষ্কার মনে হ'ল না। চৌধুরী মশাই তাঁর অফিসেও নিয়ে ন আমাদের। সেইখানেই সরস্বতী পূজা হবে। নে বাঙালীরা সংখ্যায় খুবই পরিমিত, সারা সহরের ঐ একটিই পূজা বাঙালীদের। কাজেই, সকলের পরিশ্রম ও আন্তরিকতা একই কাজে নিবদ্ধ হওয়ায় অনুষ্ঠান ছোট হলেও বেশ সুন্দর ও সমারোহপূর্ণ হয়। রী মশাই এই অল্প সময়ের মধ্যে এখানকার বাঙালী জে বেশ সুন্দর ভাবে মিশে গেছেন।

সন্ধ্যার পর আমরা গেলুম যমুনার ঘাটে। পথটি বড় । রাস্তার আশে পাশে ছোট ছোট মাটির টিলা, াণিক যুগের সাক্ষী রূপেই বুঝি দাঁড়িয়ে আছে তারা। শে নক্ষত্রের সভায় তখন সবে দেখা দিয়েছে শুক্লা র ক্ষীণ চাঁদ, তারই ম্লান জ্যোৎস্নায় রহস্যময় হয়ে ছে টিলাগুলি। ঘাটে এসে বসলুম আমরা। নদীর ারের গাছগুলি ধীর, স্থির, বুঝি সন্ধ্যা-বন্দনায় রত। াস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন া ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিস-করা রূপোর আয়না।" , সমাহিত নদী চেয়ে আছে আকাশের পানে, কে ঘিরে সেখানে কত তারার মেলা! আকাশ ও র মাঝখানে বিরাট শূন্যতার ব্যবধান, সেখানে আলো- ারের মিলন। নদীর ওপারে ঘন বনানী আবছায়ায় । বনের আড়ালে আছে বুঝি কোন্ স্বপ্নলোকের , রূপকথার রাজকুমার আজও সেখানে পথ খুঁজে ।—"নির্জ্জন নদী তীরে"র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল আনন্দ র গানে, সাড়া জাগলো প্রতিধ্বনির অন্তরে।

রাত প্রায় ন'টার সময় ওখান থেকে ফিরে এলুম, মনে এক অনুভূতির আবেশ নিয়ে।

পরদিন ৺সরস্বতী পূজা। আমাদের অন্যতম সঙ্গী রঞ্জন বাবু ভোর রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটাওয়ার ঘি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে থাকবে তাঁর সঙ্গে। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলুম, বিশেষতঃ আজই বিকেলের গাড়ীতে কানপুরে ফিরে যেতে হবে।

সকালে চৌধুরী মশাই ডাক্তার নিয়ে এলেন। তাঁর চিকিৎসার গুণেই হোক বা আমাদের ভাগ্যের জোরেই হোক, কিছু পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'লেন বিশ্বরঞ্জন বাবু। বৌদির ওপর তাঁর দায়িত্ব দিয়ে আমরা চারজন বেলা দশটা নাগাদ বেরুলুম চৌধুরী মশাইএর সঙ্গে। তাঁদের বাসার সামনে একটি ঘিয়ের কারখানা, প্রথমেই সেখানে গেলুম আমরা। বিরাট লৌহ-পাত্রে জমা ঘি, রিফাইন করার পূর্ব্বাবস্থা। ডারউইনের মতে আমাদের যারা পূর্ব্ব-পুরুষ, তাদের দেখলে তোমরা যেমন চমকে ওঠ, বিশুদ্ধ ঘি যদি কখনও 'সচেতন' হ'য়ে ওঠে ত' সে তার পূর্ব্বাবস্থা দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠবে—আমাদের কথা ত' দূরের!

ওখান থেকে বেরিয়ে চৌধুরী মশাই চলে গেলেন পূজার আয়োজনে। আমরা ষ্টেশনে বেড়াতে গেলুম। চৌধুরী মশাইএর কাছে কাল শুনেছিলুম "চম্বল" নদীর কথা, আমরা ঠিক করলুম সেখানে যাব। ষ্টেশন থেকে চম্বল (প্রায় আট মাইল) যেতে টাঙ্গা অনেক বেশি চাইল। শেষে এক টাঙ্গাওয়ালার পরামর্শ মত আমরা গেলুম "পাক্কীসরাই"এর মোড়ে, এবং সেখান থেকে একটি টাঙ্গা ভাড়া করে চম্বল রওয়ানা হলুম।

সহরের সীমানা ছাড়িয়ে আবার সেই মাটির টিলার পর টিলা, কোথাও বা পথের পাশে, কোথাও বা দূরে মাঠের বুকে। কোথাও পথ চলেছে সোজা, কোথাও বা এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে। পথ বেশ সুন্দর ও উঁচু-নীচু। বিশেষতঃ ওঠা-নামার সময় দূর থেকে বড় চমৎকার দেখায় টিলাগুলিকে—কোন্ সুদূর কালের প্রহরী সব। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, কখনও বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সব মিলিয়ে বেশ লাগছিল। অজানার উদ্দেশে চলেছি, মনে বেশ এক স্বপ্নময় আবেশ নিয়ে।—খানিক দূরে যমুনার পুল। পোনটুন ব্রিজ এটি। যাতায়াতের জন্যে পয়সা নেয়। পুল পেরিয়ে চম্বলের পথে যতই অগ্রসর হই, পারিপার্শ্বিকতার সৌন্দর্য্যে আনন্দে ভ'রে ওঠে মন!

সাড়ে এগারোটার সময় আমরা পৌছুলুম চম্বল নদীর ধারে। সুন্দর নদীর দৃশ্য! টাঙ্গাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে ব'লে আমরা গেলুম নদীর খেয়া ঘাটে। খেয়া ঘাটের পাশেই ডাক-বাংলো। নদীর অপর পারে গোয়ালিয়র রাজ্যের সীমানা। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়া ও গরুকে নদী পার করানো হচ্ছে বড় বড় নৌকায়—মানুষের সঙ্গে একই নৌকায়, একই সাথে। কখনও বা জন্তুগুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ছেড়ে দেওয়া হয় ও দড়ি থাকে নৌকায় লোকেদের হাতে; বেশ কৌতূহল হয় দেখে।

সুন্দর, স্বচ্ছ, নীল জল, নদীর দুই পাশে বালুর চর। "মেঘ-ছেঁড়া সূর্য্যের" রশ্মি পৌছেছে গিয়ে নদীর অন্তস্তলে—বিরাট আকাশ যেখানে প্রতিফলিত হ'য়ে আছে নদীর স্বচ্ছ জলে। আবার মেঘে মেঘে ঘোড়া লাগে, সূর্য্যরশ্মি মুখ লুকায় মেঘের অন্তরালে, মাথার উপরে ধ্যান-গম্ভীর আকাশ মৌন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার প্রতিবিম্বের পানে। কখনও বা বাতাসের দোলা লেগে জলে লাগে কাঁপন, ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু আঘাতে তীরের বালু মিলিয়ে যায় জলের বুকে। গাছের শাখায় শাখায় সুরু হয় কানাকানি।

একটি ছোট দেখে নৌকায় উঠে বসলুম আমরা। বেশ স্পষ্ট দেখা যায় নদীর অপর পার, প্রস্থে খুবই ছোট নদীটি। নদীর ওপারে এক দিকে কিসের যেন চাষ, সবুজ রংএ ভরা ক্ষেতটি দূর থেকে দেখে মনে হয় একটি জাজিম বিছানো যেন—রূপ সেখানে মিশেছে রূপাতীতের বুকে। সে শোভা র'য়ে গেল আমার মনের অনুভূতিতে। সে অনুভূতির কাছে নতি স্বীকার করতে হয় আমার লেখনীকে।

তীরে পৌছে, চর পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলুম। বৃটিশ রাজত্ব পার হ'য়ে দেশীয় রাজ্যে (গোয়ালিয়রের মহারাজার) এসে পড়লাম। ঐ রাস্তাটি ধ'রে খানি গিয়ে রাস্তার উপর একটি সাঁকোয় কিছুক্ষণ আমরা। হীরেন বাবু সেখানে আমাদের নাম রাখলেন। সে লেখা হয়ত এত দিনে মলিন হ'য়ে কিন্তু সে দিনের সে আনন্দের স্মৃতি আজও অম্লান হ'য়ে।

ফিরে এসে টাঙ্গায় বসলুম। পথের সৌন্দর্য্য ও বাবুর মিষ্টি গানের সুর ফেরার পথটিকেও বেশ ক'রে তুলেছিল। আমরা বাসায় না ফিরে এ গেলুম চৌধুরী মশাইএর অফিসে। সেখানে ভোগ খাওয়া হ'ল। আনন্দও কম উপভোগ করি আমরা সেখানে সবাইকার অতিথি, ব্যক্তিবিশেষের সেখানকার বাঙালীরা অতি সহজেই আমাদের আপন নিয়েছিলেন।

বেলা তিনটের সময় বাসায় ফিরলুম। দেখলুম, বিশ্বরঞ্জন বাবু ভালই আছেন। বৌদিদের থেকে বিদায় নিয়ে চারটের সময় রওয়ানা হলুম সাড়ে চারটেয় গাড়ী।

* * *

তার পর অনেক দিন কেটে গেছে, কিন্তু এটা সেই দু'টি দিনের স্মৃতি আজও আছে আমার যুড়ে। প্রকৃতির রাজ্যে বাস নয়, ফিরে আসতে বাস্তবের মাঝে। কিন্তু বাস্তবের দাবী মিটিয়ে অবসরের মুহূর্ত্তগুলিতে আমার যাযাবরী মন ঘুরে যমুনার পারে, চম্বলের ধারে—চোখের সামনে ভেসে ম্লান জ্যোৎস্নায় যমুনার সেই শোভা। যমুনার পথে চাঁদের কিরণমাখা সেই মাটির টিলাগুলি, শোভা-সম্পদ, চম্বলের সেই ঢালু পথ, সেই সব ছোট মাটির পাহাড়—বাস্তবকে ভুলে গিয়ে সেই ক্ষণগুলি আমার মধুরতায় ভরে ওঠে।*

*কানপুর থেকে শ্রীঅর্চ্চনা দত্ত, বড়াকে লিখিত চিঠি।

চিত্রশালা

আফ্রিকার, জঙ্গলে

*

দুষ্প্রাপ্য জীব ওকাপি

গরিলার যুদ্ধহুঙ্কার

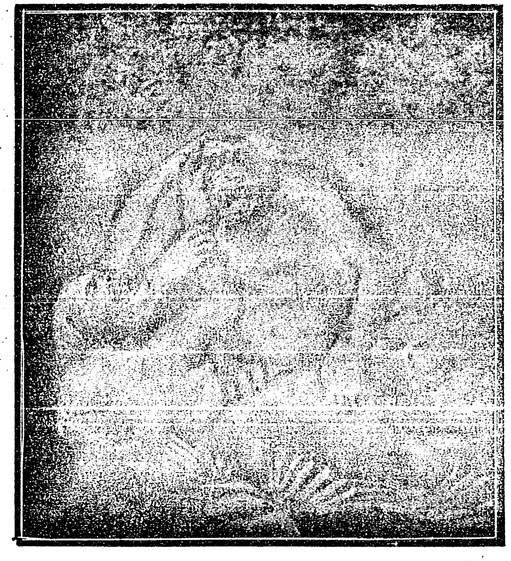

গরিলায় গরিলায়

মেঘের কথা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ‘মেঘ যত উঁচুতে থাকবে, আবহাওয়া হবে তত শান্ত।’ কথাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেশ খাটে। আকাশে এক টুকরোও মেঘ নেই, এ রকম অবস্থা তোমাদের চোখে নিশ্চয়ই কখনও পড়ে নি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে ... প্রধানতঃ দু’ভাগে ভাগ করা যায়। এক রকমের ... আকাশে উপর নীচে বিরাট বিরাট পাহাড়ের মত ... থাকে, আবার কোনটা থাকে পাশাপাশি—কখনো

তূলা-মেঘ

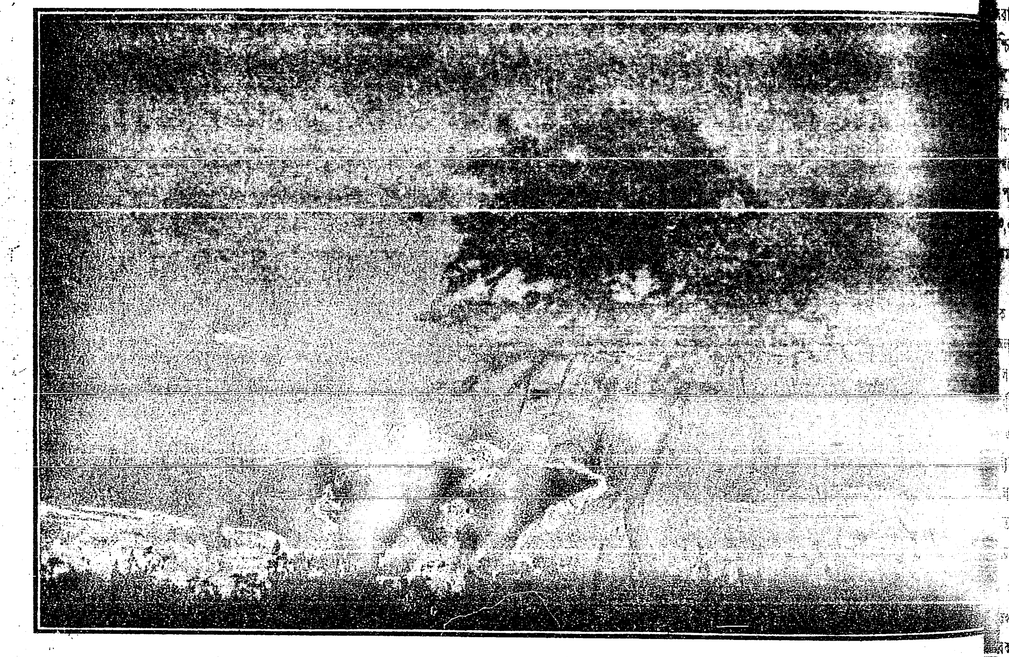

তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই মেঘ সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল নই। সীমাহীন বিরাট আকাশে বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন বর্ণের মেঘ যে অনবরত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় তা একদিকে যেমন আমাদের বিস্ময় যোগায় অন্য পক্ষে তেমনি ভবিষ্যৎ আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এদেরই কিছু গল্প আজ শোন।

খণ্ড হয়ে, কখনো বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে। অবশ্যি এ... বলে রাখা প্রয়োজন যে মেঘ হ’ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা... তুষার-কণা যা নাকি বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণাকে আশ্রয়... আকাশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকে।

পাশাপাশি মেঘের মধ্যে আকাশের সর্ব্বোচ্চ ... যে মেঘ দেখা যায় তাকে বলা হয় তূলা-মেঘ (সির...

...মেঘ থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠের ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ...টের মধ্যে। বিভিন্ন রকমের তূলা-মেঘ আছে, তবে ...ন্যান্য মেঘ থেকে এর প্রভেদটা খুব সহজে ধরা যায়। এ ...মেঘের রং হয় সাদা, কখনো বা রেশমী পালকের মত; মনে ...য় যেন পেঁজা তূলা দিয়ে তৈরী। হাওয়ায় যখন এগুলি ...লাফেরা করে তখন এদের দেখতে হয় অনেকটা লম্বা ...তোর মত। অবশ্য খুব শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেও ...রাস্-মেঘ দেখা যায়। হাওয়ার সঙ্গে এ মেঘ যদি ...শ্চিম দিকে বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে আসে তবে ...তে হবে যে শীঘ্রই খুব খারাপ আবহাওয়া আসছে। ...কাশ যুড়ে যদি এ মেঘ অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে তবে ...কে বলা হয় তূলা-স্তবক মেঘ (সিরো-স্ট্র্যাটাস)। এ মেঘ ...খতে হয় সাদা পর্দ্দার মত, তবে সূর্য্য বা জ্যোতিঃমণ্ডলই ...পর্দ্দার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। এ মেঘ থাকে পৃথিবীর ...,০০০ থেকে ৩৩,০০০ ফুটের মধ্যে। উপরোক্ত দু’ ...ম মেঘই ক্ষুদ্র তুষার-কণা দিয়ে গঠিত।

...দশ হাজার থেকে কুড়ি হাজার ফুটের মধ্যে আর ...ক রকমের মেঘ আছে যাকে বলা হয় উচ্চ-স্তবক মেঘ ...ল্টো-স্ট্র্যাটাস্)। এ মেঘের রং হয় ধূসর বা ফিকে ...। স্তর-স্তবক মেঘ ও উচ্চ-স্তবক মেঘের ভিতর ...ক্যটা ধরা একটুখানি শক্ত। তবে উচ্চ-স্তবক মেঘ ...একটু কালচে ও ঘন। এ মেঘের ভিতর দিয়ে যখন ...কিরণ আসে তখন তা দেখতে হয় অবিকল যেন ...র ভিতর দিয়ে আলো দেখা হচ্ছে বা ঈষৎ স্বচ্ছ কাচের ...র দিয়ে আলো আসছে; কারণ এ মেঘ বারি-বিন্দু ...ই তৈরী।

...র্ষাকালের আকাশে কেমন করে পশ্চিম দিক্ থেকে ...সানা বিরাট মেঘ,—যার সামনের অংশটা হ’ল তূলা-...ক এবং পিছনের ভাগটা উচ্চ-স্তবক, এসে ক্রমে ক্রমে ...ভূত হয় এবং কি ক’রেই বা তা স্থায়ী-বর্ষণ মেঘে ...ম্বাস্) পরিণত হয়ে সমস্ত আকাশ কালো ক’রে দিনের ... দিন বৃষ্টি ঝরায় তা একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা ...া বুঝতে পারবে। স্থায়ী বর্ষণ-মেঘ খুব নীচেই অবস্থান ...র, উচ্চতা মাত্র ৬০০ থেকে ১০,০০০ ফুট। এ মেঘ হয় ...লো এবং কোন আকৃতিশূন্য। এ মেঘের সাথে আশা ...র তোমরা খুব ভাল ভাবেই পরিচিত।

তূলা-স্তবক মেঘের ঠিক নীচেই হ’ল তূলা-স্তূপ মেঘ (সিরো কিউমিউলাস্) এবং উচ্চ-স্তূপ মেঘ (অল্টো-কিউ-মিউলাস্)। এই দু’ রকম মেঘই হ’ল আকাশের সব চাইতে সুন্দর মেঘ—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এরাই। বড় ও ছোট তরঙ্গাকারে এ মেঘ থাকে থরে থরে সাজান, দেখতে ভেড়ার লোমের মত কুঞ্চিত। এই দু’ রকম মেঘের প্রভেদ ধরাও একটু অসুবিধাজনক। তবে তূলা-স্তূপ মেঘের তরঙ্গের মধ্যে

স্থায়ী-বর্ষণ

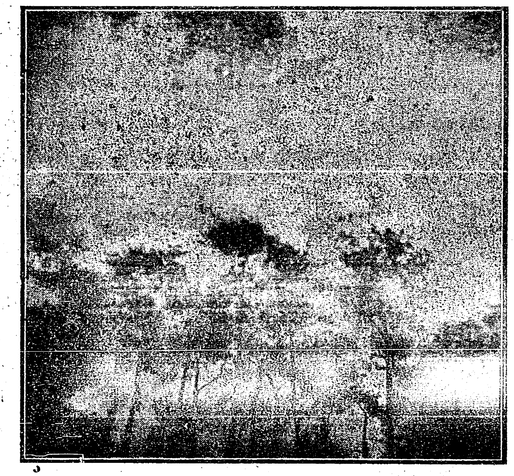

তূলা-মেঘের ছোট ছোট খণ্ড দেখা যায় এবং এ মেঘের রং থাকে মুক্তোর মত সাদা; আর উচ্চ-স্তূপ মেঘের মধ্যে কোন তূলা-মেঘ থাকে না বটে, কিন্তু এ মেঘের মধ্যে থাকে কালো কালো ছায়া। অনেক সময় এ মেঘ দেখতে হয় লম্বা লম্বা ফিতের মত। তূলা-স্তূপের উচ্চতা হ’ল ২৩,০০০ থেকে ৩৩,০০০ ফুটের মধ্যে এবং উচ্চ-স্তূপ মেঘ থাকে ১৩,০০০ থেকে ২০,০০০ ফুটের মধ্যে।

আরও নীচে আমরা যে মেঘ দেখতে পাই তাকে বলা হয় স্তবক-স্তূপ মেঘ (স্ট্র্যাটো-কিউমিউলাস্)। এ মেঘের রং হয় ধূসর, মধ্যে মধ্যে কালো ছায়া থাকে। এরা নীলাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। শরৎ বা

শীতকালের শান্ত দিনে কখনও কখনও এরা অবিচ্ছিন্ন মেঘ-খণ্ডে পরিণত হয়, আবার গ্রীষ্মের দিনে এরাই স্তূপ মেঘে রূপান্তরিত হয়। এ মেঘ থাকে ৩,০০০ থেকে ১৩,০০০ ফুটের মধ্যে।

পাশাপাশি মেঘের মধ্যে স্তূপ-মেঘই (কিউমিউলাস্) প্রধান। এ মেঘের নিম্নাংশ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ থেকে ১০,০০০ ফুটের মধ্যে থাকে। এর রংও সাদা। আমাদের দেশে খুব সুন্দর ভোরের পর পাহাড়ের মত যে এক ধরণের মেঘ দেখা যায়,—যার নীচের দিক্‌টা থাকে বিস্তৃত ও উপরের দিকটা থাকে গোলাকৃতি, তাই হ'ল স্তূপ-মেঘ। গ্রীষ্মের অতি শান্ত দিনে এ মেঘ প্রথমে খণ্ডাকারে হ'য়ে অপরাহ্নের দিকে আয়তনে বেশ বেড়ে যায়। আবার সন্ধ্যার দিকে একেবারে মিলিয়ে যায়। উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে এ মেঘের ঊর্দ্ধাংশ গুম্বজাকৃতি পেয়ে থাকে। যেদিন খুব বেশী পরিমাণে স্তূপ-মেঘ জমা হ'চ্ছে সেদিন যদি ভাল ভাবে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে যে এ মেঘের চূড়ার দিক্‌টা আস্তে আস্তে পেঁজা তুলার মত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তখন এ মেঘের উপর দিক্‌টা তুলা-মেঘে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় এ মেঘকে বলা হয় বর্ষণ-মেঘ (কিউমিউলো-নিম্‌বাস্)। এ মেঘে বেজায় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত হয়। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে যখন কাল বৈশাখীর সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করে তখন বর্ষণ-মেঘ চারিদিকে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। কালের প্রথম দিকে আকাশে যে বর্ষণ-মেঘ জমে সামান্য বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত ক'রে রাতের বেলায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। কিন্তু শেষের দিকে রাতের এ মেঘ সৃষ্টি হ'য়ে প্রচুর বারিপাত করে।

উপরে যে সমস্ত মেঘ সম্বন্ধে বলা হ'ল তা ছা কয়েক রকমের মেঘ হ'তে পারে। যেমন ধর, স্তবক (স্ট্র্যাটাস্),—এ দেখতে অনেকটা কুয়াসার মত। এ সাধারণতঃ বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের পাশে থাকে। অনেক অতি দূরে একখানা সাদা মেঘের সামনে কালচে ছি মত একে দেখা যায়। ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ জা আকাশে স্তবক-মেঘ বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশে (বিশেষ ভাবে বাংলার দক্ষিণা শীতের দিনে সূর্য্যাস্তের পর এ মেঘ দেখতে পাওয়া মাটী থেকে ২,৫০০ ফুটের মধ্যে।

আর এক রকম মেঘের ইংরেজী নাম লেনটি মেঘ। এ মেঘ দেখতে ঠিক কাচের লেন্সের মত, খুব সরু, মাঝখানটা মোটা; থাকে ১৫,০০০ থেকে ফুটের মধ্যে। আর এক রকম মেঘ হ'ল স্তূপ (টারেট)। এ মেঘ দেখতে কিছুটা ছোট আ তুলা-মেঘের মত। গ্রীষ্মের দিনে এ মেঘ দেখলে শীঘ্রই বিদ্যুৎপাত হবে।

ছড়া

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

মা আমাকে দুষ্টু বলে,
বাবা বলে দস্যি,
দাদু বলে 'নক্ষী মেয়ে'—
নাকে দিয়ে নস্যি।

ঠাম্‌মা বলে পোড়ারমুখী,
বড়দা' বলে মুখ্যু,
ছোড়দি খালি পেত্নী বলে—
সেই ত' আমার দুঃখু।

গল্প ও উপন্যাস

হে বীর, প্রণাম করি

(অতীত যুগের এক বিস্মৃত কাহিনী)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এক

মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র।

কম্বোজ (আফগানিস্থান) থেকে কুন্তল প্রদেশ (কাশ্মীর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের শাসনকেন্দ্র পাটলী-পুত্র। গঙ্গার তীরে বরাবর সাড়ে' চার ক্রোশব্যাপী জনপদ। প্রশস্ত রাজ পথ, শত শত অট্টালিকা, সুসজ্জিত পণ্যশালা ও সুদৃশ্য উদ্যানশোভিত মহানগরী। চারিপাশে পরিখা দিয়ে নগরীকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ৯ হাত চওড়া, ত্রিশ হাত গভীর পরিখা, সর্বদাই থৈ থৈ করছে। পরিখার পিছনেই উঁচু কাঠের বেড়া, সেই পাঁচীলের উপর থেকে চারি পাশে লক্ষ্য করবার জন্য পাঁচশ' সত্তরটি পর্য্যবেক্ষণ-তোরণ, আর শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তীর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে প্রাচীরের গায় শত সহস্র রন্ধ্র। জনশ্রুতি আছে যে সম্রাট্ অশোক শত্রু এই মহানগরীর পত্তন করেন; ভগবান্ তথাগত ভবিষ্যৎ বাণী করেন—ভাবীকালে এই নগরী মহা-ভারতের মহানগরী রূপে বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে উঠবে, সমগ্র হিন্দু-স্থানের গৌরব ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হবে। শাক্যমুনির এই ভবিষ্যৎ বাণী যে সার্থক হয়েছিল বহু শতাব্দী ধরে ভারতের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অসাধারণের আগমন নিষ্ক্রমণের জন্য মহানগরীর দ্বার চৌষট্টটী। কুক্কুটারাম বিহারের পাশে গঙ্গার উপরেই যে দ্বার ছিল তারই সামনে এক প্রাচীন বট গাছের নীচে সেদিন বিকাল বেলা বেশ ভীড় জমেছিল। এক প্রৌঢ় বাক্‌জীবন (কথক) গল্প বলছিল, ছেলে বুড়ো সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক। বাক্-জীবন বলে যাচ্ছিল:

আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম প্রান্ত ধূলিধূসর হয়ে উঠলো, শত সহস্র অশ্বের পদশব্দ কম্বোজের পার্বত্য পথে প্রতিধ্বনি তুললো। সেকেন্দারের দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক্ বাহিনী শত শত যোজন পার্বত্য মরু অতিক্রম ক'রে ভারতের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করলো। কিন্তু উত্তরাপথের কোথাও কোন সাড়া জাগলো না। খণ্ড বিচ্ছিন্ন অক্ষম রাজন্যবর্গ পর-স্পরের ঈর্ষা নিয়ে বিলাস করতে লাগলেন, একজন আর এক জনের বিলোপ দেখে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন, কিন্তু নিজেদেরও সর্ব্বনাশের পথ যে প্রশস্ত হচ্ছে তা বুঝলেন না। শত শত হিন্দুর রক্তে পথ ও প্রান্তর রঞ্জিত হ'ল, বিজয়ী সেকেন্দারের জয়ধ্বনি এগিয়ে চললো—কম্বোজ (আফগানিস্থান), সৌবির (সিন্ধু), সৌবির থেকে পঞ্চনদে।

শশীগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিভীষণের ভূমিকায় নামলো। মহারাজ পৌরব ভাগ্যদোষে পরাজিত হলেন, কর্দ্দমাক্ত প্রান্তরে তাঁর দুর্দ্ধর্ষ রথী সৈন্যদের রথ

অচল হয়ে পড়লো। পঞ্চনদের পাঁচশত জনপদ শ্মশান হয়ে গেল। বন্দীদের পায়ের শিকল ঘর্ষণে ঘর্ষণে রাজ-পথের বুকে গভীর রেখা ফুটিয়ে তুললো। কঠরাজ্য থেকে বিজয়ী গ্রীকেরা সত্তর হাজার নরনারীর পায়ে শিকল পরিয়ে, বন্দী করে নিয়ে চললো। অশ্বায়ন রাজ্য থেকে চল্লিশ হাজার, ক্ষুদ্রক, অম্বষ্ঠ, প্রকন্ব, মধুমন্ত, আশাকানন, হস্তিনায়ন প্রভৃতি রাজ্য থেকে আরো কত যে বন্দী করেছিল আজ আর তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সবাইকার মনেই ত্রাস, সকলের মনেই শঙ্কা। তবু বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা ওঠে না, খণ্ড বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল ভারত দেশদ্রোহী শশীগুপ্তের চেষ্টায় যোজনের পর যোজন যবনের পদানত হ'তে থাকে।

সেকেন্দার অশোকাবনের দ্বারে এসে পৌঁছুলেন। বিধবা রাণী কৃপা দেবী, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্যের চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন দিক্ থেকে কোন সাহায্য পেলেন না। তবু বিজাতীয় বিধর্মীর অধীনতা তিনি স্বীকার করে নিতে পারলেন না, সামান্য ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, আটত্রিশ হাজার পদাতিক, ত্রিশটি হাতী ও সাত হাজর রথী সৈন্য নিয়ে তিনি সেকেন্দারে সম্মুখীন হলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামে বহু অরাতি নিধন ক'রে কৃপা দেবী সসৈন্যে মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলেন না। উল্লসিত গ্রীক-বাহিনী এবার রাজধানী মশকাবতী লুঠ করতে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু রাজধানীর তোরণে এসে তারা বাধা পেল, নাগরিকেরা পুরদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। নগরে পুরুষ মানুষ নেই, অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পুরনারীরা কি এবার বিদেশী সৈনিকের পায়ের নীচে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবে? হিন্দু রমণীরা কি ধর্ম ও মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে যবনের ক্রীতদাস হ'য়ে ভারতভূমি ছেড়ে চলে যাবে? সম্মানের চেয়ে প্রাণের মূল্য কি বেশী ধরা হবে?

না, না, না। হিন্দুর মেয়েরা দুর্বলা নয়। অশ্বের বল্গা ধরতে তারা জানে, তাদের হাতের অসিতে সূর্য্য-রশ্মি ঝলসিত হয়। অশ্ব ও অসি, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরে তিন হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন। যাদের হাতে তাদের বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্র নিহত হয়েছেন, আর্য্যাবর্ত্তে যারা মৃত্যুর তরঙ্গ তুলেছে তাদেরকে আঘাত করার জন্য তি হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন, এক একজন এক এ গ্রীক্‌কে মেরে মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কয়েক দণ্ডেই গ্রীক্‌রা পুরদ্বার ভেঙে নগরের ম প্রবেশ করল। তিন হাজার পুরনারী লাফিয়ে প গ্রীক্ সেনার মাঝে। তাদের হাতের তলোয়ার গ রূপার মত ঝল্‌মল করে উঠল, শিরস্ত্রাণের সোনা আভা গ্রীক্ সেনার চোখকে ঝলসে দিল। সেকেন্দ সুদূর গ্রীস্ থেকে পঞ্চনদ অবধি দিগ্বিজয় করে ফিরেছে কিন্তু কোথাও কোনদিন কোন নারী-বাহিনীর সা এসে তাঁকে দাঁড়াতে হয় নি। যবন সেনা বারেক স্তব্ধ থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু সংগ্রামের ক্ষেত্রে চিন্তার অ কোথায়? নারী-বাহিনীর অসির আঘাতে গ্রীকে ধরাশায়ী হতে সুরু করে, কঠোর সংগ্রাম সুরু হ'য়ে যায়।

নগরের পথে পথে, গৃহে গৃহে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা মুখর উঠলো। তিন হাজার হিন্দু ললনাকে জয় করতে গ্রী বাহিনীর তিন প্রহর লাগল। সেকেন্দার মশকাবতী করলেন, তখন সেখানে একটী মানুষেরও সাড়া নে সব শ্মশানের মত স্তব্ধ। সেকেন্দার ক্ষণেকের জন্য বিমা হয়ে পড়লেন। কত রাজ্য ও কত জাতিকে তিনি জ করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতাকে এতে বেশী মূল্য দিতে আ কোথাও তিনি দেখেন নি। তাঁর কপালে চিন্তার রে পড়ল।

বিভীষণ শশীগুপ্ত সেনাপতি সেলুকসের সহযো শূন্য গৃহগুলি লুঠ করলে, সেকেন্দারকে উৎসাহ দি বললো—আরো এগিয়ে চলুন সম্রাট্, সমগ্র উত্তরাপ আপনার পদানত হবে।

পাটলীপুত্রের সমৃদ্ধি দিগ্বিজয়ী সম্রাটের লুণ্ঠন নেশাকে প্রলুব্ধ করে, শশীগুপ্ত তিল তিল করে সেই লোভকে বহ্নিমান করে তোলে। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও ধর্ম্মাশোক কম্বোজ-কারুষ-পঞ্চনদ অবধি যে প্রশস্ত পথ অগ্রগামী করেছিলেন শান্তি ও সমৃদ্ধি বিস্তারের জন্য সেই পথ এবার বুঝি বিদেশী শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনবে পাটলীপুত্রে তোরণ অবধি।' কে এই দুর্য্যোগ থেকে ভারতে পুণ্যভূমিকে মুক্ত করবে? বিভীষণ শশীগুপ্তের কু-পরাম

কে হিন্দুদের রক্ষা করবে? নিজের জীবন দিয়ে কে রক্ষা করবে?

ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র-শক্তি আজ ক্ষীণ হয়ে গেছে। উত্তরা-ব-দধীচি জনগণের কল্যাণ কামনায় অস্থি দান করতে হলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য্য পণ্ডিত সুবন্ধু উৎকোচ ীক্ সৈন্যকে বশীভূত করলেন। রাত্রের অন্ধকারে ের মধ্যে শশীগুপ্ত নিহত হ'ল, সেকেন্দারের অগ্রগমন হ'ল। যবন রাজের পাশে ভারতীয় রাজনীতি কূটযুক্তি দেবার কেউ রইল না, উত্তরাপথ রক্ষা

শ' বছর অতীত হয় নি, আবার সেই দুর্দ্দিন । আবার আর এক যবনের দিগ্বিজয়ের নেশা আকাশ-বাতাস ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলেছে। মিনাণ্ডার তার দুর্দ্দান্ত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে (সমরখণ্ড) থেকে সাকেত (অযোধ্যা) অবধি ার করেছে। কিন্তু আজ সুবন্ধুর মত আচার্য্য ুগুপ্তের মত বীর নেই। সমগ্র উত্তরাপথ কি াজ নিঃশেষিত-শৌর্য্য? হিন্দুস্থানের গৌরব-সূর্য্য হ'লে আজ সত্যই অস্তমিত হবে? কে আছ কে আছ বীর, অগ্রগামী হও—সঙ্ঘবদ্ধ হও। আজ ার, তোমার জাতির সঙ্কট, তোমার ধর্ম ধ্বংস তোমার সম্মান লুপ্ত হবে। জাতির চেয়ে—ধর্ম্মের দেশের চেয়ে বড় কিছু নেই। সব আকর্ষণ ঠেলে দিয়ে আজ দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলি দাও, াছ তরুণ, তরবারী গ্রহণ কর। কে আছ তরুণী, ল থেকে ধনুকের ছিলা বেঁধে দাও!...

ণ থামলেন।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ গাছের পাশে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ন। এবার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—পরিচয় জানতে পারি কি?

চারণ উত্তর দিল—আমি বাক্-জীবন। রাজ-রাজড়ার কাহিনী শুনিয়ে বড় লোকদের খুসি করাই আমার বৃত্তি।

—তোমার নাম?

—পুষ্পমিত্র।

—এই নগরে তোমাকে নবাগত বলে মনে হচ্ছে?

—তক্ষশিলা থেকে আমি আজ প্রভাতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

ব্রাহ্মণের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। দৃষ্টিকে ধারালো ক'রে নিয়ে পুষ্পমিত্রের মুখের পানে ভালো ক'রে নজর ক'রে বললেন—আমার যতদূর স্মরণ হয় বারো বছর আগে তক্ষ-শিলার রাজন্য-শিক্ষালয়ে এক যুবককে আমি রাজনীতি অধ্যাপনা করার জন্য মনোনীত করেছিলাম, তার নাম ছিল আচার্য্য পুষ্পমিত্র।

—রাজগুরু, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। পুষ্পমিত্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন।

—জয়স্তু। কিন্তু তোমার তো এখানে এসে প্রথমেই আমার গৃহে যাওয়া উচিত ছিল।

—আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না। তা' ছাড়া আমি 'কোজাগরী-সন্ন্যাস' গ্রহণ করেছি।

—সেটী কি?

—যতদিন না এ দেশ থেকে যবনের অনাচার দূর হবে ততদিন আমি সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করবো, আর দেশে দেশে, পথে পথে তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানাবো—'কে জেগে আছ, কার শক্তি আছে, ভারতের পুণ্যভূমি থেকে যবন-অনাচার দূর কর!

—উত্তম। তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো।

রাজগুরু পাতঞ্জলি অগ্রগামী হলেন। আচার্য্য পুষ্পমিত্র তাঁর অনুসরণ করলেন।

প্রাসাদ-তোরণ থেকে চতুর্থ প্রহরের সান্ধ্য ভেরী ঘোষিত হ'ল। (ক্রমশঃ)

স্বাধীন ভারতের আদর্শ

গত ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ তারিখে ভারতীয় গণ-পরিষদে ভারতের স্বাধীনতার যে আদর্শ ঘোষণা করা হয় তা সংক্ষেপে এই:

এই গণপরিষদ্ দৃঢ়তা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে সংকল্প করছে যে ভারতবর্ষকে এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র গণরাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা হবে। বৃটিশ ভারত, বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের বাইরের অন্যান্য অংশ এবং ভারতের আর আর যে যে অঞ্চল স্বাধীন, সার্ব্বভৌম ভারতের ভিতর আসতে ইচ্ছা করবে তাদের নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সংকল্পও এই পরিষদ্ ঘোষণা করছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরকার সমস্ত অঞ্চল আত্ম-কর্তৃত্বশীল অঞ্চল হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে স্বভাবতঃই তার হাতে যে সব ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য থাকে সেগুলি বাদে অন্য যাবতীয় শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হবে।

স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত ও তার ভিতরকার অংশ সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে জনসাধারণের কা এই রাষ্ট্রে সামাজিক, বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক বিচারের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে। সকলের ম হবে সমান, সকল বিষয়েই সকলে পাবে সমান সু আইনের চক্ষে পাবে সমান ব্যবহার। প্রত্যেকের চিন্তার, বাক্যের, বিশ্বাসের, ধর্ম্মের, বৃত্তির, উপা এবং বৃত্তির স্বাধীনতা। অনগ্রসর, অনুন্নত ও লঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য থাকবে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

সভ্য জাতির ন্যায়নীতি ও বিধান অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের ভূখণ্ড হবে অখণ্ড,—জলে, স্থলে ও আকাশে তার সার্ব্বভৌম অধিকার।

এই প্রাচীন দেশ বিশ্বের দরবারে তার ন্যায্য লাভ করবে এবং বিশ্বের শান্তি ও মানবের কল্যাণে যা প্রয়োজন তা স্বেচ্ছায় দিতে পারবে।

স্বাধীনতার দিনে

আমি কি বাণী দিতে পারি? আমার প্রার্থনা-সভার বক্তৃতাই জাতির প্রতি আমার শ্রেষ্ঠ বাণী।

—মহাত্মা গান্ধী।

কঠিন কাজ রয়েছে আমাদের সম্মুখে। যতদিন না আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ রাখতে পারছি—যতদিন না ভারতবাসীর সকলকে তাদের বিধিদত্ত অধিকার দিতে পারছি ততদিন আমাদের কারও বিশ্রাম করা চলবে না। এক মহান্ দেশের নাগরিক আমরা—যে দেশ এক অতি দুঃসাহসী প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে। আমাদের সেই মহান আদর্শ রক্ষা ক'রে চলতে হবে।...পৃথিবীর সমুদয় দেশ ও জাতিকে আমরা আজ শুভ কামনা জানাচ্ছি এবং পৃথিবীতে শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রসারের কাজে সর্ব্বদা সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করছি।

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

আমরা আজ যা পেলাম তা হচ্ছে আমাদের ভবি সার্থক বা বিনষ্ট করবার স্বাধীনতা। একাধারে এটি শ্রেষ্ঠ অধিকার তেমনি সুকঠিন দায়িত্ব। স্বাধী আমাদের জন্য যে সুযোগ ও দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তা প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও দল নির্ব্বিশেষে সমান অংশীদার হবে।

—রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু একতা লাভ নি। স্বাধীন ভারত এখনও খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন। তবে করি এ বিভাগ নিশ্চয়ই লোপ পাবে।

—শ্রীঅর

এই সংগ্রামের এই গৌরবময় পরিসমাপ্তি যাঁদের ত্যাগের ফলে সম্ভব হয়েছে আজ সকলের আগে করা আমাদের প্রথম কাজ। দেশবাসী সসম্ভ্রমে দের স্মরণ করুক।

—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

আমাদের কাজের এখানেই শেষ নয়। লক্ষ লক্ষ ক এখনও অন্নাভাব, রোগ ও কষ্টের সম্মুখীন। তা দূর র জন্য সকল রকম বাদবিসম্বাদ, উপদলগত স্বার্থ করতে হবে। স্বাধীন জাতির প্রয়োজন মেটাতে সাধারণের শক্তিকে একত্রীভূত করার কঠিন কাজ ছু ভারতের সম্মুখে।

—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

পরাধীনতার দীর্ঘ রাত্রিতে যে স্বপ্ন আমাদের উৎসাহ দিয়েছে—প্রেরণা যুগিয়েছে তাকে বাস্তব রূপ দিয়ে মহিমা মণ্ডিত করব ব'লে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি।

—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত জাতি-গুলির পক্ষে ভারতের কার্য্যক্রম অনুপ্রেরণা যোগাবে। ভারতের উজ্জ্বল ও বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ এবং সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—চীন গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই শেক

আঠারো শ' সাতান্ন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

১৮৫৭। ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। তা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে। বোধ হয় ত পারছ, আমি সিপাহী-বিদ্রোহের কথা বলছি।

আমরা ছেলেবেলায় ইস্কুলের বইএ যখন সিপাহী-হের কাহিনী পড়তাম তখন বিদ্রোহীদের আচরণের গুনে তাদের ওপর একটা ভীষণ খারাপ ধারণাই হ'ত। বিক, সদাশয়—প্রজারঞ্জক—মহাপরাক্রান্ত রাজশক্তি, না হয় তা বিদেশী, তার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, রই অধীনে চাকরী করা সত্ত্বেও, তাদের কেউই ভাল খে দেখে না। তা ছাড়া সিপাহীদের যে নৃশংস চারের কাহিনী শোনা যেত-তা শুনলেও গায়ে কাঁটা ওঠে। রাজভক্তদের দোষ কি?

কিন্তু একটু বড় হয়েই যেন মনে হ'ল দেশের সুর কেমন লে যাচ্ছে! 'সিপাহী-বিদ্রোহ'কে এখন আর 'বিদ্রোহ' ও যেন সবাই স্বীকার করতে চান না—তাঁরা এর দিয়েছেন 'সিপাহীযুদ্ধ'; অর্থাৎ কিনা সিপাহীরা যে ই করেছিল তা দেশের স্বাধীনতার জন্য, তাই তাকে হ' না বলে যুদ্ধ বলাই উচিত। তা ছাড়া এত কাল টিশ যে বিবরণ পড়ে এসেছি এঁদের বিবরণের সঙ্গে কিছু গরমিলও দেখা যেতে লাগল। তাঁরা বললেন, যারা রাজত্ব করছে এ যুদ্ধ হয়েছিল তাদেরই সঙ্গে, কাজেই তাদের রাজত্বকালে সমস্ত ব্যাপারটির নিরপেক্ষ বিবরণ পাওয়া কঠিন। যে সব কথা সরকারের মনঃপূত হবে না তা মুখ ফুটে বলতে গেলে বিপদের ভয় আছে। কাজেই দেশ যত দিন না স্বাধীন হয় তত দিন এই একতরফা ইতিহাস নিয়েই থাকতে হবে।

আজ ভারতবর্ষে ইংরেজ-কর্তৃত্ব শেষ হয়েছে। ভারতের ঐতিহাসিকরা এখন হয়তো স্বাধীন ভাবে, সরকারের মন না জুগিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে, দেশের সত্যিকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন, এবং সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধেও হয়তো অনেক নতুন কথা জানা যাবে।

আজ নেহাৎ অভ্যাসের দোষে ছাড়া সিপাহীযুদ্ধকে এ দেশের কেউ আর সিপাহী-বিদ্রোহ ব'লে অভিহিত করতে চান না। 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ' বা 'প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম'—ভারতীয়ের ইতিহাসে এই নামেই এখন সে পরিচিত হয়েছে।

সিপাহীযুদ্ধের ঠিক একশ' বছর আগে পলাশীর আম্র-কুঞ্জে বাংলার (এবং ধরতে গেলে ভারতের) স্বাধীনতাসূর্য্য অস্ত যায়। এই যুদ্ধ জয়ে শৌর্য্যবীর্য্যের চেয়ে কি ভাবে ছল-চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল তা আজ আর কারও অজানা নেই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র রচিত "সিরাজউদ্দৌলা" বইখানি প্রত্যেকেরই

পড়ে দেখা উচিত। সে যাই হোক্, ১৮৫৭ সনটি ছিল পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী বৎসর। সেদিক্ দিয়ে পরাধীন জাতির কাছে এর গুরুত্ব বড় কম ছিল না।

ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহের যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে—যেমন হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সিপাহীদের শূয়োরের অন্ত্র দিয়ে তৈরী টোটা ব্যবহার করানো, তাদের ভাতা বন্ধ করা, কম মাইনে দেওয়া, ছুটী না দেওয়া, সমুদ্র যাত্রা করতে বাধ্য করা ইত্যাদি, তাকেই তাদের অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ ব'লে আজকালকার ঐতিহাসিকরা মনে করেন না, আর বিশেষ ক'রে সিপাহীদের মধ্যেই যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল এ কথাও তাঁরা মানতে চান না। অবশ্যি এটা ঠিক যে এ দেশের অনেক রাজা-মহারাজা ও সাধারণ লোক বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, তেমনি সিপাহীদের পক্ষ নিয়েও জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে ত্রুটী করে নি। দেশ থেকে বিদেশীর শাসন উপড়ে ফেলে আবার স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবার স্বপ্ন ছিল এর পেছনে। হঠাৎ সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণস্থায়ী 'বিদ্রোহ' হিসাবে ধরলে এর প্রতি অবিচার করা হবে, এর পেছনে ছিল বহু লোকের দীর্ঘ দিনের সুকল্পিত পরিকল্পনা—এ যুগের ইতিহাসকাররা তার প্রমাণ পেয়েছেন। তাই একে বিদ্রোহ না ব'লে বলা হয়েছে 'স্বাধীনতা-যুদ্ধ'।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিদেশী সরকার। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সওদাগরী করতে এসেছিল তারা, কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং কৌশলে অধিকার ক'রে বসল সিংহাসন। যদিও খোদ ইংরেজ সরকার তখনও এ দেশের শাসন-ভার নেয় নি—নিয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তাদের শাসনের চাপে নানা দিক্ দিয়ে দেশের লোক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তার ওপর বিদেশী শিল্পবাণিজ্যকে নানা রকম সুবিধা দেওয়ায় তাদের পণ্যে দেশ আস্তে আস্তে ভরে উঠছিল, দেশের জাতীয় শিল্প, কুটীরশিল্প পড়ছিল বিপর্য্যস্ত হয়ে। এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যে জমিদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করেছিলেন তা'তে কৃষকদের অবস্থাও বিশেষ সুখের হয় নি। যে সব ইংরেজ ভাগ্য অন্বেষণের জন্য এ দেশে আসত তাদের বেশীর ভাগই নানা ভাবে—এবং অনেক সময় অন্যায় ভাবে এ দেশের অর্থ ও সম্পদ্ শোষণ সুরু করে দেয়। দেশের লোককে তারা প্রায়ই হীন চোখে দেখত, এবং সামান্য কারণে উৎপীড়ন বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদেরও কেউ কেউ এ দোষ মুক্ত ছিলেন না। ফলে দেশের লোকের যে তাদের আর যাই থাক, শ্রদ্ধার ভাব আসতে পারে না তা সহজেই বোঝা যায়।

লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হয়ে এলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্য বাড়াবার জন্য তিনি নতুন নতুন খুঁজে বার করলেন। এর ফলে ঠিক হ'ল কোনও রাজ্যের রাজা যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান রাজ্য সরাসরি বৃটীশ সাম্রাজ্যের ভিতর চলে একে একে সাতারা, নাগপুর, ঝান্সী, জেতপুর, কর্ণাট, তাঞ্জোর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য ইংরেজের হাতে চলে গেল। এর ফলে ঐ সব রাজ্যের প্রজা সাধারণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এদিকে ইংরেজ মিশনারীরাও চুপ করে ছিলেন শ্বেতকায় জাতিরা পৃথিবীর যেখানে গেছে সেখানে নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করেছে। ব্যাপারটি এদিক কোন দোষের নয়, কারণ নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের সকলেরই খুব আস্থা থাকবে এবং সে চাইবে আর সেই সত্য উপলব্ধি করুক এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জন্য জোর-জবরদস্তি করা বা অন্যায় ভাবে লোভ নিশ্চয়ই ভাল নয়। এই মিশনারীরা তা ভুলে এবং পেছনে রাজশক্তি আছে বুঝেই হয়তো অনেক অন্যায় ভাবে দেশী লোকদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে একজন বিখ্যাত পাদ্রী তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন— পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না সে পর্য্যন্ত আমাদের চেষ্টা ক'রে যেতে হবে।' মনোভাবও ধর্ম্মভীরু ভারতীয়দের ভিতরে উত্তেজিত ক'রে থাকবে।

যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল অবশেষে তা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হ'ল। বিপ্লবীরা ভিতরে ভিতরে ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। ১৮৫৭ সনের ২৩শে জুন পলা যুদ্ধের পর এক শ' বছর পূর্ণ হবার কথা। ঐ দিনটি

া সংগ্রাম ঘোষণার দিন বলে স্থির করল। বলা ল্য এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সিপাহীরাই যে সব চেয়ে বড় শ গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। বিভিন্ন দলের ্য গোপনে গোপনে যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা হ'ল— ঃতিক ভাবে খবর আদান-প্রদানের আয়োজনেরও ত্রুটী না। ইংরেজ গোরা সৈন্য অত্যন্ত সুশিক্ষিত, কিন্তু ায় তারা নগণ্য। তার ওপর ইয়োরোপে ক্রিমিয়ায় চলছিল, ইংরেজরা সেদিকেও ব্যস্ত ছিল। দেশী াহীরা গোরাদের মত অত রণনিপুণ না হ'লেও সংখ্যায় অনেক। অস্ত্রশস্ত্র বেশী না থাকলেও কৌশলে যুদ্ধ াতে পারলে প্রতিপক্ষ দলকে বিপর্য্যস্ত করা তেমন ন হবে না। এবারকার মহাযুদ্ধে 'গেরিলা যুদ্ধের' ণী তোমরা শুনেছ, সিপাহীযুদ্ধেও অনেকটা ঐ লীই অবলম্বন করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। প্রতি- রাষ্ট্রদের কাছ থেকেও যে সাহায্যের চেষ্টা হয় নি য়। 'বিদ্রোহে'র অন্যতম নেতা আজিমউল্লা খাঁকে ও পাঠান হ'ল গুপ্তচর হিসাবে ইংরেজের সামরিক ম্বন্ধে ঠিকমত খবর সংগ্রহের জন্য। আজিমউল্লা ুদূর ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও ইংরেজের রণকৌশল া ক'রে এলেন। তুরস্ক, আফগানিস্থান প্রভৃতিও আসতে বাকি রাখলেন না।

ারিখ নির্দ্ধারিত ছিল ২৩শে জুন, কিন্তু সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে অত দিন পর্য্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারল না। মার্চ মাসেই এক হঠাৎ একদিন কলকাতার অনতিদূরে বারাকপুরে আগুন জ্বলে উঠল। মঙ্গল পাঁড়ে নামে এক ব্রাহ্মণ ের হাতে একজন অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার হ'ল। বিচারে মঙ্গল পাঁড়ের হ'ল ফাঁসী—ঘটনার প্তাহের মধ্যেই। বারুদে আগুন লাগল যেন।

তার পর? তার পর অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে সারা তে যুড়ে যে নিদারুণ রণতাণ্ডব সুরু হ'ল তার তুলনা গে মেলা ভার। ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা হ' ঘোষণা করল। সেখানকার ইংরেজ সেনাপতি র হাতে প্রাণ হারাল। 'বিদ্রোহীরা' মশালের ন ঘরবাড়ী জালিয়ে দিয়ে দলে দলে ছুটল দিল্লী ার করতে।

এদিকে দিল্লীর সিংহাসনে তখন শেষ মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ। নামে মাত্রই বাদশাহ, ইংরেজরা ইতি-পূর্ব্বেই তাঁর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। দিল্লীর জন সাধারণ এই নতুন উত্তেজনায় যেন নতুন প্রাণ পেল। তারা বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট্ ঘোষণা ক'রে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম সুরু ক'রে দিল। লক্ষ্ণৌ, বিঠুর, কানপুর, রুড়কী, কাশী, আজমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ, ফতেপুর, আম্বালা, ঝিলাম, শিয়াল-কোট, পাটনা, দানাপুর, আরা, জৈনপুর, ইন্দোর, ঝান্সী, বারাকপুর, বহরমপুর,—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র চল্‌ল সংগ্রাম। সকলের মুখেই এক বাণী—'চলো দিল্লী'।

সিপাহীযুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন নানা সাহেব। ইনি কানপুরে সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ইনি ছিলেন শেষ পেশওয়া নৃপতি ২য় বাজীরাওএর দত্তক পুত্র। লর্ড ডালহৌসীর প্রবর্ত্তিত নীতিতে এঁর মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে কিছুদিন এঁকে সামান্য কেরা-ণীর কাজও করতে হয়। কিন্তু তা'তে তাঁর দেশাত্মবোধ নষ্ট করতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে সৈন্য সংগঠন করবার জন্য তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং ধীরে ধীরে সিপাহীদের সংঘবদ্ধ ক'রে তুলছিলেন। সিপাহীযুদ্ধের সময় মধ্যভারতে —বিশেষ ক'রে আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লবীদের পরিচালনার ভার তিনিই নিলেন। নানা সাহেব শুধু সাহসী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না, রণনৈপুণ্যও ছিল তাঁর যথেষ্ট। সিপাহীযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর।

তাঁতিয়া টোপী ছিলেন আর একজন নেতা। ইনি ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ। সৈন্য পরিচালনায় এঁরও ছিল প্রচুর দক্ষতা। যুদ্ধের সময় ইনি নিলেন গোয়ালিয়র সৈন্য-দলের ভার।

কূটকৌশলী আজিমউল্লা খাঁর কথা আগেই বলেছি। ইনিও যুদ্ধ চালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন। রাজা কুমার সিং, অযোধ্যার বেগম, রোহিলখণ্ড রাজবংশের খান সাহেব—এঁরাও অনুচরদের নিয়ে বিপ্লবে যোগ দিলেন। আর যোগ দিলেন ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হওয়ায় ইংরেজ সরকার এঁর রাজ্য দখল ক'রে নেয়। রাণী ঝান্সী পুনর্দখলের সুযোগ খুঁজছিলেন।

তিনিও সসৈন্যে দেশোদ্ধারের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়ে, উন্মুক্ত তলোয়ার হস্তে। মুখে উদাত্ত বাণী—"মেরী ঝান্সী নেহি দুংগী"। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৩ বছর।

এক সহর থেকে অন্য সহরে—এক ছাউনী থেকে অন্য ছাউনীতে ঝড়ের মত বিপ্লবীর দল এগিয়ে চল্‌ল। দলে দলে ইংরেজ সৈন্য, সেনাপতি তাদের হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগল। বিপ্লবীরা রেল লাইন ধ্বংস ক'রে বিপক্ষের যোগাযোগের পথ বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করল; দু' হাজার মাইল টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলল, কারাগার ভেঙ্গে বারো হাজার বন্দীকে মুক্ত ক'রে দিল, সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিল।

কিন্তু এত ক'রেও ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন তাদের প্রতি বিরূপ। সংগ্রামের পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটী ছিল, সর্ব্বত্র সুব্যবস্থাও করা হয় নি, শৃঙ্খলার অভাব ছিল প্রচুর। তা ছাড়া যে ভাবে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল তার সঙ্গে তাল রেখেও নেতারা চলতে পারলেন না। কানপুরে জেনা হ্যাভলক নানা সাহেবকে পরাজিত করলেন। মাসের চেষ্টায় দিল্লী নগরীও ইংরেজরা পুনর্দখল অবশ্যি তাদের নায়ক জেনারেল নিকল্‌সন্‌কে প্রাণ হ'ল। হ্যাভলক্ ও আউটরাম্ লক্ষ্ণৌ আক্রমণ ক বিজয়ী হলেন। বেরিলী, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডেও হ'ল অবস্থা। ওদিকে স্যর্ হিউরোজের সঙ্গে সম্মুখসমরে করতে করতে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈও রক্তাক্ত দেহত্যাগ করলেন। তাঁতিয়া টোপী তাঁর সাহা জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারলেন দু' লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ করল।

সিপাহীযুদ্ধে জয়ী হবার পর ইংরেজরা ভারতী উপর কিছুদিন যে অত্যাচার চালিয়েছিল সে ইতিহাস উল্লেখ না করাই ভাল। স্বাধীন ভা নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা শেষ হ'লে তার পূর্ণ বিবরণ জানতে পারবে।

ছোট্ট একটি মিথ্যে

শ্রীকমলা দত্ত

ডেভিড নয়-দশ বছরের একটি ছেলে, থাকে সহরের কাছাকাছি একটা গ্রামে, মস্ত একটা বাড়ীতে। ওর বাবা পয়সাওয়ালা লোক। সহরে ঘেঁষাঘেঁষি করে ছোট বাড়ীতে থাকা তিনি পছন্দ করেন না। তাই নিরালায় এমন সুন্দর বাড়ীখানা তৈরী করিয়েছেন।

ডেভিডদের বাড়ীর পাশেই গির্জা—মাঝখানে খানিকটা খোলা জমি। ছোট্ট, পুরানো গির্জা, কোথাও জাঁকজমকের চিহ্ন নেই। একজন পাদ্রী বা পুরোহিত সেখানে থাকেন—চমৎকার লোক তিনি। সারা পল্লীতে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নেন—কোথায় কার অসুখ, কার কি অভাব; তার পর সাধ্যমত প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটান। এর জন্য তাঁর নিজেকে অত্যন্ত কষ্ট ক'রে থাকতে হয়।

ডেভিডদের বাড়ীতে ধর্ম-টর্ম কেউ পছন্দ করতেন না, গির্জায় যাওয়ার রীতিও তাঁদের ছিল না। তাঁরা ডেভিডকে এ সব থেকে দূরে রাখতে যথাসাধ্য করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ডেভিড আবা গির্জাতেই যেতে ভালোবাসত, আরো বেশী ভালো এই পাদ্রীকে। তার মনে হ'ত স্কুলে যে যীশু খৃষ্টে সে শুনেছে, এ পাদ্রী যেন সেই যীশু খৃষ্ট, রোগীর সারিয়ে দিচ্ছেন—দুঃখীর দূর করছেন দুঃখ। গির্জাতে গেলে সে কেমন যেন অন্য এক বহুযুগ আগে দেশে চলে যেত।

সে চলে যেত দু' হাজার বছর আগে জেরুজা বেথেলহেমের এক অন্ধকার আস্তাবলে। সেদিন আ উঠেছে এক নূতন তারা; আর সেই ক্ষুদ্র আস্তা অপরিচ্ছন্ন, অন্ধকার কোণে মাতা মেরীর কোল ক'রে জন্ম নিলেন যীশু খৃষ্ট।

চারপাশ নিস্তব্ধ, নিঃঝুম; কেউ কোনো সাড়া

ছে না; চুপ চুপ, রাজার কানে যেন এ খবর না পৌঁছয়। বাণী শুনতে পেয়েছেন সে দেশের রাজা—এক শিশু রে তাঁর দেশে, রাজার প্রাধান্য যাবে মিলিয়ে। তাই া আদেশ দিয়েছেন সব নবজাত শিশুকে মেরে তে। মাতা মেরী পালিয়ে এসেছেন। কত দুস্তর তিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে, সহ্য করতে হয়েছে কত হ দুঃখ!

সেই মাতা মেরীর মূর্ত্তি আছে বেদীর ওপরে। বেদী- জ্বলে সারি সারি মোমের প্রদীপ। শান্ত, স্নিগ্ধ তে মাতার মুখ উজ্জ্বল, যেন মাতৃস্নেহ গ'লে গ'লে পড়ছে। কোলে তাঁর শিশু যীশু।

পাদ্রীও ডেভিডকে খুবই ভালোবাসেন। ছেলেটিকে লক্ষ্য করেন এ ধারণাই তাঁর ক্রমশ দৃঢ় হয়ে ওঠে—বানের বিশেষ করুণা এ বালক পেয়েছে। হয়তো র ভবিষ্যতে এ বালকটিই যীশুর বাণী বয়ে নিয়ে যাবে ক দিকে। ডেভিডদের বাড়ীর লোকের মনোভাবের ও তাঁর অজানা ছিল না; তাই তো তিনি ডেভিডের ভেবে আরো অবাক্ হয়ে যান। অবসর সময়ে াহিত ডেভিডকে শোনান যীশুর কত গল্প। কেমন যীশুর ছোঁওয়ায় অন্ধ ফিরে পেত দৃষ্টি, রোগী হ'ত গ। আরো শোনান সেই গল্প—যীশুরই এক অনুচর ধরিয়ে দিল ইহুদীদের হাতে। যীশু খৃষ্ট চলেছেন র ক্রুশ কাঠখানা বয়ে নিয়ে অতি কষ্টে। মাথায় কাঁটার মুকুট। তাঁর চার পাশ ঘিরে কোলাহল ও প করতে করতে চলেছে অসংখ্য ইহুদী।

তার পর তাঁর হাত-পা পেরেক দিয়ে ক্রুশে আটকে া হ'ল; রক্ত ঝরছে ঝর ঝর ক'রে। কিন্তু মুখে একটুও যন্ত্রণার চিহ্ন নেই; তিনি বলছেন ভগবানের শে, "পিতা, এদের তুমি ক্ষমা ক'রো, এরা জানে না রা কী করছে।"

শুনতে শুনতে ডেভিডের গালের ওপর দিয়ে র জল গড়িয়ে পড়ে বড় বড় ফোঁটায়।

এমনি ক'রেই দিন চলে যায়। বাড়ীর লোক ক্রমে ভিডের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কিছুটা হাল ছেড়ে দিল। ড তাই আজকাল অনায়াসে দিনে দু'-একবার ক'রে তে আসে।

কয়েক দিন ধ'রে সারা গ্রামময় একটা সাড়া পড়ে গেছে, —বিশেষতঃ শিশুমহলে। পুরোহিত প্রচার করেছেন,—মাতা মেরীর একটি ছোট্ট মূর্ত্তি নিয়ে লটারী খেলা হবে। আগাগোড়া মোম দিয়ে তৈরী সেটা। এ লটারীতে যোগ দিতে পারবে শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। এক আনা ক'রে টিকিট; লটারীতে যা টাকা উঠবে তা দিয়ে গ্রামের গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা হবে, তাদের খাবার, পোষাক কিনে দেওয়া হবে।

মূর্ত্তিখানা রাখা আছে গির্জার বেদীর ওপর, বড় মূর্ত্তিটার কাছেই। ডেভিড রোজ গির্জাতে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে শুধু দেখে ছোট্ট মূর্ত্তিখানা। শুভ্র, স্নিগ্ধ-কোমল সে মূর্ত্তি। আর পুরোহিত ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধুই ভাবেন—"আহা, ডেভিডই যদি লটারীতে মূর্ত্তিটা পায়! তা হ'লে ডেভিডও যেমন খুসী হবে মূর্ত্তিটাও পড়বে তেমনি উপযুক্ত হাতে। কোথায় কোন্ দুষ্টু ছেলে হয়তো পাবে; দু'দিন এটা নিয়ে পুতুল খেলা করবে, তারপরই ভেঙ্গে ফেলবে চুরমার ক'রে। তিনি জিজ্ঞেস করেন—"টিকিট কিনবে না ডেভিড?"

"বারে,—নিশ্চয়ই কিনব। জানেন, আমাদের পাড়ায় কতকগুলি ছেলে আছে ভারী গরীব। বেচারাদের বোধ হয় টিকিট কিনবার পয়সাও নেই। আমার একটা টাকা আছে একেবারে নিজের। আমি ওদের মধ্যে ১৫ জনকে পনেরো আনা দিয়ে দেব টিকিট কিনতে, আর নিজে কিনব একটা। আচ্ছা, লটারীতে আমার নামও তো উঠতে পারে?"

"নিশ্চয়; তোমার নামই উঠবে। পাবে—তুমিই পাবে।" পুরোহিত যেন নিজেকেই আশ্বাস দিতে থাকেন।

তারপর সেই দিন এলো। সকাল বেলা—গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা হয়ে এসে মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। গির্জার দরজা পর্যন্ত চলে গেছে তরুবীথিকা, পথ ছায়াচ্ছন্ন। সেই পথে ছেলেমেয়ে আসছে দলে দলে।

গির্জার প্রকাণ্ড ঘরটি ভরে যায়। ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই টিকিট কিনেছে, দু'-একজন হয়তো বা কিনতে পারে নি। ডেভিড এলো, বসল একপাশে।

ফুলে, পাতায়; আলোয় সেদিন গির্জার ভেতরটা সুন্দর সাজানো। বেদীর পাশে এক টেবিল—সে টেবিলের ওপর মূর্ত্তিখানা।

আগ্রহে, উত্তেজনায় শিশুর দলের মুখ উজ্জ্বল, চোখ বিস্ফারিত। প্রত্যেকের বুক কাঁপছে দুরু দুরু ক'রে আশা ও আশঙ্কায়। পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন, হাতে তাঁর একখানা ট্রে। তার ওপর যারা লটারীর টিকিট কিনেছে তাদের নাম লেখা ছোট ছোট ভাঁজকরা কাগজ রাশিকৃত হয়ে আছে। সে নামগুলি পুরোহিত নিজেও জানেন না।

এবার লটারী সুরু হবে। পাদ্রী স্তূপীকৃত কাগজ থেকে যে কোন একখানা কাগজ তুলে নিয়ে নাম পড়বেন। যার নাম থাকবে সেই পাবে মূর্ত্তিখানা। তাঁর বিচারই হবে চূড়ান্ত।

পুরোহিত শান্তমুখে একখানা কাগজ তুলে নিলেন—একবার দৃষ্টি পড়ল ডেভিডের দিকে। ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে সে। মনে মনে কামনা জাগল তাঁর—যাতে ডেভিডের নামই ওঠে।

তিনি ধীরে ধীরে কাগজ খুলতে থাকেন। প্রত্যেকটি শিশু রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে—সমস্ত শরীর তাদের ঋজু হ'য়ে উঠেছে। পুরোহিতের কিন্তু হাত কাঁপছে একটু একটু ক'রে। ভয়—যদি ডেভিডের নাম না-ই ওঠে!

তিনি কাগজের দিকে তাকালেন। সব আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, ডেভিডের নাম ওঠে নি। হতাশায় তাঁর মন ভরে গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মত চিন্তা এসে যায়—"কী ক্ষতি হয়, যদি আমি ডেভিডের নাম বলি? কেউ তো জানবে না। আমার এই ছোট্ট একটুখানি মিথ্যে ভগবান্ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।" তিনি স্থির কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ডেভিডের নাম। সব শিশুর চোখ একযোগে পড়ল ডেভিডের দিকে।

কিন্তু ও কী! ডেভিডের মুখ এমন কালো হয়ে গেল কেন? ডেভিড যাঁকে এতদিন যীশুর মত ভেবে এসেছিল তিনিই বললেন মিথ্যে কথা! সে যে টিকিট কেনেই নি! আজ ভোরবেলা টিকিট কিনতে এক আনা পয়সা নিয়ে আসছিল, পাড়ার ছোট্ট পল্‌কে দেখল, টিকিট কিনতে না পেরে সে কাঁদছে। মন তার খারাপ হ'য়ে গে পয়সাটা সে দিয়ে দিল পল্‌কে। সে পয়সা দিয়ে কিনেছে পল্। শেষে এও সম্ভব হ'ল? গির্জা, ভগবান্ সব কিছুতেই তা হ'লে মিথ্যে থাকতে পা তার বাবা-মা যে বলেন পুরোহিত ভণ্ড—তা হ'লে ঠিক? সব বিশ্বাস তার আজ ভেঙে গেল চুরমার হ ডেভিড দিশেহারার মত চীৎকার ক'রে ছুটে পা গেল।

পুরোহিত ডেভিডের মুখ দেখেই বুঝতে পার কোথাও ভুল ঘটেছে। যে কোন রকমেই হোক মিথ্যে ধরতে পেরেছে। কিন্তু আর উপায় ডেভিড যখন ছুটে গেল—পুরোহিতের মুখ হ'ল ফ্যাকা তিনি মাথা নীচু করে চলে গেলেন ভিতরে, নিজের ঘরে

সেদিন গভীর রাত্রিতে স্বল্প-আলোকিত গির্জা-ঘ বেদীর পাশে একাকী স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছেন পুরোহি মাতা মেরীর পদমূলের প্রদীপশিখাগুলি একটু কাঁপছে; কোথাও কোন সাড়া নেই। কী যে ঘটে কি করে ডেভিড তাঁর মিথ্যে বুঝতে পারল—পুরো পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছেন না। আবার পেয়েছেন—এখান থেকে গিয়েই ডেভিডের জ্বর হ তিনি আকুল হ'য়ে প্রার্থনা করেন—আমি স্নেহে অ মিথ্যে বলেছি, তার জন্য নিষ্পাপ শিশুর বিশ্বাস চিরদ মত হারালাম। আমার এই শাস্তি মাথা পেতে নি প্রভু, কিন্তু ডেভিডকে তুমি সুস্থ ক'রে দাও।"

একটি একটি ক'রে পনেরো ষোল দিন কেটে ডেভিড চার পাঁচদিন পরেই সুস্থ হয়েছে—কিন্তু গি সে আর আসে না। পুরোহিত দু'একদিন তাকে পেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওঁকে দেখলেই ডে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পুরোহিতের মুখের হাসি মি গেছে। বিষণ্ণ করুণ হ'য়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। দিনেই মুখে আরও কতগুলি বার্দ্ধক্যের রেখা পড়ে গে সবাই দেখে—তাঁর সহাস্য আনন আর নেই। বু কেউ কিছু পারে না। ডেভিডও কাউকে কিছু বলে নি

পুরোহিত চেষ্টা ক'রে অন্য গির্জাতে বদলী বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। তিনি আর পারছেন এ অবস্থা সহ্য করতে।

এলো তাঁর বিদায়ের দিন। সব জিনিষপত্র গাড়ীতে ছে। গ্রামবাসীরা এসেছে প্রায় সবাই। এত বড় ক হারাতে হবে,—মন সকলেরই ভারাক্রান্ত।

পুরোহিত গির্জার বাইরে বেরিয়ে এলেন—অত্যন্ত ও উদাস তাঁর চেহারা। সকলকে সম্ভাষণ জানালেন; দিকে একবার দেখলেন তাকিয়ে—না, ডেভিড আসে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী চল্‌ল ডেভিডদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। উৎসুক চোখে তিনি তাকালেন, কিন্তু বাগানে, বাড়ীর বারান্দায়—কোথাও ডেভিড নেই! নয়তো সে তাঁকে দেখতে পেয়েই আড়ালে সরে গেছে। দুই চোখ দিয়ে এখন তাঁর অবিরল ধারায় জল ঝরছে।

একটু একটু ক'রে গাড়ী গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেল।*

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

২শে শ্রাবণের স্মরণীয় তারিখের পর কলকাতায় যে ায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিল কয়েক দিন আগে একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তার অবনতি মহাত্মা গান্ধী এই ব্যাপারে এমন মর্ম্মাহত হয়ে-ন যে তিনি হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য তাঁর শেষ অস্ত্র ণ অনশন সুরু করেন। গান্ধীজির ওপর দেশবাসীর মেয় প্রভাবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এতে ফল য় এবং ৭৩ ঘণ্টা অনশনে কাটাবার পর মহাত্মাজি ন ভঙ্গ করেন। শুধু হাঙ্গামাই বন্ধ হয় না, যারা াল সুরু করেছিল তাদের অনেকে অনুতপ্ত হয়ে জির কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক ইত্যাদি সমর্পণ প্রতিজ্ঞা করে যে এর পর থেকে শান্তি প্রচারের তারা গ্রহণ করবে। বর্ত্তমান বিশ্বযোড়া হানাহানি-কাটির দিনে অহিংসা মন্ত্রের এত বড় প্রভাব কেউ কি স করতে পারত?

* * *

গান্ধীজির কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের পর গান্ধীজি হেসে ছিলেন—জীবনে তিনি এই প্রথম ব্রেন্‌গান প্রভৃতি ক অস্ত্র চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ পেলেন।

* * *

লকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর হঠাৎ নতুন হাঙ্গামা সুরু হওয়ায় কারোই এর প্রতি সহানুভূতি ছিল না। কলকাতার নাগরিকেরা হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় শান্তি অভিযান চালিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন এতে সব চেয়ে অগ্রণী। কিন্তু এই শান্তি-অভিযানেই আমরা কয়েকটি মহাপ্রাণকে হারিয়েছি। অভিযানের সময় তাঁরা দুর্ব্বৃত্তদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৺শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ৺স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুশীল দাশ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতেও সুপরিচিত ছিলেন—কংগ্রেস সাহিত্যসংঘের তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এঁরা ছাড়া ৺বীরেশ্বর ঘোষাল নামে একটি স্কুলের ছাত্রও এই ভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। এই সব অমর শহীদের নাম দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

* * *

কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ভারতের অনেক জায়গায় এখনও সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভে নি। বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবে। সম্প্রতি আবার দিল্লীতেও সুরু হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী তাই নোয়াখালি না গিয়ে

সেখানেই ছুটে গেছেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন পাঞ্জাব।

এদিকে দেশের নানা জায়গায়—বিশেষ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গে দেখা দিয়েছে দারুণ খাদ্যাভাব। অনেকেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছেন।

* * *

বিপ্লবী যতীন মুখোপাধ্যায়ের নাম দেশ ভুলে যেতে বসেছিল। 'বাঘা যতীন' নামেই ইনি এক সময় পরিচিত ছিলেন। আজ থেকে প্রায় ৩৩ বছর আগে বালেশ্বরের অরণ্যে বুড়ীবালাম নদীর তীরে মাত্র চার জন বিপ্লবী সহকর্ম্মী নিয়ে ইনি ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামেন এবং তা'তেই দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনা ভারতের বিপ্লব-ইতিহাসে 'বালেশ্বরের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের পর সম্প্রতি দেশবাসী সমারোহের সঙ্গে এঁর স্মৃতি তর্পণ করেছে। এই প্রসঙ্গে সে যুগের অনেক অজ্ঞাত কাহিনীও জানা গেছে।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকার বোষ্টন সহরে ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক—প্রাচ্য কলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বৃহত্তর পৃথিবীর সামনে ভারতের সংস্কৃতি প্রচারের ভার যাঁরা নিয়েছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বোষ্টনের যাদুঘরে প্রাচ্য কলার যে সংগ্রহ তিনি করেছিলেন ভারতের বাইরে বোধ হয় তার আর যুড়ি নেই। ডাঃ কুমারস্বামীর বাড়ী ছিল সিংহলে।

দেশব্যাপী অশান্তির ফলে এ দেশের খেলা ক্রমাগত বিভ্রাট গেছে তা তোমরা জান। কলকা ক্রীড়ামোদীদের প্রধান আকর্ষণ ফুটবল লীগ—তা বছর খেলা হয় নি। শোনা যাচ্ছে, দেরীতে হ আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার নাকি আয়ো হচ্ছে। শীঘ্রই হয়তো খেলা সুরু হবে।

ওদিকে মোহনবাগান দল গিয়েছিল বোম্বা বিখ্যাত রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় খেলতে। সে তারা খুবই কৃতিত্ব দেখিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে কোয়ার্টার ফাইনালে সাউথ স্ট্যাফোর্ড সৈন্য দলের তাদের খেলা পড়েছিল। খেলা হচ্ছে, মোহনবাগান গোলে জিতছে। খেলার মাঠে দর্শকদের প্রচণ্ড এত বড় ভীড় বোম্বাইএর মাঠে বড় একটা যা হঠাৎ ভীড়ের চাপে দেড় হাজার দর্শক সমেত গ্যালারী পড়ল ভেঙ্গে। বহু লোক আহত হ'ল, নি হ'ল কেউ কেউ। দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ এবারকার প্রতিযোগিতা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

* * *

ভারতবর্ষ থেকে বাছাই করা ক্রিকেট খেলোয় দল শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে টেষ্ট খেলতে—এ খবর তো আগেই পেয়েছ। কিন্তু দলের অধিনায়ক বিজয় মা অসুস্থতার জন্য যেতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন অমরনাথ।

যে বই তোমরা পড়তে পার

যূথপতি—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, বনে জঙ্গলে—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ছেলেবেলার গল্প—শরৎচন্দ্র চ পাধ্যায়, বুড়ো আংলা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শিবরাম চক্রবর্ত্তী, হলেও সত্যি—ধীরেন্দ্রলাল ধর, মানুষ কি করে বড় হ'ল—গিরীন চক্রবর্ত্তী (অনুবাদ), 'প্রকৃতির পরাজয়—আ রশিদ, আবিষ্কারের গল্প—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুমি মহীয়সী—ইন্দিরা দেবী, রবিবারের দেশে—উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, গান্ধীজির গল্প—প্রভাত বসু, 'দিগ্বিজয়ী বী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ধনুর ছোট্ট বন্ধুগণ,

জয় হিন্দ! ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পর প্রায় মাস হয়ে এল, আজ আবার তোমাদের কাছে চিঠি তে বসেছি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে অতি দ্রুত পরিবর্ত্তন হবে বলে হয়তো তোমরা আশা করেছিলে, এখনও তার প্রায় কিছুই হয় নি। এখনও দেশ যুড়ে ছে নানা বাধা—নানা ঝঞ্ঝাট। এত বড় একটা রাষ্ট্রিক বর্ত্তন, বড় সহজ কথা নয় তো!

জটিল খাদ্যসমস্যা, বন্যা, সাম্প্রদায়িক অশান্তি—এ সব রয়েছেই, তার উপর মাঝে মাঝে কোন কোন গায় নতুন ক'রে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াচ্ছে ও খবর আসছে। আজ আমরা যখন অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক ব'লে পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করছি 'আসাম শুধু আসামীদের জন্য', 'বিহার শুধু রীদের জন্য' বা 'উড়িষ্যা শুধু ওড়িয়াদের জন্য'—এ রকম ীর্ণচিত্ততার কথা ভাবা যায় না। মহাত্মা গান্ধী এই ক্ত মনোভাবের নিন্দা ক'রে যা বলেছেন তা তোমরা য়ই শুনেছ। প্রাদেশিক নেতারাও এর নিন্দে ছেন।

অবশ্য আমাদের সকলেরই উচিত যে প্রদেশে বাস সে প্রদেশের তো বটেই, প্রতিবেশী অন্যান্য প্রদেশ ও যথাসাধ্য 'খোঁজ-খবর' রাখা। তা আমরা সব সময়ে কি? এ বিষয়ে আমাদের একজন আসামী গ্রাহিকা তী বকুল তামুলী আমাদেরই একজন গ্রাহক ও লেখক কাছে যে চিঠি দিয়েছেন তার একটু তুলে দিচ্ছি:

"বাঙালীদের আমার খুব ভাল লাগে। অবশ্য কোন দিন আমি আসামের বাইরে যাই নি। বাংলা সাহিত্যের মাঝেই আমার বাংলা দেশের সাথে পরিচয় হয়েছে। ভালো লাগে আমার আপনাদের সাহিত্যিক জাতি ব'লে…

"আপনাদের কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে… আপনারা আমাদের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না। অবশ্য এখন রাজনীতির ভেতর দিয়ে বাংলা আর আসামের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে—কিন্তু সাহিত্যে অথবা আসামের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নয়। আমরা এত কাছে থেকেও এত পর! অবশ্য আমরা বাংলার অনেক কথা জানি, অনেক খবর রাখি, যা আপনারা আসামের জানেন না। একটা দেশকে জানতে গেলে তার সংস্কৃতি আর সাহিত্যই যথেষ্ট, তা নয় কি? আপনাদের বাংলার সে সব আমরা কিছু কিছু জানি। এ অভিযোগের উত্তরে আপনারা বলবেন, "তা তোমরা জানবেই—যেহেতু আমাদের বাংলা একটি উন্নতিশীল প্রদেশ—ভারতের মধ্যে বিখ্যাত। কিন্তু তোমাদের আসাম এমন কিছু বিখ্যাত নয় যে তার কথা সব আমাদের 'স্টাডি' করতে হবে।" এ অভিযোগ স্বীকার করি। কিন্তু লাগালাগি প্রদেশ হিসাবে আসামের যা জানা উচিত তা আপনারা জানেন না বা জানতেও চান না। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, অনেক বাঙালী আছে যারা আমাদের জানতে চায়, বুঝতে চায়, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আপনাদের সাহিত্যও আসামের কথা প্রচার করে না।"

এর কয়েকটি উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। চিঠিখানার বিষয় তোমাদের ভাল ক'রে ভেবে দেখতে বলি।

পূজো-সংখ্যা রামধনু আশ্বিনেরই ২৫ তারিখের মধ্যে

বার করবার চেষ্টা করছি,—একটু বর্দ্ধিত কলেবরে। কিন্তু যেন ক্রমেই দুর্লভ হয়ে পড়ছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নি
সবই নির্ভর করে 'কাগজ' পাওয়ার উপরে। ও জিনিষটি —রা

বন্দে মাতরম্।

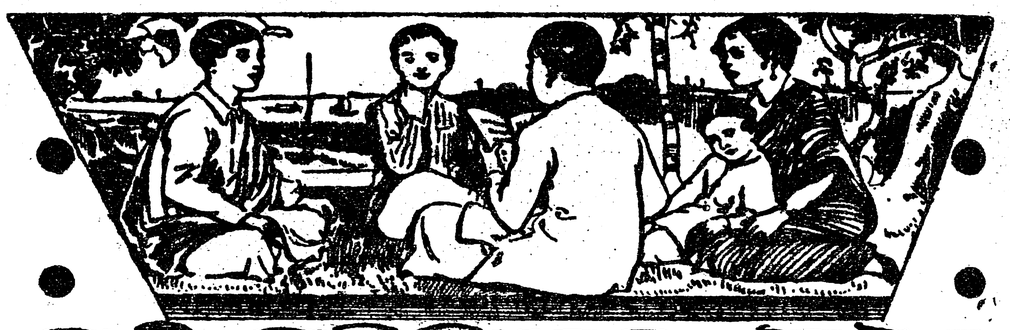

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

নূতন যুগের মাঝি

শ্রীতরুণকুমার সান্যাল

কা'র ইঙ্গিতে উঠিয়াছে ঝড়,
তাণ্ডব নাচে আজি,
সব অবহেলি' ধ'রে থাক হাল
নূতন যুগের মাঝি!
ডাকুক সমুখে গুরু গুরু বাজ,
ঢাকুক সূর্য্য আঁধারের মাঝ,
আসুক দুঃখ, দাও না আসিতে
দুঃসহ সাজে সাজি'।

ঘোর দুর্দ্দিন ঘনাবে হয়তো—
ভীম, দুর্যোগ রাতি,
করিও না ভয়—হবে হবে জয়,
সমুখে আশার বাতি।
বজ্রমুঠিতে ধরে থাক হাল,
নহে শাশ্বত এ নিশি ভয়াল,
তিমির রাত্রি ঘুচিবে—হেরিবে
নবীন সূর্য্যভাতি।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

আষাঢ় মাসের রামধনুতে প্রকাশিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতার (বিতর্ক প্রতিযোগিতার) ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :—১ম পুরস্কার—শ্রীঅসীম চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), ২য় পুরস্কার—শ্রীমতী তৃপ্তি দাশগুপ্ত (নিউ দিল্লী)। এঁরা ছাড়া শ্রীরণেনকুমার (কলিকাতা), শ্রীশিশির নাগ (কলিকাতা), শ্রীউৎপলা সরকার (পুরুলিয়া) শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া)—এঁদের বিতর্ক ভাল হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কয়েকটি অক্ষর এই ভাবে অদল বদল করতে হবে :—
ন, ী = ি, র = ব, জ = ে, অ = ক। লাইন ক'টা
হ'লে এই রকম হবে :—
অনেক দিন আগে আমাদের ভারতবর্ষে চন্দ্রমাণিক
ম এক রাজা ছিলেন। রাজার দুই পুত্র—বীরমাণিক
ীরমাণিক! বড় রাজপুত্র খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলেন,
টাটি যুদ্ধবিগ্রহের ধার ধারিতেন না, কবিতা লিখিতে
লেই খুসী।

উত্তরদাতাদের নাম :- মীরা, মণ্টু, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বরাহনগর); অসিতরঞ্জন সেন (কলিকাতা ২৯); নবেন্দু সেন (কলিকাতা); সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কালীঘাট); রাধাবিনোদ সুরাল (মেদিনীপুর); দেবী বিশ্বাস (বেলগাছিয়া); অর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); অজিত, সুজিত, জ্যোৎস্না, মীরা, উকি, ডলি (খুলনা); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা)।

নূতন ধাঁধা

খুঁজে বার কর :—
(১) পাখীর মধ্যে জাহাজ (২) মাঠের মধ্যে দানব
াধুর মধ্যে বীর (৪) জাতি বিশেষের মধ্যে শরীর
(৫) শরীরের অংশের মধ্যে লড়াই (৬) বইএর উপকরণের মধ্যে হাতী (৭) পুকুরের মধ্যে মৃতদেহ (৮) ফলের মধ্যে সময়।

যাঁদের মাণিক নিয়ে মেলা বসেছে—

আসছে পূজোয় ছোটদের বার্ষিক
মাণিক-মেলা
সম্পাদক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সুন্দরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়, গৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশাপূর্ণা , শ্রীসুব্রতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিরা দেবী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী, াসিরাশি দেবী, শ্রীগজেন্দ্রকুমার , শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযোগেন্দ্র , শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীধীরেন্দ্রলাল , শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীসুকুমার সরকার, শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, গুপ্ত, শ্রীমণি ঘোষাল, শ্রীঅনিল সরকার, শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য, শ্রীনরেন্দ্র মল্লিক, যাদুকর পি. সি. সরকার, শ্রীবিভূতিভূষণ ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীঅশোককুমার শাস্ত্রী, বনফুল, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক গুহ, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল ঘোষ, শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার, শ্রীঅসিত সেন, শ্রীদেবপ্রসাদ

এঁরা ছাড়া আরও অনেকে আছেন। দাম—৪৲

এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৩/১, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২

TIGHT BINDING

"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয় গান",—

যাদের আত্ম-বলির রক্তে মাখা দেশের মাটির উপর আজ
স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হলো,—
একদা-অবজ্ঞাত সেইসব শহীদের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে রচিত হয়েছে
আমাদের এ-বৎসরের পূজা-বার্ষিকী—**'দেশের মাটি'**
'দেশের মাটি'র পাতায়-পাতায় চিত্রে-কথায় কাব্যে-গাথায়
স্বাধীন-বাংলার বরেণ্য মনীষীবৃন্দ অশ্রুবিন্দুর যে মালা গেঁথেছেন
তার দিগন্ত-প্রসারী সৌরভে দেশ নূতন সম্ভাবনায় মেতে উঠবে !!

৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্ব-মায়ের)
আঁচল পাতা।"

—রবীন্দ্রনাথ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন—২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোষ্ট বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

=য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস=
প্রত্যেকখানি—এক টাকা

=সব্যসাচী বিরচিত=
১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার
১১। দরিদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন
১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৩। মিঃ গশ্‌ ডিটেক্‌টিভ

বুদ্ধদেব বসু
১৪। কাঁল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু
১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
২১। গ্রহের ফের
২২। রত্নতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল্‌, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

রেজিঃ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোনঃ-কলিঃ - ১৬০৬

[illegible]ষিক ৩৲ | কার্য্যালয় | প্রতি সংখ্যা ।৶০
[illegible]াসিক ১৷৷৵০ | ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। | ফোন্ ঃ সাউথ ১২৬

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ... ১৷৷০
সোনার হরিণ (ঐ) ... ১৷৷০
চায়ের শেঁায়া (গল্প) ... ৸০
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ... ৸৵০
নূতন পুরাণ (ঐ) ... ৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত

দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স্ ৷৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১৷৷০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ... ১৷০
বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ) ... ১৲
আবিষ্কারের গল্প ... ৸০
ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ... ৸০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ... ৸০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ... ৸০
ঐ ২য় ... ৸০

ভট্টচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

ভোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

রাঙা রাখি

মাতোয়ারা গল্প ! ঝরঝরে কবিতা !
উচ্ছল হাসি-ব্যঙ্গ ! অফুরন্ত চিত্র !

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

রাঙা হাতে 'রাঙারাখি' মানাইবে ভালো,
কোহিনুর-উপহার, ঝল্‌মলে আলো !

দেব সাহিত্য কুটীর
২২।৫ বি, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লিলি ব্র্যাণ্ড
বার্লি
স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও জন-কল্যাণে
লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি
তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব কার নাই।
তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার সমান আদর!
লিলি বিস্কুট কোম্পানী : কলিকাতা

রামধনু—

শ্রীঅরবিন্দ

দেশবন্ধু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পণ্ডিত মতিলাল

স্বাধীনতার দিনে যাঁরা স্মরণীয়—৩

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ
=য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস=
প্রত্যেকখানি—এক টাকা

=সব্যসাচী বিরচিত=
১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার
১১। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন
১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৩। মিঃ গশ্‌ ডিটেকটিভ

বুদ্ধদেব বসু
১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু
১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
২১। গ্রহের ফের
২২। রত্নতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল্‌, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫৪ | ৭ম সংখ্যা

বন্দে মাতরম্

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শৌর্য্যশোভিত, বঙ্কিম ঠামে
এস গো সিংহবাহিনি!
কেমনে অসুরে ›করিলে ধ্বংস
কহ আজি মা, সে কাহিনী।
এস গো বিশ্বমোহিনি!

এস মা, বঙ্গে, আজি এ ভঙ্গে
তুমিই শঙ্কাবারিণী,
আন গো সঙ্গে স্কন্দ গণেশ
অয়ি মা, আয়ুধধারিণি,
এস গো দৈত্যদারিণি!

স্বাধীন এ দেশ, তবু দীন বেশ,
এস মা, দৈন্যহারিণি,
আন ভারতীরে, আন কমলারে,
আন আন মাগো, তারিণি,
এস মঙ্গলকারিণি!

উভয় বঙ্গ বরিছে তোমা
এস এস রণরঙ্গিণি,
দাও মা, সাহস, শক্তি, শা
রহিয়া সতত সঙ্গিনী,
ওগো বঙ্কিমভঙ্গিনি!

এস গো জননি, স্বাগতম্,
এস গো, বন্দে মাতরম্।

একটি স্বর্ণসন্ধ্যা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বালেশ্বর জেলার পূর্ব্বাংশে একটি ছোট বন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হ'ল একদিন হঠাৎ রিভলভার ও রাইফেলের রুক্ষ শব্দে বনভূমিটি সচকিত হয়ে ওঠে। সেই খণ্ডযুদ্ধটি ঘটেছিল মাত্র পাঁচজন বাঙালি যুবক ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে।

সে কাহিনী বাঙালি সযত্নে মনে রেখেছে! যুবক পাঁচটির নাম সগর্ব্বে উচ্চারণ করে।

বলতে লজ্জা নেই, বরং গৌরবে মন ওঠে ভরে, যে, তারা পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পারে নি; পারবার কথাও নয়। কারণ তারা ছিল মাত্র পাঁচজন, সম্বল ছিল পাঁচটি রিভলভার, গুলি-বারুদের সঞ্চয়ও ছিল সামান্য। রাইফেলের বিরুদ্ধে, বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে সেই স্বল্পাহার-ক্লিষ্ট, ক্লান্ত ক্ষুদ্র দল, ক্ষুদ্র অস্ত্র কতক্ষণ লড়তে পারে? তবুও তারা পালায় নি, রিভলভারের শেষ গুলিটিও শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যয় করেছিল; নিজেদের প্রাণ নিঃশেষে দান করে দেশ ও বনভূমিটিকে ধন্য ও পবিত্র করে গেছে। দেশের মাটিতে রক্তাক্ষরে লিখে রেখে গেছে মানুষের সব চেয়ে বড় অধিকার—স্বাধীনতা ও তার যুদ্ধের মহান্ কাহিনী।

তাদের, বাঙলার সেই অগ্নিযুগের মুক্তিপাগল বাঙালি-ছেলেদের ভয়ে ইংরেজ-সরকার সারা হচ্ছিল। তাদের প্রতাপে ও কাজে পুলিশ শঙ্কিত ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাদের ধ্বংস করবার সে কি আয়োজন! ওই পাঁচটির নামে বেরিয়েছিল পুলিশের হুলিয়া। ধরা না দিয়ে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেশে জায়গায়, নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করে। চারধারে ঘৃণ্য গুপ্তচর। তারা তাদের সন্ধান পেল ওই তারপর—

তারপর ওই খণ্ডযুদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতা সুবৃহৎ ইতিবৃত্তের আর একখানি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা লিখিত হ'ল।

ছোট নদীটির তীরে—বরি বালাম—সেই ব আজও আছে; তার সীমান্তে আছে সেই ছোট আর আছে সেই কাহিনী। শিলাভারও ক্ষয়িষ্ণু কাহিনী অক্ষয়।

পাঁচজনের সেই ক্ষুদ্র দলটির যিনি ছিলেন মনে পড়ছে তাঁর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সৌম্য-মূর্ত্তি দেখি, পথ দিয়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে আসছেন। বেশ—ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবি, কিন্তু পায়ে বুট সে পা দু'খানিতে বুট ছাড়া আর যেন কিছু মানা না।

স্মৃতিপটে শৈশবের বহু ছবি প্রায় মুছে এসেছে, কয়েকখানি আজও আছে উজ্জ্বল।

সেদিন—

...তিনি এসেছেন আর এক বিপ্লবীর, সন্ত্রাসবাদীর গৃহে। ...নি এলেই, তাঁকে দেখলেই, বালক ও যুবকমহল চঞ্চল ...ওঠে, তাদের মনে বল ও আশার স্ফুরণ হয়; শঙ্কিত ...পুলিশ। গুপ্তচর তো জুতোর তলার কাদার মতো তাঁর ...সঙ্গে ফেরে।

...যাঁর গৃহে তিনি এসেছিলেন, সে বিপ্লবী আজও জীবিত, ...কিন্তু বহুকাল সংসারাশ্রম ত্যাগী, দেশের এক শ্রেষ্ঠ ...ব্রায়তনে কর্ম্মী হয়ে নরনারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ ...রছেন।

...তাঁদের গৃহখানিকে মনে আছে। খোলার বাংলো। ...লের খোলাগুলি চূণ-বালি দিয়ে ঢাকা; গৃহের সামনে-...তরে ঢাকা বারান্দা, দু'পাশে চারখানি ও মাঝে এক ...নি নাতিদীর্ঘ হল্-ঘর। গৃহের সামনে একটু বাঁধানো ...তাল; তারপর বসবার বেদি। বেদির পরই ফুলের ...গান। বেদিটির পাশে একটি ঝাঁকড়া হাসনুহানা ...হ। বাগানের মেহেদি বেড়ার কোল বরাবর সুপারি-...ছের সারি। বেড়ার পর অপরিসর রাস্তাটি। তার ...প্রান্ত শেষ হয়েছে গড়ইয়ের তীরে, আর এক প্রান্ত ...য়ে মিশেছে বড় রাস্তায়।

সেদিন গোধূলির স্বর্ণরেণু আকাশে মিলিয়ে গিয়ে ...য়লো যেন স্বর্ণসন্ধ্যা। ওই হল্-ঘরে বসলো আনন্দের ...ট। বালক ও যুবকে ঘর-বারান্দা ভরে গেছে। তিনি ...টি ছোট গল্পে, কথায় ও 'কমিকে' প্রচুর হাস্যরস ...রণ করছেন। কে তখন দেখে বলবে, তিনি বিপ্লবী-...ক? এক একবার মনে হচ্ছে, ঘরখানি বুঝি হাসিতে ...টে চৌচির হয়ে যাবে, ছাদটা যাবে উড়ে।

একবার দেখালেন, এক ভক্ত শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন ...র দেশে ফিরে সকলকে দেখাচ্ছে, জগন্নাথ-মূর্ত্তি কেমন। ...শ্চর্য্য তাঁর অনুকরণ-শক্তি! পটে জগন্নাথের যে মূর্ত্তি ...খেছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, সেই মূর্ত্তিই যেন সজীব ...র পট থেকে নেমে এসেছে।

আর একবার দেখালেন, ভোজে ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণের রসগোল্লার পর রসগোল্লা ভক্ষণ! গায়ের জামা খুলে, চাদরখানি গায়ে ও কাঁধে পেঁচিয়ে, কচ্ছটিতে পাক দিয়ে, উদর যথাসম্ভব ফুলিয়ে ভোজনবিলাসী সাজলেন। সেই বেশ দেখেই উঠলো হাসির হিল্লোল। তারপর বসে আরম্ভ হ'ল ভোজন। বাম হাতের তর্জ্জনী অনবরত ইঙ্গিতে জানাচ্ছে—"দাও"; দক্ষিণ হাত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উঠছে মুখে। তারপর এক ঘটি জল পান। জল ঘটি থেকে সশব্দে কণ্ঠনালীতে পড়ে সরবে "উদর নামক মহা গহ্বরে" নেমে চলেছে। তারপর পরিতৃপ্তির সুদীর্ঘ উদ্গার।

একবার, বোধ হয় বাহু দু'টির শক্তি দেখাতে, এক একজনের দু'টি বাহুমূল ধরে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো করে শূন্যে মাথার ওপর তুলে আলগোচে মেঝেয় নামিয়ে রাখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চললো এমনি খেলা। কিছুক্ষণ!

তারপর হঠাৎ এল গাম্ভীর্য্য নেমে। যুবকদের কারো কারো সঙ্গে অনুচ্চ কণ্ঠে বালকদের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কোন গুরুতর বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু কথায়, আকারে, ইঙ্গিতে এতটুকু উত্তেজনা নেই। শান্ত, ধীর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, মুখখানি স্মিতহাস্যে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বালক ও যুবকেরা মহানন্দে তাঁর চার ধারে ঘুরছে, তাঁকে, তাদের 'যতীদাকে' সগর্ব্বে দেখছে। তাঁর, পুলিশের যতীন মুখুয্যের, বজ্রমুষ্টির আঘাতে যে 'সাহেব' মাথা নোয়ায়, সর্ব্বশক্তিমান্ পুলিশও যে তাঁর ভয়ে কাঁপে! বনের হিংস্র বাঘও একদিন তাঁর সবল বাহুর আঘাত যে সইতে পারবে না, এ কথা যদি তখন তাদের জানা থাকতো তা হ'লে তারা কি করতো কে জানে!

আজ ভারতের পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল মোচনের ঝনৎকার উঠছে। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে মুক্তি-পাগল বাঙালি-ছেলেদেরই জয়ধ্বনি, যারা অগ্নিযুগের অনলে "নিঃশেষে প্রাণ করে গেল দান—"

নিস্তারিণী পিসিমার সত্য কাহিনী

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ

যারা রামধনু পড়ে তাদের কারুর সঙ্গেই বোধ হয় আমার নিস্তারিণী পিসিমার পরিচয় নেই, কিন্তু সেই জন্য বিশেষ আক্ষেপেরও কোনও কারণ নেই। কারণ আমি তাঁর নিজের খুড়তুত ভাইঝি হ'য়েও বল্‌ছি যে তাঁকে যারা চেনে তার চেয়ে তাঁকে যারা চেনে না, তারা ঢের বেশী সুখী। কিন্তু তাই বলে যেন আবার কেউ মনে না করে যে আমার নিস্তারিণী পিসিমার কোনও গুণই নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তিনি বহুগুণ-সম্পন্না, এবং এ কথা কেবল আমি একলা বলি না; তিনি নিজে এবং পিসেমশাইও এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এবং পিসিমা বার বার বলেন, "কেউ যদি কখনও আমার মধ্যে কোনও দোষ দেখে থাক, সাহস থাকে ত' মুখের সাম্নে বল দিকি নি!"

কেউ একটি কথাও বলে না, এবং তার ফলে নিস্তারিণী পিসিমার এ ধারণাও দৃঢ় হয়ে গেছে যে দোষ-টোষ তাঁর বিশেষ দেখা যায় না। তবে বিনয় জিনিষটা যে তাঁর একেবারে নেই তাও নয়। বার বার বলেন, "বলতে হ'ল বলে কথাগুলো বল্লাম, কিছু মনে কর না বাছা। অন্যায় আমি মোটে সইতে পারি না, ঐ আমার একটি বড় দোষ!"

এই নিস্তারিণী পিসিমার বাড়িতে একবার পূজোর সময়ে গিয়েছিলাম। নিস্তারিণী পিসিমা তিন মাসের জন্য রাঁচিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। পিসেমশাইও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হলেন গিয়ে প্রণম্য গুরুজন, ইচ্ছা থাকলেও তাঁকে দিয়ে পাকা চুল তোলান বা পা টেপান ভালো দেখায় না ব'লে পিসিমা আমার মার কাছে এসে বার বার পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন। "মেয়েটাকে আমার সঙ্গে দে না বৌ! অমন কড়া ব্যামো থেকে উঠ্‌ল, ওর একটু হাওয়া বদ্‌লান দরকার। আমার সঙ্গে গেলে শরীরও সেরে যাবে, নজরে নজরেও থাকবে। দেখিস্ তিন মাসে কেমন কাজের মেয়ে হ'য়ে ওঠে।"

যে কারণেই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত মা আমাকে নিস্তারিণী পিসিমার সঙ্গে রাঁচি পাঠালেন। তখন আমার ষোল বছর বয়স ছিল, কোথাও একটা যেতে পারলেই [...] হ'ত। কাজেই আমি নিজেও কোনও আপত্তি ক[...]

ষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম নিস্তারিণী পিসিমা তাঁর [...] সংসারটাকে তুলে এনে প্ল্যাটফর্মের উপর ঢেলে[...] ওরে বাবা! অত বাক্স, প্যাঁটরা, থলে, পোঁটলা, মু[...] বালটি, সতরঞ্চি মোড়া বিছানা, প্যাকিং কেস, [...] ক্যারিয়র, বেতের ঝুড়ি, তরকারির টুকরি, ধামা, [...] জন্মে কখনও আমি একসঙ্গে এক জায়গায় দেখি[...] এমন কি একটা গাম্‌লায় চড়িয়ে পিসিমা দেখলাম [...] পোষা পাতিহাঁস দু'টোকে পর্য্যন্ত এনেছেন।

আমি এসে আমার ছোট্ট বিছানা আর তার [...] ছোট্ট সুটকেস নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। পি[...] দেখলাম চক্‌চকে বোতাম আঁটা, সাদা কোট পে[...] পরা, কালো ফিতে লাগান সাদা টুপি মাথায় একটা [...] কোম্পানীর লোকের সঙ্গে বিষম ঝগড়া কর[...] লোকটা বার বার বলছে—"দেখুন, তা কি কখনও [...] এত জিনিষ নিয়ে একটা গাড়ীতে উঠলে প্যাসেঞ্জার [...] কোথায়? কতক কর্ত্তক ব্রেকে দিন না।" তাই [...] পিসিমা হাত-পাখা শুদ্ধ হাত নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, [...] তোমরা বাছারা সেই সুযোগে আমার অত [...] জিনিষগুলো মেরে দাও আর কি! আমি জানি [...] এই ত' বছর দশেক আগে সেবার কাশী যাবার [...] তোমাদের বিশ্বাস করে আমের ঝুড়ি দিই নি গা[...] গাড়ীতে? কাশী গিয়ে দেখি তিনটে আম কম।"

পিসেমশাই এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার আঁকু[...] করে ছুটে এসে বল্লেন, "না গো, ওঁদের কেন মিছি[...] দোষ দিচ্ছ? সে আম তিনটে আমি আর [...] খেয়েছিলাম। ওঁদের কোন দোষ ছিল না।"

নিস্তারিপী পিসিমা পিসেমশাইএর দিকে ফিরে হি[...] মত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তুমি কেন এর মধ্যে [...] ঢোকাচ্ছ বল ত'? ব্যাটা ছেলে ব্যাটা ছেলের মত থা[...] এসব ব্যাপারে তোমার সেঁদোবার ত' প্রয়োজন নে[...] পিসেমশাই ঢোক গিলে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগ[...]

[...] পাগল না কি! ও লোকটা কখনও পারে নিস্তারিণী [...]সিমার সঙ্গে? খানিক বাদেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে [...]লেন।

[...] আর পিসিমা, আমি আর গোটা সাতেক কুলি জিনিষ-[...] টেনে হেঁচড়ে গাড়ীতে তুল্লাম। কুলিদের বিদায় করে [...] জিনিষপত্র যথাসম্ভব গুছিয়ে রেখে আমরা ত' বসলাম! [...]সেমশাই বিনা বাক্যব্যয়ে এক কোণায় পা ঝুলিয়ে বসে [...]লেন। এতক্ষণে দেখলাম পিসিমার বামুন ঠাকুর [...]রাও আছে। তা ছাড়া একজন আধাবয়েসী ভদ্রলোক [...] কোণে গুটিশুটি বসে রয়েছেন; সঙ্গে হাঁটু অবধি [...]মটা টেনে তাঁর গিন্নীও আছেন।

[...] নিস্তারিণী পিসিমা আমার কানে কানে সজোরে [...] ফিস করে বল্লেন, "এত জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি, কী জানি, [...]মি ত' সুবিধা বুঝছি না!" তাই শুনে ভদ্রলোক আরও [...]সড় হয়ে বসলেন, কিন্তু তাঁর গিন্নীটি ঘোমটা তুলে [...] পাকিয়ে বল্লেন—"কার কথা বলছেন?" পিসিমা [...] শুনতেই পেলেন না। শঙ্করাকে বল্লেন, "তুই বাবা, [...]বার সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমুস নি যেন। একটু [...]খটোখ রাখিস। সবই ত' জানিস!" শঙ্করারও গোল [...] আরো গোল হয়ে গেল—সে আবার বল্লে, "সেটি [...]মি পারিব না মা। আমার ত' এখনই ঘুম ধরি গিলা।" [...] পিসিমা পিসেমশাইএর দিকে তাকালেন। পিসেমশাই [...]তো পায় দিয়েই দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন। [...]তাতাড়িতে বগলের ছতাটিকে অবধি নামিয়ে রাখতে [...] গেলেন। অগত্যা নিস্তারিণী পিসিমা আমাকে বল্লেন, [...] বাপু ছেলেমানুষ! তোর নিশ্চয় ট্রেনের হট্টগোলে [...] পায় না। তুই বাপু, জিনিষগুলো আগলাস; আমার [...]বার না শুলে ফিক্ ব্যথা ধরে।" বলে নিস্তারিণী [...]সিমা দিব্যি বিছানা পেতে আপাদমস্তক কাপড় ঢাকা [...] নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

[...] চেয়ে দেখলাম সেই অন্য ভদ্রলোকটি খচমচ করে উপরে [...] শুচ্ছেন, তাঁর স্ত্রীটি নিচেই শুলেন। আবার ঘোম্‌টা [...] আমাকে ঠেস্ দিয়ে বল্লেন, "তা বাছা, পাহারাতেই [...] থাকলে, আমার জিনিষগুলোর ওপরও একটু নজর [...]। আমিও বিশেষ সুবিধে দেখ্‌ছি না।"

তার পর যে যার ঘুমিয়ে পড়ল। আর আমি রইলাম জেগে। ট্রেনে কখনও একা রাত জেগেছো? যে ট্রেনে এত কম আলো যে বই পড়া যায় না, তা'তে কখনও রাত জাগতে চেষ্টা করেছো? আমার চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল। অসীম ক্লান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে এল। ট্রেনের দোলায় আমার সর্ব্ব দেহমন ঘুমে আচ্ছন্ন হতে লাগল। প্রতেকটি শব্দ যেন কী রকম অস্বাভাবিক শোনাতে লাগল—প্রত্যেকটি ছায়া যেন বিরাট আকার ধারণ করে, আমার চেতনাকে গ্রাস করতে প্রয়াস পেতে লাগল। হঠাৎ আমি চকিত হ'য়ে জেগে গেলাম। নিমেষের মধ্যে আমার চোখ থেকে ও সমস্ত চেতনা থেকে নিদ্রা অপসারিত হ'ল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম অতি সন্তর্পণে কে দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। গাড়ী তখন বেগে চলছে। গাড়ীর মধ্যে সবাই তখন নিদ্রামগ্ন। একা আমি জেগে। কেউ যে বাইরে থেকে দরজা খুলতে চেষ্টা করছে সে বিষয়ে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ রইল না। তার ঘন ঘন নিশ্বাস পর্য্যন্ত শুনতে পেলাম। আমার গায়ের রক্ত হিম হ'য়ে গেল, হাত-পা-গুলো পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। কোনও রকমে উঠে গিয়ে নিস্তারিণী পিসিমাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম। "ও পিসিমা, ওঠ! ওঠ! শোন কে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে।" নিস্তারিণী পিসিমা একেবারে সজাগ হয়ে উঠে বসলেন। কোনও কথা না বলে কান পেতে খানিক শুনলেন। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম কাউকে ডাকলেন না। গাড়ীতে তিন তিন জন পুরুষ মানুষ রয়েছে। নিস্তারিণী পিসিমাকে বল্লাম, "ওদের তুলি?" তিনি কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লেন—"বিপদের সময় কখনও পুরুষ মানুষদের উপর নির্ভর করতে নেই, ছেলেমানুষ বলে সে কথা এখনও বোঝ নি।"

সেকালের সেই সব বীরাঙ্গনাদের মত নিস্তারিণী পিসিমা প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাতি হাঁসের গামলাটাকে কাছে টেনে আনলেন। আমিও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে পিসেমশাইএর বগল থেকে ছাতা টেনে নিয়ে সেটা মাথার উপর উঁচিয়ে ধরে পিসিমার আড়ালে দাঁড়িয়ে রেডি হয়ে রইলাম। যা' থাকে কপালে দু' ঘা ত' লাগাব আগে। আমার গায়েও বীরাঙ্গনাদের রক্ত আছে টের পেলাম।

ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। মিথ্যা কথা বলব না, খোঁচা গোঁফ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই নি। লোকটা গাড়ীর মধ্যে নাক ঢোকাবা মাত্র পিসিমা তার মুখের উপর পর পর দু'টো হাঁস ছুঁড়ে মারলেন। হাঁসগুলোও ডানা ঝাপ্‌টে প্যাক্ প্যাক্ করে উঠলো, লোকটাও হকচকিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ছেড়ে দিয়ে গাড়ী থেকে পড়েই গেল! গোলমালের মধ্যে আমি ভুলে শঙ্করার গায়েই ছাতার বাড়ি বসিয়েছিলাম বলতে ভুলে গেছি।

ততক্ষণে গণ্ডগোলে সবাই জেগে গেছে, পিসিমার উপস্থিত-বুদ্ধি আর সাহস দেখে সবাই থ'! সেই লোকের স্ত্রী ত' পিসিমার পায়ের ধূলো নিয়ে ছাড়লেন।

হঠাৎ পিসিমা—"ও বাবা গো, তুমি কি রকম মানুষ যে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পার না!" হাত-পা ছুঁড়ে পিসেমশাইকে হাঁকড়ে পাকড়ে ধরে মূর্চ্ছা গেলেন। আমরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখি নেংটে ইঁদুরের বাচ্ছা পিসিমার পায়ের কাছ থেকে যেন খুঁটে খাচ্ছে!

জার্মানীর স্মৃতি

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

হিটলারকে আমি দেখেছি কবে?

১৯৩৬ সন। জার্মান্ জাতির উপর হিটলারের প্রতাপ তখন অতি প্রবল। জার্মানীতে বসে তাঁর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করতে পাবার যো নেই। কেউ কোনরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছে তো তার পিছে হিটলারের পুলিশ-বিভাগের গুপ্তচর ফেউ লেগেছে।

বার্লিনে অলিম্পিকের খেলা হচ্ছে। পৃথিবীশুদ্ধ লোক গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সহরটীর উপর। অত বড় সহর, কিন্তু কি সুন্দর ব্যবস্থা! রাস্তায় রাস্তায় কোন বিদেশী রাস্তা ভুল করে অনর্থক ঘুরে বেড়ায় না। বহু দোভাষী রাস্তায় রাস্তায় চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। কোন বিদেশীকে দেখলে তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। রাস্তায় হ'লে একত্রে এত বিদেশী ইউরোপে আর কোথাও কখনও দেখি নি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সহর,—লম্বা লম্বা ও চওড়া রাস্তা সেখানকার মানুষগুলি ভারী স্ফূর্ত্তিবাজ ও আমুদে। রাস্তায় ফুটপাথের উপর বহু রেষ্টুরেণ্ট। সেগুলির দিক্ খোলা, খালি মাথার উপর একটা চাল। রেষ্টুরেণ্টে বসে গাড়ী ও রাস্তার লোকজনের চলাফেরা দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু বার্লিন সহরের নিজস্ব কোন বিশেষত্ব নেই। কারণ, বার্লিনের মত সুন্দর

ীতে বহু। যেমন মিউনিখ্, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ন্যুর্ণবার্গ, া, ভাইমার ইত্যাদি প্রতি সহরই খুব পরিষ্কার, ও জানুলাভের উপযোগী। জার্মানীর বড় বড় লি বিদ্যোৎসাহী মানুষদের পক্ষে ভারী লোভনীয়।

ার্লিনে কবি লেসীংএর বাড়ী দেখে ই। পথে দেখি বার্লিনের সব চাইতে রাস্তা 'উনটার্ ডেন্ লিনডেন'-এর খের দুই ধারে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে। কৌতূহল হ'ল—জানবার জন্য কিসের এ ভীড়। একজন লোককে জিজ্ঞাসা সে উত্তর দিল, "আমাদের নেতা এই দিয়ে যাবেন।" মনে বহুদিনের ছিল ঐ দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, পৃথিবী-াত ব্যক্তিটীকে দেখবার। তাই ও ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম।

সেদিন ছিল রাজনীতি বিষয়ক কোন বের দিন। বার্লিনের একটী খোলা ায় লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে আছে ারের বক্তৃতা শোনবার জন্যে। সেই খোলা া থেকে "উনটার ডেন লিন্‌ডেন্" বেরিয়েছে। ঐ রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত দুই ধারে মাইক্রোফোন না, যাতে এক সঙ্গে বহুলোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ত পারে। হিটলারের বক্তৃতা সুরু হ'ল। বজ্রের গম্ভীর স্বর। গলার স্বর একবার সপ্তমে ওঠে আবার ম, আবার ওঠে, আবার নামে। শ্রোতার মনকে র্ণ করার ক্ষমতা বক্তার আছে বলে মনে হ'ল। বক্তৃতাটীর ভিতর সার কথা বিশেষ ছিল না। র ভাগই গালাগালিতে পূর্ণ,—কখনও ইংলণ্ড, ফরাসী াশিয়াকে উদ্দেশ করে, কখনও ইহুদীদের উদ্দেশ করে। াড়া তাঁর বক্তৃতার ভিতর পাওয়া গেল শ্রোতাদের ঢ়ভাবে বিশ্বাস জাগাবার চেষ্টা করা যে জার্মান্‌রাই ার শ্রেষ্ঠ জাতি।

বক্তৃতা থামল। জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীত সুরু হ'ল। াম জাতীয় সঙ্গীত শেষ হ'লে মিটিং আজকের মত হবে। তার পর কানে এল, দূর থেকে বহুলোক র্জিত ভাবে সমকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে, "সিগ্ হাইল্", "সিগ্ হাইল্" (বাংলা ভাষায় "জয় হোক", "জয় হোক") বুঝলাম, নেতাটি মিটিং শেষ করে ফিরছেন। ক্রমশঃ সে স্বর জোরে শোনা যেতে লাগল। তার পর সুরু হ'ল আমারই আশেপাশে লোকেদের মুখে।

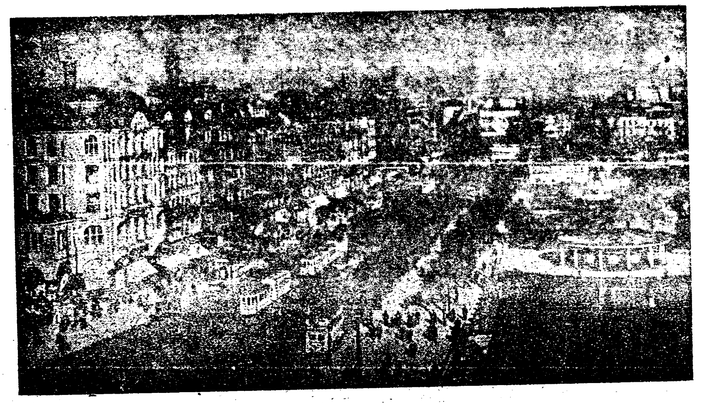

যুদ্ধপূর্ব্ব জার্মানীর একটি সহরের দৃশ্য

একটা চক্‌চকে মোটর গাড়ী। তার উপর দাঁড়িয়ে ডান হাতটা সম্মুখে টান টান করে দাঁড়িয়ে আছেন আডল্‌ফ্ হিটলার।* মানুষটী দেখতে না বেঁটে, না লম্বা। গঠন বেশ হৃষ্টপুষ্ট। নাকের ঠিক নীচে এক গোছা গোঁফ। মুখে চোখে অদ্ভুত দীপ্তি ও গর্ব্বের ছাপ—চেহারা দেখলেই মনে হয় সহস্র লোকের উপর নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা লোকটীর থাকতে পারে। পরনে মিলিটারী পোষাক। মানুষটী রাস্তার দুই পাশের লোকের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে কপালের উপর নেমে পড়া এক গোছা চুল মাথার উপর তুলে দিচ্ছেন। সে হাসির একটা বিশেষত্ব আছে। সে হাসি গান্ধী অথবা রোমাঁ রোল্যাঁর মত সরলতা-মাখা হাসি নয়, ষ্ট্যালিন অথবা রুসভেল্টের মত প্রাণ-খোলা হাসিও নয়। সে হাসির ভিতর অদ্ভুত একটা গাম্ভীর্য্যের রেশ দেখতে পাওয়া যায়।

* আমরা যেমন রাস্তায় পরস্পরে দেখা হ'লে নমস্কার করি, হিটলারের জার্মানীতে দু'জনে দেখা হ'লে সে স্থলে ডান হাতটা সামনে টান টান ক'রে ধ'রে মুখে বল্‌ত, "হাইল হিটলার"—অর্থাৎ হিটলারের জয় হোক।

হিটলারের মোটরের আগে আগে গেল বহু মোটর বাইক, ট্যাঙ্ক, কামান ও যুদ্ধে যে সব গাড়ী ব্যবহৃত হয় সেই ধরণের বহু গাড়ী । আকাশে উড়ছে শত শত এরোপ্লেন।

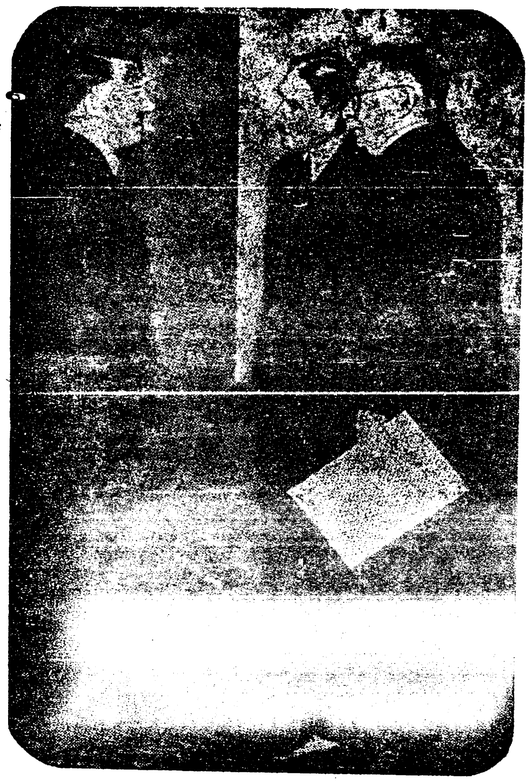

হিটলার দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করছেন

এ ছাড়া তার আগে আগে ও পরে গেল বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য, যুবকের দল, যুবতীর দল, কিশোর ও কিশোরীর দল তাদের আপন আপন সংঘের পোষাক প'রে। একদিকে এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্কের শব্দ, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের অভিনন্দন-ধ্বনি,—এর ভিতর মানুষটীকে দেখে আরও বিরাট মনে হচ্ছিল।

হিটলার চলে গেলে আমার পার্শ্ববর্ত্তী একজন আমাকে অতি উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করল, "... আমাদের নেতাকে ?" বললুম, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

লোকটি তেমনি উৎসাহের সঙ্গে বলল—"এমন নেতা জার্ম্মানরা পূর্ব্বে কখনও পায় নি। আমাদের ... একজন আদর্শ মানুষ।"

একটু হেসে বললাম,—"আদর্শ মানুষ নাকি ?"

"বলুন কি দোষ আছে তাঁর ? তিনি দেশের ... জীবন উৎসর্গ ক'রে বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নি। ... জার্ম্মান্ জাতিকে পৃথিবীর সম্মুখে এত উঁচু ক'রে ... নেতাই পূর্ব্বে ধরতে পারেন নি।"

জার্ম্মানীতে বসে হিটলারের নিন্দা করতে পা... না। আমি শুধু বললাম, "আমার কিন্তু ধারণা ... কোন জাতিই আদর্শ প্রণালীতে দেশ শাসন করছে ... আপনারা কি বলতে চান, দেশের প্রত্যেক অ... সুবিধা-অসুবিধা আপনারা দেখছেন ?"

লোকটী বলল, "আপনি কি ইহুদীদের কথা ব... তারা তো আসলে জার্ম্মান্ নয়। তারা তো প্যালে... মানুষ।"

ইহুদী-প্রসঙ্গ শোনা কোনও জার্ম্মানের পক্ষেই ... নয় ও কোন বিদেশীর পক্ষে ঐ **প্রসঙ্গ** নিয়ে হিটলা... জার্ম্মানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাও নিরাপদ ... তাই আমি ঐ প্রসঙ্গ থামাতে চাইলাম। এমন ... একটি ছোট ছেলে—সে এতক্ষণ লোকটার হাত ... দাঁড়িয়ে ছিল, খুব কৌতূহলী হয়ে বলে উঠল, "V... Vater, ein Negar geht da !" (বাবা, বাবা, একজন নিগ্রো যাচ্ছে !) নিগ্রোদের ও কৃষ্ণবর্ণ মা... জার্ম্মান্‌রা ঘৃণার চোখে দেখে এ কথা জানতাম। আমি বললাম, "তা হলে দেখুন, আপনাদের চোখে ... ইহুদীরাই ঘৃণ্য নয়,—কালো লোকরাও।"

ভদ্রলোক আমার কথার উত্তর দেবেন, না ... কথার উত্তর দেবেন হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলেন না। ... পরেও আমাকে তাঁর কিছু বলার ছিল কি না জানি ... তবে যদি আমাকে খুঁজে থাকেন তো বিফল হ... কারণ কথাটা বলেই আমি ভীড়ের সঙ্গে মিশে গেছি...

বারো

— কলকাতার সেরা ছেলের দল —

নন্দ লোকজনের ভিড় ঠেলে বাড়ির ভিতর গিয়ে ...কে। রান্নাঘর ও তার চারপাশের নীচের ও উপরের ...র, বারান্দা প্রভৃতির পুড়ে যাওয়ার নানা চিহ্ন দেখতে ...ল। ওর নিজের ঘরটির কোন ক্ষতি হয় নি, সেখানে ...খনও শুকনো ফুল ও লতাপাতার মালা সব ঝুলছে। ...রে ঢুকতেই দেখে কুড়িটি ছেলে মেঝেতে চুপ করে বসে, ...লে মাথায় হাত দিয়ে। তাকে নজরে পড়তেই সসম্ভ্রমে ...াড়িয়ে ওঠে।

ওদের চোখের সামনে দেখেই নন্দর মাথায় যেন আগুন ...লে গেল। অসুখ থেকে ওঠবার পর থেকে ওঁর হাতে ...কটি লাঠি থাকতো কোথাও যাবার আসবার সময়। ...সেই লাঠি তুলে সপাসপ্ চালাতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে ...পরোয়া। কার শরীরের কোন অংশে লাগছে ও ...তখানি লাগছে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করলে না। পাগলের ...তন খানিকটা লাঠি চালাবার পর হঠাৎ মনে হয় একটি ...থা। কই, শয়তান ছেলেরা ত' কোন রকম বাধা দিচ্ছে ...না!—আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে না এতটুকু ! দাঁড়িয়ে ...থা পেতে মার খেয়ে যাচ্ছে নির্বিকার ভাবে !

ওদের ভাব দেখে মনে হয় এই মার যেন ওদের ন্যায্য ...াওনা উচিত শাস্তি, যেন চুপ করে আরো মার খেতে ...য় কোন রকম অভিযোগ না জানিয়ে। হ'ল কি ? ...র নিজের কোথাও গলতি হচ্ছে না ত' ?

সে মার থামিয়ে দেখে ছেলেরা এবারে কাঁদছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এতটুকু শব্দ হচ্ছে না, শুধু চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে ঝরে ঝরে পড়ছে টুপ টুপ। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল সে। অমন দুরন্ত, ডানপিটে ছেলেরা ত' কাঁদে না, তবে এরা কাঁদছে কেন ? আর এ কান্না মারের জ্বালায় শরীরের যন্ত্রণার ত' নয়, এ যে অন্য রকমের কান্না ! মনে হ'ল এ কান্না যেন দুঃখের কান্না, হতাশার কান্না, অনেক কিছু আশা করে, চেষ্টা করে যখন সব ব্যর্থ হয়ে যায় তখনকার গভীর মনস্তাপের কান্না !

নন্দর মনকে একটা গভীর দুঃখ সবেগে নাড়া দিয়ে দিলে। ওদের কাছে গিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কি হয়েছে রে ? কিসের দুঃখ, কিসের হতাশা তোদের ?

আরো কেঁদে ফেলে সকলে ঝর ঝর ক'রে আকুল ভাবে। কিছুক্ষণ মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিতে তবে ওরা ঠাণ্ডা হয়। তার পর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে যায় ওদের কথা। এই প্রথম ছেলেরা মন খুলে দরদের সংগে নিজেদের কথা বলে গেল।

কত উৎসাহে কত আয়োজন করা হয়েছিল তাকে খুশি করবার জন্যে, তাকে আনন্দ দেবার জন্যে—সে সবের বিবরণ শুনতে শুনতে নন্দরও চোখে জল এসে যায়।

আজ প্রথম বুঝলে যে এরাও মানুষ, অন্যদের চেয়ে কিছু মাত্র'কম নয়। পৃথিবী এদের দুরন্ত, ডানপিটে, দুষ্টু বলেই

জানে, তার বেশী বুঝতে চায় না, বোঝবার চেষ্টা করে না। এদের বুদ্ধি খুব প্রবল তাই সেই অনাদরের শোধ নেয় শয়তানি করে, মানুষদের জ্বালিয়ে, গড়া জিনিষ সব ভেঙে তছনছ করে। অথচ এদের ভালবাসলে, এদের উপযুক্ত মূল্য স্বীকার করলে, এদের ওপর কাজের দায়িত্বের ভার চাপিয়ে দিলে, সব কিছুই করতে পারে এরা।

ঝুড়িতে আগুন ছেলেরা ইচ্ছা করে লাগায় নি, তা অকস্মাৎ ঘটে গিছলো কোন-না-কোন উপায়ে। জলন্ত উনানের চারপাশে সকলে শুয়ে-বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল চাদর-কম্বল মুড়ি দিয়ে। শীতের রাতে উত্তাপের আরামে কেউ কেউ হয়তো খুব কাছে সরে গিছলো বা, তার থেকেই এই অঘটন ঘটে গেছে হঠাৎ।

নন্দ আদর করে বুঝিয়ে ওদের শান্ত করে ওদের মনের জ্বালা ঘুচিয়ে দেয়। আর বার বার বলে, না, ওদের ছেড়ে সে চলে যাবে না কিছুতেই। ওদের নিয়েই সে গড়ে তুলবে একটি কোন সুন্দর প্রতিষ্ঠান—যাতে করে দেশের হবে উপকার, মানুষদের হবে ভাল।

এক বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান কলকাতার কাছেই যাদবপুরে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হয় যে কানাই বাবুর প্রাণান্ত চেষ্টা ছাড়া এ সম্ভব হ'ত না কোন দিন। এক প্রকাণ্ড পোড়ো জমি ছিল উঁচুনীচু, গাছপালা নেই,—অনুর্বর। এখন সেখানে একটি সুন্দর ঝকঝকে গ্রাম বসে গেছে। ছোট ছোট পরিষ্কার বাড়ি, ইস্কুল, কারখানা, পশুশালা, পুকুর, চষা জমি, ফুল-ফলের বাগান—সমস্ত যেন আঁকা ছবিটির মতন সাজানো, যেখানে যেটি থাকা দরকার ঠিক ঠিক আছে। কোন সাইন বোর্ড টাঙানো নেই বটে কিন্তু কোন দর্শককে মনে করিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না যে এটি একটি তপোবন, সত্যিকারের সুন্দর তপোবন।

ছেলেদের ওপরে সমস্ত ভার, তারাই দেখাশুনা করে নিয়ম মত। আশপাশের গ্রাম থেকে কত বাসিন্দারা খুশি মনে আসে এদের সাহায্য করতে এবং এদের কাছ থেকে নানা রকম সাহায্য পাবার আশায়।

ইস্কুলটিতে ছেলেমেয়েদের এমন ভিড় যে জায়গা থাকে না। কত দূর দূর থেকে গরীব দুঃখীদের ছেলেমেয়েরাও আসে। এ এক নতুন ধরণের ইস্কুল—বেত নেই, বেতনও নেই। মাষ্টার মশায়দের সংগে মিলে মিশে গল্প ... নিজে হাতে কাজ করে সব শিখতে হয়। আ... কুড়িটি সেরা ছেলেও এর মধ্যে পড়াশুনায় বিশেষ উ... করে ফেলেছে।

নন্দর আজকাল এতটুকু ফুরসৎ নেই, নানা ক... ব্যস্ত থাকতে হয় সারাদিন। তবে এত কাজের চা... সে খুব আনন্দে আছে। এত দিন পরে, লড়াই ফে... ফিরে আসার পর থেকে, এই প্রথম মনের মতন ... কাজ পেয়ে গেছে।

সে বদলেও গেছে খুব। আগের ছটফটানি ... এতটুকু নেই। সে আর চীৎকার করে বিদেশী গান ... না, কোন তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলে চমকে ওঠে না, এবং ... ছেলেমেয়ে দেখলে চড় চাপড়টা লাগিয়ে শাসন ক... চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না। আজকাল বুঝে ফেলেছে ... ভালবাসাই হচ্ছে সোনার কাঠি যা ছুঁইয়ে যে ... মানুষকে যখন খুশি বশ করা যায়। সুতরাং শুধু ... কড়া আইন-কানুন সৃষ্টি করে শাসন করতে গিয়ে হাং... বাধিয়ে লাভটা কি?

সে সুখেই আছে। শুধু একটি ভয় আমার ... নন্দদুলাল কোন দিন ঝপ্ করে ইয়া দাড়ি-গোঁফ না ... ফেলে। অবশ্য তপোবনের সংগে ঋষি মশায়ের চমৎ... মিল হবে বটে, তবে ঐ বিশাল লম্বা-চওড়া চেহা... ওপর বুক পর্য্যন্ত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফ বড় ভ... ভয়ংকর দেখাবে—নয় কি?

দেখলে, তাড়াতাড়ি লড়াই-ফেরত নন্দদুলা... কাহিনী শেষ করতে গিয়ে একটি ছোট ঘটনার ক... বেমালুম ভুলে যাচ্ছিলাম। অথচ জানি সেটি শু... তোমরা খুশি না হয়ে পারবে না।

আবার সেই মহাপুরুষের দর্শন পাওয়া গেল এই ... অল্প দিন আগে। এক দিন নন্দরা সদলবলে কলকা... এসেছিল নানা কাজে এবং বেড়াতেও। সন্ধ্যা না... তপোবনে ফিরে যাবার জন্যে, শিয়ালদাতে ট্রেনে ... বসে। বিষম ভিড়। দরজা জানলার ওপরেও ... বসেছে। একটি বড় তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এত ... ঢুকেছিল যে তাদের হঠাৎ ছেড়ে দিলে ধর্মতলার ... গাড়ি-ঘোড়া যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।

...ছেলেরাই প্রথমে আবিষ্কার করলে মহাপুরুষকে ও ...সংগীদের। নন্দর কাছে এমন হুবহু বর্ণনা সব ...ছিল যে চিনতে বেশী দেরি হ'ল না। এবারে কিন্তু ...পুরুষ অন্য ভেলকি দেখাচ্ছেন।

...পদ্মাসনে বসে আঙুলে মুদ্রা করে হঠাৎ ধ্যানস্থ হয়ে ...ন এবং একটু পরেই থর থর করে আগপাশতলা কাঁপেন, ...বাংলা মুল্লুকের বিষম ম্যালেরিয়াতে ধরেছে। সেই ...ন, বাবু এবারেও ভক্তি-গদগদ স্বরে বলে ওঠেন,— ...এ যে ভর, দেবতায় ভর করেছেন ওঁর শরীরে! ...যাড়া হাত বার বার ঝুঁকে পড়ে মাথায় ঠেকান। ...বাদুর কল যে অন্য যাত্রীদের মাথা নীচু হয়ে যেতে ...মিনিটও আর তর সইলো না।

...সেই মহিলাটি আজ ভারি ভক্তিমতী। চওড়া লাল ...শাড়ি পরে এলোচুলে বার বার মাথা ঠুকে প্রণাম ...ন, এবং অন্যদেরও করতে বলেন।

...অত ভিড়ের মধ্যে সে এক ভয়ানক ঠেলাঠেলি,—ভারি ...ড়। কে আগে মহাপুরুষের পায়ের ধূলো মাথায় ...জন্মটি সার্থক করে নিতে পারে। এদিকে আঙুল ...করে হাত সাফাই-এর কাজও বন্ধ রইলো না।

নন্দর দল চোখে চোখে ইসারা করে ঠিক করে ফেলেছে কি করতে হবে, ও কখন। যাদবপুর ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই তারা ভীষণ তৎপর হয়ে গেল। মহাপুরুষ ও তার চেলাদের কুমড়োর মত লোফালুফি করে নামিয়ে ফেলে দু' মিনিটে, ভক্ত যাত্রীদের আপত্তি ও আক্রমণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তার পর আর কি, মহাপুরুষদের দর্শন লাভ করতে চাও ত' সোজা চলে যাও আলীপুর জেলে। টিকিট লাগবে না একটি পয়সা, প্রণামীও নয়, শুধু শুধু দর্শন পেয়ে যাবে। তবে এবারে দেখবে কয়েদীর পোষাক পরা অন্য এক রূপ। সম্ভব নতুন ভেলকি দেখাচ্ছেন,—না?

সেদিন সন্ধ্যায় নন্দদুলাল ও তার কুড়িটি ছেলেকে তপোবনে পৌঁছে দিয়ে আমার কাহিনী আমি শেষ করলাম। কলকাতা শহরের সেরা ছেলে ওরা, কলকাতাকেই আবার নতুন করে গড়ে তুলবে একদিন— নিশ্চয়ই। তোমাদের ইচ্ছা হয় না ঠিক ওদের মতন হ'তে? আমার ত' হয়। আজ আবার যদি ছোট বেলা ফিরিয়ে পাই ত' আর অন্য কিচ্ছু চাইবো না—সত্যি বলছি।

— শেষ —

দাওয়াই

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

...তোমরা যারা খবরের কাগজ নিয়মিত পড় তাদের ...মনে আছে, প্রায় বছর সাতেক আগে আনন্দবাজার ...য় একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটিতে লেখা

...টক হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাই-...ন যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ...জ দত্ত গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক অলৌকিক অসুখে ...এক সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিয়া পরলোক গমন ...য়াছেন। তাঁহার অসুখ কোনও চিকিৎসকই ধরিতে ...ন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে···ইত্যাদি।

সেই সাত বছর আগেকার কথা। কটকে সিভিল সার্জন ডক্টর রসরাজ দত্ত শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি পূর্ণ। কটকের ডাক্তারেরা সহজে এ বাড়িতে আসতে চাইছেন না। তাঁদের ধারণা—এত বড় ডাক্তারের অসুখে তাঁদের মত চুনোপুঁটি আর কি করবেন! ডক্টর দত্তই তাঁর নিজের অসুখ সারাতে পারবেন।

রসরাজ বাবুও অন্যান্য ডাক্তার ডাকতে রাজি ছিলেন না। কি আর এমন হয়েছে, সামান্য মাথা ব্যথা তো? এ তো নিজেই চিকিৎসা করা যায়।

করতেও গেছিলেন, কিন্তু বড় ছেলে নটরাজ তা হতে দেবে না। বলল—"এ কি করছ বাবা? ডাক্তার তার নিজের বাড়ির রোগীদেরই দেখে না তো নিজের উপর ডাক্তারী করবে! তোমার অসুখ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা আছে বল তো? আর তোমাকেই বা কি করে তোমার হাতে ছেড়ে দিই বল? অসুখ করেছে, তুমি এখন নিজের উপর ডাক্তারী করে বললে—ও কিছু নয়। অত সর্দ্দারি করতে হবে না।"

রসরাজ বাবু বাধা দিয়ে বললেন—"এতে অন্য ডাক্তার ডেকে তাঁকে মিছিমিছি ব্যতিব্যস্ত করা কেন? এ অসুখ এমন কিছুই নয়, অমনি সেরে যাবে।"

নটরাজ বলে উঠল—"যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা ব'ল না। এতে ব্যতিব্যস্ত করা কি? সিভিল সার্জ্জনের বাড়ি স্বেচ্ছায় আসবে না এমন ডাক্তার এ তল্লাটে কে আছে একবার দেখি। আর তুমিই বা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ডাক্তারেরা তো আর আমাদের কাছ থেকে ভিজিট নিতে পারবেন না!"

রসরাজ বাবুকে অগত্যা চুপ করতে হ'ল। বড় ছেলে নটরাজ ওকালতি পড়ছে, তার অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে মনে মনে আনন্দিতই হলেন—ছেলে কালে রাসবিহারী ঘোষ হ'তে পারবে।

ডক্টর রায় খবর পেয়েই মোটর হাঁকিয়ে এলেন। রসরাজ বাবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই যে স্যর, কেমন আছেন? বড় কাহিল দেখাচ্ছে!"

রসরাজ বাবু উত্তর দিলেন—"না, কাহিল আর কোথায়? এক রকম ভালই আছি।"

নটরাজ ফোঁস্ করে উঠল—"ভাল কোথায় আছেন বাবা? আর একটু আগেই না একবার খুক্ খুক্ করে কাসলে? আমি বলি কি, ডক্টর রয়, একবার এক্স-রে করলে হয় না?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," ডক্টর রায় লাফিয়ে উঠলেন—"এক্স-রে একশ' বার করতে হবে। আমরা ডাক্তার, আমরা বুঝি এ কত বড় খারাপ অসুখ। এক্স-রে করে থাইসিসের জীবাণু ধ্বংস করে অন্য কথা। এর জন্য যদি আমাকে নৈনিতাল পর্য্যন্ত যেতে হয়, আমি যেতে প্রস্তুত। এর শেষ না দেখে আমি নড়ছি না।"

রসরাজ বাবু বললেন—"আপনি বুঝছেন না, ... রয়, এ যক্ষ্মা হতে পারে না। এ কাসি তেমন ন... রক্তও পড়ে নি। এমনি গলা শুকিয়ে গেছিল বলে..."

ডক্টর রয় কথা শেষ করতে না দিয়েই ... "আপনাকে আর কি বলব স্যর! আপনি ভা... সব চেয়ে বড় ডাক্তার, আপনিই এ সব কথা ... কান ধরে শেখাতে পারেন। আপনাকে কিছু ... আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু স্যর, আপনার ... বোঝা উচিত, এই যক্ষ্মা আমাদের কত ক্ষতি করে... আপনি মনে করছেন কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে ... কাল যে উঠবে না এমন কথা তো নেই। প্রথ... সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপনি ... কি কালিম্পং চলে যান। ও জায়গা ভাল না ... দেরাদুন কি সুইজারল্যাণ্ড, মস্কো কি পণ্ডিচেরী, ... কি রাঁচি যেতে পারেন।"

নটরাজ বলে উঠল—"অসুখ করলে যেতে ... আমেরিকা পছন্দ না হলে আফ্রিকা, জাপান কিংবা ... এসিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া, যাভা কিংবা ... আরব কিংবা খার্কোভ—চলে যাও যেখানে ইচ্ছা।"

রসরাজ বাবু বললেন—"তোমরা একটু ... তোমাদের বকবকানিতে আমার বড় মাথা ধরছে।"

ডক্টর রায় সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন—"যা বলে... এখন মাথা ধরছে, একটু পরে ঘুসঘুসে জ্বর ধরবে ... পর যা হবার হবে। এই সময় থেকে যদি আপনা... ভাল করে চিকিৎসা না করেন তবে, বুঝলেন ... বাবু—"

নটরাজ বুঝল। রসরাজ বাবুকে এক্স-রে করানো ... ডক্টর রয় প্রেসক্রিপসান লিখে বিদায় নিলেন। ... ছুটল ওষুধ আনতে।

খবর ডক্টর অবিনাশ সাহাও পেয়েছিলেন। ... হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ঘরে ঢুকেই প্রথম প্র... হয়েছে স্যর?"

"কিছুই হয় নি, অবিনাশ। তোমরা আমাকে ... সুস্থ থাকতে দাও। এমনি ভাবে যে আর বাঁচব না ..."

"কি যে বলেন স্যর, আপনি বাঁচবেন না ... আপনি না বাঁচলে চলবে কেন? আমরা আ...

...। এখন আপনার কি অসুখ হয়েছে বলুন তো ..."

...রসরাজ বাবু অবিনাশের দিকে তাকালেন। তারপর ... বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"তুমিই বল অবিনাশ। ... আমার ছাত্র—তোমাদের মুখেই আমার কি ... হয়েছে শুনি। ডক্টর রয় বলে গেলেন, যক্ষ্মা। ... তুমি কি বল একবার শুনি।"

"...যক্ষ্মা! ছোঃ!" অবিনাশ হো হো করে হেসে ... "আপনাকে কি আর বলব স্যর! ডক্টর রয় ...দের চেয়ে বয়সে বড় হতে পারেন, কিন্তু···কিন্তু ...রীতে স্যর—। থাক্ গে ও সব কথায়। আপনার ... আমাকে দেখতে বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন স্যর? ... ভারতবর্ষের সব চেয়ে ভাল ডাক্তার, আপনার ...কি আমরা ভাল বুঝব? আপনার হাতটা আপনিই ... হ্যাঁ, এই আয়নাতে আপনার জিভটা দেখুন। ... বলুন দেখি স্যর, আপনার কি অসুখ হতে পারে?"

"...আমার মনে হয়," রসরাজ বাবু বলতে ইতস্ততঃ ...

"...লুন, বলুন—" অবিনাশ উৎসাহ দেয়—"বলে যান, ...র ভয় কি স্যর? আপনার পা ভাঙলে আপনি ...লেন আমাশা, কে তা অস্বীকার করবে বলুন? ...র কথার উপর কথা বলে এত বড় ডাক্তার ...র্ষে কে আছে বলুন?"

...রাজ বাবু বলেন—"দেখ, আমার মনে হয়—মানে ...ক বুঝতে পারছি না যে আমার কি হয়েছে। ...বার সমস্ত উপসর্গ মিলিয়ে মনে হচ্ছে কলেরা, ... মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া কিংবা ধর ডক্টর রয় যা ...থাইসিস্। কিংবা···কিংবা···"

...রাজ ধুয়া ধরল—"কিংবা প্লেগ?"

"...হ্যাঁ, প্লেগ।" রসরাজ বাবু হাঁপাতে লাগলেন।

...বিনাশেরও প্রায় সেই অবস্থা। বল্‌ল—"কলেরা, ...য়া, থাইসিস্, প্লেগ··! কি সর্ব্বনাশ! এ রকম ...লে অসুখ স্যর পৃথিবীর ইতিহাসে হয় নি। এর ...মরা কি করে জানব স্যার?"

...বিনাশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রসরাজ বাবু বলেন—"...ই, আমিও ভাবছি—কি করে এ রকম, গোলমেলে অসুখ হ'ল! ডাক্তারী করতে করতে যত রাজ্যের অসুখের রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, সমস্ত অসুখের জীবাণু আমার বুকে বাসা বেঁধেছিল। আজ অতর্কিতে সকলে আক্রমণ করেছে। তুমি, অবিনাশ, আমাদের মত সমস্ত অসুখ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে শুধু একটা অসুখ নিয়েই থেক। মরলে একটা অসুখে মরাই ভাল।"

অবিনাশ উত্তর দিল—"হ্যাঁ, স্যর। আমি ঠিক করেছি এবার থেকে শুধু সর্দ্দির চিকিৎসাই করব।"

নটরাজকে একদিকে ডেকে নিয়ে অবিনাশ বল্‌ল—"শুনলেন তো সব কথা? এতগুলো অসুখ করেছে, শুধু একটা ওষুধেই চলবে না। কলেরা, ম্যালেরিয়া, থাইসিস্, প্লেগ—প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ওষুধ দরকার। আমি প্রেসক্রিপসান্ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। যত বেশী ওষুধ খাওয়াবেন তত তাড়াতাড়ি ডক্টর দত্ত ভাল হয়ে উঠবেন। ভগবান্ করুন যেন উনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠেন, নয়ত ব্যাটা ডক্টর রয় সিভিল সার্জ্জন হবে।"

আবার চারটে ওষুধ আনতে ছুটল চাকর।

ডাক্তার অরূপ করকে এবার ডেকে আনা হ'ল। তিনি রসরাজ বাবুর বুক থাবড়ে দেখতে লাগলেন। তার পর বললেন—"আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওঁর গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার হয়েছে, কিংবা ক্যান্সার হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। এ সব অসুখ তো সকলেরই হচ্ছে। এঁকে বরফ-দেওয়া ঠাণ্ডা জলে অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক ধরে স্নান করিয়ে দিন। আমি একটা প্রেসক্রিপসান্ লিখে রেখে যাচ্ছি। সেই ওষুধ খাওয়ালেই ভাল হয়ে যাবেন।"

এবারের দাওয়াইয়ে নটরাজেরও মুখ হাঁ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে বলল—"সে কি ডক্টর কর? এই শীতে বরফ-জলে স্নান করালে যে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া হবে!"

ডক্টর কর বললেন—"ঠিক বুঝেছেন, আমিও ঠিক তাই চাই। আমি নিমুনিয়াতেই স্পেশালিষ্ট কিনা!"

নটরাজের মামা ব্যবস্থা দিলেন হোমিওপ্যাথি। একটু নাক্স ভোমিকা দিলেই বিনা ভূমিকায় অসুখ সুড়সুড় করে পালাতে পথ পাবে না। পাড়ার ননী বাবু বললেন—"ছোঃ, হাইড্রোপ্যাথি ছাড়া ওষুধ আছে?"

পিসিমা বললেন—"মা কালীর ছিন্নামিত একটু দে দিকিনি!"

নটরাজের মা বললেন—"একবার কোনও কবিরাজকে ডাক বাবা !"

হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, বাইওকেমিক, কবিরাজী—কেউই বাদ গেলেন না। এল চরণামৃত, তুলসী-পাতা, বেল-পাতা, সিদ্ধ বাবার পায়ের ধুলো। কিন্তু কোন্ ওষুধ খাওয়ানো হবে? কি অসুখ করেছে সেটা আগে জানা দরকার, তারপর তো ওষুধের ব্যবস্থা! নটরাজ তো অকুল পাথারে পড়ল।

আবার ডাক ডক্টর রয়, অবিনাশ ডাক্তার, ডক্টর কর, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, বাইওকেমিক, কবিরাজ—সক্কলকে। তিন ঘণ্টা ধরে তাঁদের জোর সভা চল্‌ল—কিছুই মীমাংসা হতে পারে না। ডক্টর রয় যত তড়পান—"আলবৎ থাইসিস্", ডক্টর কর তত টেবিল চাপড়ান—"না, নিমুনিয়া।"

শেষটা দিয়ে স্থির হ'ল সমস্ত ওষুধ এক সঙ্গে একটি গামলায় মিশিয়ে খাওয়ানোই সঙ্গত। যে অসুখই [illegible] না কেন এই মোক্ষম ওষুধে তার ধরা পড়তেই হবে [illegible] তার পালাতেই হবে।

এল এক মণী এক গামলা। সমস্ত ওষুধ [illegible] নটরাজ রসরাজ বাবুর ঘরে গিয়ে হাজির। বল্‌ল—[illegible] একটু হাঁ কর—বেশ বড় হাঁ। দেখছ তো কত ওষুধ [illegible] হবে!"

রসরাজ বাবু বললেন—"অত ওষুধ?"

বলতে বলতে আপনিই তাঁর মুখ হাঁ হয়ে যায়, [illegible] বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখানোর চেয়েও বড় হাঁ,—আর সেই [illegible] সুযোগ বুঝে অতখানি ওষুধ গিলে খাবি খাবার [illegible] ছোট্ট একটু প্রাণ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

রসরাজ বাবুর মুখে প্রশান্তির হাসি নেমে [illegible] শুধু হতভম্বের মত নটরাজ সেই এক মণী গামলা [illegible] তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

— দুই —

পাটলিপুত্র নগরীর বাহিরে গঙ্গাতীরে মহাত্মা পতঞ্জলির আশ্রম। গোল পাতায় ছাওয়া কয়েকটী কুটীর, খানিকটা ফুলের বাগান, খুঁটিতে বাঁধা গোটা কয়েক গরু। ঘরের ভিতরে তালপাতার পুঁথি আর মাদুর, পুস্তক পাঠের সহায়ক এক একখানি কাঠের পুস্তকধারক, আর মাটীর পিলসুজের উপর এক একটি মৃৎপ্রদীপ। মগধের রাজগুরুর গৃহে বিলাসের কোন সমারোহ নেই।

নানা দিক্-দেশাগত ছাত্রদের কাছে প[illegible] পতঞ্জলি অধ্যাপনা করছেন। আশ্রমের এ[illegible] উপবনের প্রান্তে প্রাচীন এক বটগাছের নীচে বি[illegible] চলেছে। মহাত্মা যোগদর্শন ব্যাখ্যা করছেন: 'কি[illegible] মানুষ আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে—হেয়, হে[illegible] হান ও হানোপায়: এই সংসারের দুঃখ কষ্ট আ[illegible] মনকে প্রতিমুহূর্ত্তে নিম্নগামী করছে, আমরা সত্য [illegible]

[illegible] যাচ্ছি। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে, বাহিরের [illegible] থেকে মনকে টেনে আনতে হবে ভিতরের পানে। [illegible]য়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে অর্পণ [illegible]তে হবে। যখন যে কাজ করবে ফলের প্রতি লক্ষ্য [illegible] রেখে, সুখের অনুসন্ধান না করে সমস্তই সেই পরমগুরু [illegible]মেশ্বরে সমর্পণ করবে, সকল সময় তাঁরই ধ্যান করবে।

[illegible] যোগ সাধনার প্রণালী সম্পর্কে বললেন: যে ভঙ্গীতে [illegible]কক্ষণ স্থিরভাবে বসে থাকতে পারা যায় তার নাম [illegible]ন। সেই আসনে বসে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে সংযত [illegible] (প্রাণায়াম) চিত্তের বৃত্তিগুলিকে জয় করতে হবে। [illegible]পর সেই চিত্তকে স্থির করতে হবে ভগবানের উপর। [illegible] ভেদজ্ঞান লুপ্ত হবে, মনের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত [illegible]। যোগী সৎ-চিৎ-আনন্দময় সমাধি প্রজ্ঞা লাভ [illegible]বে—জীবনের শোকদুঃখের অনুভূতি আর থাকবে [illegible] জগতের বন্ধন নষ্ট হবে, দেহী হয়েও তিনি হবেন [illegible]তীত, ভগবানে সব লীন হয়ে যাবে, সাধক উপলব্ধি [illegible]বেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

[ব্রহ্মোপনিষদ্]

[illegible] শ্রুতিধর ছাত্রেরা তন্ময় হয়ে গেছে, গুরুদেবের প্রতিটি [illegible] তাদের মানসপটে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে যাচ্ছে। [illegible]ত্মা চিত্তজয়ের এক একটি মার্গ ব্যাখ্যা করছেন: [illegible]র্কে বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্—যখন মনের কোন [illegible]কে জয় করতে হবে তখন তার বিপরীত ভাবকে [illegible]র মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে, তা হলেই প্রথম বৃত্তিটী [illegible]ল হয়ে পড়বে, কোন ক্ষতি করতে পারবে না। চিত্ত [illegible] করার এইটাই হ'ল প্রথম রীতি।...

[illegible] পতঞ্জলি পড়াচ্ছেন। বটের জটগুলো চারিপাশ দিয়ে [illegible] এসেছে, অধ্যাপকের মাথার জটগুলি যেন তাদের [illegible]কট-আত্মীয়। ওই বটগাছটী যেমন যুগান্তের সাক্ষী, [illegible]ত্মা তেমনি যুগান্তরসঞ্চিত জ্ঞানের ব্যাখ্যাতা। উভয়ের [illegible]ঝেই একটা যোগসূত্র আছে। বুড়ো বটগাছের নীচে ছায়াশীতল বেদীটীর উপর জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতকে মানায় ভাল।

সূর্য্য প্রখর হয়ে ওঠে, দিবসের প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়; গুরুদেব পাঠ শেষ করেন। শিষ্যেরা একে একে চলে যায়। ঋষি আত্মস্থ হন। চারিপাশ স্তব্ধ, পাতার মর্ম্মর-ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, রোদের রুক্ষতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের কাকলিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; কয়েকটী শালিখ পাখী ঘাসের বীজগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

ধীর পদক্ষেপে পুষ্পমিত্র সামনে এসে দাঁড়ালেন, পায়ের শব্দ শুনে পতঞ্জলি চোখ মেললেন, পুষ্পমিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—বল?

—দিন কয়েক ধরে আপনার বাণীই বার বার আমার মনে হচ্ছে—'বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্!'

পতঞ্জলি হাসলেন, বললেন—তুমি গ্রীক্ বাহিনীর সম্মুখীন হতে চাও?

পুষ্পমিত্র বললেন—আপনি সত্যদ্রষ্টা, আপনার অন্তর্দৃষ্টির কাছে কিছুই তো লুকাবার উপায় নেই গুরুদেব!

—কিন্তু যখন সেনা বিশেষ শক্তিমান, তাদের সম্মুখীন হ'তে হ'লে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন তা তোমার কই? শুধু বংশগৌরব কি বিদ্যাগৌরব তো রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে অর্থ। অর্থ ছাড়া লোকবল সংগ্রহ করা যায় না। সেই সৈন্য সংগ্রহ করার মত সম্পদ্ আগে আহরণ কর?

—আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি গুরুদেব!

পতঞ্জলি কোন উত্তর দিলেন না, পুষ্পমিত্রের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলেন। পুষ্পমিত্র বললেন—মিনাণ্ডার অযোধ্যার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। সম্রাট্ বৃহদ্রথকে ভয় দেখিয়ে পত্র পাঠিয়েছে—'দু' শ' রণহস্তী, দু' হাজার ঘোড়া, দু' হাজার নর্ত্তকী ও দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা চাই, অন্যথা যবন সেনা অযোধ্যার পথে পাটলিপুত্র আক্রমণ করবে।' আমি শুনলাম, মৌর্য্য সম্রাট্ যুদ্ধ করার চেয়ে এই উপঢৌকন পাঠানই শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন! এ সংবাদ বোধ হয় আপনারও অজ্ঞাত নয়?

—তোমার সংবাদ যথার্থ।

—সেই সম্পর্কে আপনার কাছে আমার একটী বিনীত

নিবেদন আছে। আপনি আমাকে মগধ সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

—কোন গোপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাও?

—আপনার কাছে বলতে কোন বাধা নেই, আমি মগধ-সম্রাটের উপঢৌকনের অনুগামী হ'তে চাই। গ্রীক রাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় করার আগ্রহ হয়েছে।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

—আপনার করুণাই আমার সম্বল গুরুদেব!

পুষ্পমিত্র পতঞ্জলির পদধূলি নিলেন, পতঞ্জলি আশীর্বাদ করলেন – শুভমস্তু!

পতঞ্জলি চোখ বুঁজলেন, মানুষের কণ্ঠ যে স্তব্ধতা খণ্ডিত করছিল তা আবার দিগন্ত ছুঁয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। সমাহিত ঋষিকে পিছনে রেখে পুষ্পমিত্র সামনের মেঠো পথ ধরলেন। পথটী ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে উত্তর মুখে চলে গেছে। একটী রক্ত গোলাপের ডালে একবার দোলা দিয়ে, একটী সূর্য্যমুখীর মাথায় একবার টোকা মেরে অপরাজিতা গাছগুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাতাসের মৃদু সুগন্ধটা একবার বুক ভরে গ্রহণ করে, গুণ গুণ করতে করতে তিনি অগ্রসর হলেন। গঙ্গাতীরে একটী গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। ওদিকে পাটলিপুত্রের ঘাট দেখা যায়। শাদা শাদা বিন্দুর মত অসংখ্য নৌকার পাল, নগর-প্রাকারটা এত দূর থেকে শুধু রেখার মত মনে হয়। মানুষ দৃষ্টিতে আসে না। পুষ্পমিত্র সেই দিকে তাকিয়ে গুণ গুণ করে সুর ধরলেন:

সাধনা আমার গ্রীক বিতাড়ন,
মন্ত্র আমার—"অস্ত্র ধর।"
বেদ-বেদান্ত গীতা ছেড়ে ভাই
মাতৃভূমিকে মুক্ত কর।

বেলা দ্বিপ্রহরের দিকে এগিয়ে যায়। মধ্যাকাশের সূর্য্য প্রখর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাতাস জোরালো হয়ে উঠেছে, দু'-একটা দম্‌কা ঝাপটায় তপ্ত বালুকণা গায়ে এসে বেঁধে। এক একটা ধূলার ঝাপটা পিছনের প্রান্তর ... ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার উপর দিয়ে এগিয়ে যায়, প্রভাতে... স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের রুক্ষতায় রূপান্তরিত হয়। গাছের ছায়াতেও পাশের উত্তাপ সংক্রামিত হ'তে সুরু করে।

পুষ্পমিত্র তখনও সেই গাছের নীচেই বসে আছেন। এক টুকরো পাথর দিয়ে মাটীর উপর কত কি লিখছেন হিজিবিজি। তাঁর মাথার মধ্যে যে চিন্তার ঝড় বইছে বাইরে থেকেও সেটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

সহসা কি যেন একটা শব্দ হ'ল, পুষ্পমিত্র মুখ তুললেন। সামনে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, হাতে একটি প্রকাণ্ড গাছের ডাল, এক টুকরো 'কৌপীন ছাড়া আর কোন বসন নেই। শ্রমণ এগিয়ে এসে বললেন—আপনার কাছেই এলাম। সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য উত্তরাপথের ধর্ম... আপনাকে মগধের মহামাত্য পদে আসীন করতে চায়। আপনি প্রতিশ্রুতি দিলেই আমরা অগ্রসর হতে পারি।

—আমি মগধের মহামাত্য হব!—পুষ্পমিত্র কথা ভালোমত বুঝে নেবার চেষ্টা করেন, জিজ্ঞাসু চোখে তাকা... লেন সন্ন্যাসীর পানে।

সন্ন্যাসী বললেন—কুক্কুটারামবিহারে উত্তরাপথের ধর্ম-চক্রের মহাসম্মেলন বসেছে, সদ্ধর্মের সংস্কার সম্পূর্ণ ক... আবার আমরা প্রচারক পাঠাবো চম্পা দ্বীপ (ইন্দোচীন) থেকে সুবর্ণসপ্তক (জাপান) দ্বীপ অবধি। আপনাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে!

—কিন্তু আমি যে......

—আপনার পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। এই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মহাসম্মেলন আজ রাত্রি প্রথম প্রহরে আপনাকে কুক্কুটারাম বিহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আপনার উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করি।

সন্ন্যাসী উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসার মত গাছের ডালটীর উপর উঠে বসলেন। পরক্ষণেই মনে হ'ল ডালটী যেন মাটীর উপর থেকে শূন্যে উঠে পড়লো, আকাশপথে সন্ন্যাসী অদৃ...লেন। শোনা যায় তখনকার দিনে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ...ক্ষ শূন্যপথে বিচরণ করা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। পুষ্পমিত্র বারেক সেদিকে তাকিয়ে আবার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।*

(ক্রমশঃ)

ফেলিক্স কেরি

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ

গত বারে বাংলা সাহিত্যের গল্প বলতে গিয়ে তোমাদের ...শুয়া ও ক্লার্ক মার্শম্যান্ প্রভৃতির গল্প বলেছি। ক্লার্ক মার্শম্যান্ ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র। পিতার ...রব্ধ কাজ পুত্র অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় এবার ফেলিক্স কেরি। ইনি ...লেন উইলিয়ম কেরির পুত্র। বাংলা ভাষার বিস্তারে ...র দানও কম নয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন ...ং এঁর মৃত্যু হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। স্বল্পপরিসর এই ...বনের মধ্যে তাঁর যে উদ্যম দেখা গিয়েছিল তা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; মুদ্রাকর হিসাবেও তাঁর নাম যথেষ্ট; বাংলা, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দখল ছিল বেশ।

ফেলিক্স বাংলা ভাষায় যে সব বই লেখেন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়।

বইটি ফেলিক্স কেরি একখানি ইংরাজী ইতিহাস থেকে অনুবাদ করেন।

(২) বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত

---

* এই গল্পে যে পতঞ্জলির নাম করা হয়েছে ইনি যোগদর্শনের ...খ্যাতা মহর্ষি পতঞ্জলি ন'ন। মহর্ষি পতঞ্জলি ছিলেন কাশ্মীরের ...ধিবাসী, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে—খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮।২৯ শতকে ইনি ...বির্ভূত হয়েছিলেন। আমাদের এই কাহিনীর মহাত্মা পতঞ্জলি ...লেন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, পূর্ব ভারতের 'গোনার্দি' প্রদেশের অধিবাসী। উত্তরাপথে এঁর পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল, বিশেষতঃ বৈয়াকরণিক হিসাবে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মগধের রাজবংশ এঁকে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন। এঁকে আমরা দ্বিতীয় পতঞ্জলি বলতে পারি। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত 'হিন্দু হিষ্ট্রি' দ্রষ্টব্য—লেখক।

TIGHT BINDING

ইউরোপীয় সর্ব্ব গ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূল-গ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। ফেলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এন্‌সেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নাম গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। গরিষ্ট উলিআম্ কেরি কর্ত্তৃক তর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুরে মিশিয়া ছাপাখানে ছাপাকৃত। সন ১৮২০।

(৩) যাত্রিরদের অগ্রসর বিবরণ (দি পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্) ১৮২১-২২।

ক্লার্ক মার্শম্যানের মত ফেলিক্স কেরির রচনার সাহিত্যিক মূল্য কত তা নিয়ে সবাই একমত হ'বেন না। তবে ভাষার গতি যে দিন দিন বেড়ে চলেছে—এবং পুষ্টির দিকেও যে বেশ আয়োজন চলেছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। নদী যেমন পাহাড়ের অন্ধকার গুহা থেকে শীর্ণ ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে প্রথম—তার পর দিকে দিকে তার প্রসারতা বেড়ে চলে—বাংলা গদ্যের রূপটাও ছিল সেই সময়ে ঠিক সেই রকম। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানান দিকেই বাংলা গদ্য আপনার আবেগে ছুটে চলেছে।

ফেলিক্সের ভাষা যে বেশ শব্দ-বহুল ও দুরূহ তা পড়লেই বেশ বোঝা যায়। যেমন—

"পৃষ্ঠের কণ্টক প্রবর্দ্ধন প্রযুক্ত ঐ মাংসপেশী কশেরুকাবর্ত্তকাকে উত্তোলন করে।"

আবার

"অপর ঐ গলাগ্রকাকুদের লুণ্ঠমান পর্দার উভয় পার্শ্বে স্থিত অতি বৃহদ্ গুটিকা নামে মাংসগ্রন্থি দ্বয়েতে সর্ব্বদা আর্দ্রভাবে থাকে ঐ মাংসগ্রন্থিদ্বয় বাদামবীজাকৃতি প্রযুক্ত কোনো ২ ব্যবচ্ছেদকেরা তাহারদিগের বাদামগুটিকা সংজ্ঞা করিয়াছেন" ইত্যাদি।

জন ম্যাক

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরায় ম্যাক সাহেবের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরে আসেন। দীর্ঘ ষোল বছর ইনি কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং কঠোর পরিশ্রম ক কলেজটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর ক'রে তোলেন। ১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ম্যাক সাহেব রসায়ন শাস্ত্রের ওপর বাংলা ভা একখানি বই লেখেন। এই বিষয়ের ওপর বই বা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম। বইটির নাম:

"কিমিয়া বিদ্যার সার। শ্রীযুত জান ম্যাক সাহে কর্ত্তৃক রচিত হইয়া গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।"

১৮৩৪ সালে শ্রীরামপুরে এটি ছাপা হয়।

শ্রীরামপুরের মিশনরীদের প্রচেষ্টা নানা দিকেই ছ পড়েছিল। সাধারণ জ্ঞানের নানা দিক্ থেকে আলো করার চেষ্টায় তাঁরা যে সার্থক হ'তে পারেন নি সে সত্য—কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের চেষ্টাকে আমরা অস্বী করতে পারি না কোন মতেই। উনবিংশ শতা ইংরাজী সাহিত্যের বয়স হিসাব করলে দেখা যাবে ব গদ্য সাহিত্য তার কাছে শিশু—শুধু শিশু নয়, অ শিশু। তাই সে সময় বৈদেশিক সাহিত্যের বা অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী। এই মিশনরীরা বাংলা গদ্যের এই অসহায়ত্ব বেশ দরদের উপলব্ধি করেছিলেন। একজন সাধারণ শিক্ষিত বা ছেলের যে যে বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার ব'লে ধারণা সেই সব বিষয় বাংলা গদ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চলেছিল এ যুগে।

নিছক ভাষার দিক্ থেকে আলোচনা করলেও ম্যা সাহেবের প্রশংসা না করে পারি না। নীচে একটু দেওয়া গেল:

"আলোকের চলন ও কার্য্যের দ্বারা অনেকে করে যে সে এক প্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্য অনুমান করেন যে সে বস্তু নহে কেবল বস্তুর মধ্যগত প্রকার বিশেষ সংলড়ন দ্বারা উৎপন্ন।"

চিত্রশালা

কবিতীর্থ

বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে থাকতেন

উপরে—উত্তরায়ণ, নীচে—শ্যামলী

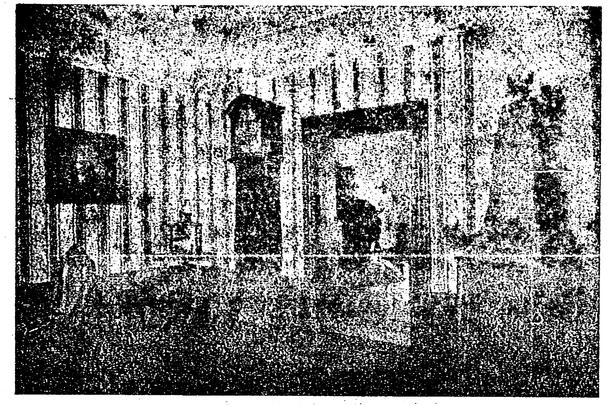

জার্ম্মেনীর কবি গ্যেটে যে ঘরে থাকতেন

ইংলণ্ডের কবি কীট্‌স্ যে বাড়ীতে থাকতেন

TIGHT BINDING

অ্যাটম যুগ

শ্রীসুবোধ বসু

২০৪৭ সাল। কালীকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের ডায়মণ্ড হারবার জাতীয় নিম্নবিদ্যাকেন্দ্রে ক্লাস বসিয়াছে। সাধারণতঃ সুপার-রেডিয়ো সেট ও টেলিভিসন বোর্ডের সহায়তায়ই ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়; প্রচার-কেন্দ্র হইতে একই শিক্ষক এক একটি অঞ্চলের সমুদয় স্কুলের এক একটি শ্রেণীর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছে অধ্যাপনা করেন; ছাত্র কমিটি ডিসিপ্লিন রক্ষা করে, ছেলেরা কেউ গণ্ডগোল বা মারামারি করিলে কমিটিই বিচার করে। ইহাতে সামান্য সংখ্যক কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে বহু ছাত্রকে পড়ানো সম্ভবপর হয়, এবং ডিসিপ্লিন রক্ষার ভার ছাত্রদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহাদেরও দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য যে স্পেশাল ক্লাসগুলি আছে তাহাতে এখনও শিক্ষকদের সশরীরে উপস্থিত হইতে হয়। খবরের কাগজে এই সেকেলে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। ফলে প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারটাও যাতে কেন্দ্রীভূত করা যায় তার ব্যবস্থা অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছে।

প্রশ্ন-উত্তরের মাষ্টার মশায় ক্লাসে আসিলেন। ছেলেরা নিজ নিজ স্প্রীংয়ের চেয়ার হইতে ডান হাত উঁচু করিয়া কহিল, 'জয় অ্যাটম!' মাষ্টার মশায় দেওয়ালের বোতাম টিপিয়া জবাব দিলেন, 'জয় অ্যাটম!' দেওয়াল ফাঁক হইয়া মাষ্টারের আসন আত্মপ্রকাশ করিল। সিঁড়ি দিয়া তিন ধাপ উঠিয়া দেওয়ালের কোটরের মধ্যে মাষ্টার মশায়ের উচ্চাসন। ক্লাস-ঘরে ডেইস-চেয়ার আমদানি করিয়া অযথা জায়গা আটকানো হয় নাই। মাষ্টার মশায় বোতাম টিপিয়া অ্যাটম-আলো জ্বালাইলেন; কোটরটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

'আচ্ছা মাষ্টার মশায়', প্রথম বাচ্চা প্রশ্নকর্ত্তা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উদ্বেগপূর্ণ মুখে প্রশ্ন করিল, 'একশো বছর আগে কালীকাতা কি খুবই অনুন্নত ছিল? আপনি সেদিন বললেন, তখন এর নাম ছিল কলকাতা আর আমাদের ডায়মণ্ড হারবার শহরের মধ্যেই ছিল না। কিন্তু শহরে তখনও অ্যাটম আলো ছিল না, তা তো বলেন নি! বাবা বল্লেন, হ্যাঁঃ, অ্যাটম-আলো! কয়লা পুড়িয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ বা গ্যাস তৈরি আলো জ্বালান হ'তো, আর তাতেই তাদের কত তাই নাকি, মাষ্টার মশায়?'

'হ্যাঁ, কয়লা, তেল বা খুব বেশির পক্ষে জলের এই সবই ছিল সেকালে শক্তির উপকরণ।' মাষ্টার পাণ্ডিত্য সহকারে উত্তর দিলেন। 'তখনও বি তেমন উন্নতি হয় নি কিনা। একশো বছরের কিছু এক মহাযুদ্ধ হয়। সেই সময়েই অ্যাটম ফা কৌশলটা বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের সাহায্যে মিত্রপক্ষ অ্যাটম বোমা তৈরি অ্যাকৃসিস্ পক্ষীয় জাপানের হিরোসিমার ওপর দেয়। পলকে মানুষ-জন, পশু-পক্ষী, ঘর-বাড়ি, গা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাপান তখনও অ্যাটম শেখে নি। তাই তারা উল্টে প্রতিশোধ নিতে না। তারা পরাজয় বরণ ক'রে নিল জাপানের জন্য সমস্ত সভ্যতাই কৃতজ্ঞ। ভাগ্যে তারা অ্যাটম তৈরি করতে জানত না। নইলে সারা পৃথিবীই যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এখন আমরা এখানে ব উত্তর চালাতে পারতাম না।'

"ইহার পর কি কি প্রশ্ন ও কি কি উত্তর হইল সেইগুলি পর পর দেওয়া হইল:—

প্রঃ—আগে কি অ্যাটম দিয়ে শুধু অ্যাটম তৈরি হতো?

উঃ—অ্যাটম-যুগ অ্যাটম-বোমা দিয়েই শুরু হয়।

প্রঃ—তবে রকেট প্লেন, সুড়ঙ্গ রেল, চলন্ত মিউনিসিপ্যাল তাপনিয়ন্ত্রণ ওয়ার্কস্, কলকারখানা চলতো কি দিয়ে?

উঃ—কয়লা, খনিজ তেল বা ইলেকৃট্রিসিটি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হতো। খরচ অনেক বেশি পড়ত কিন্তু উপায় কি? গোটা সহরের তাপনিয়ন্ত্রণের ক যুগে কেউ ভাবতেই পারত না; নিরুপায় ভাবে পড়ে পড়ে গরম সহ্য করত। দু' একটা সিনেমা এক রকম তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো শুরু হয়েছে ব'লে তিহাসিকেরা বলেন, কিন্তু তার বর্ণনা…

প্রঃ—সিনেমা! সিনেমা কি, মাষ্টার মশায়?

উঃ—সেকালে এখনকার মতো ঘরে ঘরে টেলিভিশন্ ছিল না; তখন কেবল মাত্র টেলিভিশনের প্রক্রিয়া বিষ্কার হয়েছে। ওরই মধ্যে যেগুলি কিছুটা উন্নত ছিল সে সব দেশে দু' চারটে উদ্ভট টেলিভিশন সেট যেত। তাতে ঝাপসা ঝাপসা কিছু ছবি ধরা ত। এখন যেমন তোমরা সচিত্র খবর পাচ্ছ, নাটক , মায় ফুল-ফলের গন্ধ পাচ্ছ, আগের কালের সেটে কেউ আশাও করতে পারত না। আর সে সেটও সবার কেনবার ক্ষমতা ছিল? শুধু ধনীদের পক্ষেই কেনা সম্ভব ছিল, ধনী ছাড়া…

প্রঃ—ধনী কা'কে বলে, মাষ্টার মশায়?

উঃ—এখন যেমন প্রত্যেক নাগরিকের আয়ই মোটা-সমান, শুধু প্রয়োজনের তফাতের জন্যই যা সামান্য তম্য, সে যুগে তেমন ছিল না। কারুর অনেক টাকা ; তারা ভালো খেত, ভালো পরত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একলা দখল ক'রে থাকত, বড় বড় গাড়ি হাঁকাত, বিশটা ক'রে চাকর রাখত। আবার অন্যেরা টাকার রে পেট ভরে খেতে পারত না, ছেঁড়া আর নোংরা ড়-জামা পরে দিন কাটাত, অস্বাস্থ্যকর খারাপ তে ঠাসাঠাসি ক'রে বাস করত, পায়ে হেঁটে অফিসে-খানায় যেত…

ও মা! এমন অসভ্য ছিল সব!' বলিয়া এইবার ক্লাস সকল ছাত্রছাত্রীই কৃপাভরে হাসিয়া উঠিল।

প্রঃ—চাকর কি, মাষ্টার মশায়?

উঃ—সেকালে বাড়ি চালানো কম হাঙ্গামা ছিল না। নিসিপ্যাল হোটেল থেকে বাড়ি বাড়ি খাওয়া পৌঁছে র ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক বাড়িতেই আলাদা দা রান্না হ'ত। সে যুগের হিসেবে উন্নত দু' একটা ঘর ঝাঁটপাট, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা প্রভৃতির আবিষ্কার হ'লেও তা যেমন সেকেলে আর দামী ছিল, তেও তেমনি খরচ পড়ত। তাই ধনী আর মধ্য-, মানে যাদের মাঝামাঝি আয় ছিল তারা, বেকার দের ভাড়া ক'রে খাওয়া পরা আর দু'-দশ টাকার বিনিময়ে তাদের দিয়ে নিজেদের বাড়ির নোংরা আর পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি করিয়ে নিত। এই ভাড়া করা বেকার লোকগুলিকেই বলা হ'ত চাকর। সেকেলে বৈদ্যুতিক মেসিন কেনার চাইতে এরা সস্তা ছিল।

প্রঃ—বাঃ, পরের নোংরা কাজ তারা করতে যেত কেন? এতে বুঝি অপমান হয় না? তারা বেকার নিয়োগ মন্ত্রীর কাছে গেলেই পারত!

উঃ—সেকালে বেকার নিয়োগ মন্ত্রী বলে কিছু ছিল না। এখন যেমন বড় বড় কলকারখানা সরকারি সম্পত্তি তখন তেমন ছিল না; বেশির ভাগ কলকারখানাই তখন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। তাদের ইচ্ছেমত লোক নেওয়া হ'ত বা ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। সরকারকে যে প্রত্যেক লোকের কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। শুধু রাশিয়াতে এই সম্পর্কীয় পরীক্ষা শুরু হয়েছে, কিন্তু সেকালের অন্যান্য ব্যবস্থার মতো, এদের ব্যবস্থাও বড় 'ক্রুড' ছিল…

প্রঃ—যারা কাজ পাবে না, তারা তবে খাবে কি?

উঃ—তারা চাকর হবে, মজুর হবে। তাও না জুটলে উপোস ক'রে মরবে। দু' একটা সভ্য দেশে ভিখিরিদের খাওয়াবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু…

প্রঃ—ভিখিরি কি?

উঃ—যাদের আয় ছিল না, পরের কাছে চেয়ে দু' চার পয়সা জোগাড় করত, তাদের বলা হ'ত ভিখিরি। এরা লোকের কাছে গিয়ে হাত পেতে পয়সা চাইত, কখনও পেত, কখনও ধমক খেয়ে…

'ওমা, এমনও কেউ করে!' ক্লাসের মেয়েরা গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে কহিল। 'আগের কালের লোকগুলি ভারি বোকা ছিল তো! আমাদের কালে তো কই ভিখিরি নেই, বেকার নেই, ধনী নেই! অ্যাটম-যুগের আগে সবাই এক দম গেঁয়ো অসভ্য ছিল দেখছি! ভাগ্যে আমরা অসভ্য যুগে জন্মাই নি, নইলে…'

নহিলে কি হইত, শেষ করা গেল না। সহসা ক্লাস-ঘরের সুপার-রেডিয়োর ডায়াল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেওয়াল ঘড়ি বাজিবার পূর্ব্বে যেমন শব্দ হয় সেই রকম একটা শব্দ সারা ক্লাসকে জানাইয়া দিল যে অবিলম্বে

স্থপার রেডিয়োতে জরুরি ঘোষণা করা হইবে। ছেলে-মেয়েরা উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

'কালীকাতার সকল ইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জানানো হচ্ছে'; রেডিয়োর ঘোষকের গম্ভীর আওয়াজ ধ্বনিত হইল, 'আগামী পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসের শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল বিদ্যাকেন্দ্রের পনের—ষোল—সতের এই তিন দিনব্যাপী ছুটি থাকবে। পনের, ষোল, সতের এই তিন দিনব্যাপী ছুটি থাকবে…'

বলা বাহুল্য, তিন দিনের ছুটির সংবাদে ছেলেমেয়েদের মুখ খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছুটি তাদের খুবই ভালো লাগে। মাষ্টার মশায় বলেন, সেকালের ছেলেমেয়েরাও নাকি তাদের মতই ছুটি পছন্দ করিত। করিবেই তো, বেচারিরা যা অসুবিধার মধ্যে পড়াশুনা করিত!

এই ছুটি সম্পর্কে আবার নতুন ধরণের প্রশ্নের উদয় হইল।

প্রঃ—মাষ্টার মশায়, প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একদিন ক'রে ছুটি হয় কেন? স্বাধীনতা কি?

উঃ—এখন থেকে 'একশ' বছর আগে আমাদের দেশ ইংলণ্ডের লোকেরা শাসন করত; মানে, তাদের ইচ্ছে মতো আমাদের চলতে হ'ত। তারা হুকুম করবে, আমরা হুকুম তামিল করব, এই ছিল ব্যবস্থা।

'বাঃ রে, তা আমরা করতাম কেন?' এক বাক্যে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

উঃ—পরাধীন দেশের তা না ক'রে উপায় থাকে না। এক দেশের লোকেরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্য দেশের ঘাড়ে চেপে বসতে পারলে আর কিছু করবার থাকত না। আপত্তি করবে তো সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে মরবে। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক জেলে পচেছে, ফাঁসিতে ঝুলেছে, সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করেছে। ১৮৫৭ সালে, ১৯২০, ১৯৩০, ১৯৪২ সালে ভারতবাসীরা বিদ্রোহ ক'রে প্রভুশক্তির হাতে প্রবল নিগ্রহ ভোগ করে…

প্রঃ—বাঃ রে, আন্তর্জাতিক গভর্ণমেণ্ট কি[...] না? আমাদের দেশ অন্যেরা দখল করবে কেন?

উঃ—তখনও আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত [...] আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী তখন ছিল না, কি[...] চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। তবে যে-সব দেশ নিয়ে আন্ত[...] গবর্ণমেণ্ট গঠিত হবে তাদের অধিকাংশ তখনও নি[...] অন্যদের দেশ বা সম্পত্তি অধিকার ক'রে বসছে। [...] রাজ্য দখল করা তখনও লজ্জার ব্যাপার ছিল না, [...] গর্ব্বের বিষয় বলেই মনে করা হ'ত।…যাই [...] আমরা নিজের চেষ্টায় ১৯৪৭ সালের পনেরোই [...] ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব থেকে ভারতকে উদ্ধার করতে [...] হয়েছিলাম। এ জন্যই এই তারিখটি জাতীয় উ[...] দিন। এই যুদ্ধে আমাদের নেতা ছিলেন একজন মহা[...] ইনিই প্রথমে জগৎকে সভ্যতার পথ দেখান। [...] তিনি অ্যাটম-যুগের পথ প্রদর্শক। তিনি একটি [...] অস্ত্র আবিষ্কার করেন। এই অস্ত্রে অসম্ভব সম্ভব [...] মহা পরাক্রমশালী বিপক্ষ এই আশ্চর্য্য অস্ত্রের [...] টিকতে পারল না।…এই মহাপুরুষের নাম মহাত্মা [...] আর তাঁর অস্ত্রের নাম…'

'অ্যাটম-বোমা, 'অ্যাটম-বোমা!' সমবেত ছাত্র[...] উত্তেজনার ঘোরে দাঁড়াইয়া পড়িয়া দৃঢ় নিশ্চয়তায় [...] গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পাঁচ মিনিটেও সে চীৎকার [...] না।

'তাঁর অস্ত্র ছিল', সঠিক জবাব দিতে পারা[...] ছাত্রছাত্রীদের স্তম্ভিত করিয়া মাষ্টার মশায় অ্যাটম-[...] নির্দ্দয়তার সঙ্গে কহিলেন, 'পরকে ভালোবাসা। পরকে ভালোবাসার মধ্যে অ্যাটম-যুগের সভ্যতার [...] নিহিত। অ্যাটম-বোমা পরস্পরকে ভালোবাসার [...] প্রয়োজনীয়তার কথাটা যুধ্যমান জাতি, সম্প্রদায় ও [...] গুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল [...] যদি পরস্পরকে ভালোবাসতে না পার তবে সবাই [...] এই ছিল অ্যাটম-বোমার মোদ্দা কথা।'

ইমারতের কারিকর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

রাজা সীতারাম ও তাঁর রাজধানী

কারিকরেরা একখানা ইটের উপর আর একখানা ইট দিয়ে মস্ত বড় বাড়ী গড়ে তোলে। একটা দেশকেও [...]র সু-সন্তান যাঁরা, মহাপুরুষ যাঁরা, বীর যাঁরা তাঁরা একটু [...]টু ক'রে গড়ে তোলেন। এঁরাই দেশের আলোক-[...]—লাইট পোষ্ট।

আমাদের দেশ আজ স্বাধীনতার দ্বারে এসে [...]ড়িয়েছে। ভাববার সময় এসেছে আমাদের আজ, [...] এই স্বাধীনতা আনল। কে তার পুঙ্খানুরূপ হিসাব [...]খেছে? এই স্বাধীনতা-সৌধ তৈরী করতে গিয়ে [...] কারিকরের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তিলে তিলে কেউ [...]ণ দিয়েছে, কেউ কীর্তি রেখে গেছে, আবার 'কাউকে [...]ত লোকে চিনতে পারে নি! কিন্তু এই স্বাধীনতা-[...]জ্ঞে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের কারও দান নই[...] যায় নি। তাঁদের আদর্শ, তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের [...]মন্ত্র অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্তী কর্মীদের।

স্বাধীনতার মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমরা জানা-অজানা [...]ন দেশপ্রেমিকের কাছেই নত মস্তকে আমাদের [...]জ্ঞতা স্বীকার করব। প্রতাপ, ঈশা খাঁ, সীতারাম—[...]রাম, যতীন, সূর্য সেন প্রভৃতি শহীদেরা আমাদের [...]ধীনতা-সূর্যের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধন্য [...]রা—আর তাঁদের বীরত্বে আমরাও আজ ধন্য।

এখানে আমি সংক্ষেপে রাজা সীতারামের কথা বলছি। সীতারামের বংশধর আজ কেউ নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি আছে, আর সেই সঙ্গে আছে তাঁর পবিত্র স্মৃতি।

সীতারাম ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তাঁর পিতা উদয়নারায়ণ ঢাকার নবাব সরকারে কাজ করতেন। অনুমান ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সীতারাম তাঁর মাতুলালয় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল দয়াময়ী; ইনি খুব তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। কথিত আছে, একবার তিনি নিজেই অসি হাতে একদল ডাকাতকে বিতাড়িত করেন। তাঁর নামানুসারে আজও মামুদপুরে 'দয়াময়ীতলা' বর্ত্তমান।

সীতারাম যেমন শাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন, অস্ত্রশস্ত্রেও ছিলেন তেমনি নিপুণ। স্বীয় বীরত্ব, উদারতা ও প্রেমের দ্বারা তিনি মামুদপুরে (যশোর) একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

মামুদপুর নামটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কেউ বলেন, আসলে জায়গাটির নাম মহামোদপুর, এখন ওটি মহম্মদপুর বলে চলে আসছে। কেউ বলেন মামুদ শা ফকির নামে এক ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ব'লে সীতারাম ওটার নাম রাখেন—মামুদপুর।

যাই হোক, সীতারাম যেখানে রাজ্য স্থাপন করেন, তার উত্তর ও পূর্বে মধুমতী নদী, পশ্চিমে নবগঙ্গা এবং

দক্ষিণে কুরসীর প্রকাণ্ড বিল। জায়গাটি প্রকৃতি দ্বারাই সুরক্ষিত, তার উপর সীতারাম তাঁর বাস-ভবনের চতুর্দিকে প্রকাণ্ড গড় বা পরিখা খনন করেন। শোনা যায়, এখানে তিনি অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত তৈরী করেছেন।

খুলনা থেকে সন্ধ্যায় বোয়ালমারী লাইনের ষ্টীমারে অথবা ট্রেনে কুষ্টিয়া হ'য়ে কালুখালি—ভাটিয়াপাড়া লাইনেও মামুদপুর যাওয়া যায়। ঘোষপুর অথবা বোয়ালমারী নেমে সেখান থেকে কয়েক মাইল গেলেই মামুদপুর। এই মামুদপুরে সীতারামের বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। যারা ইতিহাস ভালবাসে তাদের তো বটেই, যারা দেশকে ভালবাসে তাদেরও সুবিধামত এই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আসা উচিত।

রাজা সীতারামের প্রধান কীর্তি তাঁর জলাশয়। মামুদপুরে রামসাগর, সুখসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামে তিনটি প্রসিদ্ধ দীঘি তিনি খনন করান। রামসাগরের দৈর্ঘ্য ১০০০'×৩০০'। দুঃখের বিষয়, এখন এই তিনটি দীঘির একটিও নেই। মধুমতী নদী রামসাগরকে ভেঙ্গে নিয়েছে, সুখসাগর ও কৃষ্ণসাগর পলিমাটি পড়ে ভরাট হ'য়ে গেছে। রাজার গড়ও এখন ভরাট।

স্বাধীনতা লাভ করার পর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ছিল সীতারামের অন্যতম প্রধান কীর্তি। দশভুজার মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, হারকৃষ্ণ রায়ের মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান।

সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন মৃন্ময় ঘোষ, ব... এঁরা সব। অনুমান ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মৃন্ময় গুপ্ত ঘা... হাতে প্রাণ দেন।

সীতারামের বন্ধু ছিল যেমন, তেমনি শত্রুরও ... ছিল না। যারা ছিল ক্লীব, ভীরু তারাই এই বীরশি... ঈর্ষা করত। মাথা নীচু করে প্রভুর পদলেহন ... ছিল যাদের স্বভাব, তারাই এই উন্নতশির, স্বাধীন... প্রয়াসীকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে পদে ... এই ধর্মপ্রাণ, পরদুঃখকাতর রাজার সম্বন্ধে ধ... অসৎচরিত্র, পরপীড়কেরা নানারূপ কুৎসা রটাতেও ... করে নি; কিন্তু সত্যের আগুনকে কখনও মিথ্যার ... চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সীতারাম ... প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে—তিনি ছিলেন স্বাধী... প্রয়াসী, তিনি ছিলেন ধার্মিক, পরদুঃখকাতর, ... বীরের মতই তিনি প্রাণ দিয়েছেন—কখনও শত্রুর ... স্বীকার করেন নি।

সীতারাম যদি কূটকৌশলী হতেন—কি... পরাধীনতা বা বশ্যতা যদি তিনি স্বীকার করতেন, তা... আজ তাঁর বংশ হয়ত থাকত এবং রাজার মতই ... থাকত।

তাঁর কেউ নেই—বীরের মত স্বাধীনতার যজ্ঞে ... প্রাণ দিয়েছে সকলেই। এই জন্যই, আজ আ... সীতারামের কথা স্মরণ করব—তাঁর স্মৃতিকে পূজা কর...

হে স্বাধীনতা-মন্ত্রের গুরু, তোমায় নমস্কার।

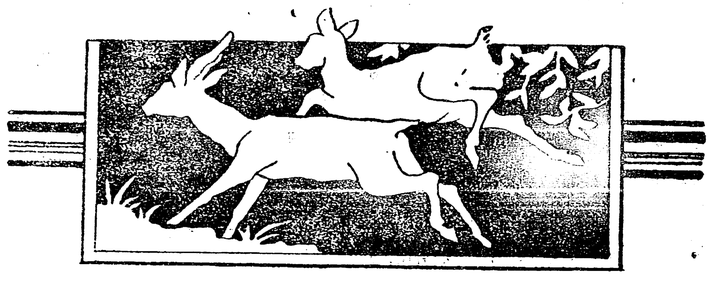

রামধনু—

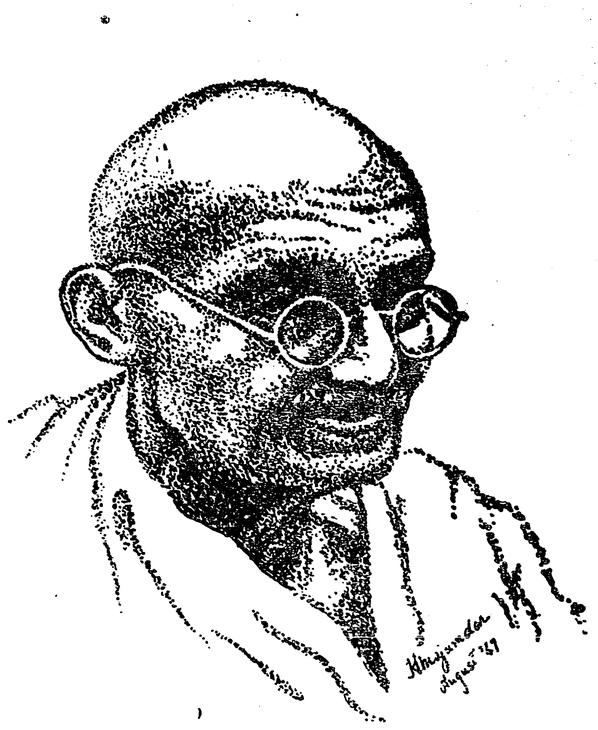

বাপুজী

শিল্পী—শ্রীহরিহর মজুমদার

ছোট্ট টুকু

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

মোদের টুকু—ছোট্ট খুকু
দুষ্টু মোটে নয়!
ভরায় মেঝে—ছড়ায় সে যে
সারাটি ঘরময়
লেপের তুলো—বালিশগুলো,
কাপড় জামা আর;
দু'হাত ভরে টানবে জোরে
চুলের গোছা মার!
ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি
লেগেই আছে খালি—
এমন মেয়ে, কেবল যেয়ে
মাখবে ধুলো-বালি!
ধরবে যেটা ভাঙ্‌বে সেটা
জানা এ নির্ঘাৎ—
সবাই ভীত, সশংকিত,
টুকুর কিসে হাত!
থাকলে কাছে রক্ষে আছে?
অক্কা পাবে সে যে—
চোখে যা তার পড়ে তাহার
বারোটা যায় বেজে।
মাথার কাঁটা কিম্বা ঝাঁটা
কিম্বা চায়ের কাপ্
পলক পাতে টুকুর হাতে
একেবারে সাফ্!
দিন দুপুরে বেড়ায় ঘুরে
রোদের মাঝে পাড়া,
টুকু কোথায়! ডাকলে কি হায়
মিলবে ভাবো সাড়া!
ছাদের পরে আলসে ধরে
ঝুঁকছে নীচের দিকে,
কিম্বা গিয়ে দেয় রাগিয়ে
বাড়ীর বুড়ী ঝিকে!
শীতের দিনে জলের টিনে
হয়তো দেবে ডুব—
বল তো ভাই তোমরা সবাই
দুষ্টু সে কি খুব?

বাঘা যতীন

শ্রীপ্রভাত বসু

বাঘের চেয়েও শক্তি তোমার,
বশ করেছ সিংহকে,
কীর্তি তোমার রইল গাঁথা
অটুট হয়ে তিন লোকে।
পাঁচজনেতে করলে লড়াই
পাঁচ শ' সেনার বিরুদ্ধে—
ভক্ত দেহের রক্তনদী
বইল ভীষণ সে যুদ্ধে।
তীর্থ হ'ল বুড়ি বালাম,
বালেশ্বরের অরণ্য,

বিপ্লবী বীর যতীন, তুমি
করলে বাংলা কি ধন্য!
সঙ্গী তোমার চিত্তপ্রিয়—
অমর মরণ বরল সে;
ফাঁসির রশি কে পরাবে
তাই দিয়েছ প্রাণ নিজে।
রক্ত-পণে স্বাধীনতা
কিনলে হে বীর বিপ্লবী,
রক্ত দিয়ে রাখব সে ধন—
মুক্তি-যাগে সেই হবি।

চুপি চুপি

বন্দে আলী মিয়া

ক্রিকেট খেলায় ভক্ত দীনু বললে নূরুর কাছে,
"অষ্ট্রেলিয়ার দল এসেছে—ভাবনা কি আর আছে!
ইস্কুলেতে যাবো না কাল, ছুটবো খেলার মাঠে,
ক্রিকেট দেখায় বড্ডো মজা—আনন্দে দিন কাটে।
বাবার কানে কোন মতে খবর যদি ওঠে
গাঁট্টা খেয়ে ফাটবে খুলি সন্দেহ নাই মোটে।
লক্ষ্মী নূরু, কারোর কাছে দিস্ না বলে ভাই,
ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার কালকে যাওয়া চাই।"
বল্লে নূরু, "ভয় ক'রো না—কেউ পাবে না টের,
আমার পেটে লুকিয়ে আছে গোপন কথা ঢের।"

নূরুর বোন সে জাহানারা ইস্কুলেতে পড়ে,
বিকাল বেলায় পার্কে এসে দোলার ওপর চড়ে।
তাহার সাথী রতনমণি দীনুর প্রতিবেশী
এক সঙ্গে খেলে বেড়ায়—অবাধ মেশামেশি।
জাহানারা তাকে ডেকে বল্লে কানে কানে,
"বলবো তোকে একটা কথা কেউ যেন না জানে।
কাল দীনুদা দেখতে খেলা পালাবে ইস্কুল,
কারেও যেন বলিস না ভাই—করিস না এ ভুল।"

রতনমণি বাড়ী এসে বললে মাসির কাছে
"দীনু দাদার মতন দুষ্টু কোথায় কে আর আছে!
ক্রিকেট খেলা দেখতে সে কাল ইস্কুল পালিয়ে
দুপুর বেলায় গড়ের মাঠে হাজির হবে গিয়ে।
দীনু দাদার বাবা যদি হঠাৎ জানতে পান
হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে দেবেন তাহার দু'টি কান।"
শুনে এ সব বললে মাসি, "ভয় কিছু তোর নাই,
এমন খবর গোপন করে রাখতে আমি চাই।"
খানিক পরে দীনুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে
সকল ব্যাপার মাসি তখন বললে চাপা স্বরে,
"ছেলে মানুষ দেখবে খেলা—এতেই কিবা দোষ!
কর্ত্তা যদি জানেন ইহা বাড়বে অসন্তোষ।"

পরের দিনে সকাল সকাল নাওয়া-খাওয়া ক'রে
বই বগলে ছুটলো দীনু বেজায় জোরে জোরে।
ইডেন-বাগান যাবার পথে লাগলো ভিড়ের ঠেলা,
কত না লোক যাচ্ছে সেথা—যেন বিরাট মেলা!

...কাটার লাইন দেখে আঁৎকে ওঠে প্রাণ,
...ক তার পিছন থেকে টানলো কষে কান।
...ীনু পিছন ফিরে দেখলো চেয়ে যেই
...বুক উঠলো কেঁপে—মুখেতে রা নেই।

ভূতকে দেখেও এমন কেহ আঁৎকে নাহি ওঠে—
থর্ থরিয়ে কাঁপে দীনু—গায়েতে ঘাম ছোটে।
বাবা তাহার কান ধরেছেন—রক্ষা এবার নাই,
কেমন করে রটলো খবর ভাবছে দীনু তাই।

কাতুকুতু দাও

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ. বি.টি

...ক'রে ব'সে থাকে, মুখ যার গোম্‌রা—
কাতুকুতু দিও তাকে তোমরা।
...লমেয়ে খেলা করে নদীতীরে জুটিয়া,
...া-কাদা মেখে মুখে হেসে পড়ে লুটিয়া,
...র মাঝে যে ছেলেটা প্যাঁচা-মুখ বাঁকিয়ে
...ত ভুরু নিয়ে পিছে থাকে তাকিয়ে,
...চকা টানেতে তার ভাঙো ঔদাস্য,
...তুকুতু দিয়ে তার মুখে আন হাস্য।
...ক তার কিল্‌বিল্ করে নানা ফন্দী,
...ই নিয়ে হয়ে আছে নিজ মনে বন্দী।

...লে চলে সবে, মুখে হাসি মিষ্টি,
...মাথা হয়ে ওঠে সুচকিত দৃষ্টি।
...-সল্প চলে, দু' একটা রঙ্গ,—
...র মাঝে যে ছেলেটা করে রসভঙ্গ,
...গালের কথা তুলে ধম্‌কায় সকলে,
...ব মিলি কাতুকুতু দাও তার বগলে।
...নে রেখো, সেই ছেলে বেরসিক ভণ্ড,
...নিয়ার সব খেলা ক'রে দেয় পণ্ড।

...জ-বাড়ী, খায় সবে, হাসাহাসি চল্‌ছে,
...া-মিঠাই-দই গলা দিয়ে গলছে।
...র মাঝে যে ছেলেটা কত না অভিজ্ঞ
...টামিন্-ব্যাখ্যানে মাথা নাড়ে বিজ্ঞ,
...ীরে ব'সে থাকে দু'টি হাত গুটিয়ে,
...তুকুতু দিয়ে তাকে পাতে দাও লুটিয়ে।
...টে-পেটে খেলে তার শয়তানি বুদ্ধি,
...র বিয়ে আনে ভোজনে অশুদ্ধি।

পুজোবাড়ি, খোকাখুকু কোলাহলে মত্ত,
হাসিতে বাঁশিতে ঘন মুখর নেপথ্য।
তাই দেখে যে মেয়েটা তেড়ে যায় রুষিয়া,
হাঁড়িপানা মুখে যার ফণী ওঠে ফুঁসিয়া,
দাও তারে কাতুকুতু, মারো তিন ধাক্কা,
হাসিতে চুবাও তারে দু'ঘণ্টা পাক্কা।
বিশ্বাস ক'রো নাকো তারে কেহ কিচ্ছু,
মনে তার বাসা বাঁধে হিংসের বিচ্ছু!

রথ-তলা মেলা বসে, ভিড় জমে মস্ত,
শিশুরা পুতুল কিনে লালায়িত হস্ত।
তার পাশে যে মেয়েটি একটেরে বসিয়া
পয়সা বাঁধিয়া রাখে অঞ্চলে কষিয়া,
মুখে যার মেঘ জমে আঁখি কোল ছাপিয়ে
কাতুকুতু দিয়ে তার প্রাণ দাও হাঁপিয়ে।
সে মেয়ে তো মেয়ে নয়, অকালের গিন্নী,—
লক্ষ্মী-প্যাঁচার পায়ে মানে ব'সে সিন্নি।

প্যাঁচা আর পেঁচী যত আছে এই ভারতে,
থম্‌কিয়ে ব'সে থাকে বিষাদের আড়তে,
আশা ছেড়ে কাশে শুধু, মুখে অমাবস্যা,
কেবলি পাকায় জট হাজারো সমস্যা,—
হাসার সময় যারা পায় নিকো আজো রে,
কাতুকুতু দাও ধরে তাহাদের পাঁজরে।
যেখানে যে বেরসিক—দাও তাকে হাসিয়ে,
দাও তার ভাবনার ভুঁড়িটাকে ফাঁসিয়ে।

TIGHT BINDING

ভার সাম্য

তোমরা নিশ্চয়ই সার্কাস দেখতে ভালবাসো। ছোট বেলায় আমি খুব সার্কাস দেখতাম। রামমূর্ত্তি, তারাবাঈ, বোস প্রভৃতির সার্কাসের কথা তোমাদের গুরুজনদের জিজ্ঞাসা করলে অনেক কিছুই শুনতে পাবে। গত মহা-যুদ্ধের সময় নিষ্প্রদীপ, জিনিষপত্রের চড়া দাম, দুর্ভিক্ষ, ট্রেনে যাতায়াতের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে প্রায় সার্কাস-পার্টিই তাঁবু গুটিয়েছেন তবে এখন এক-আধটা আবার নতুন ভাবে সুরু করার চেষ্টা করছেন।

শরীরের শক্তি দিয়ে অসম্ভবপ্রায় খেলা দেখানো, নিজের জীবন বিপন্ন করে দর্শকের মনে আনন্দ দেওয়া, ব্যালান্সের অদ্ভুত খেলা, হিংস্র পশুকে আদেশ মত কাজ করানো—এ সব দেখার মধ্যেও প্রাণ আছে, সার্কাস বোধ হয় আমাদের তাই এত ভাল লাগে।

সার্কাসে অনেক সময় যাদুকরকে তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করতে হয়। তাঁরা সচরাচর যে যে খেলা সার্কাসের এরিনায় দেখান তার নাম ও নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিলাম।

(১) সোর্ড বক্স—একটী মেয়েকে একটী বাক্সের মধ্যে পুরে বাক্সটাকে চারিদিক্ থেকে তরোয়াল বিদ্ধ করে পরে মেয়েটিকে অক্ষত অবস্থায় পরিবর্ত্তিত পোষাকে উদ্ধার করা হয়।

(২) ইলিউশন বক্স—হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে, গ কড়ি লাগিয়ে বাক্সে যাদুকরকে বন্ধ করে দেওয়া যাদুকর মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে মুক্ত করেন, আবার তাঁকে আগের মতই বাঁধা অবস্থায় বাক্সের মধ্যে পা যায়। এটি যাদুসম্রাট্ ৺ গণপতি চক্রবর্ত্তীর অতি খেলা ছিল। তিনি সার্কাসে বহুকাল এটি দেখিয়ে খ্যা অর্জ্জন করেন।

(৩) এরিয়াল্ সাস্‌পেন্‌শন্—কোন ব্যক্তিকে ম হিত অবস্থায় শূন্যে উত্তোলন। এর একটী সহজ প পরের বার প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

(৪) জাগলিং—এতে যা দেখানো হয় তা'তে ম্যা কিছু আছে বলেই মনে হয় না। মনে হয় সবই অভ্য অর্জ্জিত। যেমন ধর একটা লাঠির উপর বল ব্যা করা, সেই বলের উপর আর একটা বল; এর পর ন সমেত বলগুলি নাক বা কপালের উপর ব্যালান্স ক টেবিলের উপর বোতল, প্লেট, গ্লাস প্রভৃতি রয়ে হঠাৎ যাদুকরের প্রয়োজন হ'ল একটা বড় কাগ টুকরোর—তিনি এক টান মেরে টেবিল ক্লথ নিয়ে কাজে লাগালেন অথচ তার ওপরে রাখা গেলাস, বো

প্রভৃতি নীচে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হ'ল না—আশ্চর্য্য ?

কলে বলবেন—অভ্যাস। অভ্যাস যে করতে হয়েছে ত সন্দেহ নেই, তবে অভ্যাস করতে হয়েছে তাঁকে টা, অর্থাৎ যাতে ধরা না পড়েন সেইটেই তাঁকে করতে হয়েছে। এই জাতীয় কৌশলও এক এক রামধনুতে প্রকাশ ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'লাম।

ার্কাসে টিয়া পাখীর তারের উপর দিয়ে সাইকেল নোতে টিয়া পাখীর কৃতিত্বের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সাইকেলেরও কৃতিত্ব যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সাইকেলের কেন্দ্র সর্ব্বদাই তারের নীচে থাকে।

ারীরিক শক্তি ও কৌশলের প্রদর্শনী করতে যে বহু ই যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হ'তে হয় তার দৃষ্টান্তের ব নেই। তাই আজ "ব্যালান্সিং কার্ড", আপাতঃ তা জাগলিং বলে মনে হবে, তার কৌশল প্রকাশ গিয়ে সার্কাসের কথার রেশ টানতে হ'ল।

বার ব্যালান্সিং কার্ডএর প্রদর্শন পদ্ধতি ও কৌশল করে দিচ্ছি।

তাসের খেলা দেখাবার সময় একটা তাস ও একটা ন গ্লাস যাদুকর পরীক্ষা করতে দেবেন। দর্শকেরা

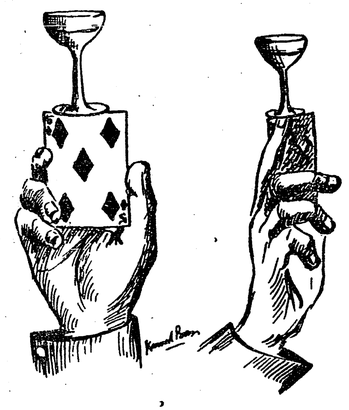

১নং ছবি

ক্ষা করে দেখবেন যে উভয়ই সাধারণ, তা'তে যাদুর ন কারসাজিই নেই। এর পর গ্লাসটী তাসের ওপর রেখে শুধু তাসটী ধরে গ্লাসের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ১নং ছবি দেখ। বাঁদিকের ছবিতে দর্শকরা যেমন দেখবেন তা দেখান হয়েছে। ডান দিকে যাদুকরের কৌশল।

এর পর যাদুকর ধীরে ধীরে তাঁর হাতটা ডান দিকের ছবির মত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন তিনি কি ভাবে এই খেলাটা করছিলেন এবং বলবেন যে তাঁর ইচ্ছা যে এই খেলাটী সকলে শিখুন।

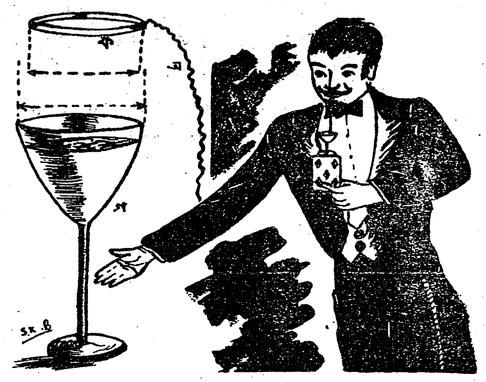

২নং ছবি

ক—কাগজের রিং, অ—অদৃশ্য সুতো, গ—ওয়াইন গ্লাস

যা'তে সকলে ভাল ভাবে খেলাটী শিখতে পারেন সেই জন্য যাদুকর আবার খেলাটী দেখাবেন। এবার কিন্তু গ্লাস সমেত হাত ঘুরিয়ে ফেলার সময়ে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে, লক্ষ্য করবেন যে যাদুকর আঙ্গুল দিয়ে গ্লাসটী ধরে রাখেন নি—মাত্র দুই আঙ্গুলে তাস ধরে তার উপরে গ্লাসটী ব্যালান্স করেছেন। দর্শকদের দুর্ভাগ্য তাঁরা খেলাটী আর শিখতে পারলেন না। এতে তবে তাঁদের দুঃখ হবে না কারণ তাঁরা ম্যাজিক দেখতেই এসেছেন, শিখতে আসেন নি। যাদুকরও যথেষ্ট প্রশংসা পাবেন।

প্রথম বার কৌশল শেখাবার পর গ্লাসটায় কিছু রঙীন্ পদার্থ ঢেলে দিতে হবে। একটা সেলোফেন কাগজের রিং তৈরী করতে হবে, যাতে এটার পরিধি গ্লাসের ওপরকার পরিধির চাইতে অল্প ছোট হয়। যে রঙের তরল পদার্থ গ্লাসে ঢালা হবে সেই রঙের কাগজ হওয়া

TIGHT BINDIN

চাই। এবার ইঞ্চি দশেক লম্বা খুব পাতলা কালো রংএর রেশমের সূতো এই রিংএর সাথে আঠা দিয়ে যুড়ে দিতে হবে। এই রকম সূতোকে আমরা ইন্‌ভিজিবল্‌ থ্রেড বলি। রাত্রি বেলায় একটু দূর থেকে এ সূতো কোন মতেই দেখা যায় না।

গ্লাস দ্বিতীয় বার টেবিল থেকে নেবার সময় কৌশলে কাগজের রিংটা পরিয়ে নিতে হবে। এই কাগজ এমনই যে কাচের সঙ্গে লাগিয়ে ধরলে এর অস্তিত্ব সহজে অনুমান করা যায় না। এর ওপর রঙীন হওয়াতে রঙীন দ্রব্যের সঙ্গে এমন মিশে থাকবে যে আলাদা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হবে না।

এবার বাঁ হাতে কাগজ সুদ্ধ গ্লাস ধরে ডান হাতে অদৃশ্য সূতোর শেষ প্রান্ত ধরতে হবে। সূতোর প্রান্ত ধরা অবস্থায় গ্লাসের রঙীন দ্রব্যের আস্বাদন নেওয়ার ভাব দেখাতে গিয়ে সূতোর প্রান্তটাকে দাঁত দিয়ে ধরে ... হবে। আস্বাদন নেওয়ার সময় মুখ বিকৃতি ... দোষণীয় নয়, কাজে কাজেই কাজটী করতে ... অসুবিধা হবে না। এর পর ধীরে ধীরে বাঁ-হাতে গ্লা... নীচের দিকে নামাতে হবে যতক্ষণ না সূতো টা... হয়। এই কাজটী সাবধান হয়ে করতে হয় কারণ ... টানে সূতো ছিঁড়ে গিয়ে খেলা পণ্ড হ'তে পারে। ... হাতে একটী তাস নিয়ে সেটী গ্লাসের তলে ধরতে ... এই হ'ল খেলার কৌশল। (২নং ছবি)

এই পদ্ধতিটী আমার নিজস্ব। যাঁরা নূতনের ... তাঁদের আমি এটী করে দেখতে অনুরোধ করছি। ... ভাবে দেখাতে পারলে এই পদ্ধতিটীর সাহায্যে ... জানেন না এমন যাদুকরদেরও চোখ ধাঁধিয়ে ... যায়।

লাল কেল্লা

শ্রীসুমেধা মুখোপাধ্যায়

ঘোড়ার খুরে ধূলো উড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে যে দৌড়ে এলো সে হ'ল মহারাজ কেশর সিংএর গুপ্তচর অনামিল। ঘোড়ার মুখ দিয়ে তখন লালা ঝরছে বেশ। বিশ ক্রোশ মাত্র এই কয় ঘণ্টায় দৌড়ে আসা কি সোজা ব্যাপার ?...

সভায় বসে আছেন মহারাজ কেশর সিং স্বয়ং; সঙ্গে আছেন পাত্র, মিত্র, সভাসদ্; আর আছেন জাঁদরেল কুবের সিং। সবারই মুখ বিমর্ষ।

মহরাজ প্রশ্ন করলেন : কি সংবাদ নিয়ে এলে দূত ?

অনামিল উত্তর দিলে : সংবাদ সত্য, মহারাজ! রায়গড়ের রাজার একমাত্র কন্যাকে লালকেল্লার অধিপতি জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ প্রশ্ন করলেন : তার পর ?

অনামিল : তার পর রাজ্যে উঠেছে হাহাকার; লালকেল্লার শক্তি অপরিমিত—রায়গড়ের কেউ তাকে বাধা দিতে পারে নি।

ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল : বাধা দিতে পারে ... না বাধা দেয় নি ? কোন্‌টা সত্যি ?

অনামিল : অগণিত সুশিক্ষিত দুর্বৃত্তের হাতে ... জেনে রায়গড়ের প্রজারা বাধা দেয় নি।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে মহারাজ মন্তব্য ক... কাপুরুষ!

সভাস্থল নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ... এসেছে। ঘনায়মান অন্ধকারে আলো উঠলো ... মহারাজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার : এখানে কে ... আছে যে দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারে ? সেনাপতি!

সেনাপতি কুবের সিং সসম্ভ্রমে বল্লেন : মহারা... অনুমতির অপেক্ষা। কিন্তু...

—কিন্তু! কিন্তু কি ?

সেনাপতি আমতা আমতা করে বল্লেন : না, মা... লালকেল্লা......

মহারাজ বল্লেন : হ্যাঁ, লালকেল্লা। লালকে... ...র স্রোতে লাল করে দিতে হবে। ও কি! ভয় ...?

—না। তবে অনর্থক একটা গোলমাল! লাল-...ার সুশিক্ষিত সেনা অসংখ্য।...

—ও সব শোনবার সময় নেই সেনাপতি! রায়গড়ের ... আমার চিরশত্রু। তবুও তার অপমান আমার ...মান। তার কন্যা আমার কন্যা। রাজ্যের যে কোন ...র কন্যা আমার কাছে কম প্রিয় নয় আমার নিজের ...র চেয়ে। সবল যেখানে দুর্ব্বলের বুক থেকে তার ...জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়—তখন তাকে ক্ষমা করার ... ভীরুতা।

সেনাপতি : কিন্তু এ যুদ্ধেও যে আমরা জয়ী হ'তে ...বো না!

মহারাজ : কিন্তু মরতে তো পারবো।

সেনাপতি : তা'তে লাভ ?

মহারাজ : সেনাপতি ?

মহারাজের গম্ভীর স্বরে সকলেই স্তম্ভিত। স্বর সংযত ... মহারাজ বল্লেন :—ভীরু, কাপুরুষদের আমি ক্ষমা ...নে কোন দিন। যে দুর্বৃত্ত অসংখ্য লোকবলে ...ান হ'য়ে মুষ্টিমেয়ের উপর অত্যাচার করতে পারে ... যেমন কাপুরুষ, মুষ্টিমেয় বলে যারা সেই অত্যাচারের ...দ্ধে বুক ফুলিয়ে না দাঁড়ায় তারাও তেমনি কাপুরুষ। ... তারই প্রমাণ দিয়েছ আজ। রাজকার্য্য থেকে ...র নেবার সময় এসেছে তোমার...

তার পর তিনি উগ্রকণ্ঠে বল্লেন : কে আছ এমন বীর ...লকের মধ্যে সেই নির্য্যাতিতা রমণীকে উদ্ধার ক'রে ...তে পারবে, আর সেই সঙ্গে সেই অত্যাচারীর ...টা।

অনামিল : মহারাজ।

মহারাজ : তুমি ?

অনামিল : যদি মহারাজের অনুমতি হয়।

মহারাজ : পারবে ?

অনামিল : চেষ্টা তো করি!

মহারাজ : কিন্তু এর জন্যে দাম দিতে হবে কি জান ?

অনামিল : অনুমান করছি। কিন্তু আমায় আদেশ ... মহারাজ!

মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন; চলে-যাওয়া কার কথা যেন একবার ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন একবার; তারপর বল্লেন : আচ্ছা। যদি না পার ফিরে এসো না আর।

* * *

পরের দিন ঠিক এমনি সময়। উৎসুক সভাসদ্ পরিবৃত মহারাজ কেশর সিং অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন।

আবার সেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এবার যে এলো সে অনামিল নয়। এলো তার একজন অনুচর। সোজা লালকেল্লা থেকে দৌড়ে আসছে ঘোড়া।

'মহারাজ!' বলে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালো সে।

মহারাজ : কি সংবাদ ?

অনুচর : এই নিন্ মহারাজ অত্যাচারীর মুণ্ড।

মহারাজ : অপহৃতা রমণী ?

অনুচর : তাঁকেও উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু যিনি করেছেন তিনি অনুমতি না পেলে এখানে আসতে পারেন না।

মহারাজ : কে সে ? আচ্ছা,—ডাক।

অনুচর বেরিয়ে গেল। মহারাজ বিমনা হ'য়ে কি ভাবতে লাগলেন। সে আজ চার বছর আগের কথা। স্বেচ্ছাচারী একমাত্র পুত্র যুবরাজ অজিতসিংকে তিনি নির্ব্বাসিত করেছিলেন। সেই কি ফিরে এলো ? না, অসম্ভব!

আবার শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়া থেকে নামলো একজন, দু'জন, তিনজন। অনামিল—রায়গড়ের অপহৃতা রাজকন্যা—আর তৃতীয়টি কে ? অজিত সিং নয় ?

মহারাজ কঠোর হ'তে চেষ্টা করলেন। ধীর, সংযত পায়ে এগিয়ে এলেন কুমার অজিত সিং—অভিবাদন করে বল্লেন : মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। লালকেল্লার রাজাকে আমিই দিয়েছি শাস্তি। অস্ত্রশিক্ষা আমার ব্যর্থ হয় নি। রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'রে এনেছি। আমাদের নিরাপত্তার জন্যে রায়গড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব আবশ্যক। তারই সুযোগ দেবেন এই রাজকন্যা—তাই তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

নেমন্তন্ন খাইয়ে এঁটো পাতা বা পাত্র ফেলে দিই সেই রকম আর কি। বাসন ধোয়ার হাঙ্গামা নেই।

এই সব খাবার নানা রকম হ'তে পারে—ফল-মূল থেকে স্থরু ক'রে মুখরোচক কারি, মাংসের কালিয়া, চপ্, কাটলেট, ডিমের পোচ্, রোষ্ট—সবই এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা চলে। আমেরিকার নানা জায়গায় এই ধরণের খাবারের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অর্থাৎ জীবন-যাত্রার মজাটুকু বজায় রেখে হাঙ্গামা যতটা কমানো যায়। হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, হাসপাতালে—এমন কি অনেক বাড়ীতেও নাকি আজকাল রান্না-বান্নার পাট তুলে দিয়ে এই ধরণের 'তৈরী' খাবারের প্রচলন হচ্ছে। দূরে কোথাও যেতে হ'লে এ খাবার যে কত স্থবিধাজনক তা তো বুঝতেই পারছ। বিশেষ ক'রে এরোপ্লেনে লম্বা পথ পাড়ি দেবার সময়। এরোপ্লেনের ভিতর রকমারি খাবার রান্না করা কি রকম ফ্যাসাদ তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। এই ধরণের রান্না-করা খাবার আবিষ্কৃত হওয়ায় তাদের ভারী স্থবিধা হয়েছে। ঠাণ্ডা খাবার গরম ক'রে নেবার জন্য কোন কোন এরোপ্লেনে আবার বিশেষ ভাবে তৈরী গরম হাওয়ার বৈদ্যুতিক চুল্লী বসানো হচ্ছে। এতে কয়েক মিনিটের মধ্যে রেফ্রিজারেটারের খাবার স্বাভাবিক চেহারায় এনে টেবিলে পরিবেশন করা চলে।

ঠাণ্ডায় জমানো 'তৈরী খাবার' এদিক্ সেদিক্ পাঠাবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী গাড়ী—এমন কি রেলগাড়ীর কামরা পর্য্যন্ত তৈরী হয়ে গেছে!

ট্রামগাড়ীর গল্প

তোমাদের মধ্যে যারা পাড়াগাঁয়ে থাক তারাও বোধ হয় সহরে বেড়াতে এসে ট্রামগাড়ী দেখেছ এবং এক-আধবার চড়েছ। বড় বড় সহরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা অনেকখানি পথ, অথচ কাজেকর্ম্মে লোকেদের সর্ব্বদাই এদিক্ থেকে ওদিকে যাতায়াত করতে হয়। অল্প খরচে তাড়াতাড়ি যাতায়াতের স্থবিধার জন্যই এই গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলেবেলায় আমাদের ট্রামে চড়ে বেড়াতে ভারী মজা লাগত। এখন কিন্তু সেদিন আর নেই, কলকাতার ট্রামগাড়ীতে চড়বার কথা ভাবলেই এখন বিরক্তি লাগে—যা অসম্ভব ... ঠেলেঠুলে ওঠাও যেমন কষ্টকর, নামাও তেমনি।

ট্রামগাড়ী নাম কি ক'রে হ'ল জান? লোহার ... উপর দিয়ে যায় ব'লে যেমন রেলগাড়ীর নামকরণ ... তেমনি গোড়াতে ট্রামের উপর দিয়ে যেত ব'লে ... গাড়ীরও ঐ রকম নাম হয়েছিল। ট্রামগাড়ীর ... প্রচলন হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে—১৮৩২ ... তার জন্য যে লাইন পাতা হয় তা ছিল কাঠের বরগা ... তৈরী, আর কাঠের বরগাকে সে দেশে বলা হ'ত ... কালক্রমে কাঠের লাইন বদলে লোহার লাইনের চল ... কিন্তু ট্রামগাড়ীর নাম 'ট্রাম'ই রয়ে গেছে।

নিউইয়র্কের দেখাদেখি আস্তে আস্তে পৃথিবীর অন... বড় বড় সহরেও ট্রামগাড়ীর চলন হ'ল। ফ্রান্সে প্যা... সহরে, ইংল্যাণ্ডে লণ্ডন সহরে দেখতে দেখতে ট্রাম ... স্থরু করল। ইতিমধ্যে কলকাতাও বেশ বড় ... দাঁড়িয়েছে। এক বিলিতী কোম্পানী এসে কলকাতা... ট্রামগাড়ী চালাবার আয়োজন করল। সেটা ... সনের কথা।

কিন্তু এরা বেশী দিন কলকাতায় ট্রাম চালাতে ... নি। অল্প দিন পরেই সে ট্রাম উঠে যায়। তার ... দিন পরে ১৮৮০ সনে একটা বড় বিলিতী কোম্পানী ... কলকাতায় ট্রাম চালাবার একচেটিয়া অধিকার ... ক'রে নিয়ে ট্রাম লাইন খুলে বসল। এই কোম্পা... এখন পর্য্যন্ত কলকাতায় টিকে আছে।

কলকাতার চৌরঙ্গী, চিৎপুর এবং শিয়ালদহে ... ট্রাম চলতে স্থরু করে। তার পর ধীরে ধীরে কোম্... সহরের নানা অংশে শাখা ছড়িয়ে দেয়। অল্প কিছু ... আগেও তারা গড়িয়াহাট রোড আর আপার সার্কু... রোডে নতুন লাইন খুলেছে। শোনা যায় ভবি... নাকি কলকাতার বাইরে যাদবপুর অঞ্চলেও ট্রাম ... নেবার মতলব তাদের আছে।

প্রথম যুগে কলকাতায় যে ট্রাম চলত তার সঙ্গে ... এখনকার ট্রামের খুব কমই মিল আছে। সে ... এখনকার মত বিদ্যুতের শক্তিতে চলত না—ঘোড়া ... টানা হ'ত। কামরা থাকত একখানি। খুব ... অষ্ট্রেলিয়ান্ ঘোড়া লাইনের উপর দিয়ে ট্রাম টেনে ...

... খানিকটা পর পর ঘোড়া বদল করা হ'ত। এ ... রাস্তার জায়গায় জায়গায় ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ...। মোড় ঘুরবার সময়েও অতিরিক্ত ঘোড়া যুড়ে ... হ'ত। ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখার সৌভাগ্য ... আমাদের হয় নি, কিন্তু আমাদের বাবা-কাকার ...র যে গল্প শুনেছি তা শুনতে ভারী মজা লাগে। ...র সময় ট্রাম কোম্পানীর বেশ লোকসান হ'ত, কারণ ...মে প্রায়ই ঘোড়া মারা পড়ত। লোক বোঝাই ...ড় ভারী গাড়ী টেনে নেওয়া সোজা কথা নয় তো! ...না হয় লাইন পাতা! সময় সময় ঘোড়া বিগড়ে ...ত। তখন ট্রাম শুদ্ধ লোক নেমে হেঁইও হেঁইও ক'রে ...ঠেলত। ভাবতে পার সে দৃশ্য?

...ঘোড়ায় টানা ট্রামের অস্থবিধা দেখে পরে রেলগাড়ীর ...র মত ছোট ছোট এঞ্জিন লাগিয়ে ট্রাম চালাবার ...স্তে হয়। রাস্তা দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে, বাঁশী বাজিয়ে ...গাড়ী ছোটার মত ট্রাম ছোটা—সেও এক মজার ...র! তবে এ ব্যবস্থা সহরের সব জায়গায় হয় নি, ...ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তারা বৈদ্যুতিক ট্রাম চালাবার ...জন ক'রে ফেললেন। মাথার উপর মোটা তামার ...তিক তার মাকড়ষার জালের মত ট্রাম রাস্তা ছেঁকে ...। ট্রামের চেহারাও গেল বদলে। গাড়োয়ানের ...য় এল ড্রাইভার, লাগাম আর চাবুকের জায়গায় ...হাতল আর চাকা আর ঐ রকম মজার মজার সব ...এক কামরার জায়গায় যুড়ে দেওয়া হ'ল দু' কামরা—...বেশী পয়সা খরচ করবে তাদের জন্য প্রথম শ্রেণী, ...দের জন্য ২য় শ্রেণী। বলা বাহুল্য ট্রামের গতিবেগও ...বেড়ে। ১৯০২ সন থেকে কলকাতার বুকে বৈদ্যু-...ট্রামের চলন স্থরু হয়। এই ট্রাম কি ভাবে চলে ...রা নিশ্চয়ই দেখেছ। ট্রামের ছাদের ওপর থাকে ...লম্বা লোহার ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা গোল ছোট ...। সেটা ওপরের তামার তারের সঙ্গে ছুঁয়ে থাকে। ...লবার সময় মাথার ঐ চাকাটিও ঘুরতে থাকে আর ... ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি এসে ট্রামের যন্ত্রে পৌঁছে ... ঠেলে নেয়।

...ার পরেও ট্রামগাড়ীর চেহারা একটু আধটু ...ছে। আমরা ছেলেবেলা যে ট্রাম দেখেছি তার রং হ'ত সব হলদে আর খয়েরী মেশান। ভিতরে ঢোকবার জন্য অনেকগুলি দরজা থাকত। লম্বা ফুটবোর্ড রেল-গাড়ীর মত দেখতে, আর কণ্ডাক্টারকে গাড়ীর বাইরে সেই ফুটবোর্ডের উপরই প্রায় সারাক্ষণ থাকতে হ'ত। তার পর গাড়ীর চেহারা একটু বদলান হ'ল। দরজার সংখ্যা কমিয়ে সামনে পেছনে দু'টি করা হ'ল, তার মধ্যেও আবার যাত্রীদের জন্য রইল শুধু পেছনেরটা। এ রকম ট্রাম আজও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ট্রামের, রং হয়ে গেল সব সবুজ।

১৯২৫ সন থেকে কলকাতার রাস্তায় ট্রামের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দেখা দিল। সে হচ্ছে বাস্। বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রামকে নানা নতুন বিষয়ে নজর দিতে হ'ল। দুপুর বেলায় সস্তা টিকেট (এখন উঠে গেছে), মাসিক টিকেট ইত্যাদি। তার পর কোম্পানী নতুন চেহারার এমন সুন্দর গাড়ী বার করল—যা নাকি পৃথিবীর খুব কম জায়গায়ই দেখা যায়। যাঁরা পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরেছেন তাঁরা বলেন এক আমেরিকা ছাড়া এমন সুন্দর, আরামদায়ক গাড়ী আর কোথাও তাঁরা দেখেন নি, ইয়োরোপেও না। বসবার জন্য চমৎকার গদী, মাথার উপর বিজলী পাখা, বাইরেও সুদৃশ্য ধুসর রং, কত কি!

কলকাতার ট্রাম কোম্পানীর চুক্তি কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শোনা যাচ্ছে চুক্তি ফুরিয়ে গেলেই কলকাতার কর্পোরেশন এই কোম্পানী কিনে নেবেন। এর জন্য অবশ্যি প্রচুর টাকার দরকার। তার জন্যও তোড়-জোড় চলছে।

এতক্ষণ কলকাতার ট্রামগাড়ীর কথাই বললাম। ভারতবর্ষের আরও অনেক বড় বড় সহরে ট্রামগাড়ী চলে। বোম্বাইএর ট্রামগুলো দোতলা। ভারতের রাজধানী দিল্লী সহরের ট্রামগাড়ী কেউ দেখেছ? দেখলে নিশ্চয়ই ভক্তি চটে যাবে। একেবারে ছ্যাকরা গাড়ীর মত চেহারা, যদিও বৈদ্যুতিক শক্তিতেই চলে। যেমন রং তেমনি ঢং, রাজধানীর পক্ষে একেবারেই বেমানান। এ ট্রাম অবশ্যি দিল্লীর খুব অল্প জায়গায়ই যাতায়াত করে।

যুক্ত প্রদেশের কানপুর বেশ একটা বড় ব্যবসায়ী সহর। কলেজে পড়বার সময় আমরা একবার কল-

কারখানা দেখবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দল বেঁধে সেখানে গিয়েছিলাম। রাস্তা কাঁপিয়ে ট্রাম চলেছে; বৈদ্যুতিক ট্রাম। যদিও এক কামরা তবে দিল্লীর মত অতটা বাজে নয়। সেই ট্রামে চড়ে আমরা সহরের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ালাম।

এর কয়েক বছর পরে আবার একবার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে কানপুর গেছি; আমিই সেখানে পুরোনো, আর সবাই নতুন। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছি, কানপুরে ভাবনা নেই, টামে চড়ে ঘোরা যাবে। কিন্তু গিয়ে দেখি কোথাও ট্রামের চিহ্ন নেই। বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলেন—'কোথায় তোমার ট্রাম? আকাশে উড়ছে বুঝি?' কি জবাব দেব ভেবে পাই না। হঠাৎ রাস্তার এক জায়গায় ধুলোর নীচে ট্রাম লাইনের চক্ চক্ করছে। টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস 'এখানে আগে ট্রামগাড়ী দেখেছিলাম, কি হ'ল?' টাঙ্গাওয়ালা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আ... তুড়ি মেরে জানাল, "খতম্ হো গয়া।" টাঙ্গা... পাল্লা দিয়ে ট্রাম কোম্পানী লাল বাতি জেলেছে, টাঙ্গাওয়ালার এত আহ্লাদ।

কে জানে ভবিষ্যতে কলকাতায় টিউব রে... জাতীয় কোন নতুন গাড়ীর আবির্ভাব হ'লে ... অগতির গতি ট্রামেরও ঐ দশা হবে কি না!

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর তোমাদের জানা উচিত। চেষ্টা কর দেখি? উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।

(১) এই কথাগুলি বলতে কি বোঝায়?—প্রুফশীট, অটোগাইরো, পোলো, স্মল্ পাইকা, গ্রন্থ সাহেব।

(২) নীচে কতকগুলো খাবার আর জায়গার নাম দেওয়া হ'ল। এর কোন্ জায়গা কোন্ খাবারের জন্য বিখ্যাত?—ছানাবড়া, সরপূরিয়া, ডাঁটা, সীতাভোগ, মোরব্বা, আমৃত্তি, কাঁচাগোল্লা, ফজলী আম, লিচু, ...

বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বীরভূম, ... নাটোর, জয়নগর, ঢাকা, মজঃফরপুর, মালদহ।

(৩) রেশম তৈরী হয়—তূলো থেকে, এ... গাছের আঁশ থেকে, এক রকম পোকা থেকে, ... লোম থেকে।—কোন্‌টি ঠিক?

(৪) নীচে কি কি ভুল আছে?—

(ক) সুশ্রুত ছিলেন বড় একজন নৈয়ায়িক ... বারভূঞার মধ্যে যশোহরের রাজা গণেশ ছি... প্রতাপশালী। (গ) বাংলার প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন ... চন্দ্র ঘোষ।

(৫) পাশের ও নীচের ছবি দু'টি কার বা ...

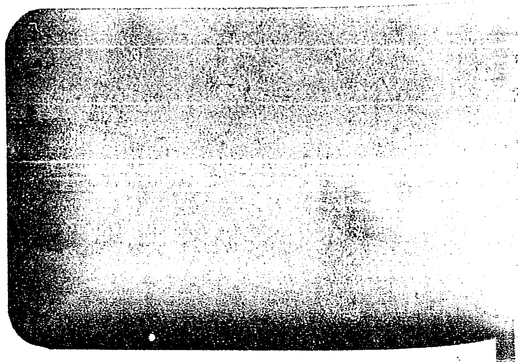

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

...াণিক মেলা:—সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ...এন. দে য়্যাণ্ড কোং, ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, ...তা। দাম ৩।৹

...াণিক মেলা' নতুন পূজা-বার্ষিকী। শিশুসাহিত্যের ...সকল নাম-করা লেখকের রচনাই এতে স্থান পেয়েছে। ...তাই নয়, সচরাচর যে সব বার্ষিকী আমাদের চোখে ...তার তুলনায় এতে বৈচিত্র্য খুব বেশী,—পৃথিবীর ...ভাবধারার সঙ্গে শিশুজগৎকে পরিচিত করাবার প্রচুর ...জন সহজেই চোখে পড়ে। এদিক্ দিয়ে সম্পাদনার ...স্বীকার করতেই হবে।

...ইখানির ছাপা, কাগজ এবং রূপসজ্জা উল্লেখযোগ্য। ...লিও সুন্দর। ছেলেমহলে এর আদর অবশ্যম্ভাবী।

...ারো ভূতের গল্প:—সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ...সাহিত্য সম্প্রদায়, ৪৪৬।১, কালীঘাট রোড, ...কাতা। দাম ১।৹

...টি একটি ভূতের গল্পের সংকলন। বারো জন ...কের (ভূতের নয়) বারোটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। ...দের ভূতের গল্প শুনিয়ে তাদের আরও ভীতু ক'রে ... উচিত কিনা এ বিষয়ে কারও কারও মতদ্বৈধ ...লেও পৃথিবীর প্রায় সকল সাহিত্যেই ভূতের গল্প ...াল চলে এসেছে এবং রসপিপাসুদের কাছে তা ...াল আদর পেয়েছে, ভবিষ্যতেও পাবে। এই ...লন-গ্রন্থের অনেক লেখক তোমাদের পরিচিত এবং ...নর ক'টি লেখার মধ্যেই মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।

...ামাদেরই মত ছেলে:—শ্রীবিজনকুমার ...াধ্যায় প্রণীত। সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর, ...গণা। ২য় সংস্করণ। দাম ॥৵৹

... হয়ে যাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন ছেলে- ... তাঁদের অনেকেই তোমাদেরই মত ছিলেন—...দেরই মত দুষ্টুমি করতে তাঁদের বাধত না। ...ই ছেলেবেলার কতকগুলি গল্প। ছেলেবেলায় ...রন্ত হ'লেও ভবিষ্যৎ জীবনে মহাপুরুষ হ'তে কোন ...থাকে না—এই গল্পগুলিতে তাই প্রমাণ করা হয়েছে। পড়লে তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বইখানির একাধিক সংস্করণ এর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

এর শেষ কোথায়:—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। দীপালী গ্রন্থমালা, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম ২৲

এটি ছোটদের জন্য লেখা একখানি বারোয়ারী উপন্যাস। কিন্তু বারোয়ারী হলেও এর মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। লেখা সুরু করেছেন সম্পাদক মশাই এবং শেষ করেছেন সুসাহিত্যিক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য। আর বাকি অংশ পূর্ণ করার ভার নিয়েছেন 'ছুটির ঘণ্টা' আসরের ১৫টি ছেলেমেয়ে। কাজেই কৃতিত্বটা তাঁদেরকেই দেওয়া উচিত।

পুরু কাগজে ছাপা, মলাটটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শেষ রাতের অতিথি:—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত প্রণীত। সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। দাম ১॥৹

এখানি একখানি কিশোর-উপন্যাস,—গ্রন্থকারের ভাষায় "গল্প নয়।…একটি ভাগ্যহীন কিশোরের জীবন-কথা।" মণীন্দ্র বাবু শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত ন'ন—ছোটদের মন আকর্ষণ করার ক্ষমতা তাঁর কলমের আছে। এই উপন্যাসখানিতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাথমিক (হিন্দী) অনুবাদ শিক্ষা:—রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক অধ্যাপক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫। দাম ।৵৹

ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজন আরও বেড়ে গেছে। বিদেশী ভাষার বদলে নিজেদের একটা রাষ্ট্র-ভাষারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষা প্রচুর সম্পদ্‌শালী এবং ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও সর্ব্ব ভারতে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যাই বোধ হয় কিছু বেশী, এবং যারা এ ভাষায় কথা বলে না তারাও প্রায় সবাই এ বুঝতে পারে। কাজেই বাংলার উপযুক্ত দাবী

থাকলেও ভারতের রাষ্ট্রভাষা 'হিন্দী' হবার সম্ভাবনাই দাঁড়িয়েছে বেশী। হিন্দী সাহিত্যও বর্ত্তমানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সব কারণে হিন্দী শেখার প্রয়োজন অস্বীকার করবার উপায় নেই। গ্রন্থকার এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। হিন্দী শেখাবার ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রচুর। এই বইখানির সাহায্যে ঘরে বসে হিন্দী শিখবার একটা নতুন পথ তিনি দেখিয়ে দি বাংলা মূল থেকে হিন্দী অনুবাদের সহজ প্রণালী হিন্দী অনুবাদ বইখানির বিশেষত্ব। তা ছাড়া বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষার্থীর পক্ষে তা সহজপাঠ্য হয়েছে। যাঁরা অল্পায়াসে হিন্দী শিখতে তাঁদের প্রত্যেকের বইখানি সংগ্রহ করা উচিত।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

জয় হিন্দ। কাগজের বিভ্রাট সত্বেও কার্ত্তিক সংখ্যা যে পূজোর আগেই তোমাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি সে জন্য স্বস্তি অনুভব করছি। দেশ স্বাধীন হ'লে কি হয়, ঝঞ্ঝাট রয়ে গেছে ষোল আনা।

প্রতিবারে শারদীয় সংখ্যায় আমরা ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি বন্ধ রাখি, কিন্তু এবারে বহু পাঠক-পাঠিকা এ বিষয়ে অনুযোগ করেছেন। রামধনু খুলে তাঁরা গোড়াতেই ক্রমশঃ লেখাগুলো পড়তে চান। এক মাস অপেক্ষার পরও যদি তাঁদের হতাশ হ'তে হয় এবং আবার এক মাস অপেক্ষা করতে হয় তবে অনেকখানি আনন্দই নাকি মাটী হয়ে যায়! তাঁদের অনুরোধ মত এ সংখ্যায় তাই সব ক'টি ধারাবাহিক রচনাই দেওয়া হ'ল। বলা বাহুল্য—এতে পূজা-সংখ্যার বৈশিষ্ট্য গল্পের ভাগ কিন্তু কিছু কমে গেল!

গত সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের অসমীয় গ্রাহিকা শ্রীবকুল তামুলীর চিঠিখানি তোমাদের অনেকেরই চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে জেনে সুখী হ'লাম। বাস্তবিক, কথা- গুলি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার মত। সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতা জিনিষটাও যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সেদি প্রত্যেক প্রদেশের লোকের,—বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়ে দেখা উচিত। সম্প্রতি কতকগুলি প্রদেশে এ অপ্রীতিকর ঘটনার খবর প্রায়ই কাগজে বেরোচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নানা সমস্যা তোমাদের কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পাচ্ছি। শ্রী মজুমদার, শ্রীবিজয়া বরা, শ্রীঅমলকুমার মিত্র, শ্রী বসু, শ্রীনীলিমা রায়, কুমারী রাবেয়া খাতুন—এঁদে গুলি উল্লেখযোগ্য। তোমরা যে দেশের বিভিন্ন নিয়ে এই বয়সেই এমন ভাবতে শিখেছ তা জে ভাল লাগল।

আশা করি পূজোর দিনগুলো ভাল ভাবেই কা অন্ততঃ তোমরা সে বিষয় সাহায্য করবে। তে ছেলেমেয়ে—কিশোর-কিশোরীরাই, দেশকে নতুন গড়ে তুলতে পার এ বিশ্বাস আমার আছে। মাতরম্।

—ইতি রা

গত ২রা অক্টোবর বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধী ৭৮ বছর পার হয়ে ৭৯ বছরে পা দিয়েছেন। প্রথম বার এই পুণ্য দিনটিতে সমস্ত ভারত যুড়ে ছুটী ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে গান্ধীজি বার বলেছিলেন তিনি ১২৫ বছর বেঁচে স্বাধীন, ভারত দেখে যেতে চান। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘোড়া ভ্রাতৃকলহ দেখে বলেছেন—এ দৃশ্য দেখবার জন্য তাঁর বেঁচে থাকবার ইচ্ছা নেই। তা সত্বেও আমরা দীর্ঘ জীবন কামনা করব এবং এ দৃশ্য যাতে এখনই হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।

* * *

ভারত স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু সমস্যার আর তার নেই। পাঞ্জাবের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের ফলে অশান্তি চলেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ী, ভিটে- বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ফেলে আশ্রয়ের আশায় অন্যত্র আসছে। এদের কাহিনী শুনলে চোখে জল আসে। মহাযুদ্ধে ব্রহ্মদেশ থেকে যে ভাবে লোক চলে এসেছিল তার চেয়েও ভয়াবহ। পালাবার পথেও গুণ্ডার থেকে নিস্তার নেই।

* * *

কাথিওয়াড়ের ক্ষুদ্র জুনাগড় রাজ্যের নবাব প্রজা- রণের মতামতের অপেক্ষা না ক'রে পাকিস্থান মিনিয়নে যোগ দেওয়ায় ব্যাপারটা একটু ঘোরাল দাঁড়িয়েছে। কাথিওয়াড়ের অন্যান্য রাজ্যগুলি এতে বোধ করছে। ভারত গভর্ণমেণ্টও জুনাগড়ের এ মেনে নিতে রাজী হ'ন নি—তাঁরা সেখানে ভোটের দাবী করেছেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে পাকিস্থান রের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা চলছে। এই লোচনার ফলাফলের উপর ঐ অঞ্চলের শান্তি অনেকটা করবে।

সম্প্রতি নবগঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্র ইউ. এন্. ওর সদস্য পদ লাভ করেছে। তবে মজার কথা এই, এই ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেছিল মাত্র একটি দেশ—তাদেরই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র—আফগানিস্থান।

* * *

ভারতবর্ষের বাছাই করা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল এই প্রথম বার অষ্ট্রেলিয়ায় টেষ্ট্ ম্যাচ্ খেলতে যাচ্ছেন সে খবর তোমরা আগেই পেয়েছ। গত ৮ই অক্টোবর এই দল কলকাতা থেকে আকাশপথে অষ্ট্রেলিয়া রওনা হয়ে গেছেন। দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মার্চেণ্ট অসুস্থতার জন্য এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন নি। তা ছাড়া শেষ মুহূর্ত্তে মুস্তাক আলি, ফজল মামুদ এবং মোদিও যেতে না পারায় দলটি একটু দুর্ব্বলই হয়ে পড়েছে বলা যেতে পারে। দলের অধিনায়ক হয়ে গেছেন লালা অমরনাথ। এঁরা ছাড়া ম্যানেজার হিসাবে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত এবং সংবাদ পরিবেশক হিসাবে সুবিখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড় দলীপ সিংজিও এই দলের সঙ্গে আছেন।

লালা অমরনাথ

* * *

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসভা সম্প্রতি বাংলা ভাষাকে এই প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে যে আদেশ জারি করেছেন তার জন্য দেশবাসী তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই আদেশে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের তাঁদের কাগজ-পত্রে ইংরেজীর বদলে যথাসাধ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। উগ্র সাহেবী রুচির কোন কোন উচ্চ কর্ম্মচারী এতে অসুবিধা ভোগ করলেও আশা করি অল্প দিনেই এটা তাঁদের অভ্যাস হয়ে যাবে। প্রচলিত কোন কোন ইংরেজী শব্দের ঠিক মত বাংলা প্রতিশব্দ যোগাড় করতে প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক

কিন্তু মাতৃভাষায় মনের কথা প্রকাশ করার অক্ষমতা নিশ্চয়ই শিক্ষিত লোকেদের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সাহায্যেই করবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

* * *

দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাবের কথা তোমরা জান। মাঝখানে খাদ্য পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে পড়ায় আবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘোষ-মন্ত্রিসভার চেষ্টায় তা অনেকটা আয়ত্তে এসে গেছে, তবে এখনও স্বাভাবিক হয় নি। খাদ্যে ভেজাল, চোরা কারবার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতরকার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যও এঁরা প্রশংসনীয় অভিযান সুরু করেছেন।

* * *

দীর্ঘ দিন কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল্ খেলা বন্ধ থাকার পর অল্প কয়েকদিন আগে এরা আই. এফ. এ শীল্ড্ প্রতিযোগিতা সুরু হয়। ফাইনালে বি. এ. আর দলকে পরাস্ত ক'রে ইষ্ট দল একদিকে ফাইনালে ওঠে, অপর দিকে মহ স্পোর্টিং দলকে পরাস্ত ক'রে ফাইনালে ওঠে বাগান। ৪ঠা অক্টোবর এই দুই শক্তিশালী দল ফাইনাল খেলার জন্য সমবেত হয়। শেষ পর্য্যন্ত খেলা হ'তে পারে নি। লক্ষ লক্ষ খেলা দেখতে এসে টিকিট না পেয়ে উত্তেজিত ওঠে এবং তাদের একদল গেট ভেঙ্গে মাঠের ভিতর পড়ে। তার পর জনতা যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে মোটেই খেলোয়াড়ী মনোভাব বলা চলে না। সুরু হাঙ্গামা। তারপর অনেক অপ্রীতিকর কাণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষ খেলা স্থগিত রাখতে বাধ্য হ'ন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(২৬২ পৃষ্ঠা দেখ)

(১) ছাপার আগে ছাপাখানা থেকে অক্ষর সাজিয়ে ভুল সংশোধন করে দেবার জন্য কাগজে যে ছাপ দেওয়া হয় তাই। বিশেষ ধরণের এরোপ্লেন—যা মাটীর ওপর দৌড়ে না গিয়ে সোজা ওপরে উঠে যেতে পারে। এক রকম খেলা—ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয়। ছাপবার অক্ষর বিশেষ (যাতে এই লাইনটি ছাপা হয়েছে)। শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ।

(২) বহরমপুরের ছানাবড়া, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া কাটোয়ার ডাঁটা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বীরভূমের মোরব্বা, ঢাকার আমৃত্তি, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, মালদহের ফজলী আম, মজঃফরপুরের লিচু, জয়ন মোয়া।

(৩) এক রকম পোকা থেকে।

(৪) (ক) সুশ্রুত নৈয়ায়িক ন'ন—আয়ুর্ব্বেদ চি সক (খ) রাজা গণেশ বার ভূঞার কেউ ন'ন, ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন রাজা। দিনাজপুরের গণে বার ভূঞার একজন। যশোহরের ভূঞার নাম পাদিত্য। (গ) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম ব প্রধান মন্ত্রী। পূর্ব্ব বাংলার মিঃ খাজা নাজিমুদ্দিন।

(৫) যতীন দাস, নিউদিল্লী—সম্মুখে সেক্রেটা ও আইন পরিষদ্ ভবন।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—এই সংখ্যা (কার্ত্তিক) রামধনুর একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা। ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে লেখা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও নিজের গ্রাহক নং দিতে হবে। আমাদের চূড়ান্ত। ১ম, ২য়, ৩য়—এই তিনটি পুরস্কার হবে।

যে বই তোমরা পড়তে পার

ভোম্বল সর্দ্দার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঋষি অরবিন্দ—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, আকাশ গঙ্গা—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, গৌতমের গতজন্ম—শ্রীনরেন্দ্র দেব, কাণাকড়ির খাতা—শ্রীসুনির্ম্মল বসু, আধুনিক রবিন হুড—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, চায়ের ধোঁয়া—অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহিম ডাকাত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, কুহকের দেশে—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, উঁচুনীচু—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ইয়োরোপের চিঠি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ইউরোপের আলো—শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কপোত—পোত (২) ময়দান—ময় (৩) কবীর—বীর (৪) কায়স্থ—কায় (৫) চরণ—রণ (৬) কাগজ—গজ (৭) জলাশয়—লাশ (৮) মাকাল—কাল।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—মঞ্জুশ্রী, বাপ্পা, লব, কুশ (ভবানীপুর); নবেন্দু সেন (কলিকাতা ২৯); সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা) বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যা (কলিকাতা ২৫); রাধাবিনোদ সুরাল (শিলদা); ছবি ছায়া, মায়া, সুশীল রায় (নিউ দিল্লী); শিবু, বোদো ডলি, কমলা, মীনা, মগন ও টিটি (জামসেদপুর); গৌরাঙ্গ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); শীলা রায় (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

(সংগ্রহ)

অনেক দিন আগেকার কথা, এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব তখন সবে সুরু হয়েছে। পাটগ্রামের হরিশ বাঁড়ুয্যে মশাই তক্তপোষে ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন, সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ননীবালা। এমন সময় কে একজন এসে ঘরে ঢুকলেন; তার পর হরিশ বাবুর পায়ের কাছে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন, কিন্তু হরিশ বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলেন না। বরঞ্চ দেখা গেল, উলটে হরিশ বাবুর স্ত্রী ননীবালাই গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। বলতে পার ইনি কে?

কিন্তু মাতৃভাষায় মনের কথা প্রকাশ করার অক্ষমতা নিশ্চয়ই শিক্ষিত লোকেদের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সাহায্যেই করবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

* * *

দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাবের কথা তোমরা জান। মাঝখানে খাদ্য পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে পড়ায় আবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘোষ-মন্ত্রিসভার চেষ্টায় তা অনেকটা আয়ত্তে এসে গেছে, তবে এখনও স্বাভাবিক হয় নি। খাদ্যে ভেজাল, চোরা কারবার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতরকার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যও এঁরা প্রশংসনীয় অভিযান সুরু করেছেন।

* * *

দীর্ঘ দিন কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল্ খেলা বন্ধ থাকার পর অল্প কয়েকদিন আগে এরা আই. এফ. এ শীল্ড্ প্রতিযোগিতা সুরু হয়। ফাইনালে বি. এ. আর দলকে পরাস্ত ক'রে ইষ্ট দল একদিকে ফাইনালে ওঠে, অপর দিকে মহ স্পোর্টিং দলকে পরাস্ত ক'রে ফাইনালে ওঠে বাগান। ৪ঠা অক্টোবর এই দুই শক্তিশালী দল ফাইনাল খেলার জন্য সমবেত হয়। শেষ পর্য্যন্ত খেলা হ'তে পারে নি। লক্ষ লক্ষ খেলা দেখতে এসে টিকিট না পেয়ে উত্তেজিত ওঠে এবং তাদের একদল গেট ভেঙ্গে মাঠের ভিতর পড়ে। তার পর জনতা যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে মোটেই খেলোয়াড়ী মনোভাব বলা চলে না। সুরু হাঙ্গামা। তারপর অনেক অপ্রীতিকর কাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ খেলা স্থগিত রাখতে বাধ্য হ'ন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(২৬২ পৃষ্ঠা দেখ)

(১) ছাপার আগে ছাপাখানা থেকে অক্ষর সাজিয়ে ভুল সংশোধন করে দেবার জন্য কাগজে যে ছাপ দেওয়া হয় তাই। বিশেষ ধরণের এরোপ্লেন—যা মাটীর ওপর দৌড়ে না গিয়ে সোজা ওপরে উঠে যেতে পারে। এক রকম খেলা—ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয়। ছাপবার অক্ষর বিশেষ (যাতে এই লাইনটি ছাপা হয়েছে)। শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ।

(২) বহরমপুরের ছানাবড়া, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া কাটোয়ার ডাঁটা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বীরভূমের মোরব্বা, ঢাকার আমৃত্তি, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, মালদহের ফজলী আম, মজঃফরপুরের লিচু, জয়নগরের মোয়া।

(৩) এক রকম পোকা থেকে।

(৪) (ক) সুশ্রুত নৈয়ায়িক ন'ন—আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ (খ) রাজা গণেশ বার ভূঞার কেউ ন'ন, ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন রাজা। দিনাজপুরের গণেশ বার ভূঞার একজন। যশোহরের ভূঞার নাম পাদিত্য। (গ) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বা প্রধান মন্ত্রী। পূর্ব্ব বাংলার মিঃ খাজা নাজিমুদ্দিন।

(৫) যতীন দাস, নিউদিল্লী—সম্মুখে সেক্রেটারি ও আইন পরিষদ্ ভবন।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—এই সংখ্যা (কার্ত্তিক) রামধনুর একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা। ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে লেখা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও নিজের গ্রাহক নং দিতে হবে। আমাদের চূড়ান্ত। ১ম, ২য়, ৩য়—এই তিনটি পুরস্কার হবে।

যে বই তোমরা পড়তে পার

ভোম্বল সর্দ্দার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঋষি অরবিন্দ—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, আকাশ গঙ্গা—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, গোতমের গতজন্ম—শ্রীনরেন্দ্র দেব, কাণাকড়ির খাতা—শ্রীসুনির্ম্মল বসু, আধুনিক রবিন হুড—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, চায়ের ধোঁয়া—অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহিম ডাকাত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, কুহকের দেশে—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, উঁচুনীচু—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ইয়োরোপের চিঠি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ইউরোপের আলো—শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কপোত—পোত (২) ময়দান—ময় (৩) কবীর—বীর (৪) কায়স্থ—কায় (৫) চরণ—রণ (৬) কাগজ—গজ (৭) জলাশয়—লাশ (৮) মাকাল—কাল।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—মঞ্জুশ্রী, বাপ্পা, লব, কুশ (ভবানীপুর); নবেন্দু সেন (কলিকাতা ২৯); সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা) বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৫); রাধাবিনোদ সুরাল (শিলদা); ছবি ছায়া, মায়া, সুশীল রায় (নিউ দিল্লী); শিবু, বোদো ডলি, কমলা, মীনা, মগন ও টিটি (জামসেদপুর); গৌরাঙ্গ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); শীলা রায় (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

(সংগ্রহ)

অনেক দিন আগেকার কথা, এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব তখন সবে সুরু হয়েছে। পাটগ্রামের হরিশ বাঁড়ুয্যে মশাই তক্তপোষে ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন, সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ননীবালা। এমন সময় কে একজন এসে ঘরে ঢুকলেন; তার পর হরিশ বাবুর পায়ের কাছে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন, কিন্তু হরিশ বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলেন না। বরঞ্চ দেখা গেল, উলটে হরিশ বাবুর স্ত্রী ননীবালাই গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। বলতে পার ইনি কে?

ঘরে বসে অল্পায়াসে হিন্দী

শিখবার জন্য

প্রাথমিক (হিন্দী) অনুবাদ-শিক্ষা

রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক

অধ্যাপক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত

দাম ।/০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

অল্প মূল্যে পুরাতন ব্লক্

আমাদের নিকট নানা ধরণের ছোট-ব
হাফ্‌টোন ব্লক্ (কপার ও জিঙ্ক) সস্তায় বিক্রয়
মজুত আছে। 'ক্যালেণ্ডার ছাপিবার উপযো
নানাবিধ ব্লক্‌ও পাওয়া যায়। অর্ডার দিলে পছ
মত ব্লক্ ছাপাইয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :—

পি. চ্যাটার্জ্জি

C/o রামধনু কার্য্যালয়, ১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা ২৫

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-কুমারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যাস। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িতে বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীর হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।
—আনন্দবাজার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ **কৈশোরক** বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যিক দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের **'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা'** ও বিশু গুপ্তের **'নবীন সূর্য'** নামক দু'খানা উপন্যাস চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

অভ্যুদয় চক্রের প্রথম গ্রন্থ

"মায়াকাজল"

[রঙিন ছবিতে ভরা ছোটদের ভূতের গল্প সংকলন]

সম্পাদনা : সুনীল ঘোষ

চিত্তাকর্ষক তো বটেই—লোমহর্ষকও কম নয়। শিশুর সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে প্রত্যেকটি গল্প শিশুমনকে সবল ও সুস্থ করার চেষ্টা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকদের রচনাসম্ভার নিয়ে "মায়াকাজল" ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করবে। লিখেছেন :

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ; প্রেমেন্দ্র মিত্র ; নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ; ডাঃ ক্ষেত্রপাল-দাস ঘোষ ; নীহাররঞ্জন গুপ্ত ; ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ; ধীরেন্দ্রলাল ধর ; অখিল নিয়োগী ; শুদ্ধসত্ত্ব বসু ; মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় ; ইন্দিরা দেবী ; সুমেধা মুখোপাধ্যায় ; সুনীল ঘোষ ও আরও অনেকে।

বুক কাঁপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম ১।০

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে—সেই বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল
প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর
কাঠের ড্রাগন
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের
বজ্র ভৈরবের মন্ত্র

মুখস যখন খুলে গেল
তরুণ লেখক অজয় বসাকের
হত্যা যাদের নেশা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
সীমান্তের বন্ধু (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গদ্যের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ৷৷৵০

তা ছাড়া পূজোয় ছেলেমেয়েদের পড়বার মত উপন্যাস, গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ্, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (সেবাসদনের সম্মুখে)

শরৎ-সাহিত্য-ভবন থেকে—৺পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

দেশের মাটি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী * শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী * শ্রীরাধারাণী দেবী *
শ্রীরুচিরা দেবী * শ্রীহাসিরাশি দেবী * শ্রীপ্রতিভা বসু * শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)
শচীন সেনগুপ্ত
শ্রীনরেন্দ্র দেব
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
কৃষ্ণদয়াল বসু
যাদুকর পি, সি, সরকার
ব্যায়ামাচার্য্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীপরিমল গোস্বামী
কবিশেখর কালিদাস রায়
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
বুদ্ধদেব বসু
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
শ্রীঅখিল নিয়োগী
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
শ্রীসুকুমার দে সরকার
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এবং আরও অনেকের লেখা আছে 'দেশের মাটি'র মধ্যে।

শরৎ-সাহিত্য-ভবন—২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোষ্ট বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা

একটি বিশিষ্ট পরিবার

—কারণ কুসুম হোসিয়ারীর জিনিষ শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সমভাবে বজায় রেখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুন্দর আরামদায়ক ও টেকসই।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ডঃ স্পিটফায়ার, হারিকেন লভলক, লাক্সটেক্স, ভিক্টোরিয়া, ইউনিক, এয়ারটেক্স।

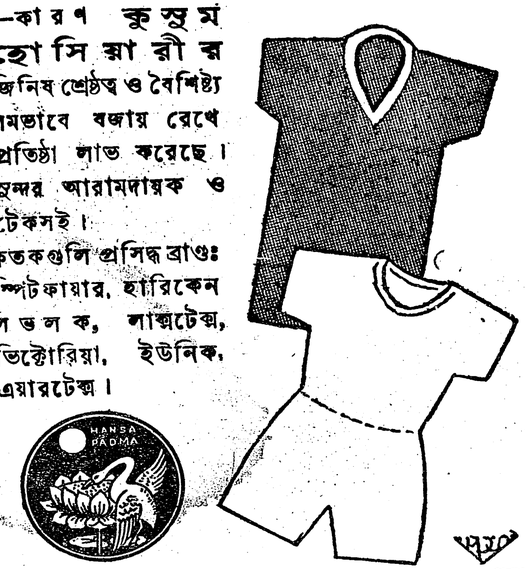

GRAM — "LUXTEX."
PHONE — B.B. 1146.

কুসুম হোসিয়ারী মিলস্
৮১, তালপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা :: কলিকাতা।

—ঃ ডিষ্ট্রিবিউটার্স ঃ—

মেসিনারিজ্ এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক্যালস্ লিঃ

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Gram : "EYELETS" Phone : Cal, 6586

Regd. No. C-1641

এদেরি সবচেয়ে বেশী দরকার

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

রেজিঃ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বড়বাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি.

...বিক ৩৲ কার্য্যালয় প্রতি সংখ্যা ।/০
...মাসিক ১৷৷৵০ ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

এদেরি সবচেয়ে বেশী দরকার

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

রেজিঃ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোনঃ-কলিঃ - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

কার্যালয়,
১৬, টাউনসেন্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ... ১৷৷০
সোনার হরিণ (ঐ) ... ১৷৷০
চায়ের খোঁয়া (গল্প) ... ৸০
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ... ৸৵০
নূতন পুরাণ (ঐ) ... ৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত

দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স্ ৷৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১৷৷০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ... ১৷০
বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ) ... ১৲
আবিষ্কারের গল্প ... ৸০
ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ... ৸০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ... ৸০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ... ৸০
ঐ ২য় ... ৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট্

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম্ দামোদর

দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

=য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস=

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

=সব্যসাচী বিরচিত=

১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার

১১। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন

১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৩। মিঃ গশ্ ডিটেক্‌টিভ

বুদ্ধদেব বসু

১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু

১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২১। গ্রহের ফের
২২। রত্নতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল্, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১॥० টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-কুমারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ৷৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যা
ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িে
বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীে
হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।

—আনন্দবাজা

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ | **কৈশোরক** | বার্ষিক মূ ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যি
দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা
ও বিশু গুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খানা উপন্যা
চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

রাত্রি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ | ৮ম সংখ্যা

নালিশ

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদির মাকে বলে দেবো দিদি ভারি পাজি,
বকুল-ডালে ছুলিয়ে দিতে হয় নি আমায় রাজি।
দাদার খাতায় আঁক কেটেছি—দিয়েছে তাই বলে,—
খেলাঘরে যাব না ওর আর ত' বিকেল হ'লে!

বাছুড়গুলো উড়ে যাবে—আসবে সাঁঝের বেলা,
বাগানেতে ফুলের গাছে বসবে রঙের মেলা।
প্রজাপতির পাখায় চ'ড়ে যাবো মামার বাড়ী,
দিদির সাথে আজ থেকে মোর 'সাত জন্মের আড়ি'।

কিল মেরেছে কালকে আমার পুষির নরম গায়ে—
দড়ি বেঁধে টানলো আমার শালিখ ছানার পায়ে,
ভেঙে দিলে ছোট্ট আমার ফুল তোলবার সাজি,
হোক না দিদি—বলব তাকে পাজি—পাজি—পাজি!

ডাকলেও আর খেলতে আমি যাবো না ওর
রূপকথা ওর শুনব না আর ঘুমের আগে রা
ফুল পেড়ে আর দেবো না ত' উঁচু ডালের
পাখীর পালক কুড়িয়ে আমার বাক্সে দেবো

তোমার মেয়ে দুষ্টু ভারি—বল্‌ব ডেকে মাকে,
একলা আমায় ফেলে এলো বেণুবনের বাঁকে।
বলে দিলে বাবার কাছে পড়ি নিক' বই,
শিউলি-তলা ফুলে ছাওয়া—পড়ার সময় কই?

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের যুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌ এ, বি এস্‌-সি

কলিকাতায় একটা উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া ক্লাবে আলোচনা হইতেছিল। ফিরিঙ্গীরা কোথায় বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তাহা লইয়া আলোচনা। অধ্যাপক (এখন খুব উচ্চ —দ বলিতেছিলেন, কাল এক সংবাদপত্রের আফিসে ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি বলি সব ব্যাপারে আমরা বহুকাল পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা ছিলাম তাহাই এই রূপ ব্যাপারের উপযুক্ত জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি? সে প্রসিদ্ধ ওয়ে স্কোয়ারের 'ব্যাট্‌ল' বা যুদ্ধ।° তৎকালে উহা কলি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার পর তি তাঁহার বন্ধুবর্গ ফিরিঙ্গীদিগকে কি রকম ঠেঙ্গাইয়া তাহার বিশদ বর্ণনা করিলেন। খুব রোমহর্ষণ না যথেষ্ট উত্তেজক সেই বর্ণনা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের যুদ্ধ শুনিয়া উৎকীর্ণ হই কারণ ঐ ব্যাপারের সহিত আমিও কিছু লিপ্ত ছি অধ্যাপকের কাছ হইতে ভদ্রলোকটির যে বর্ণনা পা তাহাতে মনে হইল লোকটি বোধ হয় রঘুনাথ। র একটু বড়াই করিতে ভালবাসিত। তবে বড়াই ক মানাইতও কতক। তার মত ধবধবে গৌরবর্ণ বাঙ্গালীর মধ্যে বড় দেখা যাইত না। সুপুষ্ট, ব দেহ। বাপও তখনকার মানে বড়লোকই ছি ওয়েলিংটন লেনে তাদের বাড়ীতে কত বার দিয়াছি। বাপ নির্ম্মল বাবু বঙ্গ দেশীয় সৎসঙ্গীদের ছিলেন। প্রায় রবিবারে তাঁদের ফরাস পাত বৈঠকখানায় সৎসঙ্গের বৈঠক হইত। আমরাও মাঝে যোগ দিতাম রঘুনাথের নিমন্ত্রণে। একটা ছোট

উপর একটি প্রকাণ্ড বই স্থাপিত হইত। হিন্দি লেখা। একজন সেই বই পাঠ করিত, আর ২৫।৩০ তা নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিত, আমরাও শুনিতাম। ঝিতে পারিতাম না, কিন্তু ভাল লাগিত। রঘুনাথও াঝে পড়িত। বেলা ৮টা হইতে ১২।টা পর্য্যন্ত লিত, তার পর শ্রোতৃবৃন্দের রঘুনাথদের বাটিতে ব্যাপার। নিরামিষ হইলেও উপাদেয়।

ন আসল ব্যাপারে আসি। সেটা প্রায় পঞ্চাশ পূর্ব্বের ঘটনা। এর আগে একবার হরিদ্বারের গল্প গিয়া বলিয়াছিলাম—আমরা বৈপ্লবিক যুগের ারা ডায়ারী লেখার পাট তুলিয়া দিয়াছিলাম। শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর। আমি বোধ হয় তখন ক্লাসে পড়ি (১৮৯৮ খৃঃ অব্দ)—খেলতচন্দ্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঐ বাড়ীটি ছিল।

র হেড মাষ্টার সুরেশ দত্ত মহাশয় পরম ইংরাজ-ছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই নিজের ক্লাসে ইংরাজ-মহিমা বর্ণনা করিতেন। কিন্তু ইহার টা হইয়াছিল। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন 'সাজেশ্চন্' দান কখনও কখনও বিপরীত ফলপ্রসূ হয়। estion acts as a counter suggestion.)।

লতচন্দ্র স্কুলের ছেলেরাই প্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক সমিতি— তি সমিতি গড়িয়া তুলে। এই স্কুলেরই দুইজন াত্মোন্নতি সমিতির নেতৃত্ব করিয়া বৈপ্লবিক সমাজে র্জন করে। এক জন হরিশচন্দ্র শিকদার। ষ্টার গিরিন মুখার্জি (সমিতির সভ্য) হরিশের রিত লিখিয়া নিজেকে, হরিশকে ও আত্মোন্নতি কে অমর করিয়াছেন। রাউলাট রিপোর্ট বিপিন কে বীর পদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। যতীন র দল উড়িষ্যার সমুদ্রতটে জার্ম্মান্ জাহাজ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিপিন গাঙ্গুলীর দলকে অস্ত্রিত , এবং তাহারা ফোর্ট উইলিয়ম ও কলিকাতা রিবে।

য়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরিঙ্গীর ছেলেরা বেশ উপদ্রব , বল্ খেলিত; ছোট বাঙ্গালীর ছেলেদের গায়ে াগিলে প্রতিবাদ করিলে মারিত। সে কারণে মারিবার অছিলা না পাইলে কারণ উদ্ভাবিত করিত। একটি ছোট ফিরিঙ্গীর ছেলে হয়ত কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গায়ে পড়িল; তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলের সহিত সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এই হেতুতে কয়েকটি বেশ বড় ফিরিঙ্গী যুবক ভদ্রলোকটিকে উত্তম মধ্যম দিত। এই রকম নানা প্রকারে তাহারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত, তাহারা রাজার জাতি, আমরা পরাধীন।

কিছু দিন পরে আমরা ইহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। প্রতিশোধ লইতে হইবে। আমার গায়ে তখন বিশেষ বল ছিল না। লম্বা, রোগা, তালপাতার সেপাইর মত চেহারা। অন্যায় দেখিলে সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়িতাম। কতকটা ডন কুইক্সোটের মত। আমার উত্তেজনা বন্ধুবর্গের মধ্যে সংক্রমিত হইল। সকলেই মারামারি করিতে প্রস্তুত হইল। সারদা দাস নামক একটি বয়স্ক ছেলে মারামারি বাধাইবার ভার লইল। ভুবনেশ্বর সেন ও সতীশ মজুমদার নামক দুইটি বলবান্ বালক আমাদের আক্রমণের বর্শাফলক হইল। আর হরিশ শিকদার জেনেরেল হইল।

হরিশ শিকদার জগু বাবুর (শত্রুরা বলিত জগা গুণ্ডার) জিমনাষ্টিকের আখড়ার ছেলে ছিল। ছোটখাট মানুষটি, কিন্তু তাহার হাড়গুলিতে যেন ভেল্কি খেলিত। সেগুলি যেন লোহার মত শক্ত ছিল। সে হাতের উপর শরীরের ভর রাখিয়া আকাশের দিকে পা তুলিয়া ময়ূর হইয়া হাত দু'টিকে দিয়া পায়ের কাজ করিতে পারিত। মারামারিতে সে সিদ্ধহস্ত ছিল—আক্রমণ ও পলায়ন এই উভয় কার্য্য বেশ তৎপরতার সহিত চালাইত। মন্ত্রণা-সভায় হরিশ জগু বাবুর এক মারামারির বর্ণনা করিল। "চুণাগলির কাফ্রীদের সঙ্গে মারামারি। স্থানীয় লোকেরা উহাদের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া জগু বাবুর শরণ লয়। আমরাও জিম্‌নাষ্টিক্ শেখার একটা প্রয়োগ-উপায় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠি। ছোট ছোট লাঠি, সহজে লুকান যায় এরূপ লোহার ডাণ্ডা এবং পকেট ভরা ইট লইয়া যুদ্ধযাত্রা করি। জগু বাবু বলেন, শুধু বাহুবলেই কাজ হইবে না, কিছু বুদ্ধিবলও প্রয়োজন। তিনি এক দল মুটেকে সাহায্য করিতে বলেন। কাফ্রীদের সঙ্গে

মারামারিতে তাহারা অস্বীকৃত হয়। জগু বাবু তাহাদের প্রত্যেককে দু' আনা (এখনকার আট আনার সমান) দেন এবং বুঝাইয়া দেন যে তাহাদিগকে মারামারি করিতে হইবে না, নিরাপদ দূরে থাকিয়া শুধু মার মার রবে চীৎকার করিতে হইবে। পয়সা পাওয়া ও তামাসা দেখার প্রলোভনে তাহারা এ কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দেয়। আমরা কাফ্রীদের উত্তেজিত করিবার জন্য প্রথমে বাক্যবাণ বর্ষণ করি। এক এক জন কাফ্রী দু' জন বাঙ্গালীর সমান বলবান্ ছিল। তবে আমরা "ইষ্টকায়িত" ছিলাম, তাহাদের "সোডা ওয়াটার বোতলায়িত" হইতে সময় লাগে। তা ছাড়া তাদের অন্য হাতিয়ার যোগাড় করিতেও কিছু সময় লাগে। এই সুযোগে আমরা আক্রমণ কার্য্যে সুবিধা করিয়া লই। তাহাদের যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার মুখেই আমাদের মুটিয়া বাহিনীর মার মার শব্দ তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে। তাহারা প্রথমে হঠে, পরে পালাইতে থাকে। আমরা যুদ্ধে জয়ী হই।"

হরিশের এই অভিজ্ঞতার দরুণ তাহাকেই আমাদের আক্রমণ-প্রণালী নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইল। সারদা দাস সহজেই ঝগড়াটা বাধাইয়া দিল। ফিরিঙ্গীরা একটা বেঞ্চির উপর ও দুই পাশে মাটিতে বসিয়াছিল। ছোটরা মাটিতে, বড়রা বেঞ্চে। সারদা অদূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। তাহার ক্রূর হাসি শীঘ্রই তাহাদিগকে আহত করিল। তাহাদের পূর্ব্বেকার প্রথামত একটি ছোট ছেলে আসিয়া সারদাকে ধাক্কা দিল। সারদার সামান্য ধাক্কায় সে অপ্রয়োজনীয় মাত্রায় বেশী গড়াইয়া গেল।

ছোট ছেলের উপর অত্যাচারের শোধ লইতে কয়েক জন চাই সারদার দিকে উদ্যত মুষ্টিতে অগ্রসর হইল। আমাদেরও দল, যাহারা অদূরে এবং ভিন্ন ভিন্ন ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য ছিল, এখন শত্রুকে আক্রমণ করিল। তার পর যুদ্ধ ব্যাপার অতি সামান্য। দু'তিন মিনিট সময়ও লাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমার এইটুকু মাত্র মনে আছে আমি এক বা দুই জনের সঙ্গে হাতাহাতি করিতেছিলাম। ভয়ে বা উত্তেজনায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড এতই দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল যে আমার ঘুষিতে কোনও জোর ছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ শত্রুও [illegible] সেইরূপ ছিল, কারণ আমি আহত হই নাই। [illegible] সতীশ মজুমদার বা ভুবনেশ্বর সেন নিজ শত্রু [illegible] করিয়া আমার সাহায্যার্থে আসে। ফিরিঙ্গীরা পূর্ব্বে চিরকাল আক্রমণ করিয়াই আসিয়াছে, [illegible] হওয়া তাহাদের অভ্যাস ছিল না। এখন আক্রান্ত [illegible] তাহারা খানিক ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। অতঃপর [illegible] অতি সহজ কারণেই তাহাদের রণস্পৃহা এক[illegible] নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বিকালের পার্ক, 'বায়ুভক্ষণ-[illegible] বালক, বৃদ্ধ ও যুবকে পূর্ণ ছিল। এই শান্ত ও শা[illegible] জনতা পার্কের মধ্যে মারামারি হওয়ায়—বিশেষতঃ [illegible] বাঙ্গালীতে মারামারিতে বিহ্বল হইয়া নানাবিধ [illegible] সাবধানতাসূচক বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক নিরাপদ স্থা[illegible] হইয়া পড়িলেন। ফিরিঙ্গীরা তখন বাঙ্গালা জানিত [illegible] বাঙ্গালীদের সন্ত্রাসজাত বাক্য তাহাদের নিকট [illegible] বলিয়া মনে হইল, তাহাদের ক্ষিপ্র পদচালনা তাহা[illegible] নিকট আক্রমণ-উদ্যোগ বলিয়া মনে হইল। [illegible] আর যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিল। এক[illegible] তাহারা পলায়ন করিল এবং আমরা পালাই নাই [illegible] আমরা জিতিয়া গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা [illegible] সকলকে অক্ষত শরীরে পাইয়া প্রীত হইলাম, [illegible] অবিলম্বে আমাদের পলায়নের হুকুম হইল। এবার [illegible] পালাইলাম ফিরিঙ্গীর ভয়ে নহে—পুলিশের ভয়ে।

তারপর আমরা সপ্তাহ খানেক পার্কের চা[illegible] ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতাম ফিরিঙ্গীরা দলবল লইয়া প্রতি[illegible] লইতে আসিয়াছে কিনা। তাহারা অনেক দিন [illegible] নাই। যখন আসিয়াছিল ভদ্র ভাবেই।

এই যুদ্ধে আমরা এই কয়টি জ্ঞান আহরণ করিলাম[illegible]

(১) রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

(২) আমাদের শক্তি হয়ত খুব বেশী নয় [illegible] শত্রুর শক্তি খুব বেশী ভাবিয়া কল্পনায় নিজেদের আ[illegible] করিয়া লাভ নাই।

(৩) বেকায়দায় পড়িলে সবাই পালায়। প[illegible] কালে আমরা দেখিয়াছি ইংরেজ পালায়, ফ্রেঞ্চ পালায়, আমেরিকান্ পালায়, জাপানী পালায়, জার্ম্মান্‌ও [illegible]র।

(৪) যুদ্ধমান্ দুই দলের এক সময়ে দু'পক্ষেরই পালাইবার বাসনা হয়। যে মুখ খামটি করিয়া টিকিয়া থাকে সেই জিতে।

(৫) জয় ও পরাজয়ের ব্যবধান অতি সামান্য।

জার্মান মজুরদের সঙ্গে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

[illegible] হারমান গোয়েরিং যেদিন জার্মানবাসীকে জানিয়ে দিল তাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে কামান, বন্দুক প্রভৃতি [illegible] সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা বেশী সেদিন দেশের লোকেরা [illegible]তে কম বিচলিত হয় নি। কিন্তু দেশের নেতা[illegible]দারের উপর তাদের এতখানি বিশ্বাস ছিল যে তারা [illegible] করত হিটলার যা করেন তা দেশের মঙ্গলের [illegible]ই করেন। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা [illegible] উক্তির ভীষণ নিন্দা করতে লাগল। একজন জার্মান [illegible]রের সঙ্গে আমার একদিন এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। [illegible] বলল, "যত দিন আমরা প্রয়োজন মত খাদ্য পাচ্ছি [illegible]ক্ষণ এ বিষয়ে দেশের নেতাদের নিন্দা করব না।" আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার [illegible]লে বোধ করি দেখা যাবে যে বর্ত্তমান সময়ে যে খাদ্য [illegible] দেশে পাওয়া যায় তা ইংলণ্ড অথবা ফরাসী দেশের [illegible]দ্যের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির?"

সে উত্তর করল, "সে কথা বহু বিদেশীর কাছ থেকে [illegible]ছি বটে তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আস্বাদের [illegible]রও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যেমন, কৃত্রিম কফি অথবা [illegible]ী থেকে তৈরী মাখন খেতে প্রথম প্রথম খারাপ [illegible]ত, কিন্তু খেতে খেতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। [illegible]ন আর খারাপ লাগে না।" সে একটুখানি চুপ করে [illegible]ক বলল, "বাস্তবে আমাদের দেশের নেতারা যে [illegible]সামগ্রী তৈরী করার জন্য ক্ষেপেছেন সেটা অতি [illegible]ভাবিক।" তারপর হেসে বলল, "আপনারা, বিদেশীরা, [illegible] আমাদের বন্ধু বলে মনে করেন না, সুতরাং আমাদের [illegible]রক্ষার জন্য কিছু কামান, বন্দুক তৈরী করে রাখতে [illegible]।" বলে সে আবার হাসতে লাগল। একজন মজুরের [illegible]ছ থেকে নিজের দেশ সম্বন্ধে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ কথা-বার্ত্তা শুনবো পূর্বে আশা করি নি। ইউরোপের অন্য কোন দেশে এতখানি দেশাত্মবোধ কোন মজুর শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে শোনা যায় কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধের পূর্ব্বে গোলা-বারুদ তৈরী করার কারখানাতে সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ চলেছে। ফলে অনেক স্থলে দেখা গিয়েছে মজুরদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হচ্ছে। হিটলার দেখলেন, যে স্থলে জন প্রতি খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয় অথচ দৈনিক কাজের সময় কমিয়ে দিলেও যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে সে স্থলে দেশের মজুরদের স্বাস্থ্যরক্ষার একটা উপায় হচ্ছে বছরে যাতে তারা দশ-বারো দিন ছুটি নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়িয়ে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এ সব ছুটীতে বেশীর ভাগ স্থলেই তাদের জার্মানীর ভিতরেই কোন মনোরম পাহাড়ী স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কোন কোন স্থলে সুইজারল্যাণ্ড অথবা চেকোস্লোভাকিয়াতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার কথাও শুনেছি।

হিটলার দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর মজুরদের জন্য সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাট তৈরী করা হয়েছিল। একদিন এক জার্মান মজুরের সঙ্গে এ ধরণের কতকগুলি ফ্ল্যাট দেখতে গিয়েছিলাম। প্রতিটী ফ্ল্যাটে ছোট ছোট এক একটা মজুর পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। তার সংলগ্ন লাইব্রেরী, খেলার মাঠ ও রেষ্টুরেণ্টও খোলা হয়েছে। আমি বললাম, "হিটলার তোমাদের এত রকমের সুবিধা করা সত্ত্বেও ইংরাজ মজুরেরা তোমাদের চেয়ে সুখে আছে। কারণ তারা তোমাদের চেয়ে বেশী আয় করে ও তাদের দেশে জনসাধারণের সব বিষয়েই স্বাধীনতা বেশী।" মজুর বন্ধু বলল, "এ কথা শুনেছি

বটে। তবে আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের দেশ। আমরা চাই উপনিবেশ। যেমন আছে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের ও হল্যাণ্ডের। পেলে দেখবে আমাদের দেশের মজুরদেরও অবস্থা ফিরবে।"

যে সব মজুরের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি তাদের অনেকের বাড়ীতেই রেডিও আছে। তাদের ঘরে আসবাবপত্রও মন্দ নেই। কিন্তু সব চাইতে আগে চোখে পড়ে তাদের বাড়ীঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। যতক্ষণ কারখানায় কাজ করে ততক্ষণ ময়লা কাপড় পরেই কাজ করে; দিনের শেষে বাড়ী যাবার সময় তারা পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে যে বেশ ধারণ করে তাতে তারা যে মজুর শ্রেণীর লোক তা বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে মজুরদের বাড়ী দেখলে তাদের বাড়ীর তুলনায় নরকতুল্য মনে হয়। তবে কোন কোন কারখানায় মজুরদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে। লাইব্রেরী, খেলার মাঠ ও ব্যায়াম ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তবে এ ব্যবস্থা যতদিন কারখানার মজুরদের জন্যে করা হবে,—যেমন রাশিয়াতে, ততদিন তাদের উপর অবিচার কা শুধু তাদের বাড়ীঘর প্রভৃতির সুব্যবস্থা করলে মজুরদের যাতে আয় বৃদ্ধি পায় সেদিকেও নজর হবে,—নইলে শুধু যে মালিক ও মজুরদে অপ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হবে তাই নয়, তৈরী জিনিষপত্রের মূল্যও বাড়বে।

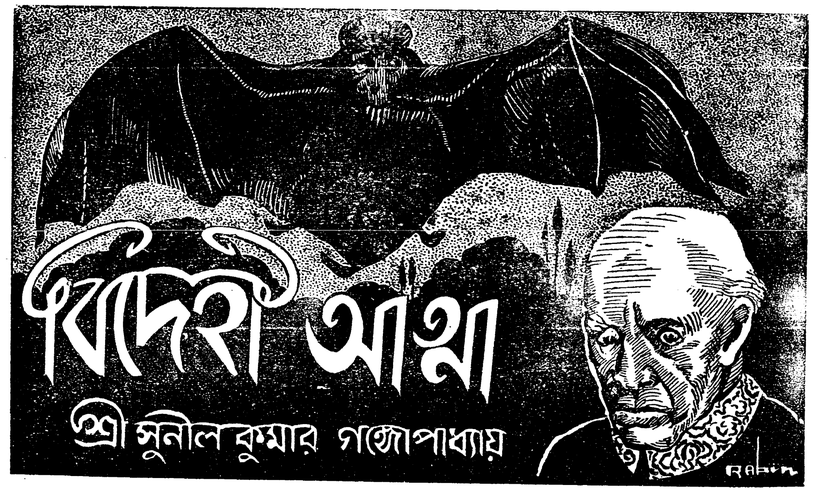

এক

অশোক লাহিড়ীর ডায়েরি

ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব আসামের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। একবার সেই দিকে তাকিয়ে স্যুটকেস্‌টা তুলে নিলাম। ছোট্ট ষ্টেশন—একজন বুড়ো লোক আধ ময়লা একটা কোট গায়ে কালি-পড়া লণ্ঠন এক হাতে নিয়ে আমার কাছ টিকিট নিলেন।

টিকিটের দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ আমাকে

করলেন—"আপনি—আপনি কি কলকাতা আসছেন?"

উত্তর দিলাম—"হ্যাঁ। ষ্টেশন মাষ্টারের দেখা কোথায় পেতে পারেন?"

তিনি বললেন—"আমিই ষ্টেশন মাষ্টার। চলুন আমার। আপনি ভীষণগড়ের জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার বাড়ি তো?"

মাথা নেড়ে জানালাম—"হ্যাঁ।"

ছোট্ট বাড়ি—বাড়িতে তাঁর আর কেউ নেই। এই তিনি আজ পঁচিশ বছর ধরে আছেন—দু'একবার করার চেষ্টাও হয়েছিল, তিনিই যেতে চান নি। পাহাড় ও জঙ্গল ভরা জায়গায় সহজে আর কেউ যেতে চায় না দেখে কর্ত্তৃপক্ষও তাঁর বদলীর আর বেশী করেন নি।

বাড়িতে এসে তিনি আমাকে একটা চিঠি বের দিলেন। চিঠিটা লিখেছেন ভীষণগড়ের জমিদার বর্ম্মা স্বয়ং। লিখেছেন—

স্যর,

আমাদের পার্ব্বত্য দেশ আপনাকে স্বাগতম্ জানাচ্ছে। দের আগের চিঠির কথামত আপনি আজ রাত্রে মাষ্টারের বাড়িতে থাকবেন। কাল বিকেলে ওখান একটা ঘোড়ার গাড়ি কয়েকজন যাত্রী নিয়ে শম্ভুদল সেই গাড়িতে আপনার জন্য একটা আসনের করে রেখেছি। জঙলা গ্রামে আমার গাড়ি র জন্য অপেক্ষা করবে। আশা করি কলকাতা এখানে আসতে আপনার কোনও রকম অসুবিধা। আমার দেশে, আমার বাড়িতে এলে আপনি আনন্দ পাবেন, কথা দিচ্ছি।

আপনারই
কৃতান্তবর্ম্মা।

মাষ্টার মশাইএর আতিথ্যের কথা জীবনে ভুলতে না। ষ্টেশনের কুলি, এবং মাষ্টার মশায়ের নিরাত্মীয় র একমাত্র সঙ্গী রঘু,—সেও এই অল্প সময়টুকুর আমার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর ছিল। মাষ্টার মশাইএর কাছ থেকে জানলাম, ভীষণগড়ের জমিদারের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তিনি আমার এই আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন, শম্ভুদল যাবার ঘোড়ার গাড়িতে সব চেয়ে ভাল আসন ঠিক করে রেখেছেন। ভীষণগড়ের জমিদার সম্বন্ধে আমার তেমন জ্ঞান নেই। জানি না ভীষণগড় কেমন জায়গা হবে—তাই মষ্টার মশাইকে আমি জমিদারের বিষয় কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তিনি বার বার জানালেন যে তিনি কানে স্পষ্ট শুনতে পান না।

কিন্তু কানে শুনতে না পাওয়ার তো কোনও সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না! এর আগে এর চেয়ে অনেক আস্তে যে কথা বলেছি তার উত্তর তিনি দিয়েছেন। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, তিনি আর রঘু দু'জনেই যেন কেমন ভয় পেয়ে গেছেন। একটা থমথমে কালো ছায়া তাঁদের মুখের উপর পড়েছে। আরও প্রশ্ন করাতে তিনি ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে জানালেন যে টাকা আর চিঠি ভীষণগড়ের জমিদারের কাছ থেকে আর কিছুদিন আগে এসেছিল, কি করতে হবে না হবে চিঠিতেই সব লেখা ছিল। কিন্তু জমিদার বা জমিদার-বাড়ির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই রঘু আর তিনি পরস্পরের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

সময় হয়ে আসছে, এক্ষুনি ঘোড়ার গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়তে হবে—তাই আর বেশী পীড়াপীড়ি করতে পারলাম না। কিন্তু মনটা কেমন যেন হয়ে গেল,—একটা সন্দেহ,, একটা রহস্য যেন সমস্ত ঘটনাকে ঘিরে রয়েছে।

বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমিও আমার জিনিষপত্র ঠিক করে নিচ্ছি। হঠাৎ মাষ্টার মশাই ছুটে আমার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখ দু'টোতে যেন কোনও অজানা আশঙ্কার ছায়া পড়েছে! তাঁর গলা কাঁপছে, নিজেকে ঠিক সংযত রাখতে পারছেন না। আমাকে অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"অশোক বাবু, না গেলে কি আপনার চলে না? আপনার কি যেতেই হবে?"

জানালাম, যেতেই হবে। তবু আর একবার বললেন—"যদি না গেলে চলে, না যাওয়া যদি কোনও রকমে

সম্ভব হয়, আমার অনুরোধ আপনি যাবেন না—আপনি কলকাতায় ফিরে যান।"

বললাম—"যে কাজ করতে এসেছি তা এত দরকারী আর এত দায়িত্বপূর্ণ যে এত দূর এসে আর ফেরা অসম্ভব।"

তিনি দমে গেলেন, তবু আর একবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি জানেন না আজ কত তারিখ?"

জানালাম যে আজ বাংলা বছরের শেষ দিন। হতাশ ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন—"আমিও জানি, আজ বছরের শেষ দিন। কিন্তু জানেন না কি যে আজ রাত বারোটার পর পৃথিবীর সমস্ত শয়তান এখানকার পাহাড়-জঙ্গলে জেগে ওঠে? জানেন না কি যে আজকের রাতে এখানকার সমস্ত বন-জঙ্গল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে? কত হাজার হাজার মানুষের অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস এখানকার বাতাসে ভেসে বেড়ায়? আর, আপনি কি জানেন না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কার কাছে যাচ্ছেন?"

তাঁর এ ধরণের কথাবার্ত্তায় আমি একটু অবাক্ হয়ে গেলাম। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু তিনি আমার হাত দু'টো ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন—যদি একান্তই ওখানে যেতে হয়, আরও দু' চার দিন যেন দেরী করে যাই। কিন্তু যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছি তা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ না করে অপরের মিথ্যা ভয়ে কোথাও অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তখন উঠে চোখ মুছে আমার গলায় একটা মাদুলি পরিয়ে দিলেন।

এ যুগের ছেলে আমি, মাদুলি-চরণামৃতে আমার বিশ্বাস একেবারে নেই। তবু কেন যেন বৃদ্ধ মাষ্টার মশাইয়ের দেওয়া এ মাদুলি গলা থেকে নামাতে পারলাম না। একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ, একটা খাপছাড়া ভয় বোধ হয় আমার মনে বাসা বাঁধলো। কিছুতেই তাকে মন থেকে ঠেলে ফেলতে পারছিলাম না।

গাড়িতে উঠে দেখি, গাড়োয়ান মাষ্টার মশাইএর সঙ্গে কথা বলছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমার সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হচ্ছে, কারণ গাড়োয়ানকে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতেও দেখলাম। আরও দু'-চার জন লোক এল—তারাও আমার দিকে কেমন করুণার চোখে তাকাতে লাগলো আর তাদের পাহাড়ী ভাষার মধ্যে কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলো। কয়েকটা পারলাম—শয়তান, নরককুণ্ড, ডাইনি, নেকড়ে। সব কথার মানে কি? হঠাৎ এ কথা ওঠেই বা

কয়েকজন যাত্রী গাড়িতে উঠে বসল। সকলে দেখি একটা করুণার্দ্র ছাপ, সকলেই আমারদিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালো। গাড়ি ছাড়বা সকলে ডান হাতের দুটো আঙুল আমার কপালে দিল। সমস্ত শরীর অস্বস্তিতে ভরে উঠল—এ কুসংস্কার! একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জা কপালে দুটো আঙুল ছোঁয়ালে শয়তানের দৃষ্টি প না। এক অজানা দেশে এক অজ্ঞাত লোকের স করতে যাওয়ার আগে শয়তানের কথা কল্পনা কর যেন অস্বস্তিকর লাগে!

গাড়োয়ানের চাবুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গা দিল। পথের দু' ধারের মন-ভুলানো দৃশ্যে আমা ভূতুড়ে ভয় কখন হারিয়ে গেছে। অবশ্য যদি আমি সহযাত্রীদের পাহাড়ী আস্যামী ভাষার কথাবার্ত্ত পারতাম তবে হয়তো সে ভয় সহজে যেত না। চোখের সামনে রুক্ষ পাহাড়ী পথ, ঘন বন আর গাছপালা, এপাশে ওপাশে খাড়া পাহাড়—মাঝে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। বুনো ফুল আর মাটির গন্ধ সারা পথ ছেয়ে ফেলেছে।

পাহাড়ী পথ, তবু যেন গাড়ি উড়ে যেতে গাড়োয়ানের এত তাড়াতাড়ি করার মানে বুঝতে শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে সে এতটুকু সময় চায় না। অন্তহীন পথে যেতে যেতে বন ও মাঝে সূর্য্য অস্ত যেতে দেখলাম। সূর্য্যের আলো দূরের কালো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পড়েছে, চঞ্চল ঝর্ণার রজত ধারায় তার খানিকটা ছিটকে পড়েছে, উপরের নীল আকাশ লাজার তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার সারা ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের গাড়ি অন্ধকারের ভিত আঁকাবাঁকা পথে, কখনো বা একেবারে খাড়াই উপর দিয়ে, যথাসাধ্য জোরে যেতে লাগল।

তার পর দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় কেমন যেন টা আলো জ্বলতে দেখা গেল। তা দেখে আমার যাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা অত্যন্ত বেড়ে গেল। তারা মাকে দু' একটা জিনিষ উপহার দিল, কেউ কেউ দু'টো আঙুল কপালে ছুঁইয়ে অমঙ্গল দূর করার চেষ্টাও করল। তাদের সহানুভূতিতে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম, কিন্তু কেমন যেন এক অজানা আশঙ্কায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল। (ক্রমশঃ)

আশা চলে অসীমের পথে

স্থলপদ্ম

মানুষের আশা যেন অসীম! সেই আদ্যিকাল থেকে য কত কিছু জান্‌ল, কত কিছু কর্‌ল—কত অজানা উদ্ঘাটন কর্‌ল, বিধির বিধান উল্টে পাল্টে—তি কথায় যাকে বলে খোদার উপর খোদকারী—ও সে করতে বাকি রাখল না, কিন্তু তবু তার সাধ টে কই? যত করে ততই তার লোভ বেড়ে যায়, া আর ফুরায় না।

কিন্তু এত ক'রেও মানুষ এক জায়গায় এসে ঠেকে ছে। মৃত্যুকে সে জয় করতে পারে নি। অবশ্যি চেষ্টার র ত্রুটী নেই। সেই সত্যযুগ থেকে মানুষ এ নিয়ে থা ঘামিয়ে আসছে। কিন্তু ঘামালে কি হবে, ব্যাপারটা া সহজ নয়!

কিন্তু এবারে বোধ হয় মানুষের এই আশাও সফল ত চল্‌ল। কিছুদিন আগে তোমরা রামধনুতে পড়েছিলে য়েকজন রুশ বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে অদ্ভুত রকম এগিয়ে ছেন। সম্প্রতি তাঁদের গবেষণার বিষয়ে যা জানা ছে তা শুনলে অবাক্ হতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ী বাহাদুরী যিনি দেখিয়েছেন তাঁরই কথা তোমাদের ব।

এই বৈজ্ঞানিকটিকে নেহাৎই তরুণ বলা যেতে পারে। ম ভ্লাডিমির নেগোভাস্কি। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর গলায় ন বিজয়মাল্য পরিয়ে দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর।

ভ্লাডিমির এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন কুকুর, ড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি ইতর জন্তুর সাহায্যে। এই সব ক্ষাতে সাফল্য লাভ ক'রে তাঁর আশা আরও বেড়ে ন, তিনি তখন ছোট ছোট সদ্যজাত ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই গবেষণা আরম্ভ করলেন। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে পরীক্ষার কাজ চালিয়ে দেখা গেল এতেও তিনি অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছেন।

এইবার তাঁর চেষ্টা হ'ল কি ক'রে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের উপরও তাঁর গবেষণা চালাবেন। কাজটা খুব সহজ নয়, কিন্তু হঠাৎ এক বিচিত্র এবং অভাবিত ঘটনায় তাঁর সে সুযোগ এসে গেল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছে। দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান্ বাহিনী রণমদে মত্ত মাতঙ্গের মত আশ-পাশের সমস্ত দেশগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে শেষে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়ার উপর। জার্ম্মানীর এই আকস্মিক আক্রমণে রাশিয়ার প্রচুর সৈন্য মারা যেতে লাগল প্রত্যেক দিন। যুদ্ধের আঘাত—তাই অধিকাংশই অত্যধিক রক্তপাতের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যেত। ভ্লাডিমির পরীক্ষার এ সুযোগ, হাতছাড়া করলেন না। তাঁর সমস্ত টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে সৈনিকদের বাঁচাবার দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ১৯৪৩ সনে যুদ্ধের এক হাসপাতালে এসে উপস্থিত হলেন। এই হাসপাতালে তিনি প্রথম যে মৃত রুশ সৈনিককে বাঁচিয়ে তোলেন তার নাম ভ্যালেনটিন চেরিপনোভ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে সৈনিকটি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

গভীর একাগ্রতার সঙ্গে ভ্লাডিমির পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাঁর সেই অদ্ভুত একাগ্রতাই হয়তো এত তাড়াতাড়ি তাঁর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিল।

চেরিপনোভের পর তিনি আরো কয়েকটি এই রকম রোগীকে বাঁচিয়ে তুলে জগতের কাছে এক বিস্ময়কর

TIGHT BINDING

আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। অবশ্যি তাঁর এই আবিষ্কারকে ঠিক আবিষ্কার না ব'লে আবিষ্কারের সম্ভাবনা বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। এরই উপর ভিত্তি করেই হয়তো একদিন মানুষ মৃত্যুকে জয় করবার গৌরব লাভ করবে, এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর নাম চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। কি ক'রে তাঁর এই অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভব হ'ল তা ভেবে হয়তো তোমরা অবাক্ হ'চ্ছ। ভ্লাডিমির যে যন্ত্রটি দিয়ে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করলেন সেটি দেখতে অনেকটা কামারশালার হাপরের মত। তার মুখটির সাথে একটি নল লাগিয়ে শ্বাসনালীসংযুক্ত করে তারপর ক্রমাগত বাতাস পাম্প করে যেতে হয়। তোমরা হয়ত জান আমাদের এই শ্বাসযন্ত্রটি, অর্থাৎ ফুসফুসটি, অনেকটা ফুটবলের ব্লাডারের মত। কেউ যখন মারা যায় তখন এই শ্বাসযন্ত্রটি চুপসে একেবারে লেগে যায়। ভ্লাডিমির দেখলেন কোনক্রমে যদি ফুস্ফুস্টি নিটোল ক'রে তোলা যায় তা হলে হয়তো মৃতদেহের ভিতর জীবন সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। একে একে গুটিকতক পরীক্ষার পর তাঁর সেই ধারণা সত্যি বলে জানা গেল। তিনি চেরিপনোভের শ্বাসনালীর সাথে তাঁর [illegible] যন্ত্রটি লাগিয়ে ক্রমাগত বাতাস পাম্প করে [illegible] শরীরে একটু একটু প্রাণের স্পন্দন অনুভব কর[illegible] অতি যত্নের সঙ্গে বিশুদ্ধ সতেজ রক্ত মৃতের শ[illegible] করিয়ে দিলেন। সেই রক্ত হৃদযন্ত্রের চারি[illegible] পেশীগুলিতে জমা হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ [illegible] ভাবে আরম্ভ করে দিল। এইভাবে ভ্লাডিমি[illegible] যে অতিরিক্ত রক্তপাত বা হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া[illegible] মৃত্যু হ'লে কয়েক মিনিটের ভিতর এই উপা[illegible] করলে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা অসম্ভব নয়[illegible]

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা শুধু মরা মানুষ বাঁচা[illegible] আবিষ্কার ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা আজ বল[illegible] হয়তো শুধু মাত্র একটু মালিস অথবা 'সিরাম'এ[illegible] মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে দেড় শ' বছর পর্য্যন্ত বাঁ[illegible] যাবে, এবং সে দিনের বেশী দেরী নেই। এ[illegible] তাঁদের গবেষণা নাকি প্রায় নিখুঁত অ[illegible] দাঁড়িয়েছে!

নটবর পাল

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

আমাদের নটবর পাল টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার। অতএব বিনে মাইনে, আপ খোরাকী। ফলে যদি পিসিমার মেজাজ ঠিক না থাকে পিসীমাকে কি দোষ দেওয়া যায়?—যায় না।

আবার এদিকেও দেখ। আমাদের নটবরেরই বা কী দোষ? নেহাৎ উনিশটি বার না হোক্, পাঁচটি বছর ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, কতবার 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' কবিতাটি আউড়েছে। 'একবারে না পারিলে দেখ শত বার'।—মাত্র পাঁচ বার দেখেছে। বড় মামা রায় দিয়ে দিয়েছেন—"ঘোড়ার ঘাস কাট গে, পড়াশোনা তোমার কম্ম নয়।" অতএব—আমাদের নটবর পালের কী দোষ!

কিন্তু যাই বল, আমাদের নটবর পালের গুণ[illegible] আছে। ভাল লাইন্‌স্‌ম্যান্, ভাল বাজার [illegible] ছাঁটাই সম্পর্কে রুশ জার্মানের কায়দা-কানুন [illegible] যুদ্ধের খবর তার নখ-দর্পণে; ভাল ঘামাচি [illegible] পারে, এবং আরো অগুন্‌তি গুণ।

কিন্তু হ'লে কি হবে? চাকরী-বাকরী [illegible] অনেক জুতোর তলা খুইয়েও জোটাতে পারে নি।

তাতে অবশ্যি নটবরের বেশী হায়-আফশো[illegible] কত যোগ্য লোককেই তো পয়সার অভাব পোয়া[illegible] না হ'লে মাইকেলের মত কবি কিনা হাসপাতা[illegible] চিকিৎসায়—

কিন্তু পিসীমার গঞ্জনা আর বুঝি সহ্য হয় না! [illegible] আফ্‌টার অল্, নটবর পালের গায়ে তো আর [illegible]মড়া নেই যে পিসীমার বাক্য-বাণগুলো তা ভেদ ক'রে [illegible]তেই ঢুকতে পারবে না!

—"বলি, একটা ফুটো পয়সা আয়ের মুরোদ নেই, [illegible] ওদিকে তো দেখি ষোল আনা চাই। ওদিকে তো [illegible]ন থেকে চুণ খসলে বাবুর রাগের আর সীমা-পরিসীমা [illegible]কে না!" দিন রাত্তির পিসীমার এই এক বুলি।

'প্রেষ্টিজ' ব'লে মানুষের একটা পদার্থ আছে। আর, [illegible]বর পালও তো নেহাৎ অমানুষ নয়! সুতরাং—

সুতরাং নটবর পাল নগদ একটা তামার পয়সা ছুঁয়ে [illegible]তিজ্ঞা ক'রে ফেলল যে—"যদি পয়সা আয় ক'রে ফিরতে [illegible]রি তবেই ফিরব, নইলে আর নয়! নইলে দেব লাইফ[illegible]কে ঐ কলকাতার গুণ্ডাদের হাতে। এ্যায়সা জীবন [illegible]কবার চেয়ে না থাকা ঢের ঢের ভাল।" গুণ্ডার আড্ডা [illegible]জতে হবে না, রায়টের জের তখনও থামে নি।

পিসীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কয়েক বার দীর্ঘশ্বাস ফেলল [illegible]টবর, আড়চোখে তাকালো তার দিকে। কিন্তু উঁহুঁ, [illegible]মনিতরো কথায় ভিজবার মত চিঁড়ে পিসীমা ন'ন্। [illegible]ল্টে তিনি বললেন—"থাক নটবর, ঢের হয়েছে, আর [illegible]কন? ও সব কথা শুনতে শুনতে কানটা অনেক দিন [illegible]থকেই কেমন-কেমন করছিল; অনেক দিনের পুরোনো [illegible]গেন্দির কব্‌রেজ, ভাবলাম তাকে একবার দেখাই। [illegible]—মা, যা ভেবেছি তাই! দেখেই বললেন যে পচা [illegible]থা শুনতে শুনতে নিঘ্‌ঘাত কানে পোকা ধরেছে। [illegible]তা বাছা, যা করেছ—ও সব কথা বলে আমার কানের [illegible]ণাটা আর বাড়িয়ো না। দোহাই তোমার!"—পিসীমা [illegible]বার আগের মত নির্লিপ্ত ভাবে চোখ বুজে, মাথা নেড়ে, [illegible]তে মিশি ঘষতে লাগলেন।

সেদিকে তাকিয়ে ইচ্ছে ক'রেই নটবর দু' পাটি দাঁতে [illegible]একটা জোর কলিশন্ করল।—উফ্!

কিন্তু না, যা ভেবেছ তা নয়। এতই কি নিরুপায়? [illegible]কছুই কি করবার ক্ষমতা নেই আমাদের নটবরের?

এই তো কত মুহুরী-মুছুদ্দি, মুচি-মেথরের ছেলেরা [illegible]বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড কাণ্ড-কারখানা ক'রে ফেলছে। [illegible]কত কামাচ্ছে, কত হাতাচ্ছে—অন্ততঃ হাতড়াচ্ছে হাতা[illegible]বার জন্য। যত সব আঙুল এই ধমকে কলাগাছ হয়ে [illegible]ছে। কিন্তু নটবর?—যাই বল আর তাই বল, সব কিছু রয়েছে এই তিন ইঞ্চি কপালটুকুর মধ্যে। না হ'লে গোবেচারী গোবর্দ্ধনও মিলিটারী হচ্ছে, এ-আর-পি হচ্ছে, সিভিক-গার্ড হচ্ছে,—শুধু নটবরই জুলফকা-জুলফুকী! নটবরের অদৃষ্টেই যত ফাঁক-ফোকর!

নাঃ, রাতারাতিই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু উপায়? ম্যাজিক? ভোজবাজী?—ইম্‌পসিবল্! অ্যাবসার্ড!—কিন্তু বুদ্ধিমান্‌দের দপ্তরে অমনি ধরণের কোনো শব্দই নেই। এবং যেহেতু আমাদের নটবর পাল নিজেকে যথেষ্ট বিজ্ঞ বিবেচনা করে সুতরাং মনে মনে সে অন্য পন্থা খুঁজল। খুঁজতে খুঁজতে ঘাম বেরুলো, কপাল কুঁচকালো, চোখ ফেটে জল এলো। কিন্তু তবুও কোন উপায় মাথায় এলো না।

তা বলে পিসীমার মুখের ওই কথাগুলোর পরে কিছুতেই আর বাড়ী থাকা চলে না। ঘেন্না-পিত্তি ব'লে নটবরেরও একটা জিনিষ আছে তো! আগে তো পথে বেরুনো যাক্, উপায় শেষে যা হবার হবেই।

যাকে বলে, এক বস্ত্রে পথযাত্রা। অনেক জায়গা ঘুরল, অনেক অফিস-কাছারী। কিন্তু কোথাও নাকি আর লোকের দরকার নেই।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, মাথার ওপর প্রকাণ্ড বোশেখী সূর্য্য। কলকাতার রাস্তায় পিচ গলছে, নটবরের গায়ে সারা দুপুরের ধুলো-বালি। পেট ভরে "বিশুদ্ধ পানীয় জল" খেয়ে শ্রান্ত শরীরে খানিক জিরিয়ে নেবার জন্যে সে একটা বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলো। নিজের অজানাতে অমনি ভাবেই কখন এক সময় দু' চোখে রাজ্যির ঘুম নেমে এলো।......

ঘুম যখন ভাঙলো রাত হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ, ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা তারা চিক চিক করছে। অমাবস্যার অন্ধকার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নটবর উঠে দাঁড়ালো। তাকালো একবার আকাশের দিকে। হুড়মুড় ক'রে বৃষ্টি এলো ব'লে!

তাড়াতাড়ি নটবর পা চালালো। গুণ্ডাদের আস্তানায়ই সে যাবে। এমনি বিষাক্ত জীবন রাখার চাইতে না রাখা, শতগুণে ভালো। ঐ অঞ্চলের অন্ধকার গলিগুলি

আজকাল যা হয়েছে, সন্ধ্যার পরে নেহাৎ ভুলেও কেউ হাঁটতে সাহস পায় না।

সেই রকম একটা গলিতে ঢুকে পড়লো আমাদের নটবর পাল।—যার পিতার নাম ৺রাইচরণ পাল, পিতামহের নাম ৺দিগম্বর পাল, প্রপিতামহর নাম ৺বটকেষ্ট পাল। যার পিতা ভূতের ভয়ে হার্টফেল ক'রেছেন, পিতামহ চোরের ভয়ে অক্কা গেছেন, প্রপিতামহ তিনটে তুলোর বালিশ চাপা পড়ে ভবলীলা সম্বরণ করেছেন।

যাক্ গে, যেতে দাও। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা বলছিলাম।

হ্যাঁ, আমাদের নটবর এগোতে লাগলো, বেশ বিজয়ী বীরের মত ভঙ্গী। যার জীবনের ভয় নেই তার আবার কিসের পরোয়া!

স্যাঁতসেতে দুর্গন্ধে নটবরের নাক ঝালাপালা, কিন্তু তথাপি সে পথচ্যুত হয় না, পদচ্যুতও হয় না। "যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই যে হবে রে"—কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তনের কলিটা বেশ কায়দা ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগলো নটবর।

কিছুদূর এগোতেই একটা বস্তি প্যাটার্ণের টিনের চালা। টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছে; ইয়া ইয়া অনেকগুলো চেহারা। নটবরকে দেখেই তাদের চোখগুলো শিকারী কুকুরের মত চকচক্ ক'রে উঠলো। আর তাদেরই একজন এগিয়ে এলো দরজার কাছে।

নটবর তো বেপরোয়া। লোকটাকে দেখে তার ধারণা হলো যে সে-ই সর্দার। সোজা সে তাকে বললো—"এই সর্দার, তোমার সাথে একটা জরুরী কথা আছে।"

আশ্চর্য! এ-ই যে সর্দার এ কথা এই লোকটা জানলো কী ক'রে!—দলের অন্য লোকগুলো সত্যিই তাজ্জব বনে গেল।

—"আমি যে সর্দার, তা তুমি বুঝলে কী করে?"—কী কর্কশ গলা লোকটার!

কিন্তু নটবর কি ঘাবড়াবার পাত্র! মুচকি হেসে সে বললো—"এটুকু বুঝবার মত শক্তিও আমার নেই, তুমি তা-ই বলতে চাও সর্দার?"

"তা আমার কাছে তোমার কী দরকার?"

"যা দরকার তা তো তোমার হাতে নেই, না, কোমরেও তো গোঁজা নেই!"—নটবর হতাশ হয়ে গেলো।

"কী? কিসের কথা বলছ?"—সর্দারের চোখ জ্বলতে লাগল।

"আর কিসের কথা বলব? ছোরা, তোমার কথা বলছি সর্দার!"

"কেন?"

এই সামান্য ব্যাপারটা এরা বুঝতে পারছে না, এত খুন-খারাপি করছে, আর এটুকু বুঝছে না! বলতে কি, নটবরের বিরক্তি হ'ল। ভ্রূ কুঁচকে ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল—"কেন? কেন আবার, তোমার সেই ছোরাখানা এনে আমার এই বুকে সড়াৎ ক'রে ঢুকিয়ে দাও। আমাকে—"

কিন্তু এ কি ম্যাজিক? ভোজবাজী? স্বপ্ন? সিদ্ধি? না……?

সেই সর্দার একেবারে নটবরের পায়ের ওপর পড়ল।—"এবারকার মত ক্ষমা করুন কর্ত্তা, আ থেকে শুনেছি বটেক যে একজন নতুন গোয়েন্দা আমাদের পেছনে। তা আপনিই যে সেই তি এতক্ষণে বুঝলুম কর্ত্তা। এবারকার মত আ করুন।"

নটবর পাল তো হতভম্ব! এ আবার কো রে বাবা!

—"না হে, না, সত্যি বলছি আমি গোয়েন্দা কিচ্ছু নই। দেখ তুমি আমাকে তল্লাসী করে পাও, রিভলভার দূরের কথা, যদি একটা—"

—নটবরের কথা শেষ হবার আগেই সর্দার হাত যোড় ক'রে, মাথা নেড়ে, জিভ কেটে ব কর্ত্তা, অমনি বাক্যি মুখেও আনবেন না। ছোটনোক্, গুণ্ডা-বদমাস সব, আমরা কি হুজুরকে করতে পারি? হুজুরের পায়ের কানা আঙুলে যোগ্য নই আমরা, এবারকার মত আমাদের ক্ষ কর্ত্তা!"

তার পরেই সর্দারের সে কী কান্না! এই মা

যেন! "দয়া ক'রে পুলিশ-টুলিশগুলোকে যেতে আপনার পায়ে পড়ি কর্ত্তা, এবারকার মত।"

কী বিপদ্! নটবর এক লাফে পিছু সরে এল—এ সব পা ধরাধরি কেন! বলছি আমি ও সব লা-ফোয়েন্দা কিচ্ছু নই। পুলিশ-টুলিশ কেন, চৌকিদারও নেই ধারে-কাছে কোথাও, অযথা রা আমাকে—"

কিন্তু তবুও কি সর্দার ছাড়ে! কান্না কি তার এত ই থামবার? ইনিই যে সেই গোয়েন্দা, সে বিষয়ে সন্দেহ কোথায়! ঠিক মত পাকা-পোক্তভাবে তৈরী য় কি কেউ এমনি আসে! এমনি এসে কোন ও নাকি কক্ষনো নিজের প্রাণ সর্দারের ছোরায় তে চায়! ও সব তো গোয়েন্দা সাহেবের একটু তার ভান!

—হুজুর, আমাদের এবারের মত ক্ষমা করুন"—রের কান্না উথলে উঠলো—"আর আমাদের মত বদমাসের জন্যে এই মেঘলা ঘুটঘুটে রাত্তিরে ার কত পরিশ্রম হ'ল! সেজন্য আমাদের ক্ষমা হুজুর। আর দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি আপনি দের ক্ষমা করে যান হুজুর,—আপনি ছাড়া আমাদের ার আর কেউ নেই!" দলের দিকে একবার একটু য়ে সর্দার হুকুম করলো—"এই, কে আছিস, সিন্দুক তিন হাজার টাকার একটা তোড়া আর বড় রাস্তা একটা ট্যাক্সি নিয়ে আয়,—জলদি—।"

তিন হাজার টাকার তোড়া এলো, ট্যাক্সি এলো।

সর্দার স্বয়ং টাকার তোড়াটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে গেল, আমাদের নটবরের পা ধরতে ধরতে এনে ট্যাক্সিতে চাপাল। বার বার মিনতি ক'রে অনুরোধ জানাল—"আমাদের এবারকার মত ক্ষমা করুন কর্ত্তা,—সাধ্যমত আপনার পায়ের কাছে এই তিন হাজার টাকার প্রণামী দিলাম,—আমাদের দোষ-ত্রুটি এবারকার মত—।"

আমাদের নটবর পাল হতভম্ব একদম। শুধু ড্রাইভারের কথার জবাবে একবার বললো—"ভবানীপুর।"

স্বপ্ন? ভোজবাজী? আলাউদ্দীনের প্রদীপ?—কে জানে, যার জানবার সে তো হতভম্ব।

এর পরের ঘটনা যার যা খুশী ভেবে নিতে পারো, আমার কিচ্ছু বলবার নেই। বলবার বাকি আছে শুধু নটবর পালের একটু কথা, অল্প একটু, যৎকিঞ্চিৎ। তোমরা হয়েছ কি না জানি নে, তবে কাহিনীর এ পর্য্যন্ত আমি এ্যাত্তটুকুন আশ্চর্য্য হই নি। আশ্চর্য্য হয়েছি সেদিন নটবরের বৈঠকখানায় গিয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এই নটবর পাল চালবাজপুরের মহারাজার কায়দায় চায়ে এক-একটু চুমুক দিচ্ছে আর পাড়ার বেকার ছেলেদের বিনি পয়সায় উপদেশ বিলোচ্ছে,—"তোমরা সব ইয়ং মেন, পয়সার জন্যে অত মাথা ঘামাও কেন বল দেখি? আমার মত বুদ্ধি খাটাও, দেখবে পয়সা এসে গেছে। পয়সা রোজগার এমন একটা কষ্ট কি হে! পয়সা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে, শুধু একটু মগজের ঘিলু খাটিয়ে ঘরে নিয়ে এলেই হ'ল—ব্যস্। এই দেখ না আমি কেমন—!"

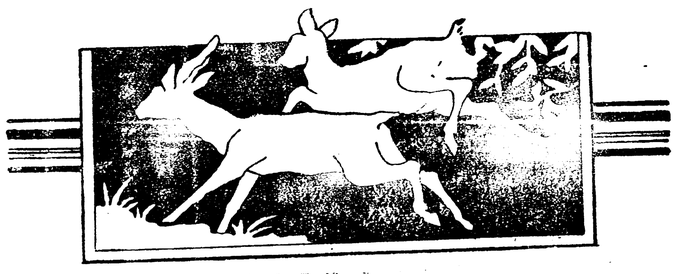

মজার ছবি

বর-কনে বিয়ের পর বাসর ঘরে গিয়ে বসেছে।
আসলে কিন্তু এরা সেলুলয়েডের পুতুল!

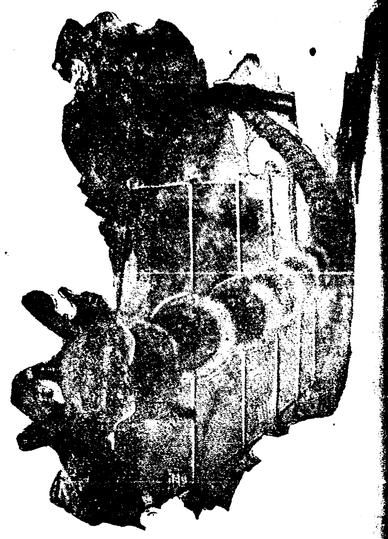

ড্রাগনের মত হোঁৎকা-মুখো, লম্বা লেজওয়ালা জন্তুটা কি?
এটি একটি ঘুড়ী। চীনা ছেলেরা এই রকম ঘুড়ী উড়িয়ে থাকে।

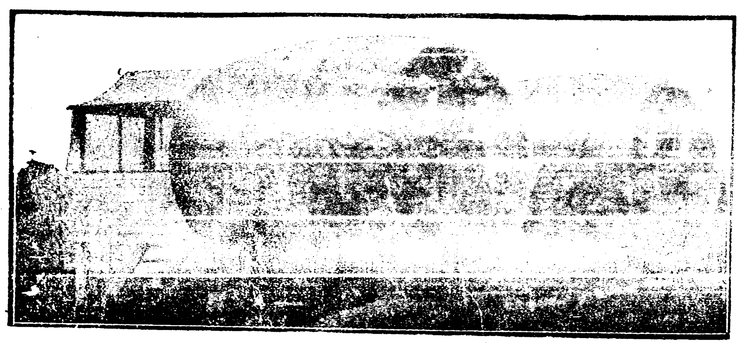

পাশাপাশি দু'টো পিপে। তার গায়ে জানালার মত খাঁজ কাটা কেন?
আসলে যে এটি একটি বাড়ী, মস্ত বড় দু'টো পিপে থেকে এই বাড়ী তৈরী করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ঋষি অঙ্গিরা

অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এ

...হিন্দুগণের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদের মন্ত্রসমূহ ...স্মৃতি যাঁহারা প্রচারিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের ...হয়। ঋষি বলিলেই কতকগুলি আজগুবি কাণ্ড-...র কথা মনে পড়ে। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা ...খুব জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারাই বৈদিক আর্য্য ...র গোড়া পত্তন করিয়া গিয়াছেন।

...দিক ঋষিগণের মধ্যে সাত জন খুব বড় ঋষি ছিলেন। ...র সপ্তর্ষি বলা হয়। অঙ্গিরা এই সাত জনের ...। তাঁহার কথাই আজ তোমাদের বলিব।

...ঙ্গিরা যে পৃথিবীর কোন্ অঞ্চল অলঙ্কৃত করিয়া-...তাহা বলা যায় না। তিনি যে কত দিনের ...লোক তাহাও বলা যায় না। তবে তিনি খুবই ...। তাঁহার সময় মানুষের জ্ঞান ছিল অল্প; তাই ...র দুঃখ-দুর্দ্দশারও সীমা ছিল না। তখন ঋষিগণ ...দুঃখ দূর করিবার জন্য গভীর ভাবে চিন্তা ...ন। এই গভীর চিন্তাকেই তপস্যা বলে।

...দিন বোধ হয় শীতের রাত্রি। অঙ্গিরা তাঁহার ...শ্রান্ত গভীর তপস্যায় মগ্ন। সম্মুখে কিছু দূরে ঘন ...অরণ্যের ঘন অন্ধকারে হিংস্র জন্তুগণ নির্ভয়ে ...করিতেছে। বাহিরে যে ঝড় উঠিয়াছে সে কথা ...জানিতেই পারিলেন না।

...ৎ পশুপক্ষীর কোলাহলে অঙ্গিরার তপস্যা ভঙ্গ ...তিনি চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে বনভাগ আলোক-...য়া গিয়াছে। পশুপক্ষিগণ যে যেদিকে পারিতেছে ...করিতেছে। বনে আগুন লাগিয়া সমস্ত গাছপালা ...উ করিয়া জ্বলিতেছে।

...ইরূপ দাবানল ঋষি পূর্ব্বেও অনেকবার দেখিয়াছেন। ...সেদিনকার দাবানল দেখিয়া হঠৎ অগ্নির অদ্ভুত ...কথা তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিল। তিনি ...লন অগ্নির আলোকে রাত্রির অন্ধকার দূর হইয়াছে। ...রাক্ষিকা শক্তির ভয়ে হিংস্র জন্তুগণ দূরে পলায়ন ...ছে, এবং অগ্নির উত্তাপ দূর হইতে তাঁহার গায়ে লাগায় শীতকালে তাঁহার বেশ আরাম বোধ হইতেছে।

তখন অঙ্গিরা ভাবিতে লাগিলেন, অগ্নি উৎপন্ন করার কৌশলটি শিখিতে পারিলে মানুষের কত সুবিধা হইবে। শীতের রাত্রে কুটীরের চারিপাশে ঐ দাবানলের মত আগুন জ্বালিয়া রাখিতে পারিলে অন্ধকারের ভয়ও থাকিবে না, হিংস্র জন্তুগণও ভয়ে কাছে আসিবে না, এবং শীতের হাত হইতেও মুক্তি পাওয়া যাইবে।

তাই বনে কি ভাবে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দাবানল লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ইহার কারণ আবিষ্কার করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন বাতাসে বৃক্ষশাখা যখন ঘন ঘন দুলিতে থাকে তখন দুইটি শাখার ঘর্ষণের ফলেই আগুন জ্বলিয়া উঠে। আগুন বৃক্ষশাখা ও শুষ্ক পত্রকে সহজেই দগ্ধ করিতে পারে। সেজন্য বনের এক স্থানে আগুন লাগিলে ক্রমে উহা সমস্ত বনে ছড়াইয়া পড়ে।

অঙ্গিরা তখন দুইটি গাছের ডাল ঘষিয়া আগুন জ্বালার কৌশলটি শিখিয়া ফেলিলেন। অগ্নি উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত কাষ্ঠখণ্ড দু'টিকে অরণি বলে। অঙ্গিরা এই অরণি আবিষ্কার করিয়া মানব-সমাজের অনেক কল্যাণ করিয়াছেন।

মানুষের জ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রাচীন কালের অরণিই এখন দিয়াশলাই কাঠিতে পরিণত হইয়াছে। দিয়াশলাই আমাদের কত উপকারে লাগে তাহা তোমরা জান। তোমাদের বাড়ীতে যদি ম্যাচবাক্স না থাকে, এবং অন্য কোনও ভাবেই যদি তোমরা আগুনকে ব্যবহার করিতে না পার, তাহা হইলে কত অসুবিধা হইবে ভাবিয়া দেখ। বৈজ্ঞানিক ঋষি অঙ্গিরা আগুনের ব্যবহার প্রথম আবিষ্কার করিয়া মানব-সভ্যতার নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বেদের বহু সূক্তে 'অগ্নি-পুরোহিত' অঙ্গিরার কথা পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে তিনি যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন আজও নিশ্চয়ই তাহা পাইবেন।

পানুর প্রবেশিকা পরীক্ষা

শ্রীকল্যাণী দেবী, বি.এ

পানু এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে ;
তাই তার বাবা, মা, ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা,
পিসি, মাসী, দাদু, দিদিমা—
সব্বাইকার বুক ফুলে গিয়েছে।
কারণ তাঁদের বংশে
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী এই প্রথম।
কমসে কম
চেষ্টা করেছিলেন আরো পঁচিশ জন,
কিন্তু বরাত এমন
সবাই এসে ঠেকেছিলেন ভগ্নাংশে।
কাকা বল্লেন, যে ভগ্নাংশের গণ্ডী হ'ল পার,
তার কাছে খোলা হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার।
মামা বল্লেন গম্ভীর মুখে—
তা ছাড়া ও কষেছে স্কোয়ার রুট,
সব ফেলেছে শিখে
বর্গমূল থেকে বর্গফুট।
গদগদ হয়ে মা বল্লেন, দেখ নি ঠাকুরপো গয়লার হিসেব ?
সেরেফ্
মুখে মুখে চোখ বুজে
কড়াক্রান্তি
কেমন দেয় কষে ? ভুল ভ্রান্তি
কোথাও পাবে না খুঁজে।
ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।
দাদু বল্লেন, এ ছেলে জলপানি বা নেয় !
ছোট বোন মুক্তি,
দাদার ওপর ভারী ভক্তি।
বল্লে, মা, কলেজ বড় দূরে—
দাদাকে এবারে
একটা সাইকেল দিও কিনে।
তাই শুনে ঠাক্‌মা বল্লেন, এই নে—
এণ্ট্রেস পাশ ছেলে,
ও জজ হবে কালে,
ও কি হেঁটে যেতে পারে ?
ষাট্ বাছারে !

কিছুদিন পর পরীক্ষার ফল বেরুল।
বাড়ীশুদ্ধ লোক খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'ল ;
কিন্তু গেজেটের কোনো পাতায়
নীচের দিকে কিম্বা মাথায়,
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোনো বিভাগেই
পানুর নাম নেই।
ঠাকুর্দ্দা বল্লেন, ছিঃ, ছিঃ,
এ হ'ল কি !
আজকাল ইউনিভার্সিটিরও এমন ছাপার ভুল ?
জ্যাঠা উঠলেন রেগে, ফুল, ফুল, সব ফুল (fool)।
মামা বল্লেন সন্দেহের সুরে,
একবার দেখো তো অঙ্কের প্রশ্নপত্রটা পড়ে,—
ভগ্নাংশ দেয় নি তো ?
কাকা বল্লেন, বাজে কথা যতো !
পানু কি ভগ্নাংশে ভেঙ্গে পড়বার ছেলে ?
মা পানুকে ডেকে নিলেন আড়ালে।
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে
বল্লেন সান্ত্বনা দিয়ে,
বেশ করেছিস্ বাপ !
বাপ খুড়োকে পেরিয়ে
যদি পাশ করে যেতিস্ বেরিয়ে
সে যে মস্ত হ'ত পাপ !
বংশধর হয়ে তাঁদের মুখে দিতিস্ কালি !
লোকে যে দিত হাততালি !
ফেল করে তুই উজ্জ্বল করলি বংশের মুখ,
গর্ব্বে আমার ভরে উঠছে বুক !

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ

ইয়েট্‌স্ ও পিয়ারসন্

এর আগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের গল্প বলতে গিয়ে
ল্প কেরি ও জন্ ম্যাকের কথা বলেছি। এবারে
আরও ২।১ জনের কথা।
উইলিয়াম্ ইয়েট্‌স্ এঁদের একজন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের
থম মাসে লগবোরোতে ইয়েট্‌স্‌এর জন্ম হয়। তাঁর
ব্যবসা করতেন জুতোর। ব্রীস্টলের ব্যাপটিস্ট
জে তিনি প্রাচ্য দেশের নানা ভাষা শিখবার সুযোগ
। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে তিনি কেরি সাহেবের
াগিতা করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "স্কুল বুক
াইটির" সম্পাদক নিযুক্ত হন। এইখানেই পড়া-
র যথেষ্ট সুযোগ তাঁর আসে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর
হয়।
বাংলা ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।
দের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :
(১) পদার্থ বিদ্যা—১৮২৪
(২) পদার্থ-বিদ্যা-সার। অর্থাৎ বালকেরদিগের
র্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন।—১৮২৫
(৩) বাইবেলের অনুবাদ (আংশিক) ১৮৩৩
(৪) জ্যোতির্বিদ্যা যুবলোকের শিক্ষার্থে—১৮৩৮
(৫) ইনট্রোডাক্‌শন্ টু দি বেঙ্গলী ল্যাংগোয়েজ্
(দুই ভাগে)—১৮৪০
(৬) হিতোপদেশ—১৮৪১
(৭) সার সংগ্রহ—১৮৪৪
ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বইগুলির নাম পড়লেই বেশ বোঝা যায় ইয়েট্‌স্ সাহেবের পরিকল্পনা কত দীর্ঘপ্রসারী।

"পদার্থ-বিদ্যা-সার" গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান হ'লেও বিজ্ঞানের শব্দ-বিভীষিকা এখানে নেই। কথোপ-কথনের ভিতর দিয়ে নীরস বিষয়কে যতটা সম্ভব সুখপাঠ্য ক'রে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। যেমন :

শিষ্য : নক্ষত্র পতনের যে দর্শন হয় সেটা কি ?

গুরু : সে নক্ষত্র পতন নয় (,) কিন্তু সূর্য্য সন্তাপদ্বারা যে কোন বস্তুর বাষ্প আকাশে উঠে তাহার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রজ্বলিত হয় ; তাহাতে যে পর্য্যন্ত সে সকল দগ্ধ না হয় তাবৎ (ততক্ষণ) ঐরূপ দর্শন হয়।

শিষ্য : রাত্রিকালে যে আলেয়ার দর্শন হয় সে কি ?

গুরু : অনুমান হয় যাহাতে অগ্নির যোগ আছে এমন কোন বায়ু বিশেষ হইবে কিংবা মৃত বৃক্ষ ও পত্র হইতে নির্গত কোন সক্লেদ বস্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গের যোগ হওয়াতে প্রজ্বলিত হয়।" ইত্যাদি।

"জ্যোতির্বিদ্যা"তেও লেখক বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন ; যথা : "পৃথিবীর গতি ও আকার পরিমাণের বিষয়" ; "সকল বস্তুর তোলন, নিক্তি ও সূর্য্যাদিগ্রহ বিবরণ" ; "পৃথিবীর দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা নির্ণয়ার্থক নিয়ম কথন" ; "দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবর্ত্ত ও চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ" ; "সমুদ্রে জোয়ার ভাটার বিষয়" ইত্যাদি।

আর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর নাম ক'রে আমি এ অধ্যায় শেষ করবো ; তিনি হ'চ্ছেন জন্ পিয়ারসন সাহেব। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় ; মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি অনেক বাংলা বই লিখে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) পত্র কৌমুদী। ১৮১৯
(২) পাঠশালার বিবরণ। ১৮১৯
(৩) বাক্যাবলী। ১৮২০
(৪) নীতিকথা (রাধাকান্ত দেবের সহযোগি
(৫) মারের ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ। ১৮
(৬) প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয়। ১৮৩০
(৭) ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথন।
(৮) দুই মহা আজ্ঞা (দি টু গ্রেট কমেণ্ট্‌স্)। ১৮২৬
(৯) এ স্কুল ডিক্‌শনারী। ১৮২৯
(১০) 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্'এর অনুবাদ।

আমাদের গ্রাম

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ, বিদ্যাবিনোদ

শ্যামের গণ্ডীতে ঘেরা আমাদের গ্রাম,
ফলে ফুল-গাছে গাছে নয়নাভিরাম।
দোয়েল, শালিখ, শ্যামা গান গায় নিতি,
ছোটতে বড়তে হেথা অনাবিল প্রীতি।
ষষ্ঠী-বটের তলে হেথা বসে মেলা,
যেথায় আঘাত নেই, নেই অবহেলা।

গ্রামের দক্ষিণে বহে দ্বারকেশ্বর,
উত্তরে ঘন বন, পূর্বে সহর।
দিনে লোক কাজ করে, রাতে কীর্তন,
উদাসী বাউল সুরে মেতে ওঠে মন।
ঘরে ঘরে মায়েদের মূরতি উজল,
তাঁদের স্নেহের টানে জনম সফল।

তরুণের সাধ

এ. কে. জয়নাল আবেদীন (আতশবাজ)

দুঃখ-আহত, মর্ম্মপীড়িত, সংগ্রামরত বীর,
সুখ পানে উদ্ধত গতি, চক্ষে নাহিক নীর।
জিয়া চলি পর্ব্বত গিরি, উচ্চ প্রাচীর বাধা,
নিশীথে দুর্গম মাঠ—কুজ্ঝটিকার ধাঁধা।
বিবেক, উন্নত মন, সংযত সদা দিল,
পিতার শিষ্য সেবক—নিঃস্বের সাথে মিল।
আলোকেতে ভাঙা ও গড়াব বাস্তব রূপ আঁকি,
যুগের সভ্য মানুষ সত্য লয়েই থাকি।

তত্ত্ব নিয়েই মত্ত কেবল মিথ্যারে পায় দলি,
ধ্বান্ত দেখেই ক্ষান্ত তো নই—রশ্মি পানেই চলি।
রত্নাকরের গর্ভ মথন করেছি জীবন ভরি',
মুক্তা মাণিক শুক্তি দিয়েই ভরেছি আমার তরী।
দুঃখ-রাতের কাঁটার পথেই আমার চলার গতি,
কণ্টকময় বনের মাঝেই গড়িব অমরাবতী।
ধৈর্য্য আমার স্থৈর্য্য আমার কভু নাহি ভাঙ্গে বাঁধ,
মাটীর ধরায় সোনার স্বর্গ গড়িতে আমার সাধ।

কলকাতার ফুটবল

শ্রীঅমলকুমার মিত্র, সাহিত্যভারতী

এ বছরের ১৬ই আগষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে কলিকাতার খেলার মাঠের সমস্ত খেলা অসময়ে বন্ধ যায়। সেই সময়ে আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। শেষ হইতে পারে নাই। তার পর অনেক দিন তায় আর প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলাই অনুষ্ঠিত —এমন কি এ বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল্ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের রাষ্ট্রীয় নের পর এবারকার আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিতার ব্যবস্থা করা হয়।

রতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই আই. এফ. এ শীল্ড গিতায় নানা কারণে এবার বাহিরের বিশেষ ম যোগদান করিতে পারে নাই। ফলে স্থানীয় প্রথম ডিভিসন ও দ্বিতীয় ডিভিসনের টীমের মধ্যেই ধরিতে গেলে শীল্ড খেলা সীমাবদ্ধ ছিল। বাহিরের দলের মধ্যে ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি জেলা একাদশ এবং খড়্গপুরের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে—মাত্র এই তিনটি দল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত টীমটি ব্যতীত অন্য কোনও টীমই তৃতীয় রাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ২২টি টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। খেলার বিবরণ নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হইল :—

প্রথম রাউণ্ড

১। জর্জ্জ টেলিগ্রাফ (দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন) ইয়ং বেঙ্গলকে শোচনীয় ভাবে চার গোলে পরাজিত করে।

২। মোহনবাগান কালীঘাটকে হারায় ৩—০ গোলে।

৩। স্পোর্টিং ইউনিয়ন সুবারবন্‌কে হারায় ৪—১ গোলে।

৪। পুলিশকে হারায় রাজস্থান ১—০ গোলে।

৫। লীগ চ্যাম্পিয়ন ইষ্টবেঙ্গল এরিয়ান্‌সকে হারায় ২—০ গোলে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

১। জর্জ্জ টেলিগ্রাফ অতি কষ্টে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারায় ০—০ ; ১—১ ; ১—০ গোলে।

২। মোহনবাগান রেঞ্জার্সকে হারায় ২—০ গোলে।

৩। ভবানীপুর ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করে ১—০ গোলে।

৪। মহমেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় ডিভিসনের টাউন ক্লাবকে ৩—০ গোলে হারায়।

৫। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ২৪ পরগণাকে হারায় ৪—০ গোলে।

৬। দ্বিতীয় ডিভিসনের রাজস্থান জলপাইগুড়িকে ০—০ ; ৩—১ গোলে পরাজিত করে।

৭। ইষ্ট বেঙ্গল হাওড়া ইউনিয়নকে ৪—০ গোলে হারায়।

৮। খড়্গপুরের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ডালহৌসীর বিরুদ্ধে 'ওয়াক ওভার' পায়।

তৃতীয় রাউণ্ড

১। জনপ্রিয় মোহনবাগান দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন টীম, প্রথম ডিভিসনের স্পোর্টিং ইউনিয়ন-বিজয়ী জর্জ্জ টেলিগ্রাফকে শোচনীয় রূপে ৬—১ গোলে পরাজিত করিয়া এইবারকার শীল্ড প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোল দিবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে।

২। ভবানীপুর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিংএর নিকট ১—০ গোলে পরাজয় বরণ করে।

৩। শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল রাজস্থানকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

৪। বি. এ. রেলওয়ে বি. এন. রেলওয়েকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে।

এই তো গেল প্রথম তিনটি রাউণ্ডের সংক্ষিপ্ত তার পরেই চতুর্থ রাউণ্ডের খেলা না হইয়া সেমি ফাইন্যালের খেলা হয়, এবং দুইটি চ্যারিটি হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সেমি ফাইন্যাল খেলায় শীল্ড বিজয়ী শক্তিশালী বি. এ. আর-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্ব এ. আর ইষ্ট বেঙ্গলকে শীল্ড ফাইন্যালে ২—০ পরাজিত করিয়া শীল্ডবিজয়ী হয়। সুতরাং এই শীল্ড সেমি ফাইন্যাল দেখিতে বিশেষ জনসমাগম খেলায় বি. এ. আর পরাজিত হয় মাত্র ১—০ গোল দেন কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফ বার্ম্মিজ খেলোয়াড় পাগসলে। ইষ্ট বেঙ্গল এবার ক্রমান্বয়ে পাঁচ বার শীল্ড ফাইন্যালে উঠিবার যোগ্যতা করে।

অপর সেমি ফাইন্যাল খেলায় বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ টীম মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং হয়। এই খেলায়ও অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হয়। বাগান অতি কষ্টে ১—০ গোলে বিজয়ী হয়। স্পোর্টিং এর ক্রীড়ানৈপুণ্য হইয়াছিল খুব এমন কি তাহারা শৈলেন মান্নার একটি তীব্র শট্‌ও আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা করে।

ফাইন্যালের খেলার জন্য ক্রীড়ামোদীগণ উদগ্রীব হইয়া থাকেন। কারণ ফাইন্যালে দুইটি শ্রেষ্ঠ টীম মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল দ্বন্দ্বিতা করিবে। কিন্তু ফাইন্যালের দিনে যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, আই. এফ. এ. শীল্ডের বোধ হয় তাহার তুলনা মেলা দুষ্কর।

সেদিন বেলা আড়াইটা হইতে টিকেট বিক্রয় ছিল, এমন সময়ে আধ ঘণ্টা পরে ঘোষণা করা আর টিকেট নাই। অতি উৎসাহী দর্শকগণ রণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং স্বাধীন দেশের এই পরিচয় বিস্মৃত হইয়া রিজার্ভ সিটগুলি জোর দখল করিলেন। পুলিসের কোনও কথা শুনি এবং "খেলা অনুষ্ঠিত হইবে না" এই ঘোষণা মাঠে টেবিল চেয়ার চুরমার করিয়া প্রলয় কাণ্ড

...লেন। পুলিশকে বাধ্য হইয়া কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার ...ত এবং গুলি ছুঁড়িতে হয়। ইহাতে অনেকে ...ত হন। পুলিশদেরও আহতের সংখ্যা বিশ জনের ...হয়। শোনা যায় দর্শকগণ রাস্তার নিরীহ পথচারী-...উপরেও জুলুম করেন। হঠাৎ এই কাণ্ডটি সংঘটিত ...য় আই. এফ. এর কর্ত্তৃপক্ষ এবারকার ফাইন্যাল ...টি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। ...সরের মাঝামাঝি এই খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে ...া শোনা যাইতেছে।

এই তো গেল শীল্ডের খবর। এইবার আন্তঃ প্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল খেলাও ৫ বৎসর পরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে :—

১। মহীশূর ২। বাংলা ৩। বোম্বাই ৪। মাদ্রাজ ৫। আসাম ৬। বিহার ৭। উড়িষ্যা ৮। যুক্তপ্রদেশ এবং ৯। ত্রিবেন্দ্রাম। মহীশূর গত বৎসরের বিজয়ী।

শেষ পর্য্যন্ত ফাইন্যালে ওঠে বাংলা ও বোম্বাই, এবং এই খেলায় বাংলা দল বোম্বাইকে পরাজিত করিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়।

সুকুমার-স্মরণে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আজ ১৩ই কার্ত্তিক। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতি-...এই তারিখটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আজ থেকে ...বছর আগে এই দিনটিতে এমন একজন শিশু-

৺সুকুমার রায়

...ত্যিক জন্মেছিলেন যাঁর তুলনা বাংলায় কেন, পৃথিবীর ...কোন সাহিত্যেই বোধ হয় কম পাওয়া যাবে। ইনি 'আবোল তাবোলের' কবি, সন্দেশ-সম্পাদক ৺সুকুমার রায়।

২৪ বছর আগে সুকুমার রায় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ মাত্র ৩৬ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন, বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য যে রত্নভাণ্ডার রেখে গেছেন তা-ই তাঁকে চিরকাল অমর ক'রে রাখবে।

যে সময়কার কথা বলছি তখন বাংলা শিশুসাহিত্যে এত সমারোহ ছিল না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখক ছেলেমেয়েদের জন্য সত্যিকার দরদ দিয়ে লিখতেন। এত মাসিকের ছড়াছড়ি ছিল না, এত বার্ষিকীর কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। ছোটদের বইএর যে রূপ-সজ্জা—চাকচিক্য তোমাদের চোখ ঝলসে দেয় সেকালে তারও দেখা পাওয়া যেত না কোথাও। ঠিক সেই যুগে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব শুধু বিস্ময়কর নয়—ভগবানের আশীর্ব্বাদও বলা যেতে পারে।

সুকুমার রায়ের বাবা ৺উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য চমৎকার লিখতেন। তাঁর ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। কিন্তু এ ছাড়াও তিনি কত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে লিখতেন

তার হিসার নেই! দুঃখের বিষয় তার কোনটিই আজ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বেরোয় নি, তাই এ যুগের ছেলেরা সে মধুর আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। সুকুমার রায়ের বইএর প্রকাশকেরা পুরোনো মাসিকের পাতা ঘেঁটে সেগুলো উদ্ধার ক'রে যদি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতেন তবে তা বাংলা শিশুসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ্ হয়ে থাকৃত।

বাংলা ১৩২০ সালে উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা বার করেন। তার আগে সখা, সাথী, মুকুল, বালক, তোষিণী ইত্যাদি আরও কতকগুলি ছেলেদের মাসিক বেরিয়েছিল বটে কিন্তু 'সন্দেশ' যেন শিশুসাহিত্যে এক নতুন যুগান্তর নিয়ে এল। সেই ৩৪ বছর আগে লেখায়, ছাপায়, ছবিতে অমন একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাগজ কি ক'রে বার করা সম্ভব হ'ত আজও ভাবতে অবাক্ লাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল, উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'ও তেমনি শিশুসাহিত্যে এনেছিল নতুন প্রাণ— এ কথা জোর ক'রে বলা যায়।

সন্দেশ বার করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিশুসাহিত্যে দেখা দিলেন একদল শক্তিশালী লেখক। এঁদের বেশীর ভাগই ঐ রায় পরিবারেরই লোক। উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, তাঁর ছেলে সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল, মেয়ে সুখলতা, পুণ্যলতা—এঁদের কথাই বলছি। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নাম যেমন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, বাংলা শিশুসাহিত্যেও তেমনি এই রায় পরিবারের নাম অমর হয়ে থাকবে।

সন্দেশ বেরোবার বছর তিনেক পরেই উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হ'ল, সন্দেশ সম্পাদনার ভার পড়ল সুকুমারের উপর। সুকুমারের লেখার সঙ্গে বাংলার ছেলেমেয়েরা ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত হয়েছিল, সম্পাদক সুকুমার আবার এক নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিলেন।

কী অদ্ভুত ছিল তাঁর সে সব লেখা! তাঁর হাসির কবিতা শিশুসাহিত্যে একেবারে নতুন জিনিষ। ইংরেজীতে 'ননসেন্স রাইম্' নামে এক ধরণের হিজিবিজি কবিতা আছে। কেউ কেউ মনে করেন সুকুমারের এই সব আবোল তাবোল কবিতা বুঝি তারই অনুকরণে [illegible] কিন্তু কথাটা যে একেবারেই ঠিক নয় তা ঐ দুই [illegible] কবিতা পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই বোঝা [illegible] সুকুমারের আবোল তাবোল অনেক উঁচুদরের [illegible] এবং এ তাঁর নিজস্ব সম্পদ্ এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে [illegible] যায়। এই অফুরন্ত হাসির ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে [illegible] ইঙ্গিত আছে তা পড়ে বুড়োরাও হাসি চাপতে পা[illegible] না। অথচ এর মধ্যে কা'কেও আঘাত করার [illegible] (যা প্রায় ব্যঙ্গ-কবিতারই বৈশিষ্ট্য) একেবারেই [illegible] কবিতার প্রত্যেকটি মিল, প্রত্যেকটি শব্দ যেন অনা[illegible] হাসির এক-একটা জমানো টুকরো। রবীন্দ্রনাথ এ স[illegible] যা বলেছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই বলি—"বঙ্গ সাহি[illegible] ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি [illegible] গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশে[illegible] তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার [illegible] সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।"

শুধু কি হাসির কবিতা? হাসির গল্প, হাসির নাটক [illegible] এ সবেও সুকুমারের হাত কি অপরূপ ছিল তার পরি[illegible] তোমরা পেয়েছ। স্কুলের ছাত্রজীবন নিয়ে তিনি [illegible] সরস গল্পগুলি লিখতেন তাও সে যুগে ছিল একেবা[illegible] নতুন। এ দিক্ দিয়েও তিনি শিশুসাহিত্যিকদের প[illegible] প্রদর্শক বলা যেতে পারে। গল্প আর কবিতার স[illegible] সমান তালে চল্‌ত তাঁর ছবি। ছবি আঁকায় সুকু[illegible] সিদ্ধহস্ত ছিলেন—সন্দেশের প্রায় সব ছবিই তিনি নিজে[illegible] হাতে আঁকতেন, এবং তার মধ্যে তাঁর এমন এক[illegible] নিজস্ব ঢং ছিল যার তুলনা আজও বড় একটা চোখে প[illegible] না।

কিন্তু আরও এক ধরণের লেখায় সুকুমার অসাধা[illegible] নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন যার কথা হয়তো তোম[illegible] অনেকেই জান না। সে তাঁর প্রবন্ধ—বিশেষ ক[illegible] বৈজ্ঞানিক বা ঐ জাতীয় প্রবন্ধ। তথ্যবহুল, স[illegible] অথচ কী সহজবোধ্য ছিল সেই সব প্রবন্ধ! প্রবন্ধ ছো[illegible] বেশী পড়তে চায় না—হয়তো মনে করে প্রবন্ধ মানে[illegible] কতকগুলো নীরস 'টেক্সট্ বুক্' জাতীয় পদার্থ কৌশ[illegible] তাদের গেলান হচ্ছে। কিন্তু প্রবন্ধও লিখতে জান[illegible] যে কত অপরূপ হ'তে পারে পুরোনো আমলের সন্দে[illegible]

[illegible] তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুমারের রচনার [illegible]টা দিক্ এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে এখনও [illegible]াত রয়ে গেছে। এই লেখাগুলোও সংগ্রহ ক'রে [illegible]কারে প্রকাশের সময় এসেছে। নইলে সুকুমারের [illegible] প্রতিভার ঠিক ঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না।

[illegible]য়িক পত্র হিসাবে, আগেই বলেছি, সুকুমারের [illegible] ছিল একখানি আদর্শ পত্রিকা। সম্পাদনার [illegible]ত্রিকা যে কত উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে তা এই [illegible]র যে কোন সন্দেশ নিয়ে সুকুমারের মৃত্যুর বহু [illegible] প্রকাশিত দ্বিতীয় পর্ব্বের একখানা সন্দেশের সঙ্গে [illegible] করলেই বোঝা যায়। অবশ্য সন্দেশ সম্পাদনায় [illegible]র দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তাঁর ছোট ভাই ৺সুবিনয় [illegible] এই দুই প্রতিভাবান্ ভাইএর সম্মিলিত যত্নেই [illegible]র সন্দেশ অমন চমৎকার হ'তে পেরেছিল।

[illegible] প্রসঙ্গে একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। যেদিন [illegible] প্রথম সন্দেশের গ্রাহক হ'লাম সেদিনের কথা। [illegible] বয়স তখন বছর আটেক, থাকতাম সুদূর [illegible]। গল্পের বই পড়ার আগ্রহ আমাদের সব [illegible]ভাইবোনের ছিল প্রচুর, কিন্তু বাংলা থেকে ১২০০ [illegible] দূরের সেই সহরে বাংলা বইএর মুখ দেখা বেশ [illegible] ছিল। বহু আবেদন-নিবেদনের পর বাবাকে [illegible] করিয়ে সন্দেশের গ্রাহক হবার জন্য চিঠি দিলাম। [illegible]ঠি কলকাতায় সন্দেশ অফিসে পৌঁছে ফেরৎ ডাকে [illegible] আসতে ৬।৭ দিনের ধাক্কা। এই ৬।৭ দিন যে কি [illegible] কাটল তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। [illegible]য়ে সন্দেশ এল। একেবারে একসঙ্গে দশ খানা। [illegible]র সে কী কাড়াকাড়ি! ভীম নাগের এক ঝুড়ি [illegible] এলেও বোধ হয় অমনটা হ'ত না। মনে পড়ে [illegible]ত্রে আমরা কয় ভাইবোন একেবারে ঘুমুতে পারি [illegible] দুপুর রাত জেগে সন্দেশ পড়ছিলাম। পাশের ঘর [illegible] মা ধমক দিলেন, 'আর রাত জাগতে হবে না, [illegible]ড়িস।' আলো নিভিয়ে দেওয়ায় পড়া আর হ'ল [illegible] কিন্তু বাকি রাতটুকু, যতদূর মনে পড়ে, কিছুতেই [illegible] পারি নি। কতক্ষণে ভোরের আলো ফুটবে, [illegible] সন্দেশ খুলে বসতে পারব—এই প্রতীক্ষায় প্রহর [illegible] গুনলাম।

তারপর প্রতি মাসে সন্দেশ আসার সময় হ'লে কয়েক দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটত। যেদিন সন্দেশ আসত—যত রাতই হোক্ না কেন, ধাঁধার উত্তর বার না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম না। কবিতাগুলো তো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখস্থ হ'য়ে যেত। (এবং আজও তা মুখস্থ আছে।) পড়া শেষ হয়ে গেলে ভাবতাম— আবার পূরো একমাস অপেক্ষা করতে হবে! কি ক'রে কাটবে এতদিন!

মনে আছে লাহোর থেকে কলকাতায় এসে দাদার সঙ্গে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর দেখার চাইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের সন্দেশ কার্য্যালয় দেখার আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। এবং কালবিলম্ব না ক'রে সে আগ্রহ মিটিয়েছিলাম। এমনই যাদু ছিল সুকুমার রায়ের সন্দেশের!

সুকুমারের যখন মৃত্যু হয় তখনও আমি ছোট—ইস্কুলের গণ্ডী পার হই নি। তাই সুকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু একটু বড় হয়ে তাঁর ভাই ৺সুবিনয় রায় এবং তাঁদের পরিবারের আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সুকুমার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি—তাঁর জীবনের নানা ঘটনার কথা জেনেছি। জেনেছি মানুষটিও ছিলেন তিনি তাঁর লেখারই মত সুন্দর—তেমনি হাস্যকৌতুকে ভরা।

লেখাপড়ায় সুকুমার খুব মেধাবী ছিলেন। ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি—এই দুই বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি.এস্-সি পাশ ক'রে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। বিলেতে ম্যাঞ্চেষ্টারে ফটোগ্রাফী ও ব্লক্ তৈরী সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে ১৯১৩ সনে দেশে ফিরে আসেন। ব্লক্ তৈরী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ক'রে তিনি এফ্. আর. পি. এস্. উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁদের নিজেদের ব্লক্ তৈরীর বিরাট প্রতিষ্ঠান ইউ. রায় এণ্ড সন্সএ যোগ দেন। এখানে বলা যেতে পারে উপেন্দ্রকিশোরই এ দেশে হাফ্‌টোন ব্লকের প্রবর্ত্তন করেন।

সুকুমারের বয়স যখন উনিশ-কুড়ি বছর তখন তিনি 'ননসেন্স ক্লাব্' নামে একটি ক্লাব গঠন করেন। নাম শুনেই বুঝতে পারছ তিনি কেমন আমুদে ছিলেন! এই ক্লাবের সভ্যরাও ছিলেন সেই রকম আমুদে। ক্লাব থেকে

একখানা হাতে লেখা পত্রিকা বেরোত, তার নাম ছিল "সাড়ে বত্রিশ ভাজা"। হাস্যকৌতুককর অভিনয় এবং গানে সুকুমার ছিলেন বিশেষ দক্ষ।

এ ছাড়া সুকুমার আর একটি সাহিত্য সমিতিও গড়ে তোলেন। তার নাম 'মণ্ডা'ক্লাব'। পরে অবশ্যি নামটা একটু বদলে করা হয় মণ্ডে ক্লাব'। এটিও ছিল ঐ রকম আমুদেদের ক্লাব। অবশ্যি এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তখনকার অনেক নাম-করা সাহিত্যিকরাই ছিলেন, যেমন— কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, সুবিনয় রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্ত্তী, কিরণশঙ্কর রায়, কালিদাস নাগ প্রভৃতি। ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন শিশির দত্ত। কিন্তু সুকুমার রায়ই ছিলেন ক্লাবের প্রাণ। সপ্তাহে একবার ক'রে ক্লাবের অধিবেশন বস্‌ত। চিঠিপত্র বেশীর ভাগই লেখা হ'ত কবিতায়—এবং আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 'বিবিধ' —অর্থাৎ 'জলযোগ' একটা বড় অংশ যুড়ে থাকত। এ বিষয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ "আমাদের মণ্ডা সম্মিলন" নামে একটি সুন্দর গান লিখেছিলেন। তার প্রথম দিক্‌টা ছিল এই রকম—

"আ"— আমাদের মণ্ডা সম্মিলন,
আরে না— তা না, না না—
আমাদের মণ্ডে সম্মিলন!
"আমাদের হল্লারই কুপন!"

ক্লাবের কাজকর্ম্ম কি রকম, হাসি-তামাসার ভিতর দিয়ে হ'ত তার পরিচয় ক্লাবের কার্য্যবিবরণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। একবার বাৎসরিক হিসাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হ'ল এই রকম:

আয়	ব্যয়
জানা যায় নাই	বিলকুল

সার্টিফায়েড্ কারেক্ট্। সম্পাদক।

আর একবার (৩য় বার্ষিক বিবরণী) হিসাবে দেখা গেল সম্পাদকের হাতে জমা আছে সওয়া চৌদ্দ সম্পাদক এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"আমার হাতে বাক্সে এই সোয়া চোদ্দ আনা পয়সা মজুত সভ্যেরা যদি অসভ্যের মত খাই খাই না করিয়া চা খুসী থাকিতেন—যাক্, সে কথা বলিয়া কো নাই।"

একবার সম্পাদক মশাই অকস্মাৎ কোথায় দিলেন। ক্লাবের অবস্থা হ'ল কাহিল। তখন রায় এই-রকম একটি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র বার শোকসংবাদ বোঝাবার জন্য যেমন কালো বর্ডার হয় এই চিঠিতেও তেমনি কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিখানা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না—

"সম্পাদক বেয়াকুব
এদিকেতে হায় হায়
তাই বলি, সোমবারে
দিলে সবে পদধূলি
রকমারি পুঁথি যত
আনিবেন সাথে সবে,
করযোড়ে বার বার

কোথা যে দিয়েছে
ক্লাবটি তো যায় যায়
মদ্‌গৃহে গড়পারে
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি
নিজ নিজ রুচিমত
কিছু কিছু পাঠ হবে
নিবেদিছে সুকুমার।"

মণ্ডে বা মণ্ডা ক্লাবের অধিবেশন সুকুমার বাড়ীতেই বেশী হ'ত।

১৩৩০ সালে নিতান্ত অকালে সুকুমার রায় দুরন্ত কালাজ্বরে ভুগে পরলোক গমন করেন। মা কিছু দিন বাঙ্গালী যেন তাঁর কথা ভুলেই গিয়ে এমন কি তাঁর প্রায় কোন বই-ই বাজারে পাওয়া যে এবং তখনকার ছেলেরাও এই প্রতিভাবান্ লে লেখার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে নি। সুখের এখন আস্তে আস্তে সুকুমারের অনেক লেখাই পুস্তকাকারে দেখা দিচ্ছে এবং বাংলার ছেলেমেয়ের খোরাক মেটাচ্ছে। তাঁর বইএর প্রকাশক সিগনেট এ জন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

— তিন —

সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু দেরী আছে। পুষ্পমিত্রকে নিয়ে পতঞ্জলি মগধ-সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে ন।

মগধ-সম্রাটের সাতমহলা বাড়ী, পাটলিপুত্রের রাজ-াদ। গঙ্গার তীরে যোজনব্যাপী ঘন সন্নিবিষ্ট দের মাঝে মৌর্য্য বংশের বিরাট রাজপ্রাসাদ। র পর মহল—অধ্যক্ষভূমি, কুমারভূমি, উপস্থান, মি, অলঙ্কারভূমি, অন্তঃপুর—একটীর পর একটী অট্টালিকা। প্রশস্ত কক্ষ, দীর্ঘ দালান, সাত রঙে সু-উচ্চ দারুস্তম্ভমণ্ডিত সভাঘর। প্রাসাদের ভিতরে হিরে সোনা, রূপা ও লাক্ষার মনোহারী কারুশিল্প তী সূর্য্যের দীপ্তিতে বহু বর্ণবৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় ঠ। ভারতীয় শিল্পকলার পরম বিকাশ দৃষ্টিকে দেয়।

অট্টালিকাশ্রেণীকে ঘিরে আছে নয়ন-মনোহারী ন। নানা দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ, নানা অসংখ্য পোষা পাখীর সমারোহ। পাখীগুলির কেউ শিকল পরিয়ে রাখতো না, তারা ইচ্ছামত গাছে উড়তো, কলকাকলিতে সারাক্ষণ উদ্যানভূমি ত করে রাখতো। কয়েকটী সরোবরে স্ফটিকের স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করতো, মৃণালের পাশে পাশে নানা র মাছ রামধনুর চাঞ্চল্য জাগাতো। প্রকৃতির র্য্য আর শিল্পীর বিলাস এসে মিলেছিল এই দে

আড়াই হাজার বছর আগে সমগ্র উত্তরাপথের সমৃদ্ধি আহরণ করে মৌর্য্য সম্রাটেরা পাটলিপুত্রের এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ইলিয়ান এই প্রাসাদ দেখে লিখে গেছেন: 'এমন চমৎকার প্রাসাদ গ্রীস দেশে নেই, তৈরী করার মত শিল্পীও নেই!' চীনা দূত ফা-হিয়ান লিখেছিলেন: 'এই প্রাসাদ মানুষের তৈরী নয়, মানুষ এমন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না। আগেকার রাজারা তাল বেতালের মত ভূত আর দানবকে বশ করে এই প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন।'

দু' হাজার বছর আগে—আমাদের এই কাহিনীর যুগে—মগধের এই প্রাসাদে মৌর্য্য সম্রাট্ বৃহদ্রথ বাস করতেন।

গঙ্গাবক্ষে প্রশস্ত প্রাসাদ-অলিন্দ। সুবর্ণখচিত জাজিমের উপর বসে সম্রাট্ বৃহদ্রথ অন্তরঙ্গ কয়েকজন পার্ষদ নিয়ে দাবা খেলায় নিমগ্ন।

ওপারের অশথ-তমালবীথি থেকে বায়ুহিল্লোল অসংখ্য নৌকার পালে পালে ভর দিয়ে এপারের অলিন্দ পার হয়ে মহানগরীর অলিগলি-পথে হারিয়ে যাচ্ছে। শরতের স্বচ্ছতা দেখা দিয়েছে আকাশে, নীল রঙ ঢলে পড়েছে নদীর প্রান্তে, গোধূলি রঙের প্রান্তরের সীমান্তে। বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘে শুভ্রতা দেখা দিয়েছে, দিনশেষের সূর্য্য-কিরণ রূপালী জরীর কাজ করছে মেঘের কিনারায়। গঙ্গা-বুক্ষের স্নিগ্ধ সমীরণে প্রাসাদ-অলিন্দে সুবর্ণখচিত জাজিমের

উপর বসে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে সম্রাট্ বৃহদ্রথ দাবা খেলায় নিমগ্ন।

পতঞ্জলি এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন—সম্রাটের জয় হোক!

বৃহদ্রথ চোখ না তুলেই মাথাটী খানিক ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানালেন, বললেন—প্রণাম হই গুরুদেব, আসন গ্রহণ করুন।

পতঞ্জলি বসলেন না, পার্ষদদের মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—একটা সংবাদ ছিল মহারাজ!

—এখনি শুনবো গুরুদেব! আপনি একটু বসুন, আগে এই বাজীটা শেষ করে নিই। গ্রীক্‌দের এমন চেপে ধরেছি···নাও, কিস্তি···এইবার?

পতঞ্জলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর পদক্ষেপে অলিন্দের এক পাশে সরে এলেন। সেখান থেকে নীচের অধ্যক্ষভূমির একাংশ দেখা যায়, ধূসর প্রাঙ্গণকে সামনে রেখে বরাবর প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়ে হস্তিশালা চলে গেছে। সমান্তরালে গঙ্গার তট ধরে এগিয়ে গেছে দীর্ঘ রাজকীয় অশ্বশালা। অশ্বপালক ও হস্তিপালকের দল ছুটোছুটি করছে। সামনের প্রাঙ্গণে অশ্ব ও হস্তীর সমাবেশ হচ্ছে; ওদের ভিতর থেকে দু'শ' হাতী আর দু' হাজার ঘোড়া বাছাই করে নিয়ে সুরাষ্ট্রে (কাথিয়াবাড়) গ্রীক্ রাজা মিনাণ্ডারের কাছে পাঠাতে হবে। মাধ্যমিকার (মেবার) পথে তিনি সৈন্য সমাবেশ করে অপেক্ষা করছেন। যে কোন দিন মগধ রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে। শঙ্কিত প্রত্যন্তবাসীরা হয়তো বিনিদ্র রজনী যাপন করছে, কিন্তু বিগত-শৌর্য্য মগধ-সম্রাটের সে জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। তিনি নিশ্চিন্ত মনে দাবার ছকের উপর প্রতিপক্ষের রাজাকে কিস্তি দিচ্ছেন। পতঞ্জলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গাছের নীচে ছায়ার আভাস জাগে। মেঘের কিনারায় যে রূপালী পাড় জেগেছিল, তাকে স্তিমিত করে রাত্রি-পূর্বের কৃষ্ণাভা। নীড়-সন্ধানী পাখীর কাকলিতে গাছগুলি মুখর হয়ে উঠল। প্রাসাদের পিছনে নগরের সৌধ-চূড়াগুলি অন্ধকারে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। প্রাসাদের করঙ্কবাহিনীরা ঘরে ঘরে তোরণে ও অলিন্দে দীপবর্ত্তিকা জেলে দিল, তোরণে সন্ধ্যার ভেরীনিনাদ হ'ল, নগরীর পূর্বে জাগলো শঙ্খধ্বনি, মন্দির থেকে ভেসে এলো সা কাঁসর ঘণ্টার শব্দ। পতঞ্জলি সম্রাটের দিকে বৃহদ্রথ তখনও গভীর মনোযোগের সঙ্গে দাবার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন, বাইরের জগতে তাঁর বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। দু'পাশে অসি হস্তে দেহরক্ষিণী পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আর সময়ক্ষেপ করলেন না, অলিন্দ পার হয়ে নীচে এলেন।

নীচে উদ্যানের একপাশে একটী গোলাপের পুষ্পমিত্র দোল দিচ্ছিল, প্রতীক্ষা করছিল পতঞ্জলি ডেকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

পতঞ্জলি নেমে এসে বললেন—সুবিধা হ'ল না সম্রাট্ দাবা খেলায় ভারী ব্যস্ত, তাঁর এতটুকু অবসর —মিনাণ্ডারের বিরুদ্ধে তিনি বার কয়েক কিস্তি দি আর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ-অলিন্দে গ্রীক্ সসৈন্যে পরাজিত হবেন!

—রাজ্য বিপন্ন, প্রজা বিপন্ন, আর সম্রাট্ নি মনে দাবা খেলছেন! বিস্ময়কর!

—মোটেই বিস্ময়কর নয় পুষ্পমিত্র, এই হ'ল নিয়ম। দৃঢ়চিত্তে কর্মপ্রতিভা দিয়ে একজন সাম্রাজ্য তোলে, সেই সাম্রাজ্যের উপস্বত্ব ভোগ করতে তার বংশধরেরা বিলাসের চরমে গিয়ে পৌঁছয়, শ দৃঢ়তা—দুই-ই তারা হারিয়ে ফেলে, তখন রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের হস্তচ্যুত হয়, নতুন কর্মী এসে ভার গ্রহণ করে, নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়।

—সম্রাট্ বৃহদ্রথের ভবিষ্যৎ তো তা হ'লে অন্ধকার মনে হয়!

—প্রাসাদের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন আলো না করাই বিধেয়, পুষ্পমিত্র!

পুষ্পমিত্র লজ্জিত হ'ল, বললো—হিন্দুস্থানের ভবিষ্য পানে তাকিয়ে মাঝে মাঝে চিত্তবিভ্রম ঘটে,—স্থান ও পাত্রের কথা আর স্মরণ থাকে না, গুরুদেব!

মৌনমুখে দু'জন প্রাসাদ-তোরণ পার হয়ে গঙ্গা এসে দাঁড়ালেন।

দুই শিকারীর কাহিনী

শ্রীশান্তা দেবী

উনবিংশ শতাব্দীর কথা। ইয়োরোপে ফরাসীদের সঙ্গে ...দের যুদ্ধ বেধেছে। প্রুশীয়রা প্যারিস্ শহর অবরোধ ...ছে। শহরবাসীরা কেউ অনাহারে, কেউ বা অর্দ্ধাহারে ...কাটাচ্ছে। প্রাণচঞ্চল প্যারিস শহর দেখে আর ...চেনা যায় না!

...এমনি এক দিনে সকাল বেলার রৌদ্রস্নাত রাজপথে ...টি লোক খালি পেটে পকেটে দু' হাত পুরে ঘুরে ...ছিল। লোকটির নাম মরিসোৎ, শুহুরে তার নিজের ...ছোটখাট জুতোর ব্যবসা ছিল, আর ছিল মাছ ধরার ...ও বাতিক। রবিবার এলেই আর কথাটি নেই, ...একটি লম্বা বাঁশের ছিপ আর পিঠে টিনের বাক্সে ...ধরার সরঞ্জাম নিয়ে মরিসোৎ বড় রাস্তা ধরে বরাবর ...যেত শহর পেরিয়ে সুদূর মার্যাৎ দ্বীপে। এইটি ...তার প্রিয় জায়গা। সেখানে সারা দিন ধরে চলত ...মাছ ধরা। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসা না পর্য্যন্ত ...আর হুঁস হ'ত না।

...এইখানে তার আলাপ হয় সোভাজের সঙ্গে। বেঁটে, ...সোটা, আমুদে স্বভাবের লোকটি। তারও ছিল ...ছোট মণিহারী দোকান, আর মাছ ধরার নেশা। ...পাশি ছিপ ফেলে দুই শিকারী বসে থাকত জলের ...। মাঝে মাঝে চলত দু' একটা আলাপ। এই ...াপ ক্রমে পরিণত হ'ল বন্ধুত্বে।

...যুদ্ধ বাধবার পর মাছ ধরা বন্ধ হয়েছে। শহরের ...রে যাওয়া বারণ। রবিবারগুলো বৃথাই নষ্ট হয়। ...ভাজের সঙ্গেও আর দেখা হয় না। মরিসোৎ মনে ...সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ—আরে, সামনে সোভাজ ...হ্যাঁ, সোভাজই তো!

...অনেক দিন পরে দেখা। কারো মুখ দিয়েই যেন ...বেরুতে চায় না। খানিক পরে সোভাজই কথা ...করল, "কি সব ব্যাপার দেখ দেখি!"

...পাশেই একটা ছোট কাফে। যদিও বিশেষ কিছু ...যায় না, তবু দু' জনে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকল। ...ত পড়েছে। খালি পেটে এক এক গ্লাস মদ নেহাৎ ...লাগবে না।

একটু পরেই নেশা বেশ জমে উঠল। দু' জনেই যেন কিসের একটা অভাব বোধ করছে—কি যেন একটা করতে ইচ্ছা করছে!

সোভাজই আবার কথাটা পাড়ল—"আচ্ছা, একবার গেলে কেমন হয়?"

"কোথায়?"

"কোথায় আবার? সেই দ্বীপে—মাছ ধরতে।"

"কিন্তু তার কাছাকাছি যে প্রুশীয়রা আস্তানা গেড়েছে!"

"তা গাড়ুক। ফরাসী সম্মুখ-বাহিনীও কাছেই থাকবে। তা ছাড়া ফরাসী কর্ণেলের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। দল ছেড়ে এগিয়ে যাবার এবং ফিরে আসবার যে সামরিক সঙ্কেত তা জেনে নিতে পারব। আর সত্যিই তো আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না! চল হে, চল। ওঃ, কত দিন যে মাছ ধরি না!"

মরিসোতের পক্ষে এ প্রলোভন দমন করা কষ্টকর। কাজেই সেও রাজী হ'ল।

কর্ণেল সোভাজকে চিনতেন, তার বাতিকের বিষয়েও তাঁর অজানা ছিল না। এই নির্ব্বিরোধী লোকটি আর কি ক্ষতি করবে! তিনি অনুমতি দিলেন। সঙ্কেত জেনে নিয়ে দুই বন্ধু ছিপ আর সরঞ্জাম কাঁধে রওনা হ'ল।

ফরাসী সম্মুখ-বাহিনী পার হয়ে ছোট ছোট কতকগুলি আঙ্গুরের ক্ষেত ঢালু হয়ে নদী পর্য্যন্ত নেমে গেছে। সামনে একটি পরিত্যক্ত গ্রাম। তার পর মাঠ, শুষ্ক—ফলপত্রহীন—ক্ষতবিক্ষত চেরী গাছের বন। যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে সেখানে।

সোভাজ একটা উঁচু জায়গায় উঠে চুপি চুপি বল্‌ল, "ঐখানে প্রুশীয়রা রয়েছে। যাবে ওদের অবস্থা দেখতে?" তার পর মুচকি হেসে বল্‌ল, "রোসো, আগে ওদের জন্য কয়েকটা মাছ ধরে ভেজে নিই!"

ঝোপের ভিতর দিয়ে কখনো হাঁটু গেড়ে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে তারা এগুতে লাগল। শেষে নদীর পাড়ে পৌঁছে একটা খালি জায়গা বেছে ছিপ নিয়ে বসে

পড়ল। কয়েকটা নল খাগড়ার ঝোপ তাদের আড়াল ক'রে রাখল।

চার দিক্ জনশূন্য, সামান্য শব্দও শোনা যায় না। দূরে ছোট একটি সরাইখানা, এখন বন্ধ আছে। মনে হচ্ছে যেন কত যুগযুগান্ত ধরে ওটি এই রকম বন্ধ রয়েছে!

দুই বন্ধু নিঃশব্দে মাছ ধরতে সুরু করল।

বঁড়শীতে টপাটপ্ মাছ উঠছে,—ছোট ছোট চকচকে রূপোর কুচির মত মাছ। দেখতে দেখতে তাদের থলে ভরে উঠল। অনেক দিন এমন মজা ক'রে মাছ ধরা হয় নি। আশপাশের পরিস্থিতি বেমালুম ভুলে গিয়ে দুই বন্ধু মৎস্য শিকারে নিমগ্ন হয়ে রইল।

গুম্ গুম্ গুম্। হঠাৎ একটা ভারী শব্দ। নদীর ওপারে ভালেরিন পাহাড় যেন গর্জ্জে উঠল। প্রুশীয়রা কামান দাগছে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে।

"ঐ ফের সুর হ'ল বুঝি!" সোভাজ ঘাড় নেড়ে বল্লে।

"নাঃ, আর তিষ্ঠোতে দিলে না। উন্মাদ, উন্মাদ! এ ভাবে মারামারির কোন মানে হয়?" মরিসোৎ গম্ভীর মুখে বল্লে।

ভালেরিন পাহাড় তখনও তেমনি গর্জ্জন ক'রে চলেছে। গোলার ঘায়ে ঘরবাড়ী, গাছপাথর গুঁড়ো ক'রে, ফরাসীদের সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা চূরমার করে সমানে গর্জ্জন করে চলেছে।

সোভাজ বল্লে, "এরই নাম জীবন!"

মরিসোৎ বল্লে, "না, এরই নাম মৃত্যু!"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল কাদের যেন ভারী পায়ের শব্দ তাদের ঠিক পেছনে এসে থেমে গেল। মুখ ফেরাতেই দেখে চারজন জোয়ান চেহারার প্রুশীয় সৈন্য তাদের দিকে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই দু'খানি ছিপ গড়িয়ে পড়ল নদীর জলে।

মরিসোৎ আর সোভাজকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে সৈনিকরা নিয়ে এল তাদের অধিনায়কের কাছে। সামনের বন্ধ সরাইখানাটি সত্যি বন্ধ ছিল না, সেখানেই একদল প্রুশীয় সৈন্য তাদের ঘাঁটি বসিয়েছিল।

তাদের দলপতি চেয়ারের ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে বসে পাইপ টানছিল। লোমশ দৈত্যের ম[illegible] চেহারা। বন্দী দু'জনকে সামনে আনতেই [illegible] ফরাসী ভাষায় ব্যঙ্গ-স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "[illegible] মশাইরা, মাছ ধরায় কোন অসুবিধা হয় নি তো?"

সৈনিকদের একজন মাছভরা থলিটা দলপতির কাছে নামিয়ে রাখল। দলপতি তেমনি ব্যঙ্গের [illegible] বল্ল, "বাঃ, শিকার তো ভালই জুটেছে দেখছি!"

সোভাজ আর মরিসোৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দলপতি খানিক থেমে বল্ল, "শুনুন। বাজে [illegible] থাক্। আপনারা দু'জন যে গুপ্তচর তা বুঝতে [illegible] কষ্ট হয় না। আমাদের ওপর নজর রাখবার জ[illegible] আপনাদের পাঠানো হয়েছে তাও জলের মত প[illegible] বোঝা যাচ্ছে,—যতই না কেন আপনারা মাছ ধরা[illegible] করুন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার কি কর্ত্তব্য তাও [illegible] হয় জানেন?—আপনাদের গুলি ক'রে মারা। তবে [illegible] লোকটা খুব খারাপ নই, দয়া দেখাতেও জানি। বিনা সর্ত্তে তো আর তা দেখানো সম্ভব নয়!"

দলপতি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বন্দী দু'জনের [illegible] দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বল্লে, "আপনারা যখন পা[illegible] কার ফরাসী বাহিনী পার হয়ে চলে এসেছেন [illegible] নিশ্চয়ই আপনাদের ফিরে যাবার সঙ্কেতটাও জানা [illegible] সেইটে বলে দিলেই আপনাদের মুক্তি দিতে পারি।"

দুই বন্ধু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। [illegible] দিয়ে তাদের টুঁ শব্দ বেরোলো না, শুধু পা দু'টো ঠ[illegible] ক'রে কাঁপতে লাগল।

দলপতি আবার বল্লে, "আপনাদের ভয় কি? [illegible] তো আর এ কথা জানতে পারবে না! আপ[illegible] নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যাবেন। আর যদি রাজী [illegible] হ'ন তা হ'লে তো বলেছিই আমার কর্ত্তব্যের [illegible] আমাকে তা পালন করতেই হবে। পাঁচ মিনিটের [illegible] যা হয় ঠিক ক'রে ফেলুন। আর বেশী সময় দেওয়া [illegible] হবে না।"

সোভাজ ও মরিসোৎ তেমনি চুপ করে দাঁ[illegible] রইল।

বাইরে ভালেরিন পাহাড়ের ওপর থেকে ত[illegible] সমানে কামানের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। দলপতি হ[illegible]

[illegible] বন্দী দু'জনকে একটু তফাতে নিয়ে পাশাপাশি [illegible] করিয়ে দেওয়া হ'ল, তার পর বারো জন সৈনিক [illegible]র দিকে বন্দুক উঁচিয়ে স্থির লক্ষ্য স্থাপন ক'রে [illegible]য়ে গেল।

ভালেরিনের ওপর কামান তখনও গর্জ্জন ক'রে [illegible]ছে।

দলপতি হঠাৎ চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে মরিসোতের কাছে এগিয়ে গেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে [illegible] ফিস্ ক'রে বল্ল, "এখনও সময় আছে, চুপি চুপি [illegible]য় বলে ফেলুন; আপনার সঙ্গী কিচ্ছু জানতে [illegible]বে না। আপনি মুক্তি পাবেন।"

মরিসোৎ কোনও উত্তর দিলে না।

দলপতি সোভাজের কাছে গিয়ে তারও কানে কানে ঐ কথা বল্লে। কিন্তু ফল হ'ল সেই একই।

থলির মধ্যে মাছগুলো তখনও ফর্ ফর্ করে [illegible]ছিল। মরিসোৎ একবার সেই দিকে তাকিয়ে [illegible]তাদের পানে চাইল। দুই বন্ধু করুণ চোখে পরস্পরের [illegible]হ শেষ বারের মত বিদায় প্রার্থনা করল।

[illegible]নষ্ট করবার মত আর সময় নেই। দলপতি হুকুম [illegible]—"গুলি কর।" অমনি একসঙ্গে বারোটা বন্দুক গর্জ্জে উঠল—দুম্ দুম্ দুম্। সোভাজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, মরিসোৎ একবার পাক খেয়ে বন্ধুর গায়ে ঢলে পড়ল। লাল তাজা রক্তে ঘরের মধ্যে স্রোত বয়ে গেল যেন!

সৈনিকরা এবার বাইরে থেকে দু'টো দড়ি আর দু'টো ভারী পাথর নিয়ে এল। মৃত শত্রু দু'টির পায়ের সঙ্গে তা শক্ত ক'রে বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল নদীর ধারে, তার পর ঝাঁকুনি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল নদীর জলে।

পিচ্‌কিরির মত ফিনকি দিয়ে খানিকটা জল চারধারে ছিটিয়ে পড়ল। কয়েকটা ছোট ছোট ঢেউ ঠেলা খেয়ে লাগল এসে নদীর কিনারে, তার ওপর ভাসতে লাগল কয়েক ফোঁটা রক্ত। তার পর সব শান্ত। শুধু দূরে ভালেরিন পাহাড়ের ওপর থেকে তখনও সমানে ভেসে আসছিল কামানের গর্জ্জন।

দলপতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল মাছের থলিটার দিকে। একজন অনুচরকে ডেকে সে শুধু বল্লে, "আরে এগুলো পড়ে রইল যে! যা যা, ভিতরে নিয়ে যা, আর তাজা থাকতে থাকতেই ভেজে নিয়ে আয়। ভাজা মাছ খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।"*

* ফরাসী গল্প থেকে

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বার্ষিক শিশুসাথী—১৩৫৪। আশুতোষ লাই-[illegible]। ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ৪৲

প্রতি বছরের মত এবারেও পূজোর সময় এই সুন্দর [illegible]কীখানি মনোজ্ঞ চেহারা নিয়ে শিশুদের চিত্ত জয়ের হাজির হয়েছে। তা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা [illegible]ক নানা চিত্র এবং রচনার ভিতর দিয়ে এবারকার [illegible]যোগী বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। শিশুমহলে এর আদর [illegible] সন্দেহ নেই।

দেশের মাটী—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত। [illegible] সাহিত্য ভবন। ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলি-[illegible]তা। দাম ৩৲

গত কয়েক বছর ধরে শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সম্পাদনায় একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ বছরেও এঁরা ছোটদের জন্য এই লোভনীয় বার্ষিকীখানি প্রকাশ করেছেন। এতে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রায় সকলের লেখাই দেওয়া হয়েছে। অজস্র ছবি ও বিষয়সম্পদেও বইটি কম আকর্ষণীয় হয় নি। বিশেষ ক'রে বেশীর ভাগ লেখাই আমাদের দেশের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে লিখিত হওয়ায় বইএর নামটিও সার্থক হয়েছে। বই-খানির ছবি, কাগজ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা বিবেচনা করলে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে দাম সস্তাই হয়েছে বলতে হবে।

রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান—বঙ্গীয় রাষ্ট্র-ভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক অধ্যাপক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১ বি, রমা রোড, কলিকাতা। দাম ৮০

বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার পর সারা ভারতের জন্য একটা নিজস্ব রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্য-সম্পদে অতুলনীয় হ'লেও সারা ভারতে হিন্দী ভাষাটারই চল কিছু বেশী—এবং হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁরাও এ ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারেন। এই সব কারণে, অনেকে মনে করছেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হবার সম্ভাবনাই বোধ হয় বেশী। আলোচ্য গ্রন্থে এই জন্য 'হিন্দী'কেই রাষ্ট্রভাষা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওয়ার্দ্ধার "রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি" প্রায় ত্রিশ বছরের উপরে ঐ নাম নিয়ে দেশের সর্ব্বত্র হিন্দী ভাষা শেখাবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। গ্রন্থকারও এই সমিতিরই একজন মুখপাত্র—এবং বাংলা প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত। তা সত্ত্বেও বইটির নামকরণে '[illegible] ব্যবহার না ক'রে 'হিন্দী' শব্দটি ব্যবহার করলেই [illegible] ভাল হ'ত।

দীর্ঘ দিন হাতে-কলমে অ-হিন্দীভাষীদের হিন্দী [illegible] কাজে ব্যাপৃত থাকায় গ্রন্থকার এ বিষয়ে স্বভাবতঃই [illegible] অভিজ্ঞ। শিক্ষার্থীদের কোথায় অসুবিধা হয়—কি [illegible] তা দূর করা যায় এ সব তথ্যও তাঁর নখদর্পণে। এই [illegible] প্রণয়ণে তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ পূর্ণ [illegible] গ্রহণ করেছেন। একটা নতুন ভাষা শুদ্ধ ভাবে লি[illegible] পড়তে এবং বলতে গেলে তার ব্যাকরণটাও মোট[illegible] জানা দরকার। অতি অল্প আয়াসে কি ক'রে এই [illegible] এবং তার ব্যাকরণ আয়ত্ত করা যায় এই বইএ তিনি [illegible] দেখিয়েছেন। এই বই পড়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সা[illegible] ব্যতিরেকেও অতি সহজে হিন্দী শিখতে পারবেন বলে [illegible] হয়। তা ছাড়া অতি অল্প পরিসর জায়গায় বইখানি [illegible] হওয়ায় এবং সর্ব্বত্র বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় খুব [illegible] লোকের পক্ষেও বইখানির সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হ[illegible]

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বাদল ঝরা দিনে

কুমারী চম্পা মুখোপাধ্যায়

ঝড়ের মেঘে আকাশ গেল ঢেকে,
বাঁশের বনে আঁধার নেমে আসে,
নীরব নিথর দীঘির কালো জলে
জলভরা ঐ মেঘের ছায়া ভাসে।

নদীর ওপার ঝাপ্‌সা হয়ে এলো—
গুড়গুড়িয়ে মেঘ যে ওঠে ডেকে,
কত দিনের হারিয়ে যাওয়া কথা
পড়ছে মনে মেঘের ঘটা দেখে।

[illegible]আঁধার ভরা ঘরের কোণে একা—
বসে আছি বাহির পানে চেয়ে,
মেঘের মতই গুমরে ওঠে বুক,
বৃষ্টি সম অশ্রু পড়ে বেয়ে।
কিসের ব্যথা বুঝতে নারি আমি,
শুধু শুধু কাঁদছি কেন একা,
[illegible]সব রয়েছে প্রতিদিনের মত
তবু কেমন লাগছে ফাঁকা ফাঁকা!
মুষলধারে বৃষ্টি আসে নেমে,
নিবিড় আঁধার ঘনায় চারিদিকে,
[illegible]আঁধার ঘরে একলা বসে আমি,
আকাশ পানে তাকাই অনিমিখে।

অশথ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
বৃষ্টি ঝরার শব্দ আসে কানে,
গভীর ব্যথায় কাঁদছে কোথায় দুখী—
কান্না যে তার শুনি আমার প্রাণে।
মা-হারা আজ কাঁদছে মায়ের লাগি,
মা কাঁদে তার হারা ছেলের তরে,
পথ-না-জানা সুদূরে ভিনদেশে
কোন্ বিরহীর অশ্রু পড়ে ঝরে।
আজ বুঝি ভাই, শুধুই কাঁদার দিন,
অশ্রুতে আজ জগৎ ভেসে যায়;
নাইক' ব্যথা, নাই ত' কোন দুখ,
বাদ্‌লা দিনে কান্না কেন পায়?

নেতাজী, নমস্কার!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুঁই

[illegible]উন্নত ভালে বহ্নির ছটা, কণ্ঠে আলোর হার,
[illegible]ভারতের জনগণাধিনায়ক, নেতাজী, নমস্কার!
[illegible]সুপ্ত জাতির সুপ্তি ভাঙ্গিতে, দূরিতে আঁধার যত,
[illegible]হে বীর সেনানী, মুক্তি-সাধক, তোমার সাধন-ব্রত।
[illegible]মরা গাঙে তুমি বহালে তুফান, তুলিলে প্রাণের ধ্বনি,
[illegible]অযুত শবের মৃত্যু টুটাতে দানিলে সঞ্জীবনী।
[illegible]ভগীরথ সম গঙ্গা আনিয়া হরিলে ভূভাগ-ভার,
[illegible]সুপ্ত-ভারত-মুক্তিসাধক নেতাজী, নমস্কার!

শৌর্য্য তোমার, বীর্য্য তোমার, ত্যাগ-শীল-দান তব,
ধর্ম্ম তোমার, কর্ম্ম তোমার দেখায়েছে অভিনব।
স্বদেশের গ্লানি বেদনা দিয়েছে, ভেসেছ চোখের জলে,
ভারতের নানা জাতিরে এনেছ তোমার পতাকা-তলে।
ঘুচালে বিভেদ, দিলে প্রাণে আশা, দূরিলে মৃত্যুভয়,
মরণবিজয়ী হে বীর সেনানী, গাহি আজ তব জয়।
তুমি যা করেছ, দিয়েছ যা তুমি, কোথায় তুলনা তার?
ভারতের জনগণাধিনায়ক নেতাজী, নমস্কার!

খোস-খবর

শ্রীসুখেন্দুমোহন দাস

[illegible]রাশিয়াতে ভূগর্ভ-বাস পরীক্ষা—জানা [illegible] যে কয়েকজন রুশ বৈজ্ঞানিক ভূগর্ভের ভিতরে ২০ [illegible] পর্য্যন্ত যেতে সমর্থ হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকগণ আগে [illegible] করতেন, ভূপৃষ্ঠের নীচে নামলে, সূর্য্যতাপের প্রভাব [illegible] হওয়ার পরে প্রতি ৫০।৬০ ফুটে ১° ডিগ্রী ক'রে ক্রমশঃ [illegible] বাড়বে। আবার সেই উত্তাপ খুব বেড়ে যাওয়ার পরে আরও নীচে গেলে, মানুষের উপযোগী ঠাণ্ডা বায়গা পাওয়া যাবে। রুশীয় বিজ্ঞানীরা এখন এই ঠাণ্ডা যায়গায় পৌঁছে সেখানে আদিম গিরিগহ্বরবাসী মানবের চাল-চলনের বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন বলে ঠিক করেছেন।

পদব্রজে মহাভ্রমণ—ইংলণ্ডের বার্ট কোজেন্স নামে একটি লোক সম্প্রতি একাদিক্রমে ৪৮ দিনে ৩০০০

মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন। এই ৪৮ দিনের মধ্যে বার্ট সাহেব মোটে ২৬ ঘণ্টা বিশ্রাম করেছিলেন। এই ক' দিনে তিনি ১০০ গ্যালন চা পান করেছিলেন। ভ্রমণকালের মধ্যে তাঁর ছয় যোড়া জুতো রাস্তায় ক্ষয়ে গিয়েছিল। বার্টের বর্ত্তমান বয়স ৪৭। এঁর পূর্ব্বে পৃথিবীতে আর কোনও লোকের এমন হাঁটার কথা জানা নেই।

বিবাহের জন্য চলন্ত গীর্জ্জা—ডেনমার্কের অন্তর্গত ন্যাস্কফ্ লেল্যাণ্ড দ্বীপে বর-কন্যাদের জন্য চমৎকার সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়েছে। তাদের আর বিবাহের জন্য গীর্জ্জায় দৌড়তে হবে না, বর-কন্যাদের বাড়ীতেই গীর্জ্জা আসবে। কারণ সেখানে একটি চলন্ত গীর্জ্জা বিবাহের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই চলন্ত গীর্জ্জায় পুরোহিত এবং বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত আসবাবপত্র রয়েছে। গীর্জ্জাটি একটি বাসের উপরে নির্ম্মিত।

বিরাট সাংহাই সহর—চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের সাংহাই সহর বাড়াবার জন্য নূতন ... হচ্ছে। পূর্ব্বে সমুদ্রের দিক্‌টা ছেড়ে দিয়ে এর তি... ১৫ মাইল বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এখানে দেড় ... লোক থাকতে পারবে। তা হ'লে পৃথিবীতে এটি ... সবচেয়ে বড় সহর।

পৃথিবীর বয়স—আমাদের এই পৃথিবীর ব... তা নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। ... অল্প দিন পূর্ব্বে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ... বৈজ্ঞানিক এ্যাড্‌লফ্ নপ্ট কসমিক্ ক্লক্ নামে ... নূতন সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী ক'রে তাতে মেপে ঘোষণা ক... যে পৃথিবীর বয়স দু' শ' কোটি বছর। অর্থাৎ ... কোটি বছর আগে আমাদের পৃথিবীর উদ্ভব হ... তিনি এই যন্ত্রের গণনায় ইউরেনিয়াম্ ও থোরিয়াম্ ব... করেছেন ও কি ক'রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা এই যন্ত্র ... হ'তে পারে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

জয় হিন্দ। রামধনুর পক্ষ থেকে তোমাদের শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মুসলমান ভাই-বোনদের এই সুযোগে ঈদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

অন্যবারকার মত এবারেও তোমাদের কাছ থেকে বিজয়ার শুভেচ্ছাবাহী বহু চিঠি এসে আমার টেবিল ভরিয়ে ফেলেছে। ঈদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠিও অনেক পেয়েছি। সবাইকে পৃথক্ ভাবে জবাব দেওয়া সম্ভব নয় তো, তাই রামধনুর ভিতর দিয়েই তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রামধনুর প্রতি তোমাদের স্নেহের নি... এই চিঠিগুলি আমাদের কাছে বড় মূল্যবান্। এক... চিঠির ভাষা একটু বৈচিত্র্যময়। সেটা তুলে দিলাম—

"এই চিঠিটার বস্তু বিষয় নয়কো এমন কিছু,
এই বিজয়ার শুভেচ্ছাটা দিলাম চিঠির পিছু।...

এটির লেখকের নাম শ্রীমান্ তরুণকুমার সান্যাল।

বিজয়ার পর দিনই এবার পড়েছিল মুসলমান... বকরীদ পর্ব্ব। হিন্দুদের বিজয়ার মত এই ঈদেও প্রী... শুভেচ্ছা জানাবার নিয়ম আছে। দেখে ভাল ...

... কোন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা থাকলেও ...তায় ও বাংলার নানা জায়গায় এবার একত্রে ঈদ-...া সম্মেলন হয়েছে। এ রকম একটি সম্মেলনে যাবার ...গ আমাদের হয়েছিল। এর আয়োজন করেছিলেন ...ন রাঁচের প্রগতি-সংঘ। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব ...ছিলেন তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ... কবি মহীউদ্দীন, অভ্যুদয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীন ...র্ত্তী ও তোমাদের সম্পাদক মশাই বিশেষ অতিথি ...বে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের হিন্দু ও মুসলমান ...রা যদি সমস্ত উৎসব-আনন্দে এই রকম যুক্ত সম্মেলনের ...য়োজন করেন তবে তা পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতির ... ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এতদিন যদি তাঁরা ...বিরোধে পাশাপাশি বাস করে আসতে পারেন তবে ... পারবেন না কেন? হঠাৎ-জেগে-ওঠা এই ভেদাভেদ ...ত কৃত্রিম তা বুঝবার এবং বোঝাবার সময় এসেছে।

...এ মাসে তোমাদের ৺সুকুমার রায়ের কথা শোনালাম। ...সাহিত্যে এঁর অপরিসীম দানের তুলনা নেই। অথচ মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৩ই কার্ত্তিক গেছে তাঁর জন্মতিথি। প্রতি বছর ঐ দিনটি তোমরা স্মরণ ক'র।

তোমাদের রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যেরও জন্মতিথি ঐ মাসে—২৭শে কার্ত্তিক। তিনিও অকালে—মাত্র ৩৫ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। শিশুসাহিত্যে তাঁর বিভিন্ন ধরণের রচনা—বিশেষতঃ পদ্মরাগ, ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি, সোনার হরিণের মত অপূর্ব্ব উপন্যাস—এবং নূতন পুরাণ, চায়ের ধোঁয়ার গল্পগুলির মত অনাবিল হাসির গল্প তাঁকে অমর ক'রে রাখবে। রামধনুর পুরোনো পাঠকদের কাছে তার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁর জন্মতিথিটিও তোমরা স্মরণ ক'র। মনোরঞ্জন সম্বন্ধে এখনও তেমন ভাল ক'রে আলোচনা হয় নি। রামধনুতে অদূরভবিষ্যতে তাঁর একটি ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করব।

আবার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম্। —ইতি রাঃ সঃ

ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকালের বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত ...র পর সকলেই আশা করেছিলেন এবারে দেশে ...কার শান্তি ফিরে আসবে। বিশেষতঃ ভারত বিভক্ত ...র—অর্থাৎ পাকিস্থান অর্জ্জনের পর অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক ...শান্তিটা থামবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ...টার পর একটা নতুন ব্যাপার নিয়ে গোলমাল ...গেই আছে। সম্প্রতি দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ...ন্টা কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দেবে তাই নিয়ে চলেছে ...ভ্রাট।

* * *

কাশ্মীরের ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সব চেয়ে ...ালো। কাশ্মীরের রাজা হচ্ছেন হিন্দু, কিন্তু প্রজারা বেশীর ভাগই মুসলমান। আবার মুসলমান হ'লেও তাঁদের অনেকেই মুসলিম লীগ্‌পন্থী ন'ন। তাঁদের সর্ব্বপ্রধান নেতা শেখ আবদুল্লা হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী।

মুসলমানপ্রধান রাজ্য বলে পাকিস্থান আশা করেছিল কাশ্মীর তাদের রাষ্ট্রেই যোগ দেবে। কিন্তু কাশ্মীর প্রথমটা কোন পক্ষেই যোগ দেয় নি। এর পরই দেখা দেয় এক অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে হাজার হাজার বিদেশী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে বসে। এদের মধ্যে কিছু ছিল সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি, বাকি সবাই আধুনিক যুদ্ধপ্রণালীতে সুশিক্ষিত মুসলিম সৈনিক। শুধু সুশিক্ষিত নয়, শত শত মোটর লরী, কামান, বন্দুক, মেশিন গান,

বেতার যন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জামে সজ্জিত তারা। এই বিপুল বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে হত্যা, অত্যাচার এবং লুঠতরাজে রাজ্যশুদ্ধ লোককে ভয়ত্রস্ত ক'রে তোলে। সমস্ত কাশ্মীর রাজ্য এদের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়ার যোগাড় হয়। বেগতিক দেখে কাশ্মীর-রাজ তাড়াতাড়ি ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগ দিয়ে তাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ভারত সরকার এই সর্ত্তে রাজী হ'ন যে কাশ্মীরের শাসন ভার আপাততঃ প্রজাদের প্রতিনিধি শেখ আবদুল্লার দলের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এবং রাজ্য শত্রুমুক্ত হ'লে গণভোট নিয়ে ঠিক করতে হবে দেশের জনসাধারণ কোন্ রাষ্ট্রে যাবার পক্ষপাতী। এই সর্ত্তই মেনে নেওয়া হয়েছে। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রে দেশরক্ষায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কাশ্মীরের হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে বিদেশীর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য জীবন পণ ক'রে দাঁড়িয়েছেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও বিমানযোগে কাশ্মীরে গিয়ে আক্রমণকারীদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ এখনও চলছে কিন্তু তা আক্রমণকারীদের প্রতিকূলে। ভারতীয় সৈন্যেরা তাদের ক্রমাগত হটিয়ে নিয়ে চলেছে এবং বহু আততায়ী ধ্বংস হয়েছে। মনে হয়, কাশ্মীর শীঘ্রই শত্রুমুক্ত হ'তে পারবে। এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান অংশ নিয়েছেন কয়েকজন বাঙ্গালী সেনানায়ক। তাঁরা যে বীরত্বের ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

* * *

এদিকে জুনাগড়ের গোলমালের কথা তো আগেই শুনেছ। জুনাগড়ের নবাব করাচী চলে গেছেন। শ্যামলদাস গান্ধীর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রজাসাধারণের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করছে। জুনাগড়ের দেওয়ান আপাততঃ ভারত সরকারকেই রাজ্যের শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন। পাকিস্থান অবশ্য তা এখনও অনুমোদন করে নি।

* * *

ইংলণ্ডের রাজকন্যা (যিনি ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধীশ্বরী হবেন) এলিজাবেথের বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লণ্ডন সহরে মহা সমারো[illegible] বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বর হচ্ছেন ভারতের [illegible] জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিলিপ্ [illegible] ব্যাটেন। নানা দেশ থেকে রাজপ্রতিনিধিরা এই [illegible] অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য লণ্ডন যাচ্ছেন। লর্ড [illegible] ব্যাটেনও গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার [illegible] শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের [illegible] জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন এবং বাংলার গভর্ণর হা[illegible] শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র (স্যর্ বি. এল্. মিত্র)।

* * *

ভারতবর্ষ থেকে বাছাই করা একদল খেলো[illegible] অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলতে গেছেন সে খবর তো[illegible] আগেই পেয়েছ। সেখানে ভারতীয় দল পর পর ক[illegible] ম্যাচ খেলেছেন। প্রথম খেলা দু'টি অমীমাংসিত [illegible] শেষ হয়েছে। অবশ্য ২য় খেলাটিতে ভারতীয় দল, [illegible] জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, প্রায় নিশ্চিত জয় থেকে ব[illegible] হয়েছেন। কিন্তু তারপর নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌এর [illegible] তাঁরা বিশ্রী ভাবে এক ইনিংস্‌ও ৪৮ রানে হেরে গে[illegible] অবশ্য এই পরাজয় সম্বন্ধে একটা কথা এই বলা যা[illegible] দলের অধিনায়ক অমরনাথ খেলা সুরু হবার পর [illegible] হওয়ায় আর কোন ইনিংস্‌এই খেলতে পারেন নি, ভা[illegible] দলকে দুই ইনিংস্‌এই একজন লোক কম নিয়ে খে[illegible] হয়েছে।

যে ক'টি খেলা হয়েছে তার মধ্যে অমরনাথ প্রত্যে[illegible] খেলায় আশ্চর্য্য বাহাদুরী দেখিয়েছেন। তিনি এ[illegible] প্রত্যেকটি ইনিংস্‌এই শতাধিক রান্ করেছেন, এক[illegible] রান্ করেন দু' শ'রও ওপর। এ ছাড়া হাজা[illegible] এবং মানকড়ও বেশ ভাল খেলছেন। কিন্তু এঁ[illegible] ছাড়া দলের আর কেউ এখন পর্য্যন্ত তেমন বিশেষ কৃ[illegible] দেখাতে পারেন নি। ভারতীয়দের বোলিং বা ফি[illegible] কোনটাই তেমন যুৎসই হচ্ছে না। দেখা যাক প্র[illegible] টেষ্টে কি হয়!

* * *

এ বছর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশ্ববিখ্যাত নো[illegible] পুরস্কার পেয়েছেন তিন জন। এঁদের মধ্যে দু[illegible] হচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী—ডাঃ কার্ল এবং ডাঃ গার্টি কো[illegible]

দু' জনেই ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। [illegible] ব্যক্তির নাম ডাঃ বার্ণার্ডো হোসে। ইনি থাকেন [illegible] আয়ারস্।

[illegible]কোরি দম্পতি হচ্ছেন তৃতীয় দম্পতি যাঁরা একত্রে [illegible]বেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে অধ্যাপক পিয়ারি ও তাঁর স্ত্রী ম্যাডাম কুরি একবার একত্রে নোবেল [illegible]র পান। তার পর তাঁদেরই মেয়ে জুলিয়ান কুরি [illegible] তাঁর স্বামী একত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। [illegible] কার্ল ও ডাঃ গার্টি দু' জনেই একবয়সী—দু' জনেরই বর্ত্তমানে ৫০ বছর, ডাঃ গার্টি সামান্য কয়েক মাসের [illegible]। ১৯২০ সনে তাঁরা যখন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন [illegible] তাঁদের বিয়ে হয়।

সাহিত্যের জন্য এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে গাইদ। এঁর বয়স বর্ত্তমানে ৭৮ বছর।

* * *

অবশেষে ২৮শে কার্ত্তিক এ বছরের আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে। মোহনবাগান ইষ্ট বেঙ্গলকে ১—০ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। ৩৬ বছর পরে মোহনবাগান আবার এই সম্মান লাভ করল। এর আগে সেই ১৯১১ সনে (ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম) মোহনবাগান আর একবার এই সম্মান লাভ করে। অবশ্য ইতিমধ্যে তারা আরও তিন বার ফাইনালে উঠেছিল।

যে বই তোমরা পড়তে পার

বহুরূপী (গল্প)—সুকুমার রায়, রাজকাহিনী—[illegible]ন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগবানের চাবুক (ঐতিহাসিক [illegible])—হেমেন্দ্রকুমার রায়, হাস্য ও রহস্য (গল্প)—[illegible]রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহরলাল (জীবনী)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ [illegible]পাধ্যায়, ছোটদের সোভিয়েট—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্‌স্ (উপন্যাস—অনুবাদ)—শ্রীঅমলেন্দু সেন, মরেও যারা রইল বেঁচে (জীবনী)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যাদের গায়ে জোর আছে (শরীরচর্চ্চা)—উমেশ মল্লিক, এসিয়ার ছেলেমেয়ে—ভীমাপদ ঘোষ।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি হরিশ বাঁড়ুয্যের প্রথম [illegible] স্ত্রী—ননীবালার বড় সতীন। নাম শুনেই বোঝা [illegible]চ্ছ হরিশ বাঁড়ুয্যে কুলীন বামুন—এবং সে যুগে কুলীনরা [illegible]ধিক বিয়ে করতেন।

উত্তরদাতাদের নামঃ—মঞ্জুশ্রী, বাপ্পা, লব, [illegible], রামু, প্রসূন (ভবানীপুর); শেফালি নাগ (ঢাকা); [illegible]লকুমার মিত্র (গৌহাটী); অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি [illegible]বোন (গৌহাটী); দীপ্তি সেনগুপ্তা (গৌহাটী); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); মালবিকা দত্ত, সিপ্রা, অরুণ, মতি, দিলীপ, মিত্রা প্রভৃতি (করিমগঞ্জ); শিশিরকুমার নাগ (কলিকাতা); যূথিকা সেনগুপ্ত (কলিকাতা); শেষপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, সমর, তেঁতুল, টুনু, মরাল, হর্ষ (জলপাইগুড়ি); বিষ্ণুপদ রায়, শিশুমঙ্গল সমিতি (বালিঘাই); গোরাচাঁদ গুপ্ত ও বৌদি (গিরিডি); অজিত, দিলু ও রাধাবিনোদ (গড় রাইপুর); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); মলয়কুমার গাঙ্গুলি (যোড়হাট)।

নূতন ধাঁধা

শব্দ তৈরীঃ

(ক) 'হাতের' সাহায্যে তৈরী কর :—

(১) ভৃত্য (২) ব্যাকরণ (৩) চাঁদ (৪) কোন একটা (৫) কোন একটা পোকা।

(খ) 'পায়ের' সাহায্যে তৈরী কর :—

(১) গানের সুর (২) হিংস্র জন্তু (৩) নামের অংশ (৪) সম্মান-চিহ্ন (৫) অবাঞ্ছিত লোক।

বুক কাঁপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। নৌ
বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে
হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের
সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল
প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর

মুখস যখন খুলে গেল
তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাঠের ড্রাগন
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

হত্যা যাদের নেশা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র **সীমান্তের বন্ধু** (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গদ্যের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জী
দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের
স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ॥৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সম্ভা

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

সুসংবাদ

শীঘ্রই দেখা দিবে

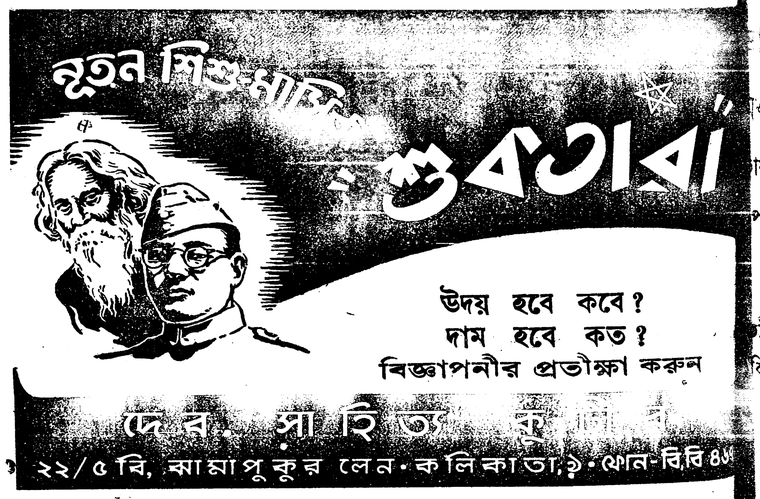

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ

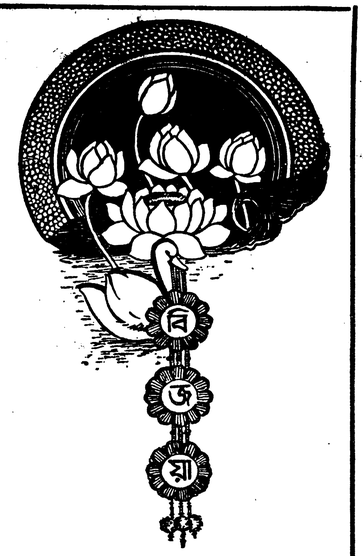

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

ঘরে বসে অল্পায়াসে হিন্দী

শিখবার জন্য

যার **প্রথম সোপান** ৸০

ক (হিন্দী) **অনুবাদ-শিক্ষা** ।৵০

ষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক

পক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত

ট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

অল্প মূল্যে পুরাতন ব্লক্

আমাদের নিকট নানা ধরণের ছোট-বড় হাফ্‌টোন ব্লক্ (কপার ও জিঙ্ক) সস্তায় বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। ক্যালেণ্ডার ছাপিবার উপযোগী নানাবিধ ব্লক্‌ও পাওয়া যায়। অর্ডার দিলে পছন্দ মত ব্লক্ ছাপাইয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :—

পি. চ্যাটার্জ্জি

C/o রামধনু কার্য্যালয়, ১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা ২৫

Regd. No. C.—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন:- কলি: - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

Regd. No. C.—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। ভেজাল বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন:-কলিঃ - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি.

INTENTIONAL
DUPLICATE EXP(

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ...	১॥০
সোনার হরিণ (ঐ) ...	১॥০
চায়ের ধোঁয়া (গল্প) ...	৸০
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ...	৸৵০
নূতন পুরাণ (ঐ) ...	৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ...	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত

দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স	॥৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ...	৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ...	১॥০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ...	১।০
বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ) ...	১৲
আবিষ্কারের গল্প ...	৸০
ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ...	৸০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ...	৸৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ...	৸০
মহভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ...	৸০
ঐ ২য় ...	৸০

ভট্টাচার্য গুপ্ত এণ্ড কোংলিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

...ন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট ...া, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা ...ত্ত। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

...টি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। ...টির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। ...শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

বালক কেশব

...পুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-...রের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ॥৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যাস। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িতে বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীদের হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।

—আনন্দবাজার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ **কৈশোরক** বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যিক দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা' ও বিশ্বগুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খানা উপন্যাস চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

বুক কাঁপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম ১।০

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বস্যাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল
প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর

মুখস যখন খুলে গেল
তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাঠের ড্রাগন
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

হত্যা যাদের নেশা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র

সীমান্তের বন্ধু (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার গল্প)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গল্পের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ॥৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

সুসংবাদ

শীঘ্রই দেখা দিবে

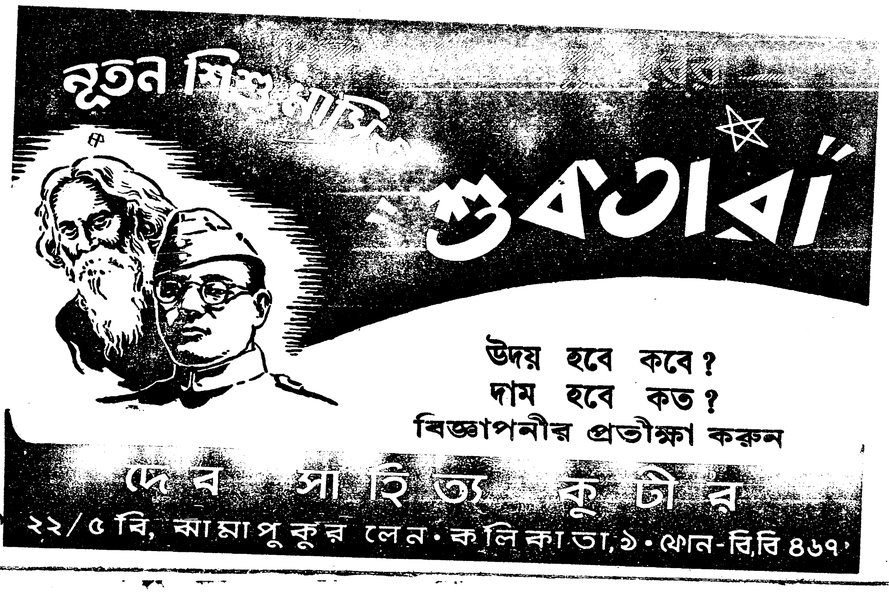

মায়ের কোলে যীশু

"তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করছে অখৃষ্টান,
ভগবানের ভক্ত ছেলে, ঋষির ঋষি, খৃষ্ট মহাপ্রাণ!

* * *

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থহীন।
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি—আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান।"

—সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৫৪ | ৯ম সংখ্যা

প্রণাম

শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, এম্.এ, বি. এল্

দেশকে ভালবাস, দশকে ভালবাস,
পরকে কর ভাই আপনার,
রাজ্য বিনিময়ে এ সুখ নাহি মিলে,
দুঃখে ফেল যদি আঁখিধার।
পায় নি খেতে যা'রা তাদের খেতে দাও,
হাসে নি যারা, দাও হাসিতে,
বোঝে নি যা'রা যাহা বুঝিতে তাহা দাও,
ভালকে দাও ভালবাসিতে।
সাগর পর্ব্বতে ঘেরা যে শ্যাম ভূমি
তাহারে দেশ বলি জানিও,
সকল শির টানি' তাহারই ধূলি 'পরে
জননী বলি' নমি' মানিও।
মাথার 'পরে তব ওই সে নীলাকাশ
কত না অতীতের কাহিনী
হেরেছে, ধ্বনি তা'র বহিছে নিরবধি
তটিনী পারাবার বাহিনী!
ধন্য দেহ তব এ ভূমি পরশিছে,
ধন্য প্রাণ তব জনমি'
এ পূত ধূলি 'পরে, মুক্ত জননীরে
যুক্ত কোটি করে প্রণমি।

দুই

অশোক লাহিড়ীর ডায়েরী

আমাদের গাড়ি জঙলা গ্রামে এসে থামল। গাড়োয়ান আর সহযাত্রীরা চারি পাশের অন্ধকারে কি যেন দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। মনে হ'ল যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু ওদিকে হচ্ছে কিংবা হবে। আমি এ পাশ ও পাশ তাকিয়ে খোঁজ করছি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কোনও গাড়ি এসেছে কিনা। হঠাৎ গাড়োয়ানের একটা কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। শুনলাম গাড়োয়ান অন্যান্য যাত্রীদের ফিস ফিস্ করে বলছে—"এক ঘণ্টা আগেই এসে পৌছেছি।"

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—"কোনও গাড়ীই তো দেখা যাচ্ছে না! আপনাকে আজ বোধ হয় কেউ নিতে আসবে না। আপনি আজ আমাদের সঙ্গে শম্ভুদলে চলুন। তার পর কাল কিংবা পরশু,—পরশু হ'লেই ভাল, আমাদের সঙ্গেই আবার ফিরবেন।"

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াগুলো হঠাৎ চীৎকার করে উঠে মাটিতে সজোরে পা ঠুকতে লাগলো। পরমুহূর্ত্তেই ঝড়ের মত বেগে একটা দু' ঘোড়ার গাড়ি আমাদের গাড়ির পাশে এসে থামল। ওই গাড়ির গাড়োয়ানটি বেশ লম্বা, এক গাল সাদা দাড়ি, পাগড়ি—সামনের দিকে টানা থাকায় তাকে স্পষ্ট যায় না। তার চোখ দু'টো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। আমাদের গাড়োয়ানকে বল্‌ল—"আজ দেখছি তুমি তাড়াতাড়ি এসেছ!"

আমাদের গাড়োয়ানটির ভয়ে গলা কেঁপে কোনও রকমে বললে—"বাঙালী বাবুর বড় তাড়া ছিল, তাই—"

সেই অপরিচিত গাড়োয়ানের থমথমে গলা গেল—"তাই তুমি বুঝি ওঁকে শম্ভুদলে যাবার পীড়াপীড়ি করছিলে? আমাকে ঠকাতে পারবে বন্ধু! আমি সব জানি। আর জেনে রেখ—আ ঘোড়াও বাতাসের মত ছুটতে পারে।" বলতে ব গাড়োয়ান হেসে উঠল, গাড়ির স্বল্পালোকিত আলো তার শ্মশ্রুবহুল কুটিল মুখের উপর পড়ল। রক্ত-রাঙা ঠোঁট, আর হাতীর দাঁতের মত সাদা দেখে আমি কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

ার পর হঠাৎ সেই গাড়োয়ানটি ছোঁ মেরে আমার পত্তর তার গাড়িতে তুলে ফেলল। আমিও তার ত উঠবার জন্য তৈরী হলাম। সে তার বজ্রকঠিন আমাকে টেনে তুলল। কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা সেই বুঝতে পারলাম, গাড়োয়ান বয়সে বুড়ো হ'তে কিন্তু শক্তিতে সে আমার মত পাঁচ সাতটাকে দুমড়ে মেরে ফেলতে পারে। একটি কথাও না এ গাড়ির গাড়োয়ান তার লাগাম তুলে ধরল, ও সামনে ছুটতে সুরু করল। একবার পিছন ফিরে াম। সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম, আগের সহযাত্রীরা আমার গাড়ির দিকে তাকিয়ে আঙুল কপালে ছোঁয়াল; তার পর গাড়োয়ান ঘুরিয়ে তার গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। তাদের গাড়ি রে মিলিয়ে গেলে পর অস্বস্তিতে আর ভয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেমন যেন এক নিবিড় নকে ঘিরে ধরল—পৃথিবীতে যেন আর আমাকে কেউ দিতে নেই! পৃথিবীতে যেন আর আমার কোনও ান্ধব নেই!

আমাদের গাড়ি খুব জোরে সোজা ছুটছে, হঠাৎ একটা সোজা রাস্তায় মোড় ফিরে ছুটতে সুরু করল। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমার হঠাৎ মনে হ'ল আমরা একই রাস্তা দিয়ে এতক্ষণ বার বার ছুটোছুটি ছি। ভাবলাম, একবার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করি, পথে বার বার ছুটোছুটি করে মিথ্যে দেরী করার কি! কিন্তু জানি—এ প্রশ্নের কোনও উত্তরই সে া। ক'টা বেজেছে দেখার জন্য একটা দেশলাই হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে ম—রাত বারোটা বাজতে আর কয়েক মিনিট মাত্র আছে। মনে পড়ে গেল ষ্টেশন মাষ্টারের কথা: বারোটার পর আজ সমস্ত শয়তান জেগে উঠবে। চুপ করে সেই বিভীষিকার প্রতীক্ষা করতে াম।

ঠাৎ দূরে একটা ভীত কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। র আর একটা!—একের পর এক অনেক কুকুরের চীৎকার ভেসে আসতে লাগলো। বুনে, পাহাড়ে, সের অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসও যেন শুনতে পেলাম। ঘোড়া-গুলোও কেমন যেন ভয় পেয়ে উঠলো, কিন্তু গাড়োয়ানের মিষ্টি কথায় তারা কতকটা শান্ত হ'লো। কিন্তু ভয়ে তারা তখনও কাঁপছিল। হঠাৎ আমাদের চারিপাশের পাহাড়ে জঙ্গলে নেকড়ের তীক্ষ্ণ গর্জ্জন শোনা গেল—আমি আর ঘোড়া দু'টো ঠিক একই রকম ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমার ইচ্ছা করছিল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বন-পাহাড় ভেদ করে ছুটে পালাই। ঘোড়া দু'টো হঠাৎ লাফালাফি সুরু করে দিল। গাড়োয়ান অনেক চেষ্টা করে ঘোড়া দু'টোকে সংযত করলো। এবার আমাদের গাড়ি ছুটে চললো একটা সরু রাস্তা দিয়ে, এত সরু যে দু'ধারের গাছগুলো আমাদের গায়ের উপর এসে পড়তে লাগলো। আমরা যেন এক গাছপালার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি! বাতাসের বিক্ষুব্ধ গর্জ্জন সেখানেও ভেসে আসছে, গাছপালাগুলো জোর বাতাসে আছড়ে আছড়ে গাড়িতে পড়ছে। অন্ধকারে আশেপাশে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু দেখলাম গাড়োয়ান নির্ব্বিকার চিত্তে তার কাজ করে যাচ্ছে।

বাঁদিকে দূরের বনে সহসা একটা নীল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে পড়ে সেই আলোর দিকে ছুটে গেল। আমি কি করবো বুঝতে পারলাম না, এদিকে নেকড়ের গর্জ্জনও ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। আমি কিছু স্থির করবার আগেই দেখলাম গাড়োয়ান ফিরে এসে একটিও কথা না বলে আবার গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। আমার মনে হ'তে লাগলো, এ যেন কোন এক দুঃস্বপ্ন—কারণ আমি ঠিক একই রকম ঘটনা বার বার হ'তে দেখলাম। একবার গাড়োয়ান আলোর খোঁজে অনেক দূরে চলে গেছল। সেই সময় ঘোড়াগুলো ভয়ানক ডাক ছাড়তে আর লাফালাফি করতে লাগলো। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে পড়া মাত্র আমি দেখলাম আমাদের গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে একপাল নেকড়ে, সাদা ঝকঝকে দাঁত আর রক্তলোলুপ জিভ বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নেকড়ের এই নীরব প্রতীক্ষা তাদের গর্জ্জনের থেকে আরও ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগলো। মৃত্যুর সামনা সামনি এসে আমি ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছলাম।

হঠাৎ নেকড়েগুলো গর্জ্জন করে উঠলো, ঘোড়াগুলোও পিছু হটবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি গাড়ির দরজা পিটিয়ে আর চীৎকার করে গাড়োয়ানকে ডাকতে লাগলাম। গাড়োয়ান যে কোথা দিয়ে কি করে এলো জানি না। তার গলা শুনে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে সে তার বিশাল দুই হাত দিয়ে নেকড়েদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে-গুলো পিছু হটতে স্থরু করলো।

তারপর তাকে দেখলাম গাড়িতে উঠতে। এই ব্যাপারটা এমন আকস্মিক আর এত ভূতুড়ে বলে আমার মনে হলো যে গাড়োয়ানটিকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেই সাহস হ'লো না। সময় যেন আর কাটতে চায় না, পাহাড়ী বন্ধুর পথে গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তীর-বেগে ছুটে যাওয়া, গাছের শাখায় শাখায় বাতাসের গোঙানি, দূরে ভীত কুকুরের আর্ত্তনাদ, চারিপাশে রক্তলোলুপ নেকড়ের হুঙ্কার আর আকাশে মেঘ ও চাঁদে লুকোচুরি···

হঠাৎ যেন মনে হ'লো গাড়োয়ান লাগাম টেনে ধরেছে। চেয়ে দেখলাম গাড়ি থেমেছে এক অতি পুরানো ভাঙা দুর্গের মত বাড়ির চত্বরে। ওই দুর্গের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানলা থেকে কিন্তু একটুও আলো আসছিল না। প্রকাণ্ড অন্ধকার বাড়িটাকে জ্যোৎস্না-ঝলমল নীল আকাশের নীচে এক মরা পাহাড়ের মত মনে হচ্ছিল।

আমি নিশ্চয়ই গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নয় ত' এত বিশাল দুর্গের মত বাড়ি দূর থেকে আমার নজরে পড়তো। রাতের সেই অন্ধকারের মধ্যেও চত্বরটাকে প্রকাণ্ড বলে মনে হচ্ছিল, চারিপাশের খিলান-দেওয়া বারান্দা যেন এর বিশালতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ান আমার হাত ধরে নামিয়ে দিল। এবারও তার শক্ত হাত আর অসী... লক্ষ্য না করে থাকতে পারলাম না। তার হাত... একটা ইস্পাতের সাঁড়াশি, ইচ্ছা করলেই ... হাতটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আমার ... পত্তরগুলো আমার পাশে নামিয়ে রেখে সে গাড়ি... অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি এক বিশাল লোহার দরজার সামনে ... আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। কি করব, কি... বাড়ির মালিককে ডাকব, ভেবে পেলাম না। ... একটা ঘণ্টা নেই, একটা লোহার কড়া নেই। ... যেন আর কাটতে চায় না। সেই অন্ধকার চত্বরে দাঁ... সমস্ত শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল। আমি এ কোন ... দেশে এসে পড়লাম! এরা কি রকম লোক? ... আমি কি বিপদে পড়ব? যারা পরের উপকার ... আসে, তারাই কি এ ধরণের বিপদে পড়ে? ... বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। বাড়িতে রয়েছে ... ছেলে—অলক···তাকে কে দেখবে তবে?

হঠাৎ যেন দরজার পিছনে ভারি পায়ের শব্দ ... পেলাম। লোহার শিকল, হুড়কো আর তালা ... শব্দও শোনা গেল। দরজাটা মনে হয় অনেক দিন ... হয় নি, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে প্রকাণ্ড দরজাটা একটু ... খুলে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক লম্বা বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ... পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁর অদ্ভুত চোখের দীপ্ত ... প্রথমেই চোখে পড়ে। কালো কাপড় আর জামায় তাঁ... কেমন যেন দেখাচ্ছিল! তাঁর হাতে নবাবী আম... রূপোর বাতিদান, তা'তে কোনও চিমনি নেই, আ... শিখা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি তাঁর ... হাত বাড়িয়ে আমাকে ভিতরে আসতে অনুরোধ ... বললেন—"স্বাগতম্। কোন সঙ্কোচ করবেন না। নি... বাড়ীর মত মনে ক'রে চলে আসুন।

(ক্রমশ)

মানস সরোবরে এক রাত্রি

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

...ন্ হেডিন্ বিখ্যাত সুইডিশ পর্যটক। ১৯০৬-৮ ...রহস্যময় তিব্বত দেশ ঘুরে তিনি অনেক নতুন ...ার করে গেছেন। মানস সরোবরের উপর নৌকো- ... তিনিই করেছিলেন প্রথম। এ হ্রদ সম্বন্ধে প্রচুর ... তিনি পরবর্তী ভ্রমণকারীদের জন্য রেখে গেছেন। ...দের কাছে মানস সরোবর অতি পবিত্র। তার ... নৌকো চালান তারা অতি গর্হিত কাজ বলে ...রত। কোন অবিশ্বাসী লোক এই পবিত্র হ্রদের ... নৌকো ভাসালে হ্রদের দেবতা তাকে ডুবিয়ে ...ন এই ছিল তাদের ধারণা। একদিন রাত্রে ... বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে হেডিন হ্রদে ভেসে পড়েন। ... রাত্রে রহস্যময় হ্রদের ওপর তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী ...কর। হেডিন নিজে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন ... সম্ভব সে ভাবেই রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের সে ...া উপহার দেওয়া হচ্ছে। এ কাহিনীতে তাঁর ...দের মধ্যে পাঁচ জনের নাম পাওয়া যাবে। তারা ... রবার্ট, সুক্কুর আলি, রহিম আলি, রব্‌সং আর ...।

* * *

...বার্ট, রবসং এবং দু'জন তিব্বতী আমাদের সঙ্গে ... ঘোড়ার পিঠে তকৃচেন উপত্যকার মধ্য দিয়ে ... দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরলুম। ক্রমে আমাদের ...ম জেগে উঠল নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল পবিত্র ... সরোবর। কি সুন্দর, কি অপূর্ব!' দেখবামাত্র সমস্ত শরীর আর মন যেন জুড়িয়ে গেল। আমার দ্রুত নিশ্বাস আবার সহজ ও সরল হয়ে উঠল; মনে হ'ল জীবনে সব চেয়ে আনন্দ আমি আজ পেলুম। ইচ্ছে হ'ল এখুনি ঐ নীল জলরাশির ওপর ঘুরে বেড়াই। মানস সরোবর হচ্ছে পৃথিবীর পবিত্রতম এবং প্রসিদ্ধতম হ্রদ। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর কাছে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর নেই। কত পুরোনো কবিতা আর গানে যে এর গুণের কথা বলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একজন হিন্দুর মৃত্যুর পর তার দেহের চিতাভস্ম গঙ্গায় পড়লে যে রকম পুণ্য হবার কথা মানস সরোবরের ভেতর নিহিত হ'লে তার চেয়ে ঢের বেশী পুণ্য হবার সম্ভাবনা।

এখানে আসবার আগে আমি যখন ভারতে অপেক্ষা করছিলুম তখন বহু ধার্মিক হিন্দু আমায় জানিয়েছিলেন যে আমি যদি পবিত্র মানস সরোবর সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারি, যদি আমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান পুণ্য কৈলাস-গিরি সম্বন্ধে তাঁদের নতুন কিছু জানাতে পারি তা হ'লে ভগবানের কাছে প্রার্থনার সময় তাঁরা আমার নাম স্মরণ করতে ভুলবেন না। তাঁদের সদিচ্ছার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এখানে পুণ্য করতে আসি নি। আমি এসেছি বিজ্ঞানীর মন নিয়ে। আমি সরোবরের গভীরতা মাপতে চাই। আমি চাই জানতে কোথা থেকে এই হ্রদ এত জল পাচ্ছে। পাশের হ্রদ রাক্ষসতালের সঙ্গে মানস সরোবরের সম্বন্ধ কি সেটা আমি সঠিক ভাবে নির্ণয়

করতে চাই। তা ছাড়া আমি অবশ্য হ্রদের পাশে অবস্থিত লামাদের মঠগুলিরও খোঁজ নেব।

তিব্বতী এবং হিন্দুর ধর্মের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু দু'জনের কাছেই মানস সরোবর অতি পবিত্র। মনে হয় এর কারণ মানসের অপূর্ব ও অপার্থিব সৌন্দর্য। দূর থেকে এ সরোবরের রূপ দেখে আমার নিজের চোখে জল এসেছে, আমার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে। মানস সরোবরের পার্শ্ববর্তী উপত্যকার সৌন্দর্য আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও পাই নি। হ্রদটি ডিম্বাকৃতি। উত্তরে এর বিস্তৃতি কিছু বেশী। চওড়ায় মোটামুটি সাড়ে পনের মাইল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এক বিরাট নীলকান্ত মণিকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যে খুদে বসান হয়েছে। উত্তরে কৈলাস আর দক্ষিণে গুর্‌লা মন্দত্ত। মধ্যে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে তাদের চিরতুষারময় উজ্জ্বল চূড়ো দু'টি। সাপের চোখের মোহ যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে মানস সরোবর ঠিক তেমনি করে আমায় টান্‌ছে; তার বুকের কম্পন না দেখে, তার ঢেউএর গর্জন না শুনে কিছুতেই সরে যেতে পারি না।

অবাক্ হয়ে আমরা মানস সরোবরের সৌন্দর্যসুধা পান করতে লাগলুম। কোথা দিয়ে একঘণ্টা সময় কেটে গেল জানতেও পারলুম না। মানসের বুকের ওপর মৃদু কম্পন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দূর থেকে মনে হচ্ছে মাঝখানটা সম্পূর্ণ স্থির। জলের ওপর কে খানিকটা তেল ছড়িয়ে রেখেছে যেন! তিব্বতীরা আমাকে বল্‌ল ঝড় না উঠলে হ্রদের মাঝখানটা ঠিক ঐ রকম শান্তই থাকে।

পথ প্রদর্শকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্রদের ওপর নৌকোয় করে বেড়ালে কেমন হয়? মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে তারা উত্তর দিল যে তা হ'লে মৃত্যু অনিবার্য। মানস সরোবর দেবতাদের বাসস্থান। যে মানুষের স্পর্দ্ধা এত বেড়ে উঠেছে যে সে দেবতাদের বাসস্থলের খোঁজ নিতে চায় সে মরবে। তারা আরও বল্‌ল যে চার পাশ থেকে দেখা না গেলেও হ্রদের মাঝখানে নাকি দেব-মন্দিরের এক বিরাট স্বচ্ছ গম্বুজ আছে। কোন

নৌকো তার কাছ দিয়ে যেতে পারে না।
তৎক্ষণাৎ নৌকো উলটে যাত্রীরা মারা পড়বে।

আমরা দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড় বেয়ে সে
স্বর্ণ উপত্যকায় পৌছলুম। এখানে পেলুম লামাদে
সেরলুং গুম্ফা। মঠের চারধারে ঘুরে বেড়িয়ে
আবশ্যক মত তথ্য সংগ্রহ করলুম আর ছবি এঁকে
ত্রিশ জন লামা এখানে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অ
কাজে বেরিয়েছেন। মানসের চারদিকে যে অতি
আটটি মঠ আছে সেরলুং গুম্ফা তাদের অন্যতম।
পরিক্রমায় এসে যাত্রীরা এখানে একবার ঘুরে
তাদের বিশ্বাস এ পুণ্যস্থান দর্শন করলে পুনর্জন্ম হ
পাপের ভার যাবে কমে আর মৃত্যুর পর দেব
পায়ের কাছে বসে তারা স্বর্ণপাত্র থেকে "ৎসম্বা"*
পাবে।

আমাদের ২১২ নম্বরের তাঁবু পড়েছিল
উপত্যকার দক্ষিণে, একেবারে জলের ধারে। তী
খুব সঙ্কীর্ণ; দূরে ছ'টি গিরিমালা কে যেন প
সাজিয়ে রেখেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ স্থানের
পনের হাজার ফুটেরও বেশী।

২৭শে জুলাই, ১৯০৭। রাত্রে সুনিদ্রার পর
দিনটা কাটালুম হ্রদ পাড়ি দেবার নানা বন্দোবস্ত
আমার মতলব ছিল হ্রদের দক্ষিণ দিকে যাবার।
বেলা অনুকূল আবহাওয়ার প্রতীক্ষা করলুম, কিন্তু
না। রাত্রে বাতাস কমে আসে। তাই স্থির ক
রাত্রেই যাত্রা আরম্ভ করব। তীরের কাছাকাছি
হ্রদের গভীরতা পেলুম ১৩০ ফুট। সে দিক্ থেকে
ফুট চওড়া পথের একটা প্ল্যান আমি কাগজে
নিলুম। আমার অনুচরদের সকলে ভয়ে স্তব্ধ।
ভাবছিল আমরা আর ফিরব না। সুক্কুর আলি
যা আছে হবে ব'লে আমার সঙ্গী হতে রাজী
রহিম আলির মনে কিন্তু খুব ভয়। দিনের বেলা
হ'ত। অন্ধকার নির্জন রাতে এই রহস্যময় হ্রদের
সে শেষ পর্যন্ত ইতস্ততঃ কর্‌ছিল।

সন্ধ্যে হ'ল। সূর্য ডুবে যাবার পর হাওয়া

* তিব্বতীদের প্রিয় খাদ্য।

দক্ষিণ পশ্চিমের আকাশ মেঘে কালো হয়ে উঠল।
সময় আমি চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম দুর্ভেদ্য অন্ধকার।
শে একটাও তারা দেখা যাচ্ছিল না। হ্রদ, তীরভূমি,
ময় গিরিশৃঙ্গ সব রাত্রির কালো চাদরের তলায়
য় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল! ঘণ্টা খানেক পর হাওয়ার
কিন্তু কমে এল। ঢেউগুলোর আওয়াজের ভেতর
একটা মৃদুভাব খুঁজে পেলুম। তাঁবুর পাশে
জ্বালান হ'ল; তার ধোঁয়া উঠ্‌ল সোজাসুজি
শ লক্ষ্য করে।

আমাদের যাত্রার সময় হয়ে এসেছে। ক্যান্‌ভাসের
হ্রদে নামান' হ'ল। মাস্তুল ঠিক আছে কিনা
নিয়ে দু'দিনের উপযোগী রসদ সঙ্গে করে আমরা
য় উঠলুম। আমি গায়ে দিলুম চামড়ার জামা,
পরলুম কাশ্মীরী বুট, মাথায় চাপালুম ভারতীয়
চেয়ার পেতে নৌকোর একধারে বসলুম। আমার
রইল জল মাপবার সরঞ্জাম, কারেণ্ট-মিটার,
স, ঘড়ি, নোট-বই আর মানচিত্র। কাগজের তৈরী
একটা চীনে লণ্ঠন জ্বালান হ'ল। দরকার মত
লে চাপা দিয়ে তার আলো ঢেকে ফেলা যাবে।
মাপবার পর হাত মোছবার জন্যেও তোয়ালের
ক আছে। নৌকোর সামনের দিকে বসল রহিম
, পেছনের দিকে সুক্কুর আলি।

সেরিং সন্দেহের সঙ্গে আমাদের এই অসমসাহসিক
দেখছিল। সে বল্‌ল মানস সরোবরের মধ্যে কত
র্য্য রহস্য নিহিত রয়েছে তার ঠিক নেই। সম্ভবতঃ
র যাওয়ার পরই কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের আবার
র দিকে ঠেলে নিয়ে আসবে। একজন তিব্বতী মাথা
সেরিংএর কথায় সায় দিল। সে বল্‌ল আমরা যত
ই করি না কেন কিছুতেই পশ্চিম দিকে যেতে পারব
হ্রদের দেবতা আমাদের নৌকো আটকে রাখবেন।
মনে করব নৌকো চলছে, আসলে যতই দাঁড়
যাক না কেন নৌকো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে
বে। হয়তো ক্রুদ্ধ দেবতা নৌকো উল্টে দিয়ে শেষ
আমাদের ডুবিয়ে দেবেন।

রবার্টকে আমি বলে দিলুম ২১২ নং তাঁবুতে আমাদের
অপেক্ষা করতে। ঘড়িতে ন'টা বেজেছে। সকলে

ধীর গম্ভীর স্বরে আমাদের বিদায় জ্ঞাপন করল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হ'ল আমাদের সঙ্গে তাদের এই শেষ দেখা। দক্ষিণের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। হয়তো ঝড় উঠবে। কিন্তু অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছিল। দূরে পাহাড়ের আড়ালে ঐ যে চাঁদ উঠছে! অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় মানস সরোবরকে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে। দক্ষিণে তুষারময় গুর্‌লা মন্দত্ত বিরাট দৈত্যের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

আমার আদেশে মাঝিরা শক্ত করে দাঁড় চেপে ধরল। নৌকো জল কেটে চলতে আরম্ভ করল। অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম আমার অনুচরেরা বিমর্ষভাবে চুপ করে তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁবুর আগুন দেখা গেল, তার পর তাও গেল মিলিয়ে। রবার্ট পরে আমাকে বলেছিল যে নৌকো চলতে আরম্ভ করবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা পাড়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতে পেয়েছিল, কেন না আমাদের কাছের লণ্ঠন জ্বলছিল আর সে আলোর প্রতিবিম্ব পড়েছিল মাস্তুলের আগার ওপর। তারপর চাঁদের আলো যখন নৌকোর ওপর এসে পড়ল তখন দূর থেকে মনে হ'তে লাগল হ্রদের মাঝে বুঝি ছোট্ট একটি বিন্দু ভাসছে। তারপর তাও আর দেখা গেল না।

অজানা, অন্ধকার, রহস্যময় রাত্রির মানস সরোবর আমাদের চোখের সামনে কালো মখমলের মত বিছানো। দূরে অতি অস্পষ্ট গিরিশ্রেণী ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হয়ে আসছে। কুড়ি মিনিট দাঁড় বাইবার পর আমরা দাঁড়ালুম। জল মেপে দেখলুম গভীরতা ১৩৫ ফুট। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা কেবল তিনটি শব্দ শুনছিলুম—তীরভূমিতে ঢেউএর আছাড়, দাঁড় ফেলার ছপ্ ছপ্ শব্দ আর দাঁড় নামানোর সময় মাঝিদের এক-ঘেয়ে গান। আর একটু এগিয়ে গিয়ে আবার জল মাপা হ'ল। দেখলুম গভীরতা এবার ১৪১ ফুট। প্রত্যেক ঘণ্টায় আমি একবার করে জল আর বাতাসের উত্তাপ লক্ষ্য করছিলুম। এবার নিদ্রাদেবী আমাদের কাছে এসেছেন বলে বোধ হ'ল। সুক্কুর আলি হাই তুলতে আরম্ভ করল। তার দীর্ঘ হাই তোলার শব্দ

পর পর তিনবার দাঁড় ফেলার আওয়াজকেও অতিক্রম করছিল।

অতি ধীরে বাতাস বইছে। নৌকোর দোলানি মৃদু ভাবে আমাদের দেহ স্পর্শ করছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। মনে হ'তে লাগল আমাদের পাশে বসে অন্য অশরীরী আত্মারাও যেন দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে গরম বোধ হ'ল। তাপমান যন্ত্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম কাঁটা ৪৬ ডিগ্রীতে ঠেকেছে। ঘড়িতে রাত এগারটা বাজল। কিছুক্ষণ পর দু'বার গভীরতা মেপে আমরা পেলুম ১৪৩ এবং ১৬৪ ফুট। মাঝিরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে জল মাপা দেখছিল। প্রতি বারই আশা হচ্ছিল বুঝি গভীরতা কমে আসছে। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারে অজানা হ্রদের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দিতে তাদের ভয় করছিল। দক্ষিণের আকাশ জলে উঠল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরণ আরম্ভ ক্রমে আকাশের ঠিক মাঝখানটা আলোয় আলো উঠল। মনে হ'ল কাল রাত্রির মাঝখানে হঠাৎ দু রৌদ্র এসে উপস্থিত হয়েছে! কিন্তু ক্ষণকালের অপূর্ব দীপ্তি! দেখতে দেখতে আলো মুছে গিয়ে আগেকার অন্ধকার। চোখ ঝলসান আলোর পরে অন্ধকারকে আরও গাঢ় বোধ হচ্ছিল। নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য শতগুণ বেড়ে উঠেছিল যেন। বিদ্যুৎচ মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখলুম আমার মাঝিদের মুখ বিহ্বল; তারা উত্তেজনায় কাঁপছে। গান গেয়ে নিস্তব্ধতাকে বাধা দেবার সাহস তাদের আর হ'ল না।

(আগামী বারে শেষ

বড় কাজ

অরূপ

তিনরঙা পতাকা ছাদের ওপর উড়িয়ে দিয়ে চার বন্ধু সামরিক কায়দায় সার দিয়ে দাঁড়াল। রেবা, সিপ্রা, প্রণতি ও সুনন্দা—চার বন্ধু।

তাদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন মা ও মাসিমা। ছোট ভাই বাচ্চু ও এসে দাঁড়াল। দাদুকেও এসে দাঁড়াতে হ'ল। সবাই এক সুরে গাইলেন—বন্দে মাতরম্।

শিক্ষাশিবিরে গিয়ে রেবা ও সিপ্রা বাংলা কুচকাওয়াজ শিখে এসেছে। তাদেরই একজন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিল। সেদিন ছিল রামেশ্বর ও সালামের মৃত্যুদিন। সংগীতের পর রেবা বললে, 'শত্রুর অনুচররা ভারতের যে সব বীর সন্তানদের বর্বরের মত হত্যা করেছে, আমরা তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।'

প্রণতি বললে, 'শহীদদের অতৃপ্ত আকাংক্ষা আমাদের ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণতা পেতে চাইছে। নতুন ভারত গড়ে তোলবার দায়িত্ব যে আজ আমাদের। এস, এই পবিত্র দিনে আমরা আমাদের মহান্ কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করি।'

সুনন্দা বললে, 'রামেশ্বরের আত্মদান ভারতের প্র ছেলেমেয়ের পক্ষেই পরম আকাংক্ষার বস্তু।'

সিপ্রা বললে, 'এ আমাদের শোকসভা নয়। আমাদের আনন্দের দিন। আমাদের শহীদরা বুকের রক্তে মায়ের কপালে জয়টিকা পরিয়ে দিয়ে উৎসবের আনন্দে আমাদের গুরু দায়িত্বের কথা ভুললে চলবে না।'

দাদুকেও কিছু বলতে হ'ল। তিনি বললেন, 'রা ও আবদুস সালাম মরে নি, মরেছি আমরা। তারা প্রত্যেক নরনারীর অপমানিত অন্তরাত্মা শহীদদের নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তাই তাদের হাত দি আমরা পেয়েছি আজ মৃত্যুর চরম পরীক্ষার অনুভূ শহীদরা তো মরে নি; শত্রুর হাতে মরণ দিয়ে ছি নিয়েছে অমরত্ব। তারা বেঁচে আছে, তোমার ম আমার মাঝে, ভারতের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ম তারা বেঁচে আছে।

অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। ছোট্ট অনুষ্ঠানটি সেদিন স বড় মর্মস্পর্শী হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে কিশোর

দের দায়িত্ব যে অনেক বড়, এ কথা চার বন্ধুর ত বাকী রইল না। তাদের অন্তরাত্মা বলে উঠল— রা বড় হব, বড় কাজ করব।

প্রায় নিত্যই তারা একত্র হয় এবং দেশের ও সমাজের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য দেশের তুলনা করলে ভারত যে অনেক পেছনে পড়ে সে সম্বন্ধে কারুরই কোন মতভেদ থাকে না। মাঝে তারা দাদুর কাছেও যায় এবং নানা বিষয়ে লোচনা করে।

দিন কয়েক পরে একদিন মা বললেন, 'রেবা, আজ টা বড্ড জ্বালাচ্ছে, এই কুটনোটা তুই চট করে কুটে তা মা!'

রেবা বললে, 'আমি পারব না মা, আমার অন্য কাজ হ।'

আর একদিন মা রেবাকে তাঁর কাপড়ে একটু সাবান বললেন। রেবা বলে উঠল, 'আমি এ সব কাজ না মা! তোমাদের ঝি-গিরি করবার জন্য আমার হয় নি। অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে াদের।'

দাদুর কাছে গিয়ে মা নালিশ করলেন, 'দেখুন তো র কাণ্ড! আদর ক'রে আপনি আরো ওর মাথা ছেন। সামান্য একটু কাজের কথা বললেই মেয়ের ব—পারব না!'

দাদু একটু হাসলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু কে চার বন্ধুর ভেতর এক দারুণ সমস্যা দেখা দিল। কাজ তো করতেই হবে, কিন্তু কোথায় সেই বড় জ? যে সুযোগে রামেশ্বর তার প্রাণ দিয়েছিল সে াগ আর আসবে না। ঝাঁসীর রাণী বাহিনী অথবা ষচন্দ্রের বালসেনা তো আর তৈরী হবে না! কারণ ৩ ও ৪৫ সাল যে আর ফিরে আসবে না!

একদিন রেবা বললে, 'একটা কাজের মত কাজ, ং স্বাধীন ভারতের কিশোর মেয়েদের পক্ষে যা সব তে গৌরবের হবে, এ রকম একটা কাজ বাতলে দিতে র দাদু?'

দাদু বললেন, 'কাজ কেউ কাউকে বাতলে দিতে রে না দিদিমণি! কাজ নিজেকে খুঁজে নিতে হয়।'

রেবা বললে, 'আমরা তো খুঁজে পাচ্ছি না!'

দাদু বললেন, 'সত্যি কথা কি জান বোন? কাজ আর সুযোগ দু'টোই আপনা থেকে আসে, খুঁজতে হয় না। আমার কাছে আসে, তোমার কাছে আসে, প্রত্যেকের কাছে যায়। কিন্তু সবাই সে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে না। যারা পারে ইতিহাস তাদেরই শুধু নামগুলো বেছে নেয়।'

দাদুর কথাগুলো রেবা বেশ ভাল বুঝতে পারলে না, সে তাকিয়ে রইল দাদুর পানে। দাদু বললেন, 'তোমাদের ক্লাসে প্রথম তো একজনই হয়। কিন্তু তুমি কি বলবে যে তুমি সুযোগ পাও না, অন্যান্য মেয়েরা সুযোগ পায় না বলেই প্রথম হতে পারে না? সে কথা বলতে পার না। প্রথম হবার সুযোগ প্রত্যেকের কাছেই যায়, শুধু সেই সুযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে সেই প্রথম হয়।'

রেবা জবাব দিলে, 'তাই বলে গান্ধীজি বা ঐ রকম লোকেরা হয়তো কোন দিনই ক্লাসে প্রথম হ'ন নি; তবুও তাঁরা...'

—'কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই প্রথম হয়েছেন।' দাদু চটপট জবাব দেন, 'গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সুযোগ পেয়েছিলেন সে সুযোগ সেখানকার প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই গিয়েছিল। এই রকমই তো সব।'

রেবা খানিকক্ষণ চুপ করে তার পর আবার বললে, 'দাদু, এ সব বড় বড় কথা রাখ। এখন আমরা কি করব বলে দাও দিকি বেশ পরিষ্কার করে?'

দাদু বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন, 'রামেশ্বরের মত শহীদ হও, আজাদ হিন্দ ফৌজের মত বীর হও, নেতাজির মত নেতা হও, মহাত্মাজির মত মহাত্মা হও, বিবেকানন্দের মত ভালবাসায় গড়া তেজের মূর্তি হও,—এর চেয়ে পরিষ্কার করে আর কি বলব বল?'

দাদুর জবাবে রেবা মোটেই খুসী হ'ল না। সে বললে, 'এ সব কথা তুমি কেন, ছোটদের সভায় আমিও অনেক বার বলেছি। সবাই ও রকম বলে। তোমাকে প্রাণের কথা বলছি দাদু! আমরা চার বন্ধু শপথ করেছি আমরা বড় হব, বড় বড় কাজ করব। কিন্তু কাল থেকে কি কাজ আমরা করব সেটি ভেবে ঠিক করতে পারছি

না। সিপ্রা বললে, 'আয় আমরা একটা ইস্কুল করি গরীবদের জন্য। এ প্রস্তাব আমাদের ভাল লাগছে না। ইস্কুল তো অনেকেই করছে। আমরা যে আরো বড় কাজ চাই!'

দাদু বললেন, 'বেশ কথা, আমিই তোমাদের কাজ দেব। আগে তোমাকে দিচ্ছি। তার পর একে একে তোমার বন্ধুদেরও দেব।'

এ কথায় রেবার মুখখানি হাসিতে ভরে উঠল। বললে, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। আজ নিশ্চয় বলছি তোমার মাথার পঞ্চাশ গাছি পাকা চুল তুলে দেব।'

একটু হেসে দাদু বললেন, 'বেশ, দিও। কিন্তু একটি কথা। আমি যা বলব তোমরা তা করতে রাজী হবে তো?'

—'নিশ্চয়ই দাদু! [চার বন্ধুর তরফ থেকেই আমি কথা দিচ্ছি। দেখে নিও, কোন বাধা আমাদের দমিয়ে দিতে পারবে না। •আমরা চাই, সুযোগ পেলে আমরাও মহৎ হতে পারি।'

খুসী হয়ে দাদু জবাব দিলেন, 'বেশ, তা হ... কথাই নেই। আমি তোমার কাজ দিচ্ছি। কা... ভোর ছ' টায় নিত্য তুমি আমার এই ছোট্ট ... ঝাঁট দিয়ে পুঁছে দেবে। ঠিক সময় মত নি... চাই এবং নিখুঁত ভাবে করা চাই। যে নুন ঠি... মাপতে পারে সে মিস্ত্রিও...'

আর দাদুকে বলতে হ'ল না। কারণ দাদুর ... কথা শুনে রেবা ভয়ানক চটে গেছে। দাদুর পি... ধাক্কা মেরে মুখ ফুলিয়ে দুম্ দাম্ পা ফেলে সে ওপরে গেছে।

বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত ছাত্র

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

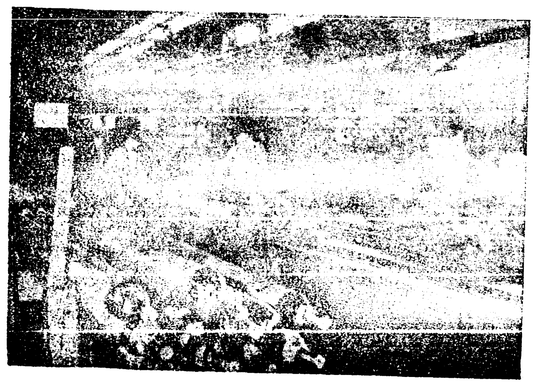

আজ তোমাদের কাছে একজন মার্কিন রাসায়নিকের গল্প বলিব। ইঁহার নাম চার্ল্‌স্ মার্টিন্ হল্। ১৮৬৩ সনে

আধুনিক এলুমিনিয়াম-কারখানার একটি দৃশ্য

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর অন্তর্গত ওবারলিন গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। মার্টিনের এক অধ্যাপক তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন: "চার বছর জাপানে অধ্যাপনা ক... দেশে ফিরিয়া আসিলে একটি ছেলের প্রতি আমার ... আকৃষ্ট হয়। ছেলেটি রসায়নাগারে আসিয়া কাচের ... বা টেষ্ট টিউব কিনিয়া নিত। ছেলেটির হাবভাব দে... আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয় এবং স্থির ধারণা হয় ... ছেলে নিশ্চয় বড় হইবে। অপর ছেলেরা যখন খেলায় ... ছেলেটি তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত। ছেলে... নাম চার্লস মার্টিন হল্। মাত্র ২২ বছর বয়সে ... এলুমিনিয়াম নামক ধাতুটিকে খনি হইতে উদ্ধারের সু... পন্থা আবিষ্কার করে।

"ছেলেটী সর্ব্ব বিষয়ে ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু বিজ্ঞা... তাহার বিশেষ দখল ছিল। শ্রীমান্ কাজে ভর্ত্তি হই... আমি তাহাকে পছন্দ করিয়া আমার পাশে কাজ করি... দিতাম এবং অবসর সময়ে উহার সঙ্গে নানা রাসায়... বিষয়ে আলোচনা করিতাম। সম্ভবতঃ আমার কো... কথা তাহাকে •এলুমিনিয়ামের সন্ধানে *নিযুক্ত ক... ছেলেদের নিকট নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে একদিন ...

...ছিলাম যে যদি কেহ কোনও সুলভ পদ্ধতিতে এলু-...াম তৈয়ার করিতে পারে তবে তাহার দ্বারা ...ীর মহা কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং নিজেও বিপুল অর্থের অধিকারী হইতে পারিবে। তখনই হল্ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সহপাঠীকে বলে, ...মি এ কাজ সাধন করিব।" হল্ সত্য সত্যই ...র প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে। সে নানাভাবে ...নিয়াম পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু ...টা কোনও ফল পায় নাই। অবশেষে ...ার মনে হয় সম্ভবতঃ বিদ্যুৎশক্তি তাহার ... হইতে পারে; যেমন মনে করা অমনি ...জ নিযুক্ত হওয়া। আমি তাহাকে বৈদ্যুতিক ...াতি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়াছি, হল্ও ... সময় পেয়ালা, গ্লাস ইত্যাদির দ্বারা তাহার ... চালাইয়াছে।

"ইহার পর শ্রীমান্ বি,এ পাস করিল এবং যন্ত্রপাতি ... তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।.. ইচ্ছা, ঘরে বসিয়া ...ার গবেষণা চালাইবে। হল্ মাঝে মাঝে আমার ... দেখা করিত এবং তাহার প্রচেষ্টার ফলাফল ব্যক্ত ...ত। দু' মাস পরে একদিন দেখি, হল্ ঘরে ঢুকিয়া ...খানা আমার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং বলিতেছে ...র, আমি পাইয়াছি।" আমি দেখিলাম তাহার ...তের তেলোতে ১০।১২টী এলুমিনিয়ামের ক্ষুদ্র বটিকা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এই সর্ব্বপ্রথম আমাদের আমে-...াতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হইল—সন ১৮৮৬, ২৯শে ...য়ারী। ইহার পরে শ্রীমান্ তাহার প্রণালীটী পরি-...ত ও সুগঠিত করে।"

হল্ ১৯১১ সনে বিশ্ববিখ্যাত পার্কিন পদক লাভ করেন। ... সময়ে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতেও ...ার বিষয় কিছুটা খবর পাওয়া যায়। তিনি বলেন ...ার প্রথম রাসায়নিক বিদ্যালাভ ওবারলিনের ...ই হইয়াছে। পিতার একখানা অতি পুরাতন ...ন পুস্তক ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। ...খানা এখনও আমার কাছে আছে। ইহার প্রথম দিক্ কয়েকটি পৃষ্ঠা নাই, কাজেই লেখকের নাম জানিতে পারি নাই। পরে আমি এলুমিনিয়াম উদ্ধারণ সম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডি'ভিলের প্রক্রিয়াও পড়িয়াছি এবং

এলুমিনিয়ামের ব্যবহার আজকাল সকল কাজে। এই আসবাবপত্রগুলি সব এলুমিনিয়ামের তৈরী।

জানিয়াছি যে কাদা-মাটি এলুমিনিয়ামের জননী। এলুমিনিয়াম রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান্। আমি ক্রমশঃ কি ভাবে ইহা সস্তায় প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকি।"

যে বালক তাহার ব্যাটারী প্রস্তুতের জন্য কাঠ কাটিয়া পাত্র তৈয়ার করিত, দস্তা গলাইয়া বিদ্যুৎস্তম্ভ (ইলেক্-ট্রোড) তৈয়ার করিত, তাহার পক্ষে যেখানে ডেভির মত মহাপণ্ডিত অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সেখানে কৃতকার্য্য হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। হলের পূর্ব্বে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক উলার, ডি'ভিল প্রভৃতি বহু মনীষী এলু-মিনিয়াম প্রস্তুতের পদ্ধতিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে ভাবে কৃতকার্য্য হন নাই। ডি'ভিলের অবশ্য একটা পদ্ধতি ছিল, কিন্তু ইহাতে বিরাটভাবে জিনিষটা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রণালীতে ১৮৫৩ সনে মাত্র ১৮ পাউণ্ড এলু-মিনিয়াম প্রস্তুত হয়। কাজেই ধাতুটি চমৎকার হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাকে নিয়োগ করা যাইতেছিল না। হল্ বহু চেষ্টার পরে বক্সাইট নামক প্রধান এলুমিনিয়াম-খনিজকে বিদ্যুৎপ্রভাবে বিভক্ত করেন তাঁর এই আবিষ্কার

পৃথিবীর কি কল্যাণ সাধন করিয়াছে আজ পৃথিবীর অধিবাসিগণ তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

এলুমিনিয়ামের ব্যবহারিক সত্তা কি সুদূরপ্রসারী ক্রমশঃ মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতেছে। একমাত্র আমেরিকাতে যে পরিমাণ এলুমিনিয়ামের কেটলী তৈরী হয় তাহা দিয়া আমেরিকায় এপার ওপার—অর্থাৎ আট-লান্টিক মহাসাগরের পার হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের পার পর্য্যন্ত এক সারি কেটলী অনায়াসে সাজাইয়া রাখা যায়। ইহা ছাড়া উড়ো-জাহাজের ও মোটর গাড়ীর শরীর এবং অন্যান্য অনেক কিছু ব্যাপারে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য। ইহা যেমন শক্ত, তেমন হাল্কা ও সুন্দর। লোহার চেয়েও ইহা অনেক বিষয়ে বেশী কার্য্যকরী।

হল্ যদি আর কিছুদিন বিলম্ব করিতেন তবে এলু-মিনিয়াম্-প্রস্তুতির কৃতিত্ব অপরের হাতে চলিয়া যাইত। হলের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেরল্ট ঠিক একই উপায়ে ইহা আহরণ করেন। দুইজন কৃতী সন্তান আটলান্টিকের দুই প্রান্তে বসিয়া প্রায় একই সময় পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন পরিবেশন করেন।

হল্‌কে প্রথম প্রথম আবিষ্কারের ফল উপভোগে বেগ পাইতে হইয়াছিল। বহু অর্থশালী প্রতিষ্ঠান বিমুখ করিয়াছে, আবার কেহ কেহ প্রতারণা করি চেষ্টা করিয়াছে। এ বিষয়ে ১৮৯৩ সনে বিচারক ট্যা মতামত উল্লেখযোগ্য: "হলের প্রণালীটী সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার।...তিনি এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক আইন মতে সর্ব্ববিধ সুবিধা তাঁহারই প্রাপ্য।"

হল্ ছিলেন একজন নির্ব্বিবাদ লোক। ঐ সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শেষ জীবনে এ জন্য তিনি লোকসমাজ পছন্দ করি না এবং প্রায়ই সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় নিযুক্ত থাকি ১৯১৪ সনে মার্টিন হল্ দেহরক্ষা করেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি আমেরিকাবাসীদের শিক্ষার জন্য দান ক গিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব উচ্চ বিদ্যালয় সম্পত্তি তৃতীয়াংশ পাইয়াছে (প্রায় দেড় কোটি ডলার)। আ ছেলেরা কবে হলের মত হইবে তাহাই ভাবি!

বুলি

শ্রীসুকুমার দে সরকার

কাণ দুটো ঝোলা ঝোলা, চক্‌চকে সোনালী রঙ, জুল জুলে নির্দ্দোষ চাউনি। ধর্ম্মতলার মোড়ে বাচ্চা-টাকে দেখে ভারী পছন্দ হয়ে গেল। বোধ হয় আমার চোখের ভাল লাগাটা বুঝতে পেরে, বাচ্চাটা বগলে এগিয়ে এসে লোকটা বলল, "নিয়ে নিন না বাবু! আসল বিলিতী, গোল্ডেন টেরিয়ার!"

কুকুর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম অথচ পোষবার সখ।

"গোল্ডেন টেরিয়ার?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আসল বিলিতী বাবু, বড় হয়ে সার্কাস দেখাবে। ওর মা সার্কাসের কুকুর ছিল। আর বাড়ীতে একটা মাছিও ঢুকতে পাবে না, জাত শিকারী ছিল ওর বাবা।"

"বড় হয়ে কামড়ে টামড়ে দেবে না ত' হে?"

লোকটা হাসল, বললে, "কামড়ে? নিশ্চয় দেবে বাবু! একেবারে সোঁদর বনের বাঘের তবে বাড়ীর লোককে নয়, চোট্টাকে—ডাকুকে। বা একদম ভিজে বেরাল আর ডাকু, চোট্টা এলেই সোঁদর বনের বাঘ।"

"খাবে কি?"

লোকটা আড় চোড়ে একবার আমার চেহারাটা নিয়ে বলল, "ওই একটা কথা আছে বাবু! জাত কিনা, যা' তা' জিনিষ একবার শুঁকেও দেখবে মাংস আর দুধ-রুটি। একটু খরচা হবে বাবু, কি পয়সায় দরোয়ান হয়ে যাবে।"

আর দ্বিধা না করে নিয়ে ফেললাম বাচ্চাটা ক কুড়িটা টাকার বদলে।

এসেই হাঁক দিলাম, "খোকা! খোকা! কি দেখ।"

মা, কি সুন্দর!" লাফিয়ে ধেয়ে এল খোকা, "মা, খে যাও!"

কি রে খোকা?" খোকার মা আসতে আসতে মাঝ মে দাঁড়ালেন। "আ মরণ! একটা নেড়ী কুত্তার কোথা থেকে ধরে আনলি?"

খোকা বলল, "আমি নয়—বাবা!"

নেড়ী কুত্তা? কাণ দু'টো গরম হ'য়ে উঠল। "যা জান নিয়ে কথা বলতে যাওয়া কেন? হুঁ, নেড়ী কুত্তা! গোল্ডেন টেরিয়ার! দেখছ না কেমন কাণ দু'টো ঝোলা? ওর মা ছিল সার্কাসের আর বাপ বাঘ ছে।"

তোমার পকেট মারা গেল কত?"

জবাব দিলাম না। খোকার দিকে ফিরে বললাম, সার্কাস শেখাতে হবে, বুঝেছিস খোকা? দেখ করে দু' পায়ে চলবে সামনের ঠ্যাং দু'টো তুলে।"

দিলাম।

খোকা আহ্লাদে আটখানা। "বেশ হবে বাবা!"

বাড়ীতে আর একটাও চোর ঢুকতে পারবে না।"

কেন বাবা?"

কামড়ে দেবে।"

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "এ কি কাণ্ড বাপু র? ছেলেপুলের ঘর। যদি কামড়ে দেয়?"

একদম ভিজে বেরাল, কিচ্ছু ভেবো না।"

* * *

র নাম দেওয়া হ'ল বুলি। প্রথম দু'টো রাত কেঁই করে সারা রাত চেঁচিয়ে কাউকে ঘুমোতে দিল না দিনের বেলা বেশ নড়বড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা কিন্তু রাতটি হয়েছে কি চেঁচান সুরু।

প্রথম রাতে চীৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠে-ম।—"শুনছ?"

শুনছি বৈ কি!" আধ-ঘুমন্ত স্বরে খোকার মা'র এল।

চোর-টোর এল নাকি?" সগর্ব্ব কণ্ঠে বললাম।

"জাত কুকুরের বাচ্চা ত', প্রথম রাত থেকেই চোর ধরতে পারে।"

"তুমি থামো! নেড়ী কুত্তার বাচ্চা, মার জন্য মন কেমন করছে তাই ঘ্যাঙাচ্ছে।"

"দেখ, নেড়ী কুত্তা নেড়ী কুত্তা, ক'রো না! অমন কাণ দু'টো ঝোলা ঝোলা!" পাশ ফিরে শুলাম।

তৃতীয় রাত থেকে আর চেঁচাল না বুলি। মৌরশী পাট্টা গেড়ে বসল সে। একটা কাঠের বাক্স যোগাড় করে ঘর করে দেওয়া হ'ল তার। চামড়ার একটা সৌখীন শিকলও কিনে আনা হ'ল। ক'দিন পরে যখন অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি হঠাৎ দেখি বুলি আমার পায়ের কাছে লাফাচ্ছে!

"আরে, বুলিকে শেকল থেকে খুলে দিলে কে?"

"কই, জানি না ত'!" জবাব দিলেন গৃহিণী।

"খোকা?"

"না। খোকা ত' খেলতে গেছে!"

ভাল করে দেখি চামড়ার শেকলের একটা মুখ পরিষ্কার চিবোন। তার ওপর জুতো পরতে গিতে দেখা গেল চামড়ার জুতো একটাও আর আস্ত নেই।

সৌখীন চামড়ার শেকল আর চলল না, আনতে হ'ল লোহার শেকল। দুধ ছেড়ে বুলি তখন রুটি খাওয়ার সুরে উঠেছে।

"খোকা, এইবার ওকে সার্কাস শেখাতে হবে।"

"কাকে বাবা?"

"কাকে আবার? বুলিকে।"

"কি করে শেখাবে?"

"দেখ্ না। তোর মা'র কাছ থেকে এক টুকরো রুটি নিয়ে আয় দেখি?"

খোকা রুটি নিয়ে এল আর চেন খুলে বুলিকে নিয়ে এলাম আমি। একখানা ছোট বেতও যোগাড় করে রাখতে ভুলি নি। ঘরের মাঝখানে বুলিকে ছেড়ে দিয়ে বেশ সার্কাসী কায়দায় বেতটা দিয়ে হাওয়ায় সপাং করে একটা শব্দ করলাম। পর মুহূর্ত্তেই দেখি ঘর বুলিহীন। নীচে ওর কাঠের বাক্সটা থেকে শব্দ ভেসে আসছে—কেঁউ কেঁউ!

অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার নিয়ে আসা হ'ল বুলিকে।

"দরজাটা ভেজিয়ে দে খোকা!"

ঘরের মাঝখানে বুলি দাঁড়িয়ে জুল জুল করে তাকাল আমাদের মুখে।

"খাবি বুলি? রুটি খাবি?"

বুলি একবার আমাদের মুখের দিকে আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, "কুঁঃ কুঁঃ!"

"উঠে দাঁড়া তবে। দাঁড়া দু' পায়ে! ওঠ্! ওঠ্!"

"কই বাবা?" খোকা বলল, "ও ত' দাঁড়াচ্ছে না!"

"ও বুঝতে পারছে না। তুই একটু দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দে ত' খোকা!"

"আমি ত' দাঁড়িয়েই আছি বাবা!"

"নারে, তুই আগে কুকুরের মত চার পায়ে হামাগুড়ি দে আর যেই আমি এই রুটিটা দেখিয়ে তোকে দু' পায়ে দাঁড়াতে বলব অমনি উঠে দাঁড়াবি।"

"সে আমি পারব না বাবা! আমি কি কুকুর?"

"তবে তুই ধর রুটিটা, আমিই হামাগুড়ি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

হামাগুড়ি দিয়ে কুকুর হ'লাম। খোকা বলল, "দাঁড়া! উঠে দাঁড়া বুলি!"

হাত দু'টো বুকের কাছে বকের মত বেঁকিয়ে, দু'পায়ে উঠে খোকার হাত থেকে মুখে করে রুটিটা তুলে নিলাম। বুলি এতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘাড় বেঁকিয়ে একবার আমাকে আর একবার খোকাকে দেখছিল।

খোকা বলে উঠল, "দেখ দেখ বাবা, বুলি হাসছে!"

"য়্যাঁ?"

মুখ থেকে শব্দটা বেরোতেই রুটিটা পড়ে গেল। বুলি যেন মুখিয়েছিল, নিমেষে ছোঁ মেরে তুলে নিল রুটিটা। গর্জ্জে উঠলাম, "এই বুলি, খবরদার! দিয়ে দে রুটি!"

অবস্থা সঙ্গীন বুঝে বুলি ততক্ষণে খাটের তলায় ঢুকেছে, রুটিটা কিন্তু ছাড়ে নি। রোখ চড়ে গেছে তখন, আবার গর্জ্জে উঠলাম, "বেরিয়ে আয় বুলি!"

চপ চপ ক'রে দ্রুত রুটিটা চিবোনোর শব্দ কাণে এল।

"বেরোবি না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি।"

কোন রকমে বুকে হেঁটে নীচু খাটটার তলায় এমন সময় দরজা খুলে খোকার মায়ের গলা কাণে "কি হচ্ছে রে খোকা?"

"সার্কেস।" জবাব দিল খোকা।

"কে করছে রে?"

"বাবা।"

* * *

সার্কাস না শিখেই বুলি বড় হ'য়ে উঠল। আর দিন যেতে লাগল ততই কাণ দু'টো খাড়া হয়ে লাগল তার। মাংস খেয়ে বেশ টেঁপা-টোপা হয়ে উঠল ক্রমে। আর বিনাশ্রমে যতই আরাম খেতে পেতে লাগল, খাওয়ার লোভ ততই যেন উঠতে লাগল তার। প্রতিদিন দু'বেলা খাওয়ার আগে থাকতে এমন এক রকম ঘ্যাঙানি চীৎকার করত যা খাবার না পাওয়া পর্য্যন্ত থামত না।

গিন্নী প্রায়ই বলতেন, "এক হতভাগা নেড়ী নিয়ে হাড়মাস ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল।"

অনেক ঠেঙ্গিয়ে, অনেক মেরেও তার স্বভাবের এ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারি নি। হতাশ হ'য়ে বলেছি "জীব মাত্রেরই একটা না একটা দোষ থাকেই। কু পেটুক, কিন্তু কেমন তেজী, জোরাল হ'য়ে উঠেছে বাড়ীতে চোরের আর নাকটি গলাবার জো নেই।"

তার পরে একদিন বুলিকে নিয়ে বেড়াতে বে ছিলাম। চেনটা হাতে খুলে নিয়েছি, আমার দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে বুলি। তার কেবল ডাষ্টবিন আর আস্তাকুঁড়ের ময়লা ওপর। ধমকে ধমকে বার বার ফিরিয়ে নিচ্ছি এমন সময় কোথা থেকে গায়ে রোঁয়া ওঠা, হাড় জিরে, নোংরা একটা রাস্তার নেড়ী কুত্তার বাচ্চা বার ক'রে খেউ খেউ ক'রে তেড়ে এল বুলিকে। ভা সর্ব্বনাশ হ'ল। এখনই ত এক ঝটকায় ওই নেড়ী বাচ্চার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে বুলি। চোখের একটা জীব হত্যা হ'তে দেব?

"বুলি? বুলি?" জোর গলায় ডাকলাম আগে থেকেই সামলে নেওয়া দরকার।

...মা। বুলি দেখি পেছনের দুই পায়ের মধ্যে লেজটা ...চোঁ চাঁ দৌড় মেরেছে বাড়ীর দিকে!

..."বুলি? বুলি?" অনেক ডাকলাম, কিন্তু বুলি আর ...? পেছনে তার একটা রোগা ঝিরজিরে লোম-নেড়ী কুত্তার বাচ্চা খেউ খেউ ক'রে চীৎকার ...যে!

...আমরা থাকতাম দোতলার ওপরে, আর নীচে ভেতর ...র খোলা বারান্দাটায় ছিল বুলির ঘর। রাত্তির ...ওকে ছেড়ে রাখা হ'ত। একদিন রাত নিশুতি। ...যেন ঠেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। "কি? কে?

..."

...খোকার মায়ের গলা শুনলাম, "ওগো, শুনছ? ...ও না অমন ক'রে।"

..."কেন, কি হয়েছে?" চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে ...ছি তখন।

..."নীচে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে!"

..."য়্যাঁ! কে?"

..."কি বিপদ, আমি কি ক'রে বলি! ওঠো, দেখ ...!"

...লাফিয়ে উঠে নীচে যাচ্ছিলাম, খোকার মা বলে ...ন, "খালি হাতে যেও না। একটা কিছু নাও।"

...খোকার ছোট্ট হকি ষ্টিকটা বাগিয়ে নেমে এসে ঝাঁ ...র দরজা খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুদ্দাড় ...কাণে এল। স্পষ্ট দেখলাম একটা কালো পানা লোক ...ল টপকে পালাল।

..."চোর! চোর!" চেঁচিয়ে উঠলাম।

...তার পরে মহা সোরগোল। দুমদাম জানলা-দরজা ...ত লাগল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কিন্তু চোর কি ধরা ...র জন্য দাঁড়িয়ে থাকে?

...গোলমাল থামলে হঠাৎ খোকার মা বলে উঠলেন, ...লি! বুলি কই?"

..."আরে, তাই ত'! চোর ব্যাটা ত' ঠিক বুলির ঘরের ...ই দাঁড়িয়ে জানলার গরাদে কাটছিল। বুলির ঘরে ...ঢুকে দেখি তিনি বেশ নাক ডাকিয়ে নিদ্রা ...ন।

..."বুলি! বুলি!" গর্জ্জে উঠলাম।

বুলি বেরিয়ে এল, তার পরে মহা আনন্দে আমার পায়ের কাছে এসে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

গিন্নী বলে গেলেন, "আ মরণ!"

ব্যাটা যে জাত নেড়ী কুত্তা প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু আগের ঘটনাগুলিতেই নয়, তার আহারের রুচিতেও। একদিন বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই খোকার মা খেঁকিয়ে উঠলেন, "বিদেয় করো বাপু, তোমার পেয়ারের কুকুর বাড়ী থেকে। আজ রাস্তা থেকে কি খেয়ে এসেছে জান?"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি।" গম্ভীর গলায় বললাম।

"ঘেন্নায় আমি মরে যাই।"

"দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।"

কিন্তু মুখে বলা যতটা সহজ হয়েছিল কাজে ততটা সোজা দাঁড়াল না। পোষা কুকুরকে কখনও বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেখেছ? মহা শক্ত। প্রথমতঃ তোমার পেছু ত' কিছুতেই ছাড়বে না, দ্বিতীয়তঃ পথ চিনে ঠিক বাড়ী চলে আসবে। প্রথম কয়েকদিন ত' ব্যাটাকে অনেক রাস্তা ঘুরিয়ে আমার পেছনই ছাড়াতে পারলাম না। একবার পেরেছিলাম ফাঁকি দিতে কিন্তু বাড়ী পৌঁছে দেখি মূর্ত্তিমান্ আমার আগেই বাড়ী পৌঁছে বসে আছেন। কয়েকদিন পরে কুকুরটা যেন বুঝে নিল যে আমি ওকে রাস্তায় ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে পালাতে চাই। সেই থেকে কোনমতেই আমি ওকে পেছু ছাড়াতে পারি নি।

শেষে এক বুদ্ধি এল। আমার বাড়ীর কিছু দূরেই আদি গঙ্গা। ব্যাটাকে যদি কোন বুদ্ধি ক'রে গঙ্গার ওপারে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি তা হ'লেই সিদ্ধি। গঙ্গা পার হয়ে ও আর আসতে পারবে না। কিন্তু পেছু ছাড়াব কি ক'রে? সে বুদ্ধিও জুটে গেল। বুলিকে সঙ্গে করে একদিন খেয়া পার হয়ে ওপারে গেলাম, তার পরে খুঁজতে লাগলাম কোথায় আছে রাস্তার নেড়ী কুত্তার পাল। খুঁজতেও হ'ল না বেশীক্ষণ। বুলিকে দেখেই কোথা থেকে ধেয়ে এল দু'টো কালো কালো নেড়ী কুত্তা। আর বুলি, যে এতক্ষণ ছায়ার মত আমার পেছু ছাড়ে নি, হঠাৎ লেজ গুটিয়ে মারল ছুট দিক্‌বিদিক্ ভুলে। বাক্, নিশ্চিন্ত।

বাড়ী ফিরে এসে গিন্নীকে বললাম, "এতদিনে শান্তি। দিয়ে এলাম ব্যাটাকে গঙ্গা পার করে।"

মেয়েদের মন বোঝা ভার। শুনলাম গিন্নী বলছেন, "আহা, ছিল একটা জীব! আমার বাপু বড় মন কেমন করছে।"

ও মা! সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে দেখি মূর্ত্তিমান্ বেশ ঘরের সামনে বসে। আমাকে দেখে সে কি লেজ নাড়ার ঘটা!

রোখ চড়ে গেল, তাড়াতেই হবে হতভাগাকে। আমি মানুষ ও কুকুর না ও মানুষ আর আমি কুকুর? একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ওর গলায় শেকল লাগিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি চাপলাম। বললাম, "চালাও!"

মাথা তুলতে দিই নি ওকে। পাছে জানলা দিয়ে রাস্তা চিনে রাখে। উত্তরে—উত্তরে, আরও উত্তরে। ছাড়িয়ে গেলাম কলকাতার সীমানা।

"এই, রোখো!"

ট্যাক্সি থেকে নেমে খুলে দিলাম বুলির গলার বকলেস। ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। গলিতেই থাকে নেড়ী কুত্তার পাল। খুঁজতে লাগলাম তাদের। জায়গাটা আমারও অচেনা। হঠাৎ কানে এল হৈ হৈ! মার মার!

কলকাতায় সেইদিন দাঙ্গা বেধেছিল।

হঠাৎ দেখি সামনে একটা মোষ-কালো লোক, হাতে তার একটা প্রকাণ্ড লাঠি। নিমেষের মধ্যে লাঠিটা আমার মাথায় পড়ল। এক মুহূর্ত্ত রক্তে আর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। পড়ে গেলাম। আর পড়তে পড়তে দেখলাম লাঠিটা আবার উঠছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখেছিলাম সোঁদর বনের বাঘ। বুলি যেন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে আর কামড়ে ছিঁড়ে বিক্ষত করে দিতে লাগল তাকে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। এখনই শত্রু বেরিয়ে যাবে। পৃথিবীটায় অন্ধকার নেমে আসছিল। টলতে টলতে বড় রাস্তা লক্ষ্য করে ছুটলাম। দেখি নেংচাতে নেংচাতে বুলি ছুটে আসছে আমার পেছনে।

"আয় বুলি, আয়!" রক্তের স্বাদ নোনা নোনা নিজেরই রক্তের।

নেহাৎ ভাগ্য ছিল সেদিন। বড় রাস্তার ও সামনেই একটা চলতি ট্যাক্সি।

"এই, রোখো! এরোখো!" কথাগুলো বহু জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম। পা দু'টো শিথিল হয়ে আসছে কোন মতে টলতে টলতে উঠে পড়লাম ট্যাক্সিটায়। শেষ হয়ে আসছিল, তারই মধ্যে আধো জ্ঞানে অজ্ঞানে দেখেছিলাম বুলি ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করছে গলায় বকলেস নেই, দেখতেও কান উঁচু উঁচু নেড়ী ট্যাক্সিওয়ালা বাধা দিচ্ছে তাকে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "ওকে আসতে দাও! আসতে দাও!"

নিজেই বুঝতে পারলাম কথা বেরোল না, বেরোল একটা গোঙানি। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম ট্যাক্সির ভেতর।

হাসপাতাল থেকে ফিরে অনেক খোঁজ করেছি বুলির অনেক বিজ্ঞাপন দিয়েছি কাগজে কাগজে। বুলিকে আর পাই নি। একদিন যাকে জোর করে বিদায় করে চেয়েছি আজ তারই জন্য বুক ফেটে যায়।

তোমরা দেখো ত' যদি কখনও তার খোঁজ পাও।

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

চার

কাঁকর বিছানো পথ, নগর-তোরণ পার হয়ে রেখা ধরে বরাবর চলে গেছে—বৈশালী, শ্রাবস্তী, া, তক্ষশিলা, শ্রীনগর, ইন্দ্রপ্রস্থ, লক্ষ্মণাবতী, , কপিলাবস্তু। পাহাড় ও প্রান্তরকে দু' পাশে রেখে ার রেখা, মানুষের যুগ যুগান্তের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার । গান্ধার ও হিন্দুকুশের বুক চিরে কান্দাহারের পৌঁছেছে। সেই পথ আজ টেনে আনছে নিষ্ঠুর র রথচক্রকে।

সা পুষ্পমিত্রের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কাঁকর যেন রক্তিম হয়ে উঠেছে, চারিপাশে যেন ড়িয়ে আছে, কুরুক্ষেত্রের মাঠের মত রক্তাভ! ধূলিরাশি ক্রমশঃ আকাশে গোধূলির রং ধরাচ্ছে। ূলির নীচে নগরীর প্রাকার ভেঙে পড়ছে, ভগ্ন রের উপর জেগে উঠছে গ্রীক অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণ! ধারী হিন্দু সেনারা একজনের পর একজন ধরাশায়ী আহতের আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশছে বিজয়ীর ! সন্ত্রস্ত শিশু ও নারীরা পালাতে গিয়ে পিছু হটে , যবনেরা নগরীর চারি পাশ ঘিরে ফেলেছে, পথ

সা ধূলার ভিতর থেকে প্রতিভাত হ'ল রাজ-প্রাসাদ, ার প্রাসাদ। এই প্রাসাদে পুষ্পমিত্র আজন্ম প্রতি- । প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ, প্রতিটি দ্বার তাঁর পরিচিত। ওই প্রাসাদের অদূরে শাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন কে ও? মথুরার রাজা? পিতা!

পুষ্পমিত্র চমকে উঠলেন। সহসা মনে হ'ল পিতার কণ্ঠস্বর তাঁর কাণে এসে বাজছে: হিন্দু সভ্যতা ধারালো তলোয়ারের নীলাভ ফলার মত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, জাহ্নবীর মত উজ্জ্বল ও প্রাণবান্। যে প্রাণশক্তি নিয়ে একদিন আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম জনপদ থেকে জনপদান্তরে, সাগরের এক বেলাভূমি থেকে আর এক বেলাভূমিতে সে প্রাণশক্তি আজ মুমূর্ষু, আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। যে পথ আর্য্য ঋষি ও শ্রমণেরা জ্ঞানের দীপ্তি নিয়ে পরিক্রমণ করতো, সে পথে আজ মৃতের স্তূপের পাশে বাজছে বন্দীদের পায়ের শৃঙ্খল। রক্ত ও চোখের জলে পথ সিক্ত হ'ল তবু তো কই দেবতা জাগলো না! "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—কিন্তু কই? ভগবান্ তো এখনও জাগলেন না।

—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' তিনি আসছেন!

পুষ্পমিত্র চমকে উঠলেন, সামনে বজ্রাচার্য্য। মুখে হাসি, চোখ দু'টি কিন্তু হিংস্র শ্বাপদের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করছে! ওই দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত হয়ে তা হ'লে কি তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন! পুষ্পমিত্র অস্বস্তি বোধ করলেন।

বজ্রাচার্য্যের চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। হাসতে হাসতে তিনি বললেন—ভগবান্ তো নিজে আসেন না,

এক একবার এক একজন মানুষের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশ পান, প্রয়োজনীয় কল্যাণটুকু করিয়ে নেন। কে বলতে পারে এবার হয়তো তিনি তোমার ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করবেন!

পুষ্পমিত্র সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করলেন, পতঞ্জলির মুখের পানে তাকালেন। বজ্রাচার্য্য বললেন—চলো, কুক্কুটারাম বিহারে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি।

বজ্রাচার্য্যের সঙ্গে যেতে পুষ্পমিত্রের কেমন যেন শঙ্কা হ'ল, যাবেন কি যাবেন না স্থির করতে পারলেন না। পতঞ্জলি তাঁর মনের কথাটা এবার বোধ হয় বুঝতে পারলেন, বললেন, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' —কর্ম করে যাও, অনিবার্য্য পরিণতি আপনি ঘটবে!

বজ্রাচার্য্য নিমন্ত্রণ জানালেন—আপনিও আসুন মহাচার্য্য! আপনাকে পেলে জনগণের কল্যাণ নিরূপণে আমরা অভ্রান্ত হতে পারব।

পতঞ্জলি আকাশের প্রান্তে ত্রয়োদশীর চাঁদের পানে একবার তাকালেন, কি যেন ভেবে নিলেন, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! তার পর তিন জনে অগ্রসর হলেন কুক্কুটারামের দিকে।

পাঁচ

অশোকারামের *রত্নগৃহে উত্তরাপথের ধর্ম্মচক্রের প্রধানেরা সমবেত হয়েছেন। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী শীর্ণদেহ শ্রমণের দল। নিম্নস্বরে তাঁরা আলাপ করছিলেন। পুষ্পমিত্র ভিতরে আসতেই মহাস্থবির ধর্ম-রক্ষিত স্বাগতম্ জানালেন—স্বাগতম্! স্বাগতম্!! অপর সকলে বাতাসে মাথা দোলালেন শুধু।

পতঞ্জলি আসন গ্রহণ করলেন ধর্ম্মরক্ষিতের পাশে। বজ্রাচার্য্য পুষ্পমিত্রকে পাশে নিয়ে বসলেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে পুষ্পমিত্র উপস্থিত সকলের মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, কয়েকটী পরিচিত মুখ তাঁর চোখে পড়ল। তক্ষশিলার মহাসঙ্ঘিক কীর্ত্তি-রক্ষক, জেতবন বিহারের নাগদত্ত, নরেন্দ্র (নালন্দা) বিহারের সুবিজ্ঞ, মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রভাকর, অশোকা-রামের নাগসেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন কক্ষটি স্তিমিত অন্ধকারে … করতে লাগল। তার পর অশোকারামের … ধর্ম্মরক্ষিত কথা বললেন,—বহু বিচার ও বিবেচ… উত্তরাপথের ধর্ম্মচক্র (বৌদ্ধ মহাসভা) স্থির করেছে… সদ্ধর্ম্মের রক্ষা ও জনগণের কল্যাণের জন্য … দেশ থেকে যবন অত্যাচারীদেরকে দূর করা প্রয়োজন। এই কার্য্য সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ নায়ক মগধ-সম্রাট্। কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে আম… স্বীকার করতে হচ্ছে যে সম্রাট্ বৃহদ্রথের পক্ষে … নয়, আলস্য ও বিলাসপ্রিয়তা তাঁকে একেবারে … করে তুলেছে। সেই জন্য সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, … মথুরার রাজকুমার পুষ্পমিত্রকে এই দায়িত্ব গ্রহণে … আমরা আমন্ত্রণ করছি।

পুষ্পমিত্র এতটা আশা করেন নি। এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি বর্জন করবেন সহসা কিছু … করতে পারলেন না। আচার্য্য পতঞ্জলির মুখের … তাকালেন। পতঞ্জলি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে … মনের কথাটা বুঝতে পারলেন, বললেন,—পুষ্পমিত্র, রাজবংশের লোক, রাজ্য পরিচালনা ও সৈন্য পরি… তোমার সহজাত সংস্কার!

—কিন্তু এ যে বড়ই কঠিন কাজ গুরুদেব!

ধর্ম্মরক্ষিত এবার কথা বললেন,—জনগণের ক… কামীর কাছে কোন কাজই কঠিন নয়। সম্রাট্ ধর্ম্মা… নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই তোমার অবিদিত নয়?

বজ্রাচার্য্য দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন। প্র… স্তিমিত শিখায় দেয়ালের গায়ে শাদা অক্ষরগুলি স্পষ্ট … যাচ্ছে:

দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ: ক… দুকরং। যে আদি করে কলাণস সো দুকরং করো… (দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) এইরূপ ব… ছিলেন: কল্যাণকর কার্য্য করা দুষ্কর। যিনি কল্যাণ কার্য্য করেন তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন।)

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ।

তার পর বজ্রাচার্য্য কথা বললেন—এই … জাতিকে উদ্ধার করতে হবে এবং তুমিই সে সম্বন্ধে …

*অশোকের পঞ্চম গিরিলিপি—গির্ণার পাঠ

…। যবন বিতাড়নের জন্য তুমি যে ভাবে যা করতে … তাই তুমি করবে, এবং সর্ব বিষয়ে ধর্ম্মচক্র ও ব্রাহ্মণ-… তোমাকে সাহায্য করবে। অর্থের অভাব হবে না, …ণের মত সৈন্য সংগ্রহেও আমরা সাহায্য করতে …রি।

এবার পুষ্পমিত্র কথা বললেন,—কিন্তু মগধ-সম্রাটের …মতি ব্যতিরেকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে …ওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে?

বজ্রাচার্য্য বললেন,—জনগণের কল্যাণের জন্যই সম্রাট্, …দের শুভেচ্ছার উপরেই তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। …দের দুর্দ্দিনে ঐশ্বর্য্যের মাঝে বিলাস করা রাজার … শোভন নয়। শত শত প্রজার ধনপ্রাণ যখন …র তখন অক্ষ ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করা কোন …পালকের পক্ষে শোভন নয়। রাজা অযোগ্য হ'লে …কেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে হবে।

—কিন্তু এ যে রাজদ্রোহ!

—তুমি বিষয়টাকে উল্টো দিক্ থেকে দেখছ পুষ্পমিত্র। …জা যখন প্রজাদের সম্পদ্ নিয়ে বিলাস করে, প্রজাদের …দুর্দ্দশার পানে দৃষ্টি দেয় না, তখন তাকে বলে …জাদ্রোহী। প্রজাদ্রোহী সম্রাট্কে সিংহাসন থেকে …মিয়ে দেবার অধিকার প্রজাদের আছে। তাকে রাজদ্রোহ বলে না, তাকে বলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

—আপনারা এ বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলেছেন?

—সম্রাট্ দিনরাত অক্ষ ক্রীড়ায় মগ্ন, কথা বলার মত অবসর তাঁর নেই। তার উপর অতিরিক্ত মধুপান করার ফলে নিভৃতে মন্ত্রগুপ্তি আলোচনা করার মত মনের অবস্থাও তাঁর নয়।

—কিন্তু সম্রাট্কে সিংহাসনচ্যুত করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—আমরা তোমাকে তেমন কিছু করতে বলছি না। এমন পথে অগ্রসর হ'তে হবে যাতে যদি আমরা পরাজিত হই তা'হলে গ্রীক্ সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির পথ যেন খোলা থাকে। সম্রাট্ বৃহদ্রথ যেমন তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করছেন করুন, তোমাকে নামতে হবে দস্যু-সর্দ্দারের ভূমিকায়। যদি জয়ী হও দেশ শত্রুমুক্ত হবে, যদি হেরে যাও ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে,—কোন ডাকাত-সর্দ্দারের অন্যায়ের জন্য মিনান্দার সম্রাট্ বৃহদ্রথকে দায়ী করতে পারবেন না।

পুষ্পমিত্র বললেন,—তা'হলে আমি রাজী আছি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

আকাশ-দ্বীপ

শ্রাবণ মাসের রামধনুতে তোমাদের বলেছিলাম …মেন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বোমারু বিমানকে …ল্যাবোরেটরীতে পরিবর্ত্তিত ক'রে ডাঙ্গা থেকে ৭.৮ মাইল …চুতে মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেছেন। এই অদ্ভুত ল্যাবোরেটরীর নাম দেওয়া হয়েছে 'উড়ন্ত ল্যাবোরেটরী'।

মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কিন্তু এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই বিজ্ঞানীরা যে সহজেই এদিকে

ঝুঁকবেন তা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর ওপরে মানুষের অনাবিষ্কৃত জায়গা এখন খুব বেশী নেই। দুস্তর সাগর, গহন অরণ্য, দুর্গম গিরিশৃঙ্গ বা বরফে ঢাকা নির্জন প্রান্তর, যেখানে কবির ভাষায়—"রাত্রি আসে, ঘুমাবার কেহ নাই,"—তাও একে একে মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে; কিন্তু মহাকাশ সম্বন্ধে এখনও আমরা প্রায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

কিন্তু তা তো হয় না! উৎসাহী বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীতে জনসংখ্যা এবং খাদ্যাভাব যেমন বেড়ে চলেছে তা'তে মানুষকে টিকে থাকতে হ'লে বাইরে কোন উপনিবেশের ব্যবস্থা করতেই হবে এবং এখন থেকেই তার তোড়জোড় সুরু হওয়া দরকার।

উপনিবেশ তৈরী হোক্ না হোক্, মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখন আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন,—অন্য গ্রহ, উপগ্রহ সম্বন্ধে আরও সঠিক তথ্য জানা দরকার। মহাকাশের অদ্ভুত আলো—'কস্‌মিক্ রে' (যার বাংলা করা হয়েছে 'ব্যোমরশ্মি') সম্বন্ধে তোমাদের আগেই বলেছি। এর সমস্ত রহস্য এখনও জানা যায় নি কিন্তু যেটুকু জানা গেছে তাইতেই বিজ্ঞান-জগতে একটা নতুন সাড়া পড়ে গেছে। আকাশের অন্যান্য রহস্য যখন একে একে আবিষ্কৃত হবে তখন কত কি যে নতুন কাণ্ড ঘটতে পারে কে বলবে!

মহাকাশ সম্বন্ধে আরও ভাল ক'রে জানতে হ'লে পৃথিবীর রাজ্য ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি দূরে যাওয়া দরকার। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব? বোমারু বিমান বা বিশেষ ভাবে তৈরী বেলুনের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা যেটুকু উঠতে পেরেছেন বা পারবেন বলে মনে করছেন বিরাট মহাকাশের তুলনায় তা নিতান্তই হাস্যকর। তাই অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনা চলছে কি ক'রে অন্ততঃ পৃথিবীর উপরকার বাতাসের পর্দ্দা,—যাকে সাধু ভাষায় বলা হয় বায়ুমণ্ডল, এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে যার বিস্তৃতি বড় জোর ২০০ মাইল,—তাই পার হয়ে বাইরের আকাশে পৌছান যায়। বলা বাহুল্য এখনও জল্পনা-কল্পনাই চলছে, তবে সম্প্রতি তাঁরা যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে তোড়-জোড় করছেন তা'তে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে হাত কলমেই এই পরীক্ষা সুরু হবে।

তোমরা, যারা সৌরজগৎ সম্বন্ধে সামান্য এ পড়াশোনা করেছ, তারা জান অনেক গ্রহেরই এক একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর মাত্র একটি উপগ্রহ, আমরা তাকে বলি চাঁদ। মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতি ৮টি। কিন্তু চাঁদ ছাড়া আরও এমন অনেক ছোটখ বস্তু আছে যারা সূর্য্য বা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রহ দিনরাত প্রদক্ষিণ করছে। এগুলি চাঁদের তুলনায় এ ছোট যে তাদের ঠিক উপগ্রহ বলা চলে না। ইংরেজী অবশ্য তাদেরও বলা হয় 'স্যাটেলাইট্'। তোমরা উল্কা কথা নিশ্চয়ই জান; সেও এই জাতের জিনিষ। সূর্য্যে মত সমস্ত গ্রহেরই এই রকম ছোট-বড় অসংখ্য 'স্যাটে লাইট্' আছে, পৃথিবীরও আছে। খুব ছোট ব'লে আমরা তাদের হিসাব রাখি না। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির জ তারা ছিটকে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবী অবশ্য চেষ্টা করে তাদের নিজের কাছে টেনে নিতে এ সময় সময় নেয়ও। তবে সাধারণতঃ তারা চাঁদের ম একই নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়

এখন, বিজ্ঞানীরা কি বলছেন শোন। তাঁরা বলছে এই ধরণের কতকগুলি কৃত্রিম 'স্যাটেলাইট্' তৈরী ক'রে যদি সেগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা ক যায় আর ঐ সব স্যাটেলাইটের সঙ্গে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জা দিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়তো তা থেকে মহাকাশ সম্ব প্রচুর নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে এ দল জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক যে পরিকল্পনা করেছেন তা শোন। তাঁরা এই কৃত্রিম স্যাটেলাইট্ বা নকল চাঁদে নাম দিয়েছেন আকাশ-দ্বীপ। দীপ নয়, দ্বীপ। বানান লক্ষ্য ক'র। এই দ্বীপটা হবে ঢাকা—অর্থাৎ চারদি শক্ত খোলস, মাঝখানটা ফাঁপা। খোলস এমন শক্ত যে মহাশূন্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা সহজেই করতে পারবে—ভেঙ্গে ফেটে যাবে না। ভিতরের ফাঁ জায়গায় থাকবে আমাদের পৃথিবীরই মত প্রাকৃতি আবহাওয়া – বাতাস, অক্সিজেন, জল এবং তাপ নিয়ন্ত্র ব্যবস্থা। নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কলক ইত্যাদি তো থাকবেই। এই দ্বীপ এমন ভাবে প্র

মহাকাশে ছুটিয়ে দেওয়া হবে যে, পৃথিবী থেকে হাজার মাইল উঠে শেষটা সেটা চাঁদের মতই কে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করবে।, তখন আর চালাবার জন্য বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন না, চাঁদ যে নিয়মে এবং যে শক্তিতে পৃথিবীকে করে এই আকাশ-দ্বীপও ঠিক সেই ভাবে পৃথিবীকে করতে থাকবে। এর গতিবেগের ফলেই এ র আকর্ষণী শক্তিকে অনেকটা এড়িয়ে চলতে —অর্থাৎ আকাশ থেকে পৃথিবীর গায়ে খসে পড়বে আবার পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির বলেই মহাশূন্যে যাবে না—বা অন্য কোন শক্তিশালী গ্রহ একে নিতে পারবে না।

আরও ভাববার জিনিষ আছে। এই আকাশ-যদি ঠিক একই ভাবে খাড়া হয়ে ঘুরতে থাকে মুস্কিল। কারণ তা হ'লে একটা দিক্ সর্ব্বদা র দিকে থাকায় হয়ে উঠবে অসহ্য রকম উত্তপ্ত, দিক্ হবে তেমনি ঠাণ্ডা—হয়তো শূন্য ডিগ্রীর ও শত শত ডিগ্রী নীচে। কাজেই এ অবস্থা উদ্ধার পাওয়ার জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে দ্বীপটি সর্ব্বদা লাট্টুর মত নিজের মেরুদণ্ডের দিকেও ঘুরপাক খেতে পারে। কি উপায়ে তা সম্ভব পারে এ বিষয়েও গবেষণা চলছে।

ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে, না? কিন্তু নীরা আজকাল বলছেন, আশ্চর্য্য হ'লেও এ অসম্ভব আরও কিছু অদলবদলের পর হয়তো শীগ্‌গিরই রম আকাশ-দ্বীপ বা নকল চাঁদ নিয়ে হাতে-কলমে সুরু হবে। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন দি অনেক ব্যাপারই হয়তো মানুষের চোখে এক অসম্ভব মনে হ'ত কিন্তু সে ধারণা মানুষই পালটে ছে।

এই সব বৈজ্ঞানিক অভিযানে প্রথম যে সব অভিযাত্রী হবেন তাঁদের ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম থাকলেও লোকের অভাব হবে বলে মনে হয় না। কলম্বাস্ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ভেসেছিলেন তখনও লোকে রকমই আশঙ্কা করেছিল কিন্তু তিনি বিচলিত হন দেযাত্রীরও তাঁর অভাব হয় নি। বৈজ্ঞানিকের এই নতুন অভিযান তার চাইতে ঢের ঢের ভয়াবহ ও বিপদ্-সঙ্কুল হ'লেও তার ঝুঁকি নেওয়ার লোকেরও অভাব হবে না—তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য প্রথম দিক্‌কার অভিযানগুলিতে সম্ভবতঃ বিজ্ঞানীদের না পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিই পাঠান হবে। যন্ত্রযুগে যন্ত্ররাই সরবরাহ করবে প্রয়োজনীয় তথ্য।

নেপোলিয়ন্ লোকটী কেমন ছিলেন

ফ্রান্সের সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়নের কথা তোমরা অল্পস্বল্প বোধ হয় সকলেই জান। তাঁর সময়ে সমস্ত ইয়োরোপ তাঁর নামে কাঁপ্‌ত। সাধারণ ঘরের ছেলে হয়ে তিনি নিজের প্রতিভা-বলে ফ্রান্সের রাজা তো হয়েছিলেনই, ইয়োরোপের আরও বহু অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যের দখলে এনেছিলেন। অবশ্য বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে তাঁর সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসা কেউই করবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভার কাছে মাথা নোয়ায় না এমন লোক নেই। তা ছাড়া নেপোলিয়নের নানা দিকে এত রকম সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া গেছে যে তা শুনলে শত্রুপক্ষের নানা নিন্দা সত্ত্বেও তাঁকে বেশীর ভাগ লোকেরই ভাল লাগে।

নেপোলিয়ন্ জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন —অনেক বড় বড় যুদ্ধ অবিশ্বাস্য ভাবে জয় করেছেন। সে সবের কাহিনী বড় বড় ইতিহাসকাররা লিখবেন; তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ছোটখাট ২।১টি ছবি কিছুদিন আগে একখানি বিলিতী সাময়িক পত্রে বেরিয়েছিল। তার থেকেই তোমাদের কিছু শোনাচ্ছি।

নেপোলিয়নের ঘুম ভাঙ্গত সাধারণতঃ খুব ভোরে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের উদার প্রকৃতি দেখতে তিনি খুব ভালবাসতেন। বিছানায় শুয়ে চোখ না খুলেই তাই চাকরকে ডাকতেন ঘরের দরজা-জানালা ভাল করে খুলে দেবার জন্য। জানালা খুললে পরে তবেই তিনি চোখ মেলতেন।

মুখ-হাত ধুতে না ধুতেই চাকর নিয়ে আসত এক গাদা চিঠি। বিছানায় বসে বসেই নেপোলিয়ন্ সেগুলিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতেন। যেগুলি প্রয়োজনীয় মনে করতেন পাশে রেখে দিতেন, বাকিগুলো ঘরময় ছুঁড়ে

ছড়িয়ে ফেলতেন—ভাবখানা, এসব চিঠির যোগ্য জবাব হচ্ছে এই।

তারপর চা-পর্ব্ব। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। এই সময় প্রায়ই তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক আসত তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো ছাই, আসলে নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর চলত খানিকটা হাস্য-পরিহাস, চা খেতে খেতেই। ওষুধ-বিষুধের উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর কোনদিনই।

মহাবীর নেপোলিয়ন

এরপর দাড়ি কামানো। তোমরা হয়তো ভাবছ সম্রাট্ যখন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত। মোটেই তা নয়। দাড়ি কামাতেন তিনি নিজের হাতে; ঠাট্টা করে বলতেন, 'অপরের হাতে অমন ধারাল অস্ত্রটি দিয়ে তার সামনে নিশ্চিন্তে গাল-গলা এগিয়ে দে… শর্ম্মাই আমি নই!' একজন সামনে … ত আয়না, একজন সাবান আর জলের পাত্র, ক্ষুর থাকত … লিয়নেরই হাতে।

দাড়ি কামাবার পর স্নান। এইখানেই নেপোলিয়নের একটু বিলাসিতা। স্নানের টব … কাছে ছিল একটা পরম লোভনীয় সামগ্রী। কা… তাড়া না থাকলে একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা সময়ও তিনি … টবে কাটিয়ে দিতেন। তার পর ধড়াচূড়া … চলতেন 'দর্শন' দিতে, অর্থাৎ যাঁরা তাঁর সঙ্গে … করতে চায় তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে।

প্রাতরাশের সময় বাঁধা ছিল সাড়ে … কিন্তু এগারোটা-বারোটা হয়ে গেলেও অবাক … ছিল না। অন্যান্য ব্যাপারে নিয়মানুবর্ত্তী হ… এই ব্যাপারটিতে তিনি একেবারেই সময় … চলতেন না। কাজই ছিল প্রধান, খাওয়াটা … কিছুই না! এই অনিয়মের জন্য তাঁকে অ… বিসুখেও কম ভুগতে হয় নি।

প্রাত-রাশ খেতে সময় লাগত বড় জোর … মিনিট। খাবারও এমন কিছু নয়,—কয়েক টু… ফল, একটু চীজ্, একটু সুপ্ আর বড়… এক-আধ টুকরো রোষ্ট্। অবশ্যি খাবার পর … কাপ্ কফি চাই-ই।

'তার পর সুরু হ'ত তাঁর আসল কা… প্রথমে লাইব্রেরীতে। চিঠিপত্র লেখা, আদে… সই করা, খসড়া করা—সব চলত এইখা… সামনে প্রাইভেট সেক্রেটারীরা বসত, নেপো… একসঙ্গে ৫।৬ জনকে বিভিন্ন বক্তব্য বলে যে… একটু ভুল হ'ত না, কারও সঙ্গে কা… গোলমাল হয়ে যেত না—এমনি অদ্ভুত … —এমনি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল তাঁর! … ব্রেরীতে গিয়ে তিনি সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসতেন … ক'র না। সিংহাসন বা চেয়ার অবশ্যি একটা থা… কিন্তু নেপোলিয়ন্ লাফিয়ে টেবিলে গিয়ে বসাই … করতেন বেশী।

লাইব্রেরী থেকে দরবার-গৃহ। এইখানে তাঁর …

… সারা দিন … সন্ধ্যা ৬টায় ডিনার খাবার কথা, … অনেক সময় এত কাজে ব্যস্ত থাকতেন যে প্রায়ই … ১০।১১ টার আগে ডিনার খাবার ফুরসৎ পেতেন … এখানে একটা মজার খবর শোন। নেপোলিয়নের …টি প্রিয় খাদ্য ছিল মুরগী রোষ্ট্। আর তা গরম … দেওয়া চাই। কিন্তু খাবার সময় যদি নির্দ্দিষ্ট না … তবে গরম রোষ্ট্ কি ক'রে দেওয়া যায়! … রাজা-রাজড়ার কাণ্ড, খরচের ভাবনা নেই তো, … নেই প্রসাদ পাবার লোকের অভাব। কাজেই …কের দল প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর এক-একটি আস্ত …ী নিয়ে রোষ্ট্ করে রাখত—উদ্দেশ্য সম্রাট্ যখনই …ত আসুন না কেন কোন না কোন মুরগী গরম …বেই। প্রত্যহ এই ভাবে কত মুরগী যে ঐ একটি …কের জন্য বধ করা হ'ত তার ঠিক নেই!

… ঐ রোষ্টের বিলাসিতা ছাড়া নেপোলিয়নের খাওয়া-…া খুবই সাদাসিধে ছিল বলা যায়। ওসব দেশে, …মরা নিশ্চয়ই জান, পানীয় হিসাবে মদই ব্যবহার … হয়। ফরাসী মদের এমনিই খুব নাম-ডাক, কাজেই …-রাজড়াদের,—অর্থাৎ যাঁদের অর্থাভাব নেই তাঁদের, … নানা রকম উৎকৃষ্ট মদের দিকে ঝোঁক থাকবে এটা …ভাবিক। কিন্তু নেপোলিয়নের সে বালাই ছিল না। … তিনি অতি সামান্য পরিমাণই খেতেন। তাঁর প্রিয় …ীয় ছিল কফি। ধূমপানের নেশাও ছিল না তাঁর, …ার মধ্যে ছিল এক নস্যি।

… ডিনারের পর কফি খেতে খেতে খানিকটা গল্পগুজব …ত, এক-আধ বাজি তাস নিয়েও বসতেন সময় সময়, … প্রায়ই খেলতে খেলতে তাস ফেলে উঠে যেতেন …জের ঘরে। সুরু হ'ত কাজ।

… ঘুমুতে তাঁর অনেক রাত হ'ত, আর রাত ক'রে শুলেও …ই ২।৪ ঘণ্টার বেশী ঘুমুতেন না। দুপুর রাতে এক … দিয়ে নেপোলিয়ন্ উঠে টেবিলে বসে লেখাপড়ার … করে চলেছেন এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। অতি … সময় ঘুমিয়েও তিনি কাজ করতে পারতেন, এবং …নাবার জন্যও তাঁর কোমল শয্যার প্রয়োজন হ'ত …মোটেই। চেয়ারে, টেবিলে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে আধ ঘণ্টাটাক ঘুমিয়ে নিচ্ছেন এ রকম খবরও অনেক বার শোনা গেছে।

নেপোলিয়নের কয়েকটি অদ্ভুত খেয়ালের কথা বলে আজ শেষ করব। নেপোলিয়ন্ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সারা জীবন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে কাটালেও পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গেও তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সাহিত্য, কলা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল—এ সবের চর্চ্চা করতেন যথেষ্ট। আর যা পড়তেন সবই প্রায় খাতায় টুকে রাখতেন। এ অভ্যাসটি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল। শোনা যায় তাঁর ছেলেবেলার একখানা নোট বইএর একেবারে শেষ পাতায় ভৌগোলিক বিবরণের নোট করতে গিয়ে তিনি লিখে রেখেছিলেন—"সেণ্ট হেলেনা, আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে একটি রুক্ষ, পার্ব্বত্য দ্বীপ।" তোমরা সবাই জান জীবনের শেষ ক'টা দিন তাঁকে এই দ্বীপেই বন্দী হয়ে কাটাতে হয়েছিল।

নেপোলিয়ন্ আঁটসাঁট জামা-পোষাক পছন্দ করতেন না। শোনা যায় নতুন পোষাক বা টুপি এলে তিনি তা কয়েক দিন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের পরতে দিতেন। কয়েকদিন ব্যবহারের পর যখন সেগুলি একটু ঢিলে—ঢলঢলে হ'ত, তখনই তা পরতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অত বড় সেনাপতি, নিয়মানুবর্ত্তিতায় যাঁর যোড়া দেখা যেত না, পারিবারিক জীবনে কিন্তু তিনি ছিলেন নেহাৎ অগোছাল। খেতে বসলে জামা-কাপড়ে খাবারের ঝোল-টোল মেখে একাকার করতেন, ছুরি-কাঁটা সামলাতে না পেরে খানিকটা পরে হাত দিয়েই হয়তো মাংসের হাড় তুলে চিবুতে লাগলেন! চায়ের কাপ্ বা পানীয় পূর্ণ গেলাস তো প্রায়ই হাত থেকে পড়ে ভাঙ্গত। দাড়ি কামাতে গিয়ে গালটাল কেটে কাণ্ড করে বসতেন, কিন্তু তবু নাপিতকে কামাতে দিতেন না!

নেপোলিয়নের আদর করার ধরণটাই ছিল সবচেয়ে মজার। কারুর ওপর খুসী হ'লে বা তার সঙ্গে রসিকতা করতে হ'লে কি করতেন জান?—তার কানটা ধরে আস্তে মলে দিতেন। নেপোলিয়নের পারিবারিক চিকিৎ-

সঙ্ক এবং অন্তরঙ্গ অনুচরদের অনেকেই এই রকম কান গণ্যমান্য লোকেরাও বাদ যেতেন না। এ রকম আ
মলা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। বয়স্ক এবং দেশের মধ্যে তোমাদের পছন্দ হয় কি?

প্রত্যহ কি কি খাওয়া উচিত

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি পরিকল্পিত

বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহীনতার দিনে আমাদের দৈনিক খাবারের তালিকায় যা যা থাকা দরকার

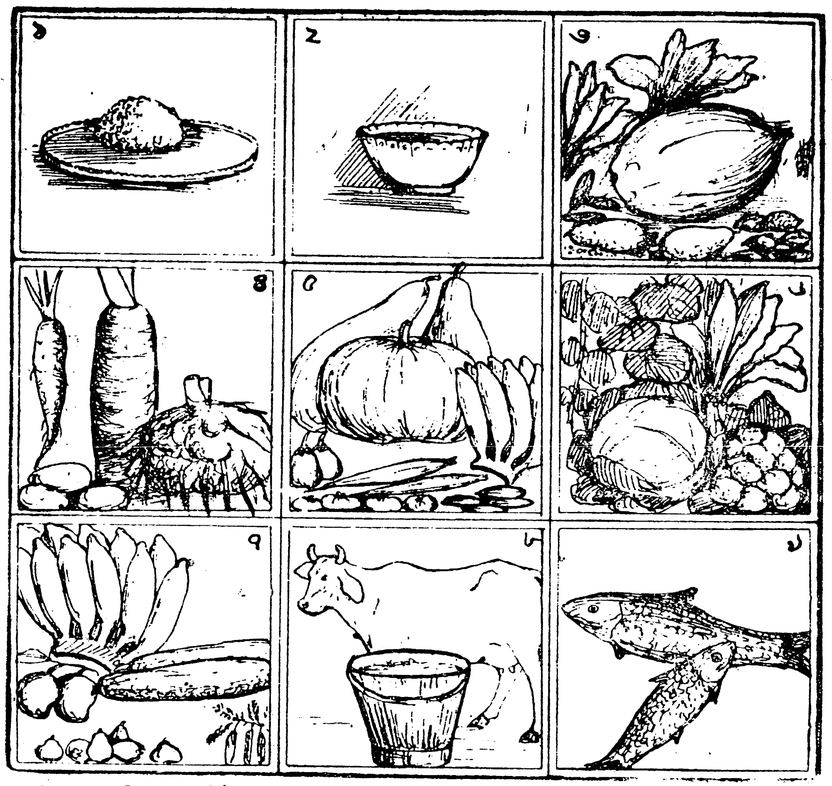

(১) ভাত (২) ডাল (৩) কিছু শক্ত সিটাওয়ালা দ্রব্য (নারিকেল, শাক ইত্যাদি) (৪) মূল আনাজ (মূলা, আলু, কচু ইত্যাদি) (৫) ফল আনাজ (৬) লতাপাতা ও ডগা আনাজ (৭) ফল (৮) দুধ (৯) মাছ

শীত

শ্রীহরিপদ গুহ

হিমানীর অবসানে পউষালী রাত্রে
এসো শীত, আবরিয়া শিহরণ গাত্রে।
হিমালয় হ'তে এসো তুষারের সঙ্গে,
উত্তরী-বায়ু মাখি' কুহেলীর অঙ্গে।
অপূর্ব্ব শোভা হেরি পল্লীর নেত্রে,
মৌমাছি ছুটে যায় সরিষার ক্ষেত্রে।

গাঁদা ফুল ওঠে ফুটি' পল্লীর বক্ষে,
উল্লাস নাহি ধরে কৃষাণীর চক্ষে।
পিষ্টক-উৎসব গৃহে গৃহে নিত্য,
পায়সে ও নব রসে খুসী হয় চিত্ত।
কাঁথা, লেপ, বালাপোষে কম্পন খর্ব্ব,
তুহিনের মুখে হাসি, মনে ভারী গর্ব্ব।

তপু সর্দার

অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্.এ

ফুটফুটে মুখখানি, গাল তার তুল্‌তুল্,
কুচ্‌কুচে কালো চুল, আঁখি দু'টি কি চটুল!
ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্ করে সব হরদম,
নিশ্‌পিশ্ করে হাত— ডানপিটে দুর্দম।
চোখা চোখা বোলচাল ঝরে মুখে ঝর্‌ঝর্,
বলিলে পড়ার কথা রাগে করে গর্‌গর্।
এটা খাব ওটা চাই; যাহা পায় চায় না,
একটা না একটাই লেগে আছে বায়না।
'বেলা তো হ'লো ঢের, আন দেখি বইখান'—
যেই বলা অমনি সে সোজা দেয় পিট্‌টান।

দু'টি কান দু'টি হাতে ধ'রে নিয়ে আসি ফের,
গোঁ ধরে সে থাকে ব'সে, কিছুতে মেটে না জের।
কাঁদ-কাঁদ মুখে শেষে বাধ-বাধ কথাতে,
আওড়ায় মন্তর অন্তর-ব্যথাতে।
মন্থর তনু ক্রমে ঘুমে পড়ে এলায়ে,
ঘুমবুড়ি সুড়সুড়ি দিল বুঝি বুলায়ে!
'না খেয়ে ঘুমাল বাছা, ওরে তোরা ডেকে তোল্,
সন্দেশ-লুচি পেলে চুকে যাবে সব গোল।'
জেগে উঠে লুটোপুটি, দিদি দু'টি হিম্‌শিম্—
একটানা নাকি সুরে মাথা করে ঝিম্ ঝিম্।

অবশেষে সন্দেশে পাওয়া যায় মন তা'র,
থম্‌থমে মুখে আর নাহি রহে মেঘভার।
চুল্‌বুলে চঞ্চল মুখে সদা ফোটে খৈ ;
সারাদিন হুটোপাটি, হল্লা ও হৈ-চৈ।
বল দেখি কোন্ জন—নাম-ধাম কিবা তা'র ?
কেউ নয়—তপু সে যে—ছোটদের সর্দার।

সন্ন্যাস

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক

পান্না বাবু গিন্নী-হাতের রান্না ছাড়া খান না—
আন্নাকালী গিন্নীকে তাই ক'রতে যে হয় রান্না।
হঠাৎ সেদিন শক্ত ব্যারাম সন্ন্যাসেতে গিন্নী
পান্না বাবুর সঙ্গ হতে হয়েই গেলেন ভিন্নি !

সেদিন হ'তে পান্না বাবুর ঘুচলো খাওয়া অম্ল,
সন্ন্যাসেতে দীক্ষা নিতে গেলেন গুরুর জন্য।
দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে ঘুচলো প্রাণের কান্না—
সন্ন্যাসেতে গিন্নী গেছেন, সন্ন্যাসী তাই পান্না।

সত্যি-মিথ্যে

কুঞ্জনাথ

ইস্কুল গণপতিকে কিছুতেই ছাড়লে না, সুতরাং গণপতিই ইস্কুল ছাড়লে।

ব্যাপারটা সামান্যই।

ইতিহাসের মাষ্টার মশায় শশধর বাবু সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় বলে ফেললেন, "আজকের এই ব্যাপার একেবারেই অনৈতিহাসিক,—অর্থাৎ ইতিহাসে এর নজির নেই।"

পরিতোষ ভালো ছেলে ; ইস্কুলের পাঠ্য ইতিহাস ছাড়াও অনেক ইতিহাসের বই সে পড়েছে। একটু আমতা আমতা করে সে বল্লে—"কিন্তু ঔরং—"

আল্‌তাফ্ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালে, "না, ও সব মিছে কথা।"

আলতাফের প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখে পরিতোষ চুপ ক'রে গেল। যদিও বলবার তার অনেক কিছুই ছিল। স্বয়ং শশধর বাবুও চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু উঠে দাঁড়াল গণপতি।

গণপতি খুব ভালো ছেলে নয়, কিন্তু ইতিহাসের অনেক খবর সে পড়ে। নির্ভীক্ কণ্ঠে গণপতি বললে, "একটুও মিথ্যে নয়, খাঁটি সত্যি।"

আলতাফও গলা চড়িয়ে জবাব দিলে, "ডাহা মিথ্যে নয় স্যর ?"

শশধর বাবু প্রমাদ গণলেন। জনপ্রিয় হবার জন্য ইতিহাসের ক্লাসে প্রায়ই তিনি বর্তমান ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতেন, কিন্তু এখন তিনি কৌশলে আলোচনাটা পরিহার করবারই একটা পথ খুঁজছিলেন। আলতাফ্ যে এমনি ক'রে তাঁর ওপরে শেষ বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বিপদে ফেলবে তা তিনি ভাবেন নি। সুতরাং অপ্রস্তুত হয়ে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন,—"মানে, আপাতদৃষ্টিতে সেই রকম মনে হ'লেও, রাজনীতির খাতিরে তাও—"

বাধা দিয়ে গণপতি বললে, "কোন নীতির খাতিরে সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না স্যর ! সত্যি যা তা চিরদিন সত্যি।"

কিন্তু সত্য সম্বন্ধে গণপতির ধারণা যাই হোক্ শশধর বাবুর ধারণা অন্য রকম। সুতরাং গণপতির কথা তিনি চটে উঠে বললেন, "চুপ কর। সত্যি কথা তোমায় বক্তৃতা দিতে বলি নি।"

পতি বললে, "বক্তৃতার কথা তো নয় স্যর! যা তাই আপনি আলতাফের কথায় সত্যি বলে নিতে চাইছেন। সেইখানেই আমার আপত্তি।"

র্তের মধ্যে গোটাকত কথা এক সঙ্গে শশধর বাবুর বলক দিয়ে গেল। ইস্কুলটা সরকারী, সালটাও তেয়ান্ন। সময়টা সুবিধার নয়। রাগে কাঁপতে শশধর বাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, "চুপ কর, আমার সঙ্গে! বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে। যাও।"

পতি নির্বিকার ভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

য় সত্যিই খারাপ ; স্কুলের শান্তিপ্রয়াসী কর্তৃপক্ষ র তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্তমান পরিস্থিতিতে যোগ্য নয় বিবেচনা ক'রে তাকে ইস্কুলে রাখতে আপত্তি জানালেন।

পতির বাবা শ্রীপতি সরকারী চাকুরে।

পার শুনে শ্রীপতি ছেলেকে ডেকে ধম্‌কালেন, লম্বা লম্বা বুলি ছেড়ে এক্ষুনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ক্ষমা চেয়ে এস। প্রেসিডেণ্ট ক্ষমা করলে হেড-মশাই আর কিছু করবেন না। যাও।"

পতি বললে, "যেতে পারি, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা বদলে যাবে কি ?"

পতি রক্তচক্ষু তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "যাও বলছি !"

পতি গেল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নয় ; কোথায়, জানলে না। বাপের ধমক খেয়ে গণপতি সেই যে বেরুল, তিন মাসের মধ্যে আর তার কোন সন্ধানই না। এদিকে তার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনায় সহর র হয়ে উঠল। কেউ বললে—অনুতাপে আত্মহত্যা ছে, কেউ বললে—ইন্দোনেশিয়ায় প্রাণ দিতে গেছে, কেউ আলতাফের দিকে ইসারা ক'রে আরও কিছু করতেও ছাড়লে না। অবশেষে শেষের অনুমানটাই স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়ে সহরে দারুণ একটা সঞ্চার করেছে তখন সকলকে অবাক্ করে দিয়ে একদিন গণপতি এসে উপস্থিত হ'ল।

পরনে তার আঁটসাঁট পায়জামা, গায়ে আচ্‌কান, ফেজ্ টুপি। গণপতি আর নাম নয়, নাম আবদুল

গণপতি মুসলমান হয়েছে।

সারা সহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বলপূর্ব্বক ধর্মান্তর-করণের অনুমানে গোপনে যাঁরা উত্তেজিত হয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ গণপতিকে আড়ালে শুদ্ধির পরামর্শ দিয়ে তাকে অভয় দিতেও ভুললেন না, কিন্তু সকলের সব উপদেশ গণপতি ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিলে 'তো-ও-বা' ব'লে। এর পর সবাই তাকে পরিহার করে চলতে লাগল।

গণপতি কিন্তু তা'তে এতটুকুও দমল না। বাজারের কাছে ছোট একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সে নির্বিকার চিত্তে কাটাতে লাগল। কোথা থেকে তার খরচ আসে, কেউ খোঁজ নিয়ে দেখাও প্রয়োজন মনে করলে না।

কিছুদিন পর গণপতি ইস্কুলে এল নতুন ক'রে ভর্তি হবার জন্যে।

হেডমাষ্টার মশায় মাথা চুলকাতে সুরু করলেন, কিন্তু এবার তিনি নিরুপায়। খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বিনা আপত্তিতে গণপতিকে ভর্তি ক'রে নেওয়া হ'ল।

গণপতি নিঝ্‌ঝাটে পড়াশুনায় মন দিলে।

আরো মাস তিনেক কেটে গেল।

সহরে গভীর আতঙ্ক। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নানা জায়গার মত এ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে না কে বলতে পারে ? শান্তি কমিটীর ঘন ঘন মিছিল ক্রমেই লোকের মনে অশান্তি ঘনিয়ে তুলছে। সভা-সমিতির বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে, ঐক্যকে যেমন ক'রে হোক টেনে হিঁচড়ে প্রতিষ্ঠা করাই চাই।

এমনি এক সভায় দু'-তিন হাজার লোকের সামনে ছেলেরা একের পর এক স্বরচিত প্রবন্ধ পড়ছে, বিষয়—সাম্প্রদায়িক ঐক্য। পরিতোষের পরই মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল গণগতি, হাতে তার প্রবন্ধ। সভার মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। আন্তরিক বিতৃষ্ণা গোপন ক'রে জরুরী কাজের ওজুহাতে কেউ কেউ উঠেও গেলেন, কিন্তু গণপতির সে দিকে লক্ষ্য নেই। অচঞ্চল ভাবে এক মনে সে পড়ে চলেছে,—"এ বিরোধ আজকের নয়, ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর সাক্ষ্য। হিন্দু সমাজ আমাদের

অবজ্ঞা দেখিয়েছে, আমরাও তাই শোধ নিয়েছি। তার সাক্ষ্য কালাপাহাড়, তার সাক্ষ্য নাদির শাহ, তার সাক্ষ্য বাদশাহ ঔরংজেব। কিন্তু ভাই সব, সে সব দিন কবে মরে গেছে। নতুন দিনের নতুন আলোর সন্ধানী আমরা, আজও কি সেই পুরানো দিনের হিসাব-নিকাশ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি ক'রে মরব? ইতিহাসে যা ধরে রেখেছে তা' সত্যি, তাকে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। কিন্তু যে ইতিহাস আজও লেখা হয় নি সেখানেও কি আমরা এ লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব না? সব ধর্মের চেয়ে মানুষের ধর্ম কি বড় হয়ে দেখা দেবে না? যদি তা না দেয় তবে পচা ইতিহাস বিসর্জ্জন দাও; নোংরা আবর্জনার মত তাকে ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে আবার নতুন ক'রে মানুষের ইতিহাস আরম্ভ হ'তে দাও। জাতি যায় যাক, ধর্ম যায় যাক, রাজ্য যায় যাক,—শুধু নতুন ক'রে বেঁচে উঠুক আর বেঁচে উঠুক তার চিরকালের মনুষ্যত্ব।"

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গণপতির কণ্ঠ চাপা পড়ে। হেডমাষ্টার মশায় মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে শশধর বাবু ভাবের আবেগে ছুটে এসে তাকে বুকে ধরলেন। সমবেত হিন্দু-মুসলমান একবাক্যে প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠল।

সভার শেষে গণপতিকে কিন্তু কোথাও খুঁজে গেল না। যেখানে সে থাকত সেই ছোট ঘর অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল বিছানায় তার পায়জামা, আচ্‌কান, টুপি রয়েছে, কিন্তু সে নেই!

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে লালা অমরনাথের নেতৃত্বে সতেরো জন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছেন সে খবর তোমরা আগেই পাইয়াছ। মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, মোদি, ফজল মামুদ প্রভৃতি নামকরা খেলোয়াড়েরা এই সঙ্গে যাইতে না পারায় ভারতীয় দল কিছুটা দুর্ব্বল হইয়াছে বলা যাইতে পারে তবে ভারতীয় দলে এবার অনেক তরুণ খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এই সতেরো জন খেলোয়াড়ের নাম: অমরনাথ (অধিনায়ক), পি. সেন, কিষেণচাঁদ, ফাদকার, ভিন্নু, মানকড়, সারভাতে, বিজয় হাজারে, আমীর ইলাহি, সি. এস. নাইডু, রঙ্গচারী, রণবীর সিংজী, বন্দে রায়সিং, অধিকারী, ইরাণী, গুল মহম্মদ ও সো ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী—নয় জনই নবাগত।

ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব্বপ্রথম খেলে ১৭ই অ পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, পার্থে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ৪ দিনের খেলাটি মাত্র দুই দিন খেলা সম্ভব নয়। অষ্ট্রেলিয়া করে ১ম ইনিস্‌এ ১৭১, ২য় ইনিস্‌এ উইকেট)। অধিনায়ক হন কারমোডী। ভারতীয় দল ১ম ইনিংস্‌এ ১২৭ (মানকড় ৫৭)। কাজেই ফলাফল অমীমাংসিত।

দ্বিতীয় খেলাটিতে (এডিলেডে) ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যাট

ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ান একা- র বিপক্ষে। চারদিন ব্যাপী এই আকর্ষণীয় খেলাটিও ন্য সময়াভাবে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

লাফল :— দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৫১৮ উইকেট)। (ব্র্যাডম্যান ১৫৬, নাইহাস ১৩৭, ক্রেগ । ২য় ইনিংস ২১৯ (৮ উইকেট)। (নাইহাস ৪৯, ডম্যান ১২)।

ভারতীয় দল—১ম ইনিংস ৪৫১। (অমরনাথ ১৪৪, রে ৯৫, বিন্নু মানকড় ৫৭)। ২য় ইনিংস ২৩৫ উইকেট)। (মানকড় ১১৬ (নট আউট), অমরনাথ ৯৪ আউট)।

এই খেলাটির পর হইতেই ভারতীয় দল ওখানে বেশ য় অর্জ্জন করে।

এর পর তৃতীয় খেলা হয় মেলবোর্ণে, অষ্ট্রেলিয়ার পেক্ষা শক্তিশালী ষ্টেট টীম ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে। রও ফল হয় অমীমাংসিত—ভিক্টোরিয়া: ১ম ইনিংস (হার্ভে ৮৭, লক্সটন ৭৭); ২য় ইনিংস ১৩৮ (২ উইকেট) সেট ৬৭ নট আউট)।

ভারতীয় একাদশ: ১ম ইনিংস ৪০৩ (অমরনাথ নট আউট)। ২য় ইনিংস ২০৩ (হাজারে ৮৩, কড় ৫৯)।

চতুর্থ খেলাটিতে কিন্তু ভারতের ভাগ্য দেখা দেয় প। অমরনাথ অসুস্থতাবশতঃ শেষ পর্য্যন্ত মাঠে তে না পারায় ভারতীয় দলকে দশ জনের উপর নির্ভর য়া নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে সিডনীতে দ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। বিজয় হাজারে দলের অধি- ত্ব করেন। ফলাফল :— নিউ সাউথ ওয়েলস: ১ম স ৫৬১ (৮ উইকেট)। (অধিনায়ক মরিস , মরনে ৯৬)।

ভারতীয় একাদশ করে ১ম ইনিংসএ ২৯৮ (বিজয় ে ১৪২)। ২য় ইনিংসএ ২১৫ (অধিকারী ৬৫)। ফলে ীয় দলকে এক ইনিংস ও ৪৮ রানে পরাজয় স্বীকার তে হয়।

সিডনীতে ১৫ই নভেম্বর হইতে ভারতীয় একাদশকে দ্বন্দ্বিতা করিতে হয় আবার ডন ব্র্যাডম্যানের ায়কত্বে একটি সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়ান একাদশের বিরুদ্ধে। খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। ব্র্যাডম্যান ১ম শ্রেণীর খেলায় তাঁহার জীবনের শততম সেঞ্চুরি এই ম্যাচে পূর্ণ করেন।

ফলাফল :— অষ্ট্রেলিয়ান দল: ১ম ইনিংস ৩৮০ (ব্র্যাডম্যান ১৭২), ২য় ইনিংস্‌ ২০৩ (ব্র্যাডম্যান ২৬)। মানকড় ৮৪ রাণে ৮টি উইকেট পান।

ভারতীয় দল :—১ম ইনিংস্‌এ ৩২৬ (গুল মহম্মদ ৮৬, কিষেণচাঁদ ৭৫ (নট আউট)। শেষ মুহূর্ত্তে ভারতীয় একাদশ ৪৭ রানে বিজয়ী হয়।

ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত কুইনস্‌ল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলাটিও আগের ন্যায় নাটকীয় পরিণতি লাভ করে। কুইনস্‌ল্যাণ্ডের অধিনায়কত্ব করেন ব্রাউন। ভারতীয় দল এই খেলায় ২৪ রানে পরাজিত হয়। কুইনসল্যাণ্ড করে ১ম ইনিংসএ ৩৪১ (মরিস ১১৫), ২য় ইনিংসএ ২৬৯ (৭ উইকেট), (ম্যাককুল ১০১ নট আউট)।

ভারতীয় দল করে ১ম ইনিংস্‌এ ৩৬৯ (অমরনাথ ১৭২ (নট আউট)। ২য় ইনিংস্‌এ ২১৭ (আমীর ইলাহি ৪৪)।

ইহার পরই প্রথম টেষ্ট খেলা। ভারতের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার এই ধরণের খেলা এই প্রথম।

অষ্ট্রেলিয়া দলের টেষ্ট ক্যাপ্‌টেন ডন ব্র্যাডম্যান্‌ ভারতীয় টেষ্ট ক্যাপ্‌টেন অমরনাথকে টসে পরাজিত করিয়া ব্যাটিং সুরু করেন। রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে অষ্ট্রেলিয়া সারাদিন খেলিয়া দিনের শেষে ৩ উইকেটে ২৭৩ রান করে। ব্র্যাডম্যান তখনও ১৬০ রান করিয়া অপরাজিত।

দ্বিতীয় দিন হইতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে অল্পক্ষণ খেলা চলে। কিন্তু তা সত্বেও চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় কম পক্ষে দশ সহস্র দর্শক সেই ঝড়-জল উপেক্ষা করিয়া ব্র্যাডম্যানের খেলা দেখিতে মাঠে সমবেত হয়। ব্র্যাডম্যান এই দিনও ১৭৯ রান করিয়া অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে সুরু হয় মুষলধারে বর্ষণ। কর্দ্দমাক্ত মাঠ আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ফলে ব্র্যাড্‌ম্যান্‌ ১৮৫ রান করিয়া অমরনাথের বলে "হিট উইকেট" আউট হন। একটির পর একটি খেলোয়াড় পরাজিত হইতে হইতে থাকেন, এবং ৮ উইকেটে ৩৮২ রান করিবার পর ব্র্যাডম্যান্‌ দলের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া

ইনিংস সমাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। অমরনাথ ৮৪ রানে ৪টি, এবং মানকড় ১১৩ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

সেই কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল মাঠে ভারতীয় দল তাহাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে। এই মাঠে আর যাহাই সম্ভব হউক, প্রকৃত ক্রিকেট খেলা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। একটির পর একটি করিয়া ভারতীয় দলের উইকেট পড়িতে থাকে। মানকড়, গুল মহম্মদ প্রভৃতি ধুরন্ধর খেলোয়াড়গণ কোনও রান করিবার পূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করেন। মিলারের মারাত্মক বল বুলেট শটের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ছুটিতে থাকে। লিণ্ডওয়ালের বল সকলের ত্রাসের সঞ্চার করে। টোসাককে কাদা মুছিয়া বল্ করিতে দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ফিল্‌ডিং একেবারে নিখুঁত হয়। ফলে সমগ্র টীম অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সকলকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া মাত্র ৫৮ রানে শেষ হইয়া যায়। একমাত্র অমরনাথ, সারভাতে এবং হাজারে ব্যতীত আর কেহ দশের উপর রান্ করিতে পারেন নাই। অমরনাথ করেন ২২, সারভাতে ১২, এবং হাজারে ১০। ভাব ব্যাপারটা! টোসাক ২ রানে ৫ উইকেট দখল পৃথিবীর টেষ্ট ইতিহাসে নূতন রেকর্ড স্থাপন ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে হয়। ইনিংসেও প্রথম ইনিংসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং টো মারাত্মক বলে সমগ্র টীম ৯৮ রান করিয়া বিদায় করে। সারভাতের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা তিন দিন ব্যাপী মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে অদ্ভুত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

প্রথম টেষ্টে ভারতীয় দল এইভাবে পরাজিত হ কেহই তাহাদের সে জন্য দায়ী মনে করে নাই। প্রা দুর্য্যোগ এবং মাঠের দুরবস্থাই যে এর কারণ পৃথিবী সকল সংবাদপত্রই তা স্বীকার করিয়াছেন এবং অ ইহাও বলিয়াছেন যে এরূপ আবহাওয়ায় যাহারা জেতে তাহাদেরই জয় প্রায় অবধারিত।

দেখা যাক্ পরের টেষ্ট খেলাগুলিতে কি হয়!

কুড়ান গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়া নামে একটা জায়গা আছে। সেইখানে এক শিকারী বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল সিডিভার। সিডিভারের দৃষ্টি ছিল যেমন তীক্ষ্ণ লক্ষ্যও ছিল তেমনি অব্যর্থ। তিনি যেখানে থাকতেন সে অঞ্চলটা ছিল পাহাড়ে ঘেরা।

একটি ছোট রেড ইণ্ডিয়ান্ ছেলে শিকারের সময় সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। সিডিভারও তাকে খুব পছন্দ করতেন। শিকারে কোন পাখী বা হরিণ মারা পড়লে ছেলেটিই আগে দৌড়ে যেত সেটা তুলে আনতে, তার পর পরের কাজ দু'জনে মিলে পরম আরামে ক করতেন।

একদিন শিকারী ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে পাহা পথে চলেছেন। ডাইনে বাঁয়ে দু' দিকেই খাড়া পা মাঝখানকার সরু পথ ধরে দু' জনে চলেছেন। দেখা গেল সম্মুখে দু'টি ধূসর রংএর ভীষণকায় ভা ভালুক দু'টি সেই সংকীর্ণ পাহাড়ে পথ বেয়ে দ্রুত তাঁদেরই দিকে ছুটে আসছে উপর থেকে।

ছেলেটি ভালুক দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল

বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিল। তাই দেখে একটা ক তার পেছনে তাড়া করল।

এর পরে কি ঘটবে তা বুঝতে সিডিভারের দেরী হ'ল তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভালুকটার দিকে বন্দুক রেন। কিন্তু তখন তাঁর কাছে ছিল মাত্র একটা টা। এটা ফুরিয়ে গেলে আত্মরক্ষার আর কোনই য় থাকবে না। কিন্তু ভাববার সময় নেই। পরক্ষণেই কারীর বন্দুক গর্জ্জে উঠল। গুলি সেই আক্রমণকারী লুকের দেহ এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে গেল।

এবার অন্য ভালুকটা প্রচণ্ড বেগে শিকারীর দিকে ড়া করে এল। শিকারীর টোটা ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু স আর উপস্থিতবুদ্ধি তখনও ফুরোয় নি। হাতে টা বন্দুক আছে বটে কিন্তু গুলিহীন, সেই বন্দুক লুকের বিশাল থাবার কাছে একটা তৃণখণ্ড ছাড়া আর ই নয়। কিন্তু তবু তিনি একটুও ভড়কালেন না। দৃষ্টিতে ভালুকের চোখের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে লেন।

ব্যাপার দেখে ভালুকও কম আশ্চর্য্য হয় নি। সে একটু থেমে আবার এগিয়ে আসতে লাগল; কিন্তু এবার আর অত জোরে নয়।

শিকারী কিন্তু তখনও তেমনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অবশ্য কান পেতে তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন শুনলে হয়তো তার দ্রুততা বোঝা যেত। কিন্তু ভালুকের পক্ষে তো তা আন্দাজ করা সম্ভব নয়! ভালুক আবার দাঁড়াল এবং আরও বিস্মিত চোখে শিকারীকে দেখতে লাগল।

সিডিভার ভালুকের চোখের উপর নিজের দৃষ্টি তেমনি স্থির ভাবে নিবদ্ধ ক'রে রাখলেন, এক চুলও নড়লেন না। ভালুক এবার ফিরল, তার পর ধীরে ধীরে চলে গেল।

অতর্কিতে বিপদে পড়লে না ঘাবড়ে উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্য নিলে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় এই ঘটনাটা তার একটা চমৎকার উদাহরণ, নয় কি? অবশ্যি শিকারীর সাহস আর ছেলেটির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ এ দু'টির কথাও ভুললে চলবে না।*

*এমাস নের গল্প থেকে।

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতির ত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন রাষ্ট্রপতি ছেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তোমরা বোধ হয় জান রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ ছাড়া ভারতীয় গণপরিষদেরও সভা- এবং ভারতের খাদ্যসচিব। সম্প্রতি তাঁর বয়স ৬০ উত্তীর্ণ হয়েছে।

* * * *

সম্প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বাঙ্গালীর এত দীর্ঘায়ু লোক বড় একটা দেখা যায় না। বোধ এত দিন তিনিই এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ক ছিলেন।

রসিকমোহন নানা শাস্ত্রে—বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন, লেখক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। প্রথম যুগের আনন্দবাজার পত্রিকার (সাপ্তাহিক) তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সে বোধ হয় ৮২।৮৩ বছর আগেকার কথা। গত বছরেও তাঁকে দেখেছি চার দিকে বইপত্র নিয়ে পড়াশোনায় ডুবে আছেন।

রসিকমোহন রামধনু-সম্পাদক মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর উপনয়নের সময়ে তিনিই হয়েছিলেন তাঁর আচার্য্য গুরু।

* * * *

ধূমকেতুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। বিরাট আকারের এই অদ্ভুত জিনিষটি হঠাৎ একদিন এসে

আকাশে দেখা দেয়, তার পর কোথায় যে চলে যায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্যি বিজ্ঞানীরা জানেন যে একদিন না একদিন সে আবার ফিরে আসবেই, কারণ সূর্য্যকেই সে প্রদক্ষিণ করছে।

সম্প্রতি এই রকম একটি নতুন ধূমকেতু আকাশে দেখা দিয়েছে। কলকাতার বিজ্ঞানীরা অবশ্যি এখনও একে খুঁজে পান নি কিন্তু ভারতের কোন কোন জায়গা থেকে—যেমন কোদাইকানাল মানমন্দির থেকে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে, একে দূরবীণ দিয়ে দেখা গেছে। সব চেয়ে ভাল ক'রে দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে। আমেরি-। থেকে নাকি খালি চোখেই দেখা গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ধূমকেতুটির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। মনে হচ্ছে ধূমকেতুটি যেন চিরে এবং হয়তো কিছু দিন পরেই এটি দু'টি পৃথক্ ধূমকে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, এই ধূমকেতুটির বা লেজের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ—এবং একটি লেজের কম ক'রে ৫ কোটি মাইল।

* * * *

অষ্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেষ্ট ম্যাচ্ সুরু হয়েছিল কিন্তু এই খেলার সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে খেলা শেষ পর্য্যন্ত শেষ হ'তে পারে ১ম ইনিংস্এ ভারতীয় দল করেছিল মোটে ১৮৮ আর অষ্ট্রেলিয়া দল আরও কম—মোটে ১০৭ ২য় ইনিংস্এ ভারতীয় দল সবাই আউট হবার আ সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক) হাতের সাহায্যে :—(১) চাকর (২) ব্যাকরণ (৩) সুধাকর (৪) করতোয়া (৫) মাকর। কর=হাত।

(খ) পায়ের সাহায্যে :—(১) ধ্রুপদ (২) শ্বাপদ (৩) পদবী (৪) পদক (৫) আপদ। পদ=পা।

উত্তরদাতাদের নাম :—নবেন্দু সেন (কলিকাতা ২৯); অরুণা ও রীণা সেনগুপ্তা (পাটনা); গৌরাংগ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); চিত্রভানু বন্দ্যোপা (ভবানীপুর); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); রেণু দিদিমা, অর্দ্ধেন্দু, খোকা, অর্চ্চনা দেবী (জলপাইগু তরুণকুমার সান্যাল, মা, রাঙ্গাদি, বিশু, ডলি, অপু, বাবলু, যতী, হরি, রেখাদি' (দুবলহাটী); নূরজা বেগম (ঢাকা); শৈল দেবী (দিল্লী); কাজল ও (এলাহাবাদ)।

নূতন ধাঁধা

সে জিনিষ আগের দিনও ছিল, পরের দিনও থাকবে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কেউই তার নাগাল পায় নি, দিন পাবেও না! বলতে পার কি সে?

পড়ে দেখ

কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে 'অল ইণ্ডিয়া একজিবিশন' হবে। একজিবিশন থাকবে একমাস। এত বড় একজিবিশন গত পঁচিশ বছরের মধ্যে স্বাধীন ভারতের আর কোথাও হয় নি। এ একটি "ছোটদের মহল" ও থাকবে। সেই মহলে থাকবে ছোটদের আঁকা ছবি, তৈরী হাতের কাজ, গড়া পুতু সংগ্রহ. শিশু-সাহিত্য, শিশু-পত্রিকাদি। ম্যাজিক, নাটক, নাচ-গান, সিনেমাদি আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু তোমরা যদি এ কাজে না এগিয়ে আস তাহলে কিছুই হবে না। তাই তোমাদের আঁকা ছবি, তৈরী হাতে কাজ, গড়া পুতুল, সংগ্রহাদি আগামী ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ সনের মধ্যে প্রদর্শনীর ছোটদের মহলের অধি পাঠাবে। মনে রেখ, তোমাদের প্রতিযোগী হবে স্বাধীন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছেলেমেয়েরা। তাদের চে উৎকৃষ্ট হওয়া চাই-ই। আর চাই তোমাদের মহলকে রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর করে গড়ে তোলা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদক, ছোটদের মহল, অল ইণ্ডিয়া একজিবিশন। ৪১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কার্ত্তিক মাসের রামধনুর পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট্
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—।৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম্ দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

—য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস—

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

—সব্যসাচী বিরচিত—
১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার
১১। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন
১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৩। মিঃ গশ্ ডিটেক্‌টিভ

বুদ্ধদেব বসু
১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু
১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
২১। গ্রহের ফের
২২। রত্নতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল্, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত

দেব সাহিত্য-কুটীর ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C.—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়; কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন:- কলিঃ - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

Regd. No. C.—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের ধাড়বার সময়; কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন:-কলিঃ - ১৬০৬

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPO

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের	
পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ...	১৷৷৹	আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ...	১৷৹
সোনার হরিণ (ঐ) ...	১৷৷৹	বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ)	১৲
চায়ের ধোঁয়া (গল্প) ...	৸৹	আবিষ্কারের গল্প ...	৸৹
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ...	৸৶৹	ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ...	৸৹
নূতন পুরাণ (ঐ) ...	৸৶৹	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর	
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর		ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸৹
রং-চং (গল্প) ...	৸৹	মনোরঞ্জন ও শিবরামের	
শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত		এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ...	৸৶৹
দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স	৷৷৶৹	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের	
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের		দিগ্বিজয়ী বীর ...	৸৹
নতুন কিছু (গল্প) ...	৸৶৹	মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ...	৸৹
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের			
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ...	১৷৹	ঐ ২য় ...	৸৹

ভট্টাচার্য গুপ্ত এণ্ড কোংলিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোকরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৹ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-কুমারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙ্গীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ৷৶৹ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যাস। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িতে বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীদের হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।

—আনন্দবাজার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ | **কৈশোরক** | বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যিক দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা' ও বিশ্বগুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খানা উপন্যাস চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

বুক কাঁপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম ১।০

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল
প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর

মুখস যখন খুলে গেল
তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাষ্ঠের ড্রাগন
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

হত্যা যাদের নেশা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র

সীমান্তের বন্ধু (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার গল্প)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গল্পের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ॥৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ্, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

সুসংবাদ

শীঘ্রই দেখা দিবে

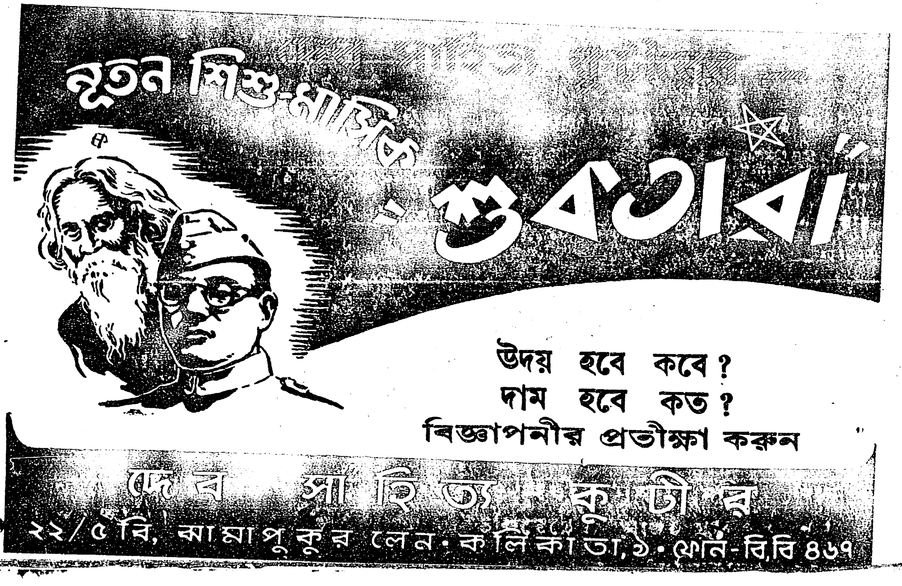

রামধনু—

জনগণমন-অধিনায়ক

শ্রীবুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৫৪ | ১০ম সংখ্যা

সোমনাথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রভাস বেলায় সোমনাথ মন্দির,
আলোকিত যার আলোকে সিন্ধুনীর,
ধর্ম্মান্ধের স্বভাবসুলভ কোপ
জয়ী হবে—করি তাহার চিহ্ন লোপ।
রেখে গেল ব্যাধ বিষ-শায়কের ক্ষত
ভারতের বুকে—কত শতাব্দী গত।
গুরু শোকবহ সেই সংঘাত স্মৃতি
করে অবরোধ জাতিতে জাতিতে প্রীতি।

শিব বাদ দিয়ে শান্তি মিলিবে কুতঃ,
শুধু বিদ্বেষ হতেছে পুঞ্জীভূত।
স্বাধীন ভারতে আজি মঙ্গল দিনে
রেখ না আর সে দুষ্ট ক্ষতের চিনে।
গড় মন্দির—মহা মন্দির গড়—
যাহা ছিল তার চেয়েও মহত্তর।
এসেছে এবার, শোনো সবে পাতি কান,
ভাঙিবার নয়, গড়িবার আহ্বান।

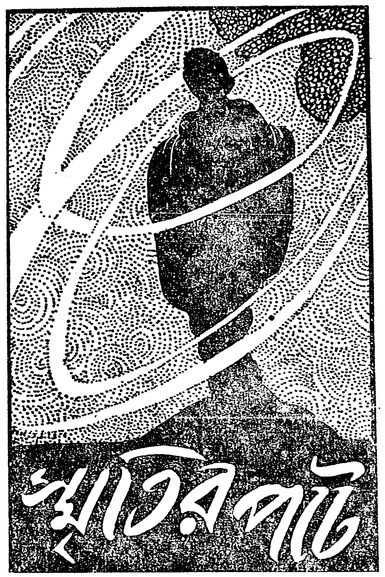

রামগড়ের জঙ্গলে

শ্রীহীরালাল মিত্র

ইংরাজী ১৯০৭ সনে আমি চট্টগ্রামের ডাক বিভাগের পরিদর্শক ছিলাম। সে সময়ে চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে রেল-গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং নৌকাযোগেই মফঃস্বলে যাতায়াত করিতে হইত। আমার একখানা মাসিক ভাড়া করা নৌকা ছিল। তাহাতে চড়িয়া চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতাম। চট্টগ্রাম সহরের গায়েই প্রকাণ্ড "কর্ণফুলি" নদী। নৌকা তাহাতেই থাকিত। তৎকালে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, বহুদূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে 'রামগড়' নামে একটি গ্রাম ছিল। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই 'মগ' নামে পরিচিত। তাহারা অর্দ্ধ-অসভ্য, শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারিত না, যদিও ইহাদের বেশীর ভাগ ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এই সব মগকে খৃষ্টান করিবার জন্য কয়েকজন খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক তথায় প্রেরিত হন। সরকার হইতে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য এই রামগড়ে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস স্থাপিত হয়। এ স্থান এক প্রকার অগম্য ছিল। বিশাল অরণ্য ও দুরা[illegible]রোহ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তথায় স্থলপথে [illegible] পথ যাইতে হইত। আমার আগে ডাক বিভাগের আ[illegible] কোন পরিদর্শকই সেই সমস্ত দুর্লজ্ঘ্য ও দুরতিক্রম্য পর্ব্বত-শ্রেণী পার হইয়া সেখানে যাইতে সাহসী হন নাই। এ[illegible] সমস্ত জঙ্গলে ও পাহাড়ে বহু সংখ্যক হিংস্র জন্তু বা[illegible] করিত। বাঘ, ভালুক, বন্য কুকুর ও বন্য হাতী—কিছু[illegible] বাদ ছিল না। এই স্থানে হাতী ধরিবার জন্য গভর্ণমেন্টে[illegible] খেদা ছিল। বিখ্যাত এণ্ডারসন সাহেব এক সময় এ[illegible] খেদার কর্ত্তা ছিলেন। তিনি হাতী ধরা সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন।

রামগড় পোষ্ট অফিস বহুদিন পর্য্যন্ত পরিদর্শন [illegible] হওয়াতে উপর হইতে পরিদর্শন করার জন্য চাপ আসি[illegible] লাগিল। সুতরাং বাধ্য হইয়াই একদিন সেখানে যাইবা[illegible] সংকল্প করিলাম। ১৯০৭ সনের ১৫ই ডিসেম্বর নৌকাযো[illegible] "ফটিকচারী" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে এক[illegible] বড় পোষ্ট অফিস ছিল, উহাতে টেলিগ্রাফের কাজও চলিত[illegible] এই সময় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে মহাশয় তথায় সা[illegible] পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। তিনি অতি সদাশয় ও অমায়ি[illegible] লোক ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় শান্তশি[illegible] পরোপকারী কর্ম্মচারী ডাকবিভাগে অতি অল্পই দেখিয়াছি[illegible] দু'দিন ফটিকচারীতে থাকিয়া উক্ত অফিস পরিদর্শন করি-লাম। এই স্থানে মুনসেফ, সাব রেজিষ্ট্রার, পুলিসে[illegible] দারোগা প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীরা ছিলেন, তাঁহাদে[illegible] সহিতও আলাপ-পরিচয় হইল।

আমি "রামগড় পর্য্যন্ত যাইব শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টা[illegible] বাবু আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, [illegible] অতিশয় বিপদ্‌সঙ্কুল। একবার রওনা হইলে জীবিত অ[illegible] স্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আশা খুবই কম। তিনি আমা[illegible] সঙ্গে লইয়া মাঠের মধ্যে গেলেন; অন্ধকারময় কৃষ্ণ[illegible] পাহাড়শ্রেণী দেখাইয়া বলিলেন, "আপনাকে ঐ দুর্ভে[illegible] অন্ধকারময় পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। [illegible] একেবারে দুর্গম, তার উপর আগাগোড়া গহন অর[illegible] পূর্ণ। সে অরণ্য আবার ভীষণ হিংস্র জন্তু[illegible] পরিপূর্ণ। তার পর মধ্যে মধ্যে ওখানে দাবানল [illegible] ওঠে, এবং সে অগ্নিরাশি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। [illegible] হঠাৎ পাহাড়ের মধ্যে বৃষ্টি সুরু হ'লে পাহাড়ে ঢল [illegible]ম,—মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি যা সম্মুখে পড়ে তা-ই [illegible]সিয়ে নিয়ে যায়।" আমার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ [illegible] ইনস্‌পেকটার ছিলেন। তিনি রামগড় যাইতে [illegible] করিয়াছিলেন। হঠাৎ পর্ব্বতে ঢল নামিয়া তাঁহাকে [illegible] পর্য্যন্ত ভাসাইয়া নেয় এবং তিনি অতি কষ্টে কোন [illegible] জীবন রক্ষা করিয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। তিনিও [illegible] শুনিলেন যে আমাকে তথায় যাইতেই হইবে, তখন [illegible]ন ওভারসীয়ারকে সঙ্গে লইতে পরামর্শ দিলেন। [illegible] তাঁহার কথা মত চট্টগ্রামের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible]াদুরকে টেলিগ্রাফ করিলাম। কিন্তু তিনি জবাব [illegible]লেন, "এখন সঙ্গে দিবার মত লোক নাই। দুঃখিত।" [illegible]ন নিরুপায় হইয়া নৌকা ঐ স্থানে রাখিয়া চাপরাশী [illegible] পদব্রজেই রওনা হইলাম।

১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে ৭টার সময় জলযোগ করিয়া [illegible] হইলাম এবং ১০টার মধ্যে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী [illegible]পুর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে একটা [illegible] ডি. এ. ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস ছিল। পোষ্ট মাষ্টার এক [illegible] সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান যুবক। তিনি পোষ্ট অফিসে [illegible]সিক ১০ টাকা বেতন পাইতেন ও স্থানীয় সাব্‌ রেজিষ্ট্রী [illegible]ফিসে কেরানির কাজ করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের [illegible]দারী ছিল, এখন অবস্থা হীন হওয়াতে সামান্য [illegible]কুরী করিতেছেন। তিনি স্কুলেও মাষ্টারী করিতেন। [illegible]নি আমাকে বিশেষ সমাদর ও যত্ন করিলেন ও [illegible]নীয় সাব্‌ রেজিষ্ট্রার পেনহেইরো সাহেবের সঙ্গে [illegible]লাপ করাইয়া দিলেন। সাহেবের গৃহে চা-পানের [illegible]মন্ত্রণ সারিয়া বৈকালে পোষ্ট মাষ্টার সাহেবের গৃহে [illegible]লাম। তাঁহার গৃহের বহু মূল্যবান্‌ আসবাবপত্রাদি [illegible]খিয়া বুঝিলাম যে এক সময়ে তাঁহাদের অবস্থা খুবই ভাল [illegible]ল। পোষ্ট মাষ্টার সাহেবের আচার-ব্যাবহারও খুবই [illegible]দ্র।

[illegible] ভুজপুরে একটা বাজার ও স্কুল আছে। সপ্তাহে দুই [illegible]ন হাট বসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার [illegible]লেও মাষ্টারী করিতেন। ই. ডি. এ. দের ছুটী বা পেন্‌সন্‌ [illegible]ই, ছুটী লইতে হইলে নিজ দায়িত্বে লোক দিয়া [illegible]াইতে হয়।

২০শে ডিসেম্বর খুব ভোরে ভুজপুর হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া ১২ মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণ-হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নারায়ণ হাটের পাশ দিয়া একটা ছোট নদী প্রবাহিত হইতেছিল। খেয়া নৌকায় উহা পার হইয়া পোষ্ট অফিসে পৌঁছিলাম। নারায়ণ-হাট গ্রামটী ভুজপুর অপেক্ষা অনেক বড়। এখানে খুব বড় একটা বাজার আছে। ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টারের বেতনও বেশী এবং তাঁহার চাকুরী পেনসন পাইবার যোগ্য। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী।

নারায়ণ হাটে দুই দিন কাটিল। আমি তথা হইতে রামগড় যাইব শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবু নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "সেখানে যাওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব, আপনি এখান থেকেই ফিরে যান।" তিনি বলিলেন পথ অতি ভীষণ ও বিপদজনক। সপ্তাহে তথা হইতে তিন দিন মাত্র ডাক যায়। একজন রানার একাকী যাইতে সাহসী হয় না বলিয়া দু'জন স্বতন্ত্র রানার এক সঙ্গে ভীষণ শালবনের মধ্য দিয়া ৬৪ মাইল গমন করে। রানারেরা জাতিতে কায়স্থ ও চাষবাস করে। রামগড়ের রাস্তার মধ্যে কয়েকটা গ্রাম আছে। সেইখানেই তাহাদের বাড়ী। জঙ্গলের মধ্যে উঁচু "টং" বাঁধিয়া রাত্রিতে তথায় অবস্থান করে। শীতকালে দুর্জ্জয় শীতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য টংএর উপরে আগুন জ্বালে। সময় সময় হাতীতে রাত্রিকালে—টং ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। তখন তাহারা উহার উপর হইতে চীৎকার করে, কেরোসিন তেলের টিন বাজায় বা ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে। ইহাতে ভীত হইয়া হাতীর দল পলায়ন করে। দিনের বেলাও মাঝে মাঝে হাতীর পাল আসিয়া ডাকের রাস্তায় শুইয়া থাকে ও সেজন্য ডাক চলাচলের বিলম্ব হয়। ডাক বিলম্বের দরুণ ওভারসীয়ারের কৈফিয়ৎ তলব করিলে হাতীতে রাস্তা অবরোধ করিয়াছিল বলিয়া কৈফিয়ৎ দেয়। রাস্তায় বাঘ, ভালুক, হাতীর ভয় তো আছেই, তাহার উপর বন্য কুকুরের দল দলে দলে বিচরণ করে। তাহারা মানুষ কি অন্য জানোয়ার দেখিলে তাহাদের চক্ষু দু'টী নষ্ট করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

কিন্তু রামগড় আমাকে যাইতেই হইবে। বিপদের কথা শুনিয়া আরও ঝোঁক চাপিল—যাইবই। ২১শে ডিসেম্বর

পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে নানা রূপ বুঝাইয়া আহারান্তে দুই জন রানার ও চাপরাশী সহ প্রাতে ৮টার সময় নারায়ণ-হাট হইতে পদব্রজে রওনা হইলাম। প্রায় এক মাইল চলিয়া ভীষণ শালবনের মধ্যে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষের গুঁড়িতে 'আঠা' জমিয়া আছে। উহা সংগ্রহ করিরা দেখিলাম আমাদের দেশের ধূপের মতন। 'নারায়ণ-হাট' হইতে রামগড় পর্য্যন্ত রীতিমত কোন রাস্তা নাই। জঙ্গলের ভিতর দিয়া মানুষ চলিয়া চলিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই ভীষণ অরণ্য। সেই রাস্তাতেই চলিতে হইল। চলিতে চলিতে বনের মধ্য হইতে হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। রাস্তায় কোন-খানেই মানুষ দেখিতে পাইলাম না। রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে জলাশয় দেখা গেল। চলিতে চলিতে জল পিপাসা পাইতেছিল। তখন ঐ জলাশয়ের ধারে বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া করপুটে জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। রানারেরা বলিল যে হাতীরা সময় সময় দলবদ্ধ ভাবে এই সকল জলাশয়ে স্নান ও জলক্রীড়া করে, শুঁড় দিয়া জল টানিয়া লইয়া একে অন্যের শরীরে ছিটাইয়া দেয়। আবার কখনও বা জলে ডুব দেয়।

বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা রাস্তা দিয়া চলিতেছি, এমন সময় একজন রানার হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ হাতী, ঐ হাতী, ঐ হাতী!" আমি প্রথমে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলাম আমাদের রাস্তায় এক প্রকাণ্ড বুনো হাতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দাঁত দুইটা খুবই প্রকাণ্ড। হঠাৎ হাতী দেখিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম, আর এক পাও নড়িতে পারিলাম না। ঐ সময়ে দৈবক্রমে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ অঞ্চলের এক ব্যক্তি একটা মহিষ লইয়া আসিতেছিল। হাতীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই মহিষের উপর পড়িল। সে একটু থামিয়া হঠাৎ এক পাশের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমি ভয়ে প্রায় অচৈতন্য হইয়া গিয়া-ছিলাম। হাতী চলিয়া গেলে চেতনা ফিরিয়া আসিল। তখন পূর্ব্বাপেক্ষা বেগে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া গেলাম।

এই ভাবে সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা ডাকের আড্ডায় (ষ্টেজ হাট্) আসিয়া পৌছিলাম। আড্ডার নাম মনে নাই। খুব উঁচু মাচার উপর ঘরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে লাম ও সমস্ত দিন চলিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। শ্রান্তি দূর হই পান করিবার ইচ্ছা হইল। আমার সঙ্গে চা ছিল জঙ্গলের মধ্যে দুধ ও চিনি পাওয়া গেল না বলি পান অদৃষ্টে ঘটিল না। তখন আমি শয্যায় শয়ন ক ও অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

আমার সঙ্গের বিছানাপত্র রানারেরাই বহন আনিয়াছিল, অন্য কুলি পাওয়া যায় নাই। রানারগণ ভাত, ডাল ও আলু ভাতে রান্না করিয়া আ জাগাইল ও আহার করিতে দিল। সমস্ত দিন পরি পর অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, সুতরাং সেই ভাতে অমৃততুল্য বোধ হইল। তারপর পুনরায় শয়ন ক মাত্র গভীর ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

রাত্রিতে ভয়ানক শীত বোধ হইল। সঙ্গে লেপ পারি নাই। কম্বলে শীত আট্‌কাইল না। রানারগণ সায় আগুন জ্বালিল ও তাহাতে ঘর একটু গরম হ সে রাত্রিতে হাতীর পালের কোন উপদ্রব হয় নাই, মধ্যে মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শোনা যাইতে লা এমন ভীষণ ভীতিপ্রদ শব্দ আমি আর জীবনে নাই। রাত্রি প্রায় ২টার সময় বিকট শব্দে আমার ভাঙ্গিয়া গেল ও হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। শীত ভোর ৭টার সময় রাত্রি প্রভাত হইল। রানারেরা প্রা রান্না চড়াইল ও আলুভাতে, ভাত ও ডাল রান্না করি সেদিন আর স্নান হইল না। আহার করিয়া পুন ৮টার সময় পদব্রজে রওনা হইলাম। পূর্ব্বের দিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, আজ ২২ মাইল হাঁটিতে হইবে। প্রায় ৫ মাইল চলিবার পর আ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমে পর্ব্বতের এক সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। সুড় ৬০।৭০ হাত দীর্ঘ হইবে। উহার ভিতরে ঢুকিয়া চোখে কিছুই দেখা যায় না, ঘোর অন্ধকারময়। স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে, মাথা নীচু করিয়া,

ানে হামাগুড়ি দিয়া সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিলাম। একটু সাবধান হইলেই পাথরে মাথা ঠুকিয়া রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা। রানারদের হাত ধরিয়া কোনক্রমে ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ পার হইলাম। এইবারে পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে উঠিতে হইবে। কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠিতে হইল। এইবার সেই পাহাড়ের অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। পর্ব্বতের উপর এক প্রকার বাঁশ হাজার হাজার জন্মিয়া আছে। তাহাদের পাতা-লি একেবারে শিমুল গাছের ফুলের ন্যায় লাল রং। এই র্বতের নিম্নভাগেও ঐ সমস্ত বাঁশ বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত য়া আছে। যেদিকে তাকাই সেই দিকের দৃশ্যই একে-ারে লালে লাল।

আমরা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। চড়াই তিক্রম করাতে ভীষণ শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌কম্প হইতে াগিল। মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগি-ম। পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া কি অপরূপ াভাই না দেখিলাম! এক শৃঙ্গের উপর অপর শৃঙ্গ, রপর অন্য শৃঙ্গ—যেন বিশ্বস্রষ্টার শত সহস্র সিংহাসন তা রহিয়াছে। শুনিলাম এই সমস্ত পর্ব্বতে সকল সময়েই ং মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃষ্টি হইলেই হাড়ে "ঢল" নামে। সময় সময় এই সকল পর্ব্বতে মা মেঘ করিয়া ঝড় ও শিলাবৃষ্টিও হইয়া থাকে। তখন বড় বড় শিল পড়ে যে মাথায় পড়িলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইবার াবনা। শিলাবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতও হইয়া থাকে। াতে পর্ব্বতের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায়। মোট এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে হইলে নানারূপ দের সম্ভাবনা। পাহাড়ের শিখরে একটিও গাছ িতে পাইলাম না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নভাগে ভয়ানক বন। সেখানে নানা রকম হিংস্র জন্তু বিচরণ করে।

সমস্ত দিন চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিয়া বেলা ৪টায় ং আকাশ ঘোর অন্ধকারময় হইয়া গেল ও ঝোড়ো ওয়া বহিতে লাগিল। একটু পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল ং বড় বড় শিল পড়িতে লাগিল। এক-একটি শিল য় একটী বেলের মত। উহা মাথায় পড়িলে সঙ্গে সঙ্গেই ব প্রাপ্তি। নিকটে কোন গাছ বা আশ্রয়স্থান নাই, সুতরাং নিরুপায় হইয়া তাড়াতাড়ি বিছানা খুলিয়া কম্বল বাহির করিয়া লইলাম ও পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িয়া আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকিয়া রাখিলাম। রানার ও চাপরাশীও আমারই মতন কম্বল মুড়ি দিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িল। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে থাকার পর আকাশ পরিষ্কার হইল। তখন উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভকরিলাম। ভগবানের দয়াতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম বটে কিন্তু আমার পেণ্টুলেন, কোট প্রভৃতি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল। ৫টার সময় আমরা পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমার শরীর পথশ্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রানারদের বাড়ী এই গ্রামে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গ্রামের মধ্যে কতক দূর হাঁটিয়া রানারদের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ভিজা কাপড়-চোপড় আগুনে শুকাইয়া লইলাম। বলা বাহুল্য তাহাদের বাসা খড়ের তৈরী ও বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। উহাদের বাহিরের ঘরে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। ঘরে কাঠের একখানা চৌকি পাতা ছিল। আমার চাপরাশী তাহার উপরেই আমার বিছানা পাতিল। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হাত-পা, মুখ ধুইলাম। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বেড়ার ফাঁক দিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলেও দেখিলাম স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের ন্যায়ই লজ্জাশীলা। সেখানেও স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠন পরিয়া থাকে ও সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মুখে আসে না। সন্ধ্যার সময় রানারেরা দুধ ও চিনি যোগাড় করিয়া আনিয়া চা প্রস্তুত করিল। সমস্ত দিন পরে চিনি-সংযুক্ত চা পান করিয়া খুব আরাম পাইলাম। রানারেরা রাত্রে কোথা হইতে মৎস্য যোগাড় করিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভাত, ডাল, মাছের ঝোল প্রভৃতি রান্না করিল। রাত্রে বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। মাছের ঝোলে কিছু অতিরিক্ত ঝাল দেওয়া হইয়াছিল, তৎসত্ত্বেও উহা খাইতে বেশ সুস্বাদু বোধ হইল। আহারান্তেই নিদ্রা, কিন্তু তেমন ভাল ঘুম হইল না। পরদিন ভোরেই আবার রওনা হইতে হইবে। সে কাহিনী বারান্তরে শুনাইব।

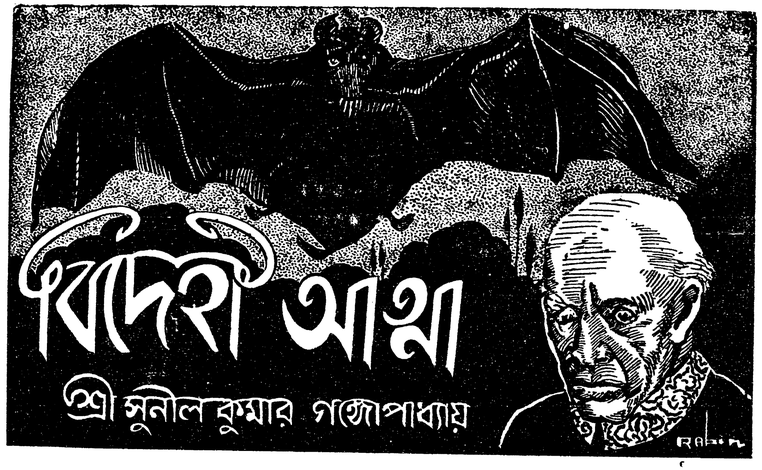

তিন

অশোক লাহিড়ীর ডায়েরী

বৃদ্ধ আমার হাত ধরে ভিতরে আনলেন। তাঁর অসীম শক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু কী অসম্ভব ঠাণ্ডা তাঁর হাত—যেন মরা মানুষের হাত! আবার তিনি বললেন—"আসুন আমার বাড়িতে। আমার আজ কি সৌভাগ্য! এ বাড়িতে কয়েক দিনের সুখ-স্মৃতি রেখে যান।" তাঁর হাতের শক্তি দেখে আমার গাড়োয়ানের কথা মনে পড়ে গেল। একবার সন্দেহ হ'ল—এ-ই তো আবার গাড়োয়ান নয়? তাই নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনিই কি জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা?"

"আমিই কৃতান্তবর্ম্মা। আসুন অশোক বাবু! বাইরে বড় ঠাণ্ডা, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবেন আসুন।" চলতে চলতে হাত বাড়িয়ে তিনি আমার জিনিষপত্তর তুলে নিলেন। আমি প্রতিবাদ করায় তিনি বলে উঠলেন—"না না, আপনি আমার অতিথি। রাত হয়েছে, আমার চাকরবাকরেরা এখন নেই। তাই আমাকেই সব করতে হবে।"

একটা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে একটা ঘোরানো সিঁ দিয়ে দোতলায় উঠলাম। জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা এ দরজা খুলে দেওয়া মাত্র ঘর থেকে এক ঝলক আ বেরিয়ে এল। সেই ঘর পার হয়ে জমিদার কৃতান্তব আর একটা ঘরে আমার জিনিষপত্তর রেখে বললেন "এতখানি গাড়িতে আসার পর আপনার বিশ্রাম প্র জন। বিশ্রামের পর স্নান করে পাশের ঘরে আস আপনার খাবার তৈরী থাকবে।"

জমিদারের অন্তরঙ্গ ব্যবহার এবং সৌজন্যে আ সমস্ত ভয় আর সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতিস্থ দেখলাম যে খিদেয় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পাশের ঘরে এলাম। খাবার তৈ ছিল। জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা বললেন—"আপনি খে বসুন। আমি আপনার সঙ্গে বসতে পারলাম না, ক আমি আগেই খেয়েছি।"

আমি জানকীপ্রসাদ বাবুর সীল করা চিঠিটা

ত দিলাম। তিনি চিঠিটা খুলে গম্ভীর মুখে পড়লেন। পর একটু হেসে চিঠিটা আমাকে পড়তে দিলেন। কটা কথা পড়ে সত্যিই আমার আনন্দ হ'ল—

'আপনি হয়ত জানেন যে আমি বেতো রোগী। ং বাত-ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় ডাক্তারের র্শ মত কয়েক মাসের মধ্যে আমার ভ্রমণ একেবারে ন্ধ। কিন্তু আমি অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ার পরিবর্ত্তে আমি যাঁকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, উপর, আমার সমস্ত কাজে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনিও বিশ্বাস করতে পারেন। তিনি বিশ্বাসী, য়িক, নীরব-কর্ম্মী এবং বুদ্ধিমান্। তাঁর অবস্থান- ন তিনি আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করবেন এবং মার সমস্ত উপদেশ মেনে নেবেন।'

খাওয়া শেষ হ'লে পর তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ক'রে ার বিষয়ে গল্প করতে লাগলাম। হঠাৎ কান পেতে াম—দূরে নেকড়ে গর্জ্জন করছে। জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার া দু'টো জ্বলে উঠল, তিনি বললেন—"শুনুন রাতের বাসীদের ডাক। আপনারা, সহরের লোকেরা, এ সবে নও আনন্দ পাবেন না। কিন্তু এই নেকড়ের গর্জ্জন, ারের রক্তচোখ—এদের সঙ্গেই আমাদের চিরকালের । এখন আপনি ঘুমোতে যান। কাল যতক্ষণ ইচ্ছা থাকতে পারেন। বিকেল পর্য্যন্ত আমি একটু রে থাকব।"

আমি আমার ঘরে চলে এলাম।

তার পর দিন কেটে গেল সারা দিন-রাত ঘুমিয়ে। ন্তবর্ম্মার সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয় নি। খাবার া দেওয়াই ছিল, কোন অসুবিধা হয় নি। একটা ব শুধু আমাকে ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল: এত বড় বাড়ি, একজনও লোক নেই!

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খাবার ঘরে দেখলাম, ঠিক আগের দিনের মতই খাবার ঢাকা া আছে। খাবারের পাশে শুধু একটা ছোট চিঠি শেষে কোন কারণে আমায় বাইরে যেতে হচ্ছে। র জন্য আর অপেক্ষা করবেন' না। অতিথি রের ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা চাইছি। ইতি কৃতান্তবর্ম্মা।'

খাওয়া শেষ হ'লে পর আমি চাকরবাকরের খোঁজ করলাম, কিন্তু একজনেরও দেখা পেলাম না। এই বাড়ির আর তার মালিকের অদ্ভুত ব্যাপারে আমি একটু আশ্চর্য্যই হয়ে পড়েছি। এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে, আমার চারিপাশে শুধু ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি। খাবার বাসন-পত্র সব সোনার এবং তার দাম লক্ষাধিক টাকা। চেয়ারে, টেবিলে, খাটে, পালঙ্কে, ঝাড়ে, লণ্ঠনে—সব জায়গায় ঐশ্বর্য্য আর আভিজাত্য ফুটে বেরুচ্ছে। তবু এত বড় বাড়িতে একটা আয়না নেই! আমার নিজের ছোট্ট আয়নাখানা না থাকলে দাড়ি কামানো আর চুল আঁচড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমি আজ পর্য্যন্ত বাড়িতে একটি চাকরের মুখ দেখি নি বা কোনও শব্দ শুনি নি। শুধু দূর বন থেকে মাঝে মাঝে নেকড়ের গর্জ্জন আমাকে আতঙ্কে শিউরে তুলেছে। কি ক'রে যে এই অলস সময়টুকু কাটাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার অনুমতি না নিয়ে এত বড় বাড়ির যেখানে সেখানে কিংবা এই বাড়ির বাইরে বেরুতে ইচ্ছা করে নি। তার উপর দেখেছি অর্দ্ধেক ঘরই তালাবন্ধ। একটা ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মস্ত বড় লাইব্রেরী—আলমারির পর আলমারি বাঙলা বইয়ে ভর্ত্তি, টেবিলের উপর বাঙলা মাসিক পত্রিকা। তা ছাড়া পৃথিবীর অনেক ভাষার বই-ই আছে।

বই নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছি, এমন সময় দরজা ঠেলে জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা ঢুকলেন। অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তিনি। বললেন--"সত্যিই খুব খুসী হ'লাম যে আপনি লাইব্রেরীতে এসে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। যখন একা একা থাকবেন তখন এই বই আপনাকে অনেকখানি সাহায্য করবে। একদিন এই সব বই নিয়ে আমারও দিন কেটেছে। বাঙলা দেশ, বিশেষতঃ কলকাতায় গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা হওয়ার পর থেকে আমি এই সব বই পড়েছি। এই বইগুলোর ভিতর দিয়ে আমি আপনাদের বাঙলা দেশের কথা জানতে পেরেছি। জেনেছি যে তাকে জানতে হ'লে আগে ভালবাসতে হবে। আমি চাই আপনাদের বিশাল কলকাতা সহরের জনবহুল পথ দিয়ে হেঁটে যেতে, চাই

সেখানকার মানুষের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে, সেখানকার জীবন, সেখানকার বাঁচা-মরা—সব পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে। কিন্তু আমার দুঃখ যে আমি ভাল বাঙলা জানি না।"

বাধা দিয়ে বললাম—"কিন্তু আপনি তো চমৎকার বাঙলা বলেন!"

তিনি বলে চললেন—"হয়ত আমার ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়! কিন্তু আমি চাই পরিপূর্ণ ভাবে বাঙালী হ'তে—কি হাবে-ভাবে, কি ভাবার টানে। যদি আমি কলকাতা সহরে যাই, সকলের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করি—সকলেই জানবে যে আমি এ দেশে নতুন। আমি তা চাই না। এখানে আমি জমিদার, আমি রাজা—এখানকার সকলে আমাকে জানে, আমাকে চেনে, এখানে আমি সকলের প্রভু। কিন্তু নতুন দেশে নতুন লোকের কেউ তোয়াক্কা রাখে না। আমি সাধারণ মানুষের মত হ'তে চাই, যাতে রাস্তায় কোন দিন কোনও লোক আমায় দেখে থেমে না বলে—'হা-হা, এ একেবারে এই সহরে আনকোরা!' আমি এত দিন সকলের উপর প্রভুত্ব করে এসেছি, এখনও আমি সকলের উপর প্রভুত্ব করতে চাই—অন্ততঃ আমার উপর প্রভুত্ব করার যেন কেউ না থাকে। আপনি শুধু আমায় বাংলা দেশের সম্পত্তি কেনার সাহায্যের জন্য আসেন নি—আপনি আমার বন্ধু। আশা করি আমাকে সমস্ত রকমে বাঙালী ক'রে, আমার সামান্য ভুল-চুক শুধরিয়ে দিয়ে মাস খানেক পরে বাড়ি ফিরবেন। আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, তাই সব সময় আপনার কাছে থাকতে পারি না, সেজন্য আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে এ ঘরে এসে পড়াশোনা করবেন। এ বাড়ির কোথাও যেতে আপনার বাধা নেই; শুধু যে সব ঘরের দরজা তালাবন্ধ—সে ঘরে যাবার চেষ্টা করবেন না।"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকানো মাত্র তিনি বললেন—"কারণ আর কিছুই নয়। এ জায়গাটা বাঙলা দেশ নয়, এ একে আসাম, তারপর ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পার্ব্বত্য জায়গা। এখানে অনেক রকম ঘটনা ঘটতে পারে যা বাংলা দেশে সাধারণতঃ ঘটা সম্ভব নয়।"

তার পর তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। [illegible] বার্ত্তায় এত চমৎকার লোক আমি খুব কম দে[illegible] এখানে এসে অবধি বা আসতে আসতে আমার [illegible] সামনে যে সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি তার সম্বন্ধে [illegible] অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। মাঝে মাঝে [illegible] প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেলেন, কখনও বা অন্য কথা [illegible] এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি তার মানেই বু[illegible] পারছেন না; কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তিনি অ[illegible] অকপট ভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁর [illegible] কথা বলতে বলতে আমারও সাহস বেড়ে গেল, [illegible] তাঁকে এর আগের রাতের কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনার [illegible] জিজ্ঞাসা করলাম—বনের মধ্যে যেখানে যেখানে [illegible] আলো দেখা যাচ্ছিল সেখানেই কেন গাড়োয়ান [illegible] যাচ্ছিল?

তিনি বললেন—"এখানে সকলের বিশ্বাস যে ব[illegible] কোনও এক রাতে, অর্থাৎ সাধারণতঃ বছরের শেষ রা[illegible] সমস্ত শয়তান জেগে উঠে 'হুড়োহুড়ি সুরু করে [illegible] যেখানে যেখানে গুপ্তধন আছে সেখানেই এক নীল আ[illegible] ভেসে ওঠে। আপনি যে রাস্তা দিয়ে এখানে এসে[illegible] তারই কাছাকাছি নিশ্চয়ই গুপ্তধন লুকোন আছে। [illegible] ওই পথে কত রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে গেছে। [illegible] আসাম, ব্রহ্মদেশ—আগেকার দিনে কত ঐশ্বর্য্যশালী [illegible] সে সব দেশে কত শক্তিশালী রাজা ছিলেন, প্রত্যে[illegible] নিজের রাজ্য বিস্তারের জন্য কত হানাহানি, রক্তার[illegible] করেছেন। কত রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল, কত ঐশ্ব[illegible] হয়ে গেল। কত রাজা তাঁদের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত হওয়ার [illegible] মাটিতে পুঁতে যখ হয়ে তা আগলে রেখেছেন। আমা[illegible] এ দেশ ঐশ্বর্য্যের জন্য চিরকাল বিখ্যাত, তাই এ দে[illegible] উপর অন্য দেশের রাজার লোলুপ দৃষ্টি সব সময় [illegible] ছিল। কিন্তু বিজয়ী রাজা কোনও দিন এ দেশ জয় [illegible] ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পান নি। রাজা-প্রজা সকলেই তাঁ[illegible] অর্থ হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা [illegible] মনে করতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এখানে ঐশ্বর্য্যের কথা [illegible] সকলেই জানে; তবু কি ক'রে এত দিনও সে [illegible] অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে?"

জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা হাসলেন, তাঁর ঠোঁটের ফাঁক [illegible]য়ে মাড়িশুদ্ধ দাঁত ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল। কি বিশ্রী, ঠিক [illegible]ন হিংস্র নেকড়ের দাঁত! তিনি উত্তর দিলেন—"কারণ [illegible]শের সাধারণ লোকেরা মনে মনে বড় ভীরু আর [illegible]ত্যন্ত বোকা। ওই নীল আলো মাত্র এক রাতেই [illegible]খা যায়, আর সেই রাত্রে সকলে দরজায় খিল এঁটে বসে [illegible]কে, ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে নড়তে-চড়তেই তারা [illegible]উরে ওঠে। আর যদিও কেউ বাইরে আসে, তখন সে [illegible] করবে ভেবেই ঠিক করতে পারবে না। এমন কি [illegible]াপনি যে গাড়োয়ানের কথা বললেন, সে সেই রাত্রে [illegible]ীল আলোর জায়গায় চিহ্ন দিয়ে রেখে থাকলেও পর দিন [illegible]তার নিজের কাজের জন্যও সে সেই জায়গা খুঁজে বের [illegible]করতে পারবে না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আপনিও আবার সেই জায়গাগুলো খুঁজে পাবেন না।"

উত্তর দিলাম—"তা সত্যি। কোথায় যে সে সব [illegible]ায়গা তা খুঁজে বের করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার কিছুই মনে নেই।"

আমাদের কথার মোড় আবার অন্য দিকে ঘুরে গেল। এক সময় তিনি বললেন—"অনেক কথাই হ'ল। এবার আমার নতুন বাড়িটার খবর বলুন। কি রকম বাড়ি কেনা হ'ল সেটা একটু জানা দরকার, কি বলেন?"

আমি আমার ঘর থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে এলাম। [illegible]খন রাত হয়ে গেছে। আমার ঘর থেকে ফিরে আসার [illegible]াগেই সমস্ত ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। জমিদার [illegible]তান্তবর্ম্মা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। তিনি [illegible]াড়িটার দলিলপত্র দেখে সে জায়গা সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন [illegible]রলেন। আমার মনে হ'ল তিনি অনেক আগে থেকেই [illegible] জায়গা সম্বন্ধে অনেক খবর জানতেন, নয়ত আমাকে [illegible]ভাবে প্রশ্নজালে বিব্রত ক'রে ফেলতে পারতেন না।

শেষ পর্য্যন্ত আমার ধারণা হ'ল, তিনি আমার থেকেও অনেক বেশী খবর রাখেন। এ কথা তাঁকে জানালে পর তিনি বললেন—"এ আর আশ্চর্য্যের কি? এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি যখন ওখানে যাব তখন আমি একেবারে একা, তখন খবর নেওয়ার জন্য কোথায় বা পাব বন্ধুবর জানকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে, কোথায় বা পাব আমার এখানকার বন্ধু অশোক লাহিড়ীকে। বলুন, সত্যি কি না? আপনারা থাকবেন আমার কাছ থেকে দূরে, নিজেদের নানা কাজে ব্যস্ত। তখন কি আর বার বার আপনাদের বিরক্ত করা সম্ভব, না উচিত?"

তার পর হা-হা করে হেসে উঠে বললেন—"আপনাদের কি ব'লে যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাব, বুঝতে পারছি না। আমি ঠিক যে ধরণের বাড়ি চাই ঠিক তাই আপনারা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। কলকাতার বাইরে পুরোনো সেকেলে প্রকাণ্ড জমিদার-বাড়ি, চার পাশ উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। বাগানের ভেতর একটা পুকুর, কিছু কিছু গাছপালা। আশেপাশে আর বাড়ি নেই—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"শুধু বাড়িটার কাছে একটা নতুন বাড়ি হয়েছে। সেটা একটা পাগলা-গারদ। একজন ডাক্তার কয়েকটি রোগী নিয়ে থাকেন।"

"য়্যাঁ! শেষটা কি আপনারা আমাকে পাগলা-গারদের মধ্যে রাখবেন?" বলতে বলতে তিনি হেসে উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমিও একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কখন যে সেই বইয়ের মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে গেছি জানি না, হঠাৎ জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার গলা শুনে চমক ভাঙল। বলে উঠলেন—"য়্যাঁ, আবার বই নিয়ে বসেছেন? চলুন, এক্ষুনি চাকর এসে খবর দিয়ে গেল যে আপনার খাবার তৈরি।"

(ক্রমশঃ)

অর্দ্ধেন্দু বাবুর অন্তর্দ্ধান

শ্রীশামুক

অর্দ্ধেন্দু বাবু যুদ্ধের বাজারে এত টাকা করলেন যে তার হিসাব হয় না। মোসাহেবরা দাঁত বার ক'রে এক সুরে বলে,—হেঁ হেঁ, আপনার মত—হেঁ হেঁ, পৃথিবীতে তুলনা হয় না হেঁ, হেঁ।

ভাবেন সত্যি তিনি বুঝি একজন খুব বিশিষ্ট মানুষ, সারা দুনিয়ায় যার জুড়ি আর নেই কেউ। ভাবছিলেন মনের আনন্দে। তোষামোদের আবহাওয়ায় গ্যাস-পোরা বেলুনের মত ভেসে চলেছিলেন স্বচ্ছন্দে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে একদিন জাহির করতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল।

গৃহিণীর মেজাজ খারাপ ছিল। ঝংকার দিয়ে বলেন, —কি এমন করেছ যে এত হৈ-রৈ ক'রে ঢাক পেটানো? শেয়ালদার কুলিরাও তো পয়সা রোজগার করে। লোকে তোমার নাম করে কই? অবশ্য তোমার নাম জানে বটে বড়বাজারের মশলাওয়ালারা আর লোহাপটির ভাঙা লোহালক্কড় বিক্রী করে যারা। শ্লেষের সংগে শেষ করলেন তিনি।

অর্দ্ধেন্দু বাবু মুষড়ে-চুপসে এতটুকু হয়ে গেলেন। সত্যি তো এ সব কথার উত্তর দেওয়া যায় কি?

সন্ধ্যার আসরে মোসাহেবরা ওঁর মুখ দেখে ভয়ে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে বরাতে ভাল খাওয়া-দাওয়া জুটবে না, হয়তো এমন সুখের চাকরি থেকে হঠাৎ বরখাস্তও হয়ে যেতে পারে।

তারা নানা চেষ্টা করে বাবুকে খুসি করতে, কথা বলাতে, এমন কি হাসাতে। একজন তো নিজেকে দারুণ বোকা প্রমাণ ক'রে সারা ঘরটা নাকে খৎ দিয়ে দিলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। বাবুর সতেরোটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়বার পর ওরা চুপ করে যেতে বাধ্য হয়।

তখন সকলে মিলে গালে বা মাথায় হাত দিয়ে বিষণ্ণ মুখে বাবুর সংগে সংগে নিশ্বাস ফেলতে থাকে। ফোঁস, ফোঁস শব্দ বাইরে থেকে এমন শোনায় যেন একশ' ... পেট-মোটা পালোয়ান ডনকুস্তির প্রতিযোগিতায় মেতে... এক সংগে।

শেষ পর্যন্ত চেপে না রাখতে পেরে অর্দ্ধেন্দু বাবু ... ফেলেন মনের দুঃখের কথা। মোসাহেবদের আর কি... না থাক উপস্থিতবুদ্ধি যে আছে এ কথা স্বীকার কর... হয়।

একজন বলে ওঠে.—বেশ তো, এর জন্যে অত ভাবনা... আছে কি, আপনি একজন দেশের নেতা হয়ে পড়ুন।

অন্যরা হৈ-হৈ ক'রে সায় দেয়। বাবুর কানে কথা... মন্দ লাগে না কিন্তু ভয়ও হয় মনে—এ সম্ভব হবে কি?

কিছু দিন চুপচাপ ভাবনা-চিন্তা চলে কিন্তু মোসাহে... দের ঘুঘুর ডাকের মতন একটানা ঘ্যানঘ্যানানি তাঁকে... রাজী করিয়ে তবে ছাড়লে। মোসাহেবরা এক সং... চেঁচিয়ে ওঠে—হুররে। সেদিন তাদের বিশেষ রকমে... ভূরিভোজের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মোসাহেবরা উঠে পড়ে লেগে যায়। বাবুকে সং... ক'রে ছোটখাটো সভাসমিতিতে নিয়ে যায়, আর সাধারণে... কাছে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে নানা অসম্ভব কথা ব'লে বাবু... খুব বড় ক'রে দেখায়। অর্দ্ধেন্দু বাবু হিসেব ক'রে ... মোটা কয়েকটি চাঁদা দিয়ে ফেললেন এবং কিছু কিছু ... খয়রাত করতে হ'ল বাধ্য হয়ে।

এ সময়টায় নেতাজী ছিলেন বর্মায়। তখন তাঁর না... নিয়ে সারা ভারতে খুব জল্পনা-কল্পনা ও উত্তেজনা চলে... কয়েকজন সুবিধাবাদী তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজেরাও এক... একজন কেষ্ট-বিষ্টু হবার চেষ্টা করছিলেন! মোসাহে... নির্দেশে অর্দ্ধেন্দু বাবুও সেই পথ ধরলেন।

কিন্তু খুব অল্প দিনেই পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে ... হওয়ার হাংগামা অনেক। রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ... বেঁড়ানো, সব সময়ে লোকজনের ভিড়, আর একই ...

...নাস্তে একশ' বার বলা বা শোনা। বক্তৃতা দেওয়া ...বার এক বিষম ব্যাপার।

...মনে থাকে না ছাই, কথাগুলি, বাড়ি থেকে মুখস্থ ক'রে ...লেও। লিখে নিয়ে পড়তে গেলেও হাত-পা'র সংগে ...টাও তাল মিলিয়ে কাঁপে থরথর। চালাক মানুষেরা ...কপালের ঘামের স্রোত ও মুখ-চোখের ভীত অসহায় ...ারা থেকে সহজেই বুঝতে পারে যে অবস্থা এমনি ...াহিল সামনে গিয়ে একটা জোরে ফুঁ দিলেই মহাশয় ...পাস করে জমি মাপবেন।

...বক্তৃতার কথাগুলি কোন রকমে পঁড়া বা মুখস্থ বলে ...লেও নিস্তার নেই। শ্রোতাদের মনের মত না হ'লে ...তে হাতে লাভ ধমকানি, গালাগালি, হট্টগোল এবং ...নো কখনো দু'একটা ইটের টুকরোও। অর্দ্ধেন্দু বাবুর ...ত বার ইচ্ছে হয়েছে যে মঞ্চের ওপর থেকে এক ঝাঁপ ...য়ে বিশাল জনতার মধ্যে ডুব দিয়ে লুকিয়ে পড়েন!

...নাম একটু-আধটু হ'ল বৈকি। কিন্তু সেই অনুপাতে ...নেক বেশী কমতে থাকে মনের স্বস্তি ও শান্তি। সব ...য়ে শুধু আশংকা কখন কি হয়, কোথায় কি ঘটে যায়। ...নের নিশ্চিন্ত ভাবটুকু বাষ্পের মতন হাওয়ায় গেল ...লিয়ে। ঘাড় নেড়ে নেড়ে নিজের মনে বলেন,—নাঃ, ...তা হওয়া বড় ঝকমারি! এ সহজ নয়, যার তার কর্ম ও ...। স্বার্থ ও সুখ যতদূর সম্ভব ত্যাগ ক'রে যাঁদের ...দেশের দশের কাজ এক মনে করবার ক্ষমতা বা শক্তি ...হ তাঁরাই শুধু নেতা হবার উপযুক্ত। তা না হ'লে ...ঙ্কুর স্বর্গ-লাভের মতনই ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা! ...ঝুলতে হয়। না পারে ওপরে উঠতে, আর না পারে ...ছেড়ে-ছুড়ে মাটিতে নেমে পালাতে।

...নে মনে যোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে,— ..., মাপ কর আমাকে। লোভে পড়ে ভুল পথে এসে ...ছি। ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দাও।

...ছাড়বার ইচ্ছা থাকলেও অর্দ্ধেন্দু বাবু নেতাগিরি ...তে পারেন না। মোসাহেবদের চাপে ও লোকেরা ...বলবে কি এই ভয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতেই হয়। ... ওপর নানা অসুবিধা যখন খুব প্রবল হয়ে ওঠে ... মোসাহেবদের ওপর ঝাল ঝাড়েন। কিন্তু তারা কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তারা যে ভাল ক'রেই জানে যে পেটে খেলে পিঠে সইতেই হয়।

এ রকম চলে কিছুদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহ্যের সীমা গেল পেরিয়ে। পারলেন না আর এই সখের নেতাগিরি করতে। উপরি উপরি কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা অবশ্য এর জন্যে দায়ী।

তিন তিনটি ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় পুঁচকে মেয়েরা গলায় ফুলের মালা পরাতে গিয়ে হেঁচকা টানে চশমা ভেঙ্গে দিলে। মুণ্ডটি তো বেশ ঝুঁকে নীচু করা হয়েছিল তবু চশমা গেল তিন তিনবার। আর ব্যাঙ-চ্যাপটা বা চিঁড়ে-চ্যাপটা যাই বল, প্রতিদিন প্রতিটি সভায়। দু'পাশের পাঁজরার হাড়গুলি যে যথাস্থানে রইলো, গুঁড়িয়ে যায় নি—এই পরম আশ্চর্য।

অর্দ্ধেন্দু বাবু মানুষ ভাল বলতে হয়। এত সব যত দূর সম্ভব মুখ বুজে সয়ে ছিলেন কিন্তু শেষের ঘটনাটির পর একেবারে ক্ষেপে মরিয়া হয়ে গেলেন।

এক সভায় এক গরম বক্তৃতা দিয়ে জেলে গেলেন কিছুদিন। নানা অসুবিধায় কাটিয়ে ছাড়া পাবার দিন মনে হ'ল, এইবার মুক্তি—এইবার এল সুখের দিন। কিন্তু হায়রে কপাল! ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না বিশেষ।

গেটের সামনে বিরাট জনতা। ফুলে সাজানো মোটার, নিশানের ছড়াছড়ি। অর্দ্ধেন্দু বাবুর চোখ দু'টি ছাড়া সারা দেহ ফুলের মালায় গেল ঢেকে। ফুলের তোড়া এতগুলি যে হাজারখানি হাত থাকলেও সামলে ধরে থাকতে পারতেন না।

গর্ব্বে বুক ফুলে ওঠে, মাথা টলমল করে। এই তো মানের মতন মান, এর জন্যে করা যায় না কি? হায়, তখনো যদি জানতেন!

শোভাযাত্রা বেরুলো, সমস্ত শহর ঘুরবে। সে বিরাট জনতা এক অতিকায় সাপের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, আবার বার বার যায় থেমে। কামানের গর্জ্জনের মতন হর্ষধ্বনি হয় একটানা।

অর্দ্ধেন্দু বাবু ফুলের মালার ভারী বোঝা নিয়ে মোটারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর মনে মনে ভাবেন কখন বাড়ি পৌঁছে পাওয়া যাবে কিছু খাওয়া আর একটু নরম বিছানা।

শোভাযাত্রা শেষ হয় না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে, পেটের মধ্যে আগুন জলে দাউ দাউ—খাবার দূরের কথা, এক ফোঁটা জলও জোটে না। ক্রমশঃ সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে পুড়িয়ে দেয়। মাথার তালু রুটি-সেঁকা চাটুর মত গন গন করে। বারান্দা থেকে ছোড়া ফুল এসে শরীরে সূচের মতন বেঁধে।

সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে অর্দ্ধেন্দু বাবু সটান শোবার ঘরে গিয়ে দু'টি বালিশ দু'কানে চেপে বিছানায় মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লেন। সে রাত্রি থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিশেষ রকম।

অসুখ হ'লেই বা কি আর রেহাই আছে? বাড়িতে সব সময়ে লোক গিস্‌গিস্ করতে থাকে। অন্য নেতারা আসেন, খবরের কাগজের লোকেরা আসেন, দেশ-সেবকরা আসেন, সেবিকারাও না এসে থাকতে পারেন না। এর ওপর মোসাহেবের দল সেই যে শোভাযাত্রার সংগে বাড়িতে ঢুকেছে আর বার হ'য়ে যায় নি।

বাইরের লোকের বিষম ভিড়ে বাড়ির লোকেরা কাছেই পৌঁছাতে পারে না। একটু জল খেতে চাইলে দশজনে কুড়ি হাতে কাড়াকাড়ি ক'রে এক এক গেলাস জল নিয়ে আসে। তার কিছুটা অবশ্য মুখের ভেতর গিয়ে পড়ে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ হয় বুকে, মাথায়, নয় বিছানায়। অর্দ্ধেন্দু বাবু চোখ বন্ধ ক'রে প্রাণপণে পথ খোঁজেন পালাবার। কান দু'টো বন্ধ করবার ভগবান্ কোন ব্যবস্থা করেন নি—তা হ'লে সে দু'টিও নিশ্চয় বন্ধ করতেন।

অসুখ সেরে গেল। এবং একদিন হঠাৎ অর্দ্ধেন্দু বাবু অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলেন। খবরের কাগজ মারফৎ শহরের লোকদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেল সুরু।

কেউ বলে, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছেন রাজা ফারুকের কাছে এক জরুরী আলোচনার জন্যে। কেউ বলে, তিন লাফে তিব্বতে গিয়ে পৌঁছেছেন যোগ সাধনা করতে। যখন ফিরে আসবেন তখন মুখ থেকে বেরুবে আগুন আর চোখ দিয়ে বিদ্যুৎ। আজকে আণবিক বোমার ভয় দেখিয়েও যে বিশ্বশান্তি ফিরে আসছে না, তিনি আ তাই নিশ্চয়ই। কেউ কেউ আবার বোকার মতন গ্রহে যাওয়ার কথাটাও বলে ফেললে—চমকদার কিছু খুঁজে না পেয়ে।

যাই হোক, অর্দ্ধেন্দু বাবু অন্তর্দ্ধান করলেন আর ফি না। শহরের মানুষরা অন্য সব নতুন ও পুরাতন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো এবং মোসাহেবরা খুঁজে তাদের নতুন জায়গা। অর্দ্ধেন্দু বাবুর কথা ক্রমশঃ যায় সকলে।

এবারে একটি কথা তোমাদের বলে দি কিন্তু চুপি চুপি। হ্যাঁ, তিনি ফিরে এসেছেন এবং আছেন শহরের মধ্যেই, ভয়ানক লুকিয়ে। যদি কোন দিন চোখে পড়ে ঘন গোঁফ-দাড়িওয়ালা একটি মানুষ—কা গোল মাথায় কালো টুপি, আর খাকী পাজামার শার্ট—লালদীঘি বা গোলদীঘিতে ঘন ঘন পাক খা তো সন্দেহ ক'রে দূর থেকে একটু নজর রেখো। হয়ে তিনি বেঞ্চিতে বসবেন কিন্তু যেই দু'পাঁচজন কাছাকাছি জড় হ'য়ে রাজনীতি আলোচনা করবে তো দেখবে তিনি তড়াক করে উঠে আবার পাক আরম্ভ করেছেন!

এখনো সন্দেহ বজায় রাখো কিন্তু হঠাৎ করে ফে কিছু। এবারে খুব কাছে গিয়ে কানে কানে চু বলে দেখো—জয় হিন্দ।

বাস্, দেখবে তিনি ফড়িংএর মতন এক লাফ ছুটতে সুরু করবেন। আর সন্দেহ করবার বাকি কিছু? তবে সাবধান, এর চেয়ে বাড়াবাড়ি আ ক'রে বোসো না।

খবরদার দাড়ি ধরে টান দিও না যেন। ঐ চুলা নয়, খাস নিজস্ব সম্পত্তি। শহর থেকে দাড়ি-গোঁফ লুকিয়ে গজিয়ে ওদেরই ভরসায় আবার ফিরে এসেছেন। বেচারী!

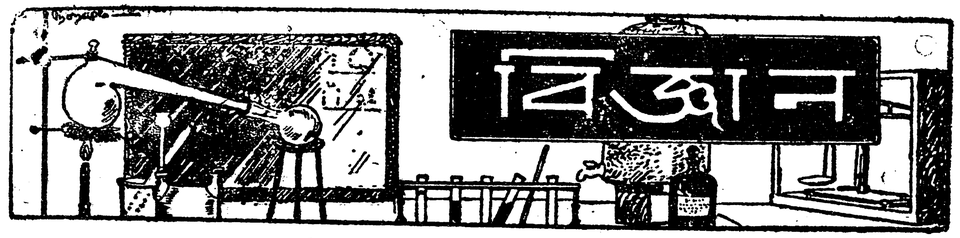

কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইডের কারবার

শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত

অনেক দিন আগে কোন্ এক কাগজে যেন ঘটনাটা ড়েছিলাম—ব্যাপারটা হয়েছিল বোধ হয় লণ্ডনেই, ক রহস্যজনক খুন নিয়ে। যে লোকটা মারা যায়, াগের রাত্রে সে নাকি ঘরে বসে আগুন পোহাচ্ছিল। রের দিন অনেক বেলা হ'য়ে গেল, তবু তার ঘুম ভাঙ্‌ছে দেখে সবাইকার মনে হয় সন্দেহ। তারপর দরজা াঙ্গতেই দেখা গেল ঘরের ভিতর মৃতদেহ। এই নের কিনারা করতে গিয়ে পুলিশ নাকি সেবার হিম্‌সিম্ য়ে গিয়েছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কানে কথাটা উঠতেই রা অতি সহজেই রহস্যের মীমাংসা ক'রে দিলেন। ন, এ আর কিছুই নয়, কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইডের কাণ্ড।

—সে কি! কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড কে? তোমরা হু কোন ডাকসাইটে খুনে-ডাকাতের নাম বুঝি! কিন্তু মোটেই নয়। আসলে ও একটা গ্যাস। চুল্লীর লা থেকেই ও গ্যাসটা তৈরী হচ্ছিল। ঘরের দরজা-নালা সব বন্ধ থাকায় রাত্রে সমস্ত ঘর গ্যাসে ভর্ত্তি হ'য়ে , আর তা'তেই দমবন্ধ হয়ে লোকটি মারা যায়।

শুধু ঐ ভাবেই নয়, ঘরে যদি অক্সিজেন কম থাকে ঐ কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড তৈরী হওয়ার আগেই কয়লা কে আর একটা গ্যাসও তৈরী হবে—যেটি কার্ব্বন ক্‌সাইডেরই জাতভাই, কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত। এর কার্ব্বন মনক্সাইড।

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছিল কার্ব্বন ডায়ক্সাইড্ য়। আসলে এ গ্যাসটা কিন্তু মোটেই ভয়ানক নয়। কি বিষাক্তও নয়। তবে একটা দোষ এর আছে, যে জন্য কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ থেকে কখনও কখনও মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। সে হ'ল অক্সিজেনের সাথে এর স্বভাববিরোধিতা। নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস থেকে অক্সিজেন্ গ্যাস নিয়েই ত' আমরা বাঁচি। কিন্তু যেখানে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাস থাকে সেখানে অক্সিজেন গ্যাস কখনও আসতে পারে না, তাই মানুষও নিঃশ্বাস নিতে না পেরে তখন দমবন্ধ হয়ে মারা যায়।

শুধু চুল্লীর কয়লা থেকেই যে এ ধরণের বিপদ্ ঘটে তা নয়। খনির নীচে বা মাটীর নীচেকার নর্দ্দমার ভেতরেও কুলীরা কাজ করতে করতে একই কারণে অনেক সময় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। বাতাস থেকে ভারী হওয়ায় এ গ্যাস সহজেই এই সব গর্ত্তে বা ঢালু জায়গায় আশ্রয় নেয়।

কিন্তু ঘরে চুল্লী নেই, কি কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ ঢুকবার কোন পথ নেই, সে অবস্থায়ও দু' একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কারণ আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে বাতাস ছেড়ে দেই তার ভেতর কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাসই থাকে সব চেয়ে বেশী। সেদিন ত' আমাদের পাড়ায়ই এই নিয়ে এক কাণ্ড হ'য়ে গেল! অভিমন্যু বধ প্লে হচ্ছিল পাড়ায়। ভীড়ও হয়েছিল খুব। কিন্তু প্লে আরম্ভ হবার খানিক বাদেই অভিমন্যুর (ওরফে আমাদের বীরুর) ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। আমরা ভাবি কি ব্যাপার! অভিমন্যু-বধ না হ'তেই অভিমন্যুর ঠাকুর্দ্দা অজ্ঞান কেন! পরে বুঝলাম, বৃদ্ধ আসলে শোকে কাতর হ'ন নি, অতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে বদ্ধ-ঘরের হাওয়ায় কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড

বেশী হ'য়ে গিয়েছিল, আর তা সহ্য করতে না পেরেই ঠাকুর্দ্দার এই দুরবস্থা। ঠাকুর্দ্দাকে অবশ্যি বাইরের খোলা হাওয়ায় আনতেই চোখ্ মেল্‌লেন। মাঝ থেকে আমাদের অমন প্লেটাই মাটি হ'ল।

এমন বিদ্‌ঘুটে গ্যাস এই কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্! কিন্তু একে এড়িয়ে চলা বড় সহজ নয়। আমাদের চারিদিকে অহরহ প্রচুর পরিমাণে তৈরী হচ্ছে এ গ্যাস্। তুমি কয়লা, কাঠ—যা কিছুই পোড়াও না কেন অমনি তা থেকে বেরিয়ে পড়বে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্। আমাদের বাড়ীর কয়লার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এক একটা বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে রোজ কি পরিমাণ কয়লা পোড়ান হয়, তা বোধ হয় তোমাদের ধারণাই নেই। এ ছাড়া চুণ

একটি আধুনিক কারখানা—বাতাসে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড গ্যাস ছড়াতে এর যুড়ি নেই।

তৈরীর কারখানায়, মদের কারখানায় (Breweries) এ গ্যাস পাওয়া যায় উদ্‌বৃত্ত হিসাবে আর তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। ময়লা ও আবর্জ্জনা পচে গেলে তা থেকেও এ গ্যাসের জন্ম হয়। আর মানুষের নিঃশ্বাসের সাথে ত' অহরহ হচ্ছেই। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে শুধু কয়লা থেকেই প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন্ অর্থাৎ প্রায় একুশ শ' মণ ওজনের কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাস আমাদের পৃথিবীর বাতাসে মিশছে। মানুষের নিঃশ্বাসের সাথে যে পরিমাণ গ্যাস বের হয় তারও একটা হিসাব নেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায় দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্ অর্থাৎ সত্তর মণ ওজনের গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়।

কি ভয়ানক কথা! নয় কি? এই অনুপাতে কার্ব্ব ডায়ক্‌সাইড্ বাতাসে বেড়ে চল্‌লে একদিন পৃথিবী আকাশ-বাতাস যে এ গ্যাসে ভর্ত্তি হয়ে যাবে তা'তে আ সন্দেহ কি? সেদিন মানুষগুলির অবস্থা তা' হ'লে কি হবে —ঠিক যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছ!

বৈজ্ঞানিকেরা যে এ নিয়ে কোন চিন্তাই করেন নি তা নয়। বাতাসে কি পরিমাণ কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ বে চল্‌ছে সে নিয়ে সুরু কর্‌লেন তাঁদের পরীক্ষা। দেখা গেল, বাতাসে আগে যে পরিমাণ কার্ব্বন ডায়ক্‌সাই গ্যাস্ ছিল বছরের পর বছর চলে গেলেও তার পরিবর্ত্তন হয় নি—তা প্রায় একই রয়ে গেছে। আশ্চর্য্য! তা হ'লে কোথায় যাচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ গ্যাস, যা রোজ পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বাতা সাথে মিল্‌ছে? খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ! দেখা গেল— এ আর কেউ নয়, স্বয়ং প্রকৃ দেবীই তাঁর দু' হাতে এ জঞ্জাল সাফ্ ক যাচ্ছেন। গাছপালা আর জল তাঁর এ দু হাত।

গাছ তার পাতার সাহায্যে কার্ব্ব ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাস্ শুষে নেয়, আর তা থে নিজের পুষ্টি সাধন ক'রে বাতাসকে অক্‌সিজেন ছেড়ে,—নিঃশ্বাসের বেলায় আ যা করি ঠিক তার উল্টো। জলের বেলায় কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ যায় গুলে, যেমন লবণ গুলে যায় জ ভেতর। পৃথিবীর গাছপালার সংখ্যা আর নদী, সমু জল ত' কম নয়, তাই যে গ্যাস এই ভাবে কমে যা তার পরিমাণও যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষও আজকাল কম সেয়ানা হয় নি। ক ডায়ক্‌সাইড্‌কে সোজাসুজি বাতাসে ছেড়ে না দিয়ে আজকাল প্রয়োজনীয় কাজে লাগান হচ্ছে। কারখানা বা মদের কারখানা থেকে লোহার 'সিলিণ্ডারে' ক'রে এ সব গ্যাস নিয়ে আসা হয়। একটা সিলিণ্ডারে অনেক ওজনের গ্যাস জোর ক ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়। 'সিলিণ্ডার' ভর্ত্তি এই স

সে সোডা ওয়াটার তৈরীর কারখানায়—খাবার জলে র্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গুলেই সোডা-ওয়াটার তৈরী হয় কিনা! ারকাল আবার কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইডের সবচেয়ে বেশী

কৃষ্ণ সাম্রাজ্য—এরা বাতাস থেকে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড টেনে নিয়ে প্রকৃতির সমতা রক্ষা করছে।

ার হচ্ছে—'ড্রাই আইস্' তৈরী করতে। খুব ঠাণ্ডা য় চাপ দিয়ে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাসকে জমাট ান হয়—তখন একে দেখতে হয় অনেকটা তূলোর । এরই নাম 'ড্রাই আইস্'। এ দিয়ে সব্জি, ফল, মাংস প্রভৃতি কাঁচা মাল ঠাণ্ডা ক'রে অনেক দিন পর্য্যন্ত কৃত রাখা যায়। ধর, আর্জ্জেন্‌টিনা থেকে মাংস যাচ্ছে লণ্ডনে, কিম্বা হল্যাণ্ড থেকে দুধ, মাখন, পনীর যাচ্ছে ফ্রান্সে। জাহাজ বা গাড়ীর কামরায় 'ড্রাই আইস্' ভর্ত্তি করে জিনিষগুলি পাঠিয়ে দাও—ব্যস্, যে অবস্থায় পাঠাবে সেই অবস্থায়ই গিয়ে হাজির হবে। আমাদের দেশে বরফ দিয়ে এ কাজ করা হয়। কিন্তু বরফের চেয়ে 'ড্রাই আইসের' সুবিধা অনেক বেশী। প্রথমতঃ 'ড্রাই আইস্' বরফের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা রাখে। আর দ্বিতীয়তঃ জমাট অবস্থা থেকে কর্পূরের মত এ সোজাসুজি গ্যাস্ হয়ে উড়ে যায়; বরফের মত গলে জল হয়ে, জিনিষপত্র ভিজিয়ে একটা গোলমেলে কাণ্ড বাধায় না।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত লাগবে যখন বল্‌ব যে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ দিয়ে মানুষের প্রাণরক্ষার কাজও নাকি হয়! কারণ আগুন নিভাতে এর যুড়ি আর নেই বল্‌লেই চলে। আগুন নিভাবার কাজে ফায়ার কিং ব্যবহার করা হয় তা তোমরা দেখে থাকবে—সেও এই কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইডেরই ব্যাপার। আগুনের গায়ে এ গ্যাস্ ছেড়ে দিয়েছ কি অমনি দেখতে দেখতে আগুন একেবারে জল হয়ে যাবে। বাতাস থেকে অক্‌সিজেন্ নিয়েই ত' আগুন জ্বলে, কিন্তু কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ থাক্‌লে সে অক্‌সিজেন্‌ই বা আস্‌বে কোন্ সাহসে? জলের বদলে পাইপে ক'রে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড্ গ্যাস জোরে আগুনের গায়ে ছুড়ে দিলে বড় বড় অগ্নিকাণ্ডকে কাবু করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র।

তা' হ'লেই দেখ, যে কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইডের জন্য মানুষের প্রাণ যাবার জোগাড় তাকেই কিনা বুদ্ধির জোরে মানুষ আজ নিজের উপকারে লাগিয়েছে! বাহাদুরী বল্‌তে হবে।

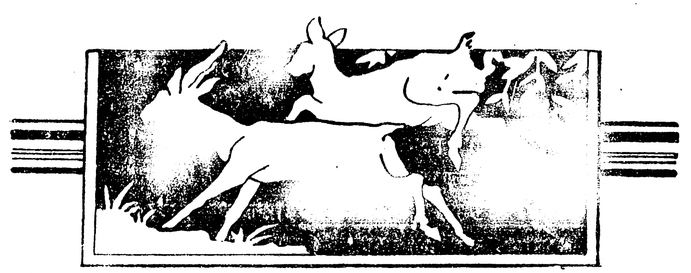

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(অতীত ভারতের এক বিস্মৃত কাহিনী)

ছয়

খৃষ্ট-জন্মের দেড়শত বছর আগের কথা, ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশ তখন ইন্দো-পার্থিয়ান গ্রীকদের অধীনে। কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও সিন্ধুদেশে তখন তারা রাজত্ব করছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের এশিয়ার বিরাট সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কিন্তু শক্তি হারায় নি। আলেকজাণ্ডারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে কয়েক বছর আগে গ্রীকরা নতুন করে ভারত অভিযান সুরু করেছে, কিন্তু কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও সিন্ধু অবধি এসেই তারা থেমেছে। কোন বড় বাধা যে তাদের থামিয়েছে তা নয়, তারা থেমেছে ভিতরের অন্তর্বিবাদের জন্য। নিজে-দের মধ্যে শক্তি-লাভের দ্বন্দ্ব শেষ হ'তে লেগেছে অর্দ্ধ-শতাব্দী। তারপরেই আবার নব পর্য্যায়ে সুরু হ'ল ভারত-জয়ের অভিযান। গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার শত সহস্র সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন সৌরাষ্ট্রের (কাথিয়াবাড়) দিকে। সৌরাষ্ট্র জয় করে এগিয়ে এলেন মধ্যসিকায় ; সেখান থেকে মথুরা। মথুরা নগরী লুণ্ঠন করে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, সংবাদ এলে ভরতপুর ও অযোধ্যায় বিপুল মাগধী সেনার সমাবেশ হচ্ছে! মগধের হস্তিবাহিনীর ভয়ে আলেক-জাণ্ডার পঞ্চনদ পার হয়ে অগ্রসর হ'তে সাহস করেন নি। মিনাণ্ডার ভাবিত হলেন। আলেকজাণ্ডারের মত তাঁর যে একেবারে হস্তিবাহিনী ছিল না তা নয়, কয়েকটী হস্তী তিনি পঞ্চনদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু মাগধী হস্তিযূথের কাছে তা নগণ্য।

মন্ত্রী এন্টিওকাস ও ডিমিট্রিয়াস বললেন—মগধ-রাজে... শক্তি যথাযথ নিরূপণ না করে অগ্রসর হওয়া আমাদে... পক্ষে ঠিক হবে না সম্রাট্! শেষে হয়তো এমন বিপর্যায়ে... সম্মুখীন হ'তে হবে যে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তচ্যু... হবে। সেইজন্য আগে আমরা চারিপাশে গুপ্তচর প্রে... করি। ইতিমধ্যে মগধ-সম্রাটের কাছে এক দূত পাঠা... হোক।

মিনাণ্ডার বললেন,—কিন্তু আমার পক্ষ থেকে ... গেলে আমারই দুর্বলতা প্রকাশ পাবে না কি?

আমরা সে কথাও ভেবেছি সম্রাট্! দূত আমা... পক্ষ থেকে যাবে না, মথুরার বৌদ্ধ-সঙ্ঘ থেকে এক... স্থবির যাবেন, তিনি আমাদের শক্তিমত্তার বিপুল... ব্যাখ্যা করে বলবেন, দু'শ' হাতী, দু'হাজার ঘোড়া, ... দশ লাখ স্বুবর্ণমুদ্রা পেলে আমাদের বাহিনী আর অগ্র... হবে না, বহু নিরীহ জনগণের রক্তপাত নিবারণ হ... বৌদ্ধদের ধর্ম্মের দিক্ থেকে সেইটাই বিশেষভাবে কাম্য...

—কিন্তু বৌদ্ধ স্থবির আমাদের পক্ষ নিয়ে যাবে কে...

—সে দায়িত্ব আপনি আমাদের উপর ছেড়ে... সম্রাট্! দেশের জনগণের কল্যাণ কামনায় বৌদ্ধরা ... করবেন, তাঁদেরকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেই চলবে যে আ... চলে যাব।

এন্টিওকাস্ ও ডিমিট্রিয়াস্ বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। ... সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রতি... ...য়ে বুঝিয়ে দিতে তাঁদের বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ল না, ...সংগ্রাম, লুণ্ঠন ও ধ্বংস থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা দূতের দায়িত্ব নিতে স্বীকার পেলেন। দ্রুত-গামী রথে পাঁচজন বৌদ্ধ স্থবির যাত্রা করলেন পাটলি-পুত্রের দিকে।

সাত

মথুরা থেকে ভরতপুর সাত যোজন পথ মাত্র। মথুরার উপকণ্ঠে মিনাণ্ডারের বিরাট বাহিনীর ছাউনি পড়েছে, ভরতপুরের রাজা কুমারসেন বিশেষ ভাবে চিন্তিত। মথুরা লুণ্ঠিত হয়েছে খবর আসা মাত্রই ভরতপুরের নাগরিকেরা পলায়নের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই একটা আতঙ্কের পরিবেশ। সাত যোজন পথ অতিক্রম করতে এক রাত্রের বেশী লাগবে না, তারপর প্রভাতের আলোকে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে নগরীর বুকে, কে কোথায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়বে! সেই ভয়ে যার সামান্য স্থান আছে সে-ই নগর পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। পথে ...কোলাহল বেশী, অনেক বিপণিও খোলে নি। রথ ...গোযানে পথ সমাকীর্ণ। কুমারসেন নগর-তোরণ মুক্ত করে দিয়েছেন, ঘোষণা করেছেন—যারা যেতে ...ও, চলে যাও, কোন বাধা নেই।

নগরীর পথ ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে আসছে। কুমারসেন ...সাদ-অলিন্দ থেকে দেখছেন, আর ভাবছেন। মনে ...ছে ছেলেবেলাকার কথা। পিতা সৌভাগ্যসেন তখন ...নদে রাজত্ব করছেন, গ্রীক আক্রমণের ভয়ে তক্ষ-...লাও তখন এমনি ভাবে জনশূন্য হয়। তারপর সম্মুখ ...রে পিতা মৃত্যু বরণ করলেন। রাজ্য গেল, ভাগ্য ...বশে কুমারসেন এসে উঠলেন এই ভরতপুরে। মগধ-...াটের অনুগ্রহে আজ তিনি এই দুর্গের রক্ষক।

সহসা কুমারসেনের চোখে পড়লো কমণ্ডলু হস্তে এক ... প্রাসাদের দিকে আসছেন। কুমারসেন তাড়াতাড়ি ...ন্দ থেকে নেমে এলেন ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা জানাবার ...

অলিন্দের একপাশে একখানি বৃহৎ কষ্টিপাথরের ...ন করা ছিল, কুমারসেন ব্রাহ্মণকে সেখানে নিয়ে এসে বসালেন। ব্রাহ্মণ বললেন,—দীর্ঘদিন পরে আজ তোমাকে আমার প্রয়োজন হয়েছে,—বিশেষ মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন।...মহারাজ সৌভাগ্যসেন যখন গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়ে একান্ত সম্বলহীন অবস্থায় একমাত্র পুত্রের হাত ধরে, মথুরায় এসে পৌঁছেছেন, তখন প্রচণ্ড মারী-গুটিকার আক্রমণে তোমরা দু'জনেই সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লে...সেইদিনের কথা তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে রাজকুমার! ..

—স্মরণ আছে আচার্য্যদেব! সেই দুর্দ্দিনে আপনি আমাদেরকে আশ্রয় না দিলে আমাদের প্রাণ রক্ষায় কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।

উত্তম! তারপর মগধ-সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তোমাদেরকে ভরতপুর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথাও নিশ্চয়ই তুমি বিস্মৃত হও নি?

—আপনি আমাকে অপরাধী করছেন কেন আচার্য্যদেব? আমার সবই স্মরণ আছে। আপনি যা আদেশ করবেন আমি সর্বদাই তা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

—এই সব কথা স্মরণ করাবার আজ প্রয়োজন হয়েছে রাজকুমার! সেদিন যে অধিকার আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, আজ সেই অধিকার আমি ভিক্ষা চাইছি। সারা ভারতের মুক্তির জন্য আজ ভরতপুরের এই রাজ্যাংশটুকুর প্রয়োজন!

—কি করতে হবে আদেশ করুন।

—বড়ই কঠিন গুরুকাজ, একান্ত মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন। ...মাধ্যসিকার মহানায়ক মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মাধ্যসিকার পতন ঘটিয়ে যবন সম্রাট্ মিনাণ্ডারকে সে নিয়ে এসেছে মথুরার দ্বারে। মৃত্যুঞ্জয়ের চক্রান্তে মথুরার পতন ঘটেছে, নগর লুণ্ঠিত। এবার মিনাণ্ডার অযোধ্যার পথে পাটলিপুত্রের দিকে অগ্রসর হবে, সত্বর একটা কিছু করার প্রয়োজন। পঞ্চনদ, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র থেকে মাধ্যসিকা ও মথুরা পর্য্যন্ত উত্তরাপথের অর্দ্ধাংশ আজ গ্রীকদের কুক্ষিগত। আর বিলম্ব করলে হয়তো পাটালিপুত্রও একদিন যবনের করতলগত হবে, যবনাচারে ভারতভূমি প্লাবিত হবে। তার আগেই আমাদেরকে প্রতিবিধান করতে হবে এবং এই কাজে তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন...

—সম্রাট্ বৃহদ্রথ কিরূপ প্রস্তুত হয়েছেন ?...

—তিনি অক্ষক্রীড়ায় মত্ত আছেন, বসে বসে অশ্ব-গজ ও বলের চাল দিচ্ছেন ; প্রাচুর্য্যের আলস্য ও নির্বীর্য্যতা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি অশ্ব, গজ ও স্বুবর্ণ পাঠাচ্ছেন মিনাণ্ডারকে খুসি করার জন্য। সম্রাটের বিশ্বাস এই উপঢৌকনে খুসি হয়ে মিনাণ্ডার কাবুল কপিশায় ফিরে যাবে। কিন্তু এই উপঢৌকন যে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবে তা তিনি বুঝতে চান না। এর আগেও তিনি একবার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, তা'তে মিনাণ্ডারের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, এবং মথুরা অবধি আক্রমণে উৎসাহ জুগিয়েছে। এবার তাই আমাদেরকে ভিন্ন পথ ধরতে হবে।

—বলুন কি করতে হবে ?

—দু'শ' হাতী, দু' হাজার ঘোড়া ও দশ লক্ষ স্বুবর্ণ উপঢৌকন নিয়ে মগধের দূত এই পথে আসবে, পথিমধ্যে সেই উপঢৌকন আটক করে লুঠ করতে হবে।

—কিন্তু সে-তো সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হ[illegible] আচার্য্যদেব !

—দেশের চেয়ে সম্রাট্ বড় নয়। দেশবাসীর শা[illegible] ও সমৃদ্ধির জন্যই একজনের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত ক[illegible] তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। যতক্ষণ তিনি প্রজাগণে[illegible] স্বার্থ দেখবেন ততক্ষণই তিনি সম্রাটের মর্য্যাদা পাবে[illegible] প্রজাদের স্বার্থের বিরোধিতা করলেই প্রজাদের কাছে[illegible] তাঁর আর কোন মূল্য নেই। তবে আমরা যে প[illegible] অবলম্বন করেছি আপাতঃদৃষ্টিতে তা রাজদ্রোহিতা ব[illegible] মনে হ'লেও পরিণামে মগধের রাজবংশ রক্ষা পাবে।

—যদি তাই হয় তা' হলে আপনার আ[illegible] শিরোধার্য্য !

ব্রাহ্মণের মুখে এবার হাসি ফুটলো, বললেন,—তুমি[illegible] এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি, তাই তোমার কাছে এলাম। এ[illegible] ইতি-কর্ত্তব্য অবধান কর :

চারিপাশে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ব্রাহ্ম[illegible] নিম্নস্বরে কথা বলতে স্বুরু করলেন। (ক্রমশঃ)

মানস সরোবরে এক রাত্রি

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

২

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটল। এবার জল মেপে দেখলুম গভীরতা ১৮১ ফুট। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মিষ্টি হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। সে হাওয়া তরঙ্গের ওপর মৃদু হিল্লোলের স্বৃষ্টি কর্ছে। কদাচিৎ নাম-না-জানা জলচারী পাখীর তীক্ষ্ণ শব্দ রাত্রির গাম্ভীর্য ভঙ্গ কর্ছে, আর আমাদের নিঃসঙ্গতাকে কমিয়ে দিতে চাই[illegible] হ্রদ-পৃষ্ঠ থেকে একটা হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধ[illegible] দক্ষিণ-পূব কূলে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ারই শব্দ। দেখ[illegible] দেখ্তে দক্ষিণের আকাশে গুরলা মন্দাত্তের চূড়োকে[illegible] আব্দার কালো মেঘ জড় হ'ল, আর বাতাস গেল বন্ধ[illegible]

[illegible]কালি-গোলা জলের ওপর দিয়ে আমরা ধীরে ভেসে [illegible]লেছি ; মাঝে মাছে বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে দেখ্ছি ছুটে-[illegible]আসা ঢেউএর মাথাগুলো। গভীরতা ক্রমেই বেড়ে [illegible]চ্ছে। ১৮৪ ফুট, ১৮৯ ফুট, ১৯২ ফুট, ২১৩ ফুট। [illegible]কোন্ অতলের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি কে জানে ? [illegible]টেম্পারেচার ৪৬ ডিগ্রীর কাছাকাছি। ফার কোটের [illegible]আবশ্যক আমার আর হ'ল না।

[illegible] হীরের ফুলে তাঁর এলো চুল সাজিয়ে রাত্রিদেবী [illegible]নির্নিমেষ নয়নে মানস সরোবরের দিকে চেয়ে আছেন। [illegible]মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। প্রথম উষার আগে রাত্রির [illegible]অন্ধকারের মধ্যে ভেঙে পড়ার ভাব। ২০৩, ২০০, ১৮৪, [illegible]৮০, ১৯০—বোধ হয় হ্রদের গভীরতম প্রদেশ আমরা [illegible]পার হ'য়ে গেছি। নৌকোর রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে [illegible]আমি এই নিরুদ্দেশে যাত্রাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ [illegible]করতে চাইছি। ইওরোপ ও এসিয়ার বহু স্থান ঘুরেছি ; [illegible]কিন্তু এই নৈশ অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে [illegible]পূর্ণ নতুন। রাত্রির মানস সরোবরের অপূর্ব সৌন্দর্য [illegible]আমার জীবনকে সার্থক করেছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি-[illegible]দেবীর বিশাল বুকের মৃদু অথচ স্বুস্পষ্ট স্পন্দন আমি [illegible]শুনতে পাচ্ছি। রাত্রির গাম্ভীর্যে সেই স্পন্দন যেন ঈষৎ [illegible]ক্ষীণ, কিন্তু কাছে-আসা প্রভাতের লাল আভার মধ্যে [illegible]রয়েছে তার নতুন আশা। মনে হচ্ছে মরজগতের সমস্ত [illegible], ভাবনা, ক্ষুদ্রতা ও বিফলতার সীমা অতিক্রম ক'রে [illegible] এসেছি চিরশান্তিময় অপরিসীম শূন্যের মাঝখানে। [illegible]চারদিকে যেন রহস্যে ঘেরা স্বপ্নরাজ্য ! স্থান, [illegible] এমন কি নিজেকে ভুলে গিয়ে অবাক্ হয়ে আমি [illegible] রইলুম। চাঁদ আকাশে তার তোরণ নির্মাণের [illegible]ব্যস্ত। তার অস্থির প্রতিবিম্ব হ্রদের জলে কাঁপ্ছে। [illegible] মাঝে নৌকোর ছায়া সে ছবিকে ঢেকে দিচ্ছে।

রাত্রির দেহ-জ্যোতিঃ আর পরিচ্ছদ ম্লান হ'য়ে এসেছে। [illegible] আকাশে হাল্কা নীলের উঁকি দেখ্তে পাচ্ছি। [illegible] দিক্ থেকে প্রভাত সাড়া দিয়েছে। পূবের পাহাড়ের [illegible] ক্ষীণ উষার আভাস। ক্রমেই সে আভাস স্পষ্টতর [illegible] উঠছে। হ্রদের ওপরের সাদা মেঘে গোলাপীর [illegible]ফোঁটা। দেখতে দেখতে আকাশ লাল হ'য়ে উঠল। [illegible] শান্ত জলে তার প্রতিফলন দেখলুম। মনে হ'ল মানস সরোবরে কে যেন লম্বা লম্বা রক্ত গোলাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই ভাসমান গোলাপ-বনের মধ্যে দিয়ে আমরা নৌকো বেয়ে চলেছি। বাতাসে প্রভাতের স্বুগন্ধ। গায়ে লাগছে মৃদু জলের ছিটে। প্রভাতের আলো আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। চারিদিক্ ফিরে পেল তাদের রং। পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে ২৮শে জুলাই পৃথিবীর কাছে বিজয়ীর মত তার নবজন্ম ঘোষণা করল। রাত্রিশেষের অন্ধকারের মধ্যে সারা পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন তখন কি ক'রে গুরলা মন্দাত্তের শিখরে প্রথম স্বূর্যের প্রথম রশ্মি আমি দেখেছিলুম তার রূপ কাগজ-পেন্সিলে সীমাবদ্ধ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। প্রথম উষার পর্বতের তুষারময় শৃঙ্গগুলিকে দেখাচ্ছিল রূপালী। যেই স্বূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অমনি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। মুহূর্তমধ্যে পর্বত-শিখর জ্বলে উঠল, যেন তার চারিদিকে কে অনবরত তরল সোনা ঢেলে দিচ্ছে ! অতি দ্রুত সেই স্বর্ণ-প্রবাহ পাহাড়ের পার্শ্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল। আশপাশের সাদা মেঘ পাহাড়ের গায়ে গা লাগিয়ে চল্তে গিয়ে সোনালী রংএর ছোঁয়াচ এড়াতে পারল না। কি অপূর্ব সৌন্দর্য ! মানুষের সাধ্য নেই কথায় তা ব্যক্ত করতে পারে। নৃত্যপরা তরুণীর হাল্কা রঙীন্ ঘাগরার মত প্রথম উষার আলো গাঢ়তর হ'য়ে উঠতে লাগল। পূবের পর্বতমালার ওপর থেকে টক্‌টকে লাল আলোর জোয়ার এল। সে আলো পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে বিকশিত করল হ্রদের বুকে। ম্লান পরাজিত রাত্রি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। নতুন দিন আলোর তূর্য বাজিয়ে বিজয় জানাল। মনে মনে তাকে বন্দনা করলুম। স্বপ্নাবেশে আমি ভাবতে লাগলুম যা দেখলুম তার মধ্যে কোন্‌টি বেশী আশ্চর্য ? রাত্রির নিঃশব্দ চন্দ্রালোক না চিরতুষারময় পর্বত-শৃঙ্গের ওপর উষ্ণ গোলাপী উষার আবির্ভাব ?

পৃথিবীতে কদাচিৎ কখনও এমন সব আশ্চর্য দৃশ্যের আগমন ঘটে। প্রথম আলোর চরণধ্বনি পৃথিবীর বুকে বাজবার আগেই তারা আসে এবং চলে যায়। জীবনে একবারও তাদের দেখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ক্ষণিকের অতিথি হয়ে তারা যেন কোন্ এক কল্পলোক থেকে আসে আমাদের অভিনন্দন জানাতে ; তারা যেন

আমাদের কাছে রহস্যে ভরা স্বপ্নরাজ্যের বিদ্যুৎ-চমক। শত শত বৎসর ধরে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী মানস-পরিক্রমা করেছে। মানস সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে তারা হয়তো কত প্রভাতে, কত সন্ধ্যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙীন শোভা দেখেছে। কিন্তু নিঃশব্দ মধ্য রাত্রিতে হ্রদের বুকে ভাসতে ভাসতে আমাদের চারপাশে আমরা প্রকৃতির যে অনন্যসাধারণ রূপ দেখেছি তা কি আর কেউ কোনদিন দেখতে পেরেছে? আলো আর রংএর ইন্দ্রজাল দ্রুত লুপ্ত হয়ে গেল। আমাদের সামনে আবার ঠিক আগেকার মত পৃথিবী। ক্ষণিকের মধ্যে সে পৃথিবীর রংও বদ্‌লে গেল। পুঞ্জীভূত কালো মেঘ কৈলাস আর গুর্‌লা মন্দাত্তকে ঢেকে ফেল্‌ল। দূরে ও অতি দূরে জেগে রইল খালি তাদের তুষারময় লাল চূড়ো। সমস্ত পৃথিবী কালো মেঘে ঢাকা, কিন্তু পাহাড়ের চূড়োর লাল আগুন আগের মতই জ্বল্‌ছে। মানস সরোবরের একদিক গাঢ় নীল, অন্যদিক্ মরকতপ্রভায় মহিমান্বিত। বুনো হাঁসেরা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, আনন্দে কল্‌কল্‌ ধ্বনি করতে করতে তারা হাওয়ায় পাখা মেলে ধর্‌ছে। মাঝে মাঝে এক একটা সামুদ্রিক চিলের চীৎকার হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছে। সারারাত্রি জেগে ও পরিশ্রম ক'রে আমার মাঝিরা ক্লান্ত, তন্দ্রাতুর। একবার তারা ঘুমে ঢুলে পড়ছে, আবার সোজা হয়ে বসে দাঁড় চালাতে চেষ্টা কর্‌ছে। সুক্কুর আলি "হেম্‌-মালা-হেম্‌" বলে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড় বাগিয়ে ধরছে। দাঁড় ফেলবার আগেই ঘুম এসে তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছে। নিজের ডাকে নিজে জেগে উঠে সে আবার দাঁড় ফেলছে। ইতিমধ্যে কখন তার চোখের পাতা বুজে গেছে কে জানে?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। কূলের কোন আভাসই পাচ্ছি না। স্থির করতে পারছি না কোন্ দিকের তীর সব চেয়ে কাছে। মনে হচ্ছে এই সীমাহীন হ্রদের মাঝখানেই বুঝি আমরা পড়ে আছি। গুরলা মন্দাত্তের মধ্যে এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দেখতে পাচ্ছি। কালো মেঘের নীচে তার প্রবেশদ্বার ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মেঘে চারিদিক্ আচ্ছন্ন, গিরিসঙ্কটের মুখে কিন্তু সূর্য্যলোকের প্রাচুর্য। ঠিক যেন এক বিরাট গম্বুজের প্রবেশপথের দ্বারে কে অসংখ্য মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে! হ্রদের গভীরতা আবার বেড়ে চলেছে। পর পর জলের মাপ হচ্ছে ২০০, ২১৩, … এবং ২৪০ ফুট।

আরও পাঁচ ফার্লং এগিয়ে গিয়ে হ্রদের মসৃণ জ… রাশির ওপর আমরা অতি গাঢ় হলদে রংএর … সমাবেশ দেখছি। কি ক'রে এই প্রতিফলন সম্ভব … আমি ভেবে পাচ্ছি না। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে … জমেছে। হ্রদের ওপর হাওয়ার বেগ বেড়ে গে… আমাদের নৌকোর গতি হ'ল আরও ব্যাহত। র… আলি নিজেকে আর জাগিয়ে রাখতে পারছে না। … তাড়াতে গিয়ে সুক্কুর আলির অবস্থা হয়ে উঠেছে হাস্যক… ঢুলতে ঢুলতে ও শূন্যের ওপরেই দাঁড় টেনে চলেছে … মুখে ক্রমাগত বল্‌ছে—'সু—বা—লা—লা'। ঘুমিয়ে ঘুমি… ও কথা কয়। হঠাৎ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে … আমায় জিজ্ঞাসা করছে ব্যাপার কি? কিন্তু ব্যাপার … তা যে কেউই জানে না! সাতটা বাজল, ঘুম আমাকে… আক্রমণ করেছে। তন্দ্রাঘোরে আমি দেখছি হ্রদে… ওপর দিয়ে এক পাল লাল্ রংএর বুনো পাখী … আসছে। মনে হচ্ছে বাতাসে ভেসে আসছে ভারী … বীণার সুর! হঠাৎ এক বিরাট সামুদ্রিক সাপ ঢেউএ… মধ্যে থেকে ফণা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াল, আবার জ… মিলিয়ে গেল। আমি দেখলুম তরঙ্গ-স্রোতে গা ভাসি… তিমি আর শুশুকের দল চলছে। কিন্তু না, ঘুমুলে চল… না। যে কোন মুহূর্ত্তে ঝড় উঠতে পারে। তন্দ্রাচ্ছ… মাঝিদের দু'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বেশ ভাল ক'রে হা… মুখ ধুয়ে ফেল্‌লুম। এক টুকরো রুটি, একটা সিদ্ধ ডি… এবং এক বাটি দুধ খেয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। আ… ঘুম আসছে না। আমি পাইপ ধরিয়ে জল মাপতে লে… গেলুম।

সকাল ন'টা বেজেছে। আমরা বারো ঘণ্টা জলে… উপর রয়েছি। গভীরতা ২৬৮ ফুট। দক্ষিণ-পশ্চি… তীরের কোন আভাসই নেই! রহিম আলি বিচলি… হয়েছে। মেঘ একটু পাতলা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হ'… দূরের উপত্যকায় কতগুলি নিভৃত স্থান চোখে ঠেকল… পাহাড়ের গা দিয়ে এক সঙ্কীর্ণ জলস্রোত বয়ে চলেছে… সূর্যের আলোয় পাহাড়ের ছবি তা'তে প্রতিফলিত হচ্ছে… আকাশ পরিষ্কার থাকলে তার রং হচ্ছে নীল, মেঘ এলে…

…যাচ্ছে সবুজ। এক ঝাঁক মাছ জলে খেলা করতে …তে লাফিয়ে উঠছে।

আরও কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। সীমাহীন জল-…শির ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কূলের কোন …চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে যাত্রার প্রাক্কালে সেরিং যে …ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বুঝি তাই ঠিক হবে। কিন্তু না, …রে—অতি দূরে অস্পষ্ট তীরভূমির আভাস পাচ্ছি যেন। …তাড়াতাড়ি জল মাপতে লেগে গেলুম। ২৫৩ ফুট থেকে …মতে কম্‌তে গভীরতা ৮২ ফুটে দাঁড়াল। পাহাড়ের …য়ে ইয়াক্ আর ভেড়ার পালকে চরতে দেখলুম। …আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। এখানে কিন্তু …ঢেউএর জোর খুব বেশী। একটা ঢেউ নৌকোর গায়ে …আছড়ে পড়ে আমার ফারকোটটাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে …ল। পরিশ্রান্ত মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে এগিয়ে …তে। আমরা বলাবলি করতে লাগলুম খেয়েদেয়ে …আগুন পোহাতে পারলে কি আনন্দই হয়! তীর দেখা …চ্ছে বটে, কিন্তু পৌছতে এখনও অনেক সময় লাগবে। …চোখের সামনে বেলা গড়িয়ে আসছে।

এবার মনে হচ্ছে গুর্‌লা পর্বত দক্ষিণে যেন ঠিক হ্রদের …ল থেকে উঠেছে। পর্বতগাত্রকে আগের চেয়ে অনেক …বেশী খাড়া বলেই বোধ হ'ল। আশপাশের মঠের …বাসীরা নদী কি ঝরণার জল খান না, তাঁরা পানের …জন্য হ্রদের জলই ব্যবহার করেন। বাস্তবিক এত পরিষ্কার, …মিষ্ট আর উপকারী জল আমি কখনও খাই নি। …স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, নীলকান্ত মণির মত নীল এ জল …দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনি সুস্বাদু। তীর্থ-…যাত্রীদের কাছে সফেন সুরার চেয়েও মানস সরোবরের …জল অধিক উপাদেয়।

…নৌকোর কারাবাস থেকে আমরা মুক্তি পেতে চলেছি। হ্রদের তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দু'-একবার দাঁড় চালাতেই নৌকো একটা কদমাক্ত শুকনো আগাছার স্তূপে এসে ঠেকল। শীতের বরফ হয় তো ঠেলে সেগুলোকে তীরভূমি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আগাছাগুলোকে পেরুলেই কাদায় ভরা অগভীর জল চোখে পড়ে। এখানে নামলে হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে বসে যাব। ঘড়িতে দেড়টা বাজল। আমরা সাড়ে ষোল ঘণ্টা হ্রদের ওপর রয়েছি। আরও কাছে এসে দেখছি এখানে নৌকো লাগালে তীরে ওঠা প্রায় অসম্ভব। তাই দেড় ঘণ্টা ধরে আবার আমরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগুতে লাগলুম। শেষ কালে সুবিধে মত জায়গা দেখে নৌকোকে একেবারে তীরে তুলে ফেলা হ'ল। মোট আঠারো ঘণ্টা মানস সরোবরে নৌকো-বিহার ক'রে আমরা মাটিতে পা ঠেকালুম।

দূরে একজন রাখাল ঘুর্‌ছে। আমাদের দেখেই সে পালাল। কতগুলো শুকনো কাঠ জড় ক'রে আগুন জ্বালালুম। চা তৈরী হ'ল, ভেড়ার মাংস আগুনে সেঁকে নেওয়া হ'ল। আমরা তিনজন তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলো খেলুম। খাওয়া শেষ হ'লে নৌকোর মাস্তুল, পাল আর দাঁড়গুলো দিয়ে একটি ছোট্ট তাঁবু খাটান হ'ল। সন্ধ্যে সাতটার সময় সে তাঁবুর ভেতর আমি নিদ্রার আয়োজন করতে লাগলুম। ফারকোটটা দিয়ে শরীর ঢেকে তার ওপর কম্বল চাপা দিলুম। সঙ্গের জীবন-বয়াগুলো আমার বালিশ আর বিছানার কাজ করল। একত্রিশ ঘণ্টা সমানে খেটেছি। শুতে শুতেই গভীর নিদ্রা আমাকে অচেতন করে ফেলল। সারা রাত্রি তাঁবুর চারপাশে যে প্রচণ্ড ঝড় চলেছে, ভোরে পঁচিশ জন তীর্থ-যাত্রী সরোবর-পরিক্রমায় কখন আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে তা জানতেও পারি নি।

সু ভা ষ   স্ম র ণে

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা… বাংলার বড় আদরের সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে তাই চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে… সুভাষচন্দ্র আজ কোথায় জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে জনগণের মনোরাজ্যে তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁ… অমর কাহিনী যুগে যুগে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি মাত্রকেই অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই স্মরণীয় তিথিতে তাঁ… পুণ্য নাম স্মরণ করে রামধনু নিজেকে ধন্য মনে করছে।

জয় হিন্দ।

কয়েকটী স্মরণীয় ঘটনা

১৮৯৬—কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম।

১৯২০—সুভাষ কর্ত্তৃক আই. সি. এস্ পদ প্রত্যাখ্যান।

১৯২১—সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসে যোগদান, ২৩শে ডিসেম্বর প্রথম দেশের জন্য কারাবরণ।

১৯২৪—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ণধার রূপে সুভাষচন্দ্র। বয়স ২৮ বছর।

১৯২৫—সুভাষচন্দ্র বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হয়ে সুদূর মান্দালয়ে প্রেরিত। দুরন্ত রোগে আক্রান্ত।

১৯২৮—কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সামরিক পোষাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক রূপে সুভাষচন্দ্র।

১৯৩০—আবার কারাগার। কলিকাতার মেয়র পদে সুভাষ নির্ব্বাচিত।

১৯৩১—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচ… যোগদান।

১৯৩৩—ইয়োরোপে সুভাষচন্দ্র।

১৯৩৬—আবার ভারতে, আবার গ্রেপ্তার।

১৯৩৮—ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে সুভাষচন্দ্র (হরিপুর…

১৯৩৯—দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি পদে সুভাষচন্দ্র (ত্রিপু… গান্ধীজির পরাজয় স্বীকার। ত্রিপুরীর… সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি-পদত্যাগ, ফরো… ব্লকের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০—সুভাষচন্দ্রের অন্ধকূপের মিথ্যা-স্মৃতিস্তম্ভ… সারণ আন্দোলন।

১৯৪১—সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধান। … মস্কো, বার্লিন, শেষে সাবমেরিনে জাপান…

১৯৪৩—ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত। সর্ব্বাধিনায়ক পদে সুভাষচন্দ্র। 'নেতাজী' উপাধি লাভ। ব্রহ্মে, মালয়ে অভূতপূর্ব্ব সাড়া। নীলামে ৭ লক্ষ টাকায় নেতাজীর গলার ফুলের মালা বিক্রী।

১৯৪৪—আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত আক্রমণ। 'চলো দিল্লী'! ভারতের মাটীতে কোহিমায় প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিকূল।

১৯৪৫—যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন। জাপানের পরাজয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাজ অসমাপ্ত। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ ঘোষিত।

১৯৪৭—দিল্লীর লাল কেল্লায় স্বাধীন ভারতের তিন-রঙা পতাকা।

জনগণমন-অধিনায়ক

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

না, কিছুতেই না। কিছুতেই সুবি আর পড়বে না …হেবী স্কুলে। শান্ত, বিনয়ী, নম্র ছেলে। বছরের …েষে মাষ্টার মশাইদের রিপোর্ট আসে, ক্লাসের সেরা …ছেলে সুবি। তার এই খেয়ালের বিশেষ কোনো কারণ …জে পান না জানকী সাহেব। কত অনুনয়-বিনয়, …ত লোভ দেখানো! কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। … একবার ঠিক করেছে তা থেকে বিন্দুমাত্র নড়ানো …য় না সুবিকে!

জানকী সাহেব বাধ্য হয়েই ছেলেকে দেশী ইস্কুলে এনে …র্তি করলেন। কিন্তু ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের চেহারা …পাষাক-আষাক দেখে বিস্ময় লাগে কোট-প্যাণ্ট-…রা সুবির। এ কী! কেমনতর দীর্ণ-শীর্ণ সব চেহারা, …ছেঁড়া-খোঁড়া, নোংরা জামাকাপড়! কেউ তার সাথে …ন খুলে কথা বলে না, দূরে দূরে থাকে। যেন অচেনা …াং থেকে পথ ভুল ক'রে সে ছিটকে এসেছে! যেন সে …দের কেউ নয়!

আবার আর এক আব্দার ওঠে জানকী সাহেবের …নে। কোট-প্যাণ্ট নয়, মোটা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে …স্কুলে যাবে সুবি।

হ্যাঁ, মোটা ধুতি-পাঞ্জাবী! দরিদ্র দেশের সাধারণ …মানুষের যে পোষাক, তারও তাই। বিদেশী ঐশ্বর্য্যের …ও ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে, …লাসিতার অনেক উর্দ্ধে আর এক রাহুমুক্ত নতুন দেশের …প্ন দেখে।

নিথর অন্ধকারে অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে অরণ্যের মহামহীরুহের সাধনা এগিয়ে চলে…

প্রবেশিকা পরীক্ষার অল্প কিছু দিন মাত্র বাকি, কিন্তু সুবির পড়াশোনায় মন নেই। রাত ক'রে বাড়ী ফেরে। ঠিক মত স্নান নেই, খাওয়া নেই—পড়া তো দূরের কথা। মা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কোথায় থাকে ছেলে এত রাত অবধি!

গভীর রাত। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিঝুম নিঃসাড় চারদিক্। শুধু বাড়ীর এক বুড়ী ঝিয়ের ঘরে প্রদীপ জলছে। আর তারই মিট্‌মিটে আলোয় ছোট্ট সুবির পায়ে বুড়ী ঝি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

ভয়-পাওয়া গলায় ঝি বললো—"ইস্! এতখানি কেটে গেল কি ক'রে?"

সুবি বললো—"অন্ধকারে বস্তি থেকে বেরোবার সময় কি ক'রে কাটলো টের পাই নি।"

—"কিন্তু সামনে তোমার পরীক্ষা, এখনও যদি এমনি ভাবে বস্তির রোগী ঘেঁটে ঘেঁটে বেড়াও তবে—"

—"নইলে যে বস্তির অনেক কলেরা রোগীর মুখে এক ফোঁটা জলও পড়বে না। এর চেয়ে কি পরীক্ষাটা বড় ঝি-মা?"

—"কিন্তু মা যদি টের পান?"

এতক্ষণ চোখ পড়ে নি, হঠাৎ দেখল মা এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। কিছুই আর তাঁর টের পেতে বাকি নেই।

পরদিন থেকে বাইরে বেরোন একদম বন্ধ হ'ল। সামনে পরীক্ষা। কিন্তু তবুও পড়াশোনায় মন বসে না। তার মনের সমস্ত একাগ্রতা উজ্জ্বল আলো হয়ে বস্তিতে, গ্রামে, হাটে-মাঠে দেশের দরিদ্র চেহারাটাকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখে।

কিন্তু তবুও পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, যে প্রথম হয়েছে তার থেকে মাত্র দু' নম্বর কম পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হয়েছে সুবি।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করা হ'ল সুবিকে। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ট্রাম-রাস্তা পর্য্যন্ত আসতে মিনিট তিনেকের মত লাগে। সেটুকু পথ হেঁটে আসতেই পকেটের সমস্ত পয়সা ফুরিয়ে যায়। অন্ধ, কানা, খোঁড়া ভিখিরীদের বাড়ানো হাতকে কিছুতেই বিমুখ করতে পারে না সুবি। তারাও উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে, কখন তাদের সেই দাতাবাবু আসেন!

ফলে এলগিন রোডের মোড় থেকে কলেজ অবধি অধিকাংশ দিনই তাকে হেঁটে আসতে হয়।

সুভাষ আর তাঁর এক ভাগ্নে একই ঘরে ব'সে পড়াশোনা করতেন। সেই ভাগ্নেটি একদিন দেখেন, বইয়ের আলমারীর পেছন থেকে সারি সারি রাশি রাশি পিঁপড়ে বেরুচ্ছে। বইয়ের আলমারীতে পিঁপড়ে কেন?—খান-কয়েক বই সরিয়ে দেখলেন দু' খানা রুটি লুকোন। নিশ্চয়ই সুবির কাণ্ড!

—"বইয়ের আলমারীতে রুটি কেন রে?"

—"ওঃ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম একদম। ঐ যে একটা অন্ধ বুড়ী আসে না, রোজ বিকেলে ওকে আমার থেকে দু' খানা রুটি দেই। কালকে আর আসে নি, তাই তারটা ওখানে রেখে দিয়েছি।"

অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ব্যবহারে ছাত্রেরা সবাই অতিষ্ঠ। ভারতবাসীরা যে অত্যন্ত নীচু স্তরের জীব এ বিষয়ে তাঁর কটূক্তির অন্ত নেই। কথায় কথায় ভারত-বর্ষের নিন্দা আর অপমান!

নাঃ, আর নয়। আর এ সহ্য করা যায় না। এর শিক্ষা দেওয়া দরকার। কাজটা হয়তো সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু দেশের সম্মান যে আরও বড়!

সিঁড়ি বেয়ে সাহেব নামছেন একদিন, হঠাৎ পেছ থেকে পেলেন বিষম ধাক্কা, সঙ্গে আরও কিছু। গড়া গড়াতে পড়ে গেলেন নীচে।

কার এত বড় স্পর্দ্ধা? এ কলেজে কার এ দুঃসাহস!

অনেক অনুসন্ধানের পর সুভাষচন্দ্রকে ডাকা হ'ল অধ্যক্ষ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কিছু জান বিষয়ে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তা হ'লে তুমিই মেরেছ?"

—"না।"

—"তবে কারা মেরেছে তুমি জান?"

—"জানি!"

—"কারা?"

—"জানলেও তাদের নাম আমি বলতে পারব না।"

—"তুমি বলতে বাধ্য।"

—"উঁহু।"

—"তোমাকে বলতেই হবে।"

—"অসম্ভব।"

ফল যা হবার। কলেজ থেকে বিতাড়িত হলে সুভাষচন্দ্র। বুঝলেন,—আদর্শের পথ এমনি উপল বন্ধুর।...

১৯২৮ সন। সারা কলকাতায় হৈ হৈ রৈ রৈ সকলের মুখেই এক কথা। কী, না—কংগ্রেসের অধিবে হবে, সভাপতি স্বয়ং মতিলাল নেহেরু।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠল। আর তার অধি নায়ক হলেন আমাদের সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু তাঁর পোষাক-আষাক, হাবভাব দেখে সবা হেসেই খুন।—বাপু, হয়েছ তো স্বেচ্ছাসেবক, না বলে,—তাদের কাপ্তান, তা'তে আবার অমন মিলি কমাণ্ডারের মত সাজপোষাক কেন হে?

কত বিদ্রূপ, কত টিটকিরির পশলা বয়ে গেল!

তবুও এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই, এতটুকু কান এতটুকু মন নেই এ সব তুচ্ছ ঠাট্টা-টিটকিরির দি সুভাষচন্দ্রের অনেক—অনেক উর্দ্ধ মনোলোকে এই তুচ্ছতা ছায়া ফেলতে পারে না।

তিনি তখন দেখছেন আসন্ন সংগ্রামের অছদ্ম স্বরূপ। নি দেখছেন—মুক্তির সন্ধানে কোটি কোটি মানুষ কত খ-কষ্ট সহ করছে, কত দুর্গম পর্ব্বত, কত দুস্তর সমুদ্র, বিঘ্ন-সঙ্কুল অরণ্য পার হচ্ছে! তিনি তাদের অধিনায়ক ার জন্যে প্রস্তুত হবেন না?

তাই তো তাঁকে তারাহীন রাত্রে ব্রহ্মের মাঠে এগোতে খছি। তাই তো প্রান্তহীন প্রান্তরের ওপারে সুজলা-সুফলা দেশের কান্না তাঁকে উতলা ক'রেছিল, তাঁকে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুতে দেয় নি কোন দিন।

কিন্তু.....

কিন্তু আজকের কোন কান্নাই কি তাঁর কানে পৌঁছুতে পারছে না? নাকি কোন বনবহুল অন্ধকারের অতলে ব'সে তিনি মানুষের কান্নাহীন শস্য-শ্যামল স্বপ্নের জন্য আবার নতুন ক'রে সাধনা করছেন?

হে মরণজয়ী বীর!

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

াংলা দেশের কোন্ সে রে ভাই মহাবীর সন্তান,—
র ইতিহাস রচিল ভারতে, বাঙ্গালীরে দিল মান।
নব যুগের নব গৌতম, কিসের লাগিয়া হায়,
গিরিপথ, সপ্ত সাগর হেলায় দলিলে পায়?

গা প্রতাপের কাহিনী শুনেছি, দেখি নি তাঁহারে কেহ,
ামার মাঝে কি সে বীর প্রতাপ ফিরে পেল নব দেহ?
খে দেখি নাই শিবাজীরে কভু, শুনেছি তাঁহার পণ,
ন শিবাজী হেরিয়া আজিকে সার্থক এ জীবন।

পড়ি তত মূক হয়ে যাই—পুণ্য জীবনী তব,
নে রোমাঞ্চ শিরায় শিরায় কাহিনী সে অভিনব।
া সন্ন্যাসী,—সাধনায় রত, সহসা লুকাল কোথা,
ল নগরী—জিয়াউদ্দীন, কে তারে চিনিবে সেথা!

থনে শুনি জলদগভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসে,
থা ইয়োরোপ, কোথায় জাপান, সপ্ত সাগর হাসে।

তার পর একি, এমন কাহিনী কেহ কোথা শুনিবে না,
ভারত বাহিরে ভারতের লাগি জাগে ভারতের সেনা।

কোহিমা দখল, ক্রমে ইম্ফল লুটায় পথের ধারে,
আজাদী ফৌজ পুঁতিল ঝাণ্ডা দূর আসামের পারে।
আরো দিন যায়, আজাদী দলের বেড়ে যায় রণরণি,
অস্ত্রে তাদের বাজে বার বার দিল্লী চলার ধ্বনি।

সহসা ভীষণ, হায় ভগবান্, একি অঘটন হয়—
বিধি প্রতিকূল, প্রকৃতি আকুল, হ'ল না হ'ল না জয়।
ধ্বসিল বিমান মহাকাশ হ'তে—সহসা পড়িল খসি',
নব ভারতের নব হিমালয় সাথে সাথে পড়ে ধ্বসি'।

আশী কোটী চোখ বহি ঝরে জল সহসা কাহার লাগি,
নব ভারতের জনাধিনায়ক, হে বীর সর্ব্বত্যাগী!
স্বাধীন ভারত অভিনন্দন জানায় আজিকে তার,
নব আলোকের বন্দনা শেষ, নেতাজী, নমস্কার!

নেতাজী-বন্দনা

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

নেতাজী, আজিকে নিখিল ভারত করিছে তোমার বন্দনা,
দেখায়েছ তুমি এই ভারতের স্বাধীনতা-পথ রন্ধ না।
স্বদেশের পায়ে স'পিলে জীবন স্বাধীন ভারত-ধূর্জ্জটী,
নিরাশ, হতাশ জনতার মাঝে বাজায়ে তুলিলে তূর্য্যটী।
তাদের শুষ্ক কণ্ঠ ভিজালে জাতীয় গানের মূর্চ্ছনায়,
জীবন তোমার করেছ অতীত ভারত-মাতার অর্চ্চনায়।
তাই ত' গাহিছে তব জয়গান পাপিয়া, কোকিল, চন্দনা,
নিখিল ভারত করিছে আজিকে তোমার চরণ বন্দনা।

প্রণাম তোমায় হে চির-তাপস, স্বাধীন ভারত-ধূর্জ্জটী,
কুজ্ঝটি-ঢাকা অম্বর-মাঝে তুমিই উঠালে সূর্য্যটী।
জ্বালালে দীপালী ভারতবাসীর তিমির-গভীর অন্তরে,
দেখায়েছ রণে বীর্য্য যতেক—নাহিক' তাহার অন্ত রে!
তব বীরত্বে বিচলিত আজি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ত';
শুনিয়া তোমার গৌরব-কথা ভারতবাসী যে নন্দিত।
দেখায়েছ তুমি স্বাধীনতা-পথ ঐক্য, বীর্য্য,—দ্বন্দ্ব না;
নেতাজী, আজিকে করিছে ভারত তোমার চরণ বন্দনা।

দিল্লী-পথের ডাক

(আজাদ হিন্দ ফৌজের গান)

কুমারী দীপালী সেনগুপ্তা

দিল্লীর পথে চলো মুক্তির সেনাদল!
রণ-হুঙ্কারে হবে ধ্বনিত গগনতল।
সম্মুখে চলো বীর, উন্নত নভে শির,
ভারতের আহ্বানে প্রাণ আজি চঞ্চল;
দিল্লীর পথে চলো মুক্তির সেনাদল!

নদী, বন, পর্ব্বত···দূরে—ওই বহু দূরে
নির্ঝর ঝরে, শোনো, এগিয়ে চলার সুরে।
হের হিমগিরি 'পরে মেঘের পতাকা ওড়ে,
সিন্ধুতে জাগে, শোনো, আহ্বান-কলরোল!
দিল্লীর পথে চলো মুক্তির সেনাদল!

সম্মুখে শত্রুর দুর্ভেদ এ প্রাচীর
চূর্ণ করিতে হবে, নির্ভয়ে চলো বীর।
চালাও চালাও রথ, আলোকবিহীন পথ
স্বদেশের স্বাধীনতা-স্বপ্নে সমুজ্জ্বল;
দিল্লীর পথে চলো মুক্তির সেনাদল!

অপরাধ

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

শীতের মধ্যাহ্ন। মেঘমুক্ত আকাশের প্রগাঢ় নীলিমায় নিবিড় প্রশান্তি। সোনালী রোদের অজস্র হাসি ছড়িয়ে আছে উদাস মাঠের তৃণে তৃণে। জনবহুল রাজপথের বুকেও এসে লেগেছে সে হাসির ছোঁয়াচ।

সামরিক লরীখানা রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। তরুণ চালক, অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে দু'হাতে স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে—যেন যন্ত্রযানেরই অংশ একটা যন্ত্রমানব! পথের বুকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চালক সৈনিক গতিবেগকে অনুভব করছে,—প্রকৃতিকে উপভোগ কর[illegible] তার অবসর নেই।

সহরের প্রান্তভাগে সামরিক লরীর সংস্কার[illegible] সেখানেই তাকে চারটের মধ্যে পৌছাতে হবে। হাতখানাকে একটু মোচড় দিয়ে একবার সে হাত-ঘ[illegible] চোখ বুলিয়ে নিলে—সবে আড়াইটে।

মোড় ঘুরে গাড়ীখানা একটা জনবিরল পথে এসে পড়ল। এ পথে আর ততটা সতর্কতার প্রয়োজন নেই, তাই এতক্ষণ বাদে চালক একবার পথের দু'ধারে দৃষ্টিপাত করলে—আঁখিতারকা দু'টিকে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে তাকালে। কয়েক গজ সুমুখেই বাঁ-ধারে একটা লাল রংয়ের ডাক বাক্স, আর তারই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে একটা অপ্রশস্ত রাস্তা। মুহূর্ত্তের জন্য সৈনিকের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ওই পথটাই তার মনকে এমনি ভাবে চঞ্চল করে তোলে। কেন, তা সে জানে না।

ধীরে ধীরে গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে এলো। কী আছে এ পথে? এর অজানা রহস্যের সমাধান করতে হবে আজ। আর একবার হাত-ঘড়ীর ওপর সে দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে,—হাতে তার এখনো অনেক সময়। গাড়ী ঘুরিয়ে একটা বিস্তৃত প্রান্তরের কাছে এসে পৌছালো সৈনিক।

প্রান্তরের বক্ষ কলকোলাহলে মুখরিত! একদল স্কুলের ছেলে, বোধ হয় শিক্ষকের সঙ্গেই, ছুটির দিনটাকে আলো-হাওয়ায় উপভোগ করতে এসেছে।

মাঠের মাঝে একদল ছেলের ক্রিকেট খেলা চলছে। দেহে স্বাস্থ্যের দীপ্তি—মনে অসীম উৎসাহ।

একটা বল তীরের মত ছুটে বেরিয়ে এলো, কিন্তু এধারের বেঁটে ছেলেটি অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু' হাতে ধরে ফেললে। চারধার থেকে প্রশংসার ধ্বনি জেগে উঠল, "চমৎকার! চমৎকার!"

এধারে ছেলের দলে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল—"[illegible]ক্, এতক্ষণে আউট হ'ল। কত রান্ করেছে? অনেক হয়েছে!"

ওধারে তিন চারটি কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে [illegible]য়ে আছে; তারই ছায়ায় পুরু ঘাসের ওপর পর[illegible]রের দেহকে উপাধান ক'রে শুয়ে আছে তিনটী ছেলে, কখনো বা তারা খেলা দেখছে, কখনো বা নিজেদের [illegible] কি বলাবলি করে সহজ উচ্ছ্বাসে হেসে উঠছে। [illegible]র কাছ থেকেই একটু দূরে রৌদ্রছায়ায় বসে একটী ছেলে একখানা বই পড়ছে, মাঝে মাঝে মাঠের দিকে তাকিয়ে খেলার গতি নিরীক্ষণ করছে।

"ইস্, মণ্টু যে একেবারে কবি হয়ে উঠলি! মাঠে বসে বই পড়া হচ্ছে! খেলবি?"

মুখ তুলে মণ্টু দেখলে একটা আধ-ভাঙ্গা ব্যাট আর রাবারের বল হাতে নিয়ে বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। বই রেখে সে উঠে পড়ল, বলল,—"আয়, ওধারে খেলি গে। ক্যাচ্ ধরতে পারলেই কিন্তু আউট।"

কৃষ্ণচূড়ার একটী ঝুঁকে-পড়া শাখায় বসে দু'টী ছেলে আনন্দে দোল খাচ্ছিল। তাদের হাসির রেশ দূর হ'তে সৈনিকের কানে ভেসে এলো।

—"সুধীর, দেখে যা কী মজার ছবি!"

—"আমি এখন যাচ্ছি না। দিব্যি আরাম ক'রে দোল খাচ্ছি।"

—"এই আইসক্রীম, এ ধারে, এ ধারে।" এক সঙ্গে নানা বিচিত্র ধ্বনি বাতাসে ভেসে এল।

সৈনিকটী এক এক ক'রে সবই লক্ষ্য করতে লাগল। তার ভাল লাগছে—এদের সব কিছুই ভাল লাগছে। ওপরে উদার আকাশ, আর নীচে আলোকস্নাত প্রান্তর; তারই মাঝখানে এই ক'টী সজীব প্রাণ হ'তে কী গভীর আনন্দই না ছড়িয়ে পড়ছে!

স্মৃতির পথ চেয়ে সৈনিকের মনে জেগে ওঠে তারই হারানো দিনগুলোর কথা—তারই বাল্যের ছাত্রজীবন। তখন হৃদয়ে ছিল এমনি সহজ উচ্ছ্বাস···আলোর মত—হাওয়ার মত। ওই যে গাছের ছায়ায় গা এলিয়ে তিনটী বন্ধু উপভোগ করছে পরস্পরের নিবিড় ভালবাসা—অমনি গভীর আবেগময় ভালবাসা একদিন তার মনেও তো ছিল! আজ মনে এসেছে বিচার, বিতর্ক,—হৃদয় হয়ে গেছে যন্ত্রীভূত।

তার শৈশবের সহচরদল! আজ কোথায় তারা? এই অপরিচিত প্রান্তরে, অপরিচিত বালকদের মাঝেই কি তারা আবার ফিরে এল? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তারা এত দিন?

যে জীবনটাকে সে পেছনে ফেলে এসেছে, যে দিন-

গুলোকে সে ফেলেছে হারিয়ে, তারই মধুর স্মৃতিতে সহসা সৈনিকের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল, বর্ত্তমানকে সে যেন ভুলে গেছে একদম !

ছেলেদের খেলার সময় শেষ হয়ে এলো। সবাই একে একে এসে জমায়েৎ হ'ল শিক্ষকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লরীর চালকটাও চমক ভেঙ্গে জেগে উঠল। ঘড়ীর দিকে তাকাতেই সাদা হয়ে গেল তার মুখ। চারটে বেজে গেছে।

যথাসম্ভব তীব্র বেগে লরীখানা ছুটে চল্ল। আবার তেমনি ভাবে সতর্ক দৃষ্টি সম্মুখে ফেলে পাথরের মত বসে রইল সৈনিক।

গ্রুপ-কমাণ্ডার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "তুমি কুড়ি মিনিট লেট হয়েছ।"

সৈনিক মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি আবার বললেন, "এ বিষয়ে তোমার কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে ? সামরিক নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ তোমার জানা নেই ?"

সৈনিক একবার মাথা তুলে তাকাল, ঠোঁট দুটো সামান্য একটু নড়ে উঠল, কিন্তু কি জবাব দেবে সে! সৈনিক-জীবনে ভাবপ্রবণতা কে বরদাস্ত করবে? গুরুতর অপরাধ করেছে সে।

কমাণ্ডার বললেন, "তোমার এ অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারলাম না। শাস্তির জন্য তৈরী হও।"

বাস্তবিক ক্ষমার অযোগ্যই তো সে।

কৃতী গ্রাহক শ্রীমান্ মনীষকুমার

ডাঃ মনীষকুমার বসু মল্লিক

রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানা দিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু বড় হয়েও তাঁরা রামধনুর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে পারেন নি। এখনও তাঁরা রামধনুর নিয়মিত গ্রাহক এবং তা পড়ে ছেলেবেলাকার মতই আনন্দ পান। এই রকম একজন গ্রাহকের ছবি এখানে দিচ্ছি। এঁর নাম শ্রীমান্ মনীষকুমার বসু মল্লিক। ইনি এখন একজন কৃতী চিকিৎসক, মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. পাশ ক'রে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি বরাবর বৃত্তি পেয়ে এসেছেন। ১৯৪৬ সনে সিনিয়র গুডিফ্ স্কলার নির্ব্বাচিত হন। এঁর বাড়ী হচ্ছে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল গ্রামে। এঁর পিতা শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু মল্লিকও একজন কৃতী চিকিৎসক।

যে বই তোমরা পড়তে পার

ছড়া—৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তমেঘ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, দেশ বিদেশের লেখা—শ্রীঅশোক গুহ সম্পাদিত, বাঁশি বাজে ঝন্ ঝন্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, হরে মাঝি—শ্রীসুন্দররঞ্জন মল্লিক, আমরা বাঙ্গালী—শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, রং-চং—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দুই খুনী—শ্রীসুকুমার দে সরকার, বালক কেশব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অলিভার টুইষ্ট—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (অনুবাদ)। ছেলেবেলার কথা (ম্যাক্‌সিম্ গর্কি)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (অনুবাদ)।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

কার্ত্তিক সংখ্যা রামধনুতে প্রকাশিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :—

১ম পুরস্কার—শ্রীউর্বসী সেনগুপ্তা (ঢাকা)। ২য় পুরস্কার—শ্রীপ্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী)। ৩য় পুরস্কার—শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী (কলিকাতা)। এঁরা ছাড়া শ্রীচিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকুমার সান্যাল, শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতরঞ্জন সেন, শ্রীঅমলশঙ্কর ভাদুড়ী, কুমারী রাবেয়া খাতুন, শ্রীঅমলকুমার মিত্র ও শ্রীমল্লিকা রায়—এঁদের লেখাগুলিও বেশ ভালো হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী গত ১৪ই জানুয়ারী থেকে আবার অনশন সুরু করেছিলেন। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি এই অনশন চালিয়ে যাবেন ব'লে সংকল্প করেছিলেন। এই মহামানবের জীবনের যাতে কোন রকম হানি না হয় সে জন্য দিল্লীবাসী তাঁর কতকগুলি সর্ত্ত মেনে নেওয়ায় ৪ দিন পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেছেন।

* * *

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভাও। দু' এক দিনের মধ্যেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। ১৫ই আগষ্টের পর সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ডাঃ ঘোষ যে ভাবে পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট চালিয়ে ছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিলেন দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। ডাঃ রায়ের ওপরও যে এই অভিযান সমানে চালিয়ে যাবেন সে ভরসা আমাদের আছে।

গত ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ সাড়ম্বরে তার স্বাধীনতা উৎসব পালন করেছে। ইংরাজ-কর্ত্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মদেশ ঐ দিন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার গৌরব অর্জ্জন করল। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ভারত থেকে ব্রহ্মকে কি উপহার দেওয়া হয়েছে জান ? বোধিদ্রুম,—যার তলায় বসে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করেন তারই একটি চারা এবং এক কলসী পবিত্র গঙ্গাজল। বর্ম্মীরা সবাই বৌদ্ধ, কাজেই বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারত থেকে এ ধরণের উপহার পেয়ে তারা অত্যন্ত খুসী হয়েছে। রেঙ্গুনের বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডায় সমারোহের সঙ্গে এই শিশু বোধিদ্রুম রোপণ করা হয়েছে।

* * *

কাশ্মীরে বিদেশীয় আক্রমণ এখনও চলেছে। ভারতীয় সৈন্যেরা অবশ্য তাদের বাধা দিতে কসুর করছে না। ভারত সরকার ব্যাপারটির সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

—ইউ. এন্. ওর নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর-সমস্যা উত্থাপিত করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানাবার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। পাকিস্থান থেকেও ঐ রকম একটি প্রতিনিধি দল গেছেন, এবং সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের ৩য় টেষ্ট ম্যাচ্ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এবারেও খেলার সময় ঝড়-বৃষ্টি সুরু হওয়ায় সত্যিকার ক্রিকেট খেলা,—বিশেষতঃ শেষের ইনিংস্এ, সম্ভব হয় নি। ভারতীয় দলকে এবারেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ২৩৩ রানে।

* * *

কলকাতায় রণজী ক্রিকেট-প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সঙ্গে হোলকারের খেলা হয়ে গেল। বাংলা দল পরাজিত হয়েছে।

* * *

সম্প্রতি পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন হয়ে গেল। মূল সভাপতি হয়েছিলেন স্যর্ আর. এন্. চোপরা।

* * *

বড়দিনের সময়ে নানা জায়গায় নানা সভাসমিতি, প্রদর্শনী ইত্যাদি হয়ে থাকে, এবারেও হয়েছে। তার মধ্যে দু'টির উল্লেখ করছি:

প্রথমটি হচ্ছে "যুগান্তর" পত্রিকার ছোটদের আসরের পরিচালক "স্বপন-বুড়ো"র পরিচালনায় "সর্ব্বএশিয়া সব পেয়েছির আসর"। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ এটির উদ্বোধন করেন, এবং পতাকা উত্তো-লন করেন কলকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক—বিশেষ ক'রে শিশু-সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, গায়ক প্রভৃতি এতে ছোটদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আসরটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলেন। সঙ্গে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানের কোন কোন অংশের চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে, শীগ্ গিরই তোমরা তা দেখতে পাবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে লেক ময়দানে নিখিল বঙ্গ শারীরিক শিক্ষা সম্মেলন। এটির উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গের নবনির্ব্বাচিত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। স্বাধীন দেশে শারীরিক শিক্ষা চর্চ্চার প্রয়োজন যে কত বেশী তা বোঝা-বার জন্যই এই বিরাট্ সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ ধরণের সম্মেলন বোধ হয় এ দেশে নতুন। সম্মেলনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল।

এ ছাড়া বোম্বাইএ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ২৫শ অধিবেশনও এই সময়ে হয়ে গেছে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এতে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

* * *

সম্প্রতি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান নায়ক বীর বিপ্লবী সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা'র) স্মৃতিবার্ষিকী হয়ে গেছে। এঁর অদ্ভুত জীবনকাহিনী তোমাদের আর একদিন শোনাব।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

অসি বাজে ঝন্ ঝন্ (২য় সংস্করণ)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। দাম—১৸০

এটি ছোটদের জন্য লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। অত্যাচারী হূণ সম্রাট্ মিহিরকুলকে পরাজিত ক'রে যশোধর্ম্মদেব কি ক'রে ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন তারই গৌরবময় কাহিনী। ছোটদের জন্য লেখা এত সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলায় খুব কমই পড়েছি। ছাপা, বাঁধাই, মলাট সবই মনোরম।

দেশের যারা শত্রু—শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১৷৷০

এটি একটি রহস্য-উপন্যাস, কিন্তু গল্পের পটভূমিতে নূতনত্ব আছে। গল্পাংশটিও মন্দ নয়। গ্রন্থকার শিশু-সাহিত্যে নবাগত ব'লেই মনে হয়। ছাপা-কাগজ ইত্যাদি ভালই।

সব সেরা সঞ্চয়—শ্রীইন্দিরা দেবী। এম্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—১।০।

ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি ছোট ছোট গল্প। লেখিকা শিশুসাহিত্যে সুপরিচিতা। গল্প বলার কৌশল তাঁর যেমন জানা আছে, ভাষা এবং রচনাভঙ্গীর ওপরও আছে তেমনি দখল। ফলে সবগুলি গল্পই সুখপাঠ্য হয়েছে।

আমাদের কাগজ। ছোটদের সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সম্পাদক—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। "সোনার-পুর লজ, পোঃ সোনারপুর আর. এস্. (২৪ পরগণা)" প্রতি সংখ্যা ⁄০

'রবিবার' উঠে যাবার পর বাংলায় ছোটদের আর কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল না, সংবাদপত্র তো নয়ই। 'আমাদের কাগজ' সে অভাব কিছুটা পূরণ করবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের কাছে সুপরিচিত ও ছোটদের বিভাগ পরিচালনায় অভিজ্ঞ। আমরা এই নতুন সহযোগীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

জয় হিন্দ। গত বারে স্থানাভাবে চিঠিপত্র বিভাগটি দেওয়া হয় নি, সে জন্য এবারে বহু অনুযোগ-পত্র পেয়েছি। এই বিভাগটি যে তোমাদের এত প্রিয় তা আগে ভাবিনি। যাই হোক্, এবার থেকে এ বিষয়ে আর একটু সতর্ক হবার চেষ্টা করব।

'সখের মিউজিয়াম্' সম্বন্ধে অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে নানা পরামর্শ চেয়েছ, ব্যক্তিগত ভাবেই তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে যে বিরাট সর্ব্বভারতীয় প্রদর্শনী হচ্ছে তার কথা তোমরা আগেই শুনেছ। এতে যে ছোটদের মহল থাকবে তাতে যোগ দেবার জন্য প্রদর্শনী-সম্পাদকের বিজ্ঞপ্তিও তোমরা দেখেছ। আশা করি অনেকেই যোগ দেবে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছ আমি, অর্থাৎ তোমাদের সম্পাদক দাদাই, এর মধ্যে আছি কিনা। নিশ্চয়ই আছি। এত বড় একটা কাজ—ছোটদের এমন কল্যাণকর এবং আনন্দদায়ক ব্যাপার থেকে কি কেউ দূরে থাকতে পারে? আমার মত, ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন এবং ভাবেন তাঁরাও অনেকেই এর কার্য্য পরিচালক সমিতির মধ্যে আছেন। এমন কি শিশুসাহিত্য-পরিষদ্—যা নাকি বাংলার শিশুসাহিত্যিকদের সব চেয়ে বড়, এবং হয়তো একমাত্র, প্রতিষ্ঠান—তাঁরাও এতে যোগ দিয়েছেন। ঐ পরিষদ্ থেকে প্রতি বছর যে শিশুশিল্প-প্রদর্শনী হয়, এই প্রদর্শনীটি ঠিক সেই কাজই আরও বড় ক'রে করছেন জেনে—তাঁরা তা বন্ধ রেখে তাঁদের সমস্ত শক্তি এই প্রদর্শনীতেই নিয়োজিত করবেন ঠিক করেছেন।

আর একটা মজার কথা শোন। প্রদর্শনীর বিভিন্ন উৎসব-তালিকার মধ্যে একটা অভিনয়েরও কথাবার্ত্তা চলছে। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় বাংলার সব সেরা শিশু-সাহিত্যিকরা এক জোটে নামতে রাজী হয়েছেন। জিনিষটি কি রকম উপভোগ্য হবে বুঝতেই পারছ।

এই মাসটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মমাস। রামধনুর কয়েকটি পৃষ্ঠায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানান হ'ল। আশা করি ৯ই মাঘ তারিখটি তোমরা উপযুক্ত ভাবে পালন করবে। এই সংখ্যাটিকে সম্পূর্ণ 'নেতাজী সংখ্যা' করার প্রস্তাব অনেকে করেছিলে। কিন্তু এত অল্প সময়ে তা সম্ভব হয় কি?

দিনাজপুর থেকে আমাদের একটি ছোট্ট গ্রাহি শ্রীমতী 'বেণু' জানতে চেয়েছেন কলকাতার চিড়িয়াখানা সাদা ময়ূর আছে কিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করছি—আছে আরও হয়েক রকম মজার মজার পশুপাখী আছে, এ সেদিন দেখে এলাম।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। বন্দে মাতরম্। ইতি রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কাল (গত কাল এবং আগামী কাল)।

উত্তরদাতাদের নাম:—শর্ম্মিলা সরকার (কলিকাতা); চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); রাধাবিনোদ সুরাল (শিলদা); ধ্রুব সেন (পাটনা); কণিকা বসু (এলাহাবাদ); তপতী দেবী (বালীগঞ্জ); ভোলা ও চিনু (কলিকাতা); জেব্‌উন্‌নিসা (ঢাকা); সীতা ও সরল চট্টোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

বৈঠকখানা ঘরে জোর গল্প চলছে। কথা উঠল কার বয়স কত, কে কোন্ সনে জন্মেছে। সুরেশ বাবু বললেন, "আমিই বোধ হয় এ ঘরে সবচেয়ে বয়সে বড়। আমি কোন্ সনে জন্মেছি বল তো? একটু হেঁয়ালীতে বলতে চাই, দেখি তোমাদের কার কত বুদ্ধি! আমি জন্মেছি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে। আমার জন্মের ইংরেজী সনটি ডাইনে থেকেও যা বাঁ থেকেও তা, ওপর থেকেও যা নীচে থেকেও তা। এবার বল তো কোন্ অদ্ভুত বছর সেটা?"

তোমরাও চেষ্টা কর।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—।৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম্ দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

—য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস—
প্রত্যেকখানি—এক টাকা

—সব্যসাচী বিরচিত—
১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার
১১। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন
১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৩। মিঃ গশ ডিটেক্‌টিভ

বুদ্ধদেব বসু
১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু
১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
২১। গ্রহের ফের
২২। রক্তৃতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল, এ,—২০১
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C.—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বৃদ্ধির সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

লক্ষ্মীদাস খেমজী

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা

ফোন:-কলিঃ - ১৬০৬

২০শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৭৪ একাদশ সংখ্যা

রামধনু

ছোটদের

সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন: সাউথ ১২৬

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের	
পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ...	১৷৹	আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ...	১৷৹
সোনার হরিণ (ঐ) ...	১৷৹	বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ) ...	১৲
চায়ের ধোঁয়া (গল্প) ...	৸৹	আবিষ্কারের গল্প ...	৸৹
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ...	৸৵৹	ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ...	৸৹
নূতন পুরাণ (ঐ) ...	৸৵৹	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর	
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর		ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸৹
রং-চং (গল্প) ...	৸৹	মনোরঞ্জন ও শিবরামের	
শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত		এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ...	৸৵৹
দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স্	৷৵৹	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের	
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের		দিগ্বিজয়ী বীর ...	৸৹
নতুন কিছু (গল্প) ...	৸৵৹	মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ...	৸৹
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের		ঐ ২য় ...	৸৹
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ...	১৷৹		

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৹ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-কুমারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ৷৵৹ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যাস। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িতে বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীদের হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।

—আনন্দবাজার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ **কৈশোরক** বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যিক দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা' ও বিশ্বগুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খানা উপন্যাস চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

বুক কাপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম ১৲

রহস্য···রোমাঞ্চ··মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল — প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর

মুখস যখন খুলে গেল — তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাঠের ড্রাগন — হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

হত্যা যাদের নেশা — প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র

সীমান্তের বন্ধু (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার গল্প)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গল্পের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ॥৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে

সুসংবাদ

শীঘ্রই দেখা দিবে

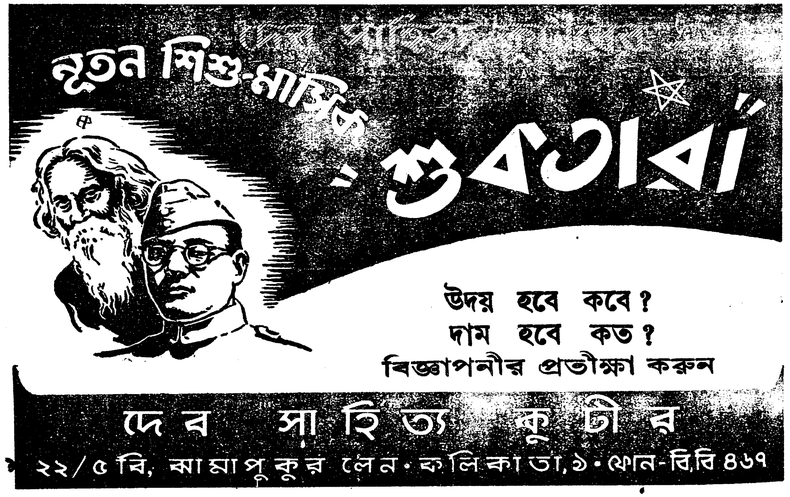

উদয় হবে কবে?
দাম হবে কত?
বিজ্ঞাপনীর প্রতীক্ষা করুন

দেব সাহিত্য কুটীর

২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন · কলিকাতা, ৯ · ফোন-বি,বি ৪৬৭

রামধনু—

"কৌস্থলি কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি ?
কার মৃদু বাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী ?
আত্মার বলে কে পশুবলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝি ?
কে রে ও খর্ব্ব, সর্ব্বপূজ্য ?—গান্ধীজি—গান্ধীজি !"

—সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৫৪ | ১১শ সংখ্যা

মহাত্মা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শান্তির বাণী করিতে প্রচার
চাহ নাই তুমি দখিণে বামে,
নহে এ ধরণী যোগ্য তোমার
চলে গেলে তাই অমরধামে।
গীতার দেবতা,— সঁপিলে পরাণ
ভ্রান্ত ব্যাধের নিঠুর করে,
বিঁধিয়া বধিল প্রেম-অবতার
ঈশের তনয়ে ভ্রান্ত নরে।

বুঝি বা চলিলে তুমি সেই পুরে
সুরাসুরে সদা বিরোধ যথা,
দেবতা দানবে শেখাতে মৈত্রী
শুনায়ে তোমার অমিয় কথা।
হে মহামানব, হে মহাবুদ্ধ,
আত্মা তোমার যুড়াক বিশ্ব,
করুক প্রচার বারতা তোমার
কোটী কোটী তব মন্ত্রশিষ্য।

"মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হ'তেন কিংবা লড়াই কর-:তেন তবে আমরা এমনি করে আজ তাঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মেছেন।...ধর্ম্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য।...যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।"

—রবীন্দ্রনাথ

"আমাদের ইয়োরোপের বিপ্লবীদের মত গান্ধী আইন-কানুন এবং অর্ডিন্যান্স তৈরী করতে আসেন নি—এসেছেন নতুন এক মানব-সমাজকে গড়বার জন্য।"

—রোমাঁ রোলাঁ

"আগামী যুগের মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে সত্যিই কোন দিন এই রকম একটি মানুষ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।" —আইনষ্টাইন্

"স্বাধীনতার সোজা সড়কে গান্ধীজি আমাদের পৌছিয়ে দিয়েছেন।" —সুভাষচন্দ্র

"এখানে ভারতের এক শাসক রয়েছেন। তাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী। রাজশক্তির চাইতে তাঁর শক্তি বেশী।"

—সি, এফ, এণ্ডরুজ

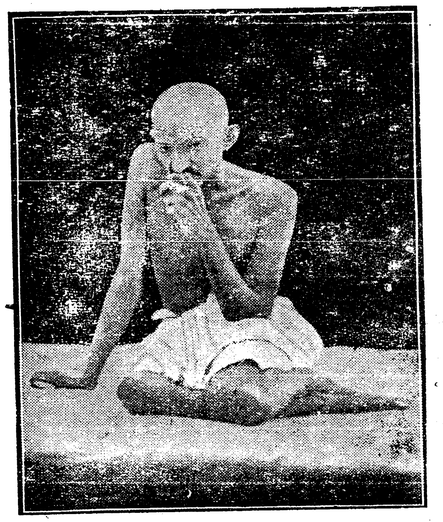

গান্ধীজি

"আমি যখন রোলাঁর কথা চিন্তা করি তখন আমার টলষ্টয়কে মনে পড়ে। যখন লেনিনের কথা ভাবি তখন মনে পড়ে নেপোলিয়নকে। কিন্তু যখন গান্ধীর কথা চিন্তা করি তখন আমার যীশু খৃষ্টকে মনে পড়ে।"

—রেভারেণ্ড হোম্‌স্

"যদিও এ কথা বল্‌তে আমার কুণ্ঠার সীমা নেই, তবু সরলভাবে স্বীকার করছি যে তাঁর চাইতে ন্যায় ও করুণার এত বড় প্রতিমূর্ত্তি, আমাদের ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্ত্তার এত বড় খাঁটি প্রতিনিধি আমি আর কাউকে জানি নে।"

—রেভারেণ্ড হোয়াইটহেড্

"বুদ্ধের পরে ভারতে এত বড় মানুষ আর জন্মান নি।"

—জন্ গান্থার

"গান্ধীকে আমরা কেউ দেখি নি, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁকে চিনতুম। তাঁর চেহারা আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো করে জানে যেন তিনি আমাদের বাড়ীরই একজন কেউ।"

—পাল্ বাক্

"গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করলে ভারতের আয়নায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

"তিনি খাঁটি হিন্দু, অকৃত্রিম ভারতীয়। তবুও রাজনীতির দিক্ দিয়ে তিনি যে ভাবধারার পোষক তা বিশ্বজনীন, কারণ তার প্রতিষ্ঠা নীতির ওপর।"

—লুই ফিশার

"গান্ধীজি বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্দেহ নেই, তবু মনে হয় তিনি বর্ত্তমান যুগের ন'ন। তিনি

যুগের মানুষ তা পৃথিবীতে আজও আসে নি, কেবারেই আসবে কিনা কে জানে?"

—এটলি (ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী)

"তিনি ভারতের নেতা ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ার্শ ও কাজ সারা বিশ্বের মনে গভীর আঁচড় রেখে ছে।

—ট্রুম্যান্ (আমেরিকার রাষ্ট্রপতি)

"ভারত আজ রাত্রে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।"—ডি ভ্যালেরা

"এ যুগের সবচেয়ে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটলো আজ।"

—হিরোহিতো (জাপানের রাজা)

"তাঁর মত মহাপুরুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।" —নেকরশি পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী)

"শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। —ষষ্ঠ জর্জ্জ (ইংলণ্ডের রাজা)

"অহিংসা মন্ত্রের ঋষিকে হিংসার আগুনে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হবে এর চেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কি হতে পারে?"

চ্যাং কাই শেক্

"অতি ভাল হবার বিপদ্ যে কত এ থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে।"

—বার্ণার্ড শ

নবসন্ন্যাসী

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

বিদেশী বণিক্ দেশের মাতার
সিঁদুর মুছিল যবে
জাফর আলীকে দেখেছ কি তুমি?
কেঁদেছ তোমরা সবে?
সে জাফর আলী মরে নাকো কভু,
আসে ফিরে বারে বারে,
শয়তান সে যে, ভ্রমিছে সদাই
অবতারে বধিবারে।

জনম, মৃত্যু, আহার, বিহার এই নিয়ে পথ চলি,
স্মৃতির আড়ালে ডুবে যায় মন, আত্মারে দিয়ে বলি।
সে অমানিশায়, সে মোহের ঘোর টুটাতে কে ঐ আসে
শীর্ণ-শান্ত কার ওই দেহ, কার বাণী তমো নাশে?

মূক পরাধীন দেশ-মাতৃকার ক্লীব কোটী সন্তান
নব অমৃতের প্রসাদ্ পাইল, অজগর পেল প্রাণ।
অহিংসা বাণী কানেতে পশিল, পৌরুষ ওঠে জাগি,
সে ঘুম ভাঙ্গাল কোন্ সন্ন্যাসী, কে এল তোমারি লাগি!

ভীষ্মের কথা কাহিনী মোদের,
কৃষ্ণের প্রেম পুঁথি,
কর্ণের তেজ দানের মহিমা,
সে যে সবাকার সাথী।
নবমন্ত্রের স্রষ্টা ও গুরু
মহাত্মা গান্ধীজি,
তোমার রচিত নববধূ বেশে
আজি দেশ এল সাজি।

তোমার করেছে' জীবনাবসান মূর্খ সে কত বড়,
ভেবেছে তোমার দেহ বধিলেই, তুমি বুঝি সরে পড়!
দুই সহস্র বৎসর আগে যেমন ভাবিল তারা
যারা খৃষ্টেরে বিঁধিল হইয়া সকল বিবেকহারা।

দেহের উর্দ্ধে তাঁহার যে বাণী জ্বলিবে অহর্নিশি,
শত সহস্র সেবকের হৃদে সে প্রাণ রহিবে মিশি।
বিবেকবিহীন আত্মঘাতীর দলেরে সহিবে কেহ
ভেবো না ভেবো না, লুকায়ে রহিবে ঘৃণিত তাদের দেহ।

পিতৃহন্তা তোমারে ক্ষমিতে আমরা ত' পারিব না,
হাতযোড় করি তাই ডাক তাঁরে, কর কর প্রার্থনা।
ক্ষমার সে ঋষি, ত্যাগেতে বিকশি' ঐ যে গগনে ভাসে—
যদি বোঝ দোষ লুটাইয়া পড় তাঁহারি চরণপাশে।

গান্ধীজির গল্প-সঞ্চয়ন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে নানা ছোটখাট ঘটনা ঘটে, তারই ভিতর দিয়ে আমাদের চরিত্রের—মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজি সম্বন্ধে এই রকম কয়েকটি গল্প শোন :

গান্ধীজি তখন ইস্কুলে পড়েন। একদিন ইন্‌স্পেক্‌টর এলেন সেই স্কুল দেখতে। গান্ধীদের ক্লাসে এসে তিনি ছেলেদের কয়েকটা ইংরেজী বানান লিখতে দিলেন। আর সবাই ঠিক ঠিক লিখল কিন্তু গান্ধীই ভুল ক'রে বসলেন একটি বানান। তাঁদের মাষ্টার মশাই ভাবলেন, এতে তাঁদের ইস্কুলের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে, তাই তিনি জুতোর ডগা দিয়ে গান্ধীর পায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারা ক'রে জানালেন পাশের ছেলের খাতা দেখে বানানটা ঠিক ক'রে নিতে। কিন্তু গান্ধী সেই অন্যায় নির্দ্দেশের কথা ভাবতেই পারলেন না। যা জানেন না মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তা শুধরে নিলে যে তাঁর সত্য রক্ষা হয় না!

*

গান্ধীজি ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যাবেন, রাজকোটের ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—কেননা এ রকম ব্যাপার সেখানে নতুন। হাই স্কুলে এক সভা ক'রে তারা গান্ধীজিকে বিদায় অভিনন্দন দিল। অভিনন্দনের পরে যাকে অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছে তাকে কিছু বলতে হয়। গান্ধীও কিছু বলবেন বলে লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সভায় দাঁড়িয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে সুরু করল, হাত-পা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না—অবশের মত বসে পড়লেন। পরবর্ত্তী জীবনে যাঁর বক্তৃতা শুনে পৃথিবীশুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়েছে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতার নমুনা।

*

গান্ধীজি তখন বিলেতে। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বোঝালেন, বিলেতে আমরা শুধু পড়াশোনা করতেই আ[illegible] না, চালচলন, আদবকায়দা এ সবও শিখতে আসি। [illegible] ভাবেই তাঁকে তৈরী হ'তে হবে—নইলে বিলেতে আ[illegible] কোন মানে হয় না।

গান্ধীজি তার কথামত পুরোদস্তুর সাহেব সাজতে লে[illegible] গেলেন। তৈরী হ'ল ফ্যাশন দুরস্ত দামী স্যুট, টুপি, টা[illegible] সোনার চেন-ঘড়ী; প্রত্যহ আয়নার সামনে দাঁড়ি[illegible] চুলের ওপর কসরৎ। শুধু তাই নয়, গান্ধীজি তিন পা[illegible] জমা দিয়ে বল্ নাচ শিখবার ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন, বে[illegible] বাজানো শিখবার জন্যও একজন শিক্ষয়িত্রী ঠিক কর[illegible] বক্তৃতা শেখাবার জন্যও একজন। বক্তৃতা-শিক্ষক তাঁ[illegible] বেল্ সাহেবের লেখা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিষ্ট' না[illegible] একখানা বই পড়তে দিলেন। এই বই পড়তে পড়[illegible] হঠাৎ যেন তাঁর দিব্যচক্ষু খুলে গেল। মনে মনে ভাব[illegible] বিলেতে তো এসেছেন দু'দিনের জন্য,—লেখা[illegible] শিখতে। তিন বছর পরেই দেশে ফিরে যাবেন এ[illegible] সারা জীবন সেই দেশেই কাটবে। তবে দু' দিনের জ[illegible] এ সব কপট সভ্যতার পেছনে ছুটে লাভ কি! তাঁর ম[illegible] পরিবর্ত্তন হ'ল—নাচ-গান-পোষাক সব ছেড়ে আব[illegible] তিনি শিক্ষার্থীর ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করলেন।

*

গান্ধীজির দাদা তাঁকে বিলেতের খরচ যোগাচ্[illegible] ভাইএর পরিশ্রমের অর্থে বাবুয়ানী করার জন্য গান্ধী[illegible] অনুতাপ হ'ল। তিনি দামী ঘর ছেড়ে সস্তায় সপ্[illegible] ৮ শিলিং ভাড়ায় একটা ছোট ঘরে উঠে এলেন। এ[illegible] ষ্টোভ কিনে সকালের খাবার নিজেই তৈরী ক'রে নি[illegible] লাগলেন—খাবার আর কিছু নয়, কোকো আর ধ[illegible] মণ্ড বা পরিজ। সে সময়ে লণ্ডনে অনেক গরীব [illegible]

[illegible]-পাড়ায় সপ্তাহে ২ শিলিং ভাড়ার ঘরে থেকে দৈনিক [illegible]নি দামের কোকো আর [illegible] দিন কাটাত। [illegible]াই হ'ল তাঁর আদর্শ।

*

বিলেত থেকে ফিরে গান্ধীজি বোম্বাইএ ব্যারিষ্টারী [illegible] সুরু করলেন। কিন্তু নতুন ব্যারিষ্টারকে কেউ

গান্ধীজি

[illegible] দেয় না। তার ওপর কেস্ সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্য [illegible]রিষ্টাররা দালালদের কিছু কিছু কমিশন দিয়ে থাকেন; [illegible]ীএই অন্যায়, এই অসাধুতা কিছুতেই মেনে নিতে [illegible] হলেন না।

[illegible] সত্ত্বেও গান্ধী হঠাৎ একদিন একটা কেস্ পেয়ে গেলেন। দক্ষিণা ত্রিশ টাকা। কিন্তু জেরা করতে উঠেই তাঁর হ'ল ভীষণ অবস্থা—সেই রাজকোটের বিদায়-অভিনন্দনের সভার মত। মাথা ঘুরতে লাগল, শরীর কাঁপতে লাগল, একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরোল না। গান্ধীজি তাঁর দক্ষিণার ত্রিশ টাকা মক্কেলকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্য উকীলকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

*

প্রিটোরিয়ার কর্ত্তা ক্রুসারের প্রাসাদ। সামনে বিস্তীর্ণ রাজপথ, তার দু'ধারে ফুটপাথ। কিন্তু 'কালা আদমী'র সেই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই। অবশ্য গান্ধী ব্যারিষ্টার, কালা আদমী হলেও তাঁর কথা স্বতন্ত্র! কিন্তু না, একদিন তাঁকেও এর জবাব দিতে হ'ল। যে ফুটপাথ দিয়ে গোরারা হাঁটে সেখান দিয়ে যাবে কালা আদমী! শান্ত্রী এসে তাঁকে ফুটপাথ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, লাথি মেরে জানিয়ে দিল তিনি ভারতবাসী—কুলির জাতভাই।

একজন সে-দেশী লোক সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিলেন, তিনি বল্লেন, "তুমি ওর নামে নালিশ কর, আমি সাক্ষী দেব।"

গান্ধী জবাব দিলেন, "কি হবে? এ লোকটা আমাদের দেশের অন্য লোকদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে আমার সঙ্গেও তাই করেছে। এ দেশের সবাই যা মনে করে একজন মূর্খ সেপাই কি তার চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারবে?"

গান্ধী নালিশ করলেন না। শান্ত্রীটি দোষ বুঝতে পেরে পরে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল।

*

যে মোকদ্দমা নিয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন তা হয়ে গেছে। এবার দেশে ফিরতে হবে। তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। খাওয়াদাওয়া চলছে পুরোদমে। এমন

সময় কে একজন একখানা খবরের কাগজ নিয়ে এল। তাতে ছোট্ট একটি খবর—নেটালের ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয়দের যে ভোট দেবার অধিকার ছিল তা বাতিল করা হচ্ছে। সেই মুহূর্ত্তে সংকল্প ভেসে গেল। গান্ধী স্বদেশ-যাত্রা বন্ধ করলেন। তখনই, সেই উৎসব-সভায়, এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য একটি সমিতি গঠিত হ'ল। গান্ধীজিই তার নেতা।

* * *

গান্ধী দেশে ফিরে এসেছেন। বোম্বাইএ সুরু হয়েছে প্লেগ। রাজকোটেও এই মড়ক ছড়িয়ে পড়ল বুঝি! গান্ধী দলবল নিয়ে নেমে পড়লেন সেবার কাজে, ভার নিলেন পাইখানা পরিদর্শন করার। যখন অস্পৃশ্যদের পাড়ায় যাবার সময় হ'ল তখন আর কেউ যেতে চান না। অস্পৃশ্য, —যাদের কিনা এমনি ছুঁলে নাইতে হয়, তাদেরই পাইখানা পরিদর্শন করতে হবে? অসম্ভব! কিন্তু একটি লোক অবিচলিত কণ্ঠে বল্লেন, "আর কেউ যাক্ না যাক্ আমি যাবই, দরকার হ'লে একাই যাব।" লোকটি আর কেউ নয়, গান্ধীজি। শেষে একজন মাত্র সঙ্গী জুটল। দু'জনে নিঃসঙ্কোচে কাজ সেরে এলেন। মহাত্মা কি তাঁর কাছে কোন কাজই ঘৃণার্হ নয়।

* * *

অনেক দিন পরের কথা। গান্ধীজি তখন দেশপূ —মহাত্মা। বক্তৃতা দিতে গলা কাঁপে না, তাঁর বা শুনবার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী পথে ভিড় করে থাকে গ্রামে সভা হবে। গান্ধীজি বক্তৃতা দেবেন। না লোকের সঙ্গে একদল মেথরও এসেছে বক্তৃতা শুনতে সকলে বল্‌ল, "দূর্ দূর্, তোরা এখানে কেন? কা' ছুঁয়ে ফেলবি শেষে!"

তারা জড়সড় হয়ে বল্‌ল, "আমরা এই দূরে বাইরে বসছি, ছোঁব না কাউকে।"

গান্ধীজি এলেন। জয়োল্লাসে সভা কেঁপে উঠল। হঠা তাঁর নজরে পড়ল একদল লোক দূরে—সভার বাইরে এ পাশে সসঙ্কোচে বসে আছে। "ওরা ওখানে কেন?"

"আজ্ঞে ওরা যে মেথর।"

গান্ধী কোন কথা বললেন না, সভা ছেড়ে মে মেথরদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "ওদের যদি ঐ সভায় স্থান না হয়, আমারও হবে না।"

গান্ধীজি লোকটি কেমন ছিলেন

গান্ধীজি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। গুজরাটী তাঁর মাতৃভাষা। ইংরেজী ও হিন্দীতে তাঁর ছিল অদ্ভুত দখল। এ ছাড়া সংস্কৃত, ল্যাটিন, ফরাসী, উর্দ্দু, মারাঠী, তামিল, তেলেগু—এগুলোও তিনি কোনটা বেশ ভাল রকম এবং কোনটা কিছু কিছু জানতেন। নোয়াখালি ভ্রমণের সময় তিনি বাংলা ভাষাও খানিকটা শিখেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক অবাঙ্গালী ভারতীয়ের বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত—কারণ বাংলা সাহিত্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তারপর মারাঠী। হিন্দী তিনি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার উপযোগী ব'লে ম করতেন। গান্ধীজির ভাষা শিখবার সব চেয়ে অবল হ'ত জেলে বসে।

গান্ধীজি অপর্য্যাপ্ত লিখতে পারতেন। টেবি চেয়ারে বসে লিখতেন না, হাঁটুর উপর একটা কা

...লা রেখে তার উপর কাগজ রেখে লিখতেন। লিখতে ...খতে ডান হাত ব্যথা হয়ে গেলে বাঁ হাতে লিখতেন। ...হাতেই তিনি সমান লিখে যেতে পারতেন।

...সময়ের কাজ সময়ে করা তাঁর একটা বড় গুণ ছিল। ...ত্যেক কাজ তাঁর ঘড়ি ধরে চলত। এজন্য সর্ব্বদা তাঁর ...কে একটা ঘড়ি ঝুলান থাকত।

...ঘুমের উপরও ছিল তাঁর আশ্চর্য্য দখল। যখন খুশী, ...খানে খুশী, যতক্ষণ খুশী তিনি ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। ...ই বিশ্রাম করবার ক্ষমতা ছিল বলেই কোন কঠিন ...জকে তিনি ভয় করতেন না।

...খাওয়া সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী। নুন ...ব কম খেতেন, রান্না করা খাবার একেবারেই প্রায় ...তেন না। তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল ছাগলের দুধ আর ফল। শরীর রক্ষার জন্যে যেটুকু দরকার শুধু তাই তিনি খেতেন।

খুব ভোরে উঠে দ্রুতপায়ে হেঁটে বেড়ানো তাঁর ছিল বহুদিনের অভ্যাস। বিলেতে যখন তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যান তখনও দেখা যেত সেই শীতের দেশের ভোর রাত্রে চাদর গায়ে, স্যাণ্ডাল পায়ে বরফ-পড়া পথে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একবার এক ট্যাক্সি-চালক তো তাঁকে ভূত ভেবে ভয়ে দৌড়ই লাগিয়েছিল। পরে আসল কথা শুনে সে নাকি বলেছিল,—পৃথিবীতে এক মাত্র গান্ধীর পক্ষেই এ ভাবে বেড়ানো সম্ভব।

গান্ধীজি ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। তাদের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর বলতেন—"এরা আমার 'বাল-লকড়ি'।" বিলেতের ছেলেমেয়েরাও তাঁকে খুব ভালবাসত। তারা তাঁর নাম রেখেছিল গান্ধী খুড়ো—"আঙ্কল্ গ্যাণ্ডী"।

বাপুজী ও মহাত্মা

...দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসবার কিছু পরে ...ন্ধীজি সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। সমস্ত ...শ্রমটী হ'ল একটি বৃহৎ পরিবার এবং গান্ধীজিই যেন ...লেন তার পিতা। গুজরাটী ভাষায় পিতাকে বলা হয় ...পু'। আশ্রমের সবাই তাঁকে ডাকত 'বাপুজী' ব'লে। ...থেকে তাঁর ঐ নাম।

গান্ধীজির মহাত্মা নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। তাঁদের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের সবাই ডাকত গুরুদেব বলে, গান্ধীও তাই বলতেন। রবীন্দ্রনাথ বয়সে গান্ধীর চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন।

গান্ধীজির কয়েকটি বাণী

আমার জীবনই আমার বাণী।

অহিংসা দুর্ব্বলের অস্ত্র নয়, সব চেয়ে সবলের অস্ত্র। এর শক্তি মাংসপেশীর নয়, হৃদয়ের। নিজের মনকে যে বশে আনতে পেরেছে সে বনের রাজা সিংহের মত নির্ভয়ে চলা-ফেরা করতে পারে।

স্বরাজ মানে নিজের মনের মত রাজ্য। ওর চাবি হচ্ছে সত্যাগ্রহ, আত্মবল। এই বল আয়ত্ত করতে হ'লে সর্ব্ব বিষয়ে স্বদেশী গ্রহণ করতে হবে।

অহিংসা ছাড়া সত্য লাভ সম্ভব নয়। ওরা ঠিক টাকার দু' পিঠের মত, কখনও আলাদা করা যায় না।

বিনা কারণে বলি দেবার মত মূল্যহীন আমাদের প্রাণ নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু স্বাধীনতার চেয়ে প্রাণের মূল্য আমাদের বেশী এ কথাও আমরা স্বীকার করি না।

যখন কারো মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভীকতা এসে পড়ে তখনই তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে,—অস্ত্রের সাহায্য আর তখন দরকার হয় না।

প্রবীণ ব্যক্তিরা যা বলেন, প্রাচীন পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে—আজকালকার ছেলেমেয়েরা তা না বুঝেই উড়িয়ে দেয়—এটাই সব চেয়ে দুঃখের।

যে জাতির ছেলেমেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা না নিয়ে বিদেশের ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা নেয় সে জাতি আত্মহত্যা করে।

গান্ধীজির জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

১৮৬৯—জন্ম
১৮৮৮—বিলাত যাত্রা
১৮৯৩—দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা
১৮৯৪—নেটাল ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
১৯০৭—প্রথম সত্যাগ্রহ ও কারাবরণ
১৯১৫—সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা
১৯১৭—চম্পারণ সত্যাগ্রহ
১৯২০—অসহযোগ আন্দোলন
১৯২২—চৌরিচোরার ঘটনা
১৯২৪—কংগ্রেস-সভাপতি পদ গ্রহণ
১৯৩০—প্রথম স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা
ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান
১৯৩১—গান্ধী-আরউইন চুক্তি
বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক
১৯৩২—আইন অমান্য আন্দোলন
১৯৩৩—পুণা চুক্তি
১৯৩৬—সেবাগ্রাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা
১৯৪২—ভারত ছাড় প্রস্তাব
আগষ্ট আন্দোলন
১৯৪৫—প্রার্থনা সভার প্রবর্ত্তন
১৯৪৬—নোয়াখালি পরিভ্রমণ
১৯৪৮—আততায়ীর গুলিতে নিহত।

মহাপ্রয়াণে

জয়নাল আবেদীন

মৃত্যু মোটেই মহিমারে কভু করিতে পারে না ম্লান,
সয়তান করে মহামানবের মৃত্যুরে মহীয়ান্।
নানক, নিমাই, বুদ্ধ, খৃষ্ট, কবীর, মহম্মদ—
মানব-মনের শ্রেষ্ঠ আসনে তাহাদের মস্নদ।
আত্মত্যাগই মানুষেরে করে চির-অমরতা দান,
নান্দীমুখর দুনিয়ার মাঝে গান্ধী অমরপ্রাণ।

মহাতপা

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ছাড়লেন, স্ত্রী ছাড়লেন, পুত্র ছাড়লেন—কিন্তু সত্যকে ছাড়লেন না। শ্মশানের ডোম হরিশ্চন্দ্র;—বর্ষার অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালো, শৈব্যাকে তিনি চিনলেন। সর্পাঘাতে মারা গেছে রোহিতাশ্ব? যত আঘাত, যত দুঃখই আসুক না কেন, হরিশ্চন্দ্র কিছুতেই বিচলিত হবেন না, কিছুতেই সত্যকে ছাড়বেন না তিনি।

এবং এ-কথা যত বারই ভাবে, তত বারই মোহনের সারা মন শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। যুগ-যুগান্ত পেছনে ফেলে তার মন কখনো-না-দেখা কল্পনার এক জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে— তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো মহারাজা, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো।"

অথচ কী খেয়ালই হঠাৎ সেদিন হ'লো! আর কিছু নয়, ধূমপানের সখ। কিন্তু তার পয়সা? হঠাৎ মাথায় এল, চাকরদের পকেটে পয়সা থাকে, তাই থেকে নিলে কেমন হয়! যা ভাবা তাই করা।

কিন্তু তারপর কী যে হ'লো! মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণার মত একটা কাঁটা দিনরাত খচ্ খচ্ করতে থাকে চুরি করা পাপ,—মহাপাপ। অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না, বিছানায় ছট্ ফট্ করে। শুদ্ধ হতে হবে পাপের এই দুঃসহ পীড়ন থেকে মুক্তি চাই।

বাবার কাছে মুখ ফুটে বলতে সাহস হয় না। হয়তো তিনি রাগ করবেন, ভীষণ ভাবে মারবেন, অথবা হয়তো নিজেই মাথা কুটবেন; কিন্তু তবুও বলতেই হবে, না বললে কিছুতেই চলবে না।

শেষ কালে নিজেই একখানা চিঠি লিখল মোহন,—অকুণ্ঠমনে দোষ স্বীকার করল, শাস্তি চাইল এ-অপরাধের জন্যে। শপথ করল: চুরির মত এমন মহাপাপ ভবিষ্যতে আর সে করবে না কোন দিন।

সামনা-সামনিই চিঠিখানা পড়েছিলেন বাবা। কি কিছু বললেন না, কোন শাস্তি দিলেন না, শুধু চোখের কোণ বেয়ে তাঁর মুক্তার মত দু'-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

দু'-চোখ ভরে কান্না এলো, তবুও অনেক ক

নিজেকে সামলে নিলো মোহন। কিন্তু ভুললো না বাবার এই শান্ত ক্ষমাকে, জীবানান্ত অবধি কোনো দিনই ভুললো না শপথের এই পথকে।……

ঠিক হ'লো বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে যাবে মোহন। কিন্তু মা'র তা'তে প্রবল আপত্তি। বিলেত গেলে মোহন যদি ম্লেচ্ছ হয়ে যায়, ম্লেচ্ছের মতো যদি মদ-মাংস খায়!

মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলো মোহন—"মদ-মাংস খাওয়া দূরের কথা, আমি স্পর্শও ক'রবো না কোন দিন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা!"

জাহাজে ভালো একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হ'লো মোহনের। কথায় কথায় তিনি শুনলেন মোহনের প্রতিজ্ঞার কথা। হেসে উড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'বিস্কে উপসাগর ছাড়ালেই—'

বিস্কে উপসাগর ছাড়িয়ে, কিংবা বিলেতে, বা আর কোথাও, তিনি মাংস ছুঁয়ে পর্য্যন্ত দেখেন নি। অনেক উপহাস সহ্য ক'রতে হয়েছে এ জন্য, শুনতে হয়েছে যে তিনি অসভ্য, মূল্যহীন প্রতিজ্ঞার জন্যে মূর্খ বলেছে তাঁকে অনেকে। কিন্তু ধর্ম্ম যাদের কাছে একটা ভান মাত্র, তারা কী ক'রে বুঝবে মোহনের মতো ছেলের মায়ের-কাছে-করা প্রতিজ্ঞার মূল্যহীন মূল্য?… ..

এবারের যবনিকা তুললাম দক্ষিণ আফ্রিকায়। কাহিনীর নায়ক—ব্যারিষ্টার মোহনদাস।

সে সময়ে চার্লস-টাউন থেকে জোহানেস্‌বার্গ যেতে হ'লে ঘোড়ার 'সিগরামে' ক'রে যেতে হ'তো। কিন্তু কালো আদ্‌মিদের গাড়ীর ভেতরে বস্‌তে দেওয়া হ'তো না, সেখানে গোরারাই বস্‌তো। এক গোরা কণ্ডাক্টার মোহনদাসকেও তাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে দিলে, আর নিজে গিয়ে বসলো ভেতরে।

কিন্তু বিকেলের দিকে গোরা কণ্ডাক্টারের একটু চুরুট খাওয়ার ইচ্ছে হ'লো! চুরুট খেতে হ'লে ড্রাইভারের পাশে ব'সে ফুরফুরে হাওয়ায় কী যে আরাম! তা বসবার যায়গা কই? মোহনদাস যে আবার ওখানে! গোরা কণ্ডাক্টার একটা তেল-চিটচিটে ময়লা চট ড্রাইভারের কাছ থেকে চেয়ে নিলে। পা-দানিতে সেটা বিছিয়ে দিয়ে মোহনদাসকে হুকুম ক'রলো—"হেই, এখানে আমার পায়ের কাছে ব'সো।"

কিন্তু না, কিছুতেই না। কিছুতেই আত্মসম্মান এমনি ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। এ যে আত্মার অপমান! সাথে সাথে চোখে-মুখে অজস্র ঘুঁষি, অকথ্য গালাগালি। হাত ধ'রে তাঁকে নীচে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রলো গোরাটা। আর সিটের পাশের পেতলের ডাণ্ডাটা প্রাণপণে আঁকড়ে রইলো মোহন। হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায় যাক, সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসে আসুক—তবুও অন্যায় সে মেনে নেবে না কিছুতেই।

দ্বিতীয় বার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার আগেই এ কথা সেখানকার সমস্ত গোরাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে মোহনদাস ভারতবর্ষে তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, মোহনদাসের ইচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবাসীতে ভর্ত্তি হয়ে উঠুক।

বলা বাহুল্য, দু'টি খবরই অতিরঞ্জিত—মিথ্যে। সে যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার গোরারা মোহনদাসের উপরে হাড়ে হাড়ে চটে রইলো। আর এমনি সময়ে সব কিছু জেনেশুনেও, মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকার কূলে এসে জাহাজ ভিড়ালেন।

শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই তাঁকে নিষেধ ক'রেছিলেন। ব'লেছিলেন—"গোরারা ভয়ানক চটে আছে, জীবনের আশঙ্কা কিন্তু আপনার!"

বেরোনোর দরকার, তা বলে রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে বেরোবেন? কোন অন্যায় তো করেন নি, তবে কিসের ভয়ে অন্ধকারের আড়ালে চলবেন?

দিনের আলোয়ই তিনি নামলেন। গোরারাও প্রস্তুত হয়ে ছিলো, হৈ হৈ ক'রে ঘিরে ধ'রলো তাঁকে। ভিড় বেড়ে চ'ললো ক্রমশঃ। সুরু হয়ে গেলো লাথি-ঘুঁষি, গায়ে এসে লাগলো অজস্র ইট-পাটকেল আর পচা ডিম। কে একজন মাথার পাগ্‌ড়ীটা ফেলে দিলে। একটা বাড়ীর রেলিঙ ধ'রে নিশ্বাস নিলেন মোহনদাস। কিন্তু আবার—আবার! পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়লেন মোহন। পুলিশ সাহেব এসে না পড়লে বাঁচবার আশা ছিল না।

খবর পেয়ে সে সময়কার ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন 'তার' করলেন: যেন অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।..

…রুখে দাঁড়ালেন মোহনদাসই। কারুর বিরুদ্ধেই …ন নালিশ নেই। শেষ পর্য্যন্ত সত্যেরই জয় হবে, …থ্যা, যা ভুল,—চৈত্রের ঝরাপাতার মতো তা

সহকর্ম্মীদের সঙ্গে গান্ধীজি

…ই হারিয়ে যাবে। তবে আর কারো ওপর অভিযোগে …?………

…র ছেলের একবার কঠিন অসুখ হ'ল। পার্শী ডাক্তার দেখেশুনে বল্লেন, "এ'কে সারিয়ে তুলতে হ'লে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে—মুর্গীর সুরুয়া আর ডিম না হ'লে হবে না।"

"কিন্তু আমরা যে নিরামিষ ছাড়া কিছু খাই না ডাক্তার সাহেব!"

"ছেলের জীবনের জন্য সবই করতে হয় মিঃ গান্ধী!"

কিন্তু না, তুচ্ছ জীবনের জন্য ধর্ম্ম নষ্ট করা যায় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকলে ম্লেচ্ছ খাবার না খেয়েও ছেলে সেরে উঠবে।

নিজে তিনি পথ্যের ব্যবস্থা করলেন—নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর উপযোগী পথ্য। ছেলে সেরে উঠল। ডাক্তার অবাক্। এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল!

কিন্তু যা আমাদের কাছে অসম্ভব তাই তো তাঁর কাছে সম্ভব! তাই তো তিনি এমন এক মহাপৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে শোক নেই, দুঃখ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। বিরোধ—অপ্রীতি—মিথ্যা—অবিচার যেখানে অতীত যুগের বিভীষিকা মাত্র। যেখানে শুধু শ্রী, শান্তি, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য!

তারই জন্যে মহাত্মা তপস্যা করলেন সমস্ত জীবন; অনশনক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন দেহে ঝড়কে আড়াল করলেন, যাতে ঝড়ের ঝাপ্টা আমাদের না লাগে। আমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যাতে আনন্দে ভরে ওঠে শুধু তারই জন্যে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন।

নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেলেন সত্যে আর ক্ষমায়। কোন অন্যায়ই মহাত্মার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। আর সেখানেই তো মহাত্মার মহত্ত্ব! মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা-সুন্দর মুখে বলেছিলেন—"ভগবান্, তুমি এদের মার্জ্জনা ক'রো।"

কিন্তু ভগবান্ কি আমাদের মার্জ্জনা করবেন?

জয় মহাত্মা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

নাও নি কো কিছু, শুধু দিয়ে গেলে
রিক্ত করিয়া পাণি,
প্রাণ—তাও তুমি ক'রে গেলে দান,
প্রেমিক তোমারে মানি।
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
বিফল হবার নয়,
লভিয়াছ তুমি চির-অমরতা,
জয়, মহাত্মা জয়!

জয়তু গান্ধী

শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্ত করেছ ভারত মাতায়,
ভেঙেছ লোহার পাশ ;
অর্দ্ধনগ্ন ফকির বলিয়া
করে যারা উপহাস—
আঁখি কচালিয়া পর 'খণে হেরে
এ কি বিস্ময়কর,
মাথা পাতি' নিলে অপবাদ নিজে—
অপমান হ'ল বর!
তেজে আর প্রেমে নতুন স্বর্গ
গড়িলে বিশ্ব মাঝ,
জয়তু গান্ধী, ফকির গান্ধী,—
তবু তুমি মহারাজ!

গান্ধীজি সম্বন্ধে বই

যারা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে আরও ভালো ক'রে জানতে চাও তারা এই বাংলা বইগুলি পড়ে দেখতে পার :—

গান্ধীজির আত্মকথা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত
মহাত্মা গান্ধী—৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গান্ধীজির জীবন-প্রভাত—শ্রীরিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
গান্ধীজি—শ্রীঅনাথনাথ বসু
গান্ধীজির গল্প—শ্রীপ্রভাত বসু
গান্ধীজির সহিত এক সপ্তাহ—লুই ফিশার (অনুবাদ)
গান্ধীজিকে জানতে হ'লে—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
অন্তিমে গান্ধীজি—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়
গান্ধীজির অগ্নিপরীক্ষা—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী
মহাত্মা—সংকেত ভবন
নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী—শ্রীসুকুমার রায়
সত্যের সন্ধান (চিত্রে গান্ধী-জীবনী)

—পি. পি

মনে রেখ

"গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী—কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরীব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।"

—রবীন্দ্রনাথ

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিত-পাবন সীতারাম!
নির্ভয়-কর-প্রভু রাজা রাম,
পতিত-পাবন সীতারাম!
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকো সুমতি দে ভগবান্!"

—মহাত্মার প্রিয় 'রা

এক যে আছে মজার মানুষ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

এক যে আছে মজার মানুষ—
গোঁফ-দাড়ি সব সাদা,
তেল চুক্ চুক্ টেকো মাথায়
নেইকো চুলের গাদা।
মুখখানি তার হাসি হাসি,
ইচ্ছে করে ভালবাসি,
চেহারাটি নাদুস নুদুস,
পেটটি মোটা নাদা।
এক যে আছে মজার মানু—
গোঁফ-দাড়ি সব সাদা।

নেয়াপাতি ভুঁড়িটি তার
রূপকথাতে ভরা,
হাজার হাজার গল্প জানে,—
লক্ষ হাসির ছড়া।
দস্যি মেয়ে, দুষ্টু ছেলে
তার কাছেতে আস্‌তে পেলে
চুপটি ক'রে গল্প শোনে—
মন-ভোলান ছড়া।
নেয়াপাতি ভুঁড়িটি তার
রূপকথাতে ভরা।

বাবাকে সে ভয় করে না,
ভয় করে না মাকে,
গড়গড়াটির নলটিরে ভাই,
সদাই হাতে থাকে।
আপিসে তার রোজই ছুটি—
খড়ম প'রে গুটি গুটি
বারান্দাতে বেড়িয়ে বেড়ায়
হাত বুলিয়ে টাকে।
বাবাকে সে ভয় করে না,
ভয় করে না মাকে।

ভাবছ কি এ গল্প-কথা,
ভাবছ কি এ ধাঁধা?
বল্‌তে পার কে তিনি
যাঁর গোঁফ-দাড়ি সব সাদা?
এস তবে আমার সাথে,
ঐ দেখ ঐ বারান্দাতে
গুড়ুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন
আমার ঠাকুরদাদা।
নয়কো এটা গল্প-কথা,
নয়কো এটা ধাঁধা।

ডিউটি

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাড়িখানা অনেক দিন খালি পড়ে থেকে থেকে ভূতের বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এবং অশরীরীদের না হোক, গুটি কয়েক অদৃশ্য শরীরীর আস্তানা হয়ে উঠেছিল। খালি কেন যে হয়েছিল আর পড়েই বা ছিল কেন সে কাহিনী বলে দুর্দিনের কথা মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে না। এইটুকু মাত্র বলি, খালিই পড়েছিল, পাড়াটাও ভাল নয়, বাড়ি-ওয়ালা চেষ্টা করেও ভাড়া বসাতে পারে নি। ভাড়াটেরা বাড়িখানা দেখা তো দূরের কথা, পাড়াটার নাম শুনেই ব'লে উঠতো, "ওরে বাবা! প্রাণ বড় না সস্তার বাড়ি বড়?" শেষে সপরিবারে এলেন এক ডাক্তার। পাড়াটা তাঁর জানা; কয়েক বার রোগী দেখতে সেখানে এসেওছেন। তবে যাদের দেখেছিলেন তারা আর কেউ নেই।

বাড়িওয়ালা বেশ খাতির করে তাঁকে এনে বসালে; বললে, "আমি নিজেই থাকতুম, ব্যবস্থাও করছিলুম সেই রকম। তবে আপনার যখন দরকার তখন এটুকু স্বার্থত্যাগ না করলে চলবে কেন? আপনার কোন ভয় নেই। আমার দ্বারোয়ানেরা সব সময় অপনার খোঁজ-খবর নেবে। এই বীটের কনষ্টেবলদেরও বলে দেবো। তা ছাড়া এখন সব ঠাণ্ডা! বাছাধনেদের ট্যাঁ-ফোঁ করবার জো নেই। থানার কর্ত্তা খা কড়া। তাঁকেও আপনার কথা জানাবো, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ডাক্তার বাবু বললেন, "চিন্তা আর করি না। বাড়িখানা না পাবার আগে ভাবছিলুম একটা তাঁবু কিনে ধাপা কি চৌরঙ্গির সেই ট্রামের ঘেরাটার মধ্যে ফেলবো কিনা। ওখানে তো বেদেগুলো থাকে। এখন যখন পেয়ে গেছি তখন সব চিন্তার অবসান হয়েছে। এখানে যদি মরি তবুও সান্ত্বনা থাকবে যে বাড়িতেই মরেছি।"

বাড়িওয়ালা লোকটি বড় অমায়িক। মোটা মানুষ-দের এই একটা গুণ। সে ডাক্তার বাবুর কথায় "হে হে" করে একটু হাসলে। এবং চওড়া মুখখানা আরও চওড়া করে মোটরে উঠে হুস করে চলে গেল।

ডাক্তার বাবুও টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগ ও ষ্টেথস্-কোপটা তুলে নিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। তিনি রোগী দেখে ফিরলেন। শেষ রোগীটি ছিল পাড়ারই এক মুস... মান। লোকটি ভাল। সে মুসলমানদের গালাগাল ... নিন্দে করে। যাক্ সে কথা। আমার এ গল্প তা... নিয়ে নয়। কথা প্রসঙ্গে তার কথা একটু বললুম।

ডাক্তার বাবু বাড়িওয়ালার কাছে যদিও বললেন, "এখা... মরলেও সান্ত্বনা থাকবে যে বাড়িতেই মরেছি" তবুও তাঁ... প্রাণের ভয় এমন যে বাড়ির দরজা-জানলা সব সময়েই ... থাকে। তাই বাইরে থেকে বাড়িখানার দিকে তাকি... লোকের মনে হয়, ওটা একটা রহস্য। ওর মধ্যে হয় ষড়... অথবা বোমা তৈরি হচ্ছে। পাড়ার দু'-চারজন কানাঘুষো... করে। ভাগ্যে বাড়িতে কুকুর বা শিশু ছিল না। এ দু'... একটিও যে বাড়িতে থাকবে সে বাড়ির রহস্য কিছুতে... ঢেকে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার গল্পটি বাড়ি... রহস্য নিয়েও নয়।

ডাক্তার বাব ও বাড়িওয়ালা পরস্পরের গন্তব্য স্থ... চলে যাবার ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা হ'ল। ডাক্তার বা... বাড়িখানিতে এসেছেন পূরো আড়াই দিন। অনেকগু... ঘর পেয়েছেন, ভাড়াও সস্তা, রোজগারও কম হয় না, ত... একটু স্ফূর্ত্তিতেই আছেন।

শীতকালে নিচে বসবার ঘরে আরাম-চেয়ারে বেশ আর... করে বসে তিনি একখানি নাটক পড়ছেন। আর ভাবছে... নাটকখানি অভিনয় করলে কেমন হয়? এই গজান... চরিত্রটা—

ডাক্তারেরা নাটক অভিনয় ও নাটক দর্শন কর... বড় ভালোবাসেন।

"এই গজানন চরিত্রটা অদ্ভুত—অ—দ্ভূত!" বলে তিনি সিগারেটে একটি জোর টান দিতেই কড়া ন... উঠলো—খট্ খট্ খট্ খটাৎ—খটাৎ—খটাৎ—

মনে মনে বললেন, "কল।" হাতঘড়িতে দেখ... সাতটা।

চাকর দরজা খুলে দিলে। একটি মোটা গো... ...া দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে তেড়ে এল, ...বাবু হ্যায়?"

ডাক্তার বাবু সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "কোন্ ...? ভিতরে আ যাইয়ে।"

...শানের মেঝেয় ভারী জুতো ও লোহার নালের শব্দ ...তে লাগলো। আগন্তুক দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তার বাবু তাকে দেখে চম্‌কে গেলেন। পুলিশ!

পুলিশ কেন?

কন্‌ষ্টেবলটি বললে, "সব ঠিক হ্যায়?"

ডাক্তার বাবুর মনে পড়লো বাড়িওয়ালার কথা। লোকটি ...ড় ভাল। কথামতো বীটের কনষ্টেবলকে দিয়ে খবরদারি ...রছে। বললেন, "সব ঠিক হ্যায়।"

তারপরই কৌতূহল হ'ল জানতে কে পাঠিয়েছে; জিজ্ঞেস করলেন, "সিপাইজী, আপকো কোন্ ভেজা?"

স্বদেশী পুলিশ হ'লেও পুলিশ তো? সমীহ করাটা ...ভ্যাস হয়ে গেছে।

সিপাইজী বললে, "বঁড়বাবু।" মানে থানার ভার যাঁর ...াতে।

ডাক্তার বাবু বড় খুশি হলেন। ইংরেজ রাজত্বে খুন ...য়ে গেলেও কেউ খোঁজ নিত না, এখন খুন না হতেই খবরদারি!

ডাক্তার বাবুর মেয়ে ডলিরাণীকে শিশু বলা চলে না, ...রণ তার বয়স তেরো বছর। সে আসছিল বাবার কাছে "Sindhbad the sailor"-এর মানে জিজ্ঞেস করতে। ...লিশ দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে দরজার আড়াল থেকে ...ার পিতা ও কোটাল প্রহরীর কথোপকথন রুদ্ধশ্বাসে ...নছিল। লোকটি চলে যেতেই সে এক ছুটে ঘরে ঢুকে ...লে, "পুলিশ দেখে কি ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম! বাবা, ...াঁচলুম! আজ রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচবো।"

ডাক্তার বাবু বললেন, "তুমি যখন ঘুমাও তখন তো দেখে ...নে হয় না তোমার মনে কোন চিন্তা আছে!"

—"মোটেই না। আমি কেবল চোখ বুজে শুয়ে থাকি। ...াজ কিন্তু ঘুমোতে পারবো।"

—"বেশ, ঘুমিও।"

ডাক্তার বাবুও কতকটা স্বস্তি বোধ করলেন। মেয়েকে ...া বুঝিয়ে দিয়ে আবার নাটকখানি পড়তে লাগলেন।

"নাঃ! এই গজাননের ক্যারেকটারটা রিয়ালি—"

খাবার ডাক পড়লো। বই বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে উঠে গেলেন তিনি। গজানন বইয়ের মধ্যে বন্দী থেকে নীরবে গর্জ্জন করতে লাগলো।

খাবার পর আর নিচে নামতে ইচ্ছা করলো না। সে রাতে আবার শীতটাও পড়লো বেজায়। কোঠাঘরের দোতলায় শীতবস্ত্র গায়ে দিয়েই হাড় কাঁপছে, বস্তিতে সূতোর ছেঁড়া জামা-কাপড়ে যারা আছে তাদের প্রাণশুদ্ধ যদি জমে কাঠ হয়ে যায় তো অবাক্ হবার কিছু নেই।

ডাক্তার বাবু শুয়ে পড়লেন। মোলায়েম কম্বলখানি কান অবধি টেনে দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর স্বাস্থ্য অটুট রাখবার পক্ষে এটা বিশেষ দরকার।

সবাই ঘুমোচ্ছে। খট্ খট্ খট্ কড়া নড়ে উঠলো। ডাক্তার বাবুর ঘুম পাতলা। তাই সেই শব্দে জেগে উঠলেন। কান পেতে রইলেন শব্দটা আবার হয় কিনা শুনতে।

আবার শব্দ হ'ল। এবার তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি পাশের ঘর থেকে বললেন, "কে কড়া নাড়ছে না?"

—"হাঁ।"

—"লোকটা কে?"

—"না দেখলে তো বলতে পারছি না। যে নাড়ছে সেও তো সাড়া দিচ্ছে না!" বলে তিনি আলো জ্বেলে দেখেন রাত কাঁটায় কাঁটায় একটা। কোন 'কল' নয় তো? ভাবতে ভাবতে মোটা আলোয়ানে গা-মাথা বেশ করে ঢেকে বারান্দার দরজা খুলে ওপর থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

—"আমি বীটের কনষ্টেবল। সব খবর ভাল তো?" লোকটি পূর্ববঙ্গীয়। বাঙালিরাও আজকাল কনষ্টেবল হচ্ছে। ডাক্তার বাবুর কান জুড়িয়ে গেল। পুলিশের মুখে খোট্টাই বুলি শুনতে শুনতে আর পাঁচজনের মতো তাঁর ধারণা হয়েছিল, পুলিশ মানে খোট্টা, খোট্টা মানে পুলিশ। বললেন, "হাঁ, সব খবর ভাল।"

লোকটি চলে গেল।

ডাক্তর বাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বললেন, "অবশ্য এতে আপত্তি করা উচিত নয়। ও ওর কর্ত্তব্য করছে।

আমাদের যদি কেউ কেটে রেখে গিয়ে থাকে ও বাইরে থেকে জানবে কি করে?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী রাগের স্বরে বললেন, "কেটে রেখে গেলে ও জানতে পারলেই কি আমাদের কাটা গলা জোড়া দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে? কাঁচা ঘুমটা—"

ডাক্তার বাবু কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর দেওয়া মানেই তাঁর ঘুমটা সারা রাতের মধ্যে আর থাকবে না, কাঁচাই থেকে যাবে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবার মায়ের পাশ থেকে ডলিরাণী ডাকলে, "মা, ও মা, কে কড়া নাড়ছে!"

মা সাড়া দিলেন না, বাবা বললেন, "শুনেছি। ও পুলিশ। আমি আর উঠছি না।"

ডলিরাণী বললে, "সারা রাতের মধ্যে একটু ঘুমোই নি। যেই ঘুম এল অমনি খট্ খট্ খট্। মাঝ রাতে খোঁজ নিতে পারলে না?"

ডাক্তার বাবু নিঃশব্দে হাস্লেন। ওদিকে কড়া সমানে খট্ খট্ খট্ খট্ করতে লাগলো।

ডাক্তার বাবু বললেন, "যতক্ষণ না সাড়া দেবো দেখ্ছি ততক্ষণ থামবে না!"

ডলিরাণী বললে, "উঠো না, শুয়ে শুয়ে সাড়া দাও।"

"দরজা-জানলা বন্ধ। শুনতে পাবে না যে! যাই, বলি গে—" বলে ডাক্তার বাবু আলো জাললেন। ঘড়িতে দেখলেন চারটে বাজতে সাত মিনিট বাকি।

আবার তেমনি মুড়ি-শুড়ি দিয়ে বেরিয়ে বারান্দা থেকে বললেন, "সব ঠিক হ্যায়।"

নিচে থেকে আওয়াজ উঠলো, "আপনি নিচে একবার আসবেন?"

—"কেন?"

—"আপনাকে দেখে যাবো।"

কি বিপদ্! বললেন, "তুমি বারান্দার তলা থেকে সরে যাও। আমি আলো জালছি। এই দেখ আমাকে—"

—"কিছু মনে করবেন না। না দেখে গেলে বড়বাবু রাগ করবেন। আচ্ছা, সেলাম।"

এটিও বাঙালি সিপাই। তবে পশ্চিম বঙ্গীয়।

ঘরে ঢুকেই বললেন, "কি জ্বালা! একটু নিশ্চি ঘুমোতেও দেবে না দেখ্ছি! শীতের রাতে—"

ডলিরাণী বল্লে, "বাবা, তুমি কাল চোঙ্ মুখে শুয়ে শুয়ে উত্তর দিও।"

—"চোঙ্! কি রকম?"

—"কেন, আমাদের গ্রামোফোনের চোঙ্টা দেওয়া ঘুলঘুলিটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখবে। খট্ খট্ খট্ হ'লেই ওটাতে মুখ লাগিয়ে বলবে, ঠিক হ্যায়!"

ডাক্তার বাবু হেসে ফেললেন; বললেন, "ঠিক বলেছি তাঁর ঘুম আর এল না।

পরদিন তাঁর স্ত্রী বললেন, "মাঝ রাতে সেই যে ভেঙে গেল তারপর আর চোখের পাতা বন্ধ কর পারি নি।"

ডলিরাণীর ঘুম ভাঙলো সাতটায়; বললে, "পুলি জালায় সারারাত জেগে থাকতে হ'ল।"

ডাক্তার বাবু কিছু বললেন না। শুনেছিলেন, আদরেও লোকে পালায়। এখন সারারাত ধরে প্র পেলেন। এই রকম যদি চারটে দিনও চলে তা হ'লে তাঁ বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। তিনি কিছু বললেন মনে মনে ঠিক করলেন আজ রাতে সাড়া দেবেন এবং একবার ভাবলেন, থানায় গিয়ে বড়বাবুকে ব আসেন, তাঁরা ভালই আছেন। দরকার পড়লে প দেবেন। কিন্তু সারাদিন রোগী দেখে দেখে সন্ধ্যায় য বাড়ি ফিরলেন তখন শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে; নি আর বস্তে ইচ্ছা হ'ল না, গজাননেরও কোন খো নিলেন না; ওপরে উঠে গেলেন।

চাকর ও ঠাকুর ওপরেই একেবারে শেষ দি ঘরখানাতে শোয়। তাদের বড় ভয়, নিচে থাক পারে না। আজ তাদের নিচের ঘরে শুতে বলে আর বলে দিলেন, পুলিশ এলে যেন বলে—'বাবুর শ খারাপ, সব ঠিক হ্যায়।'

কিন্তু রাত দশটার আগে কেউ তাঁর খোঁজ নি এল না, দশটার পর এল গত রাতের হিন্দুস্থানী কনস্টেবল য়থারীতি কড়া নাড়লো। ঠাকুর ও চাকর দু'জনেই খেতে বসেছিল। কাজেই সাড়া দিতে হ'ল ডা

হই। তিনি ওপরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে বললেন, ঠিক হ্যায়।"

সিপাইজী চলে গেল।

ডাক্তার বাবু শুয়ে পড়লেন; ঘুম আসতেও দেরি হ'ল না। ক্ষণ ঘুমিয়েছেন আন্দাজ নেই, কড়ার খট্ খট্ বুর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করে রইলেন। করলেন ঠাকুর-চাকর সাড়া দেবে। কিন্তু কোথায় কে? র তলায় যে মানুষ আছে তার লক্ষণই দেখা গেল । তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে সিপাইটির উদ্দেশে মনে বললেন, "বেটা যত পারিস খট্ খট্ কর্। মি উঠছি না।"

কড়া সমানে খট্ খট্ করতে লাগলো। কখনও রে, কখন আস্তে। ক্রমে বাড়ি শুদ্ধ সবাই জেগে লো। কিন্তু প্রত্যেকেই আজ এমন বিরক্ত যে শটাকে একটু শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর।

লোকটা এবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। হাঁক লে, "এ ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—"

ডাক্তার বাবুর আর সন্দেহ রইলো না। বললেন, বেটা।" ইচ্ছা হ'ল, ঠাকুর-চাকরকে ডেকে বলে যেন দরজা না খোলে। কিন্তু তা হলে লোকটা তে পাবে যে, তিনি জেগে আছেন। তাই চুপ করে লেন।

ডলিরাণী বললে, "বাবা, শুনছো?"

—"হুঁ।"

ডলিরাণীর মা বললেন, "দরকার কি বাপু, বলেই দাও সব ঠিক হ্যায়, আর ঐ সঙ্গে বলে দেও আর খোঁজ র দরকার নেই। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল প্।"

—"ওকে বললে কিছু হবে না, ও হুকুম তামিল ছে। বলতে হবে সেই—না, লোকটা দেখছি ড়বান্দা! ডলি, তোর বুদ্ধিটাই শেষ অবধি নিতে হবে ছি। কাল চোঙ্টা—" বলতে বলতে ডাক্তার বাবু লো জাললেন; আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বারান্দার দরজাটা বাইরে বেরিয়েই বলে উঠলেন, "আজ দেখ্ছি শুদ্ধ! সাহেবের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে—"

ডাক্তার বাবুর মনে আপশোষ জেগে উঠলো। আগেই তাঁর সাড়া দেওয়া উচিত ছিল। তিনি ওপর থেকে ঝুঁকে লোকটিকে ডাকবেন, এমন সময় সে আবার ডাকলে "ডাক্তার বাবু—"

—"হাঁ। সব ঠিক হ্যায়।"

—"রোগীকা ব্যামারি বড় গিয়া। আপ্ জল্দি চলিয়ে।"

ডাক্তার বাবুর মনের মধ্যে নিমেষে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হ'ল। তাঁর মনে আবার আপশোষ জাগলো। দুপুরে যে রোগীটিকে দেখে এসেছেন লোকটি সেই বাড়ির দ্বারোয়ান; গাড়িখানাও তাদেরই। বেশ পরিষ্কার চিনতে পারলেন। আগেই সাড়া দেওয়া উচিত ছিল। তাকে অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বেরিয়ে গেলেন।

সে রাতে পুলিশও এল তাঁদের খবরদারী করতে। নিতান্ত বিরক্তি ও অনিচ্ছায় উত্তর দিয়ে ডাক্তার বাবু পরদিন থানায় যাবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু লোকের রোগও এমন সয়তানী বাধিয়ে দিলে যে সারাদিনের মধ্যে থানায় যাবার একটুও সময় পেলেন না। এমন কি থানার সামনে দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে যেতেও তাঁর নামবার ফুরসুৎ হ'ল না। যখন বাড়ি ফিরে চললেন তখন একটু রাত হয়েছে।

যেমন আর পাঁচ জনে করে, তিনিও তেম্নি বাড়ির দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। প্রত্যেক লোকেরই কড়া নাড়ার মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট্য থাকে—তাঁরও ছিল, কিন্তু অন্দরে সকলেরই মন বিরক্তিতে এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, সেটুকু কারো কানেই ধরা পড়লো না। প্রথমটা কেউই শুনেও শুনলে না। তাই উত্তরও দিলে না।

শেষে ডলি বললে, "এই জগু, বলে দে না, সব ঠিক হ্যায়!"

জগু হুকুম তামিল করবার আগেই বাইরে থেকে অস্পষ্ট ডাক কানে এল। সে চমকে উঠলো, বলে উঠলো "বাবু—"

—"যা—যা—শীগ্গির দরজা খুলে দিয়ে আয়।"

জগু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। ডাক্তার বাবু

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে তাকে ধমক দিলেন, "কেন সাড়া দিচ্ছিলি না?"

সে বললে, "মনে করেছিলাম পুলিশ হবেক।"

ডাক্তার বাবু ওপরে উঠতে উঠতে প্রতিজ্ঞা করলেন, "কাল যেমন করেই হোক থানায় যাবোই।"

সে রাতে বার দুই খবরদারীও হ'ল এবং পরদিন সকালে চা খেয়েই ডাক্তার বাবু থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। বড়বাবু ভদ্রলোক বেশ আলাপী। বললেন, "আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি! ওহো! মনে পড়েছে কালীঘাটে আমার—"

ডাক্তার বাবু কথাটা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, "ঠিকই দেখেছেন। দাদা, গরীবের ওপর আপনার অ… অনুগ্রহ। ও বাড়িতে আমি বেশ ভালই আছি। … কাউকে খবরদারী করতে পাঠাবেন না। দরকার … আপনার কাছে আমিই ছুটে আসবো। আপ… ঋণ—"

—"হেঃ—হেঃ—হেঃ! এ তো মাই ডিউটি!"

—"নমস্কার দাদা। রোগী অপেক্ষা করছে।"

—"নমস্কার!" বলে বড়বাবু আবার হাসলেন।

ডাক্তার বাবু পথে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যে… ভাবলেন, 'একা পুলিশেই রক্ষে ছিল না। এর সঙ্গে … বাড়িওলার দ্বারোয়ান যোগ দিত!'

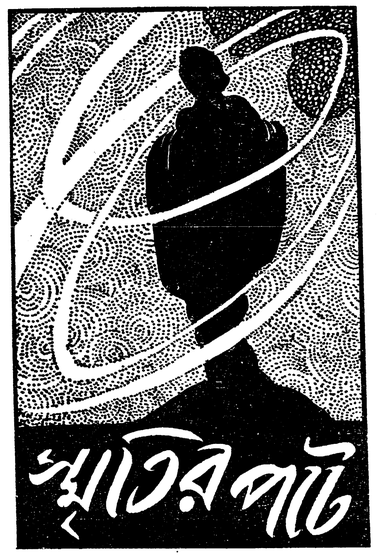

রামগড়ের জঙ্গলে

শ্রীহীরালাল মিত্র

ডাকঘরের পরিদর্শক হিসাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সুদুর্গম, অরণ্যসঙ্কুল রামগড় যাত্রার কাহিনী গত বারে তোমাদের কিছুটা শুনাইয়াছি। সেই বিপদসঙ্কু… অভিযানের বাকিটুকু আজ শুনাইব।

সেদিন ভোর বেলাই রওনা হইয়াছিলাম। শুধু … ফোঁটা চা ছাড়া সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নাই। সারা… হাঁটিয়া বেলা প্রায় ২টার সময় রামগড় পৌঁছিলাম।

রামগড়ে দু'জন খৃষ্টান মিশনারী থাকেন… একতলা সমান উঁচু মাচার উপরে কাষ্ঠনির্মি… গৃহে তাঁহারা বাস করেন। ডাকঘর তাঁহাদেরই বাড়ী… এবং তাঁহাদেরই একজন পোষ্ট মাষ্টার। তাঁহার না… শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার। তাঁহারা আমাকে খু… সমাদর করিলেন। অপরাহ্নে আহার সারিলাম… রাত্রেও বেশ সুনিদ্রা হইল। কিন্তু এ কয় দিন রাস্তা… খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, পথে বৃষ্টিতেও ভিজি… হইয়াছিল। ফলে পর দিনই আমি প্রবল জ্বরে পড়িলাম… এই সময়ে মিশনারী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী আমার … সেবাযত্ন করিয়াছিলেন তাহা ভুলিব না। সুস্থ হই… অফিসের কাগজপত্রে মন দিলাম। তাহাতেও … তিনেক কাটিল।

রামগড়ে ভয়ানক বাঘের উৎপাত। মিশনারী মহা… বলিলেন, সময় সময় রাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ পো… অফিসের সম্মুখে আসিয়া এমন ভয়ানক গর্জ্জন ক… যে মাটী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। তিনি অনেকগু… খাসী পুষিয়াছিলেন। প্রথমে মাটীতে খুব শক্ত … …মজবুত খুঁটি দিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে খাসী-…কে রাখা হইত। রাত্রে সেখানে বাঘ আসিয়া বেড়া …দিয়া খাসীগুলি লইয়া যাইতে লাগিল। তখন মিশনারী-…য়ার্টারের উঠানে এগুলি রাখা হইত। উঠানের …দিকে উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা। বাঘ বেড়া টপকাইয়া …ঠান হইতে খাসী ধরিয়া লইতে লাগিল। এই ভাবে …ধিকাংশ খাসীই বাঘের পেটে গেল। তখন নিরুপায় …য়া হতাবশিষ্ট ৫টী মাত্র খাসী রাত্রি বেলা পোষ্ট …ফিসের ঘরে আনিয়া রাখা হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একতলা সমান উঁচু মাচার উপরে …াষ্ট অফিস গৃহ অবস্থিত। এই ঘরে কাঠের দরজা …ছিল না, খুব বড় একটা মজবুত ঝাঁপ দড়ি দিয়া উপরে …লাইয়া রাখা হইত ও রাতে উহা নীচে ফেলিয়া দেওয়া …হইত। তারপর কাঠের আগড় (হুড়কা) দিয়া দরজা …করা হইত। আমি রামগড় যাওয়ার পরের দিন …ড়িত অবস্থায় রাত্রে পোষ্ট অফিসের ঘরে শুইয়া ছিলাম। …াপরাশী ঘরের মেঝেতে এক কোণে শুইয়াছিল। অপর …কোণে খাসীগুলি বাঁধা ছিল। রাত্রি ২টার সময় একটা …বাঘ মাচার উপরে উঠিয়া ঝাঁপের হুড়কা খুলিবার জন্য …াঁপের গায়ে আঁচড়াইতে লাগিল। হুড়কাটা একটু ঢিলা …ছিল, বাঘের আঁচড়ে উহা হঠাৎ খুলিয়া গেল। পোষ্ট …অফিসের ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছিল; বাঘ ঘরের …মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার পাশ দিয়া গিয়া একটা খাসীর …গলা কামড়াইয়া ধরিল। খাসীটা প্রাণের দায়ে বিকট …চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঘ খাসীটাকে লইয়া ঝাঁপ …ঠেলিয়া বাহিরে আসিল ও এক লম্ফে নীচে পড়িল। …খাসীর বিকট চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ও আমি …দেখিলাম ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড বাঘ। ভয়ে আমার হৃদ্‌কম্প …হইতে লাগিল। আমি কথা বলিতে পারিলাম না। …গোলমাল শুনিয়া মিশনারীরা পোষ্ট অফিসে ছুটিয়া …আসিলেন। চাপরাশী দরজা খুলিয়া দিল। সেই …রাত্রিতে খৃষ্টান মগেরা ও মিশনারীরা লণ্ঠন ও মশাল …লইয়া চারিদিকে খাসীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। …কিন্তু কোথাও উহা পাওয়া গেল না। পরদিন প্রাতে নদীর …অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে খাসীর ভুক্তাবশিষ্ট কতক অংশ …দেখা গেল। মিশনারী মহাশয় উহাতে 'আর্সেনিক' মাখাইয়া চলিয়া আসিলেন। বাঘ আসিয়া খাসীর অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করিবা মাত্র মাটীতে পড়িয়া গেল ও মরিয়া গেল।

মিশনারীদের কোয়ার্টারের আশপাশে বিস্তর মগ খৃষ্টান হইয়াছিল। তাহারা মিশনারীদের শিষ্য ও প্রজা। তাহারা খড়ের গাদার মধ্যে বাঁশ দিয়া ফাঁক করিয়া তার মধ্যে অবস্থান করিত। এই সমস্ত মগেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। পূর্ব্বে ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ইহারা চাষবাস করিত ও নিজেদের খোরাক নিজেরাই উৎপাদন করিত। নিজেদের কাপড়ও নিজেদের তাঁতে নিজেরাই বুনিয়া লইত। দেখিলাম এই মগেরা প্রায় সকল রকম মাংসই আহার করে। সাপ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় না। শূকরমাংস ইহাদের একটি প্রিয় খাদ্য। কচ্ছপ ধরিতে পারিলে ইহারা মাঠের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দেয় ও ভিতরে কচ্ছপটীকে পূরিয়া মাটী চাপা দেয়। কচ্ছপটী অগ্নিতে দগ্ধ হইলে নুন ও মরিচ সংযোগে তাহার মাংস ভক্ষণ করে। জঙ্গলের মধ্যে যদি হরিণ মারা পড়ে তবে তাহার পা কাটিয়া লয় এবং জঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দেয়! আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তাহার উপর পাথর চাপা দেয়। ইহাতে পাথর খুব উত্তপ্ত হয়। তখন তাহার উপর হরিণের মাংস নিক্ষেপ করে। পাথরের উপর মাংস উল্টাইয়া দেয় ও তাহাতে 'চড় চড়' শব্দ হয়। মাংস এইরূপে ভাজা হইলে নুন ও মরিচ দিয়া সকলে মিলিয়া উহা ভক্ষণ করে। ইহারা রন্ধন কার্য্যে এক প্রকার মশলা ব্যবহার করে তাহার নাম 'নপি'। এই মশলা ছাড়া ইহাদের কোন রান্নাই হয় না। মাছ রৌদ্রে শুকাইয়া পরে তাহা চূর্ণ করিয়া এই নপি তৈয়ারী হয়। ইহা এমন ভীষণ দুর্গন্ধ যে ইহাদের রান্নার সময়ে আমাদের কেহ কাছে গেলেও তাহার বোধ হয় অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসে! কিন্তু ইহা উহাদের নিকট অতি সুখাদ্য। আবার ঘি দিয়া কোন খাদ্য রান্না করিলে ইহারা তাহা স্পর্শও করে না। ঘিয়ের গন্ধ ইহারা সহ্য করিতে পারে না। চট্টগ্রাম সহরেও শুট্‌কি মাছ প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। বাজারে যেখানে শুট্‌কি মাছ বিক্রয় হয় সেদিকে গেলে দুর্গন্ধে প্রাণ, যেন বাহির হইয়া যায়! ব্রহ্মদেশেও শুট্‌কি মাছের

খুব চলন। ইহারা পীড়িত হইলে ঔষধপত্র খায় না, দেবতার উদ্দেশে গৃহপালিত পশু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূকর প্রভৃতি বলি দেয়। ফলে রোগ হইলে অধিকাংশ রোগীই মারা যায়। ইহাদের মধ্যে ভূতের ভয় খুব বেশী।

এখানকার মিশনারীদের একজনের নাম শ্রীযুক্ত দয়াল সরকার। তাঁহার একটি রাইফেল বন্দুক ছিল। আমি সুস্থ হইলে তিনি আমাকে লইয়া একদিন মাঠে হরিণ শিকার করিতে গেলেন। হরিণেরা খুব কচি কচি ঘাস খাইতে ভালবাসে। দয়াল বাবু রাইফেল হস্তে ক্ষেতের আইলের ও ঝোপের আড়ালে ধীরে ধীরে বন্দুকটী মাটীতে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২।৩টী হরিণ মাঠে চরিতেছিল। তাহার নিকটেই জঙ্গল। জঙ্গল হইতে মাঠে নামিয়া ঘাস খাইতেছিল। হরিণদের কতকটা নিকটবর্ত্তী হইয়া দয়াল বাবু গুলি ছুঁড়িলেন। একটা পড়িয়া গেল ও অন্যগুলি চোখের পলকে জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। হরিণটা মাটীতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া শিকার দেখিতেছিলাম। ৮।১০ জন মগ মিলিয়া হরিণটা কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। হরিণ কাটিয়া মগদের দেওয়া হইল। তাহারা মহানন্দে ভোজ খাইল। আমরাও ৩।৪ দিন খুব হরিণের মাংস খাইলাম। হরিণের মাংস খুব বেশী পরিমাণে খাইলেও নাকি অসুখ হয় না।

একদিন খবর আসিল যে বাঘে একটা গরু নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। আমরা উহা দেখিয়া আসিলাম। দয়াল বাবু বাঘ মারিবেন বলিলেন। মৃত গরুটার কিছু দূরে একটা মাচা তৈয়ার করা হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দয়াল বাবু রাইফেল হ উক্ত মাচার উপর উঠিয়া বসিলেন। শরীর অসুস্থ বলি আমি আর গেলাম না। মাচার উপর দয়াল বাবুর স আরো ২।৩ জন লোক ছিল। একটু অন্ধকার হইতে এক প্রকাণ্ড বাঘও মৃত গরুটার নিকট আসিল। বা এমন ভীষণাকার যে দয়াল বাবু উহা দেখিয়াই ভয়ে অ অচৈতন্য হইলেন, গুলি চালাইতে সাহস হইল না।

তিনি পাকা শিকারী নহেন। তাঁহার হাত কাঁপি লাগিল ও বন্দুকটী নীচে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে বা এক লাফে পলাইয়া গেল। বাঘের ভয়ে শিকারী মহা আর নীচে নামিতে সাহস পাইলেন না, মাচার উপ বসিয়া বসিয়া মশার কামড় খাইতে লাগিলেন। প অনেক মগ সেখানে গিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লই আসিল।

সাত দিন রামগড়ে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিবার জ প্রস্তুত হইলাম। আবার সেই জঙ্গল—সেই বিপদসঙ্কু পার্ব্বত্য পথ। যাহা হউক, অবশেষে একদিন অক্ষত দে চট্টগ্রামে পৌছিলাম। যাইবার সময় যাঁহারা একবা নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বলিলেন, আমি ব বাঁচা বাঁচিয়া গিয়াছি!

পরবর্ত্তী কর্ম্মজীবনে আমি লুসাই পাহাড়, না পাহাড়, আইজল, লুংলে, ডেমাগিরি, মণিপুর, কোহিম সিকিম, তিব্বত প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি। বহুব ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছি, কেবল ভগবানের দয়াতে রক্ষা পাইয়াছি। এখন বৃদ্ধ বয়সে সেই সমস্ত বিপদে কথা মনে পড়ে। রামধনুর ছোট্ট বন্ধুদের সে সব রোমাঞ্চ কর কাহিনী মাঝে মাঝে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

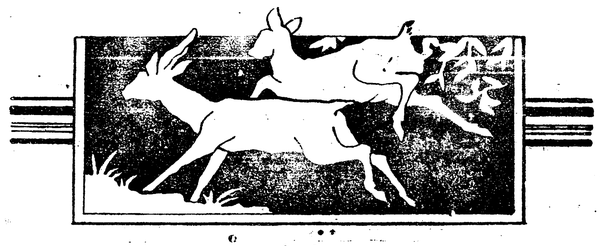

চার

অশোক লাহিড়ীর ডায়েরী

পাশের ঘরে গিয়ে খেতে বসলাম, কিন্তু জমিদার আমার সঙ্গে খেতে বসলেন না। জানালেন তাঁর খাওয়া অনেক আগেই হয়ে গেছে। খাওয়ার পর আবার বসে বসে আমরা গল্প করতে লাগলাম। রাত বেড়ে যেতে লাগল, ঘুম পেলেও উঠতে পারছি না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল--এখনি ঘুমোতে গেলে উনি কি মনে করবেন। রাত্রি-শেষের ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তবু ঘুমোতে যেতে পারি না। রাত্রের কালো আকাশ স্বচ্ছ হয়ে এল, পূব দিক্‌চক্রবালে দেখা গেল রক্তিমাভা, কোথায় কোথায় যেন ডেকে উঠল দু'-একটা বন্য মোরগ, গাছে গাছে পাখীর কাকলিতে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা হঠাৎ যেন এক সুখস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। কৃতান্ত লজ্জিত হয়ে বললেন—"য়্যা, আবার সকাল! কি অন্যায়, আপনাকে মিছিমিছি রাত্রে ঘুমোতে না দিয়ে জাগিয়ে রাখলাম। আপনি এবার থেকে এত সুন্দর ভাবে না করে অত্যন্ত কাঠখোট্টা ভাষায় গল্প বলবেন, তবে আমাদের গল্প বেশিক্ষণ চলতে পারবে না। আপনিও রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবেন।"

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ আমি এখানকার প্রতিটি ঘটনা লিখে গেছি; হয়ত অনেকের এত কথা ভাল লাগবে না। কিন্তু আজ হঠাৎ এখন মনে হচ্ছে যেন সমস্ত ঘটনা লেখাই আমার উচিত হয়েছে। এই বিশাল জমিদার-প্রাসাদে এসে এখন যে সব অদ্ভুত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করছি তাতে এক অনাগত আশঙ্কায় আমার সমস্ত মন ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে, কেন যে এখানে এলাম! একবার যদি এখান থেকে বের হতে পারি! এও হতে পারে যে সারা রাত জেগে থাকার পর অতিরিক্ত ক্লান্তিতে আমি নিজেকে অসুস্থ মনে করছি, কিন্তু সত্যিই কি তাই? যদি একজনও কথা বলার সঙ্গী পেতাম, হয়ত এত ভয় হ'ত না। কিন্তু কেউ নেই। এখানে, এই বাড়িতে, আমার চারপাশে আমার সঙ্গী বলতে একমাত্র জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা,—আর সেই জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা...! ভগবান্, আমার মনে হচ্ছে, শুধু মনে হচ্ছে কেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বাড়িতে একমাত্র জীবিত

ব্যক্তি আমি; এখানে আর কেউ জীবিত নয়, কেউ জীবিত নেই! এ কোথায় এসে পড়লাম!

বিশ্বাস হবে না জানি, আমারই যে কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না! মনে হচ্ছে কোথায় যেন কি এক গোলমাল হয়ে গেছে! সারা রাত জেগে বিছানায় এসে শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। উঠে পড়লাম। সুটকেস থেকে আমার আয়না বের করে দাড়ি কামাতে বসলাম। হঠাৎ যেন আমার কাঁধে কে হাত রাখল, পরক্ষণেই কৃতান্তবর্ম্মার গলা শুনতে পেলাম—"ঘুম হ'ল?"

চমকে উঠলাম। কারণ আমার আয়নায় আমার পিছনের সমস্ত জিনিষের ছায়া পড়লেও সেই আয়নায় কোনও মানুষের ছায়া পড়তে আমি দেখি নি। হঠাৎ চমকে ওঠায় আমার গালের খানিকটা কেটে গিয়েছিল; কিন্তু তখন তা লক্ষ্য করি নি। তাঁর কথার উত্তর দিয়ে আবার আয়নার দিকে তাকালাম, কিন্তু এবারেও ছায়া পড়ে নি। এবার তো কোনও ভুল হওয়া উচিত নয়! কারণ জমিদার—কৃতান্তবর্ম্মা একেবারে আমার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। আমার পিছনে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এবারও আয়নায় তাঁর ছায়া নেই! সমস্ত ঘরটুকু আয়নায় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আয়নায় মানুষের ছায়া বলতে পড়েছে শুধু আমার ছায়া! কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কি করব ভেবে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম, আমার গাল কেটে রক্ত পড়ছে। একটু তুলোর খোঁজ করা মাত্র কৃতান্তবর্ম্মা আমার গালে রক্ত দেখতে পেলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে আগুন জ্বলে উঠল, সমস্ত শরীর কি এক আসুরিক শক্তিতে ঋজু ও শক্ত হয়ে উঠল। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আমার গলা ধরতে এগিয়ে এলেন। আমি সভয়ে পিছিয়ে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। ততক্ষণে তাঁর শক্ত দু'হাত আমার গলা টিপে ধরেছে। প্রাণের দায়ে এক ঝটকায় গলা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। তাঁর হাত খসে গিয়ে আমার গলায় মাষ্টার মশাইয়ের দেওয়া মাদুলির উপর পড়ল। এক মুহূর্ত্তে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখলাম। তিনি ভয়ে ঘরের এক কোণে সরে গেলেন, চোখে-মুখে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্ত ভাব!

একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন—"এখানে একটু সাবধান। এ জায়গা বড় খারাপ। রক্তপাতে অনেক অনর্থ ঘটে যায়।"

তারপর আমার আয়নাটাকে ধরে বললেন—আয়নাটার জন্যই এত কাণ্ড হ'ল। এটাকে দূর দেওয়াই উচিত।" খোলা জানালা দিয়ে আয়না বাইরে ফেলে দিলেন তিনি। আয়নাটা নীচে পড়ে করে ভেঙ্গে গেল। আর কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমি বুঝে উঠতে পার এবার থেকে কি করে দাড়ি কামাব! আমার পিছনটা খুব ঝকঝকে, তাতে মুখ দেখা যায় দে এরপর দেখছি তারই আশ্রয় নিতে হবে।

খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, খাবার তৈরী; কৃতান্তবর্ম্মার খোঁজ কোথাও পেলাম না। অগত্যা একাই খেতে হ'ল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে পর্য্যন্ত তাঁকে কখনও খেতে দেখলাম না। কি অদ্ভুত ধরণের লোক!

খাওয়ার পর বাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে লাগ সিঁড়ি দিয়ে কিছু দূর নেমে একটা জানালা দিয়ে বা দিকে তাকালাম। এই প্রকাণ্ড বাড়িটি একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে। এখান থেকে একটা ফেলে দিলে কোথাও না বেধে তা হাজার হাজার নীচে পড়বে। চারদিকে শুধু পাহাড় আর ঘন বন,—ম মাঝে সরু রজতধারার মত নদী।

কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবার সময় এখন নয়। বাড়ি ঘুরে দেখলাম খালি দরজা, আর দরজা— দরজাই ভাল করে তালা-বন্ধ। সেই সিঁড়ির কা জানালা ছাড়া বাইরে বেরুবার আর কোনও পথ

তবে কি এই বিশাল জমিদার-বাড়ি একটি নি কারাগার, আর আমি তার একমাত্র কয়েদী!

—এই অজানা নির্ব্বন্ধু দেশে একটি বিশাল বাড়িতে বন্দী—এই কথা বুঝতে পারা মাত্র সমস্ত রক্ত আ মাথার মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল। আমি দিয়ে উপর নীচ প্রতিটি ঘর আর প্রতিটি জানালা

চেষ্টা করলাম, কোনও রকমে পালানো সম্ভব কিন্তু কলে-পড়া ইঁদুরের মত ছুটোছুটিই সার এ বাড়ি ছেড়ে বের হবার কোনও উপায় নেই,— পথ নেই! এই বাড়িতেই কি আমার জীবন্ত হবে? সমস্ত শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, শরীর-মন ভেঙ্গে পড়ল। নিজের নিঃসহায়তার ম্যক্ ভাবে বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলাম। একটা কথা মনে হ'ল— মনের কোনও কথাই কৃতান্তবর্ম্মাকে জানানো হবে তিনি ঠিকই জানেন যে আমি এই বাড়িতে বন্দী, তিনিই আমাকে বন্দী করে রেখেছেন—এখন যদি আমি সব বিষয়ে বিশ্বাস করি তবে আমাকেই হবে। চারিপাশে তাকিয়ে শুধু সব সময় সজাগ চোখ খুলে থাকতে হবে; আমার ভয়, আমার , আমার অভিজ্ঞতা শুধু আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ ত হবে। আমি জানি, হয় আমি অমূলক ভয়ে কল্পনা করছি, নয়ত সত্যি সত্যিই আমার জীবনের মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এই দূর দেশে, রে অপরিচিত আমাকে এ ভাবে বন্দী করে জমিদার র্ম্মার কি লাভ হতে পারে!

নে মনে যা তা আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে বড় দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম, স্পষ্ট পারলাম কৃতান্তবর্ম্মা এতক্ষণে ফিরলেন। তিনি ই লাইব্রেরীতে ফিরলেন না দেখে আমি চুপি চুপি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, আমার বিছানা করছেন। চমকে উঠলাম—কিন্তু আগেকার বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল যে এই বাড়িতে কোনও নেই। তার কিছুক্ষণ পরে খাবার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম তিনি আমার খাবার সাজিয়ে ন। আমার আগেকার ধারণা দৃঢ় হ'ল, কারণ যদি তিনিই বাড়ির সমস্ত ছোটখাট কাজ করেন তবে নিশ্চয়ই বাড়িতে চাকরবাকর কেউ নেই। কিন্তু এই কথা মনে হ'তেই এক অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যিই এত বড় বাড়িতে আর কোনও লোক না থাকে তবে সেই ঘোড়ার গাড়ির শয়তান গাড়োয়ানও নিশ্চয় জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা। কি সর্ব্বনাশ! যে শুধু হাত দিয়ে হিংস্র নেকড়ের পাল তাড়িয়ে দিতে পারে, যাকে দেখে জঙলা গাঁয়ে আমাদের গাড়ির অন্যান্য যাত্রী ও গাড়োয়ান ভয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে—সে তবে কি রকম লোক! যেমন করেই হোক্ তাঁর সম্বন্ধে আমার সমস্ত খবর জানতে হবে। আজ রাতে আমি সমস্ত গল্প তাঁকে নিয়েই সুরু করব—দেখি তাঁর সম্বন্ধে কি বলেন! কিন্তু তিনি যদি আমাকে সন্দেহ করেন!

সমস্ত রাত ধরে তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম। তিনি তাঁদের জমিদারীর ইতিহাস বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। কি সুন্দর ভাবে তিনি গল্প করতে পারেন! তিনি এমন ভাবে যুদ্ধবিগ্রহের গল্প সুরু করলেন যেন তিনি সেই যুদ্ধে সত্যি সত্যিই উপস্থিত ছিলেন। এমন ভাবে সেই সব কাহিনী বলতে লাগলেন যে তাঁর পূর্ব্বপুরুষের সুনাম ও গর্ব্ব যেন তাঁরই, তাঁদের গৌরব তাঁরও; তাঁদের ভাগ্যও তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে গাঁথা! তাঁর প্রতিটি কথায়-বার্ত্তায় পূর্ব্বপুরুষদের রাজকীয় আভিজাত্য ফুটে উঠছিল।

আমাদের গল্প শেষ হ'ল ঠিক সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। আমাদের কাহিনী ঠিক আরব্যোপন্যাসের মত হয়ে যাচ্ছে—প্রতিদিনকার গল্প শেষ হচ্ছে ঠিক মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে কেটে গেল সাত দিন। তারপর ঘটল আর এক অভাবনীয় কাণ্ড!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্‌. এ

ফোর্ট-উইলিয়াম-যুগের পরের সাহিত্য

রাজা রামমোহন রায়

বাংলা সাহিত্যের গল্প বলতে গিয়ে এর আগের বারে তোমাদের পিয়ারসন্‌ সাহেবের কথা বলেছিলাম। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আওতায় যে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল—মোটামুটি ভাবে তার রূপটা আমরা দেখেছি। এ যুগের শেষ লেখক বলা যায় হরপ্রসাদ রায়কে।

এবারে একজন মনীষীর কথা বলব—তাঁর নাম তোমরা সকলেই জান। তিনি হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি জন্মেছিলেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, আর মারা যান ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। রামমোহনের বিশেষ নাম অনেকের কাছে এইজন্যে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য আমরা তাঁর কাছে যে কি রকম ঋণী তা হয়ত অনেকে জান না। তখনকার দিনে বাংলা শাসন করবার জন্যই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োজিত লোকদের বাংলা ভাষা শিখবার দরকার হয়েছিল আর কেবল সেইজন্যেই যে বাংলা গদ্যের দৌড় পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল সে কথা আগেই বলেছি। তাই পাঠ্য পুস্তক রচনার দি[কে] তখনকার পণ্ডিতদের ঝোঁক গিয়েছিল বেশী। রামমো[হন] বোধ হয় প্রথম পাঠ্য পুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্য ব্য[বহার] করতে আরম্ভ করেন। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তখন[কার] দিনের নতুন গদ্য সীমাবদ্ধ থাকায় ভাষা সরল অনাড়ম্বর হতে পারে নি। রামমোহনের ভাষায় সাহি[ত্য] রস কতটা ছিল তা নিয়ে তর্ক থাকলেও ভাষাটা যে অ[র্থ] প্রকাশক ছিল—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নে[ই]। তিনি কি বলতে চাইতেন তা পাঠক মাত্রেই বু[ঝতে] পারত। সরল ভাষার গুণই তো এই।

রামমোহন রায়ের নামে যে কয়টি গ্রন্থ প্রচলি[ত] আছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:—

(ক) 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'—১৮১৫ (অনুবাদ গ্রন্থ)

(খ) 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে "গ্রন্থ লে[খেন] ...

...ান্ত-চন্দ্রিকা) তারই উত্তর স্বরূপ রামমোহন গ্রন্থটি ...ন করেন।

(গ) "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ"—১৮১৮-১৮১৯ সেকালে আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা ছিল। এই ...রণ প্রথা যে অন্যায় তাই প্রমাণ করবার জন্যে ঐ দু'টি ...কা লেখেন।

(ঘ) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত 'পাষণ্ড পীড়ন'- বিরুদ্ধে রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পথ্য প্রদান' রচনা ...ন।

উপরে যে বইগুলির নাম করলাম তা পড়লেই বোঝা ...সাহিত্য রচনার চেয়ে সমাজ সংস্কার করবার উদ্দেশ্য ...ই তিনি কলম ধরেছিলেন। তখনকার হিন্দুধর্ম্মের ...কথিত বড় বড় চাঁইরা তাই তাঁকে পরাজিত করবার ... উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই ধর্ম্ম-কলহের ...গ নিয়ে বাংলা গদ্যের বাঁধুনি বেশ খানিকটা শক্ত হয়ে ...।

এ ছাড়া রামমোহন রায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ ...ধি' বলে একটি কাগজ প্রকাশ করেন। তারপরের ফারসী ভাষায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, নাম হচ্ছে 'মীরাতু-ল্‌-আখবার। অনেকের মতে ...ই হচ্ছে ফারসী ভাষার প্রথম পত্রিকা। তিনি ইংরিজি ভাষায় একটি ব্যাকরণ ও তারই অনুকরণে বংলায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন। কয়েকটি উপনিষদেরও তিনি বঙ্গানুবাদ করেন।

ভাষার দিক্‌ থেকে তিনি বেশ প্রাচীনপন্থী হ'লেও (এখনকার চোখ নিয়ে বলছি) ভাষাকে সুন্দর ও সহজ করার চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিল। তাই রামমোহনের ভাষার গাঁথুনি শক্ত হ'লেও সহজবোধ্য।

রামমোহনের নাম সাহিত্যিক হিসাবে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী পণ্ডিত হিসাবে! নব্য বাংলা সেই সময় গড়ে উঠছে বিদেশীদের আওতায়। দেশের ছেলেরা, যাদেরকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলে থাকি "আমাদের ভবিষ্যৎ,"—তারা ঝাঁকে ঝাঁকে সাহেব হ'তে আরম্ভ করলে; এক পাশে হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি, আবার অন্য দিকে নতুন আমদানি পাদরীদের পিঠ চাপড়ানি—এর মধ্যে পড়ে বাঙ্গালীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রামমোহন রায় বাঙ্গালীর সংস্কৃতি দু'ভাবে রক্ষা করলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ক'রে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রাখলেন; আর বাংলা গদ্যের ভিতর দিয়ে হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে বাংলা গদ্যের আয়তন বাড়িয়ে দিলেন। তাই রামমোহন রায়কে অনেকে বাংলা গদ্যের জনক বলেন। অন্ততঃ, জনক বলে স্বীকার না করলেও বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে তাঁর দান যে চিরস্মরণীয় এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

জীবন

শ্রীনারায়ণ দত্ত

...কতই বা বয়স হবে? বাচ্ছা, দশ—কিংবা বারো; আর রামসুখন।

...বিপদ্‌ কাটল কিন্তু বিস্ময় কাটল না। বংশী ...র মত দাঁড়িয়ে রইল।

...উঃ, ভারী বেঁচে গেছি!' রামসুখন একটু থেমে ... বংশী কিন্তু জবাব দিলে না।

...াইরের গতিশীল পৃথিবীতে যেন খুব ভারী অবাকের কিছু পেয়েছে! রামসুখন চারিদিকে আড়চোখে তাকিয়ে সামান্য হেসে বল্লে, 'কেমন বল্লাম দেখলি? ব্রীজ সর্দ্দার পারতো বলতে এমনি করে?'

এবার উত্তর দিলে বংশী,—কিন্তু রামসুখনের কথার জবাব নয় সেটা।—'আচ্ছা, বলতে পারিস রামসুখন, এ কি করছি আমরা?'

রামসুখন বিস্মিত হলো এবার। চলন্ত রেলগাড়ীর

জানলা দিয়ে গলাটা বাইরে বার করে দিয়েছিল সে, ভেতরে এনে বল্লে, 'কি বল্লি?'

অন্যমনস্কের মত মুখ তুললে বংশী। চিন্তিত মুখে বললে, 'এটা ভালো নয় ভাই!'

'ভালো না? না এদ্দিন ক'রে পাকা হয়ে তোর মুখে এই কথা?' রামসুখন ভারিক্কি চালে উপদেশ বর্ষণ করতে চেষ্টা পায়—'না করলে খেতিস্ কোথা বলতে পারিস্? কোথায় মিলতো রাত দুপুরে কালো হাঁড়ি থেকে গবান ফ্যানশুদ্ধ আকজলন্ত চপ্‌চপে ভাত?'

ভাত? ভাবতে ভাবতে রসগ্রন্থীর রস নিঃসারণ খর হয়। বংশী ঘাড় নাড়তে থাকে।

'মাসীও ত' সেই কথা বল্লে!'

মাসী? মাসীকে ত' চেনাই যায় না!

পাথুরে সহর কলকাতা! জীবন্ত দুঃস্বপ্নের খাস-মহল! এই প্রদেশের ছেলে নয় রামসুখন, কিন্তু বংশী ত' এখানকারই বটে! এই মাটীর বাংলার,—এই ধানের বাংলার—শান্ত পল্লীতে ছড়ান বাংলার একটা কোণে হয়তো জন্মেছিলো সে।

সে সেই মড়কের সাল!

ধান ছিল না, চাল ছিল না, প্রাণ ছিল না, মানুষ ছিল শুধু মরতে। সেই বছরটার কথা মাঝে মাঝে স্বপ্নে যদি ভেসে ওঠে নিতান্ত ভূতে পাওয়ার মত চীৎকার করে ককিয়ে ওঠে বংশী। কিন্তু এর চেয়েও বড় একটা ধ্বংসের ছবি মনে পড়ে তার।

চলন্ত এই রেলগাড়ীর জানলা দিয়ে দূরে—আরও দূরে,—যত দূর দৃষ্টি ফেলা যায়—ঐ যে সব জায়গায় বেনাঘাসে ভরে গেছে, ততদূর—শুধু ভরে গিয়েছিলো কালো আর গেরুয়া মেশান রঙ্গিন জলের তোড়ে।

দৃষ্টির মাঝে ভাসতে থাকে গাঁয়ের কথা—এদিকেই হবে—কোথায় যেন! তখন কতটুকুই বা হবে ও!

বাইরে কর্ম্মবহুল পৃথিবীর শ্রান্তি স্পষ্ট হচ্ছে। 'লোকাল' ট্রেণখানার গতি মন্দ হ'তে মন্দতর হচ্ছে। দু'টি-একটি মাত্র লোক উঠ্‌ছে, নামছে। শির শির করে বইছে পৌষ-শেষের তীক্ষ্ণ বাতাস। প্রায়ান্ধকার ষ্টেশনের কেরোসিন ল্যাম্প কনে বউর উঁকিঝুঁকির মত বোধ হচ্ছে! ছেঁড়া কাপড়খানা গায়ে টানবার করে বংশী।

রামসুখন একটা বিড়ি ধরিয়ে গাটা গরম কর চেষ্টা করে। ঐ বয়সেই ও দিব্যি বিড়ি ধরাতে শিখে

বংশীর মানসপটে ইতিহাস আলোড়িত হ'তে থা বাবা ছিল, মা ছিল, অথচ বন্যায় কোথায় সব ভেসে গেল! গল্প শুনেছে কোন্ মুনিঋষির এক রাজার সাজান রাজত্ব নিমেষে খাক হয়ে এ যেন সেই ঘটনা।

বন্যায় যাঁরা গিয়েছিলেন সাহায্যের নামে, বোধ হয়, বংশীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'এটা সহর, এটা কলকাতা। এটা যে পাষাণ এ কথা কাউকে বলতে শোনা যায় নি!

বংশী চিনে নিয়েছে। ওর রক্তের কণায় এর বিষাক্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

'অ মা, এটা কাদের ছেলে গো! কোত্থেকে আ গো—বাছা? মাসী,—অন্‌মাসীর কাতর চোখে ঝলকানি।

বংশী উত্তর দিতে পারে নি, ভরে উঠেছিল কা ওর ডাগর চোখে ধারা নেমেছিল অবিশ্রান্ত।

আদর ক'রে ডেকে নিয়েছিল মাসী। সম্বন্ধ মা প্রথম পাতিয়ে দিয়েছিল—'আমি তোর মাসী হ জানিস্?'

সদ্য-কেনা দু'পয়সার মুড়ি খেতে খেতে ব কথা বেরিয়েছিলো, 'হ্যাঁ'।

'হ্যাঁ, অমনি হ্যাঁ! মাসী অমনি হ'লেই হ মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বড়; জানিস্? জানিস্ আদরে গালটা নেড়ে দিয়ে বল্লে মাসী। পাশের ভিখারীদের সাথে মাসীই পরিচয় করিয়ে দিয়ে 'জানিস্, আমার বোনপো এলো ঘর থেকে—'

তারপর সুরু হ'ল তার কাজ। কাজটা তেমন কঠিন নয়। চোখটা বন্ধ রাখতো মাসী, অন্ধ সাজত। দিনের বেলা বেবাক্ অন্ধ বনে সময়ে সময়ে বংশীরই তো সন্দেহ হ'ত হয়তো—হয় অন্ধই হবে মাসী। আর বংশীকে সুর চড়িয়ে বল হ'ত—'অন্ধকে দো' দো' পয়সা দেও বাবা!'

সুর চমৎকার।

যুদ্ধ চলেছে তখন। মানুষ দয়াও নেহাৎ কম করত না—হয়ত বা দিনান্তের রাশিকৃত পাপের বোঝা নামাতে চেষ্টা করত।

এটা ফুটপাথের জীবন!

পাশে ডাষ্টবিনের পৌর প্রতিষ্ঠানের জমা করে রাখা ময়লার ভ্যানভেনে মাছি! তারই পাশের জীবন।

'কাজ দেবে বাবু—? কাজ?' পোস্তা পেরিয়েই হ্যারিসন রোডের ট্রাম। জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। আরোহীদের মুখের দিকে চেয়ে আশার অন্ত ছিল না বংশীর।

'এই ছোক্‌রা, শুন্'—দামী সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডাকলে ব্রীজমোহন। পরনে পাৎলুন, গায়ে লম্বা ওভারকোট্, হাতে ওয়াকিং ষ্টিক্।

বংশী এগিয়ে এলো—'কি?'

'কাজ মাংগতা? কাজ দোরকার তোমার?' ব্রীজ-মোহন তীব্র দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।'

ঘুরে পরক্ষণই দাঁড়ায়, হন্ হন্ করে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আও, সাথমে আও! হামার সংগে এসো!'

ব্রীজমোহন তাকে কাজ দিয়েছিল; অবাক্ ধরণের কাজ।

সুখন কুনুইএর ধাক্কা মেরে ডাকে, 'এই-ই, ঝিমু-ছিস্ না কি?'

ভালো লাগে না বংশীর। রক্তাভ চোখ জোড়া তুলে বল্লে, 'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ!' সুখন ভেংচে উঠ্‌লো। 'আজকের গল্পটা দর্দারের কাছে বল্লে আধ আনি বকশিশ আলবৎ।'

আজকের গল্প! অবাক্ হয়ে যায় বংশী। সত্যি, বুদ্ধি আছে সুখনটার!

চেকারটা ধরেছিল,—'কি আছে ওতে?'

"জী?"—বংশী আমতা আমতা করতে থাকে।

'দেখেছেন মশাই, কি বিচ্ছু এই বদমাস্ বাঁচ্ছাগুলো! স্মাগলারস্। চাল এখানে ষোল টাকায় কিনে কলকাতায় বিক্রি করবে তিরিশে। ক্ষুদে শয়তান সব!'

'বাবু!' সুখন চট করে এলো এগিয়ে,—'ক্যা হুয়া বাবু?'

'কি হুয়া? বাচ্ছা ডাকু।' টিকিট-চেকার হাঁকড়ে ওঠে, 'চাল লে যাতা হায় কাঁহা?'

'আপ তৌল কিজিয়ে বাবু! পান-ছে সের হোগা। দো আদ্‌মী।'

'এ ছেলেটারও চালের থলি ছিল!' আরোহীদের একজন বলে উঠল।

'কাঁহা বাবু?' সুখন অবাক্ হয়ে যায়। 'মেরা পাস তো চাউর নেহি থা!' চোটপাট উত্তরে ভড়কে দেয় সুখন।

বংশী বিস্মিত হয়। টিকিট-চেকার নিষ্ফল আস্ফালনে সরে পড়ে।

সুখন হাসতে হাসতে কানে কানে ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'চালটা কোমরে বেঁধে, জামা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি।'

দিনে দু'তিন খেপ,—শুধু চাল কেনা আর নিয়ে যাওয়া!

কাজ! কাজ দিয়েছে ব্রীজমোহন। খাবার দিয়েছে, জল খাবারের দু'-চার পয়সা। বিড়ির দু'-এক আনা; দু' বেলা তপ্ত ভাত। ছেঁড়া হোক, তবু দিয়েছে পরনের কাপড়।

আর, আর—

'অন্ধকো দো পয়সা দে' দে' বাবু!'

বংশী ভাবছিল, চমকে ওঠে। স্বর পরিচিত।

মাসী—অন্ মাসীর গলা!

'মাসী!' বংশী ছিটকে গিয়ে পায়ের ধূলো নেয় মাসীর।

হাত নাড়তে নাড়তে দর দর ক'রে কাঁদতে থাকে মাসী।

'বংশী? তুই!' বলার চেয়ে কাঁদেই বেশী মাসী।

'হ্যাঁ।'

'চ', বসি।' জংসন ষ্টেশনে জায়গার অভাব নেই। মাসী সরে গিয়ে বসে এক জায়গায়; বলে, 'হ্যাঁরে, চলে এলি? বলে এলি না? তোকে ভাঙ্গিয়ে খেতাম বলে রাগ করেছিস্?'

রা' ওঠে না মুখে। বংশী কাঁকর-বালির গায়ে দাগ কাটতে থাকে শুধু। দু'জন নিঃশব্দে বসে থাকে।

কর্কশ শব্দ ওঠে বাঁশীর।

সুখন চীৎকার করে, 'ইঞ্জিন গাড়ী লাগল ভেইয়া!' বংশী নড়ে না। প্রশ্ন করে, 'তুমি যে এদিকে এলে মাসী?'

তুই চলে আসার পর সহর ভালো লাগল না। বুড়ো বয়সে দিনকতক খেটেওছিলাম। ঝিয়ের কাজ করতাম, আর দাঁড়িয়ে থাকতাম সেই রাস্তাটার ফুটপাথে, ভাবতাম যদি আসিস্। পোড়া যুদ্ধ ত' শেষ হ'ল, ভাবলাম, দেশের দিকে যাই। আমারও ত' ঘর ছিল, দোয়ার ছিল, ক্ষেত ছিল, তোর মতন সোনার চাঁদ ছিল ঘরে। ঘরে ফিরে গেলাম। ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে চল্‌ত। খাটতেও আর পারি না। চালের বস্তা যাচ্ছে এখান হ'তে ওখানে—চড় চড় করে উঠছে দর। দেশটা এবার শ্মশান হয়ে যাবে, আমরা শেষ হয়ে যাব বংশী! কুল উঠে যাবে আমাদের!'

দর দর করে কাঁদতে লাগল বংশী।

গাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছিল, ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল বংশী, ডেকে বল্লে, 'যাই—'

মাসী—অন্‌মাসী সাড়া দিল না, বোবার মত তাকিয়ে রইল শুধু।

০

সশব্দে দাঁড়াল প্যাসেঞ্জারখানা। শীতের রাত্রি। ব্রীজমোহন ঠিক অপেক্ষা করছে।

'কাম্ হুয়া—?

কাঁপতে কাঁপতে সুখন বল্লে, 'জী।'

কি যেন ভাবছিল বংশী, বিদ্যুৎ-গতিতে থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'না।'

'কেয়া?' ব্রীজমোহনের মেজাজ ভাল নেই।

অতি কষ্টে চালগুলো আঁকড়ে ধরে বল্লে বংশী, 'এ আমি পারব না—পারব না। আমার দেশের লোক, আমার মাসীকে এমনি ক'রে মারতে পারব না আমি!'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুখন। ব্রীজমোহন কি যেন ভাবলে, পরক্ষণে গজ গজ করে উঠ্‌ল 'করবে না! খাবে কোত্থেকে? খানা কাঁহাসে মিলেগা?'

প্ল্যাটফর্ম্ খালি হয়ে গেছে।

এ-বেলা ও-বেলা তপ্ত ভাত, ভাত থেকে গরম উঠ্‌ছে ধোঁয়া। ভাত পাবে সে কোত্থেকে? রাত্রির বিস্তীর্ণ অন্ধকারে নিরাশ্রয়ের মত দাঁড়িয়ে রইল বংশী। পূতিগন্ধ নরকে তার আত্মা যেন আকুলি বিকুলি করছে! ওপরে মেঘমেদুর আকাশটাও যেন বংশীর এই বিস্তীর্ণ সমস্যায় ভারী হয়ে আছে,—বোঝা হয়ে আছে!

যে বই তোমরা পড়তে পার

গল্পসল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানোয়ারের কাণ্ড—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জীব-জগতের আজব কথা—সুবিনয় রায়, বিজ্ঞানী ও বীজাণু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঝাঁসীর রাণী—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্‌স্ (অনুবাদ)—অমলেন্দু সেন, ময়নামতির মায়াকানন—হেমেন্দ্রকুমার রায়, আচ্ছা ফ্যাসাদ—সুনির্ম্মল বসু, অয়েল পেন্টিং—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শুঁড়ওলা বাবা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

কুড়ান গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম এ, বি. এস্-সি

মুখের দোষ

একবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে তাঁহার এক পরামর্শদাতা কোন লোককে একটি চাকরী দিবার জন্য সুপারিশ করেন। লিঙ্কন তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করাতে তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, "আমি তাহার মুখ পছন্দ করি না"। সুপারিশ-কর্ত্তা বলিলেন, "কিন্তু সে বেচারী ত' তার মুখের জন্য দায়ী নহে!"

লিঙ্কন উত্তর দিলেন, "৪০ বৎসরের অধিক বয়সের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার মুখের জন্য দায়ী।"

কৃপণ

স্কচ্‌ম্যানরা কৃপণ বলিয়া বিখ্যাত। একবার এক জন স্কচ্‌ম্যানের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী কফিন বাক্স প্রস্তুতকারকের নিকট গিয়া এক নূতন রকমের বাক্সের অর্ডার দিল। বাক্সটার একদিকে খানিকটা কাটা। তার বন্ধু বলিল, 'এ রকম কফিন তৈয়ারী করিতেছিস কেন?' সে বলিল, 'কাকার একটা পা কাটা ছিল, কাজেই উহাতে তাঁহাকে শোয়াইতে কোনও অসুবিধা হইবে না, অথচ খানিকটা কাঠ কমাতে কিছু দরের সুবিধা হইল।'

আপদ্ ও বিপদ্

গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত। সেকেলে ডেপুটি-দিগের বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইত। বঙ্কিম পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন; পরীক্ষক তিন জনই সাহেব। প্রশ্ন হইল, "আপদ্ ও বিপদ্ এই দুই কথার পার্থক্য কি?" বঙ্কিম উত্তর দিলেন, "পদ্মায় ষ্টিমারে আসিতে-ছিলাম, ঝড় উঠিয়া এক বিপদ্ ঘটিল। আর আজ এখানে আমাকে যে তিন জন সাহেবের কাছে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইতেছে ইহা এক আপদ্।"

বঙ্কিম অবশ্য পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিলেন, যদিও সাহেবদের মুখ প্রথমে একটু রাঙ্গা হইয়াছিল।

আশাভঙ্গ

এক স্কচ্‌ম্যান নিউইয়র্কের এক পনেরো তলা বাড়ীর উপর হইতে দেখিলেন রাস্তায় একটি পেনি পড়িয়া রহিয়াছে। ভদ্রলোকের লোভ হইল, উহা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উহা বড় দেখাইতে লাগিল। ভাবিলেন, তবে বোধ হয় কোন এক বড় মুদ্রা পাওয়া যাইবে। যখন আরও নীচে নামিলেন দেখিলেন সেটা একটা ডাষ্টবিনের ঢাকনা, উপর হইতে ছোট দেখাইতেছিল।

মার্ক টোয়েনের রসিকতা

মার্ক টোয়েন আমেরিকার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতে ভিন্ন ভিন্ন সহরে যাইতেন। বহু লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে জমিত এবং হাস্য-কোলাহলে সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত।

একদিন তিনি এক সহরে বক্তৃতার জন্য গিয়াছেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা হইবে, প্রাতে দুইটি যুবক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। একটি যুবক বলিল, "আমার পিসির পাঁচ বছর আগে একমাত্র ছেলেটি মারা যায়। তারপর হইতেই তিনি কেমন নিঝুম হইয়া গিয়াছেন। সংসারের কোন কাজেই তাঁহার কোনও উৎসাহ দেখা যায় না; সর্ব্বদাই গম্ভীর হইয়া থাকেন; এই কয় বছরের মধ্যে কেহই তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই। আপনি প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক, যদি কোনও রসের কথা বলিয়া তাঁহাকে একটু হাসাইতে পারেন ত' আমরা একান্ত অনুগৃহীত হইব।"

এই বিষাদ-কাহিনী শুনিয়া মার্ক টোয়েনের বড়

সহানুভূতি হইল। তিনি তাহাদের পিসিকে বক্তৃতা-গৃহে আনিয়া সামনের এক আসনে বসাইতে বলিলেন। আশা দিলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে হাসাইতে সমর্থ হইবেন।

যথাকালে মার্ক টোয়েনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তিনি নানা রসের কথার অবতারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া লুটাপুটি করিতে লাগিল। কিন্তু সেই পিসির মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হইল না! টোয়েন তখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁহার রসিকতা-ভাণ্ডারের যাবতীয় অস্ত্র ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি খুব সুসঙ্গত রসিকতা করিলেন, উগ্র রসিকতা করিলেন. সোজা রসিকতা করিলেন, বাঁকা রসিকতা করিলেন, আধুনিক রসিকতা করিলেন, পুরানো রসিকতা করিলেন, এমন কি শেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কাষ্ঠ রসিকতাও ... করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ... তেমনি অচল অটল হইয়া বসিয়া রহিল,—তা... মুখের ভাবের বিন্দু মাত্রও পরিবর্ত্তন হইল না। ... টোয়েন অবসন্ন ও পরাজিত হইয়া একটু আগেই সভা... করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমে সভার সমস্ত লোক চলিয়া গেল, ... উদ্যোক্তাগণের দু'-তিন জন রহিল। একজন টোয়েন... জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ওই বুড়ীর দিকে ফি... অত বক্তৃতা করিতেছিলেন কেন? ও বুড়ী তো ... ও বোবা, ও আপনার বক্তৃতার কি বুঝিবে?"

টোয়েন বুঝিলেন যুবক দু'টি তাঁর উপর বড় ... চালিয়া গিয়াছে; তারা রসিকের উপরই রসিকতা ক... গিয়াছে।

একটি নতুন আবিষ্কার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

পেনিসিলিনের নাম তোমরা সবাই শুনেছ। রামধনুতেই একাধিক বার তাঁর কথা তোমাদের বলেছি। আমাদের দেশের ডাক্তারেরাও আজকাল হামেশাই এই অদ্ভুত ওষুধটি ব্যবহার ক'রে থাকেন এবং আশ্চর্য্য ফলও পান। অথচ চিকিৎসা ব্যাপারে পেনিসিলিন ব্যবহারের রেওয়াজ খুব বেশী দিন হয় নি।

পেনিসিলিন্ তৈরী হয় এক রকম জীবাণু থেকে। বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন পেনিসিলিয়াম্ নটেটাম্। এই জীবাণু থেকে এক রকম রস বেরোয় যা নানা রকম বিষাক্ত রোগের জীবাণুকে ধ্বংস ... ফেলতে পারে। কাজেই ঐ রস ঐ সব রোগে... হিসাবে ব্যবহার ক'রে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যা... কিন্তু পেনিসিলিন ব্যবহারে কিছু কিছু অসুবি... আছে। তাই বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আরও গ... চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি পেনিসিলিনের মত আর একটি ... ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে যার সম্বন্ধে বিজ্ঞা... খুবই আশা-ভরসা দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন যে...

দিনও যেখানে অকেজো হয়ে গেছে সেখানে এই নতুন ওষুধ দিয়ে তাঁরা অব্যর্থ ফল পাচ্ছেন। কলেরা, টাইফয়েড, বিষাক্ত ঘা,—এমনকি যক্ষ্মা রোগেও নাকি এ ওষুধ ধন্বন্তরীর মত কাজ করেছে! তাঁরা এর নাম দিয়েছে 'ষ্টেপ্টোমাইসিন্'।

এই ওষুধ যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন আমেরিকান্,—তাঁর নাম ডাক্তার ওয়াক্স্ম্যান্। কি ক'রে এই আবিষ্কার হ'ল সে গল্প শোন।

ওয়াক্স্ম্যান্ হচ্ছেন একজন জীবাণুতত্ত্ববিদ্। কৃষি-বিজ্ঞান নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। মাটীর মধ্যে নানা রকম জীবাণু থাকে তা নিশ্চয়ই তোমরা জান। ওয়াক্স্ম্যান্ তাই নিয়েই পরীক্ষা করতেন। এখানে আগের একটা ঘটনা বলা দরকার। অনেক দিন আগের কথা, একদল বৈজ্ঞানিক রোগের বীজাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অনুমান করলেন মানুষ মরে গেলে যখন তাকে মাটীতেই কবর দেওয়া হয় তখন কবরখানার কাছা-কাছি মাটীতে নিশ্চয়ই নানা রকম বিষাক্ত রোগের বীজাণু পাওয়া যাবে। কারণ বেশীর ভাগ মৃত্যুই তো হয় দুরন্ত ব্যাধি থেকে! ঐ সব ব্যাধির বীজাণু নিশ্চয়ই মৃতদেহ থেকে মাটীতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, আর সেখান থেকেই তা আবার মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়।

গোরস্থানের মাটী পরীক্ষা ক'রে কিন্তু ঐ সব বিষাক্ত রোগের বীজাণু পাওয়া গেল না। তা হ'লে বীজাণু-গুলো গেল কোথায়? মৃতদেহের মধ্যে যে সেগুলো ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তা থেকে মাটীতেও যে সেগুলো ছড়িয়েছিল সে বিষয়েও বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ! তবে?

বিজ্ঞানীরা জানতেন, এমন কতকগুলো জীবাণু আছে যা অন্য জীবাণুদের ঘোরতর শত্রু, তাদের দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলে। নিশ্চয়ই তা হ'লে মাটীর মধ্যে এমন সব জীবাণু আছে যারা ঐ সব রোগের বীজাণুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। এরা তবে মানুষের বন্ধু! এই সব জীবাণুগুলোকে খুঁজে নিয়ে যদি তাই দিয়ে ওষুধ বানানো যায় তবে তা, নিশ্চয়ই রোগীকে ঐ সব রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। কারণ রোগ তো আর কিছুই নয়, ঐ সব বিষাক্ত বীজাণুদেরই কাণ্ড! তখন একদল লেগে গেলেন ঐ সব 'বন্ধু' জীবাণুদের খুঁজে বার করতে। ওয়াক্স্ম্যান্ও তাঁদেরই একজন।

কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। জীবাণুরা আকৃতিতে কত অসম্ভব রকম ছোট তা নিশ্চয়ই জান। খুব সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ দিয়েও সব সময়ে তাদের ধরা যায় না। আর সংখ্যায়ও তারা অগণ্য! এক কণা মাটির মধ্যে হয়তো লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভীড় ক'রে আছে। তার মধ্যে থেকে একটি জীবাণু চিনে বেছে বার করা সহজ কথা নয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজ কোন কালেই সহজ নয় তবুও দেখা যায় তাঁরা কাজ হাসিল করেন। দিনের পর দিন অসম্ভব ধৈর্য্য, অসম্ভব একাগ্রতা এবং অসম্ভব পরিশ্রমের ফলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের ওপর সদয় হ'ন।

ওয়াক্স্ম্যান্ও এইভাবে পরীক্ষা ক'রে চললেন তাঁর পরীক্ষার ধরণটা ছিল মোটামুটি এই রকম: প্রথমে তিনি একটা ছোট কাচের স্লাইডের ওপর বেশ খানিকটা রোগ-বীজাণু ছড়িয়ে দিতেন। তারপর যে মাটী নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে তার খানিকটা জলে গুলে সেই স্লাইডের ওপর ঢেলে দিতেন। তারপর সেই স্লাইড্ অণুবীক্ষণের নীচে রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন স্লাইডের কোথাও রোগের বীজাণু খানিকটা মুছে গেছে কিনা! বারে বারে এমনি ধারা পরীক্ষা চলত। তুমি-আমি, অর্থাৎ সাধারণ লোক, হ'লে হয়তো অল্প পরেই বিরক্ত হয়ে এই কাজ অসাধ্য বলে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওয়াক্স্ম্যানের ধৈর্য্যের বাঁধ এতটুকু ভাঙ্গত না। তারপর যদি দেখা গেল স্লাইডের কোন জায়গায় সত্যি সত্যি রোগ-বীজাণু কমে গেছে তখন আবার খোঁজ কোন্ জীবাণুর কীর্ত্তি এটা। শেষটা তাকে খুঁজে পেলেও নিস্তার নেই, তার ভিতরে এমন কি রাসায়নিক পদার্থ আছে যার দ্বারা এই অদ্ভুত ধ্বংসলীলা সম্ভব হচ্ছে তাও খুঁজে বার করা চাই। এত ক'রেও হয়তো শেষে দেখা গেল ঐ রস রোগ-বীজাণু ধ্বংস করছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের শরীর ধ্বংস করতেও সে সমান পটু। ওর এক ফোঁটা জীবদেহে প্রয়োগ করলে তারও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে।

অবশেষে একদিন ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলেন। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন এমন একটা জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল যা নাকি বহু রকম রোগ-বীজাণু ধ্বংস করতে একেবারে অব্যর্থ। অথচ জীব-দেহের ওপর তা প্রয়োগ করলে কোন ক্ষতি হয় না। ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও তাঁর সহকারী এই জীবাণু বেছে নিয়ে তার ভিতরকার রস সংগ্রহ করতেও কসুর করলেন না। আর তার নাম রাখলেন ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন। বলা বাহুল্য ডাক্তারী ভাষায় ঐ ভাবেই প্রায় ওষুধের নামকরণ করা হয়।

ওয়াক্‌স্‌ম্যান্ নিজে চিকিৎসক ন'ন, কাজেই এর পরের কাজগুলো করার ভার পড়ল অন্য বিজ্ঞানীদের ওপর—স্থানীয় একটি বড় ওষুধ-কারখানার গবেষণা বিভাগের ওপর। এবারে পঞ্চাশ জন ডাক্তার একসঙ্গে কোমর বেঁধে নামলেন আসরে। প্রথম পরীক্ষা হ'ল গিনিপিগের ওপর। দেখা গেল তাদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগ করার পরও তারা দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছে। ডাক্তারেরা তখন সাহস ক'রে মানুষ রোগীর ওপর পরীক্ষা সুরু করলেন।

রোগীর অভাব ছিল না। তখন যুদ্ধ চলছে। নানা রকম রোগীতে হাসপাতাল ভর্ত্তি। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সৈনিক। ডাক্তারেরা নানা রোগে নানা ভাবে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে লাগলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যেতে লাগল। পেনি-সিলিন দিয়েও যেখানে কোন কাজ হয় নি, ষ্ট্রেপ্টো-মাইসিনে সেখানে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেল।

টাইফয়েড, কলেরা, অন্ত্রের ভিতরকার ঘা, ন্যাপেণ্ডি-সাইটিস্—সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল ওষুধটি প্রায় অব্যর্থ ফল দিচ্ছে, এমন কি যক্ষ্মা রোগেও। আবার শুধু মানুষ নয় গরু-ভেড়ার ওপর প্রয়োগ ক'রেও দেখা গেল তাদের অনেক দুরারোগ্য ব্যারাম একেবারে সেরে যাচ্ছে। যেমন ধর, 'ব্যাং' রোগ। ওদেশে গরুদের মধ্যে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। একবার হ'লে সে গরুটিকে তো কোন রকমে বাঁচানো যায়ই না, তার ছোঁয়া লেগে দেখতে দেখতে সমস্ত গরুর পালে মড়ক লেগে যায়। এজন্য কোন গরুর এ রোগ হ'লে তাকে মেরে ফেলাই এতদিন ওখানকার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এই নতুন ওষুধ আবিষ্কারের পর ও রোগে আর গরু মারা পড়ছে না। হিসেব ক'রে দেখা গেছে এর ফলে আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ গরুকে বাঁচানো যাবে।

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নিয়ে গবেষণা কিন্তু এখনও শেষ হয় নি এবং ডাক্তার-মহলে এখনও জিনিষটি তা ক'রে চালুও হয় নি। পেনিসিলিনের মত প্রচুর পরিমাণে এ জিনিষটা তৈরী হ'তে হয়তো আরও কিছুদিন লাগবে কারণ এর তৈরীতে মেহনৎ প্রচুর। মাটি থেকে পেলেও জীবাণুটি মাটীর মত সহজলভ্য নয় এবং তা থেকে যা রস পাওয়া যায় তার পরিমাণও ক্ষীণ যে ওষুধটি এখনও খুবই দুর্ম্মূল্য হয়ে রয়েছে। তবে সুখের বিষয়, সেই ওষুধ-কারখানার কর্তৃপক্ষ এর জন্য এক কোটি টাকার ওপর খরচ ক'রে নতুন একটি কারখানা বসিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলছেন পেনিসিলিনের সঙ্গে এই ওষুধ মিশিয়ে তাঁরা হয়তো শীগ্‌গিরই এমন আর একটি নতুন ওষুধ তৈরী করতে পারবেন যা নাকি চিকিৎসা-জগতে সত্যি সত্যি যুগান্তর আনবে।

১ম ভদ্রলোক : আমার ছেলে জলে ডুবে গিয়েছিল, তাকে কি আপনি তুলেছেন ?

২য় ভদ্রলোক : হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? ধন্যবাদ দেবেন বুঝি ?

১ম ভদ্রলোক : আজ্ঞে না, পুলিশে দেব। ওর ট্যাঁকে তিন আনা পয়সা ছিল, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।

—শ্রীশকুন্তলা দেবী

গত মাসে যখন মহাত্মাজির অনশনের খবর বেরোল তখন, মনে আছে, চারদিন কী গভীর অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে দেশ শুদ্ধ লোক শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল —যখন তারা শুনল দেশের নেতারা গান্ধীজির সর্ত্ত মেনে নেওয়ায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত অনশন ভঙ্গ করেছেন,—মহাত্মার অমূল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তখন কি কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল মাত্র কয়েক দিন পরেই কি অবিশ্বাস্য-মর্ম্মবিদারক খবর তাদের শুনতে হবে। মহাত্মার মত পুণ্যাত্মা—যিনি আজীবন অহিংসা, ভালবাসা আর দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করে এসেছেন, —শুধু প্রচার করা নয়, নিজের নিষ্কলঙ্ক, কর্ম্মময় জীবনকেই যার উদাহরণ ক'রে সামনে ধরেছেন, যীশু, বুদ্ধ, নিমাই —এঁদের সঙ্গে লোকে যাঁর তুলনা দিয়ে এসেছে, তিনিই কিনা শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই দেশের লোকের গুলিতে নিহত হলেন! পৃথিবীতে এত বড় অবিশ্বাস্য ঘটনা বোধ হয় বহুদিন ঘটে নি!

গান্ধীজির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ যেদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বেতারে ঘোষিত হ'ল—তখন খানিক-ক্ষণের জন্য তা যেন কেউ বিশ্বাসই করতে পারে নি! এ কি হ'ল! কেমন করে হ'ল! সত্যি, এ কি হ'তে পারে!" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশাল ভারতের কোটী কোটী জনসাধারণ যেন পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করল; কত লোক মূর্চ্ছা গেল, এমন কি আঘাত সাম-লাতে না পেরে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কারো কারো মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটল! আমাদেরই চোখের সামনে দু'টি লোককে এ ভাবে মূর্চ্ছিত হ'তে দেখেছি—একজন আমা-দেরই অফিসের এক কর্ম্মচারী। জনগণের মনের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারলে এমনটা হ'তে পারে ভাবতে পার? তারপর দিল্লীতে যখন তাঁর নশ্বর দেহ রাজঘাটে চন্দনকাঠের চিতাশয্যায় তুলে দেওয়া হ'ল তখন সেই শোকাচ্ছন্ন মহানগরীর মর্ম্মস্পর্শী চেহারা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। আবার ১২ই আগষ্ট যখন তাঁর পুণ্য চিতাভস্ম ভারতের তীর্থে তীর্থে পুণ্যতোয়া নদী বা সাগরবক্ষে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় সেদিনকার সেই দৃশ্য তো বোধ হয় অনেকেই নিজের চোখে দেখেছ!

* * * * *

কিন্তু সত্যিই কি গান্ধীজির মৃত্যু হয়েছে? তাঁর মূর্খ হত্যাকারী হয়তো তাই ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর দেহ ধ্বংস করলেই কি তাঁকে ধ্বংস করা যায়? শরীরী মূর্ত্তি নিয়ে হয়তো তিনি আর নেই, কিন্তু দেশবাসীর মনের মধ্যে থেকে তাঁকে কে সরাবে? তাঁর বাণী—তাঁর আদর্শ অক্ষয় হয়ে সেখানে ছড়িয়ে আছে। কবির ভাষায় বলব—"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

* * * * *

সম্প্রতি বাংলা দেশ আরও দু'টি মূল্যবান্ রত্ন হারি-য়েছে। একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মত বড় পণ্ডিত--সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্রে, দর্শনে, বেদ-উপনিষদে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত এ যুগে খুব কমই দেখা গেছে। সারা ভারত যুড়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর স্থান কখনও পূর্ণ হবে কিনা কে জানে?

আর একজনের নামের সঙ্গে তোমরা আরও বেশী পরিচিত—তিনি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ঠিক রবীন্দ্রনাথের পরেই যে ক'জন কবি বাংলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছেন তিনি তাঁদেরই একজন। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ছোটদের জন্যও তিনি বহু কবিতা লিখে গেছেন,—তাঁর 'সিংহগড়' বা "মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই" প্রভৃতি কবিতা

পড়ে নি এমন ছেলেমেয়ে কমই আছে। সম্প্রতি ৬৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

* * * *

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার ৪র্থ ও ৫ম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ্ শেষ হয়েছে। ভারতীয় দল দু'টি খেলাতেই শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। ৪র্থটিতে অষ্ট্রেলিয়ার রান্ হয় ১ম ইনিংস্এ. ৬৭৪। ভারতের হয় ১ম ইনিংস্এ ৩৮১, ২য় ইনিংস্এ ২৭৭। পরাজিত হ'লেও ভারতীয় দলের দু'টি খেলোয়াড় এই খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফাদকারের এক ইনিংস্এ ১২৩ রান্ এবং হাজারীর দুই ইনিংস্এই শতাধিক রানের কথা বলছি। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্র্যাডম্যান্ এই খেলায় করেছেন ২০১ রান্। এটি তাঁর টেষ্ট খেলায় ৩৭তম ডবল সেঞ্চুরি, এবং পৃথিবীর টেষ্ট ইতিহাসের আর একটি রেকর্ড। এর আগে একমাত্র হ্যামণ্ডই টেষ্ট্ খেলায় ৩৬ বার ডবল সেঞ্চুরি করতে পেরেছিলেন।

৫ম টেষ্টেও ভারতীয় দলকে ইনিংস্ পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

গভীর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আজ তোমাদের সামনে রামধনু নিয়ে হাজির হ'লাম। ভারতের রাষ্ট্রপিতা, স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহাতপস্বী, অহিংসা, প্রেম ও সত্যের মূর্ত্ত প্রতীক্ মহাত্মা গান্ধী আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমরা জানি তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ যুগে যুগে ভাবী ভারতকে প্রেরণা যোগাবে। তাঁর আত্মত্যাগ বিফল হবে না।

গান্ধী কত বড় ছিলেন? ভাবতে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা-শক্তি হার মেনে যায়। ভারতের বাইরে অনেকে জানতেন তিনিই ভারতবর্ষ। আমেরিকার এক ধর্ম্মযাজক সে দিন বলেছেন, "আমেরিকায় এমন অনেক লোক আছে যারা ভারতবর্ষের নাম শোনে নি, কিন্তু গান্ধীজির নাম্ জানে।" আমাদের এক বন্ধু পোল্যাণ্ডের এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর নতুন রকম চেহারা দেখে গ্রামের লোক তো অবাক্,—কেউ বুঝতে পারে না এ কোন্ দেশের লোক। তিনি যখন জানালেন যে তিনি ভারতীয়, তখনও কেউ কেউ অবোধের মত চেয়ে রইল। শেষে তাদেরই একজন বলে উঠল, "ও, আপনি কি গান্ধী-তাগোরের দেশের লোক?" বাস্তবিক ওদেশের অনেকেই ভারতবর্ষ বলতে গান্ধী আর টেগোরকেই (রবীন্দ্রনাথ) বুঝত।

সেই রবীন্দ্রনাথ আর নেই, গান্ধীজিও চলে গেলেন আমাদের পরিচয় দেবার আর কে রইল? ভাবতে পার আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা?

গান্ধীজির মৃত্যু-সংবাদ যখন এল এ মাসের রামধনু তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে কথা এ সংখ্যায় বলা গেল না, আমরা শুধু প্রথম দিকে কয়েকটি পৃষ্ঠা বদলে তাঁর পুণ্যস্মৃতিতর্পণ করলাম। সম্বন্ধে রামধনুতে পরে আরও আলোচনা করব।

এ সংখ্যা রামধনু বেরোতে কয়েক দিন দেরী হ'ল। কারণ একটি নয়, কয়েকটি। প্রথম—ছাপাখানায় ...াট, দ্বিতীয়—রামধনু যে কাগজে ছাপা হয় হঠাৎ ...র থেকে তা উধাও হয়ে যাওয়া (সাদা বাজার,— ...লো বাজারের খবর জানি না)। ৩য়—এবং প্রধান ...রণ মহাত্মাজির তিরোভাব। যাই হোক, এ ত্রুটী ...গিরই কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে আশা করি। শ্রীযুক্ত ...রেন্দ্রলাল ধর মশাইও শেষোক্ত কারণে তাঁর "হে বীর, ...াম করি" উপন্যাসটি লিখে উঠতে পারেন নি। আগামী ...রে আবার তা বেরোবে।

রামধনুতে আমরা অনেক কিছুই দিতে চাই কিন্তু ...নাভাবের জন্য কুলিয়ে উঠতে পারি না। তা ছাড়া ...রামধনুর যে মূল্য তাতে ছবি বা অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তোলা কষ্টকর। অনেক দিন থেকেই আমরা গ্রাহকদের কাছ থেকে রাশি রাশি চিঠি পাচ্ছি—রামধনুকে আর একটু বাড়িয়ে, আর একটু সাজিয়ে ছোটদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করা সম্ভব কিনা। এ জন্য আরও বেশী দাম দিতে যে তাঁদের কোন আপত্তি নেই এ কথাও তাঁরা বারে বারে জানিয়েছেন। কারণ সমস্ত শিশু-মাসিকের মধ্যে সম্ভবতঃ রামধনুর দামই এখন সব চেয়ে কম। আমরা আগামী বৈশাখ থেকে এ পরামর্শ মেনে নেওয়াই ঠিক করলাম। এ জন্য রামধনুর দাম একটু বাড়াতে হবে, কিন্তু আমরা জানি তাতে তোমরা কেউই আপত্তি করবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হ'ল। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

জয় হিন্দ্। ইতি—রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১৮৮১

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—কল্যাণ সেনগুপ্ত (কলিকাতা); ...র্ম্মিলা সরকার (কলিকাতা); চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা); গৌরাংগ-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); রাধাবিনোদ সুরাল (শিলদা); শিশিরকুমার নাগ (কলিকাতা); হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (চক্রধরপুর); সুব্রত সনাতনি (কাশী); জয়ন্ত ...র্ণা, করুণা প্রভৃতি (গোবরডাঙ্গা); অমলকুমার মিত্র (গৌহাটী); দীপ্তি ও দীপালি সেনগুপ্তা (গোহাটী), সিপ্রা, গৌতম, বৌদি প্রভৃতি (করিমগঞ্জ); অমল মিত্র (কলিকাতা); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); অপূর্ব্ব, সেবাদি', ছবি প্রভৃতি (করিমগঞ্জ); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); সুব্রত ত্রিপাঠী (দেভোগ); নবেন্দু সেন (কলিকাতা); স্বপন, তপন, ভেলু-টুনু (কাশীপুর--নৈনিতাল); নমিতা বসু (ভবানীপুর); জয়ন্তকুমার দত্ত (শিলং); উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া)।

নূতন ধাঁধা

...চের খালি জায়গাগুলো এক-একটি খাবারের নাম দিয়ে ভর্ত্তি করতে হবে। চেষ্টা কর তো ঃ—

—তাড়া থেকে তো যা—পুর, ক—ক্ষ্মী যেতে হবে জা— তো? এদিকে এ— —রা ক' দিক্ সামলাই?— ...পুর থেকে বৌদিকে —গোল্লার জন্য ব—বাগানে যাওয়া,— , কখন্ — থেকে আসছেন, তাঁকে — ব্যবস্থা করা, এ সব —রে?

আরে —মাসা দেখ, এই ভ—গলে কি ওটা? ব—বি করিস নি তো?

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

আগামী চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর ২০শ বর্ষ শেষ হবে, ১৩৫৫ সালের বৈশাখ থেকে সুরু হবে তার ২১শ বছর। যুদ্ধ বাধবার পর থেকেই নানা ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর দিয়ে রামধনুকে আসতে হয়েছে, এবং যুদ্ধ শেষ হ'লেও অসুবিধা শেষ হয় নি। ফলে রামধনুকে ছোটদের মনের মত ক'রে গড়ে তুলবার আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও আমরা লক্ষ্যে পৌছুতে পারি নি। কিন্তু তা সত্বেও রামধনু তার অজস্র ছোট্ট বন্ধুদের স্নেহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। তার গ্রাহক-সংখ্যাও ক্রমাগতই বাড়ছে!

কিছু দিন থেকে আমরা গ্রাহকদের কাছ থেকে এই মর্ম্মে রাশি রাশি চিঠি পাচ্ছি—রামধনুর আকার আবার আগের মত বাড়িয়ে, আরও ছবি দিয়ে, বড় অক্ষর দিয়ে, সাজিয়ে—এক কথায় নতুন ছাঁচে ঢেলে বার করা যায় কিনা। এজন্য রামধনুর দাম বাড়াতেও তাঁরা অনুরোধ করেছেন। কারণ রামধনুর এখনকার দামে (যা নাকি সমসাময়িক সমস্ত শিশুমাসিকের তুলনায় সব চেয়ে কম) যে এই পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমরা এই পরামর্শ গ্রহণ করাই ঠিক করলাম। আগামী বৈশাখ থেকে রামধনুকে আমরা আরও বাড়িয়ে, নতুন ছাঁচে ঢেলে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করছি। রামধনুতে বহু বিভাগের পরিকল্পনা করা আছে কিন্তু স্থানাভাবে তার অনেকগুলিই নিয়মিত দেওয়া যাচ্ছে না। কাগজ বড় হ'লে আশা করি সে অসুবিধা আর হবে না। আগামী বছরের রামধনুতে যাতে প্রথম শ্রেণীর সমস্ত শিশুসাহিত্যিকদের লেখা বার হয় এবং সমস্ত লেখা প্রথম শ্রেণীর হয় সে বিষয়ে আমরা এখন থেকেই চেষ্টা করছি। রূপসজ্জাও উন্নততর করার ব্যবস্থা করছি।

এজন্য আগামী বৈশাখ, ১৩৫৫ থেকে রামধনুর দাম সামান্য বাড়ান হ'ল। ঐ বছর থেকে রামধনুর বার্ষিক চাঁদা করা হ'ল ৪৲, ষান্মাসিক ২।০ এবং প্রতি সংখ্যা ।৵০।

আর একটা কথা, পাকিস্থানে রামধনুর অসংখ্য গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পাকিস্থানে ভি. পি. তে পত্রিকা পাঠালে তা পেতে এবং সে টাকা আসতে বহুদিন—সময় সময় বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। এজ পাকিস্থানের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অনুরোধ করা হ তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের আগামী বছরের বার্ষি বা ষান্মাসিক চাঁদা (৪৲ বা ২।০) মনি অর্ডার ক' পাঠিয়ে দেন। অবশ্য ওখান থেকে মনি অর্ডার আসতে কম সময় লাগে না, তবে এখনই পাঠালে আশা ক বৈশাখ সংখ্যা বেরোবার আগেই তা আমাদের হস্তগ হবে—ফলে বৈশাখের রামধনু পেতে তাঁদের আর দে হবে না। ভি. পি. র জন্য বসে থাকলে তাঁদের হয়ত মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে। এজন্য এবা থেকে আমরা আর পাকিস্থানে কোন ভি. পি পাঠাব না।

ভারত রাষ্ট্রের গ্রাহকরাও অনুগ্রহ ক'রে ২০শে চৈত্রে মধ্যে তাঁদের আগামী বছরের বার্ষিক বা ষান্মাসি চাঁদা (৪৲ বা ২।০) মনি অর্ডারে পাঠিয়ে দেবেন, কা এখানে ভি. পি. অত দেরীতে না পৌছলেও মনি অর্ডারের তুলনায় অনেক দেরী হয়, ফলে বৈশাখ সংখ্যা পেতে তাঁদেরও অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে। খরচের দিক্ থেকেও ওতে বেশী পড়ে,—ভি. পি. তে পত্রিকা নিলে অতিরিক্ত ।৵০ ভি. পি. মাশুল দিতে হয়। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে আমাদের কার্য্যালয়ে বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) টাকা জমা দিতে পারেন।

আমরা আশা করি এ বছর যাঁরা গ্রাহক আছেন তাঁরা সকলেই আগামী বছরেও গ্রাহক থাকবেন। কোনও বিশেষ কারণে কারও গ্রাহক থাকতে আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ ক'রে ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের জানাবেন। ঐ তারিখের মধ্যে চাঁদা বা চিঠি না পেলে ভারত রাষ্ট্রের গ্রাহকদের কাছে আমরা বৈশাখের রামধনু ভি. পি. তে পাঠাব। আশা করি সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে সহৃদয় গ্রাহকেরা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু, কলিকাতা ২৫
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবা

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—।৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম্ দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

প্রহেলিকা সিরিজ

—য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু উপন্যাস—
প্রত্যেকখানি—এক টাকা

—সব্যসাচী বিরচিত—
১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাডহাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষবলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস

তাপসরঞ্জন সরকার
১১। দরদী বন্ধু

আবুল কালাম সামসুদ্দিন
১২। রাতের অতিথি

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৩। মিঃ গশ্ ডিটেক্‌টিভ

বুদ্ধদেব বসু
১৪। কাল বৈশাখী ঝড়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১৫। দেশের ডাক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৬। রাত যখন সাতটা

প্রভাতকিরণ বসু
১৭। ঝড়ের প্রদীপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯। স্বপ্ন হলেও সত্যি

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
২১। গ্রহের ফের
২২। রত্নতৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল্, এ,—২০৫
২৬। জয় পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কি চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত

দেব সাহিত্য-কুটীর ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট · কলিকাতা
ফোন:- কলিঃ - ১৬০৬

ন বর্ষ চৈত্র, ১৩৫৪ দ্বাদশ সংখ্যা

রামধনু

ছোটদের
সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

বার্ষিক ৩৲ কার্য্যালয় প্রতি সংখ্যা ।৴০
ষাণ্মাসিক ১॥৵০ ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ফোন : সাউথ ১২-

Regd. No. C —1641

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক চালনা হয় খুব বেশী, তারপর এই হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, কাজেই এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের। দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ঘৃত সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লখমীদাস প্রেমজী
৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন:- কলিঃ - ১৬০৬

১০ম বর্ষ চৈত্র, ১৩৫৪ দ্বাদশ সংখ্যা

রামধনু

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

প্রতি সংখ্যা ।৵০
ভবানীপুর, কলিকাতা

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ (ছোটদের উপন্যাস) ... ১।৹
সোনার হরিণ (ঐ) ... ১।৹
চায়ের ধোঁয়া (গল্প) ... ৸৹
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ... ৸৶৹
নূতন পুরাণ (ঐ) ... ৸৶৹

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং (গল্প) ... ৸৹

শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত

দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স ॥৶৹

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু (গল্প) ... ৸৶৹

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১।৹

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আকাশের গল্প (বিজ্ঞান) ... ১।৹
বিজ্ঞান-বুড়ো (ঐ) ... ১৲
আবিষ্কারের গল্প ... ৸৹
ধূমকেতু (বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ... ৸৹

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸৹

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৶৹

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ... ৸৹
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম ... ৸৹
ঐ ২য় ... ৸৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

[নূ]তন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট [খে]লা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র বিশ্লেষণ অভিনব। [সু]শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১।৹ টাকা।

বালক কেশব

[ম]হাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-[কু]মারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ॥৶৹ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনোপন্যাস। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে পড়িতে বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কিশোরীদের হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া যায়।

—আনন্দবাজার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ। **কৈশোরক** বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সুসাহিত্যিক দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্বপ্নলেখা' ও বিশ্বগুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খানা উপন্যাস চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

বুক কাঁপান ডিটেকটিভ সিরিজ—প্রতিখানির দাম ১।০

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল
প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর

মুখস যখন খুলে গেল
তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাঠের ড্রাগন
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

হত্যা যাদের নেশা
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র

সীমান্তের বন্ধু (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার গল্প)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গদ্যের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ।৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ, রাখিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

ফাল্গুন মাসে—

১ম বর্ষ—১ম সংখ্যা বাহির হইল।—

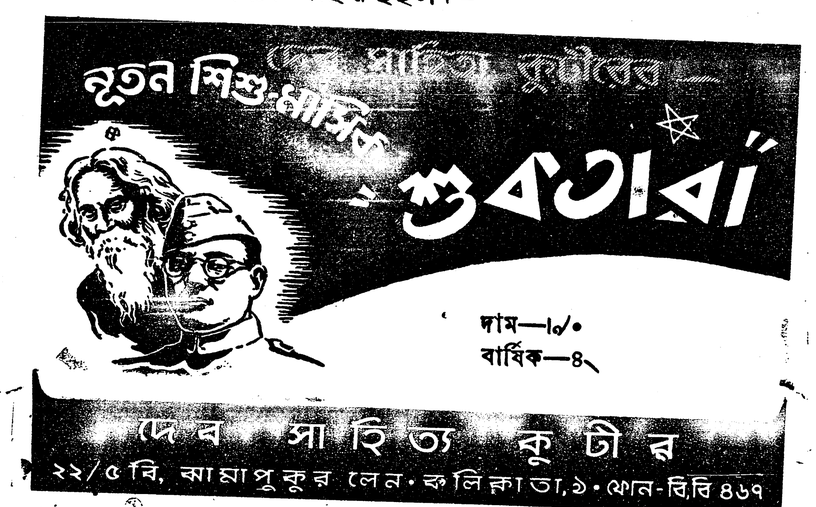

রামধনু—

শিবাজী মহারাজ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২০শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৫৪ | ১২শ সংখ্যা

নেমে আয়

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পূব গগনের নীল মায়াটী,
নেমে আয়!
দু'টী কালো কোমল চোখে
মায়ের মুখে দেখ্‌ছে ও কে?
ওই চাওয়াতে সকল চাওয়া
থেমে যায়।
নীল ও চোখে—নীল মায়াটী
নেমে আয়!

বাদল দিনের কোমল মধু
শ্যামলী,
বকুল-বনের গন্ধ সাথে
কদম-কলি নিয়ে হাতে,
আয় গো আকুল হিয়াখানি
উজলি'!
কোমল স্নেহে কচি ও বুক
উছলি'।

নিখিল ধরার রূপের ধারা
ছানিয়া,
নীল সাগরের ওপার থেকে
নীল কমলের পরশ মেখে
নীল পরীটী, নীল মায়া দাও
আনিয়া।
স্বপন-দেশের গোপন সুধা
ছানিয়া।

গল্প বলার বিপদ্

(গল্প)

শ্রীশামুক

উদ্দেশ্য-বিহীন ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। সময় সময় এ আমার একটা রোগ, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে। এমন এমন যায়গায় গেছি ও এমন সব লোকের সংগে থেকেছি যে সহরের সভ্য লোকেরা শুনে বলে,—আর রাম রাম, এত কষ্ট মানুষে করে মাত্র সখের জন্যে! কিন্তু যে সমস্ত সুন্দর স্থান দেখেছি এবং সব মিলিয়ে যা আনন্দ পেয়েছি তার তুলনায় কষ্ট আঁর কতটুকু?—কিছুই নয়।

একবার গঙ্গার কিনারা ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সেটা শীতকাল। নিজের সম্বল যা কিছু পিঠে বেঁধে সমস্ত দিনটা কাটতো গঙ্গার চরে, আর রাত্রিটা যে কোন রকমের আবাসস্থলে।

একদিন দিনের শেষে একটি ছোট গ্রামের প্রান্তে গিয়ে পৌছালাম। চাষীর কুঁড়ে, নদী থেকে একটু দূরে। খান তিনেক চালা-ঘর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে, আর নিমগাছের পায়ের তলায় তকতক করছে এতটুকু উঠান। আশ্রয় চাইতেই পাওয়া গেল।

পিঠের বোঁচকা নামিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আঙিনায় আরাম করে বসা গেল। দেখি, গৃহস্থের বাড়িতে চাষী-বৌ আর দু'টি মেয়ে। ছোট মেয়েটির বয়স সাত-আট হবে, নাম মালতী।

সন্ধ্যায় প্রদীপ দিয়েই খাওয়া গেল সকলে মিলে গরম গরম ভাত আর শাক দিয়ে পুঁটি মাছের টক। আহা, ক্ষিদের মুখে একেবারে ঠিক অমৃত।

ধীরে ধীরে প্রতিবাসীরা কয়েকজন এসে জমা হয়। বড় ঘরে আগুনের চারপাশে বসে সকলে কথায় মেতে ওঠে। বড় মেয়েটি এঘর ওঘর করে রাত্রের কাজগুলি সেরে নিতে থাকে চটপট।

আমি একটি কোণে কম্বল বিছিয়ে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। দেখি মালতী একটু দূরে চুপ করে বসে একলা। কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুমি সারা দিন কর কি?

—নদীর চরে গরু চরাই।

—গরুরা তো ঘুরে বেড়ায়, ঘাস খায়, কিন্তু তুমি কি কর?

—ভুলির সঙ্গে খেলা করি।

—ও, ভুলি বুঝি তোমার সমবয়সী মেয়ে, বন্ধু?

—না, আমার সমান সমান মেয়ে কেউ নেই কাছাকাছি।

—তবে, তবে ভুলি কে?

—পুতুল।

ভুলিকে দেখতে চাই। রাজী হয় না কিছুতেই। ভাবে আমার হয়তো পছন্দ হবে না। অনেক করে বলতে তবে নিয়ে আসে পাশের ঘর থেকে।

সে তোমাদের সহুরে ফিটফাট পুতুলই নয়। একটা ঝাঁকাচোরা কাঠের টুকরো, অপটু হাতে চোখ, কাণ খুদে দেওয়া হয়েছে। এতটুকু গামছা ছেঁড়া জড়িয়ে পরানো। এই ওর নিত্যকার সঙ্গী। এরই সঙ্গে মনের কথা বলে খেলা করে দিন ওর কেটে যায়।

বড় মায়া লাগে মেয়েটির ওপর। ওকে খুসি করবার জন্যে বলি—একটা গল্প শুনবে তুমি?

অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গল্প শোনে নি কোন দিন, গল্প কি জিনিষ জানে না। বেচারী! সহুরে ছেলেমেয়েদের সংগে কত তফাৎ! রঙচঙে বাঁধানো ছবিওয়ালা সুন্দর গল্পের বই তো দূরের কথা, সামান্য মুখের গল্পও শুনতে পায় নি এতদিন! ওর দুঃখ আমার মনে লেগে মনকে বড় ভারী করে দেয়। যা মনে আসে বানিয়ে বানিয়ে বলতে সুরু করে দি।

শোন মালতী, তোমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে গঙ্গা নদীর ধারেই অনেক দিন আগে একটি মেয়ে থাকতো—তোমার মতন দেখতে ঠিক, তোমারই মতন বড়। নাম তার কুমী। তার সঙ্গে থাকতো এক থুড়থুড়ে বুড়ি ঠাকুমা আর ছ' ছ'জন কাকা। কাকারা সকলে ভারি লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষ, এয়া বড় বড় দাড়িগোঁফ।

কাকারা চাষ আবাদ করতো আর বুড়ি ঠাকু'মা খুট খুট করে ঘর-সংসারের কাজ করতো সারাদিন। কুমীর সঙ্গে কথা বলবার কেউ ছিল না, তার খেলবার সঙ্গী ছিল না কেউ। ঘরের বাইরে যখন সে যেত শুনতে পেত কাক ডাকছে, কুকুর ডাকছে, গরুরা হাম্বা হাম্বা করছে, তার মাথার ওপর গাছের পাতা কত রকমের শব্দ করছে, কিন্তু সে এই সবের একটি কথাও বুঝতে পারে না।

শেষে একদিন মনের দুঃখ আর সহ্য করতে না পেরে কুমী পথের ধারে বসে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। ওঃ, সে কি কান্না! চোখের জলে তিন-চারটে নদী তৈরী হয়ে গেল।

এক কাঠকুড়ানী বুড়ি কাঠ কুড়াতে কুড়াতে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। মাথার বোঝা নামিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁ গা মেয়ে, কাঁদছিস কেন?

—আমার কথা কইবার বা খেলবার সঙ্গী নেই কেউ।

বুড়ি তখন কোঁচড় থেকে না এক বেল-কাঁটা বার করে কুমীর কান দুটো বিঁধিয়ে দেয় পুট পুট। বলে,—এইবার তুমি পশুপাখী, গাছপালা সকলের কথা শুনতে পাবে, বুঝতেও পারবে। যাও, ওদের সঙ্গে খেল গে।

কুমী ভারি খুশি। নাচতে নাচতে বাড়ি এসে পৌছায়। বলে,—এস মেনী, দু'জনে একটু খেলা করি।

বিড়াল বলে,—এখন তো আমার মরবার ফুরসৎ নেই। রান্নাঘরে মাছ ভাজা হচ্ছে, নজর রাখতে হবে। তুমি বরং নদীর ধারে চুর্ণীর সাথে খেল গে।

—চুর্ণী কে?

—সে এক ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। ভোরের কুয়াশায় চড়ে নদীর চরে রোজ খেলতে আসে।

মেনী তার ল্যাজ ফুলিয়ে গতর দুলিয়ে পা টিপে টিপে চলে গেল।

কুকুরেরাও খেলতে চায় না। বলে,—ছেলে মানুষের মত খেলা করে সময় নষ্ট করে হবে কি? অপরিচিত লোকজন বাড়ির সামনে এলে গান গেয়ে অভ্যর্থনা করবে কারা? তুমি যাও. নদীর ধারে চুর্ণীর সঙ্গে খেল গে।

কুমী বাইরে বেরিয়ে দেখে একটি ছোট হাঁসের বাচ্চা প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নেয়। আহা, কি নরম তুলতুলে, যেন হলদে পশমের গোলা! বলে,—বাচ্চু, আমরা, চল, দু'জনে খেলি।

হাঁসের বাচ্চা কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে আঁকুপাঁকু করে, কান্নার সুরে চেঁচিয়ে ওঠে,—ও মা, মাগো, দেখ না কুমী কি করছে!

হাঁস-গিন্নি হাঁফাতে হাফাতে দৌড়ে এসে বলে,—বলি বাছা, হচ্ছে কি? আমার খোকাকে টিপেটুপে একশা

করে দিলে যে! বড় মজা দেখছি, ভাবছি এর পর কি করবে! খেলতে হয় যাও না চূর্ণীর কাছে।

কুমী বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়। রাগ করে বলে,—আচ্ছা, তাই যাবো, চূর্ণীর সঙ্গেই গিয়ে খেলবো।

পরের দিন খুব ভোরে কুমী নদীর ধারে গিয়ে হাজির। শ্যাওলা পড়া পাড়টিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঝরা বরফের মত কুয়াশা ঝুর ঝুর করে তার চারপাশে ঝরে পড়তে থাকে। তারপর দেখে একটি সুন্দর ছোট্ট মেয়ে আকাশ থেকে কুয়াশার সঙ্গে নেমে আসছে।

মেয়েটি মাটিতে নেমে কুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কি সুন্দর, কত ফুটফুটে মেয়েটি! এক সাদা ধবধবে ঢেউ-খেলানো জামা পরা,—দুধের চেয়েও সাদা সে জামা। আর তার চারিদিকে লাল টকটকে ফুল-তোলা ছোট ছোট তারার মতন চিকচিক করছে। মেয়েটির পায়ে হরিণের চামড়ার নক্সা করা জুতো, আর মাথায় ফোলানো, কোঁকড়ানো চুলের ওপর মুকুটের মতন এক টিয়াপাখীর পালকের টুপি। গলায় আবার এক ছড়া চোখের জলের মতন ছোট ছোট মতির মালা। কুমী বলে,—ওগো সুন্দর মেয়ে, তোমার নামটি কি?

—চূর্ণী।

—আমার সঙ্গে খেলবে ভাই?

—কি করে খেলি? আমার মতন পোষাক না পরলে যে আমি কারুর সঙ্গে খেলতে পারি না।

সূর্যের তাপ বেড়ে যায়। কুয়াশা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকে। চূর্ণীও কুয়াশার সঙ্গে উঠতে উঠতে হাওয়ায় মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুমী সেখানে আছড়ে পড়ে ভীষণ কান্না সুরু করে দেয়।

দু'টি গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কুমীর কান্না দেখছিল। তারা কথা বলে।

—আহা, মেয়েটা বড্ড কাঁদছে।

—তা ও শেয়াল মাসীর কাছে যাচ্ছে না কেন? ঐ তো সামনের ছোট পাহাড়টির তলায় গর্তের মধ্যে থাকে সে।

—ঠিক বলেছ। মাসীর নিজের হাতে তৈরী হাল ফ্যাসানের সব রকম পোষাকপরিচ্ছদ মজুত থাকে সব সময়ে। গিয়ে চাইলেই পারে।

কুমী কান্না থামিয়ে শোনে সব কথা। মনে পড়ে হ্যাঁ, শিয়াল মাসীকে দেখেছে অনেক বার। কত বার দেখেছে মাসী রোদ পোহাচ্ছে আর কাচ্চাবাচ্চারা চারিদিকে ঘিরে দাপাদাপি করছে। সে দৌড়ালো তক্ষুণি গর্তের সামনে গিয়ে ডাকে,—মাসী, ও মাসী!

মাসী ক্ষেপে আগুন। চেঁচিয়ে বলে,—যাও বাছা, জ্বালিও না। চূর্ণীর সঙ্গে খেলা কর গে। আমি এখন হেঁসেলে রান্নাবান্না নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, কথা বলার সময় নেই একদম।

কাঁদো কাঁদো কুমী বলে,—মাসী, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, চূর্ণীর মতন পোষাক না পরলে সে খেলতে পারে না। দয়া করে আমায় তার মতন ভাল জামা দাও, হরিণের চামড়ার জুতো দাও, টিয়াপাখীর পালকের টুপি দাও, আর চোখের জলের মুক্তোর মালা দাও।

একটু পরে শিয়াল-গিন্নি গজ্ গজ্ করতে করতে গর্ত থেকে ওপরে উঠে আসে। হাত লাল রুমালে বাঁধা ছোট পুঁটুলী। বলে,—এই নাও বাপু, সমস্ত আছে এতে, তোমার মাপে মাপ। আর দেখ, এ সময়টা এস না কোন দিন। ভারি ব্যস্ত থাকি আমি। এই দেখ না, তোমার মেসোর জন্যে চারটি হরিণের মাংস রাঁধছি। মন্তর নেবার পর থেকে উনি আর পিঁয়াজ খান না কিনা। কতকগুলো পাঁঠার মাংসের চপ্ও বানালাম। আর হ'ল ডিমের কালিয়া—হাঁসের ডিমের, মুরগীর ডিম আমি ছুঁই না বাপু! তা যাক, তোমার ঠাকুর্মা আছেন কেমন?

—ভালই আছেন তবে মাঝে মাঝে মাথার বড্ড যন্ত্রণা হয়।

—আহা বেচারী! মানকচু পাতার উল্টো দিক্ গরম করে দু' রগে দিতে বোলো। আর রোজ এক গেলাস করে কাঁইবীচির সরবৎ। একদিন দেখতে যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যা মুখপোড়া সব কুকুর, দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে মরে। আচ্ছা যাও এখন, আবার যখন এদিকে আসবে আমার রুমালটা ফিরিয়ে দিয়ে যেও। দাঁতে যন্ত্রণা হ'লে ওটা দিয়ে আমি চোয়াল বেঁধে রাখি।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে কুমী সেই পোষাক পরে নিল। ধবধবে সাদা জামায় টকটকে লাল ফুল। ছোট

খুটখুটে জুতো। সবুজ ঝকঝকে টুপি। আর চোখের জলের মতন মুক্তোর মালা। নদীর ধারে দৌড়ে গিয়ে পৌছায়।

ঝির ঝির করে কুয়াশা নামতে থাকে। তারপর এল—ঐ এল তার বন্ধু, তার খেলার সাথী ফুটফুটে সেই সুন্দর মেয়ে চূর্ণী।

চূর্ণী তার ঢেউ-খেলানো চুল দুলিয়ে নেমে এসেই কুমীকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে দু'টি চুক চুক করে চুমু খায়। তারপর হাত ধরে খেলতে সুরু করে।

এইখানে মুখে মুখে বানানো আমার বিরাট গল্প শেষ করলাম। মালতী চোখ বড় বড় করে আমার দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখ দু'টি আনন্দে চক চক করে। বেচারী এর আগে এমন অসম্ভব অদ্ভুত গল্প শোনে নি কোন দিন। ঠিক ওর মনের মতন হয়েছে বটে। ও বড় একলা কিনা, খেলার সঙ্গী-সাথী নেই কেউ। বেশ গর্ব্ব হয় মনে যে আমিও প্রায় এক মস্ত গল্পলেখক হয়ে গেলাম আর-কি!

বড় বোন কাজ সেরে দূরে বসে বড়দের আলোচনা শুনছিল। এবার আমাদের কথা শেষ হয়েছে দেখে মালতীকে ডেকে নিয়ে যায় ঘুমাতে। চাষীদের কথা-বার্ত্তা সে রাতের মতন শেষ হবে বলে মনে হ'ল না। আমিও নিজের কম্বলের ওপর কুঁকড় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে গেল। চারিদিকে রোদ্দুর তখন খাঁ খাঁ করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে এসে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। চাষী-বৌ চুপ করে বসে কাঁদছে; সংসারের কাজ বা রান্নার জোগাড় কিছুই হয় নি! জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে মালতী কখন খুব ভোরে উঠে কোথায় চলে গেছে, গরুদের নিয়ে যায় নি চরাতে।

কর্ত্তা মাঠে গেছে চাষ করতে সুতরাং বড় মেয়ে ছোট বোনটির খোঁজে বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। চাষীবৌ-এর বিশ্বাস কোন ভূতটুত ছোট মেয়েটিকে ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে গলা টিপে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে।

বোঝাতে গিয়ে কোন ফল হ'ল না। মনটি ভারি বিগড়ে যায় আমার। কি করি, আমিও বাড়ি ছেড়ে নদীর দিকে চললাম। খানিকটা গিয়ে দেখি বড় বোন ফিরে আসছে একলা, মালতীকে দেখতে পায় নি। তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি একলাই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা হাঁটবার পর কি মনে হ'ল, ছোট পাহাড়টির দিকে পা বাড়ালাম। বড় বড় সাজানো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে একটা মানুষ দেখা যায় না। ঐ—ঐ তো মালতী হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে—একেবারে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলে যে সে নাকি অন্ধকার থাকতে, উঠে এসেছে নদীর ধারে। কুয়াশা ছিল ভারি কিন্তু চূর্ণীর দেখা কিছুতেই পেল না। তারপর এই কতক্ষণ হয়ে গেল শিয়াল মাসীকে ডাকছে সেই সুন্দর পোষাকের জন্যে, কিন্তু শিয়াল মাসীর সাড়াশব্দ নেই, রান্নার ছ্যাঁক ছ্যোঁক আওয়াজও নেই এতটুকু!

আমার মাথার ভেতর সমস্ত পৃথিবীটা যেন লাট্টুর মতন পাক খেয়ে নেয় কয়েক বার। এ করেছি কি আমি! কিন্তু এইখানেই আমার বিপদের শেষ নয়। বলছি সে কথা।

অনেক ভুলিয়ে আদর করে মালতীকে রাজী করলাম বাড়ি ফিরতে।

দু'জনে প্রায় যুদ্ধের ভগ্নদূতের মতন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি কাছাকাছি এসে পৌছেছি, দেখি, বড় বোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছে। তার হাতে ঝোলানো আমার যথা সম্বল পিঠের বোঁচকাটি। দূর থেকে দেখতে পেয়েই একটা শব্দ করে ইশারায় থামতে বলে দেয়। সেই ব্যস্ত ইশারার মানে হচ্ছে—খবরদার, আর এক পা এগিয়েছ তো গেছ। কাছে এসে আমায় বলে—এই নাও তোমার জিনিসপত্র, এখন খুব তাড়াতাড়ি সরে পড় এখান থেকে। বাবা মেয়ে হারানোর খবর পেয়ে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এসেছে। আরো এসে জুটেছে অনেকে। কাল রাত্রে যারা আমাদের ঘরে বসেছিল তাদের একজন নাকি তোমার গল্প কিছু কিছু শুনেছিল। সে বলছে যে তোমার ঐ মন-ভুলানো যাদুওয়ালা কাহিনী সত্যি হয়ে মালতীর স্বপ্নে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে

বিনাশ করবার জন্যে। দল-বল এখুনি তৈরী হয়ে এদিকে আসছে মেয়ের খোঁজে এবং তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে ভাল রকম।

প্রথমটা হেসে উড়িয়ে দিলেও বড় মেয়ের সমস্ত কথা শুনে ও বলার ভংগী থেকে এটা আন্দাজ করতে পারলাম যে এরা গ্রামের মানুষ, সহুরে লোকেদের মতন ধীরে-সুস্থে তর্কাতর্কি, আলাপ-আলোচনা করতে পটু নয়। হয়তো প্রথমেই দু'-চার ঘা নির্ঘাত তাগ লাগিয়ে তার পরে মুখ খুলবে। সুতরাং? সুতরাং আর কি, বাকি দিনটি বেশ দ্রুতপদেই পরিভ্রমণ করলাম এবং সে রাত্রের আশ্রয়ে ঘুম ভাল রকম হ'ল না।

এর পর থেকে গল্প আমি আর বলি না। ধ্যেৎ, ছোট ছেলেমেয়েদের আবার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে কিছু? ফস্ করে একটা করে ফেললেই হ'ল, তখন আমার প্রাণটুকু নিয়ে টানাটানি। *

* এক ভবঘুরের জীবনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সকলের কাছে আগে

অরূপ

বিকেলে দাদুকে নিয়ে চার বন্ধু গিরিশ পার্কে বেড়াতে গেছে। একটু নির্জ্জন দেখে এক কোণে গিয়ে সবাই বসেছে। কচি কচি দুর্বো ঘাসে কি সুন্দর হয়েছে জায়গাটা! লড়াইএর আগে জাপানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা সমাজের কত উপকারে লাগে, সে সব গল্প বলছিলেন দাদু।

গল্পের সংগে চারটি বাদাম ভাজা বা দু'-চারটে কমলা লেবু যোগ হ'লে কেমন হয় বল তো? বন্ধুরা সবাই বুদ্ধিমান্। প্রত্যেকেই দু'-চারটে পয়সা দিয়ে খাবার কিনলে ও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সবাই কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি করে খেতে লাগল।

প্রণতি বললে, এ সব শুনলে কত আনন্দ হয়। মনে হয় একবার জাপান দেশটা ঘুরে আসি। কিন্তু নিজের দেশের কথা ভাবলে তেমনি দুঃখও হয়।

সিপ্রা বললে, আমার কিন্তু দুঃখ হয় না মোটেই। আমাদের দেশ খারাপ আছে বলেই তো কাজের দরকার, কাজ করবার লোকেরও দরকার। এজন্যেই তো আমরা সুযোগ পাব।

সুনন্দা বললে, ঠিক বলেছিস ভাই। ভারত পরাধীন না হ'লে আমরা মহাত্মাজী, জওহরলাল, নেতাজী—এদের কাউকেই পেতুম না।

রেবা প্রতিবাদ করে বললে, তোরা তো খুব স্বার্থপর রে! তোরা এই কথাই বলতে চাইছিস যে ভারত যদি আরো অনেক দিন অবনত হয়ে থাকে তা হ'লে তোরা বৃহৎ হবার সুযোগ পাবি!

দাদু হেসে উঠলেন।

একটু পরেই সবাই ফিরে চলল। কিন্তু দাদু করলেন কি, বাদামের ফেলে-দেওয়া ঠোঙাটি কুড়িয়ে তার মধ্যে বাদামের খোলা, কমলার খোসা সব কুড়োতে লাগলেন।

দাদুর কাণ্ড দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। প্রণতি এগিয়ে গিয়ে দাদুর হাত থেকে ঠোঙাটা দিলে ফেলে। বললে, ছি দাদু, এ কি করছ? এগুলো কুড়োচ্ছ কেন?

সুনন্দা বললে, মেথরের অন্ন মারবার মতলব করছ নাকি?

সিপ্রা বললে, দাদুর আবার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি আছে!

রেবা বললে, নাবে, দাদু যখন ওটা ধরেছে তখন কিছু আছেই নিশ্চয়! শোন।

দাদু বললেন, না শুনেও বোঝা উচিত ছিল। আচ্ছা, আর ও কথা। বল তো আজকের বিকেলটা কেমন কাটল তোমাদের?

—বেশ কাটল বই কি! খুব আনন্দ পেলুম। এ রকম খোলা জায়গায় এ রকম কচি কচি নরম ঘাসের উপর বসে গল্প করতে কি ভালই না লাগে! একজন বললে।

রেবা এক মনে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছিল। এ কথায় সে লাফিয়ে উঠে একটা তালি দিয়ে বললে, ও বুঝেছি আমি। দাদু, তুমি বলো না, আমি বলব, আমি বলব। আগে সবাই বাদামের খোলা, কমলার খোসা ও ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে আমার হাতে দে দেখি, তারপর বলছি।

কুড়োতে বেশী সময় লাগল না। দাদুও তাতে হাসি-মুখে যোগ দিলেন। সবাই মিলে কাজ করতে কি মজা বল দেখি, তা সে কাজটা অতি সামান্যই হোক বা মস্ত বড়ই হোক, কষ্টেরই হোক অথবা সুখেরই হোক।

আবর্জনা ভরতি ঠোঙাটি হাতে নিয়ে রেবা এগিয়ে চলল বলতে বলতে, এই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার ছিল বলেই তো আমরা এখানে বসলুম ও এত আনন্দ পেলুম। নোংরা থাকলে বসতুম না। আমরা এ জায়গাটিকে নোংরা করলে সকলের আনন্দ পাবার একটা জায়গা নষ্ট করতুম।

দাদু শুনে ভারী খুশী হলেন। বললেন, ঠিক বলেছ রেবা! শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে হয়তো কেউ না দেখে এখানে এসে বসে পড়ত আর কাপড়ে, জামাতে কমলা লেবুর খোসা, ছিবড়ে সব লাগত। সর্বসাধারণের আনন্দের জায়গা নষ্ট করা ও পোষাকের ক্ষতি করা এই দু'টো অপরাধ হ'ত তোমাদের।

বলতে বলতে তারা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। রেবা দেখা গেল ও-ধারের হাঁটাপথে দু'টি সাদা মেয়ে ও একটি ছেলে চলেছে হাসিমুখে, গল্প করে। দাদু বললেন, ওরা কেমন হাসিমুখে চলেছে দেখ দেখি! চাল-চলনে কোন জড়তা নেই। দেখে আনন্দ হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েরা চলে কেমন কুঁজো হয়ে—আড়ষ্ট হয়ে।

সিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, সকল ছেলেমেয়ের নাম করে ব'লো না দাদু! আমরা সে রকম নই।

একটু হেসে দাদু বললেন, ওদের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ না দিদিমণি, তারপর আমাকে ধমক দিও।

প্রণতি বললে, ওদের পাগুলো কেমন একসঙ্গে পড়ছে দেখেছিস? সবাই গল্প করে যাচ্ছে, পা কিন্তু ঠিক পড়ছে।

রেবা বললে, কুচকাওয়াজ তো আমরাও শিখেছি। চল ভাই, আমরাও ও-রকম পা মিলিয়ে চলি।

দাদু বললেন, তোমরাও শিখেছ, ওরাও কুচকাওয়াজ শিখেই ও-রকম হাঁটছে। তোমরা শিখেছ শুধু শিবিরের জন্যে ও শেখাবার জন্যে, ওরা শিখেছে জীবনের প্রতিটি কাজের জন্যে। তোমাদের লেখাপড়া ডিগ্রির জন্যে আর ওদের লেখাপড়া জীবনের জন্যে।

রেবার কথার সংগে সংগেই চার বন্ধু পা মিলিয়ে চলতে লাগল আর মাঝে মাঝে বিদেশী ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তাদের মনের ভেতর একটি ভাব আজ বিরাট শক্তিতে জেগে উঠেছে—দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতির সংগে আজ আমাদের পা মিলিয়ে চলতে হবে, চলতে হবে।

দাদু চলছেন পেছনে। তাঁর পায়ে রবারের জুতো। তাই শব্দ শোনা যাচ্ছে না। প্রণতি বললে, দাদু, আমাদের সংগে ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারছ তো?

দাদু বললেন, আমি যে তোমাদের চেয়ে অনেক যুগ পেছিয়ে আছি ভাই। তাই তো আমি তোমাদের কাছে প্রাচীন। তোমাদের সংগে তাল রেখে চলার চেষ্টা আমি করব না। তবুও তোমাদের কাছ থেকে প্রাচীনের সম্মানটুকু আদায় করব।

বলতে বলতে তারা ব্যাংকের সামনে এসে পড়ল। তিন বন্ধুকে বিদায় দিয়ে রেবা ও দাদু বাড়ির পথে ফিরল। সামনেই ময়লা ফেলার জায়গা দেখে রেবা তার হাতের ঠোঙাটি সেখানে ফেলে দিলে।

খুশী হয়ে দাদু বললেন, তোমাকে প্রশংসা করছি রেবা! তুমি রাস্তায় ফেল নি, ময়লা ফেলবার জায়গায়

এসে ফেলেছ। এই সামান্য কাজটুকু দিয়েই তোমাকে আমি বিচার করছি। মানুষের সত্যিকার পরিচয় বলে দেয় বড় বড় কাজগুলো নয়, বলে এই রকম ছোট কাজই।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি রেবার অগাধ ভক্তি। দাদু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, সুভাষচন্দ্রকে তুমি অত ভক্তি কর কেন বল দেখি? তাঁকে তুমি কিসে জানতে পারলে যে তিনি মহৎ?

—তিনি শুধু মহৎই ন'ন দাদু, তিনি দেবতারও বড়। তাঁর ছবির দিকে চাইলেই ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে।

দাদু বললেন, ও সব ভাবাবেগের কথা রেখে বাস্তব বিচারে এস।

—কেন, তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন সারা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় কীর্ত্তি।

—কিন্তু সামান্য একটি সৈনিকের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা।—দাদু বললেন। এই রকম ছোটখাট ঘটনাই তাঁকে সত্যিকার মহত্ত্ব দিয়েছে। বিবেকানন্দকে প্রণাম করি তাঁর আমেরিকায় ধর্ম্মজয়ের জন্যেই নয়, প্রণাম করি কোটিপতির বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য দেখে ভারতের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে সারারাত মাটিতে পড়ে কেঁদেছিলেন ব'লে। আমরা ছেলেবয়স পড়েছিলুম—'বড় হ'তে বড় সাধ কর যদি ভবে, সকলে কাছে আগে ছোট হও তবে।' আজ সকলের কা তোমাদের ছোট হবার জন্যে আমি বলব না। ত এ কথা ঠিক যদি বড় কাজ করতে চাও তা হ'লে স আগে এই রকম ছোট ছোট কাজ অত্যন্ত সুনিপুণ নিখুঁত ভাবে করবার চেষ্টা তোমাদের করতে হবে।

গলির মোড়ে পা দিতেই একটা হৈ-চৈ শোনা গে একজন মহিলা খুব সেজেগুজে চলেছিলেন। ক খোসায় পা পড়ে আছাড় খেয়েছেন ও তাই দেখে আ পাশের পান বিড়িওলা এবং পথিকদেরও কেউ কে হো হো করে হেসে উঠল।

মহিলাটি উঠে লজ্জিত ভাবে চলে গেলেন। ত দামী শাড়িতে রাস্তার ময়লা লেগেছে। রাস্তায় অনে গুলো কলার খোসা পড়ে আছে। সেদিকে কারুর ল নেই। পথিকরা নিজেদের পা বাঁচিয়ে চলেছে। কে এসে প্রত্যেকটি খোসা পা দিয়ে সরিয়ে নর্দ্দামার পা রেখে দিলে।

দাদু বললেন, এই যে ছোট্ট কাজটি করলে দিদি, ছোট্ট কাজটুকুই তোমাকে বড় করবে।

ফোটার কাহিনী

শ্রীননীলাল দে

আলো ফোটে ভোর বেলা ফুল ফোটে কাননে,
নয়নের জ্যোতিঃ ফোটে সুন্দর আননে।
বোল্‌তার হুল ফোটে, জল ফোটে হাঁড়ীতে,
বিবাহের ফুল ফোটে—ধূমধাম বাড়ীতে।
মূক-মুখে ভাষা ফোটে, কলি ফোটে ফাগুনে,
খই ফোটে মুখে কারো, আরো ফোটে আগুনে।
বাচ্চার চোখ ফোটে,—আর ফোটে মূর্খের,
বোল ফোটে তবলার চাঁটিতে—কি দুঃখের!
সূচ ফোটে হিম গায়ে,—ডিম ফোটে তা দিলে,
শিশুদের বোল ফোটে কোল ছেড়ে হাঁটিলে।
লাখে লাখে তারা ফোটে আঁধিয়ার গগনে,
ফোটা নয়—ভাই ফোঁটা—দ্বিতীয়ার লগনে।

চিত্রশালা

—শ্রীলঙ্কা—

ভারতের প্রতিবেশী সিংহলে সম্প্রতি 'ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র' গঠিত হয়েছে। সিংহলের নতুন ক'রে নামকরণ হয়েছে শ্রীলঙ্কা।

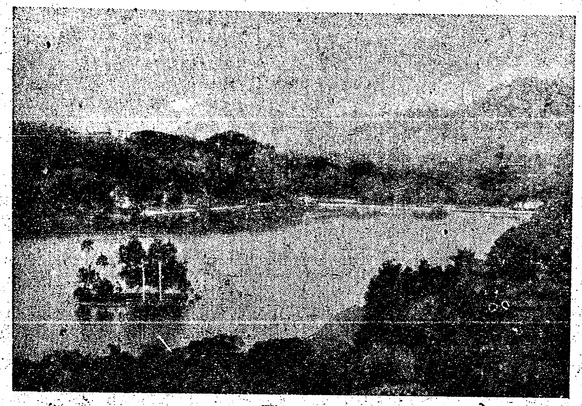

শ্রীলঙ্কার প্রাকৃতিক সম্পদ্—কান্দীর হ্রদ

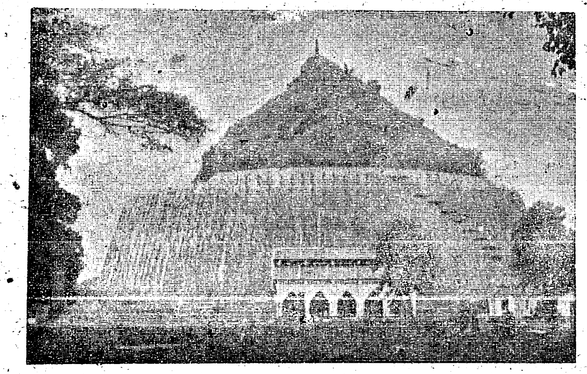

শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক সম্পদ্—অনুরাধপুরের প্রাচীন স্তূপ বা 'ডাগোবা'

পাঁচ

অশোক লাহিড়ীর ডায়েরী

সুদুঃসহ সাত দিন কেটে গেল—কি করে যে বলতে পারি না। মনে করতেই বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ করে। সাতটা দিন কেটে গেল একেবারে নিঃসঙ্গ,—প্রতিদিন একটি অলৌকিক, ভৌতিক, কি নৃশংস কোনও ঘটনার প্রত্যাশা ক'রে। কিন্তু তেমন কোনও ঘটনা ঘটে নি, তাই যেন অভাবনীয় কোনও ঘটনার ভয় আমাকে আরও পেয়ে বসল।

হঠাৎ জমিদার কৃতান্তবর্ম্মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি জানকীপ্রসাদ বাবু বা আর কাউকেও চিঠি লিখেছেন কি?"

এই প্রশ্নে আমার মনের সমস্ত তিক্ততা এক সঙ্গে মুখের গোড়ায় জড় হয়ে উঠল। একটু রুক্ষ ভাবেই জানালাম যে আজ পর্য্যন্ত চিঠি পাঠাবার কোনও সুযোগই আমি পাই নি।

আমার কাঁধে একটি হাত রেখে তিনি বললেন—"তবে লিখুন। জানকীপ্রসাদ বাবু কিংবা যাকে ইচ্ছা লিখুন যে আপনি আরও এক মাস এখানে থাকবেন।"

এক মাস! আরও একদিন এখানে থাকার কথা মনে করতেই সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে। কোনও রকমে তাই জিজ্ঞাসা করলাম—"আরও অত দিন কি আপনি আমাকে থাকতে বলেন?"

"যদি থাকেন তো আমার অত্যন্ত উপকার হবে।

"না, না—আমি কোনও কিছু শুনব না। যখন জানকীপ্রসাদ বাবু আপনাকে আমার কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তখন এটা আপনার বোঝা উচিত ছিল যে আমার যত দিন না কাজ শেষ হয় তত দিন আপনার এখানে থাকতে হবে। আর আপনার এখানে এমন কি অসুবিধা হচ্ছে? আর বেশী দিন তো নয়!"

তাঁর কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! আমি এখানে জানকীপ্রসাদ বাবুর কাজে এসেছি, তাঁর কথা আমার মনে হ'ল। তাঁর যাতে কাজের কোনও ক্ষতি হয়, তা আমি অবশ্য করব'না। আর যতক্ষণ কৃতান্তবর্ম্মা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যাতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমি একজন বন্দী। আমার স্বতন্ত্র কোনও ইচ্ছা থাকতে পারে না। তিনি যা বলবেন তা আমায় স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে। নয়তো বীভৎস, নৃশংস অত্যাচারের কশাঘাতে তা স্বীকার করতে হবে। আমার মৌনতায় তিনি দেখতে পেলেন তাঁর জয়-গৌরব, আমার মুখের বিবর্ণতায় তিনি তাঁর ক্ষমতা বুঝতে পেলেন; তারপর মুহূর্ত্তেই তাঁর স্বাভাবিক নম্র অথচ অলঙ্ঘ্যনীয় ভাষায় তিনি বলে চললেন—

"আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনার চিঠিতে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা ছাড়া আর কিছুই লিখবেন না। আপনি যে ভাল আছেন, তাঁদের সঙ্গে শীগ্ গিরই মিলিত হবেন—এ কথা জানতে পারলেই তাঁরা খুব খুশি হবেন, নয় কি?"

এই ব'লে তিনি আমাকে তিনটি কাগজ আর তিনটি খাম দিলেন। তাঁর মুখে একটা চাপা হাসি লেগে ছিল, অর্থাৎ যা-ই লিখি না কেন, তাঁর চোখে ধূলো দেওয়া সম্ভব নয়—তিনি সবই পড়তে পারবেন। তাই আমি ঠিক করলাম যে এখন জানকীপ্রসাদ বাবু আর অলককে সামুলি দু'-চার কথা ছাড়া আর কিছুই লিখব না, কিন্তু সময় এবং সুযোগ পেলে গোপনে সব কথাই তাঁদের লিখে জানাব। জানকীপ্রসাদ বাবুকে আমি শর্ট হ্যাণ্ডে লিখে জানাতে পারি—কৃতান্তবর্ম্মা যদি চিঠি খোলেন তো ওই বিজাতীয় লেখা দেখে চমকেই উঠবেন।

আমি চিঠি লিখে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি চিঠি গুলো নিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে বললেন—"আমাকে ম্যাপ করবেন, আজ সন্ধ্যায় বাইরে আমার অনেক কাজ আছে। তাই আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারব না। আপনার সব কিছুই ঠিক করা থাকবে।"

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—"আপনাকে একটা কথা জানাই—না, আপনাকে ভগবানের দোহাই দিয়ে সাবধান করে দেওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য, যে, যদিও আপনি এই ঘর ছেড়ে বাইরে যান, তবুও এই প্রাসাদের অন্য কোথাও ঘুমিয়ে পড়বেন না। এটা অনেক দিনের পুরোনো, অনেক স্মৃতি-বিজড়িত প্রাসাদ; যারা এর যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে তাদের কাঁধে নানা দুঃস্বপ্ন ভর করে। আপনাকে আমি বার বার সাবধান করছি। যদি এখন কিংবা কখনও আপনার ঘুম আসে, আপনার ঘরে ছুটে আসবেন—সেখানে আপনার কোনও ভয় নেই, আপনার বিশ্রামে কেউ বাধা দিতে আসবে না। কিন্তু তার অন্যথা হ'লে—"

কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। হাত নেড়ে যেমন ভাব দেখালেন তাতে বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। সবই বুঝলাম, কিন্তু একটা সন্দেহ শুধু থেকে থেকে মনকে দোলা দিচ্ছিল যে আমাকে ঘিরে যে অস্বাভাবিক বীভৎস রহস্য ও আশঙ্কা ঘিরে আছে তার চেয়ে দুঃস্বপ্ন পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে?

এটা স্থির করে ফেলেছিলাম যে আজ থেকে আর কিছুতেই ভয় পাব না। যেখানে তিনি নেই—সেখানটাই যেন আমার কাছে বেশী নিরাপদ, যেখানে উনি শুতে মানা করে দিয়েছেন সেখানটায়ই শুতে আমার যেন আর কোনও ভয় নেই। আজ আমি জানি, আমার গলার এই মাদুলি আমাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে পারবে, এই মাদুলি ভেদ ক'রে দুঃস্বপ্ন আমার চোখে ভিড় করতে পারবে না।

তিনি চলে গেলে পর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ না শুনে আমি দক্ষিণ-খোলা সেই পাথরের সিঁড়ির কাছের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরের চত্বর অন্ধকার, তাই বাইরের প্রশস্ত বন আর পাহাড়ে, উপরে নিঃসীম নীল আকাশে আমি অনেকখানি সান্ত্বনা, অনেকখানি মুক্তির স্বাদ পাই। বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আমার এই বন্দী জীবন কত দুঃখের! আমি মুক্ত বাতাস প্রাণ ভরে পেতে চাই। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবন আমাকে পাগল করে তুলেছে—নিজের ছায়া দেখে নিজে চমকে উঠি, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে আঁৎকে উঠি···আমার মনে নানা বিভীষিকা দিন দিন ভিড় করে আসে। ভগবান্ জানেন যে আমার এই ভয় কাল্পনিক নয়। আমি বাইরের জগতের দিকে তাকাই, নরম জ্যোৎস্নায় আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিই। চাঁদের এই অবাধ খুশীতে যেন দূরের পাহাড় গলে গলে পড়ছে, দূর উপত্যকা হেসে উঠছে!

জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে আমি

থমকে দাঁড়ালাম। কৃতান্তবর্ম্মার ঘরের জানলার কাছে যেন কা'কে নড়তে দেখলাম। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জানলা দিয়ে জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার মুখ বেরিয়ে এল। আমি তাঁর মুখ দেখতে পাই নি, কিন্তু তাঁর ঘাড় আর পিঠ ও হাতের নড়াচড়া দেখেই ঠিক তাঁকে চিনতে পারলাম। আর যাই হোক, তাঁর হাতকে আমি ভুল করতে পারি না, কারণ তাঁর হাত সব সময় আমার মানস-পটে আঁকা ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভয়ে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে এল। জানলা দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীর বের হওয়ার পর বাড়িটার দেয়াল ধরে তিনি মাথা নীচের দিকে রেখে অনেকটা কুমীরের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলতে সুরু করলেন। প্রথমে আমি আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি। মনে হ'ল হয়ত জ্যোৎস্না-রাতের কোনও ছলনা হবে—হয়ত কোন কিছুর ছায়া! কিন্তু কিছুক্ষণ ভাল ক'রে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার কোনও ভুল হ'তে পারে না। স্বয়ং কৃতান্তবর্ম্মাই দেয়াল ধরে কুমীরের মতই খুব জোরে নীচে নেমে যাচ্ছেন।

এ কি রকম লোক! না কি, এ কোন জন্তু, মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে? এই বিভীষিকাময় বাড়ি আমাকে চারদিক্ থেকে গ্রাস করে ফেলেছে, আমার কেমন যেন ভয় করছে। আমার অত্যন্ত—অত্যন্ত ভয় করছে। এর থেকে মুক্তি নেই, অচিন্ত্যনীয় ভয় আমাকে চারদিক্ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে……

এরপর যখন তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'ল, তাঁর দিকে সোজা হয়ে তাকাবার আমার সাহস হয় নি। দিন তিনেক পর আবার আমি তাঁকে কুমীরের মত দেয়াল বেয়ে বাইরে চলে যেতে দেখেছি। একটা ছোট্ট জানলার আড়ালে তাঁকে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। একটু ঝুঁকে সবটুকু দেখার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু এত দূর যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না। বেশ বুঝতে পারলাম যে তিনি এখন বাইরে বেরিয়ে গেছেন—এই ভূতুড়ে বাড়ী থেকে পালানোর এখনই একটা মস্ত সুযোগ, অন্ততঃ এখন বাড়ির সবটুকু ঘুরে সুযোগ ও সুবিধা দেখে রাখা যেতে পারে।

আমার ঘরে ফিরে এসে একটা আলো নিয়ে সমস্ত ঘর খোলার চেষ্টা করলাম,—সমস্ত ঘরই তালা বন্ধ। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নীচের হল্ ঘরে গিয়ে বাইরে যাবার বিরাট দরজাটা নাড়া দিলাম—কিন্তু সেটাও বন্ধ। বাড়িটা ঘুরে সমস্ত ঘর পরীক্ষা করতে লাগলাম, দু'-একটা ঘর ছা সবই বন্ধ। খোলা ঘরগুলোয় ধুলো আর দু'-একটা পুরো আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। অনেক ঘোরাঘুরি পর একটা ঘরের কাছে এসে উপস্থিত হ'লাম। ঘরট তালাবন্ধ ছিল না, শুধু কব্জায় মরচে পড়ে সহজে খো যাচ্ছিল না। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলল। আ যে ঘরে থাকি এই ঘরটা সে ঘর থেকে একতলা নীচে, উ দিকের একেবারে এক কোণে। ঘরে ঢুকতে কেমন ক করছিল! কিন্তু মনে হ'ল এ সুযোগ একবার গেলে হ আর কোনদিন এ ঘরে ঢুকতে পারব না। কিন্তু এ ঘরে বিশেষত্ব কিছুই নেই। চারিপাশে জানলা—সেই জান দিয়ে শুধু দেখা যায় দূরের—কাছের পাহাড়, ঘন-কা বন-জঙ্গল, উপরে নীল আকাশ……

ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন! হ্যাঁ, ভগবানের কা আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, আমাকে রক্ষা করুন…মৃ বা বিপদের হাত থেকে নয়,—আমি যেন পাগল হয়ে যাই। যত দিন আমি এখানে থাকব ততদিন শুধু আম একটি প্রার্থনা—আমি যেন পাগল হয়ে না যাই। অবশ্য এ আমি পাগল হয়ে গেছি কিনা জোর ক'রে বলতে পারি যদি এখনও আমার মাথার ঠিক থাকে তবে এ ভাবতেও আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, এখানে যত কিছু আছে তার মধ্যে কৃতান্তবর্ম্মাই বীভৎস। একমাত্র তাঁর দিকেই হয়ত আমি সোজা তাকাতে পারি।

কৃতান্তবর্ম্মা সাবধান ক'রে দেওয়ায় তখন আমি খু পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে তাঁকে অমান্য করতে কেমন মনে এক আনন্দ হচ্ছিল। ওই ঘরে বসে থাকতে থাক ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল, কৃতান্তবর্ম্ম সতর্ক বাণীও মনে পড়ে গেল—কিন্তু তাঁর কথা অমা করতে একটা জেদ চেপে বসল। বাইরের আলো-উ নীল চন্দ্রাতপ, দিগন্তপ্রসারী বন, পাহাড় আর উপত আমার মনে স্বাধীনতার হিল্লোল এনে দিল। স্থির ক ফেললাম, আজ আর আমার ঘরে ফিরব না—কৃতান্তবর্ম্ম কোনও কথা না শুনেই এই ঘরে শুয়ে থাকব। পুরাকা যখন এই রাজপ্রাসাদের পুরুষেরা বাইরে বাইরে যুদ্ধ ক

ফিরতেন তখন হয়ত এই ঘরেই পুরনারীরা তাঁদের বিজয়-সংবাদের প্রত্যাশায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিয়েছেন! একটা চেয়ার টেনে ধুলোর মধ্যেই আমি শুয়ে পড়লাম।

হয়ত আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিংবা হয়ত ঘুমিয়ে পড়ি নি…কিন্তু তারপর যা অলৌকিক ঘটনা আমারই চোখের সামনে ঘটে গেল তা'তে কি ক'রে বলি যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

এ ঘরে আমি একা ছিলাম না। সেই একই ঘর, চন্দ্রালোক-মুখর ঘরে ধূলোর উপর আমি আমার পায়ের ছাপও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার সামনে তিনটি পুরুষ বসে আছে। কিন্তু এ কি স্বপ্ন? না আমার চোখের ভুল?—চাঁদের আলো তাদের উপর পড়লেও কোথাও তাদের ছায়া পড়ছে না! তারা আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে দু'জন বেশ কালো, আর একজন ফর্সা।

আমায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে তারা খিলখিল করে হেসে উঠল। কালো লোক দু'টি ফিস্‌ফিস্ করে ব'লে উঠল, "যাও। প্রথমে তুমি যাও, তারপর আমরা…। দেরী ক'র না, ওর বুকে অনেক অনেক রক্ত…."

ফর্সা লোকটি আস্তে আস্তে আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমার বুকের ওপর তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমি বুঝতে পারছিলাম। চোখ তুলে দেখতে আমার সাহস হচ্ছিল না, তবু বুঝতে বাকী ছিল না যে তার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠেছে। তার মুখ আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল, আমার থুতনি ছাড়িয়ে গলা পর্য্যন্ত নামল। পশুদের মত জিভ দিয়ে তার ঠোঁট চাটার শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তারপর মনে হ'ল কে যেন দু' হাত দিয়ে আমার গলা টিপে ধরেছে, আর সেই সঙ্গে ছোট দু'টো দাঁত আমার গলার মধ্যে ফুটে গেল। ভয়ে নিস্পন্দ বুক নিয়ে আমি নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। (ক্রমশঃ)

কথার খেলা

শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ

কি হ'লে বিশ্রী থেকেও শ্রী পাওয়া যায়?
বিবাদ হ'লে। (বিশ্রী—বি)

চা কখন গায়ে দেওয়া চলে?
দর বাড়লে। (চা+দর)

বিছানা কখন খাদ্য হয়?
বিলুপ্ত হ'লে। (বিছানা—বি)

রাগকে ভালবাসায় পরিণত করা যায় কি ক'রে?
অনুযোগ ক'রে। (অনু+রাগ)

বার্ত্তা কখন খাওয়া চলে?
কুসঙ্গে পড়লে। (বার্ত্তা+কু)

দেবতা ও লোভী রোগীতে তফাৎ কি?
একজন ভোগ খায়, অন্য জন খেয়ে ভোগে।

পেয়ালা ও গাছের ডালে তফাৎ কি?
একটা পড়লে ভাঙ্গে, অন্যটা ভাঙ্গলে পড়ে।

স্পিরিট ও মানুষে তফাৎ কি?
একটা জ্বলে শেষ হয়, অন্যে শেষ হ'লে জ্বলে (দাহ)।

বাঁদরে ও বাতাসে তফাৎ কি?
একে শাখায় দোলে, অন্যে শাখা দোলায়।

ট্যাক্সি ও ট্যাক্সএ তফাৎ কি?
একটার ওপর মানুষ চেপে বসে, অন্যটা মানুষের উপর চেপে বসে।

সেণ্ট জর্জ্জের কথা

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ

তোমরা নিশ্চয় একটা ছবি দেখেছ যে একজন বীর যোদ্ধা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা বর্শা, আর তাঁর ঘোড়ার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া একটা ড্র্যাগনের (অনেকটা সাপের মত আকৃতির অদ্ভুত ভীষণ এক কাল্পনিক প্রাণী,—তার নাক দিয়ে আগুন বেরোয়) মাথার উপর লক্ষ্য করা। ইনি সেণ্ট্ (সাধু) জর্জ্জ,—ইংলণ্ডের পৃষ্ঠপোষক সাধু। ইংলণ্ডের লোকেরা সেই জন্য যুদ্ধের সময় "সেণ্ট্ জর্জ্জ স্থখী ইংলণ্ডের সহায়" (সেণ্ট্ জর্জ্জ ফর্ মেরি ইংল্যাণ্ড) ব'লে চীৎকার ক'রে শত্রুকে আক্রমণ করে। সেণ্ট জর্জ্জের মত একজন বীরপুরুষ যে তা'দের পৃষ্ঠপোষক এ কথা ভেবে তারা রীতিমত গর্ব্বও অনুভব করে। তাঁর কথায় তাদের মনে অনেক মহান্ চিন্তা আসে। তোমাদের নিশ্চয় এই সাধু পুরুষটি সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে ইচ্ছা করে?

জর্জ্জ এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ক্যাপাডোসিয়া প্রদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ক্রীশ্চান্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন যেমন শক্তিশালী, তেমনি ধনী ও বুদ্ধিমান্, আবার তেমনি ভদ্র। তিনি সৈনিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তখন ডায়োক্লিশিয়ান্ রোমের সম্রাট্। তিনি জর্জ্জের খুব অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন এবং তাঁকে টিবিউন-এর পদে নিযুক্ত করলেন। এই পদ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় কর্ণেল পদের সমান। তখন থেকে জর্জ্জের সম্মুখে এক গৌরবময় জীবনের পথ উন্মুক্ত হ'ল। স্বয়ং সম্রাট্ তাঁর অনুরাগী; তিনি সহজেই উচ্চ হ'তে উচ্চতর পদে উন্নীত হ'তে পারতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিপরীত অবস্থা হ'ল। সম্রাট্ লোকের কুপরামর্শে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর ভীষণ অত্যাচার স্থরু কর্‌লেন। জর্জ্জ এর প্রতিবাদে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিলেন। যে সরকার তাঁর ধর্ম্মের লোকদের উপর অত্যাচার করে তিনি সেই সরকারে কেমন ক'রে চাকুরী করবেন? তিনি শুধু পদত্যাগ ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না, সম্রাটের আচরণের নিন্দা ক'রে এবং তাঁকে তিরস্কার ক'রে তিনি এক পত্র লিখলেন। সম্রাট্ জর্জ্জকে কারারুদ্ধ করলেন। সেখানে তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখান হ'ল; জর্জ্জ কিন্তু নিজের মত পরিবর্ত্তন করলেন না। তারপর তাঁকে অনেক ভয় দেখান হ'ল। তিনি তা'তেও বিচলিত হ'লেন না। তারপর তাঁর ওপর অনেক অত্যাচার স্থরু হ'ল। জর্জ্জ সকল অত্যাচার সহ্য করলেন। অবশেষে ৩০৩ খৃঃ অব্দে ২৩ শে এপ্রিল তারিখে তাঁকে মেরে ফেলা হ'ল। জর্জ্জ এইভাবে নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুকে বরণ করলেন। গ্রীক্‌রা "তাঁকে মহান্ শহীদ্" (দি গ্রেট্ মার্ট্যার) বলে।

কন্‌স্টাণ্টিনোপল্ সহরে তাঁর সম্মানের জন্য ছয়টি উপাসনা-মন্দির নিৰ্ম্মিত হয়। তিনি জেনোয়ারও পৃষ্ঠপোষক সাধু। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময়ে তিনি যথা নিয়মে ইংলণ্ডের পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসাবে পরিগণিত হ'ন। তৃতীয় এডওয়ার্ড তাঁর সম্মানে একদল 'নাইট' সৃষ্টি করেন। ইংরাজেরা ২৩শে এপ্রিল তারিখটা সেণ্ট জর্জ্জের দিন ব'লে ধরেন এবং ঐ দিন শুদ্ধ আচরণ ও উপাসনার মধ্যে কাটান।

তোমাদের অনেকে হয়ত ভাবছ একটা ড্র্যাগনকে মেরে ফেলছেন এমন অবস্থায় সেণ্ট জর্জ্জকে কেন ছবিতে আঁকা হয়েছে। ডায়োক্লিশিয়ানের রাজত্বের সময় নিশ্চয় এ রকমের ড্র্যাগন ছিল না। আগেকার দিনের লেখক ও চিত্রকরেরা আত্মার উন্নতির বা ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি করে এমন সব কিছুকেই সত্যিকারের ভীষণ জন্তু রূপে কল্পনা করতেন। সেণ্ট জর্জ্জ যে ড্র্যাগনটিকে মারছেন তাকে আমরা "মানুষের সম্মানের লোভ" বা "সংসারের প্রতি মোহ" বলে বর্ণনা করতে পারি। মানুষের সম্মানের লোভ বা সংসারের প্রতি মোহ এই দু'টিকেই সেণ্ট জর্জ্জ নষ্ট ক'রে ফেলেছিলেন।

আমার দেশের বৈজ্ঞানিক

শ্রীনিবাস রামানুজন্

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে

তোমাদের মধ্যে হয়তো এমন অনেকে আছ, যাহারা ঙ্কের নাম শুনিলেই ঘাবড়াইয়া যাও। কেউ কেউ হয়ত াড়ালে,—আড়ালে কেন, প্রকাশ্যেই,—বল, 'ওরে বাবা! ?—ওর মত বিদ্‌ঘুটে, নীরস জিনিষ দুনিয়ায় দু'টি আছে কি?' কিন্তু অঙ্কের মধ্যেও যে কত রস থাকিতে পারে ড় হইয়া যদি উচ্চতর গণিত লইয়া আলোচনা কর বেই বুঝিবে। যে বিজ্ঞান আজ নানা দিক্ দিয়া পলে লে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিতেছে—অঙ্কশাস্ত্রই সেই জ্ঞানের ভিত্তি। কাজেই তা নীরস হইতে পারে না।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এবং ০—এই দশটি চিহ্ন রা তোমরা অনায়াসে সংখ্যা লিখিয়া থাক। কিন্তু ামরা হয়ত জান না যে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এই াবিষ্কারটির মূল্য কত বড়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার লিলেও বোধ হয় ভুল হইবে না। আর শুনিলে চয়ই গর্ব্ব বোধ করিবে যে এই আবিষ্কারটি আমাদের রতেরই দান! কেন যে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার লাম বড় হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও; গণিতে মাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কত উন্নতি করিয়াছিলেন তাহাও ন জানিতে পারিবে।

আজ তোমাদের নব্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয় িতবিদের কথাই বলিব। ইঁহার নাম শ্রীনিবাস রামানুজ ন্। অনেকে হয়ত এই নাম শুনিয়াছ। প্রথম রতীয় এফ্. আর. এস্ বলিয়া বহুদিন ইনি পরিচিত িলেন। পরে অবশ্য জানা গিয়াছে, ইঁহারও আগে দে শির কুরশেটজি নামে আর একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী থম এই সম্মান পান।

মাদ্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ িবারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর রামানুজনের জন্ম হয়। খুব ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে যখন তিনি পড়িতেন তখন উচ্চ শ্রেণীর বালকদের সকল অঙ্কই তিনি কষিয়া দিতে পারিতেন। আবার, তিনি দেখিয়া অবাক্ হইতেন যে তিনি নিজে নিজে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিপাদ্য বিষয় উচ্চ শ্রেণীর এবং কলেজের পুস্তকে রহিয়াছে। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজে ঢুকিবার আগে একখানা অঙ্কের বই তাঁহার হাতে পড়ে। ইহাতে গণিতের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৬০০০ প্রামাণ্য বিষয়ের উল্লেখ মাত্র ছিল। এই বইখানি যেন তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসে! তিনি বসিয়া বসিয়া কেবল ঐ বিষয়গুলির সমাধান করিতেন। বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু আমাদের কলেজগুলি বিশেষ প্রতিভার বিকাশের পক্ষে কোন কাজেই আসে না। রামানুজন্ গণিতের মধ্যে সর্ব্বদা এমনই ডুবিয়া থাকিতেন যে পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলিতে মন দিতে পারিতেন না। অধ্যাপক মহাশয় হয়ত ইতিহাস বা অন্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছেন, কিন্তু রামানুজনের মাথার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যত রাজ্যের গণিতের সমস্যা, আর তিনি তাহারই সমাধান করিতেছেন। ফলে কলেজের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহার বৃত্তি রহিত হইল এবং একই শ্রেণীতে তাঁহাকে আবার পড়িতে বলা হইল।

রামানুজন্ কলেজ ছাড়িয়া দিলেন। কয়েক বছর পরে আর একবার তিনি কলেজে পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এবারেও কয়েক মাস পরে হাল ছাড়িয়া দিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রামানুজন্ প্রাইভেট

ছাত্র হিসাবে এফ্. এ পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অঙ্ক তাঁহার এত ভাল লাগিত যে সর্ব্বদা তাহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন, অন্য বিষয়গুলি লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। তাহারই জন্য এইরূপ ফল হইল।

ইহার পর রামানুজনকে দেখিলে অবাক্ লাগিত। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, ভবঘুরের মতন ছিন্নমলিন বসনে, অনাহারে, অনিদ্রায় গণিতের নোট-বুক ও পেন্সিল বগলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! গণিতই যেন তাঁহার একমাত্র ধ্যান, একমাত্র চিন্তা! এই সাধনার ফল কতকগুলি নোট-বুকে লিপিবদ্ধ আছে। এই ভাবে কয়েক বছর গেল।

এই সময় রামানুজনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর বিনা উপার্জ্জনে অধিক দিন বসিয়া থাকা চলে না; কিন্তু যে যুবক একটাও কলেজের পাশ দিতে পারিল না আমাদের দেশে তাহার অর্থোপার্জ্জনের উপায় কোথায়? ঘুরিয়া ফিরিয়া রামানুজন্ কয়েকজন গণিত-বিদের সহিত পরিচিত হ'ন, তাঁহার গবেষণামূলক প্রথম প্রবন্ধ 'জার্ণাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটি' নামক পত্রিকায় বাহির হইল। রামচন্দ্র রাও নামক একজন গণিত-শিক্ষকের সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাও রামানুজনের নোট-বুক দেখিয়া তাঁহার প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। যুবকের অনেক সমাধান এই গণিতজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন নাই; অপেক্ষাকৃত সরল কয়েকটি সমাধান বুঝিতে পারিয়াই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে রামানুজন্ মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিতের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টে সামান্য বেতনের একটি কেরাণীর চাকুরী খালি হইলে রামানুজন্ ঐ পদ লাভ করেন। রামচন্দ্র রাওয়েরই চেষ্টায় এখানকার কর্ত্তৃপক্ষও রামানুজনের প্রতিভার পরিচয় পান। দেখা যায়, প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশের যোগাযোগ বোধ হয় বিধাতা নিজেই করিয়া দেন। পোর্ট ট্রাষ্টের কাজে যোগ দেওয়ার প্রায় এক বছর পরে গিল্‌বার্ট ওয়াকার নামে একজন বড় পণ্ডিত মানমন্দিরসমূহের ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া মাদ্রাজে আসেন। ইনি ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র। ওয়াকার সাহেব রামানুজনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হ'ন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই উপাধিহীন যুবককে অর্থচিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া মাত্র গণিত শাস্ত্রে চর্চ্চা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার নাম পরিচিত হয়ে উঠে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ হার্ডির সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ হয়। হার্ডিও তখন যুবক। হার্ডি রামানুজনে অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং রামানুজন্ কেম্ব্রিজে যাইতে সম্মত আছেন কিনা জানিতে চাহেন। রামানুজন্ গোঁড় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান; প্রথমটা জাতি যাইবার ভয়ে এবং পিতামাতার অনিচ্ছা হেতু তিনি বিলাত যাইতে অস্বীকার করেন। পরে এক অভাবনীয় কারণে এই প্রতিবন্ধক দূর হয়। রামানুজনের মাতা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন—পুত্রের চারিদিকে অনেক সাহেব, আর তাঁহাদের কুল-দেবতা আদেশ করিতেছেন রামানুজনের পিতামাতা যেন পুত্রের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা না দেন। ইহার পর নানা গণিতবিদ্ পণ্ডিতের চেষ্টায় তিনি বিলাত গমনের এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থানুকূল্য পান।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রামানুজন্ কেম্ব্রিজে উপস্থিত হ'ন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পর্য্যন্ত তিনি অঙ্ক-শাস্ত্র লইয়া বহু গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার অসাধারণ মৌলিক গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ বিলাতের রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে উক্ত সমিতির সদস্য পদ দিয়া সম্মানিত করেন। এই পদকে সংক্ষেপে বলা হয় এফ্. আর্. এস্। এ সম্বন্ধে তোমরা রামধনুতে আগেই পড়িয়াছ। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয়ের প্রতি এই দুর্ল্লভ সম্মান দানে তাঁহাদের অত্যন্ত কার্পণ্য ছিল। কিন্তু এই অসাধারণ পাত্রে দান করিতে পাইয়া যেন কৃপণ নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত বোধ করিল। ইহার পর অবশ্য আরও ৯ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্মান পাইয়াছেন। জগদীশ বসু, রামন্, সাহা, সাহানী, কৃষ্ণন্, ভাবা, ভাটনগর, সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখর, প্রশান্তকুমার মহলানবীশ—ইঁহাদের কথাই বলিতেছি। কিন্তু

রামানুজনকে যখন ঐ সম্মান দেওয়া হয় তখন বিদেশীর পক্ষে উহা খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল।

ভারতের ও গণিত-জগতের দুর্ভাগ্য হেতু এই প্রতিভাশালী গণিতবিদ্ বিলাতে থাকিবার সময়ে দুরন্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। প্রথমটা তাঁহার চিকিৎসার ও যত্নের ত্রুটি হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতিও দেখা গিয়াছিল; কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রামানুজন্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আবার রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এক বৎসর ধরিয়া অনেক সেবা-যত্ন চলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল, মাত্র ৩২ বৎসর ৪ মাস বয়সে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

এই কৃতী সন্তানের অকালমৃত্যুতে দেশ-মাতার যে ক্ষতি হয় তাহা অপূরণীয়। রামনুজনের প্রতিভা প্রথমাবধি উপযুক্ত পথে পরিচালিত হইলে গণিতের বিভিন্ন বিভাগ কতই না সমৃদ্ধ হইতে পারিত! তাঁহাকে পরিচালিত করিবার কেহ ছিল না, তাই গণিতে নূতন নহে এমন বহু বিষয় তিনি বসিয়া বসিয়া নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এগুলি যে আগেই অপরে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছে তাহা যদি তাঁহার জানা থাকিত তবে তিনি অন্য মূল্যবান্ নূতন আবিষ্কারের জন্য ঐ সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া গণিতের সম্পদ্-ভাণ্ডার আরও বাড়াইয়া যাইতে পারিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অসুস্থ শরীরে গণিতের যে তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিতেছিলেন তাহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, শুধু ঐ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এমন বহু সূত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তবুও তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করিতে তাঁহার মৃত্যুর পর লাগিয়াছিল আরও পূরা ১৫টি বছর।

ছোট পাখী ব'লে গেল

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

ছট্‌ফটে পাখী এক চট্‌পট্ ডাক্‌ছে—
সন্ধ্যায় সুর তাঁর বড় ভালো লাগ্‌ছে।
নিভে গেল যেন প্রায় রাঙা আলো আকাশে,
কালো রাত হাতছানি দেয় যেন আভাসে।
আকাশে প্রথম তারা যেন জেগে উঠ্‌লো,
চঞ্চল পায়ে পায়ে ছেলে-দল ছুট্‌লো।
ঠিক এই সময়েতে এতটুকু পাখী সে
ছোট ডালে একমনে সারা হ'লো ডাকি' সে।
খুব ছোট লেজ তার হরদম্ দুল্‌ছে—
স্বর তার তালে তালে বড় ভালো খুল্‌ছে।

মনে হ'ল ছোট পাখী ছোট ঠোঁটখানিতে
বড় কথা ব'লে গেল—মধুময় বাণীতে!
মনে হ'ল ব'লে গেল—'বাংলারে ভুলো না,
এর মত কোনো দেশ হয় নারে তুলনা।
হয় নারে এর মত কোনো ধূলি ধরাতে,
পারে নারে আর কেউ মনে খুসী ভরাতে।
তাই যদি দেখ কেহ বাংলার যাতনা,
দূর তাহা করিবারে জাগে যেন কামনা।
জাগে যেন তোমাদের স্বদেশের প্রীতি হে,
মনে যেন চিরদিন থাকে ইহা নিতি হে।'

ব'লে গেল সন্ধ্যায় ছোট পাখী এ কথা—
রাত্তিরে ঘরে বসে মনে যেন রেখ তা'!

শিয়ালের চাতুরী

(কুড়ান গল্প—মহাভারত হইতে)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

এক বনে এক শিয়াল বাস করিত। একটি বাঘ একটি নেকড়ে, একটি নকুল ও একটি ইঁদুর তাহার বন্ধু ছিল। সেই বনের কাছেই থাকিত এক বিরাটকায় হরিণ। হরিণটি বয়সে যুবা; সে যেমনি বলবান্ তেমনি ছিল বুদ্ধিমান্; বাঘ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বধ করিতে পারে নাই।

ব্যাপার দেখিয়া একদিন শিয়াল পণ্ডিত পরামর্শ দিল, রাত্রে হরিণ যখন ঘুমাইয়া থাকিবে তখন ইঁদুর গিয়া তাহার পায়ের শিরা কাটিয়া দিক। তখন তো আর সে দৌড়াইতে পারিবে না, কাজেই বাঘ সহজেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে। এই পরামর্শ অনুসারে কাজ হইল। পর দিন হরিণটি মারা পড়িল।

হরিণের বিরাট মৃতদেহ মাটীতে পড়িয়া আছে। শিয়াল সকলকে ডাকিয়া বলিল, "আমি ইহাকে পাহারা দিতেছি, তোমরা সকলে স্নান করিয়া আসিয়া আনন্দে ভোজন কর।" সকলে চলিয়া গেল। শিয়াল পণ্ডিত ভাবিতে লাগিল কি করিয়া আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত হরিণটা সে একাই খাইবে।

মনে মনে একটা মতলব স্থির করিয়া সে অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাঘ আসিয়া বলিল, "বন্ধু, এমন বিপুল ভোজের আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন?"

শৃগাল বলিল, "মহারাজ, ইঁদুরের অহঙ্কার দেখিয়া আমার গা জ্বলিয়া যাইতেছে। বলে কিনা তাহার বিক্রমেই নাকি হরিণটি মারা সম্ভব হইয়াছে। তাহার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া অবধি আমার এই মৃগ-মাংসে রুচি নষ্ট হইয়াছে।"

শিয়ালের কথা শুনিয়া বাঘও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, "আমিও এ মাংস স্পর্শ করিব না। বনান্তরে যাইয়া সম্পূর্ণ নিজের বিক্রমে পশু বধ করিয়া তবেই খাইব।"

নেকড়ে আসিলে শিয়াল তাহাকে বলিল, "পশুরাজ আপনার প্রতি কি জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আপনাকে খুঁজিতেছেন। ইহার পর আপনি যাহা ইচ্ছা করুন, আমার কিছু বলিবার নাই।" শুনিয়া নেকড়ে কি আর সেখানে দাঁড়ায়? সে প্রাণভয়ে দ্রুত পলায়ন করিল।

তারপর আসিল ইঁদুর। শিয়াল তাহাকে বলিল, "নকুল বলিয়াছে বাঘের কামড়ে এ মাংস বিষাক্ত হইয়াছে, সে ইহা খাইবে না; ইঁদুর খাইয়াই সে আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে।" ইঁদুর ভয়ে এক গর্ত্তের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

নকুল অর্থাৎ বেজি আসিলে শিয়াল তাহাকে বলিল, "আমি বাঘ, নেকড়ে ও ইঁদুরকে নিজ ভুজবলে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বচ্ছন্দে মৃগমাংস ভক্ষণ কর।"

নকুল ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "বলবান্ বাঘ, নেকড়ে এবং বুদ্ধিমান্ ইঁদুরকে যখন আপনি পরাজিত করিয়াছেন তখন আমার আপনার সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।" এই বলিয়া সেও পলায়ন করিল। এইভাবে গোটা হরিণটি বুদ্ধিমান্ শিয়াল পণ্ডিতের ভোগে লাগিল।

তোমরা মহাভারতের গল্প নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। মহাভারতে মূল গল্প ছাড়া আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গল্প আছে, এটিও তাহারই একটি। কণিক নামক একজন কূটরাজনীতিজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই গল্পটি বলিয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশের জন্য কুপরামর্শ দেয়। এই পরামর্শের ফলেই প্রসিদ্ধ জতুগৃহ দাহ হয়।

সবচেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

গভীর রাত্রির নিরেট অন্ধকারের পর্দ্দা ছিঁড়ে দূর থেকে শব্দ এল—ক্র্যাক্ ক্র্যাক্!

জাহাজের ডেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল পুরন্দর। পিস্তলের আওয়াজে চমকে জেগে উঠে সে রেলিংএর ধারে গেল। না, কোথাও কিছু দেখা যায় না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সে একবার পকেট-ঘড়িটা বের করে দেখল। রাত প্রায় দেড়টা। একবার হাই তুলল সে। হাড়মোড়া ভাঙতেই তার খেয়াল হ'ল যে ঘড়িটা হাত থেকে খসে পড়ল। সেটা ধরবার জন্য নীচু হতেই আর টাল সামলাতে পারল না পুরন্দর। সমুদ্রের কালো জল যেন তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিল।

ঢেউএর তলা থেকে যখন তার মাথা জাগল তখন জাহাজ বেশ দূরে চলে গেছে। সে ভেবে দেখল যে চীৎকার করা বৃথা, সাঁতরে জাহাজ ধরবার চেষ্টা করাও বাতুলামী। হাত-পা ছড়িয়ে ভাসতে ভাসতে ভাবতে লাগল পুরন্দর। কাছেই, টেনাসেরিম্-এর উপকূল, কিন্তু কোন্ দিকে, কত দূরে?

হঠাৎ আবার পিস্তলের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্ত্তনাদও হাওয়ায় ভেসে এল। তারপর সব চুপ। পুরন্দর সাঁতার কাটতে লাগল সেই দিক্ লক্ষ্য করে। ডাঙা নিশ্চয় এই দিকেই।

কতক্ষণ কেটে গেল এই ভাবে। হাত-পা আর যেন চলতে চায় না। এমন সময়ে ডাঙা পেয়ে গেল পুরন্দর। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পিছল কতকগুলি পাথর। তাই ধরে ধরে এগিয়ে শেষে শুকনো জায়গায় সে এসে পড়ল। এখনও রাত অনেকটা আছে। বিপদের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন তো শুয়ে পড়া যাক্, এই ভেবে সে ভিজে জুতো-জামা খুলে ফেলল।

ঘুম ভাঙল তার বেলা দুপুর গড়িয়ে যাবার পর। ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ হালকা হয়েছে, কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। জামা-জুতো পরতে পরতে পুরন্দর দেখল যত দূর দৃষ্টি চলে খালি ঘন জঙ্গল। সে উঠে ডান দিকে চলতে লাগল সমুদ্রের ধারে ধারে। জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু মানুষ নিশ্চয়ই আছে এখানে, কেননা আওয়াজ যে পিস্তলেরই তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো এটা বর্ম্মী জলদস্যুদের একটা আড্ডা।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা পার হয়ে ক্রমে রাত হ'য়ে এল, তবু পুরন্দর চলছেই। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরেই সে দেখল আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটু দূরেই দুর্গের মত একটা বাড়ী, তার জানলায় বিদ্যুতের আলো দেখা যাচ্ছে! কাছে এসে দেখল দেউড়ী বন্ধ। একখানা পাথর কুড়িয়ে তাই দিয়ে দরজায় সে আঘাত করল,—একবার, দু'বার। অমনি নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকেই পুরন্দরের চোখে পড়ল দৈত্যের মত বিপুল চেহারার একটা চীনাম্যান্ তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হাসিমুখে পুরন্দর তাকে বল্‌ল, "পিস্তল ছুঁড়ো না। আমি চোর-ডাকাত নই, সিঙ্গাপুরের জাহাজের একজন যাত্রী। জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে ভেসে এসে এখানে উঠেছি।"

লোকটি একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। পুরন্দর আবার বল্‌ল, "সত্যিই আমার কোনও বদ্ মতলব নেই। আমার বাড়ী কলকাতায়। আমার নাম পুরন্দর বর্দ্ধন।"

একজন চীনা ভদ্রলোক এখন এগিয়ে এলেন। আগেকার লোকটী তাঁকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে তিনিই এই বাড়ীর মালিক। তিনি একবার পুরন্দরকে দেখেই বললেন, "কি সৌভাগ্য! আপনি এখানে! আসুন, আসুন!"

পুরন্দর কিছুই বুঝতে পারল না, কথা না বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরের সাজসজ্জা যেমন ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তেমনি দেওয়ালে টাঙানো জীবজন্তুর মাথা দেখে বোঝা যায় যে তিনি একজন ভাল শিকারী।

পুরন্দরকে খাতির করে বসিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে আমি চিনলাম কি করে, তাই ভাবছেন, না? শিকারী হিসাবে আপনার নাম কে না জানে? তা' ছাড়া তিব্বতে শ্বেতভল্লুক শিকার সম্বন্ধে আপনার

লখা বই-এ আমি আপনার ছবি দেখেছি। শিকার রা আমারও নেশা কিনা!"

ভদ্রলোক সে রাত্রে পুরন্দরের আদর-যত্ন করলেন ব। খাবার সময় তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম কর্ণেল লিন্-হুয়াং। ছেলেবেলা থেকেই মামার শিকারে ঝোঁক। সৈন্যদলে ঢুকেছিলাম, উন্নতিও য়েছিল, কিন্তু মন টিঁকল না। শিকারের নেশায় াগল হয়ে দেশে-দেশে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরতে লাগলাম। শেষে এমন হ'ল যে অতি বড় হিংস্র আর চতুর জানো-ারের পক্ষেও আমার হাত ফস্কে যাওয়া অসম্ভব হয়ে াঁড়াল। পশু-শিকারে আমার বিপদ্ বা অনিশ্চয়তা কিছুই রইল না। নতুন শিকারের খোঁজে একবার ড্র্যাকেনবের্গ পাহাড়ে বুনো মোষ মারতে গেলাম। অনেক আশা করে গিয়েছিলাম, কিন্তু গিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা অতি সহজ। মনটা একেবারে দমে গেল। সারাজীবন একটা নেশা নিয়ে কাটিয়েছি, এখন যদি আর তা' থেকে উত্তেজনা না পাই তা'হ'লে করব কি? বেঁচে থাকাটাই তো তবে বিড়ম্বনা মাত্র! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টাকার অভাব ছিল না, এই নির্জ্জন দ্বীপটা কিনে নিয়ে বাড়ীটা তৈরী করিয়ে আমার চাকর ফু-চিং আর ছ'টা শিকারী কুকুর সঙ্গে করে এখানে চলে এলাম। এ জায়গাটা মাণ্ডু ই-দ্বীপ-পুঞ্জের একটা দ্বীপ। এখানে নতুন একরকম শিকার নিয়ে বেশ আছি। বনের পশুর না আছে বুদ্ধি, না আছে কোন অস্ত্র। তাদের মেরে সুখ কোথায়, বলুন? আমার শিকার আমার নিজের আবিষ্কার।"

আশ্চর্য্য হয়ে পুরন্দর জিজ্ঞাসা করল, "নতুন কোনও ভয়ঙ্কর জানোয়ার এই দ্বীপে পেয়েছেন বুঝি?"

—"সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার, কিন্তু নতুন নয়। পাওয়াও যায় না এখানে, নানা জায়গা থেকে নানা ফিকিরে ধরে নিয়ে আসতে হয় তাকে। সবচেয়ে সে হিংস্র, সবচেয়ে তার বুদ্ধি, তার নাম মা-নু-ষ।"

—"মানুষ! আপনি মানুষ খুন ক'রে আমোদ করেন?"

—"কেন করব না? হ্যাঁ, মানুষই আমি শিকার করি। তার প্রাণের দাম যে অন্য পশুর চেয়ে বেশী এ কথা মানুষের মিথ্যে একটা অহঙ্কার মাত্র। মানুষ বনের নিরস্ত্র অবোধ-জন্তুকে চুপিচুপি মেরে শিকারীর গৌরব পাচ্ছে, বোমা ফেলে হাজার হাজার স্ত্রীলোক আর শিশুকে হত্যা করে দেশপ্রেমিক বলে সম্মান পাচ্ছে, আর আমি বনের মধ্যে একটা দু'টো মানুষকে মারলেই যত দোষ হবে?"

পুরন্দর বুঝল সে এক উন্মাদের কবলে পড়েছে। ভয় তার হ'ল না, বিপদে পড়তে সে অভ্যস্ত। খালি ভাবতে লাগল কি করা যায়। কর্ণেল লিন্ আবার বললেন, "তবু তো আমি ভাল। আমার শিকারকে আমি পেট ভরে খাওয়াই, হাতে অস্ত্র দি', জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে তাকে তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় পালিয়ে যাবার জন্য। তারপর কেবল মাত্র ছোট একটি পিস্তল নিয়ে শিকারে বেরোই। এমন কি কথা থাকে যে তিন দিন যদি সে লুকিয়ে থাকতে পারে তা হ'লে তাকে নির্ব্বিঘ্নে তার দেশে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার নিজের জাহাজ। অবশ্য এ পর্য্যন্ত কাউকে পৌঁছে দিয়ে আসার দরকার হয় নি।"

—"কি ভয়ানক কথা!"

—"ভয়ানক মোটেই নয়, পুরন্দর বাবু! চলুন না একদিন আমার সঙ্গে। দেখবেন এতে কি আনন্দ। আজই আসুন না? আজ চমৎকার একটা মালয় খালাসীকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে।"

পুরন্দর ঘৃণাভরে বলল, "না, কর্ণেল, আপনার আনন্দ আপনারই থাকুক, আমি কাল ভোরেই চলে যাব।"

একটু হেঁসে কর্ণেল লিন্ বল্লেন, "সে কি কথা! যাওয়ার কথা এখনই কি? তা' আজ না হয় থাক, ক্লান্ত আছেন আপনি। আচ্ছা, নমস্কার। হ্যাঁ, ভাল কথা। বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না, কুকুরগুলো খোলা থাকে কিনা! মধ্যে মধ্যে মানুষ খেতে পেয়ে ব্যাটারা এক একটা নেকড়ে বাঘ হয়ে উঠেছে যেন।"

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন পর দিন দুপুরের খাওয়ার একটু পরেই। পুরন্দরকে দেখে বললেন, "এই যে! কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমার কিন্তু ওদিকে বিশেষ সুবিধে হ'ল না, সহজেই কাজ হয়ে গেল। এই খালাসীগুলো দেখছি—"

তাঁকে বাধা দিয়ে পুরন্দর দৃঢ়স্বরে বল্ল, "আপনাকে

অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকব না।"

যেন আশ্চর্য্য হয়ে কর্ণেল বললেন, "তা'ও কি হয়? আমি যে ঠিক করে রেখেছি আমি আর আপনি আজই শিকারে বে'রোব!"

পুরন্দর মাথা নাড়িল। দেখে কর্ণেল লিন্ গম্ভীর হয়ে বললেন, "যাবেন কোথা? আমাকে খেলায় না হারিয়ে এ দ্বীপ থেকে বেরোবার নিয়ম নেই তো! যারা খেলতে না চায় তাদের সায়েস্তা করে ফু-চিংএর চাবুক আর কুকুরের পাল। সেটা কি আপনার বেশী পছন্দ হবে?"

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পুরন্দর,—"তার মানে?"

—"মানে হচ্ছে এই যে খাবার পোষাক আর এক-খানা ছোরা নিয়ে আপনাকে জঙ্গলে যেতে হবে। ফু চিংএর কাছে চাইলেই সব পাবেন। রবারের জুতোও পাবেন, তা' পরলে পায়ের ছাপটা মাটিতে তত স্পষ্ট ভাবে পড়বে না, লুকোবার সুবিধে হবে আপনার। এখনও ঘণ্টা তিনেক বেলা আছে, চটপট বেরিয়ে পড়ুন। আমি শিকারে বেরোব সন্ধ্যার খাওয়ার পর। এখন একটু বিশ্রাম করি গিয়ে। নমস্কার!"

পিঠে খাবারের থলি, কোমরে ছোরা, পায়ে রবারের জুতো পরা, পুরন্দর দু'ঘণ্টা ধরে বনের মধ্যে পাগলের মত ছুটোছুটী করল। কি করবে, কোথায় লুকোবে, ধরা পড়লেই বা কর্ণেলের পিস্তলের থেকে কি ক'রে আত্মরক্ষা করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না সে। মাথা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। একটা উঁচু টিলায় উঠে সে দেখল যে চারদিকে সমুদ্র, অন্য কোনও দ্বীপ দেখা যায় না যেখানে সাঁতরে গিয়ে ওঠা যেতে পারে। বনের পশুরা শিকারীর তাড়া খেয়ে যত রকম কায়দায় তাকে এড়াবার চেষ্টা করে তা সব একে একে সে মনে ক'রে আনতে লাগল। তারপর এঁকেবেঁকে, ঘুরে-ফিরে, পায়ের চিহ্ন যাতে না পড়ে এমন সব জায়গা দিয়ে চলতে লাগল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই সে সন্তর্পণে একটা বড় গাছে চড়ে তার ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। কার সাধ্য সন্ধান পায়?

রাতটা কেটে গেল। ভোরবেলা উঠে সে ভাবছে যে এখন কোন্ দিকে যাবে, এমন সময় কিছু দূরে একটা ঝোপ থেকে দু'টো পাখী উড়ে যাওয়ার শব্দে সে চেয়ে দেখতে পেল কর্ণেল লিন্ আসছেন। শিকারী কুকুরের মত মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি এগোচ্ছেন, সামান্য ছেঁড়া ঘাস বা ভাঙা কাঠির টুকরোটুকুও তাঁর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে রইল পুরন্দর। কর্ণেল দেখতে দেখতে গাছের তলায় এসে হেঁট হয়ে জমিটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। পুরন্দর ভাবল যে ছোরা খুলে চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে কর্ণেলের ঘাড়ে, কিন্তু তাঁর হাতে পিস্তল দেখে চুপ ক'রে রইল জমি পরীক্ষা শেষ করে কর্ণেল গাছটা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। তারপর গুণ্ গুণ্ ক'রে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি ফিরে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। তিনি যে পুরন্দরকে দেখতে পেয়েছেন তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইঁদুরকে পেলেই কি বেড়াল তাকে তখনই মেরে ফেলে? কর্ণেলও এত শীগ্‌গির খেলাটা শেষ করতে চান না দেখা যাচ্ছে। ভাবতে পুরন্দরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সে আবার ছুটল। এক জায়গায় একটা মরা গাছ আর একটা গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে। দেখেই সে থামল। খানিকক্ষণ ধরে সেখানে কি যেন ক'রে সে কাছাকাছি একটা বড় গাছে উঠল। একটু বাদেই কর্ণেল ঠিক তার আসার পথে চিহ্ন খুঁজে খুঁজে এগিয়ে আসছেন দেখা গেল। মরা গাছটার কাছে এসেই লাফিয়ে পেছনে হটে এলেন তিনি, কিন্তু তবু গাছটা দড়াম্ ক'রে তাঁর কাঁধ ঘেঁষে পড়ল। কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে কর্ণেল চেঁচিয়ে বললেন, "পুরন্দর বাবু! চমৎকার ফাঁদ পেতেছিলেন দেখছি! মাথাটা গিয়েছিল আর কি! আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, কাঁধটা ব্যাণ্ডেজ করিয়েই ফিরে আসব আবার।"

কর্ণেল চলে যেতেই পুরন্দর আবার চলতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা সে একটা জলার ধারে এসে পড়ল। জলের ভিতর দিয়ে গেলে পায়ের কোনও চিহ্ন থাকবে না ভেবে সে যেই জলে নেমেছে অমনি কাদায় তার কোমর পর্য্যন্ত ডুবে গেল। অতিকষ্টে উঠে এসে সে একটা বড় গর্ত খুঁড়ল পাঁকের মধ্যে। আর কতকগুলি গাছের ডাল

টে তার একদিক্ সরু করে সেগুলো গর্ত্তের তলায় গা-উঁচু করে পুঁতল। তারপর কাঠি আর লতা দিয়ে টা চাটাই বুনে সেটা গর্ত্তের মুখে বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে ।।

ঘণ্টা দুই বাদে একটা গাছের আড়ালে থেকে পুরন্দর তে পেল কর্ণেলের ভারী জুতোর শব্দ। একটু পরেই র কাণে এল মড় মড় ক'রে ফাঁদের ঢাকনাটা ভাঙ্গার ওয়াজ আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা মরণ-গর্জ্জন। র্ণেলের গলা শোনা গেল, "বাহবা পুরন্দর বাবু! পনার বর্ম্মী বাঘ-ধরা ফাঁদে আমার সেরা কুকুরটা পড়ে ল। আচ্ছা, এবার আমার সমস্ত দলবল নিয়ে সতে যাচ্ছি, এবার সামলান নিজেকে।"

আবার চলতে লাগল পুরন্দর। ঘণ্টা চারেক হেঁটে ক্লান্ত লাগতে লাগল তার। একটা গাছে উঠে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে আবার চলতে চলতে কটা টিলার উপর উঠতেই সে দেখে যে একটা ফাঁকা গায় প্রায় সিকি মাইল দূরে কর্ণেল আসছেন। তাঁর মনে আসছে ফু-চিংএর বিরাট্ দেহ, পাঁচটা কুকুরের কল তার হাতে ধরা। আর দেরী করা চলবে না। াণ্ডা দেশের জংলীদের একটা কৌশল পুরন্দরের মাথায় লে গেল। পথের ধারের একটা চারাগাছকে নুইয়ে 'তে একটা লতা ছিঁড়ে বাঁধল সে। তারপর সেটার থায় ছোরাখানাকে বসিয়ে রেখে দৌড়তে গল। ততক্ষণে তাকে দেখতে পেয়ে গেছে শিকারী টা। ছুটতে ছুটতে পুরন্দর সমুদ্রের ধারে পৌঁছে ল। সে মন ঠিক করে ফেলেছে। ঝাঁপ দেবার াগে সে একবার ফিরে দেখল, কুকুরগুলো মাত্র শ' হাত দূরে, আরও শ' দুই হাত পিছনে কর্ণেল ন্ আসছেন; কিন্তু ফু-চিং কোথায়? ভাববার আর য় নেই, বিশ হাত নীচে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরন্দর। কর্ণেল যখন এসে পৌঁছলেন তখন কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই।

কর্ণেল লিন্ বাড়ী ফিরে এলেন সন্ধ্যার পর। তাঁর মনটা খারাপ লাগতে লাগল। একে তো ফু-চিংকে হারাতে হয়েছে, পুরন্দরের ফাঁদের ছোরা তার গলায় গেঁথে গিয়েছিল। অমন চাকর সহজে পাওয়া যাবে না আর একটা। তার ওপর আবার শিকারটাও হাত-ছাড়া হ'ল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি ক্রমে অক্ষম হয়ে পড়ছেন? যাক্ গে, আপশোষ বেশী নেই; খেলাটা ভাল জমিয়ে ছিল পুরন্দর। ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে নইলে কি খেলে সুখ হয়?

রাত অনেক হ'লে শোবার ঘরে এলেন কর্ণেল লিন্। দরজা বন্ধ ক'রে একবার জানলার ধারে দাঁড়ালেন। নীচে পাঁচটা কুকুর পাহারা দিচ্ছে। ফিরে দাঁড়িয়েই তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এল, আর কেউ নয়,—পুরন্দর।

স্থিরভাবে পুরন্দর বল্‌লে, "ফিরেই এলাম, কর্ণেল লিন্! ভাবলাম, খেলাটা শেষ ক'রেই যাই। আর, পৃথিবীর সব চেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ারটাকে নিজের হাতে শিকার করবার লোভও সামলাতে পারলাম না। অনেকটা পথ সাঁতরে এসে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে এর জন্য। প্রস্তুত হ'ন, কর্ণেল!"

কর্ণেল তাকে অভিবাদন ক'রে বল্‌লেন, "বাহাদুর শিকারীর মত কথাই বলেছেন আপনি। আসুন, পুরন্দর বাবু, আমি প্রস্তুত।"

ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে কর্ণেলের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল পুরন্দর।

সেই রাত্রিতে একটা মৃতদেহ দিয়ে কুকুরগুলির ভোজ হ'ল, কিন্তু বেচারীরা জানলও না যে সে মৃতদেহ কর্ণেল লিন্-হুয়াংএর। *

* বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—আট—

মথুরা ও বৃন্দাবনের মাঝে যোজনের পর যোজন ব্যেপে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দিগন্তে মিশেছে সেখানে গ্রীক্ হিনীর ছাউনি পড়েছে। সেনাপতি দিমিত্রিয়াস ও নতিওকাসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সম্রাট্ মিনান্দার ই স্থানটীই মনোনীত করেছেন। এখানে দু'টী নগরীর াগাযোগ ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজন-মত দু'টী গরীই লুণ্ঠন করে গ্রীক সেনারা খাদ্য ও সম্পদ্ আহরণ রছে। মিনান্দার ঠিক করেছেন এখানেই মগধ-সম্রাটের ট না আসা পর্য্যন্ত তিনি বিশ্রাম করবেন, এবং সেই সরে বৃন্দাবনের শত শত মন্দির থেকে ধনরত্ন আহ- করবেন; তারপর অগ্রসর হবেন মগধের দিকে। ধের সিংহাসনের উপর তাঁর লোভ বহুদিনের। উত্তরা- থে যত বড়ই রাজ্য থাক না কেন, মগধের সিংহাসনে বসতে পারলে সত্যিকারের ভারত-সম্রাট্ হওয়া য় না। সেইজন্য তিনি এবার যতটা প্রয়োজন প্রস্তুত ই এসেছেন। মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন না লে তিনি যে বিনিময়-মূল্য চেয়েছেন সেটা শুধু একটা নীতির চাল মাত্র। মগধ থেকে অশ্ব, হস্তী ও অর্থ স পড়লে তাঁর শক্তি বাড়বে, তখন সাম্রাজ্য আক্রমণ া আরো সহজ হবে। সেই ক'দিন একান্তে বিশ্রাম াই মিনান্দারের উদ্দেশ্য। আলেক্‌জান্দার যা করতে রেন নি, মিনান্দার তা-ই করবেন—তিনি হবেন লেকজান্দারের চেয়েও বড়।

মিনান্দারের এখন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম!

সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি মগধ জয়ের পরিকল্পনা করছেন। বস্ত্রাবাসের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাত জায়গায় পলি-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। গ্রীক্ শিল্পী সেই পলিমাটির উপর উত্তর ভারতের একখানি মানচিত্র এঁকেছেন। মিনান্দার অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সেই মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করছেন—কতটা তিনি অধিকার করেছেন আর কতটা অধিকার করতে বাকি আছে। এবং কোন্ পথ দিয়ে পাটলিপুত্রে অভিযান করা সহজ হবে, পথে কতগুলি নগরীর সম্পদ্ লুণ্ঠন করা যাবে, এই সব নিয়ে চলছে আলোচনা।

শিল্পী বুদ্ধিমান্, ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্যই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন; তথাপি সম্রাট্‌কে খুসি করার জন্য মানচিত্রের মিনান্দারের অধিকৃত স্থানই বড় ক'রে দেখিয়েছেন। সেই মানচিত্রের পানে তাকা-লেই দেখা যায় উত্তরাপথের অর্দ্ধেকের উপর গ্রীকেরা অধিকার করেছে। তার উপর গান্ধার, কপিসা ও কফি-রিস্তান তো আছেই। বিজয়গৌরবে মিনান্দার দৃপ্ত হয়ে উঠলেন, ভারত সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তিনি পাত্রের পর পাত্র মধু পান ক'রে চললেন। তখনকার দিনে সুরা ভারতে প্রস্তুত হ'ত না, মধুই ছিল এক-মাত্র মাদক পানীয়। মিনান্দার কয়েক পাত্র মধু নিঃশেষ ক'রে কোন এক সময়ে উৎফুল্ল মনে ব'লে উঠলেন—"শীঘ্রই ভারতের মুদ্রায় সম্রাট্ মিনান্দারের মূর্ত্তি মুদ্রিত

হবে। কিন্তু সেই চিহ্নকে স্থায়ী করতে হ'লে এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হবে, প্রাকৃত ভাষাটা রীতি-মত শিখে নিতে হবে। দিমি আর আন্তি (দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাস), তোমরা দু'জনে আজই আমার জন্য একটা হিন্দু পণ্ডিত যোগাড় করে দাও, যত শীঘ্র সে আমাকে শেখাবে তত বড় জায়গীর তাকে আমি বখশিষ দেব।"

দিমিত্রিয়াস হাসলেন, বললেন—"হিন্দুদের আপনি এখনও সম্যক্‌ভাবে চিনতে পারেন নি সম্রাট্‌! ভালো পণ্ডিত কেউ আসবে না। যাদেরকে তারা দেশের শত্রু মনে করে. জীবন থাকতে তাদের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে না।"

মিনান্দার বললেন—"অর্থ দেব, যত অর্থ সে চাইবে। অর্থ দিয়ে, জায়গীর দিয়ে তার মাথা কিনে নেব।"

আন্তিওকাস বললেন—"হিন্দু পণ্ডিতেরা অর্থের কোন মূল্য দেয় না সম্রাট্‌! গাছতলায় বসে তারা অধ্যাপনা করে। দিনে একবার তারা অন্নগ্রহণ করে। মানুষের মঙ্গলের চিন্তায় তারা জীবন উৎসর্গ করে। এদের এক পণ্ডিত নাকি নিজের বুকের পাঁজর দিয়ে শত্রুকে মারবার অস্ত্র তৈরী ক'রে দিয়েছিল! এদেশের পণ্ডিতেরা প্রত্যেকেই এক-একটী ছোটখাট সক্রেটিস!"

গ্রীক্‌ সম্রাটের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি আর এক পাত্র মধু নিঃশেষ ক'রে ফেললেন।

এমন সময় প্রতিহারী এসে জানালো—একজন হিন্দু সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আন্তিওকাস বললেন—"কি দরকার জিজ্ঞাসা কর।"

—"বললো, সম্রাটের কাছে সে সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে।"

—"সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে!"—আন্তিওকাস সম্রাটের মুখের পানে তাকালেন।

সম্রাট্‌ আদেশ দিলেন—"বেশ, হিন্দুকে নিয়ে এসো।"

প্রতিহারী অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটীকে সঙ্গে ক'রে বস্ত্রাবাসের ভিতর নিয়ে এলো সে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্মণ; ভরতপুর প্রাসাদে রাজা কুমারসেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে তাকে আমরা দেখেছি।

ব্রাহ্মণ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে গ্রীক্‌ সম্রাট্‌কে নমস্কার করলো, উচ্চারণ করলো—"সম্রাটের জয় হোক।"

সম্রাট্‌ মিনান্দার, আন্তিওকাস ও দিমিত্রিয়াস তীক্ষ্ণ চোখে ব্রাহ্মণের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিলেন, তারপর মিনান্দার বললেন—"কি চাই তোমার?"

মিনান্দার যে ভাষায় কথা বললেন তা গ্রীক ভাষা নয়। আলেকজান্দার ভারত অভিযান করার পরে, মগধ রাজ্যের পার্শ্বেই গ্রীক রাজ্যের সীমানা এসে পৌছায় এবং গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তার ফলে এই দুই জাতির পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়,—প্রাকৃত এবং গ্রীক ভাষার এক খিচুড়ী। মিনান্দার সেই ভাষাতেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণও সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন—"আমি আপনার কাছে সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছি।"

—"কি সংবাদ?"

—"প্রয়োজনীয় সংবাদ সম্রাট্‌। শুনলেই আপনি তার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।"

—"বেশ, বলুন। সংবাদ মূল্যবান্‌ হ'লে আমি আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দেব।"

—"বিত্ত ও সম্পদে আমার কোন প্রয়োজন নেই সম্রাট, আমার প্রয়োজন শুধু প্রতিহিংসার। আপনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিন আমার সেই প্রার্থনা পূরণ করবেন।"

—"যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয় আপনার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবো না।"

—"আপনার জয় হোক সম্রাট্‌!"

ব্রাহ্মণ অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই এবার আসন গ্রহণ করলেন, তারপর বলতে সুরু করলেন—"আমার সংবাদ বলার আগে আমার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এখন আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মাণ মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বজীবনে আমি ছিলাম বিদর্ভ রাজকুমার সুমতিসেন। আমাদের রাজা হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। ভগবান্‌ বুদ্ধ যখন রাজগৃহের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর শত্রু দেবদত্ত মহারাজ অজাতশত্রুকে প্ররোচিত করে শাক্যমুনির প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কাছাকাছি এক পাহাড়ের চূড়ায় এক নিক্ষেপণী-যন্ত্র স্থাপনা করে তথাগতের উপর কীলক নিক্ষেপ করে। সেই নিক্ষিপ্ত কীলকে শাক্যমুনির জীবনান্ত ঘটতো, কিন্তু এক ভিক্ষু যথাসময় দেখতে পান, এবং নিজে কীলকের আঘাত গ্রহণ করে শাক্যসিংহের প্রাণ রক্ষা করেন। সেই ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বজীবনে গৃহী ছিলেন, তাঁর পুত্রকন্যাও ছিল। সম্রাট্‌ অশোক যখন রাজা হলেন তখন সেই ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের পুত্র মাধবসেনকে বিদর্ভের শাসন কার্য্যে নিয়োগ করেন। মাধবসেন থেকে আমি হ'লাম সপ্তম পুরুষ। আমি যখন বিদর্ভের শাসনভার গ্রহণ করি তখন আমার বয়স ছিল অল্প, রাজকাজে সম্যক্‌ জ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে সেনাপতি বীরসিংহ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। আমার ভাই কুমারসেনকে হত্যা করে। আমি কোন রকমে পালিয়ে আসি। আমার বোন মালবিকাকে সে ভরতপুরের দুর্গে বন্দী করে রেখেছে। আপনার সাহায্যে আমি বোনের বন্ধন মোচন করতে চাই।"

দিমিত্রিয়াস এবার কথা বললেন—"অর্থাৎ, তোমার জন্য আমরা এখন ভরতপুর আক্রমণ করবো, এই তোমার অভিপ্রেত? কিন্তু তোমার হয়তো জানা নেই যে মগধ-সম্রাটের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে, গ্রীক্‌ সেনা আর অগ্রসর হবে না। মগধ-সম্রাট আমাদেরকে ফিরে যাবার খরচ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই টাকাটা এসে পড়লেই আমরা এখান থেকে বস্ত্রাবাস তুলে নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করবো।"

—"সে খবর আমার অজ্ঞাত নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবরটা হয়তো আপনাদের জানা নেই। পাটলিপুত্র থেকে যে অশ্ব, হস্তী ও সুবর্ণ আসছে তা আপনাদেরকে খুসি করবার জন্য আসছে না, আসছে আপনাদেরকে কিছুদিন শান্ত রাখার জন্য। এই অবসরে মাগধী সেনা প্রস্তুত হচ্ছে। ওই উপঢৌকনের পিছনে আসছে দশ হাজার হস্তী ও আড়াই লাখ মাগধী সেনা। আপনারা উপঢৌকন নিয়ে যেই ফেরার পথে পা বাড়াবেন, অমনি পিছন থেকে আপনাদেরকে মাগধী সেনা আক্রমণ করবে।"

—"মগধে দশ হাজার রণহস্তী আছে?" —মিনান্দার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আন্তিওকাস বললেন—"তোমার কথার সত্য-মিথ্যা প্রমাণ কি?"

সুমতিসেন বললেন—"গূঢ়পুরুষেরা (চর) যে সব সংবাদ আনে সে সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তোলা রাজ-ধর্ম্ম নয়, সেই সম্পর্কে যথা বিহিত ব্যবস্থা করাই হ'ল রাজকর্ত্তব্য। তথাপি প্রমাণ স্বরূপ আমি বলতে পারি যে ভরতপুরের কোন খবর রাখলে আপনারা এ কথা তুলতেন না। মগধ-সম্রাটের নির্দ্দেশে ভরতপুর দুর্গের সাধারণ বাসিন্দাদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে, প্রতিদিন সেখানে নতুন সৈন্য আসছে। এইটীই হবে একটি আক্রমণ-কেন্দ্র।"

—"আমি যদি বলি মগধ-সম্রাট্‌ আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছেন।"

—"তাও বলতে পারেন। আমি কোন বিতর্ক করবো না, আমি শুধু আপনাকে এইটুকুই বলতে চাই যে অবিলম্বে ভরতপুর দখল না করলে আপনার উত্তরাপথ জয়ের স্বপ্ন কল্পনার বিলাস মাত্র হবে!"

—"উত্তরাপথ জয়ের স্বপ্ন!"—মিনান্দারের চোখ দু'টি কুঁচকে উঠলো।

সুমতিসেন কিন্তু এতটুকু ভয় পেলেন না, বললেন,—"যদি পাটলিপুত্র জয় করতে না পারলেন তা হ'লে সুদূর কপিশা থেকে মথুরা অবধি আপনার আসার কি প্রয়োজন ছিল সম্রাট্‌? আলেকজান্দার পঞ্চনদ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ব্যকত্রিও-আনতিওকাস কুরুক্ষেত্রের ঊষরতা অতিক্রম করতে ভয় পেয়েছিলেন, আর আপনি ভরতপুর পর্য্যন্ত এসে যদি ফিরে যান তা হ'লে যারা গ্রীক জাতিকে দিগ্বিজয়ী বলে মনে করে তারাই বলবে গ্রীকেরা ভীরু, সত্যিকারের বড় শক্তির সামনে দাঁড়াবার মত সাহস তারা রাখে না।"

সুমতিসেন চুপ করলেন। মিনান্দার, দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাস কিছুক্ষণ কেউ কোন কথাই বললেন না। সমস্ত বস্ত্রাবাস থম্‌ থম্‌ করতে লাগলো। সুমতিসেন শুধু দেখতে লাগলেন তাঁর বক্তৃতা গ্রীক সম্রাটের মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া করছে।

কয়েক পল পরে মিনান্দার নিজেই কথা বললেন,—"তুমি চাও আমি ভরতপুর জয় করি এবং পাটলিপুত্র আক্রমণ করি? কিন্তু তা'তে তোমার লাভ?"

সুমতিসেন হাসলেন, বললেন,—"আমার লাভের কথা তো আপনাকে বলেছি সম্রাট্‌। আমি চাই প্রতিহিংসা!

বীরসিংহের দু'টী চোখ উপড়ে নিয়ে পথে ছেড়ে দেব, অন্ধ ভিক্ষুকের মত সে ভিক্ষা করবে, সেইদিন আমার ভ্রাতৃহত্যার তর্পণ হবে। আপনি ভরতপুর জয় করলে সেইটাই হবে আমার লাভ। আর পাটলিপুত্রের ব্যাপারে সম্রাট্ বৃহদ্রথের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে যে যখন তাঁর দরবারে বীরসিংহের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগ করেছিলাম, তিনি প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থাই করেন নি। যিনি প্রজাপুঞ্জের উপর সুবিচার করতে পারেন না সেই সম্রাট্ থাকা না-থাকায় আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মিনান্দার বোধ হয় সব ব্যাপারটা নিজের মনের মাঝে তোলাপাড়া করে নিলেন; তারপর বললেন,—"তুমি ভরতপুর দুর্গ জয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও?"

—সাহায্য নয় সম্রাট্, আমি দুর্গ জয় করে দেব। সামান্য দশ হাজার মাত্র সৈন্য পেলেই চলবে। শুধু বীর সিংহকে আমি জীবন্ত ধরতে চাই।"

—"মাত্র দশ হাজার সৈন্য? বেশ। কবে তুমি আক্রমণ করতে চাও?"

—"আপনার সৈন্য ও সেনানায়ক প্রস্তুত থাকলে আ —এখনই যাত্রা করতে পারি। শুভস্য শীঘ্রম্। ভালো কা অযথা বিলম্ব করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

—"দিমিত্রিয়াস, সেনানায়ক লিওনিদাসকে এখন দশ হাজার সৈন্য সহ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দে কর গে। আর আন্তিওকাস, তুমি এই ব্রাহ্মণের স যাবে। যদি ব্রাহ্মণ কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতার চে করে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করবে।"

দু' দণ্ডের মধ্যে সম্রাট্ মিনান্দারের আদেশ পালি হ'ল। রাত্রির অন্ধকারে সুমতিসেনের নেতৃত্বে দ হাজার সেনা ভরতপুরের পথে যাত্রা করলো। [ক্রমশ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

মগজের গল্প

"আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে!"

কবি সুকুমার রায়ের এই মজার কবিতাটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ, এবং অনেকের হয়তো মুখস্থও আছে। বাস্তবিক, কারও বুদ্ধিশুদ্ধি কম হ'লে আমরা ঠাট্টা ক'রে বলি—'লোকটার মাথায় একদম ঘিলু নেই' বা 'লোকটার ঘিলু একদম পচা!' কখনও বা আর এক কাঠি বাড়িয়ে বলি, 'ওর মগজ ভরা গোবর!'

এই মগজ বা ঘিলু জিনিষটা কি? সাধু ভাষায় মগজকে বলা হয় মস্তিষ্ক এবং এই মস্তিষ্কই হ আমাদের শরীরের প্রধান অঙ্গ। এরই সাহায্যে আম দের অনুভূতি বা বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশ স্মৃতিশক্তি,—স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, রাগ, অভিমান, বুদ্ধি, লোভ, হিংসা—এক কথায় ভাল-মন্দ সমস্ত গুণা পরিচালিত হচ্ছে। এর বিকৃতি ঘটলে মানুষ পা হয়ে যায়, এর উপর অল্প আঘাতে মানুষ অজ্ঞান হ যায়, বেশী আঘাতে মৃত্যু ঘটে।

মগজ জিনিষটা কিন্তু অত্যন্ত নরম। এত নরম

অতি সামান্য আঘাতে অনেক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটতে পারে। এজন্য একটা সুদৃঢ় খোলের মধ্যে জিনিষটি পোরা থাকে। ঐ শক্ত খোল হচ্ছে আমাদের মাথার খুলি—যাকে ভালো কথায় বলা হয় করোটি।

এই মগজ তৈরী হয়েছে অনেকগুলি স্নায়ুপিণ্ড দিয়ে —আর এই স্নায়ুপিণ্ডগুলি রক্তবাহী নালি দিয়ে ঘেরা। টেলিগ্রাফের তারের মত অসংখ্য স্নায়ু মগজ থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে আছে, এবং ঠিক টেলিগ্রাফের তারের মতই মগজ থেকে এই সব স্নায়ু দিয়ে খবর সরবরাহ হচ্ছে। ধর, তোমার সামনে কোন একটা দৃশ্য রয়েছে, চোখ দিয়ে তুমি তা দেখলে। সেই দেখার খবর স্নায়ু দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মগজে চলে যাবে, এবং তারই ফলে তুমি সে দৃশ্যটি টের পাবে। যদি তা না যেত তা হ'লে চোখে দেখলেও তুমি তা টের পেতে না। দেখার মত শোনা, ছোঁয়া বা অন্যান্য অনুভূতি বা প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

তোমরা কখনও মগজ চোখে দেখেছ? জ্যান্ত নয়, মরা মানুষের মগজের কথা বলছি। অন্ততঃ পক্ষে মগজের মডেল? অনেক ডাক্তারখানায় বা ডাক্তারী শেখাবার স্কুল-কলেজে এই ধরণের মডেল বা আসল মগজ সংরক্ষিত থাকে। অনেক যাদুঘরেও এ রকম মগজ সংরক্ষিত আছে। বাইরে থেকে জিনিষটা দেখতে এক তাল কাদার মত, কিন্তু কেমন পাকানো পাকানো! ভিতরের অংশটা তরল, সাদা স্নায়ুমজ্জা দিয়ে তৈরী। তার ওপর আরও একটা ধূসর রংএর মজ্জার স্তর আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই স্তরের গড়নের ওপর মগজের শক্তি কম না বেশী তা অনেকটা নির্ভর করে। ইতর প্রাণীর মগজ মানুষের মত ওরকম পাকানো নয়। আবার দেখা গেছে, সভ্য জাতের মানুষের মগজ অসভ্য জংলী মানুষের মগজের তুলনায় অনেক বেশী পাকানো।

মগজের ওজন কত জান? এক জন সুস্থ পুরুষ মানুষের মগজের ওজন প্রায় দেড় সের। যে সব লোক বেশী বুদ্ধিমান্ বা বেশী মাথার কাজ করতে পারে তাদের মগজের ওজন অনেক সময় আরও বেশী হয়। পুরুষের চাইতে মেয়েদের মগজের ওজন কম হয়। একজন সুস্থ স্ত্রীলোকের মগজের ওজন এক সের থেকে সওয়া সের হবে। অনেকের আরও কিছু কম,—তিন পোয়া হ'তেও দেখা গেছে। এ থেকে বোঝা যায় মেয়েদের চাইতে ছেলেদের মানসিক শক্তি স্বভাবতঃই বেশী। নীচের ছবিতে দেখ, পাশাপাশি নানা ধরণের লোকের

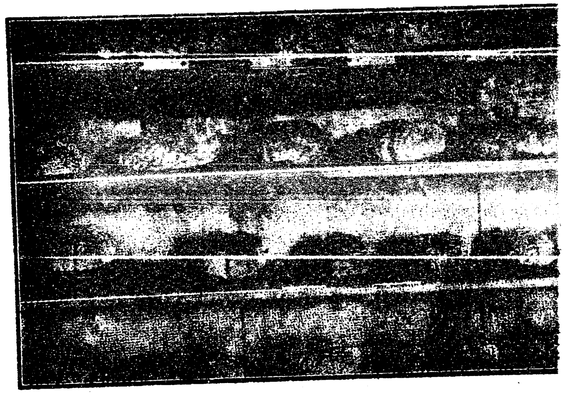

পাশাপাশি নানা ধরণের মগজের নমুনা

মগজ পরীক্ষার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের, বৈজ্ঞানিকের, লেখকের, কৃষকের মজুরের, কারিগরের, এমন কি পাগলের মগজও আছে। বিজ্ঞানীরা এগুলো পরীক্ষা ক'রে নানা তথ্য জানতে পেরেছেন। এগুলো অবশ্য মডেল,—আসল মগজের হু নকল!

মানুষের তুলনায় অন্য জীবজন্তুর বুদ্ধি যে অনে কম তারও পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মগজ পরী করলেই। একটা ঘোড়ার মগজের ওজন আধ সেরে বেশী হবে না। হাতীর তো ঐ বিরাট চেহা মানুষের কত গুণ তার ঠিক নেই!—কিন্তু একটা হাতী মগজের ওজন মানুষের মগজের ওজনের চাইতে বেশী নয়—বড় জোর তিনগুণ মাত্র! সাধে কি ত বলে হস্তিমূর্খ!

জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য স্মৃতি-মন্দির বা স্তম্ভ তৈরী করার রেওয়াজ পৃথিবীর প্রায় সব শই সর্ব্বযুগে চলে আসছে। পিরামিড, তাজমহল তি সমাধি-মন্দিরগুলিও এরই মধ্যে পড়ে। প্রথম যুদ্ধে যে সব সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল তাদের জন্যও া জায়গায় এই রকম স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল। কাতার গড়ের মাঠে 'সেনোটফ' তোমরা অনেকেই থছ। গোলদীঘিতেও বাঙ্গালী সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ দিও খুব ছোট্ট) বোধ হয় ও-অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের ছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার অধিবাসীরা নিহত আমেরিকান্ সৈন্যদের জন্য যে স্মৃতিস্তম্ভের রকল্পনা করেছে তা যেমন নতুন ধরণের, তেমনি শ্চর্য্যজনক। ইট-পাথর দিয়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ তারা রী করতে চায় না—এই স্মৃতিস্তম্ভ তারা তৈরী করতে জীবন্ত গাছ দিয়ে।—জীবন্ত অথচ চিরস্থায়ী।

কথাটা শুনলে একটু অবাক্ লাগে বৈকি! গাছ, তা সে যত পুরোনোই হোক, একদিন তার শেষ বই। তা ছাড়া আমেরিকার মত দেশে, যেখানে ধারণ অনেক বাড়ীঘরই অন্য দেশের মিনার-টাওয়ার ত্যাদির চাইতে উঁচু, সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ হ'তে পারে মন কি গাছ আছে? সেই কথাই বল্‌ব।

তোমরা ক্যালিফোর্ণিয়ার রেড্‌উড্ গাছের নাম নেছ কি? উদ্ভিদ-রাজ্যের এ এক বিরাট্ বিস্ময়। াইন গাছের মত মন্দিরের আকৃতির গাছগুলি, কিন্তু ম্বায় এক একটি ১৫০, ২০০ এমন কি ৩০০ ফুটও ছাড়িয়ে য়। অর্থাৎ দিল্লীর কুতুব মিনারের সঙ্গে তারা সমানে াল্লা দিতে পারে—কে মাথায় বড়! শুধু লম্বায়ই বড় য়, বেড়ও তার তেমনি। এমন অনেক রেড্‌উড্ াছে যাদের গুঁড়ির ভিতর ছেঁদা ক'রে নিলে তার ভতর দিয়ে একটা বড় মোটর লরী অনায়াসে চলে েতে পারে। কিছুদিন আগে এই রকম একটা গাছ কটে দেখা গিয়েছিল তা থেকে যে তক্তা বেরোল তা দিয়ে অনায়াসে বেশ বড় বড় একশ'টি কাঠের ঘর তৈরী করা যায়। সে কাঠ শুধু পরিমাণেই বেশী নয়, যেমন স্থূণ তেমনি মজবুত অথচ হাল্কা। আবার তার আর একটা মস্ত গুণ, তার মধ্যে এমন একটা রাসায়নিক মশলা মেশান আছে যার জন্য উই, ঘুণ বা ঐ রকম পোকা তা নষ্ট করতে পারে না।

এক-একটি রেড্‌উডের আয়ু কত জান? কম ক'রে ১৫০০—২০০০ বছর তো বটেই, সময় সময় আরও বেশী। গাছের বয়স কি ক'রে ঠিক করে জান তো? গাছের গুঁড়ি চিরলে তার মধ্যে বড় বড় আংটির মত দাগ দেখা যায়। ঐ দাগের সংখ্যা দেখে পণ্ডিতেরা সহজেই বলে দিতে পারেন গাছের বয়স কত হয়েছে। রেড্‌উড পাইন জাতীয় গাছ। এর বংশও বাড়ে ঠিক পাইনের মত ক'রে—সাধারণ গাছের মত নয়। এ গাছে ফল হয় না, গাছের ডাল থেকে ঝরে পড়ে 'কোন্' আর তার মধ্যে থাকে খোলা বীজ। তাই থেকেই আবার জন্মায় নতুন গাছ। শুধু তাই নয়, এর আর একটা গুণ—এ গাছ কেটে ফেললে বা পুড়িয়ে ফেললেও মরে না। শিকড় নষ্ট না হ'লে আবার তা থেকে নতুন গাছ গজায়। আবার অনেক সময় গাছ মরে গেলেও তার সাবেক গুঁড়ি থেকে নতুন নতুন ডাল গজিয়ে নতুন গাছের সৃষ্টি করে। এ রকম একটা গুঁড়ি থেকে অনেকগুলি গাছ হ পারে। এই নতুন গাছগুলিকে পুরোনো গাছের বংশ না ব'লে পুরোনো গাছের পুনর্জ্জন্ম বলতে পার। এই জন্যই ওদেশের লোকে বলে রেডউড্ গাছ অমর; তার আয়ু হাজার বছর দিয়ে মাপা যায় না—মাপতে হয় লক্ষ লক্ষ বছর দিয়ে।

রেডউড্ গাছের বন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন সে এক আশ্চর্য্য জিনিষ। শত শত ফুট উঁচু থামের মত অসংখ্য মোটা মোটা গাছের থাম পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে আকাশের দিকে উঠে গেছে। ওপরে ঘন সবুজ পাতার চাঁদোয়া, দূর থেকে দেখলে সারি সারি ঢেউ-খেলানো মন্দিরের চূড়ার মত মনে হয়। সূর্য্যের আলো তার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ রেখার মত এসে পড়ে—তা'তে বনভূমির সৌন্দর্য্য যেন আরো বেড়ে যায়। পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত পাতার গালিচা—শত শত বছর ধরে ক্রমাগত যা ঝরে পড়ছে। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো উপসাগরের কাছে এই রকম একটি রেড্‌উড্ বন আছে। বনটা বেশী চওড়া নয়, লম্বায়ও মাইল কুড়ির বেশী হবে

না, কিন্তু হিসেব ক'রে দেখা গেছে এই অনতিগভীর বন থেকেই যেটুকু কাঠ পাওয়া যেতে পারে সমস্ত ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়ারল্যাণ্ড চষেও বোধ হয় ততটা কাঠ পাওয়া যাবে না।

ওপরের হিসেব থেকেই বুঝতে পারছ, ব্যবসায়ীদের কাছে এই বন-সম্পদ্ কি রকম মূল্যবান্ এবং লোভনীয়। এই গাছের দৌলতে কত লোক যে ক্রোড়পতি হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। ফলে লোভী ব্যবসাদারদের পাল্লায় পড়ে এমন জিনিষও লোপ পেয়ে যাবার পথে বসেছিল। ওদেশের লোকেরাই সভা ক'রে, সমিতি ক'রে, চাঁদা তুলে, আইন পাশ করিয়ে এই জাতীয় সম্পদ্‌কে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। এখনও সেখানকার 'সেভ্ দি রেড্‌উড্‌স্ লীগ' অর্থাৎ "রেডউড্‌দের বাঁচাও" সমিতি ও অমনিধারা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে সমানে আন্দোলন চালাচ্ছে।

এই রেড্‌উড্ বনের এক অংশকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিহত আমেরিকান্ সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে রাখবার পরিকল্পনা হয়েছে।

শাস্তি

সেদিন খবরের কাগজে ছবি দেখলাম ইয়োরোপের কোন্ এক দেশে (পোল্যাণ্ড কি চেকোশ্লোভাকিয়া বা ঐ রকম কোন দেশ—নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না) দুধে জল মেশাবার অপরাধে নতুন রকমের এক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা যারা দুধে জল মিশিয়েছিল তাদের বুকের ওপর পোষ্টার এঁটে দেওয়া হয়—"আমি দুধে জল মিশিয়েছিলাম ব'লে আমার শাস্তি"—তারপর তাদের মাথায় সেই জল মেশান র বালতি চাপিয়ে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়। লোকে টিটকারী দিতে থাকে। দুধে জল মেশান বা খাবারে ভেজাল দেওয়া সমাজের সঙ্গে শত্রুতা করা, দেশের লোকের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা; কাজেই সেই দেশের শত্রুকে এইভাবে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশেও এই ধরণের অপরাধীর সংখ্যা খুব বেশী। দুধে, ঘিয়ে, চালে, ময়দায়—সব কিছুতেই এখানে অবাধে ভেজাল দেওয়া হয়, কিন্তু খুব কম লোকই ধরা পড়ে বা শাস্তি পায়।

অপরাধীকে প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়া—সাধারণ লোকে যাতে তাকে চিনে রাখতে পারে,—এ সব ব্যবস্থা সেকালকার দিনে অনেক দেশেই দেখা যেত। এখানে তার একটা নমুনা দিচ্ছি। ছবিতে দেখ একজন লোককে একটা কাঠের তক্তার মধ্যে কি ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। তক্তার মধ্যে তিনটে ফুটো। একটার ভিতর দিয়ে অপরাধীর মাথাটা গলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর দু'টো ফুটোর ভিতর দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে তার দুই হাত। তারপর সব শুদ্ধ তালা-চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তি-কলটির নাম হচ্ছে পিলোরি। মধ্যযুগে ইয়োরোপের অনেক জায়গায় কোন কোন অপরাধে এই পদ্ধতিতে সাজা দেওয়া হ'ত। অপরাধীকে পিলোরি যন্ত্রে আটকে রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত। রাস্তার লোকে দাঁড়িয়ে দেখত, টিটকারী দিত। পিলোরিতে দাঁড়াতে হবে ভয়ে অনেকে অপরাধ করতেও ইতস্ততঃ করত বৈকি!

সেকালের শাস্তি দেবার একটি যন্ত্র—পিলোরি

রামধনুর ছোট্ট বন্ধুগণ,

জয় হিন্দ। এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ২০ বছর পূর্ণ হ'ল। আসছে বৈশাখ থেকে আমরা যে নতুন পরিকল্পনা করেছি সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় তোমাদের বলেছি। তোমরা অনেকেই যে আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে চিঠি দিয়েছ সে জন্য খুসী হয়েছি।

আজকাল কোন কোন ছোটদের পত্রিকায় ছোটরাও সংবাদদাতার কাজ করছে। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ জানতে চেয়েছ আমরা এ রকম প্রস্তাবে রাজী আছি কিনা। নিশ্চয়ই রাজী আছি। তোমাদের নিজেদের দেওয়া খবর তোমাদেরই কাগজে বেরোবে এ তো খুবই ভাল কথা। শুধু খবর পাঠাবার আগে খবরটা ভাল ক'রে যাচাই ক'রে পাঠাবে—যেন কোন ভুল সংবাদ না হয়। আর খবরটা এমন হওয়া চাই, যার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সংবাদের স্থান, তারিখ, সময় এবং বিস্তৃত বিবরণ দিতেও ভুলবে না।

গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদে আমাদের দেশে কি রকম শোকের ছায়া পড়েছিল তা তোমরা জান। বিদেশের ছোট ছোট ছেলেদের মনেও খবরটি কি রকম রেখাপাত করেছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নীচের চিঠিটা আমাদেরই এক ছোট্ট বন্ধুর কাছে তার আমেরিকার একটি ছোট্ট বন্ধু ব্রাউন্ লিখেছে। ব্রাউনের বয়স ১২ বছর।

"আজকের কাগজে ২ ইঞ্চি লম্বা শিরোনামা দিয়ে যে খবরটি বেরিয়েছে তা পড়ে আমি যেমন অভিভূত হয়ে পড়েছি, জ্ঞান হবার পর এই ১২ বছরের মধ্যে আর কোন খবর আমাকে তেমন আঘাত করে নি। মহাত্মা গান্ধী নেই! তাঁকে নাকি তাঁদেরই দেশের কোন্ একটা লোক গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে! গান্ধীকে কখনও চোখে দেখি নি। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু গল্প শুনেছিলাম তা'তে মনে মনে তাঁকে কল্পনা করেছিলাম যীশুরই সমগোত্র ভাবে। সেই প্রশান্ত, সরল, মাতৃসুলভ স্নেহময় দৃষ্টি যেন চোখের সামনে ভাসত! গান্ধীজী ১২৫ বছর বাঁচবেন বলেছিলেন। ভাবতাম, ততদিনে আমি বড় হব এবং তখন নিশ্চয়ই একবার ভারতে বেড়াতে যাব। তখন সকলের আগে গিয়ে দেখব দু'টি জিনিষ—হিমালয় পাহাড় আর তারই মত বিরাট মানুষ গান্ধীকে।

"আমি তোমাদের দেশের স্বামীজির (বিবেকানন্দ) গল্প শুনেছি, টেগোরের (রবীন্দ্রনাথ) গল্প শুনেছি, তাঁদের কাউকে দেখি নি। ভেবেছিলাম অন্ততঃ গান্ধীকে দেখার সৌভাগ্য হবে। তিনিও চলে গেলেন…"

এবারের মুখপত্রে শিবাজী মহারাজের ছবি দেওয়া হ'ল। স্বাধীনতার কথা মনে হ'লে শিবাজীর কথা আগে মনে পড়ে। স্বাধীনতাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন, আর কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর স্বপ্ন সফল করেছিলেন!

শিবাজী শুধু বীর ছিলেন না—চরিত্রবলে ছিলেন আদর্শ। নিজের ধর্ম্মের উপর ছিল যেমন তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তেমনি পরের ধর্ম্মকেও তিনি সম্মান করতে জানতেন। নারী মাত্রেই তাঁর কাছে ছিল মা, তাঁদের সম্মান রক্ষা ছিল তাঁর কাছে সকলের আগে। শিবাজীর শত্রু কাফী খাঁ পর্য্যন্ত তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন,—শিবাজী কখনও কোন মসজিদের অসম্মান করেন নি, কোরাণকে

তিনি পরম পবিত্র ব'লে জ্ঞান করতেন। যুদ্ধজয়ের পর তাঁর কোন অনুচর যদি বিজিত দেশের মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার বা অসম্মান করত তবে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। নিজের ছেলেকেও তিনি এক বার এ দণ্ড দিতে ইতস্ততঃ করেন নি।

দেশের এই দুঃসময়ে আমাদেরকে শিবাজীর এই মহান্ আদর্শের কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে তাঁর আদর্শের প্রতীক্ পতাকা ছিল গৈরিক, "বেরাগীর উত্তরী বসন"—ভারতের চিরকালের যা আদর্শ।

শিবাজী সম্বন্ধে স্বার্থান্বেষী বিদেশী ঐতিহাসিকেরা এমন অনেক কথা লিখে গেছেন যা পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে প্রমাণ করেছেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি তোমাদের পড়ে দেখতে বলি। আর পড়ে দেখো রমেশচন্দ্র দত্তের "মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাত" এবং যদুনাথ সরকারের "শিবাজী" বইখানি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। বন্দে মাতরম্।

ইতি— রাঃ সঃ

বাংলা ভাষা পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্র ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছে এবং সরকারী কাগজপত্রে ও অন্য দিকে দ্রুতভাবে এর ব্যবস্থা হচ্ছে। সম্প্রতি সেখানকার সরকারী গেজেটও বাংলায় ছাপা হয়েছে।

পূর্ব্ব বঙ্গেরও হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। সেখানকার গ্রাম্য লোকেদের অনেকেই বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। কাজেই পূর্ব্ব বঙ্গেও রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে ব'লেই আমরা আশা করি।

গণতন্ত্রের দিক্ দিয়ে দেখলে সমস্ত পাকিস্থানেও বাংলা ভাষা অন্যকম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি, কারণ সমগ্র পাকিস্থানেও বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া বাংলা ভাষাই বোধ হয় এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলা সাহিত্য যে মর্য্যাদা পেয়েছে প্রচলিত অন্য কোনও ভারতীয় সাহিত্য তা পায় নি। হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্মিলিত প্রতিভা ও চেষ্টাতেই এমনটা হতে পেরেছে। এবং আজও এই বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়েই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মুসলমান রাজত্ব-কালেও বাংলার মুসলমান নবাবেরা এই ভাষা গড়ে তুলবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই তা জানে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে সে সম্পর্কে এ কথাগুলি ভেবে দেখা উচিত।

* * * *

ভারত ও পাকিস্থান এই দুই নতুন ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ব্রহ্মদেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে খবর তোমরা পেয়েছ। গত ৩রা ফেব্রয়ারী সিংহল দ্বীপেও ডোমিনিয়ন্ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্' কথাটার বাংলা হচ্ছে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন", পূর্ণ স্বাধীনতা না হ'লেও এটা স্বাধীনতার প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে।

সিংহলে বিদেশীর প্রভুত্ব বহুদিনের। 'প্রায় দেড়শ'

বছর পর্ত্তুগীজদের অধীনে থেকে তারা পড়ে ওলন্দাজদের হাতে। তারপর ১৭৯৫ থেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব। ইংরেজরা প্রথমটা সিংহলকে মাদ্রাজের সঙ্গে যুড়ে দিয়েছিল, পরে তাকে করা হয় 'ক্রাউন কোলোনী'।

তোমরা হয়ত জান, বাংলার সঙ্গে সিংহলের যোগসূত্র বহুদিনের। বাংলার বিজয় সিংহ তাঁর সাতশ' অনুচর নিয়ে ঐ দ্বীপ জয় করেন এবং তাঁরই নাম থেকে 'সিংহল' নাম হয়েছে এ কথাও ইতিহাসে পড়েছ। সেই প্রাচীন বাঙ্গালীরা সে দেশেরই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান, এবং তাঁদের বংশধররাও নিজেদের সিংহলী বলে পরিচয় দিতে থাকেন। যদিও সে অনেক দিনের কথা, তবুও সিংহলীদের আচার-ব্যবহারে আজও বাঙ্গালীদের সঙ্গে অনেক মিল দেখা যায়, সিংহলী ভাষাতেও বাংলা শব্দের প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে।

বাঙ্গালী ছাড়া মধ্যযুগে অনেক তামিল অধিবাসীও স্থায়ীভাবে সিংহলে গিয়ে বসবাস করেছেন; এবং তারপর চা ও রবারের বাগানে শ্রমিক হিসাবেও গেছেন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়।

রামায়ণের যুগে দ্বীপটীর নাম ছিল লঙ্কা। সম্ভবতঃ লঙ্কা, সিংহল ও ইংরেজী (বিকৃত উচ্চারণ) সিলোনের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে তার নতুন ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রীলঙ্কা'।

* * * *

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে কলকাতার ইডেন উদ্যানে যে নিখিল ভারত প্রদর্শনী সুরু হয়েছে তার সমকক্ষ প্রদর্শনী এ দেশে বোধ হয় আর কখনও হয় নি! প্রদর্শনী মানে যে শুধু দোকানপাট নয়—জাতির শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি,—এক কথায় একটা স্বাধীন দেশকে বড় ক'রে তুলতে গেলে যে যে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত—কর্ত্তৃপক্ষ তা-ই দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

প্রদর্শনীর 'ছোটদের মহল'টি তোমাদের দিক্ থেকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে করি। এ দেশের ছেলে-মেয়েদের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এতে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ছোটদের ও অভিভাবকদের যা জানা দরকার তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।—যেমন ধর 'শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধীয় প্রাচীর-পত্র এবং তার দুর্লভ নমুনা-সংগ্রহ। বহু কিশোরহিতৈষী প্রতিষ্ঠান এতে সহযোগিতা করেছেন। তার মধ্যে শিশুসাহিত্য-পরিষদের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নাম করা যায় কিশোর সভা, মুকুল সংঘ, সব পেয়েছির আসর, কিশোর দল (পাটনা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ, মূক-বধির বিদ্যালয়, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন ছোটদের পত্রিকা-সম্পাদক, এবং আরো অনেকের।

ছোটদের মহল ছাড়া বিজ্ঞান, জাতীয় আন্দোলন, চারুকলা, মহিলা, সংবাদপত্র, যুদ্ধ-বিজ্ঞান, সরকারী বন ও কৃষি, দামোদর পরিকল্পনা, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, রেল-ওয়ে, খেলাধূলা, দেশীয় রাজ্যের শিল্পকলা—ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগগুলিও বিশেষ ভাবে দেখবার মত হয়েছে।

* * * *

তোমরা শুনে সুখী হবে শিশুসাহিত্য-পরিষদ্ থেকে এক বছর অন্তর বাংলা শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখককে ভুবনেশ্বরী পদক নামে একটি সুবর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। ছোটদের প্রিয় কবি শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য পরিষদ্‌কে এর প্রয়োজনীয় অর্থ দান করেছেন। ঠিক হয়েছে প্রথম বছর এই পদক দেওয়া হবে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরে জানতে পারবে।

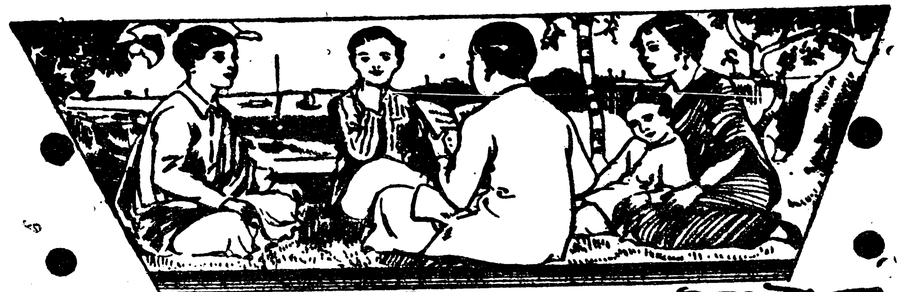

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

পাহাড়

শ্রীবাসুদেব লস্কর

পাহাড়, ওগো পাহাড়,
বন্ধু তুমি কাহার
বলবে মোরে ভাই ?
উচ্চ তোমার শির
কত মেঘের ভিড়,
ঠিক ঠিকানা নাই।

এখান হ'তে দূর,
ঐ যেথা রোদ্দুর
ছায়ার সাথে খেলে,
আকাশ যেথা নীল,
ছবির মত চিল
উড়ছে ডানা মেলে।

সেদিন দুপুর বেলা
করতে গিয়ে খেলা
হঠাৎ হ'ল মনে—
আমার ঘরের কাছে
তোমার ছায়া নাচে
খেলতে আমার সনে।

ঘরের বাঁধন টুটে
চলনু ছুটে ছুটে
তোমায় ছোঁব বলে।
যতই দূরে যাই
নাগাল নাহি পাই,
দূরেই গেলে চলে।

সেথায় তোমার শিরে
হাজার গাছের ভিড়ে
পাখীর বাসা যত ;
পথ গিয়েছে ঘুরে
উচ্চ তোমার চুড়ে
বাঁকা সাপের মত।

হেথায় ঘরের ফাঁদে
পরাণ আমার কাঁদে
কেবল চেয়ে থাকি,
জানলা গারদ টুটে
মন যে চলে ছুটে
সে কি শুধুই ফাঁকি ?

পেলাম বড় ভয়,
মনেতে সংশয়
কেন এমন হ'ল,
পাহাড়, ওগো পাহাড়,
বন্ধু তুমি কাহার
বল আমায় বল।

পণ

কুমারী প্রতিমারাণী দে

দেশকে স্বাধীন করবো মোরা—করবো গো,
নতুন মানুষ—নতুন জীবন গড়বো গো!
আনবো মোরা সূর্য্যোদয়ের নতুন দিন—
মোদের কথা কল্পনাতেই নয় রঙ্গিন।
আপন হ'তে শক্তি সাহস ধরবো গো,
রক্ত আঁখি দেখলে নাহি ডরবো গো!
অত্যাচারের পীড়ন যতই ভীষণ হোক
পালিয়ে তবু যাব না আর নামিয়ে চোখ,
মৃত্যু আসে আসুক—হেসে মরবো গো;
দেশকে স্বাধীন করবো মোরা—করবো গো!

হৈমন্তিকা

শ্রীঅমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈমন্তিকা হৈমন্তিকা!
হিম-ঝরান চরণ-রেখা।
সুনীল গগন ঘুমে মগন
শীতের সাঁঝের চিত্র আঁকা।
পাকা ধানের মিষ্টি সুবাস
আনছে বয়ে হিমেল বাতাস,
পথ বেয়ে যায় সোনার দেশে
সোনার রঙের ধানের ঝাঁকা।
দিনের শেষে অলস সাঁঝে
মন বসে না কোন কাজে,
শান্ত, নিঝুম, আবছা সে মাঠ,
তারায় তারায় আকাশ ঢাকা।

জান কি?

(সংগ্রহ

শ্রীসুখেন্দুমোহন দাস

১,৭৫০ মাইল দীর্ঘ দানিয়ুব নদী সাতটী বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গ্রীনউইচ্ মানমন্দিরে কোয়ার্টজ্-ঘড়িগুলো এত নির্ভুল ভাবে তৈরী যে এক মিনিট ফাষ্ট বা স্লো চলবার জন্য হয়তো ১৬৫ বছর লেগে যাবে।

একটি লোক চোখ বন্ধ ক'রে কোন মতেই সোজা চলতে পারে না।

লণ্ডনের পার্লামেণ্ট হাউসে সমস্ত বারান্দা বা গমনাগমনের পথগুলো একত্র যুড়ে দিলে, তা দৈর্ঘ্যে হবে দু' মাইলেরও বেশী।

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

১৩৫৪

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি উপলক্ষ্যে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিষয়—তোমার সব চেয়ে প্রিয় বই কি এবং কেন।

নিয়ম—লেখা যেন ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের আধ পৃষ্ঠার (অর্থাৎ রামধনুর দু'পৃষ্ঠা) চেয়ে বড় না হয়। বিচারের সময়ে লিখবার ভঙ্গী, বিষয়বস্তু, এবং বিশেষ ক'রে যুক্তিগুলি বিবেচনা করা হবে। লেখা ১০ই বৈশাখ, ১৩৫৫ র ভিতর রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। কেবলমাত্র গ্রাহকেরা এবং যারা আগামী বছর গ্রাহক থাকবে তারাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও বয়স লিখে দিতে হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

২টি পুরস্কার দেওয়া হবে

১টি—যাদের বয়স ১২ বছরের নীচে।
১টি—যাদের বয়স ১২ বছরের উপরে;

যারা পুরস্কার পাবে তারা তাদের ফটো পাঠালে তাও রামধনুতে প্রকাশ করা হবে।

যে বই তোমরা পড়তে পার

ছেলেদের মহাভারত—৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দমাদম্ দামোদর—৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নানা কথা—চারুচন্দ্র দত্ত, রূপকথা—মোহিতলাল মজুমদার, ভূতের মত অদ্ভুত—বুদ্ধদেব বসু, মুক্তির পথে ভারত—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নতুন কিছু—রবীন্দ্রলাল রায়, মাণিক মেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, দেশের মাটী—হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্প্রাদিত, রাঙ্গা রাখী—দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত, কাজ খেয়াল খেলা—মৌমাছি সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত (আশুতোষ লাইব্রেরী)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

জাম, বেদানা, বেল, নোনা, কলা, আম, মধু, আনারস, কুল, মাকাল (বা কমলা) পুরী, আনার, কেক, আতা, গাব, লিচু।

উত্তরদাতাদের নামঃ চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); ঋমেন্দু, বাবলু, তপন, স্নেহলতা, তারাপ্রসন্ন, গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); সত্রাজিৎ বসু (লক্ষ্ণৌ); অর্পণা ও দীপ্তি (কলিকাতা); মঞ্জরী দাশগুপ্ত (নিউদিল্লী), সেবাব্রত রায় (পাটনা); আয়েষা ও আবদুল আজিজ (ঢাকা); কল্যাণ চক্রবর্ত্তী (নতুনগাছি); তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); খোকা, শ্যামল, টুনু, মিণ্টু, ইন্দিরা (বালিগঞ্জ); তরুণ লাহিড়ী (ভাগলপুর); জামাইবাবু, বুলু, তপন, স্বপন, কানু (শ্রীহট্ট)।

নূতন ধাঁধা

সেজ মামা ভারী মজার লোক, ছেলে মহলে তাঁর রী প্রতিপত্তি।

রবিবার সকালে দেখা গেল তিনি নয়টা দিয়াশলাই-ঠি নিয়ে বসে আছেন। ছেলেরা আসতেই বল্লেন, ল তো এখানে ক'টা কাঠি?"

সবাই সমস্বরে বল্‌ল—"নয়টা।"

"হুঁ। কিন্তু একে করতে হবে দশ। কিন্তু খবরদার, একটি কাঠিও ভাঙ্গতে পারবে না। যে সবার আগে ক'রে দিতে পারবে সে পাবে এক প্যাকেট চকোলেট।"

মামার কথা শেষ না হ'তেই ছেলের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু অতই কি সোজা? মামাও কম চালাক ন'ন।

তোমরা দেখ তো একটু সাহায্য করতে পার কিনা। চাই কি, চকোলেটের ভাগও পেয়ে যেতে পার।

মনে রেখ

* এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর ২০ বর্ষ শেষ হ'ল। আগামী বৈশাখ থেকে ২১শ বছর সুরু হবে।
* আগামী বছর রামধনুর বার্ষিক মূল্য চার টাকা করা হয়েছে। ষান্মাসিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৵০। ভি. পি.তে নিলে এর উপর ভি. পি. মাশুল (নতুন নিয়মে ।৵০) দিতে হবে, পত্রিকা পেতেও কিছু দেরী হবে। সুতরাং মনি অর্ডার করাই সুবিধাজনক। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে টাকা জমা দিতে পার।
* পাকিস্থানে ভি. পি. চলাচলে দেরী হয় বলে পাকিস্থানে ভি. পি. করা হবে না। পাকিস্থানের গ্রাহকেরা অনুগ্রহ ক'রে যথা সময়ে মনি অর্ডার ক'রে টাকা পাঠাবে।
* ২০শে চৈত্রের মধ্যে রামধনুর চাঁদা আমাদের হাতে না এলে ভারত রাষ্ট্রের ঐ সব গ্রাহকদের কাছে ভি. পি.তে বৈশাখ সংখ্যা পাঠানো হবে। তারা নিশ্চয়ই তা ফেরৎ দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
* কেউ কোন বিশেষ কারণে গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক হলে ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের অবশ্য জানাবে।
* আগামী বছরের রামধনু আরও বড় ক'রে—নতুন ছাঁচে ঢেলে প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে।
* টাকা বা চিঠি পাঠাবার ঠিকানা :—কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু, ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা ২৫। এ ছাড়া আমাদের শাখা কার্য্যালয়েও (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) হাতে টাকা জমা দিতে পার।

VOLUME

ENDS.

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২১শ বর্ষ

১৩৫৫

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ।৵০ ষান্মাসিক ২।০

রামধনু

২১শ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫৫)

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক		পৃষ্ঠা
অজানা দেশে (কবিতা)	...	শ্রীঅচ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...	১৭০
অন্ধকারের গল্প (গল্প)	...	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী	...	৮২
অয়েল পেন্টিং (ঐ)	...	শ্রীনারায়ণ দত্ত	...	৬১৭
আগুনের গুণ (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	১২১
আজকে বাদল দিনে (ঐ)	...	শ্রীঅচ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...	৩৪৮
আজি এলো বৈশাখ (ঐ)	...	এ. কে. জয়নাল আবেদীন	...	১৫
আত্মোন্নতি সমিতির গল্প (স্মৃতির পটে)		অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি		৫১৬, ৫৬৩, ৬২৭
আত্মোন্নতি সমিতির জন্মকথা (ঐ)	...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	...	৩২৮, ৩৭৭, ৪১১, ৪৮০
আমাদের প্রতিবেশী (দেশবিদেশের কথা)		প্র. বা.	...	১০০
আমাদের প্রতিবেশী (ঐ)	...	শ্রীনিরুপমা তামুলী	...	৪৮৩
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ	...		...	৫৬, ১১৬, ১৭৩, ২৩০, ২৮১, ৩৫০, ৪০৫, ৪৫৬, ৫০২, ৫৪৯, ৬০৭, ৬৫৯
আমার গ্রাম (কবিতা)	...	শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	...	৫৫২
আমার বাঘ-শিকার (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	৮
আমি যখন ছোট ছিলাম (স্মৃতির পটে)		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	৪
উত্তর (গল্প)	...	শ্রীকাত্তিক মজুমদার	...	৬০৪
উড়োচুরি (বড় গল্প)	...	শ্রীকুঞ্জনাথ	...	৪৬৬, ৫২৪, ৫৬৯
এই তো সুযোগ (কবিতা)	...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ	...	১৭৭
এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন	...	...	...	১১৪, ৩৫৮, ৪৫৬
এক ঝাঁক বুনো হাঁস (কবিতা)	...	শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী	...	৫৩৫
একটি পাখীর প্রতি (ঐ)	...	শ্রীমীরা ঘোষ	...	১০৮
একটুখানি হাস (রঙ্গ)	...	...	...	৩২৭, ৩৭৫
এখানে (কবিতা)	...	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	৫৩৪
এত করেও যারা হেরে গেল (বিজ্ঞান)		শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি.	...	৪৬৪
এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেস (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	...	৫৮৬
এলো শীত (কবিতা)	...	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	...	৫৫২
ওরা আর এরা (ঐ)	...	শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক	...	১৪৫
কবি (কবিতা)	...	শ্রীসলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪৩৩
কবি কবি চেহারা (গল্প)	...	শ্রীকাত্তিক মজুমদার	...	১৩৯
কমলা সায়রের জল (গল্প)	...	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	...	৪১
কলকাতার আশেপাশে (ভ্রমণ)	...	শ্রীগৌরী দেবী	...	১৭
কি থেকে কি (বিজ্ঞান)	...	অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্. এস্-সি	...	৫২৮
কীট-পতঙ্গ ও মানুষ (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	...	৪৭৬
কুড়ান গল্প (গল্প)	...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	...	৪৯
কে সে ? (গল্প)	...	শ্রীকাত্তিক মজুমদার	...	৪৩৪
খুনী কে ? (গল্প)	...	শ্রীশামুক	...	৩৮২
খেলাধূলা	...	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	...	৫৪, ২৬৪, ৬৩১
খেলাধূলার খবর	...	,, ,,	...	১৬৯
খোকনের বাবা (গল্প)	...	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	...	৪৮৭
গাছে কি সোনা ফলে ? (বিজ্ঞান)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	...	৩৪২
গান্ধীবাণী-কণিকা (কবিতা)	...	শালগ্রাম	...	৭৮
গুণ্ডার কবলে (গল্প)	...	শ্রীঅমলশঙ্কর ভাদুড়ী	...	১০৯
চতুর্থ পেরেক (গল্প)	...	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	...	৫৭৭
চালানি কারবার (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	৩০৮
চাঁদা আদায় (গল্প)	...	শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৪৯
চিকণ কালো পথিক (কবিতা)	...	শ্রীঅতীনকুমার	...	৬১
চিঠিপত্র				৫৯, ১১০, ১৭১, ২২৮, ২৮৫, ৩৫৬, ৪০৭, ৪৫২, ৫০৩, ৬০৯, ৬৬৫
চিত্র-পরিচয়	...	...		৫৫৫, ৬৬৮
চিত্রশালা	...	...		৭৫, ২৪৪
চিনচিলা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	...	৬৪০
চিনি-পাতা দই (কবিতা)	...	শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত	...	৪৩৩
চৈতালী (কবিতা)	...	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬৬২
চোরের চালাকি (সত্য ঘটনা)	...	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	...	২৪১

বিষয় বর্ণানুক্রমিক		লেখক		পৃষ্ঠা
ছবি (কবিতা)	...	এ. কে. জয়নাল আবেদীন	..	৩৩৫
ছড়া (কবিতা)	...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি. এল্	...	১৮৬
ছাত্রভাণ্ডার (স্মৃতির পটে)		অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. বি. এস্-সি		১৯৯
ছাত্র মোরা (কবিতা)	...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, এ, বিদ্যাবিনোদ		১৪৪
জয়ের মালা (গল্প)	...	অরূপ	...	১৮৭
জো (গল্প)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...	৪০১
ঝর্ণা (কবিতা)	...	শ্রীঅমিয়কুমার রায়	...	২১৫
তারা (বিজ্ঞান)	...	অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে, এম্. এস্-সি	...	১৩২
তুমি কেমন করে পড় (প্রবন্ধ)	...	,, শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	...	৬২
দাড়ি (ব্যঙ্গচিত্র)	...	...	...	৪৫৩
দিক্‌হারার ধ্রুবতারা	...	...		২০৯, ৩২২
দু'টি কিশোর (কবিতা)	...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	৪৫৭
দুলু (গল্প)	...	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	...	১৯
দেখি তুমি কি কি বই পড়েছ ! (চিত্র)		...	...	৩৭৬
দোলনা দোলার গান (কবিতা)	...	শ্রীবিজয় সাউ	...	৬৬৩
ধনী ও দরিদ্র (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর	...	১৪
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর		৬০, ১২০, ১৭৬, ২৩২, ২৮৮, ৩৫৮, ৩৫৯, ৪০৮, ৪৫৬, ৫০৫, ৫৫৪, ৬১০, ৬১১, ৬৬৮		
নতুন প্রভাত (কবিতা)	...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	...	১
নতুন বই	...	...		২২২, ৪৯১
নদীর ধারে (কবিতা)	...	শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...	৬০৬
নববর্ষ (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	...	১৬
নরহরির বড় সাহেব (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	...	১২৭
নানা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ৩০, ৮৯, ২২৩, ২৭২, ৩৪২, ৪৪৮, ৪৯৭, ৫৪৬		
নাম (প্রবন্ধ)	...	শ্রীমায়া দেবী	...	২৮৭
নামকরণ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	...	১৫১
নিরামিষ মাছ (গল্প)	...	শ্রীঅসিতকুমার পাঠক	...	২৬৯
নির্ভয় (কবিতা)	...	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	...	৩৪৯
নির্ভীক (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	৪০৯

বিষয় বর্ণানুক্রমিক		লেখক		পৃষ্ঠা
পণ্ডিতজী (গল্প)	...	শ্রীঅজয় দত্ত	...	৬৪২
পনেরোই আগষ্ট স্মরণে (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	...	২৮৬
পরিচয় (গল্প)	...	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	...	৫২০
পয়লা বৈশাখ ১৩৫৫ (গল্প)	...	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	...	৭৬
পাখীর গানের মত (কবিতা)	...	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	...	২৫৩
পাখীর জন্ম (বিজ্ঞানের গল্প)	...	অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ	...	২৫০
পাটের আবর্জ্জনা (বিজ্ঞান)	...	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	...	২৩৯
পাতালপুরীতে (ভ্রমণ)	...	শ্রীকমলা দত্ত, বি.এ, বি.টি	...	৮৬
পান্তুয়া-বিভ্রাট (কবিতা)	...	শ্রীপ্রভাত বসু	...	৪২৩
পাঁচ মিশেলী	...	৪৫, ৯৬, ১৬৬, ২১৭, ২৭৭, ৩৩৬, ৩৯৫, ৪৩৭, ৫৪৪, ৫৯৮, ৬৫৫		
পুরস্কার (গল্প)	...	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ	...	৪১৮
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও তাহার ফলাফল		১১৯, ২৩২, ৩৫৯, ৫০৫		
পূজার ছুটী (কবিতা)	...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৮৯
পূজোর ছুটীতে যে সব নাটক অভিনয় করতে পার	...		...	৩৫৬
পেলেম মবার ভালবাসা (কবিতা)	...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৯০
পৌর বোধ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	...	৫৪৬
প্রতিমূর্ত্তি (গল্প)	...	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ	...	৫৩১
বক্সিংএর কথা	...	শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র	...	২২১
বন্দে মাতরম্ (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভটাচার্য্য, বি. এ	...	৩৩২
বল তো কিসের ছবি (চিত্র)	...	...	...	৬২৩
বসন্ত (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	...	৬০২
বংশলোচন (কবিতা)	...	শ্রীরবিদাস সাহা রায়	...	৬৫১
বার্নার্ড শ'র বিরানব্বই বছর (জীবন-কথা)		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি		২৭২
বাংলা সাহিত্যের গল্প (সচিত্র প্রবন্ধ)		শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ	৭৯, ১৫৫, ২৫৪, ৪২৪	
বিদেহী আত্মা (ধারাবাহিক উপন্যাস)		শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি ২৬, ৭১, ১২৩, ১৯৫, ২৩৫, ৩৯০, ৪১৫, ৪৬০, ৫১২, ৫৫৯, ৬২৫		
বিবেকানন্দ (নাটিকা)	...	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	...	৪২৮
বিষে বিষক্ষয় (গল্প)	...	,,	...	৩৪

বিষয় বর্ণানুক্রমিক	লেখক	পৃষ্ঠা
বীর সুভাষের জয় (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাত বসু	৬০৩
বেতার (গল্প) ...	শ্রীসুবোধ বসু, এম্. এ	৩০২
বৈদিক যুগের শান্তিবাণী (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	২১৫
ভগবানের বাণী (কবিতা) ...	" "	৩৬১
ভরদ্বাজ বাবুর অপমৃত্যু (গল্প) ...	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী	৩২৩
ভাগ্যিস বাজারে কাপড় নেই (রঙ্গচিত্র)	শ্রীরবীন ভটাচার্য্য	১০৪
ভাবী আশা-ভরসা (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৩৩৪
ভারতের বুলবুল সরোজিনী নাইডু (জীবনী)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৬৪৫
ভুল ভাঙ্গালো (গল্প) ...	শ্রীঅধীর দাস	৬৫২
ভোর (কবিতা) ...	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২১৪
মণিমঞ্জুষা ...	...	১০৫, ৫৯৩
মদন মাষ্টার (গল্প) ...	শ্রী শামুক	১৯০
মনের চিকিৎসা (বিজ্ঞান) ...	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	৩৭২
মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল ...		১১৯, ৬৬৭
মহাত্মাজী (কবিতা) ...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ	৬০৪
মাঠ ও আকাশ (কবিতা) ...	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬১৩
মাথার খুলির চিত্রকর (গল্প) ...	শ্রীনিরুপমা সেনগুপ্ত, বি. এ, বি. টি	৩৬৬
মায়াপুর (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীগৌরী দেবী	৫৩৬
মিছা ভয় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫০৭
মিঃ রক্ষিতের উইল (বড় গল্প) ...	শ্রীকুঞ্জনাথ	২১০, ২৫৭, ২৯৪
যারা আড়ালে কাজ করে (বিজ্ঞান) ...	শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত, বি. এস্-সি	১৮৩
যে বই তোমরা পড়তে পার ...	...	৬০, ১১৯, ৫৫৫, ৫৯৭
রতনে রতন চেনে (গল্প) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৬৫
রবিন হুডের জঙ্গলে (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	২৯০
রামসেতু (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সরকার	২৬৭
রাসবিহারী বসুর সহিত স্বল্পালাপ (স্মৃতির পটে)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্. এ, বি. এস্-সি ...	১৬০
রেলের গাড়ী চলে (কবিতা) ...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫৭
রোমের স্মৃতি (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্ত	২০৪
শয়তানের সভা (প্রবন্ধ) ...	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি ...	৫৮২

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
শরৎ (কবিতা) ...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ	৩৩৩
শান্তিপুর (দেশবিদেশের কথা) ...	শ্রীচণ্ডীচরণ দে	২৯৭
শান্তিবচন (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	৬৫০
শিমলার চিঠি (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়	১৪৬
শিশুর দুর্ভাবনা (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৩৬
শিশুসাহিত্য-সংবাদ ...	....	১০৯, ১৬৫, ২৭১, ৩৪৬, ৫৩৮
শিশুসাহিত্যিক কুলদারঞ্জন ...	...	৩৫৫
শিশুসাহিত্যিকের সম্মান ...	...	৫১
শীত (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	৪৮২
শেষ হ'ল দ্বন্দ্ব (কবিতা) ...	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪
শোন্ পাপ্‌ড়িওয়ালা (গল্প) ...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩১
সন্দেশ		৫৩, ১০৬, ১৭৬, ২২৯, ২৮৩, ৩৫৪, ৪০৪, ৫০৪, ৫৫৩, ৬৬
সব হারিয়ে রতন পাওয়া (গল্প) ...	শ্রীস্মৃতিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
সমব্যথী (কবিতা) ...	শ্রীনগেন্দ্রকিশোর নাগ্যসী, বি. এ	৯
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর ...	...	৬০, ৫৫
সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়ন্ ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৫৭
সাহসিকা (সত্য ঘটনা) ...	শ্রীউমা মজুমদার, এম্. এ	৫৬
সূর্য্যাস্ত (কবিতা) ...	শ্রীঅচ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫০
সেই কুলির ছেলেটা (গল্প) ...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৭
সেথায় আমার ঘর (কবিতা) ...	শ্রীঅধীর দাস	১৪
'সোনাতনের' কাণ্ড (গল্প) ...	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	২৪
সোনার বাংলা (কবিতা) ...	শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী	৩৮
সোনার সন্ধানে (প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৪৪
সোমনাথের বাদ্যকর (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৪
স্বপন-গীতি (কবিতা) ...	কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা	৫০
স্বপ্ন দেখা (বিজ্ঞান) ...	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	৫০
হিরোশিমা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্-সি ...	৩১৮, ৩৯৭, ৪২০, ৬
হে নাবিক, ধর হাল (কবিতা) ...	শ্রীবিজয়কুমার দাস	৪
হে বীর, প্রণাম করি (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৭, ১১২, ১৩৬, ১৭৯, ২৬ ৩৬২, ৪৪১, ৪৯৩, ৫৩৯, ৫৮৯, ৬
হেমন্ত (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	৪
হৈমন্তী (কবিতা) ...	শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ	৪৬

বিষ
অজা
অন্ধক
অয়ে
আগু
আজ
আজি
আত্মো
আত্মো
আমাদে
আমাদে
আমাদে
আমার
আমার ব
আমি যখ
উত্তর (
উড়োছুরি
এই তো
এই সংখ্যা
এক ঝাঁক
একটি পাখি
একটুখানি
এখানে (

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

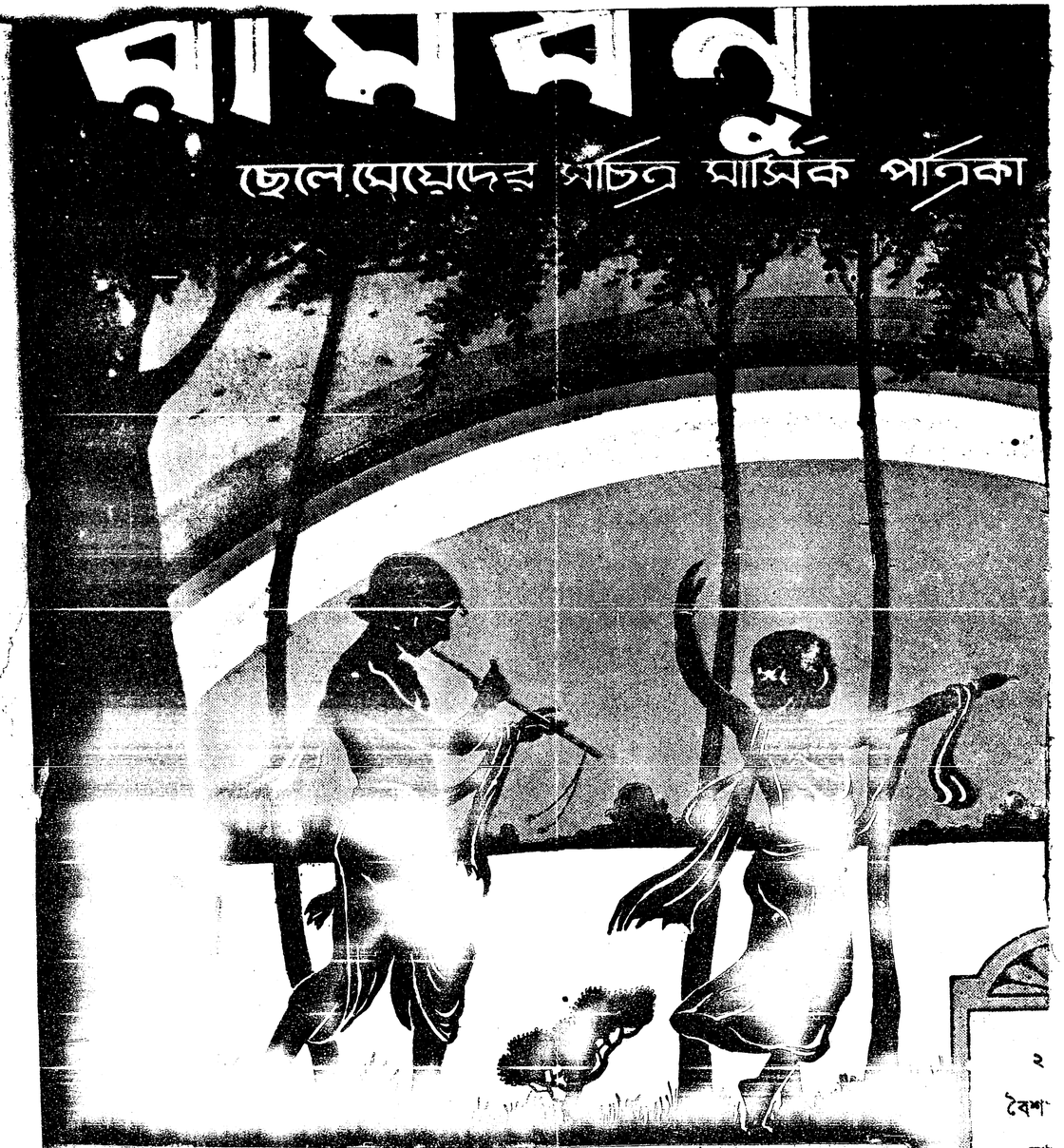

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্-সি

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড • ভবানীপুর • কলিকাতা

২
বৈশা
বা
ষাণ্ম
প্রতি

বিষ
অজা
অন্ধক
অয়েল
আগু
আজ
আজি
আত্মো

আত্মো

আমাদে
আমাদে
আমাদে
আমাদে

আমার
আমার ব
আমি যখ
উত্তর (
উড়োছুরি
এই তো
এই সংখ্যা
এক ঝাঁক
একটি পাখি
একটুখানি
এখানে (

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

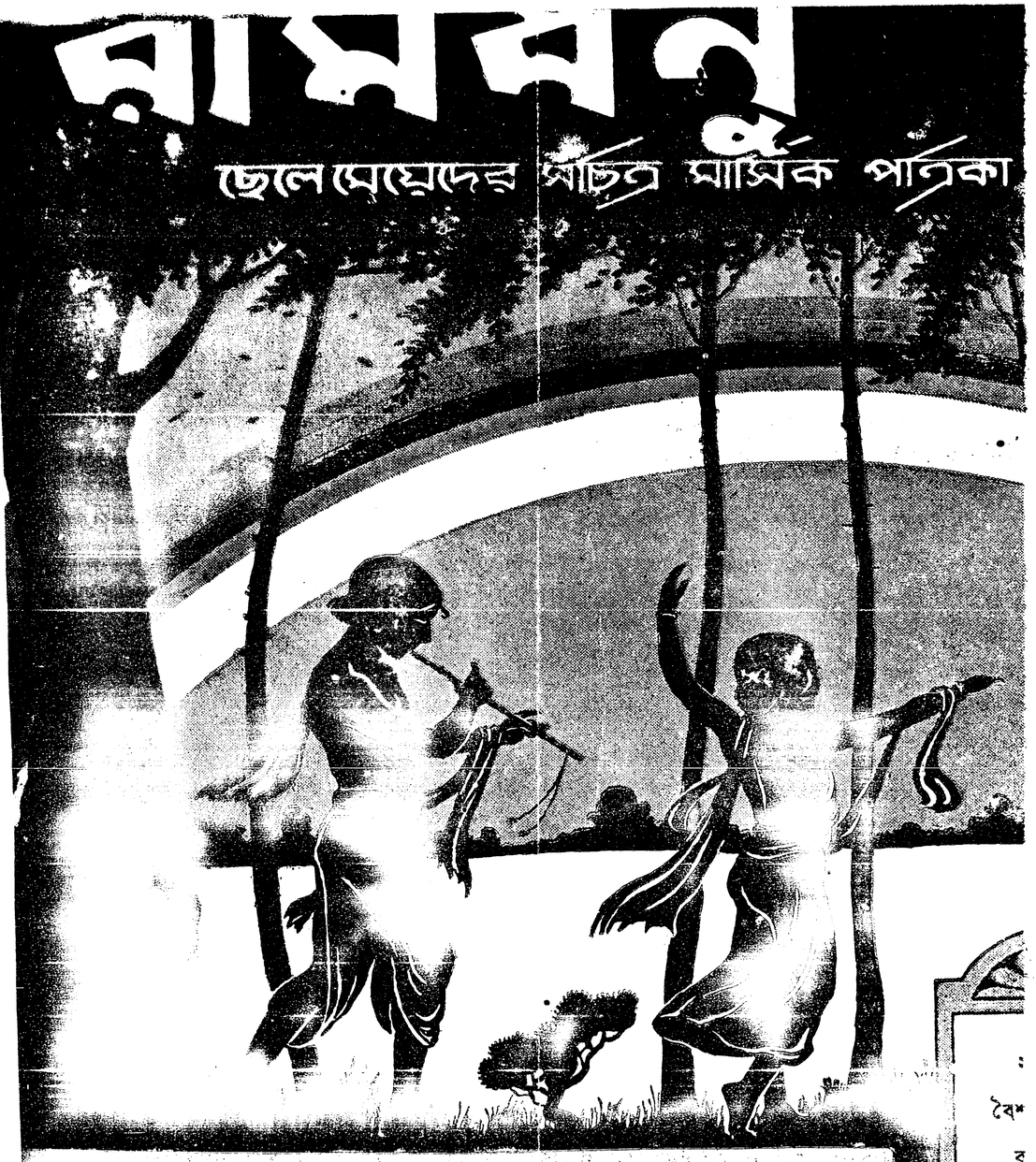

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্ • ভবানীপুর • কলিকাতা

বৈশ
ব
ষাণ
প্রতি

INTENTIONAL
DUPLICATE EXP

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪৲; ষাণ্মাসিক ২।০; প্রতি সংখ্যা ।৵০; ভি. পি. চার্জ স্বত
বৈশাখ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২০ দি
মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম সপ্ত
প্রকাশিত হয়

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হ
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক
রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক নং উ
না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা থাকে

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র যিনি গ্রা
তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয় : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রমা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

স্কুল-লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য কয়েকখানা ভাল বই

শিশুভারতী ও কৈশোরক সম্পাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

খেলার মাঠ

নূতন ধরণের ছোটদের উপন্যাস। ক্রিকেট খেলা, ডাক টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি কত অজানা রহস্য। অপরূপ প্রচ্ছদ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিদ্রোহী বালক

একটি ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমির কাহিনী। বইটির ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অভিনব। শোভন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

বালক কেশব

মহাপুরুষ কেশবের বাল্য-কাহিনী। প্রমোদ-কুমারের অঙ্কিত পাঁচখানা ছবি। রঙীন মলাট ও বাঁধাই। মূল্য ॥৵০ আনা।

মহিম ডাকাত

"...আলোচ্য গ্রন্থখানি মহিম-ডাকাতেরই জীবনে
ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ এত মনোরম যে
বসিয়া কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কিশোর-কি
হাতে নিঃসঙ্কোচে মহিম ডাকাত তুলিয়া দেওয়া য
—আ

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—মূল্য ২৲ টাকা।

১১শ বর্ষ | কৈশোরক | ব ৪

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ মাসিকপত্র। সু
দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকুমারী স্ব
ও বিশ্বগুপ্তের 'নবীন সূর্য্য' নামক দু'খান
চলিতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

কৈশোরক কার্য্যালয়, ৬৫১-এ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা ২৯

রহস্য···রোমাঞ্চ···মৃত্যু আর বিভীষিকার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে ঘটনা। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে নিশ্বাস চেপে এই সিরিজের প্রত্যেকখানি বই পড়তে হবে। ভয়ে শিউরে উঠতে হবে—পায়ের নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত খাড়া হোয়ে উঠবে। নিজে পড়ুন—ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে সাহসে ভরিয়ে দিন বুক।

যাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যে জাগরণ এনেছে সেই—বিজয়রতন বসাকের

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল — **মুখস যখন খুলে গেল**

প্রসিদ্ধ লেখক মণিলাল অধিকারীর — তরুণ লেখক অজয় বসাকের

কাঠের ড্রাগন — **হত্যা যাদের নেশা**

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের — প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বজ্র ভৈরবের মন্ত্র — **সীমান্তের বন্ধু** (যুদ্ধের এ্যাডভেঞ্চার গল্প)

শিশুদের অক্ষর পরিচয় ও প্রথম পাঠের যুগোপযোগী ছড়ার বই

ছবি ছড়ায় নেতাজী

অ-আ-ক-খ এবং যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত কবিতা ও গল্পের মাঝ দিয়ে নেতাজীর জীবনী। দু-রঙা ছাপা—বড় সাইজ—প্রায় শত ছবিযুক্ত বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। আজকের যুগে স্বাধীন ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রথম বই এমনই চাই। দাম ॥৵০

ছেলেমেয়েদের গল্প, কবিতা, এ্যাডভেঞ্চার ডিটেক্‌টিভ্, বার্ষিকী প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ।

এ, বি, পি বুক ডিপো

৮ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৬ (চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

ফাল্গুন মাসে—

১ম বর্ষ—১ম সংখ্যা বাহির হইল।—